কালিদাস রচনাসমগ্র

গদ্যে মহাকবি কালিদাসের সমস্ত রচনা

অনুবাদ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০
বইমেলা, ১৩৯৪
জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : গৌরচন্দ্র মান্না
করুণাময়ী প্রেস
৯/৭বি, প্যারীমোহন স্থর লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

সূচীপত্র

KALIDAS RACHANA SAMAGRA
Translated by : Sudhansuranjan Ghosh
Published by : Kalyanbrata Dutta
Price Rupees Forty only.

ভূমিকা

প্রবাদ আছে মহাকবি কালিদাস নিজের বিরচিত গ্রন্থসমূহ উপহার-স্বরূপ নিয়ে কর্ণাটরাজমহিষীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে পাণ্ডিত্যাভিমানিনী কবিত্বশক্তিগর্বশালিনী কর্ণাটরাজমহিষী প্রথমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে অসম্মত হয়ে একটি শ্লোক রচনা করে কালিদাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। সে শ্লোকের অর্থ হলো এই যে, যথার্থপক্ষে তিনজন কবি জন্মেছিলেন। তাঁরা হলেন ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমল হতে উদ্ভূত ব্রহ্মা, পুরাণ উপপুরাণ ও মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস এবং রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি। এই তিনজনই যথার্থ কবি, কারণ তাঁরা ত্রিভুবনের হিতাহিতের উপদেষ্টা গুরু। এছাড়া এখনকার কোন মানুষ যদি গদ্য পদ্য রচনা করে চিত্তচমৎকারিত্বের প্রয়াস পান তাহলে আমি কর্ণাটরাজ-প্রিয়া তার মস্তকে বামচরণ বিন্যস্ত করি।

পরে ভাগ্যবশতঃ কালিদাসের প্রণীত গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদ পেয়ে প্রভূত সমাদর ও গৌরবের সঙ্গে মহাকবিকে আহ্বান করে রত্নসিংহাসনের উপর বসিয়ে ঐ শ্লোকটি পাঠ করে কালিদাসের বামচরণ নিজের মস্তকে স্থাপন করে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁকে।

মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস যে দেশে জন্মেছেন, অমর ভাষায় কবিতা লিখে সনাতন হিন্দুসভ্যতার ধর্ম, আচার ও মানবপ্রকৃতির বিস্ময়াবহ অনন্ত বৈচিত্র্য একাধারে সমাবেশ করে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের রচিত মহাকাব্যে গভীর মাধুর্য ও প্রসাদগুণ মূর্ত করে তুলেছেন, সেই দেশে সংস্কৃত ভাষায় সরস কবিতা লিখে আর কেউ যশস্বী হতে পারেন, এমন সম্ভাবনা মহাকবি কালিদাসের আগে পর্যন্ত আকাশকুসুমের মতই ছিল।

কিন্তু কালিদাস এই আকাশকুসুমসদৃশ সম্ভাবনাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কাব্য হতে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে কি অপূর্ব কাব্যরস সৃষ্ট হতে পারে, তাঁদের সঞ্চিত কুসুমরাজির

দ্বারা কেমন সুললিত বৈজয়ন্তীমালা গ্রথিত হতে পারে, তা দেখাবার জন্যই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন কালিদাস।

কালিদাসের রচিত মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব—এই তিনখানি শ্রব্যকাব্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র —এই তিনখানি দৃশ্যকাব্য ছাড়া ঋতুসংহার, নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারাষ্টক, দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা ও শ্রুতবোধ কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকায় তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট করতে হয়েছে।

কালিদাসের রচিত কাব্যগুলি মহাভারতের মত সৌরলোক সমুদ্ভাসিত ও অজস্র শৃঙ্গসমন্বিত গিরিরাজ হিমালয়ের সঙ্গে অথবা রামায়ণের মত চন্দ্রজ্যোৎস্না সমুদ্ভাসিত স্থির সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু তাঁর কাব্য স্বর্গের অমরাবতীর স্নিগ্ধমধুর পবনান্দোলিত মন্দাকিনীবেষ্টিত নন্দনকানন যার মধ্যে আছে কত মণিময় ক্রীড়াশৈল, কত কুসুমকুঞ্জের বিচিত্র শোভা আর দিব্যগন্ধের সমারোহ, আর আছে কত পাখির কলকাকলির সঙ্গে স্বচ্ছশীতল সরোবরের নিত্যবিকশিত কমলনিচয়ের সুমধুর সৌরভে আকৃষ্ট মধুকরকুলের মনোহর গান।

ঐতিহাসিকদের মতে কালিদাসের জীবনকাল এখনো পর্যন্ত নির্বিরোধে ও নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হয়নি। তথাপি খৃষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব হতে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত যে চারটি কালগত মত এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকই কালিদাসের কাল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ অর্থাৎ কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল ৪৫৫ অব্দ এবং হয়ত বা কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল, আবার হয়ত বা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের কিছুকাল পর্যন্ত উজ্জয়িনীর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের কালিদাস, শূদ্রক, চতুর্থ শতকের বিশাখ দত্ত, পঞ্চম শতকের শেষভাগের ভুবনবিখ্যাত আর্যভট্ট, পঞ্চমের প্রথমাংশের বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষীগণ এই গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। গুপ্তযুগেই বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার চর্চায় ভারত সর্বাংশে

শিক্ষাদীক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়।

মেঘদূত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'মেঘদূত' ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিলেও কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।'

বস্তুতঃ কবিকল্পনার অবাধ প্রসারতায়, প্রেমচেতনার গভীরতায়, এক প্রাণস্পর্শী সৌন্দর্যচেতনার অতিব্যাপ্ত উচ্ছ্বাসময়তায় এ কাব্য শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের আর কোন কাব্যের সঙ্গে এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনা চলে না। মেঘদূত যেন রামগিরি পর্বত হতে অলকা পর্যন্ত ভারতের এক বিশাল ভূভাগের একখানি বিরাট প্রতিকৃতি।

স্বচ্ছন্দবিহারী কবিকল্পনা পাঠককে ইচ্ছামত কখনো বলাকাশ্রেণী-শোভিত নীল আকাশে, কখনো স্বর্গে, কখনো সমুদ্রশয়নসুপ্ত বিষ্ণুর পদপ্রান্তে, কখনো পাতালে, আবার পরক্ষণেই হিমালয়ের তুষারশুভ্র উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে গেছে। আর পাঠক হতচৈতন্যের মত ভূতাবিষ্টের মত সেই কল্পনার অনুবর্তন করেছে।

মেঘদূত কাব্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্য চেতনার সীমাহীন ব্যাপ্তি আর প্রসারণশীলতা। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের হৃদয়ে তার প্রেমময়ী স্ত্রীর প্রতি তার অমর প্রেম ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হয়ে দিনে দিনে বর্ধিত হয়ে লাভ করেছে এক বিস্ময়কর বেগবত্তা। সেই প্রেম প্রকৃতির চেতন অচেতন বস্তুর মধ্যে সব সীমারেখা লুপ্ত করে দিয়ে অচেতন মেঘের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গতিশীল করে তুলেছে তাকে। সেই মেঘ রামগিরি পর্বত হতে সুদূর অলকা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে যখন যেখানে উপস্থিত হয়েছে তখনি সেখানকার অচেতন জড়প্রকৃতি মেঘের প্রাণস্পর্শী ভাবোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পর্বত তাকে দেখে অশ্রুপাত করে, পৃথিবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়।

নববিবাহিত যক্ষের যে দাম্পত্য প্রেম একদিন ছিল খুবই সংকীর্ণ ও একান্তভাবে আত্মসর্বস্ব, যে প্রেম জাগতিক সকল সম্পর্ক ও কর্তব্যকর্ম

হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার সমস্ত প্রাণমনকে শুধু প্রেমাস্পদের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করে এবং তার মধ্যে হীনভাবে আবর্তিত হয়ে অভিশাপ ডেকে আনে, আজ সেই সর্ববিস্মরণীগন্ধা অভিশপ্ত প্রেমকে সকল সংকীর্ণতা হতে মুক্তিদান করে জগতের বিভিন্ন বস্তু ও জীবের মধ্যে প্রসারিত দেখে তাকে। সর্বত্রই এক আশ্চর্য প্রণয়লীলাকে তরঙ্গিত দেখে সে। তটসংলগ্ন বেতসলতাগুলি হাত বাড়িয়ে কেলিকপটিনী নীলবসনা তটিনীকে আঁকড়ে ধরতে চায়, লবঙ্গলতার দ্বারা আলিঙ্গিত হয় এলাচলতা, প্রভাতবায়ুর দ্বারা পরিচুম্বিত হয় প্রিয়ঙ্গুলতিকা, দয়িতা সৌদামিনী কণ্ঠলগ্না হয় দয়িত মেঘের। এইভাবে যক্ষের আত্মগত প্রেম হয়ে ওঠে বিশ্বগত।

যক্ষের সৌন্দর্যবোধেরও এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে এমনি করে। একদিন তার যে সংকীর্ণ সৌন্দর্যবোধ শুধু তার প্রেমাস্পদের অঙ্গলাবণ্যের মধ্যে ছিল শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ, সে সৌন্দর্যবোধ আজ বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুরাজির মধ্যে স্বচ্ছন্দপ্রসারিত। মেঘের যাত্রাপথে কোথায় কোথায় কোন কোন সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে তার সেই সব নয়নাভিরাম দৃশ্যের কথা তাকে আগেই বলে দিয়েছে। হিমালয়ের পর্বতগাত্রে তুষারশীতল শিলাখণ্ডে কস্তুরী মৃগের দল এসে বসে ও শোয় আর তাদের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে সমগ্র পর্বতদেশ। পর্বতোপরি আম্রকুঞ্জ পৃথিবীর আতাম্র স্তনকুম্ভের মত শোভা পায়। কোথাও ময়ূর নীল কণ্ঠ উন্নত করে আছে, কোথাও কোন রাজপথে ত্রাসচঞ্চলা অভিসারিকাদের কবরী হতে ফুলের মালা স্খলিত হয়ে আছে, কোথাও বা তাদের দ্রুতগমননিবন্ধন পীবরস্তনের উপর ন্যস্ত মুক্তার মালা ছিঁড়ে পড়ে যায় মাটিতে, আবার কোথাও কোন সুন্দরী করতালিসহকারে ময়ূর নাচায় আর তার করকিশলয়ধৃত সোনার বলয় রুনুঝুনু করে বাজতে থাকে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সাতটি সর্গে দেববৈরী গর্বোদ্ধত তারকাসুরের বধের উপায়স্বরূপ পার্বতীর গর্ভে শিবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্মসম্বন্ধে দেবতাদের পরিকল্পনা, হর-

পার্বতীর প্রণয় ও মিলন সম্পাদনের জন্য কন্দর্পের নিয়োগ, শিবের নেত্রানলে মদনভস্ম এবং পার্বতীর প্রাণপাতিনী তপস্যায় মহাদেবের প্রসন্নতা ও উভয়ের পরিণয়সম্পাদনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম সর্গে হরপার্বতীর বিহার বর্ণনা, নবমে হরপার্বতীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এই তিন সর্গে কিছু অশ্লীল বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। ভারতবাসীরা হরপার্বতীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। তাই তাঁরা জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করেন এবং আলঙ্কারিকেরাও ঐ একই মত পোষণ কবেন।

একাদশ হতে সপ্তদশ পর্যন্ত সাত সর্গে কার্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈন্যাপত্য গ্রহণ, তারকাসুরের সঙ্গে সংগ্রাম ও তারকাসুরের নিধন সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নেই। কিন্তু অষ্টম, নবম ও দশম সর্গ উমামহেশ্বরের সম্ভোগবর্ণনার অনৌচিত্যদোষে দুষ্ট হয়ে আছে।

কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ববর্তী রচনা। তাই কুমারসম্ভবে কয়েকটি স্থানে স্থূলতা ও ঈষৎ অসংলগ্নতার যেসব ত্রুটি দেখা যায় রঘুবংশে সতর্কতার সঙ্গে সেই সব ত্রুটি সংশোধিত করেছেন কালিদাস।

হিমালয়নন্দিনী উমা প্রথমে সৌন্দর্যের দ্বারা মহেশ্বরের হৃদয় জয় করতে গিয়ে মদনভস্ম স্বচক্ষে দেখে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। পরে সুদীর্ঘকালীন কঠোর তপস্যার দ্বারা মহেশ্বরের প্রসাদলাভ করে তাঁর চিরবাঞ্ছিত দেবতার সঙ্গে মিলিত হন। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রেম মহান, প্রেমাস্পদ যেখানে সর্বগুণান্বিত এক ব্যক্তিত্ব সেখানে তার মিলনের পথটি সহজ নয়। সেখানে কঠোর আত্মনিগ্রহ, আত্মশুদ্ধি ও দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা মিলন সম্ভব। রঘুবংশেও দেখা যায় স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর বরমাল্য লাভ করেও পরে সম্মিলিত বৈরী রাজাদের প্রতিকূলতাকে সম্মুখ সমরে জয় করে তাঁদের মিলনকে সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল অজকে। মদনভস্মের পর রতির দীর্ঘবিলাপ ও আত্মদহনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে তাদের খণ্ডিত প্রেম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন, কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচিত, পরে অষ্টম হতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অন্য কোন কবিত্ব কণ্ডুয়নার্থী কবির দ্বারা বিরচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারি না।

কালিদাস বুঝেছিলেন মানবসমাজকে শিক্ষিত ও সুগঠিত করতে হলে প্রেমের এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তাই তিনি যখনি এ বিষয়ে কোন উচ্চ আদর্শ গঠন করতে গেছেন তখনি হরপার্বতীর অলৌকিক ও অপূর্ব প্রেম ও পবিত্র চরিত্রের কথা মনে পড়েছে তাঁর এবং পরবর্তী কাব্যগুলিতে নরনারীর চরিত্র ঐ মহান আদর্শে গঠন করার প্রয়াস পেয়েছেন। দেবদেবীর মিলনাত্মক জগতের আদি জনক জননীর সম্ভোগ বিরহাত্মক 'কুমারসম্ভব' লিখতে বসেই বোধ হয় দেবমানব রাম দেবমানবী সীতার চরিত্র চিত্রণ করতে সংকল্প করেছিলেন। তাই আদর্শ প্রেমের মূর্ত প্রতীক পার্বতী মহেশ্বরকে প্রণাম করেই সেই আদর্শের অনুসরণে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন। রঘুবংশ, শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীতে এই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যদিও কালিদাসের রচিত সাহিত্যের নাম করতে সর্বাগ্রে রঘুবংশের কথাই মনে পড়ে তথাপি তাঁর কুমারসম্ভবই প্রথম মহাকাব্য এবং রঘুবংশের পূর্বরচিত। তাই কুমারসম্ভবে যে সকল অংশ হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক রঘুবংশে তা আরও পরিণত ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত আবার যে যে অংশ স্থূল ও ত্রুটিযুক্ত তা রঘুবংশে পরিত্যক্ত। মোট কথা, কুমারসম্ভবে কালিদাস যে সব চরিত্রের স্বর্ণপ্রতিমা গঠন করেছেন, রঘুবংশে সেই সব প্রতিমাগুলিকে হীরকমুক্তাখচিত নানা অনবদ্য আভরণে সজ্জিত করেছেন।

আর একটি কথা এই যে, হরপার্বতী কুমারসম্ভবের নায়ক নায়িকা, উভয়েই স্বর্গের দেবতা, আর রঘুবংশের প্রতিপাদ্য নায়কনায়িকা ভারতের সর্বপ্রধান নৃপতির বংশজাত। একের লীলাস্থল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ; অন্যের লীলাস্থল কোন মর্ত্যধাম। স্বর্গলোকের ও স্বর্গের দেবদেবীর বর্ণনায় কবিকল্পনাকে অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিহতভাবে প্রয়োগ করার

সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিত্যানুভূত পার্থিব পদার্থ ও ঘটনার বর্ণনায় কবিকল্পনাকে অনেকটা সংযত ও সামাজিকতার অভ্যাসানুগত হয়ে চলতে হয়। তাই সেই সব বর্ণনাকে চিত্তচমৎকারিণী করে তোলা বড়ই কষ্টসাধ্য। তাই কুমারসম্ভব রচনার পর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও পরিপক্ক কবিত্বশক্তির সাহায্যে রঘুবংশে নিরবচ্ছিন্ন মর্ত্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন কালিদাস।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের বিশালতায়, চিত্রপটের নিপুণতায় এবং তার স্বর্গমর্ত্যব্যাপিনী কল্পনার বিরাট রূপৈশ্বর্য দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়ি আমরা। মর্ত্যের মালিনীতীর হতে স্বর্গাধিপতির রাজসভা পর্যন্ত এই নাটকের চিত্রপট প্রলম্বিত। এই নাটকের নায়ক দুষ্মন্ত ভাগ্যবলে এই জড়জগতের সব জড়তার ধূলি গাত্র হতে ঝেড়ে ফেলে স্বর্গসম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং শেষে এই জড়তাময়ী পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পেরেছেন। স্বর্গ-মর্ত্যবিসারী এক বিরাট চিত্রপটে পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক শকুন্তলার মত চৈতন্যময়ী এক প্রতিমার সাক্ষাৎ পেয়েছি আমরা যার গৌরবমুকুট এই অসীম ধরাতল হতে বাড়তে বাড়তে শেষে সুদূর স্বর্গলোকে অসীমের পাদপীঠে গিয়ে ঠেকেছে। স্বর্গলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের মিলন ঘটিয়েছে।

মালিনীতীরের এক উদ্যানবাটিকার নিকুঞ্জপ্রান্তে যে শকুন্তলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, সেই রসোচ্ছলা শকুন্তলার হাস্যময়ী মূর্তির সঙ্গে আজকের এই ব্রতপীড়িতাঙ্গী, বিরহশীর্ণা, মলিনবেশা, পতিধ্যানরতা যোগিনী শকুন্তলার মূর্তি তুলনা করলে বুঝতে পারি সেই আত্মসর্বস্ব সকাম প্রেমের আধারস্বরূপা নারীমূর্তি অপেক্ষা স্বর্গীয় সুষমাসম্পন্না নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রতীকস্বরূপা এ মূর্তি কত অনুপম, চমৎকারিতায় কত পরিপূর্ণ। মনে হয় এ মূর্তি মর্ত্যবাসিনী হয়েও স্বর্গীয় এক দিব্যচৈতন্যে প্রদীপ্ত। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মিলনদৃশ্যটির রচনায় এক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন কবি। একদিন যে মনোহারিণী দম্পতিমূর্তি স্থূলদেহে সুন্দর ছিল আজ দীর্ঘকালীন বিরহানলে

পরিদগ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়ে সুন্দরতম হয়ে উঠেছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম ছাড়া সারা সংস্কৃতসাহিত্যে মালবিকাগ্নিমিত্রের সমকক্ষ নাটক আর নেই। এ নাটকের সর্বাংশই স্বাভাবিক লৌকিক ঘটনা ও পার্থিব পরিবেশে পরিপূর্ণ। কষ্টকল্পনা বা অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার কোন উদ্দামতা নেই এ নাটকে। এক একটি বনফুল যেমন আপন ধর্মে আপন শক্তিতে ফুটে উঠে সমগ্র বনভূমিকে আলোড়িত করে, তেমনি এ নাটকের চরিত্রগুলি আপন আপন বাস্তব স্বভাবধর্মে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে নাটকের সমগ্র পটভূমিকে রসোজ্জ্বল করে তুলেছে।

শকুন্তলার মত উর্বশী পুরূরবার প্রেমসম্বলিত বিক্রমোর্বশী নাটকটির পটভূমিও স্বর্গমর্ত্যব্যাপিনী। এ নাটকের প্রথম দৃশ্যেই কবি তাঁর যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠা কামিনীকে মর্ত্যের অধিবাসী রাজা পুরূরবা বা বিক্রমের প্রতি অনুরক্ত করে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের শত আকিঞ্চনেও যার হৃদয় স্থির, ধীর, অবিচলিত তার সেই হৃদয়ে আসক্তির তরঙ্গবিক্ষেপ ঘটাতে হবে। স্বর্গাধিপতির সভাবিলাসিনী কামিনী উর্বশীকে সজ্ঞান অবস্থায় রাজার সামনে উপস্থিত করলে তার যথেচ্ছ ভোগতৃপ্ত স্বর্গবাসী হৃদয়কে মর্ত্যমানবের প্রতি আকৃষ্ট করা কঠিন হবে বলেই কবি তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উপস্থিত করেছেন মর্ত্যরাজার সমক্ষে। সর্বসংস্কারবিমুক্ত হৃদয়ে মূর্ছাপন্না উর্বশীকে অসুরের কবল হতে উদ্ধার করে এনেছেন রাজা। মূর্ছাভঙ্গে নবজীবন লাভ করে চিরনবীনা অনন্তযৌবনা উর্বশী এক অদৃষ্টপূর্ব নূতন রাজ্যে নয়নাভিরাম এক মূর্তিকে দেখতে পেল।

প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা পুরূরবার দেবদুর্লভ হৃদয়ে প্রেমই একমাত্র মুখ্য বস্তু। উর্বশীর প্রেমের কাছে তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, মন, প্রাণ সব তৃণের মত তুচ্ছ। এই অলৌকিক অপ্রাকৃত প্রণয়শক্তিতে বশীভূত না হয়ে পারেনি উর্বশী। এক মর্ত্যমানবের প্রেমের ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে স্বর্গসুখ ভুলে গেছে সে। দীর্ঘ বিরহ ও উন্মাদলাঞ্ছনার পর উর্বশী পুরূরবা জলদযানে রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেছে। এ দৃশ্যের কল্পনায় যে ছবি ফুটে উঠেছে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে রামসীতার পুষ্পকরথ-

যোগে লঙ্কা হতে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে সেই ছবি আরও উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই দৃশ্যের বর্ণনায় কালিদাস যে স্বর্গমর্ত্যব্যাপিনী কল্পনাশক্তির লীলাতরঙ্গ প্রদর্শন করেছেন তা ভাবলেও চমৎকৃত হতে হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম, বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র এই তিনটি নাটকের নায়ক দুষ্মন্ত, পুরূরবা ও অগ্নিমিত্র- এই তিনজনই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৃপতি, প্রণয়কলায় সিদ্ধ, কিন্তু তাদের প্রেম ধর্মভাবশূন্য। তাঁরা প্রত্যেকেই গৃহে সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বহিঃসৌন্দর্যের কাছে নতি স্বীকার করে এক একজন রূপলাবণ্যবতী রমণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বহিঃসৌন্দর্যের কাছে এঁদের প্রত্যেকের অন্তঃসৌন্দর্য পরাভব স্বীকার করেছে। কিন্তু কুমারসম্ভবের অজ এবং নলোদয়ের নল পত্নীপ্রেমে একান্তভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালিদাস তাঁর প্রতিটি কাব্যে প্রণয়কলার সম্ভোগ-চিত্র বর্ণনার সঙ্গে বিরহবিধুর নরনারীর মানবপ্রকৃতি ও হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। মানবহৃদয়ে প্রণয়ের উন্মাদনা যে কতদূর চরমসীমায় উপনীত হতে পারে, প্রণয়োন্মত্ত নরনারীর নয়ন যে প্রণয়ানুকূল পদার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না এবং প্রণয়ধারা ঠিক পথে প্রবাহিত হলে প্রণয়ীর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জগতের মঙ্গল সাধিত হয় তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। প্রেম যে শুধু দুটি নরনারীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রতিটি প্রেমের যে একটি বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য আছে এটি তাঁর প্রতিটি কাব্যেই দেখাতে চেয়েছেন কালিদাস। তাই তিনি চাইতেন সুন্দর বহিঃপ্রকৃতির মত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও সুন্দর হয়ে উঠুক। তিনি চাইতেন প্রতিটি সম্ভোগসর্বস্ব প্রেম বিরহাগ্নিতে দগ্ধ ও পরীক্ষিত হয়ে নিকষিত হেমের মত এক শান্তোজ্জ্বল পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক। তিনি চেয়েছিলেন বহিঃসৌন্দর্য মুগ্ধ ও উদ্ভ্রান্ত প্রতিটি প্রেম ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জৈব লালসার সব স্তর অতিক্রম করে পদ্মের মত আপন আত্মিক সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে নিষ্কাম আদর্শের উদার আকাশপানে তুলে ধরুক নিজেকে। এইখানেই কবি হিসাবে অনন্যসাধারণ সার্থকতা কালিদাসের।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মেঘদূত

পূর্বমেঘ

অলকাধিপতি কুবেরের কর্মচারী কোন এক যক্ষ স্ত্রৈণতাবশতঃ রাজকার্যে অবহেলা করায় শাপগ্রস্ত হয়ে সব ক্ষমতা হারিয়ে এক বছরের জন্য রামগিরি পর্বতে হয় নির্বাসিত। ঐ রামগিরি পর্বতে রামসীতা কিছুকাল বাস করায় সেখানকার সব জলাশয়গুলি জনকতনয়া সীতার স্নানের দ্বারা পবিত্র এবং সেখানকার সকল স্থানই ছায়াতরুর সুশীতল ছায়ায় সতত স্নিগ্ধ।

সেখানে আট মাস বাস করে তার প্রিয়তমার বিরহব্যথায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে সেই কামান্ধ যক্ষ। তার পুষ্টল দেহ এতই কৃশ হয়ে ওঠে যে তার হাতের সোনার বালা খুলে পড়লেও সে তা জানতে পারেনি। পরিশেষে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে পর্বতের নিতম্বদেশে উৎখাতকেলিতে মত্ত হস্তীর মত মেঘের খেলা দেখে একরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল যক্ষ।

রাজার অনুচর বিরহী যক্ষ সেই নবজলধরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হৃদয়ের উচ্ছলিত অশ্রুবেগ কোনমতে চেপে রেখে কত কি ভাবতে লাগল। যার চিত্ত প্রিয়বিরহের তাপে দগ্ধ হয় না, যার প্রেমাস্পদ তিল-মাত্রও চোখের আড়াল হয় না, এমন চিরসুখী ব্যক্তিও নবমেঘ দর্শনে কেমন যেন আকুল হয়ে ওঠে, সব পেয়েও কি যেন পায়নি বলে চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মনপ্রাণ,—আর যে হতভাগ্যের কণ্ঠে দূরস্থিত প্রণয়িনীর জন্য হাহাকার ধ্বনিত হয় সতত, তার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা আর বলার কি আছে ?

ক্রমে শ্রাবণ মাস এগিয়ে আসতে বিরহী যক্ষ নিজের অবস্থা বিবেচনা করে বুঝল, এই নববর্ষাগমে বিরহবেদনা তীব্রতর হওয়ায় তার স্ত্রী হয়ত আর বাঁচবে না। সে যে মরেনি এবং আবার তাদের মিলন হবে এই

সংবাদটা কোনরকমে তার স্ত্রীকে পাঠালে হয়ত সে বেঁচে যেত। এই ভেবে মেঘের দ্বারা নিজের কুশল সংবাদ স্ত্রীর কাছে পাঠাতে মনস্থ করে কুরচি ফুলে অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রীতিবচনের দ্বারা তাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

ধূম, জ্যোতি, জল ও বাতাস এই চারটি পদার্থের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন অচেতন মেঘই বা কোথায়, আর সকল প্রাণীর দ্বারা দেশদেশান্তরে পাঠানোর যোগ্য সংবাদই বা কোথায় ? মেঘের দ্বারা সেই দূর অলকায় সংবাদ পাঠানো যে কতদূর সম্ভব, প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত যক্ষ তা একবার ভেবেও দেখল না, অথবা যারা কামার্ত তাদের চেতন অচেতনে ভেদাভেদ করার কোন ক্ষমতা থাকে না।

হে মেঘ, আমি জানি জগদ্বিখ্যাত পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি জনদেব তুমি বংশজাত, তার উপর স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের তুমি প্রধান পুরুষ। তুমি কামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করতে পার। তাই আজ আমি তোমার নিকট ভিক্ষার্থী হয়ে উপস্থিত। ভাগ্যদোষে আজ আমি একাকী সংসার সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছি এখানে। তোমার মত মহান ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা চেয়ে যদি বিফলই হই তবে সে বরং ভাল, কিন্তু যারা অধম, বা নীচ তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে সফল হলেও তা প্রার্থনীয় নয়।

হে মেঘ, যারাই তাপিত তাদের জল দান করে শীতল করো, তাদের সকল তাপ দূর করো। আমি ধনপতি কুবেরের ক্রুদ্ধ অভিশাপে প্রিয়ার বিরহানলে দগ্ধ, তুমি আমার প্রিয়ার কাছে একবার গিয়ে তাকে আমার সংবাদ দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করো। তাছাড়া বড় বড় যক্ষপতিদের আবাসভূমি অলকার নয়নমনোহর শোভা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অলকাপুরীর বাইরে উদ্যানে দেবাদিদেব মহাদেব আছেন অধিষ্ঠিত। সেই চন্দ্রশেখরের ললাটস্থিত চন্দ্রের অমলধবল জ্যোৎস্নার আলোয় নগরের যত সব সৌধমালা ও অট্টালিকারাজি তুষারশুভ্র হয়ে বিরাজ করছে।

পবনারূঢ় হয়ে তুমি যখন আকাশে উড়তে থাকবে তখন প্রোষিতপতি-

কারা অর্থাৎ যাদের স্বামীরা দূরদেশে আছে সেই কামিনীরা তাদের স্বামীরা বাড়ি ফিরে আসবে ভেবে তোমাকে দেখার জন্য রুক্ষ ও আলুলায়িত কেশপাশ নিয়ে ছুটে আসবে। তুমি সেই সব বিরহবিধুরা কামিনীদের যেন উপেক্ষা করো না, কারণ তুমি তাদের স্বামীদের বাড়ি ফিরিয়ে আনবে ভেবে এই আশ্বাসে ও আশায় তোমাকে দেখতে চায়। হে মেঘ, আমার মত পরাধীন কেউ নেই, যে তোমার উদয়েও বিদেশে পড়ে থাকে।

হে মেঘ, যাত্রার পক্ষে আজ বড় সুদিন, কারণ আষাঢ়ের মৃদুমন্দ বাতাস তোমার গমনপথের দিকেই তোমার অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে। চাতকপাখিরা আনন্দে বিভোর হয়ে মধুর কণ্ঠে গান করছে। তার উপর গর্ভাধানক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় নয়নমনোহর বলাকা মিথুনেরা মালার আকারে আকাশে উড়তে উড়তে তোমার আড়ালে মৈথুনক্রিয়ার জন্য মিলিত হতে আসবে।

হে মেঘ, তুমি গিয়ে দেখবে তোমার ভ্রাতৃজায়া আমার সঙ্গে মিলনের জন্য হৃদয়বৃন্তে আশার কুসুমটিকে ধরে রেখে বসে বসে দিবস গণনা করছে। এই আশা ফুরলেই বিশুষ্কবৃন্ত কুসুমের মত তার জীবনও শুকিয়ে যাবে। সে তার স্বামীর একমাত্র পত্নী, তার স্বামীও তার একমাত্র পতি। দুজনেই দুজনের অনন্যপরতন্ত্র অবলম্বন। আমি যে কেবল তারই একথা সে ভালভাবে জানে বলেই আশা ত্যাগ করতে পারছে না।

হে মেঘ, পথে তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না। তোমার যে গর্জনে পৃথিবী ফেটে ভূকুন্দলী ফুল কাঁপতে কাঁপতে মাথা তুলে দেখা দেয়, তোমার সে গর্জন শোনামাত্র রাজহাঁসগুলি মানস সরোবরে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠবে। তারা মুখে একখণ্ড করে সাদা মৃণাল নিয়ে তোমার সহায় হবে, তোমার সঙ্গে তারা কৈলাস পর্যন্ত সাথী হবে। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তোমার কলেবরের নীচে শুভ্র রাজহাঁসের ঝাঁক আর তাদের লাল চঞ্চুপুটে অমলধবল মৃণালখণ্ড—সব মিলিয়ে এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি হবে।

যাত্রাকালে তোমার সর্বোত্তম মিত্র এই পর্বতকে আলিঙ্গন করে যাও, তাহলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। কারণ তার মেখলাসমূহের প্রতিটি উপলখণ্ড ত্রিলোকপূজ্য রামচন্দ্রের পদচিহ্নে অঙ্কিত ও তাঁর পদরেণুস্পর্শে পবিত্র। নিদাঘের দীর্ঘ তাপভোগের পর এই পর্বত যখন তোমাকে পায়, তোমার প্রথম জলবিন্দু যখন তার উপর পড়ে তখন দীর্ঘ বিরহের সন্তাপ অল্পাকারে তার সর্বাঙ্গ হতে বার হতে থাকে। আর তার সারা গায়ে হিমবিন্দুর মত বিন্দু বিন্দু জল দেখা যায়। মনে হয় ওগুলি যেন জল নয়, তোমাকে পেয়ে তার আনন্দবিগলিত হৃদয়ের স্নেহবিন্দু ঝরে পড়ছে জলের আকাবে।

হে মেঘ, তোমার যাবার মত পথেব পরিচয় ঠিকানা সব বলে দিচ্ছি, মন দিয়ে তা শোন। তুমি এখন নববর্ষাব জলভারাক্রান্ত মেঘ। হালকা জলশূন্য মেঘেব মত অতি ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না তুমি। তাই পথে যে সব পাহাড় পর্বত পাবে তাদের কোথাও অতিক্রম করে, কোথাও বা এড়িয়ে যেতে হবে। যখন দেখবে এইভাবে অতিক্রম করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তখন সেই সব পাহাড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবে এবং সেখানে কিছুটা জলবর্ষণ করে নিজেকে হালকা করে তুলবে। আবার যখন দেখবে জলবর্ষণ করে হালকা বা ক্ষীণ হয়ে পড়েছ তখন পথের পার্বত্য নির্ঝরিণীর অতি স্বচ্ছ ও সুপেয় জল কিছুটা পান করে নেবে। তাহলে দেহে বল পাবে।

হে মেঘ, এই সব পার্বত্য অঞ্চলে অনেক সিদ্ধাঙ্গনা অর্থাৎ দেবযোনি-বিশেষ সপরিবারে বাস করে। সেখান থেকে উত্তর দিকে মুখ করে আকাশে উড়তে উড়তে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবে সারি সারি বেতস-কুঞ্জ ছবির মত সাজানো আছে। সেই সব বেতসকুঞ্জের মাথার উপর তোমাকে উড়তে দেখে সেই সব সিদ্ধাঙ্গনারা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকবে হয়ত কোন ঝঞ্ঝা বায়ু কোন পর্বতশৃঙ্গ উড়িয়ে দিচ্ছে। দিকে দিকে যে সব দিঙ্‌নাগ বা হস্তী আছে তারা তোমাকে দেখে তোমার গায়ে শুঁড় বোলাতে আসবে। তুমি তাদের দিকে লক্ষ্য না করে তাদের এড়িয়ে আপন পথে চলে যাবে। পথে ঘাটে বিবাদ বাধাতে নেই কখনো।

তাহলে পথে বিলম্ব হবে।

হে মেঘ, সামনের দিকে চেয়ে দেখবে নানা রকমের রঙের লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের সমন্বয়ে গড়া সুন্দর এক ইন্দ্রধনু পর্বতের উপরে অবস্থিত উইএর মাটির স্তূপ থেকে ধীরে ধীরে উঠছে। তুমি উত্তর দিকে যেতে থাকলে সেই ইন্দ্রধনুর কিছুটা তোমার মাথার দক্ষিণ দিকে লাগবে। তখন তোমার কি অপূর্ব শোভাই না হবে। গোপালবেশী নবঘনশ্যাম যেমন মাথার মোহনচূড়ায় মনোহরকান্তি ময়ূরের পুচ্ছ হেলিয়ে শোভা পান তেমনি তোমার শ্যাম কলেবরও এক অপূর্ব শোভা ধারণ করবে।

সারা বছরের কৃষিকর্ম বা চাষবাসের জল তোমার হাতে। কারণ তুমি সময়মত জলবর্ষণ না করলে পণ্ড হয়ে যাবে কৃষিকর্মের সমস্ত তৎপরতা। তাই তুমি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সরলহৃদয়া জনপদবধূরা অর্থাৎ কৃষকপত্নীরা প্রীতিপূর্ণ উচ্ছল নয়নে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের সে দৃষ্টির মধ্যে কোন ভ্রূবিলাস বা মদির কটাক্ষ নেই। ছলনা বা কপটতাশূন্য প্রীতিস্নিগ্ধ তাদের সে দৃষ্টির মধ্যে আছে সরলতা আর এক অপার্থিব ভালবাসা। সেই সব জনপদবধূরা তাদের দৃষ্টির দ্বারা যেন তোমাকে পান করতে থাকবে। এইভাবে তুমি যেতে যেতে কর্ষিত ভূমিখণ্ডের উপরে উঠবে। তখন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে যখন তোমার একপশলা বৃষ্টি পড়বে তখন সেই তপ্ত ভূমি হতে এক সুন্দর সোঁদা গন্ধ উঠে চারদিক ভরিয়ে তুলবে। তুমি সেই মনমাতানো গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে কিছুদূর পশ্চিমে সরে গিয়ে আবার উত্তরদিকে চলে যেও।

এই মালভূমির উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে তোমার খুব শ্রম হবে ঠিক, কিন্তু উপরে উঠলেই তোমার সামনে দেখতে পাবে আম্রকূট পর্বত। সে তোমার কাছে বড় ঋণী। কারণ তার পূর্ববর্তী বনরাজি যখন দাবানলে পুড়তে থাকে তখন তুমিই জলবর্ষণ করে সে দাবদাহ নিবিয়ে দাও। তাই আজ যখন তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন ঐ আম্রকূট পর্বতই তোমাকে তার মাথার উপর বসিয়ে তোমার সব শ্রম দূর

করবে। যারা অতিবড় নীচ তারাও উপকারী বন্ধুকে কখনো আশ্রয়দানে বিমুখ হয় না। আর আম্রকূট পর্বত তো অনেক উঁচু। সে অবশ্যই তোমার আশ্রয় দান করে কৃতার্থ হবে।

সেই আম্রকূট পর্বতের শিখরদেশটা আমগাছে ভরা। আমের পাণ্ডু-বর্ণে ঐ শিখরদেশটার সমগ্র দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। তাই তার নাম আম্রকূট। ঐ পর্বতের শৃঙ্গটি আকাশ ভেদ করে উপরে উঠে গেছে আর তার চারদিকে ঘিরে আছে অসংখ্য আমগাছ যাতে অসংখ্য পাকা পাকা আম ধরে আছে। তুমি যখন সেই পাণ্ডুবর্ণ আম্রকূট পর্বতের শিখরদেশে বসবে তখন পাণ্ডুবর্ণ আম্রকূটের উপর তোমার চুলের বেণীর মত ঘন কালো রং পড়ায় অপূর্ব শোভা হবে। তখন আকাশ হতে দেবদম্পতিরা চাইলেই দেখবেন, যেন সুন্দরী পৃথিবীর পীন পয়োধর বা স্তন শোভা পাচ্ছে। চারদিকে পাণ্ডুবর্ণ এবং বৃন্তদেশে শ্যামবর্ণ —দেবদম্পতিরা এই অপরূপ সৌন্দর্য আগ্রহভরে দর্শন করবেন মুগ্ধনেত্রে।

ঐ আম্রকূট পাহাড়ে অনেক কুঞ্জবনে সাজানো তরুলতার যে সব মণ্ডপ আছে সেখানে অরণ্যবাসী কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি পাহাড়ী আদিবাসীরা তাদের বধূদের নিয়ে এসে আমোদ আহ্লাদ করে। সেখানে তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর নিদাঘতপ্ত কুঞ্জবনের উপর কিছুটা জল-বর্ষণ করে আবার এগিয়ে যাবে। দেখবে, বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে গ্রীষ্মের বিশীর্ণকায়া স্বল্পতোয়া রেবানদী ধীরে বয়ে চলেছে। পর্বতের পাদদেশে ছোট বড় অসংখ্য পাথরে ভবা আর তার মধ্য দিয়ে পর্বত থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝরনার ধারা এসে সব এক হয়ে রেবায় এসে পড়েছে। ঊর্ধ্বদেশ থেকে ঝরে পড়া শত শত ঝরনার লাল, গৈরিক, সাদা প্রভৃতি রঙের ডোরাগুলি দেখে মনে হবে হিঙ্গুল, চন্দন, অঞ্জন প্রভৃতি গুলে তাদের ধারা দিয়ে হাতিকে সাজানো হয়েছে।

জামগাছের কুঞ্জে কুঞ্জে ঝরনার স্রোতগুলি প্রতিহত হয়ে কলরব করে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। আবার বিন্ধ্যপর্বতের বনমাতঙ্গদের মদবারির সংস্পর্শে সেই জল সুবাসিত। তুমি সেখানে জলবর্ষণের পর সেই

স্রোতোধারার সুবাসিত জল কিছুটা পান করে নিও। বান্তবৃষ্টি অর্থাৎ জল বমন করার পর সেই সুবাসিত জলপান করলে তোমার পথশ্রম দূর হবে। তুমি শরীরে বল পাবে। জলবর্ষণ করার পর যদি জলপান না করো তাহলে তুমি লঘু হয়ে যাবে আর তখন বাতাস যে দিকে ইচ্ছা তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তুমি নও, যার ভেতরটা শূন্য, সে বড়ই লঘু হয়। সে তখন ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং তার অশেষ দুর্দশা ঘটে। কিন্তু যার ভিতরটা ভারী, যে রিক্ত নয় তার সর্বত্রই গুরুত্ব ও গৌরব।

হে মেঘ, যে পথ দিয়ে তুমি যাবে, সে পথ রাজাধিরাজদের দ্বারা ব্যবহৃত রাজপথের মতই সাজানো। তোমার নবজলবর্ষণে কদমগাছ-গুলিতে কত কদম ফুল ফুটবে আর সেই সদ্যপ্রস্ফুটিত কদমের উদ্গত কেশরগুলিতে সবুজ ও পাংশু বর্ণের মিশ্রণে এক অপূর্ব শোভা জন্মাবে। আবার বৃষ্টির জল পড়লে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ভুঁইচাপা ফুল ফুটে উঠবে। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ বনস্থলীতে তোমার জলবর্ষণের ফলে সেই বনস্থলী হতে কেমন এক মিষ্টি সোঁদা গন্ধ উঠে চারদিক ভরে তুলবে। নিদাঘতপ্ত ক্লান্ত হরিণ হরিণীগুলি বৃষ্টিপাতে শীতল হয়ে একবার উপরে ঐ কদমবনের শোভা দেখবে, আবার মুখ নিচু করে ঐ ভুঁইচাপার কুঁড়িগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে আর তারা মাটির সেই সোঁদা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পাগলপারা হয়ে তোমার বর্ষণস্নিগ্ধ পথে ছুটতে ছুটতে জগতকে দেখাবে তুমি ঐ পথে গেছ।

আমার প্রিয়ার জন্য তুমি তাড়াতাড়ি গেলেও পথে প্রতিটি পাহাড়ে পর্বতে বিলক্ষণ দেরী হবে তোমার। যে সব পর্বতগুলি তোমার প্রিয় নববর্ষার অসংখ্য সাদা সাদা কুরচি ফুলে সাদা হয়ে আছে এবং তাদের সুগন্ধে আমোদিত হয়ে আছে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল, সেখানে কিছুটা দেরী না করে যেতে পারবে না। আবার যখন আকাশে নবজলসম্ভূত শ্যামকান্তি দেখে ময়ূরগণ পেখম তুলে নাচবে এবং সাদা সাদা জলভরা চোখে নীল কন্ঠ উঁচু করে মধুর কেকারবে সংবর্ধনা জানাবে তোমাকে, তখন তাদের সেই আন্তরিক ডাক উপেক্ষা করে যেতে পারবে না তুমি।

অতি বড় পাষাণহৃদয় যারা, তারাও এমন আদরের ডাক এড়িয়ে যেতে পারে না। তোমার মত সরলহৃদয়ের তো কথাই নেই।

হে মেঘ, তুমি দশার্ণদেশে গেলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম হতে যে মৃণালদল মুখে নিয়ে যে রাজহাঁসগুলি মানস-সরোবর যাচ্ছিল তারাই সেখানে দিনকতক থেকে যাবে। সারা দশার্ণদেশটা জামগাছের সার দিয়ে চারদিকে ঘেরা, আবার সে দেশের বাইরে কেতকীগাছের বেড়া। তার মাঝে আছে কত মনোহর উদ্যান। তোমার আগমনে কেতকীগাছ-গুলিতে ফুলের কুঁড়ি ফুটবে আর সাদা সাদা কাঁটাগুলি কিছুটা করে বেরিয়ে থাকবে। সাদা সাদা ফলের পাশে শ্রেণীবদ্ধ জামগাছ ও অসংখ্য জামফল এক অপূর্ব শোভা ধারণ করবে। তার উপর আবার দেখবে গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় গাছে বর্ষারম্ভে গ্রাম্য কাক ও পক্ষীরা বাসা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সমস্ত গ্রাম ভরে উঠেছে তাদের কলরবে।

হে মেঘ, সেই দশার্ণদেশের জগদ্বিখ্যাত রাজধানী বিদিশায় গিয়ে পড়লে তোমার বিলাসী হৃদয়ের সমস্ত বিলাসবাসনা পূর্ণ হবে। কারণ এমন বিলাসবহুল নগরী পৃথিবীতে আর একটিও নেই। সেই বিদিশার পাদদেশ বিধৌত করে বেত্রবতী নামে যে গিরিনদী উপলে প্রহৃত হয়ে গৈরিক দেহে ও তীরবেগে ছুটে চলেছে ও তীরশায়ী প্রস্তরে বাধা পেয়ে কলকল শব্দ করছে, তুমি সেখানে গিয়ে তার তরঙ্গিত ও সুপেয় জল কিছুটা পান করবে। তোমার মনে হবেদয়িতের নির্দয় দশর্ণাঘাতের পীড়া সহ্য করতে না পেরে ঐ নদীরূপিণী নাগরিকা ভ্রূ কাঁপিয়ে নিষেধ করছে, তাই তার অব্যক্তমধুর কণ্ঠস্বর কলরবের মত বেরিয়ে আসছে। তোমাকে পেয়ে বিলাসিনী নদীর সর্বাঙ্গ অনুরাগে লাল হয়ে উঠেছে, তাই তার দেহে রক্তাভ গিরিমাটির রং।

ঐ নগরের উপকণ্ঠে নীচৈঃ নামে যে পাহাড় আছে তুমি সেই পাহাড়ে বসে কিছুটা বিশ্রাম করে নিও। সেখানে অসংখ্য কদম্বফুল ফুটে আছে, দেখে মনে হবে অনেক দিন পর তোমার সুহৃদ তোমাকে পাওয়ায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। সেই পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা

ছেনি দিয়ে কাটা পাথরের ঘর আছে। এক সময়ে কত সাধু সন্ন্যাসী হয়ত সেখানে বাস করতেন। এখন সেগুলি খালি পড়ে থাকায় নগরের যত সব সৌখীন নাগর ঐ সব জনহীন পার্বত্য গুহায় বিলাসিনী নাগরিকাদের সঙ্গে নিয়ে বিহার করতে যায়। সেই সব পার্বত্য গুহা ও পাথরের ঘরে মনের সুখে আমোদ আহ্লাদ করে ফিরে আসে তারা, তাদের সুবাসিত অঙ্গের ও বিমর্দিত কুসুমমাল্যের গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে সেই গুহাগৃহগুলি। এক একবার দমকা বাতাসে সে সুগন্ধ বাইরে এসে জগৎকে যেন জানিয়ে দেয় ঐ বিদিশা নগরীর নাগরপুরুষদের যৌবনের বেগ কত উৎকট, কিছুতেই তাকে বেঁধে রাখা যায় না।

তুমি সেই পাহাড়ে বসে যতটা পার ক্লান্তি দূর করে নেবে। পরে আবার ছুটতে থাকবে। নীচে বেত্রবতী নদী ছুটে চলেছে আর তার উপর আকাশে তুমি ছুটছ। নদীর দুই তীরে শুধু ফুলের উদ্যান আর উদ্যান। সেই সব উদ্যানে কোটি কোটি যুঁই ফুল ফুটে আছে। দুই পাড় যেন সাদা সুচিক্কণ গরদের কাপড়ে মণ্ডিত আর তার মধ্য দিয়ে বননদী বেত্রবতী তীরবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে। আবার যে সব সমবয়সী মেয়েরা সেই যুঁইফুলের বাগানে সাজি হাতে ফুল তুলতে এসেছে তারা পুরুষবর্জিত উদ্যানে প্রাণ খুলে গল্প করছে। রৌদ্রতাপে তাদের গণ্ডদেশে ঘাম ঝরছে। বারবার হাত দিয়ে সেই ঘাম ঝেড়ে ফেলছে। তুমি ঐ যুঁইফুলের বাগানের যুঁইগাছগুলিতে একপশলা বৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, সহসা তোমার স্নিগ্ধ ধারাপাতে রৌদ্রতাপ দূর হওয়ায় সেই সব কুসুমচয়নরত মেয়েরা মুখ উঁচু করে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুকালের জন্য কত পরিচিত বন্ধুর মত প্রাণভরে তোমাকে দেখছে।

হে মেঘ, তুমি বিদিশায় এইভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর উত্তর দিকে যাবে। কিন্তু খাড়া উত্তরদিকে যেতে পারবে না বলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছুটা বেঁকে উজ্জয়িনী নগরী দেখতে দেখতে যাবে। উজ্জয়িনীর আকাশচুম্বী সৌধশিখরগুলি দেখে মনে হবে নগরী যেন উৎসঙ্গ এলিয়ে প্রণয়ীর আশার প্রতীক্ষা করছে। সেই

সব উৎসঙ্গ তলে একটু বসে তারপর যাবে। উজ্জয়িনীবাসিনী আয়তাক্ষী রমণীদের যেমন চোখ, তেমনি চঞ্চল অপাঙ্গ। বিদ্যুৎ বিলাসের মত সতত নর্তনশীল দীপ্তিময় সেইসব চোখ যদি একবার না দেখ তাহলে তোমার জীবনই বৃথা। তাহলে বঞ্চিত করবে নিজেকে।

বিদিশার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত উজ্জয়িনীতে যাবার জন্য বাঁকাপথে ঘুরে অগ্রসর হতেই তোমার পশ্চিমদিকে সামনেই দেখবে নির্বিন্ধ্যানদী। বিন্ধ্য হতে উৎপন্ন হয়ে ঐ পার্বত্যনদী পাহাড়ী পথে ছুটে চলেছে। পাথরের বড় বড় নুড়িতে নদীর খাত কোথাও পরিপূর্ণ, কোথাও নদীখাত পরিষ্কার। কোথাও পাথরে বাধা পেয়ে নদী কলকল স্রোতে ছুটে চলেছে, কোথাও বা নদীস্রোত বাধাহীন এবং শান্ত। যেখানে কোন বাধা নেই, সেখানে বড় বড় আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই আবর্তের মাঝে নদীর গভীর নাভিকূপ দেখা যাচ্ছে। নদী কোথাও চঞ্চলা, প্রস্তরপ্রতিবন্ধে স্খলিতগতি, কোথাও শান্ত কলেবরা, গম্ভীরাকৃতি। মনে হবে যেন তটিণী সুন্দরী তোমাকে আকাশপথে ছুটতে দেখে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটে চলেছে। কলস্বরা নদীস্রোতে সারিবদ্ধ পাতিহাঁসগুলি উজানদিকে সাঁতার কেটে আসার চেষ্টা করছে। জলের শব্দের সঙ্গে হাঁসের ডাক মিশে যে মধুর শব্দ হচ্ছে তা দেখে মনে হবে যেন নির্বিন্ধ্যার চন্দ্রহারের ঝুমঝুম ধ্বনি। তুমি সেখানে একটু থেকে সেই শব্দমাধুর্যের রসাস্বাদ করে যাবে। সেই শব্দকে প্রিয়ার মধুর প্রণয়বচন বলে মনে হবে। দীর্ঘতাপে শীর্ণকায়া নির্বিন্ধ্যাতে না হয় একটু জল বর্ষণ করে যেও।

হে মেঘ, তোমার মত সৌভাগ্যশালী কয়জনই বা আছে। নিদাঘতপ্ত শীর্ণ ও বিশুষ্ককায়া কত নদী তোমার আশাপথ চেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় পড়ে আছে। সামনেই চেয়ে দেখবে, বিন্ধ্যপর্বত হতে বার হয়ে সোজা উত্তর দিকে বয়ে চলেছে। তোমার বিরহে সে নদী এমনই শুকিয়ে গেছে যে দেখলে মনে হবে একগাছি লম্বা বেণী পড়ে আছে। বেণীর মতই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে বিশীর্ণকায়া সিন্ধু-নদী। নদীর দুই তীরের গাছগুলি হতে জীর্ণ পাতা পড়ে পাণ্ডুবর্ণ

করে ফেলেছে নদীর জলধারাকে। যেন বিরহে দেহের রক্ত শুকিয়ে যাওয়ায় একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠেছে নদী। যাতে সিন্ধুর এই শোচনীয় অবস্থা দূর হয় তার ব্যবস্থা করো। একি তোমার কম সৌভাগ্যের কথা! কয়জনের জন্য কে এমন তীব্র অথচ মধুর বিরহ-জ্বালায় দিন কাটায় বলতে পার?

এরপর তুমি অবন্তী দেশে গিয়ে পড়বে। অবন্তীদেশের রাজধানীর নামই উজ্জয়িনী বা বিশালা। সে দেশে বৃহৎকথা বহুল প্রচারিত। বৎসরাজ উদয়ন প্রদ্যোতের প্রিয় কন্যাকে হরণ করেন। গ্রামের বৃদ্ধগণ এই ধরনের গল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকে দিনরাত। এখানে ওখানে দশ পাঁচজন করে গ্রাম্য গোষ্টীবন্ধনে মিলিত হয়ে একথা আলোচনা করে তারা। উজ্জয়িনী বা বিশালা নগরী আয়তনে যেমন বিশাল তেমনি সম্পদ এবং ঐশ্বর্যেও বিশাল। তাকে দেখে মনে হয় ধরাতলে এমন নগরী সত্যিই অসম্ভব। যে সব মহাত্মারা বহু পুণ্যফলে স্বর্গে গেছেন তাঁরা তাঁদের সবটুকু পুণ্য ক্ষয় হবার আগেই স্বর্গ হতে ফিরে আসার সময় স্বর্গের কিছুটা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আর সেই স্বর্গীয় সুষমাই বিশালা বা উজ্জয়িনী নগরীতে শোভা পাচ্ছে। তা না হলে অত কান্তি, অত শোভা ও চিবনবীন আকৃতি সম্ভব হত না কখনো পৃথিবীতে।

সে বিশালায় সব কিছুই চমৎকার। সেখানে ভোরবেলায় শিপ্রানদীর তরঙ্গশীকরবাহী মৃদুমন্দ শীতল বাতাস নিশাশ্রম বা সুরতকেলিক্লান্ত অলসগাত্রী রমণীদের গায়ে লাগে এবং তাদের সকল শ্রম সকল ক্লান্তি দূর করে দেয়। শীতল বাতাসের স্পর্শে শিহরিত হয়ে ওঠে তাদের শিথিল অঙ্গ। শিপ্রানদীতে যে সব অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে আছে প্রভাতের বাতাস সেই পদ্মবনে গিয়ে লুটোপুটি খেয়ে কমলগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। শীতল ও কমলগন্ধ সুরভিত সেই বাতাসে শিপ্রাবক্ষ বিহারিণী সারসপঙক্তির মদকলমধুর ধ্বনি ভেসে এসে অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত কামিনীগণের কানে প্রবেশ করে। তখন তাদের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এক অপূর্ব জড়তায়। বিভোর হয়ে

পড়ে তারা এক স্বপ্নময় ভাবে। যেন বশংবদ প্রিয়তম ক্লান্তকায় প্রেয়সীর মঙ্গলস গাত্রে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে খোসামোদ বাক্যে তোষণ করছে।

হে বন্ধু, সিন্ধুনদীর দুর্দশা ঘোচাতে গিয়ে জলবর্ষণ করে কিছুটা হালকা হয়ে যে দুর্বলতা বোধ করতে বিশাখার বিশালাক্ষী ললিতা-বনিতাদের দেখে সে দুর্বলতা তোমার দূর হয়ে যাবে। যেখানে সুকেশী কামিনীরা ঘরের ভিতর ধূপ জ্বালিয়ে সেই ধূপের ধোঁয়া তাদের চুলে লাগিয়ে চুল সুবাসিত করে। সেই ধূপের গন্ধ চুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে গবাক্ষ পথে বাইরে বেরিয়ে আসে। তুমি সেখানে যাওয়ামাত্র সেই সুবাসিত ধূমপুঞ্জ তোমার গায়ে এসে লাগতেই তোমার দেহ ফুলে উঠবে। পুষ্ট হয়ে উঠবে তোমার নবকলেবর। যেখানে সেখানে বাড়িতে বাড়িতে যে সব পোষা ময়ূর আছে তারা তোমার মত পুরনো বন্ধুকে দেখে পেখম তুলে নাচতে নাচতে অভ্যর্থনা জানাবে তোমায়। সেখানে উঁচু উঁচু অনেক হর্ম্য বা অট্টালিকা আছে। তার মধ্যে ফুলসাজে সজ্জিত হয়ে সুন্দরীরা পায়চারি করে বেড়ায়। তাদের পুষ্পালঙ্কারের গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে প্রাসাদকুট্টিমগুলি। সেই সব সুন্দরীদের আলতাপরা পায়ের দাগে খচিত হয়ে থাকে হর্ম্যতল। সেই সব প্রাসাদশীর্ষে কিছুক্ষণ বসে সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তোমার পথশ্রম কিছুটা দূর করবে। তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

হে মেঘ, উজ্জয়িনীতে গিয়ে গন্ধবতী নদীর ধারে ত্রিজগদ্‌গুরু চণ্ডীশ্বর মহাকালের মন্দিরে একবার যাবে। নীলকণ্ঠের কণ্ঠের মত তোমার গায়ের রং দেখে মহাদেবের অনুচরবৃন্দ অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে। শুধু পুণ্য সঞ্চয় হবে না। সেখানে গেলে তোমার প্রাণও জুড়িয়ে যাবে। সেই মহাকালের মন্দিরের পাশে এক মনোহর উদ্যান আছে। গন্ধবতী নদীর শীতল বাতাস এসে সেই উদ্যানের ফুলগাছগুলিকে কাঁপিয়ে তোলে নিয়ত। অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে থাকা গন্ধবতীর জলে নানারকমের সুগন্ধি তেল মেখে স্নান করতে এসে জলকেলি করে কামিনীরা। তাদের গায়ের গন্ধে সুবাসিত হয় নদীর

জল, বাতাস আবার সেই পদ্মগন্ধ ও সুন্দরী পদ্মিনীদের গায়ের গন্ধ নিজের গায়ে মেখে এসে উপবনের পুষ্পিত তরুলতাদের কাঁপাতে থাকে। সুতরাং সেই সব মনোরম জায়গায় একবার যেও।

বন্ধু, আরতির সময় ছাড়া অন্য সময়ে যদি সেই মহাকাল মন্দিরে যাও তাহলে সূর্যদেব অস্ত গমন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কারণ সন্ধ্যাকালে মহাকাল-মন্দিরে যখন আরতি হবে সেই সময়ে তুমি একবার যদি মন্দ্রধ্বনি করো বা গুড়ু গুড়ু গর্জনে ফেটে পড় তাহলে তোমার সেই গর্জন ঢাকের কাজ সম্পন্ন করবে। সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হবে তোমার গর্জন। তুমি তাহলে হাতে হাতে দেবসেবার ফললাভ করতে পারবে। যে মহাকালের হাতে সর্বদা ভয়ঙ্কর এক শূল থাকে, যিনি রুষ্ট হলে আর রক্ষা থাকে না, সেই মহাকালকে প্রসন্ন করে যেও।

হে মেঘ, সেই মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যাকালে আরতির সময় বারবণিতারা সাজগোজ করে এসে নেচে নেচে চামর ব্যজন করে মহাকালকে। আরতির বাজনার তালে তালে তাদের পা পড়ে আর তখন তাদের নিতম্বের চন্দ্রহার নড়তে থাকে ও এক মধুর রুনু রুনু ধ্বনি হয়। নানা মনিরত্নখচিত চামরের দণ্ডে তাদের হাতের জড়োয়ার গয়নার জৌলুষ লেগে অপরূপ এক শোভার সৃষ্টি হয়। প্রিয়তমদের নির্দয় নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত সেই সব কেলিবিলাসিনীদের ভুজলতাগুলি চামর দোলাতে দোলাতে ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। তাদের ক্ষতস্থানগুলিতে টান ধরে। তুমি তাদের সেই ক্ষতস্থানগুলিতে দু'চার বিন্দু জল বর্ষণ করলে তাদের জ্বালা কিছুটা কমে যাবে। তারা তখন কুটিল কটাক্ষপাতে বারবার তাকিয়ে দেখবে তোমাকে। অঞ্জনশোভিত কালো চোখের কোণে কোণে কালো তারা নিয়ে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তারা বারবার তোমাকে দেখার সময় প্রতিবারই মনে হবে যেন তাদের নয়নকমল হতে অসংখ্য কালো ভ্রমর শ্রেণীবন্ধ হয়ে উড়ে আসছে তোমার দিকে।

এই মন্দিরে আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে। পুরাকালে নারদের শাপে মহেশ নামে ত্রিলোক বিখ্যাত রাজা গজের মুখ প্রাপ্ত হয়ে

গজাসুর নামে খ্যাত হন। পরে রুদ্রদেব তাঁকে নিধন করে তাঁর রক্ত-বিন্দুবর্ষী চর্মখানি গ্রহণ করেন। এই চর্মখানিকে মহাদেব বড়ই ভালবাসেন। তাণ্ডব নৃত্যকালে বিরাটবপু রজতগিরিনিভ মহাদেব তাঁর বাহু তুলে গজাসুরের চর্মখানি চাইলেই তাঁর সহচরগণ সেই চর্মখানি এনে তাঁর হাতের উপর ফেলে দেয়। তখন সেই চর্ম নিয়ে নেচে নেচে সমস্ত জগৎ কাঁপিয়ে তোলেন মহাদেব। সে যেন নাচ নয়, প্রলয়। নাচতে নাচতে শেষে শ্রান্ত হয়ে স্বেচ্ছায় নাচ থামিয়ে দেন। গিরিরাজ হিমালয়কন্যা উমা তাঁর বহু তপস্যার ধন মহাদেবকে নৃত্যক্লান্ত দেখে মনে বড় ব্যথা পান। সন্ধ্যাকালে আরতির পর চন্দ্রশেখর যখন নাচ শুরু করবেন তখনি তুমি অচিরবিকশিত জবাকুসুমের মত তোমার রক্তবর্ণ সন্ধ্যারাগ নিয়ে যদি মহাদেবের হাতের উপর পড়তে পার এবং দু'এক ফোঁটা জলও বর্ষণ করতে পার তাহলে তিনি শোনিতবিন্দুবর্ষী নাগচর্ম মনে করে তাঁর নৃত্য থামিয়ে দেবেন। তাহলে হিমালয়নন্দিনীর হৃদয় শান্ত হবে। তিনি তোমার শিবভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি তুষ্ট হয়ে প্রসন্নয়নে তোমার দিকে তাকাবেন। তিনি আশীর্বাদ করবেন তোমায়।

বন্ধু, উজ্জয়িনীতে তোমায় আর একটি কাজ করতে হবে। রাত্রিতে সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে আবৃত রাজপথে যখন অভিসারিকা রমণীরা নীলাম্বরী শাড়ীতে দেহ ঢেকে প্রিয়তমদের কাছে সংকেতস্থানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অভিসারে যায়, তখন তুমি তোমার সৌদামিনীকে চকিত কনকালোকে পথটা তাদের দেখাতে বলো। সে সময় তুমি যেন বৃষ্টি বর্ষণ করো না বা তর্জন গর্জন করো না। তাদের প্রাণ তখন এমনিতেই শঙ্কায় আকুল হয়ে থাকে, ভয়ে ভয়ে অন্ধকারে পথ চলতে থাকে। তাই তুমি যেন নতুন কোন বাধা সৃষ্টি করো না।

তোমার স্ত্রী সৌদামিনী বা বিদ্যুৎসুন্দরী বারবার আলো দিয়ে অভিসারিকাদের পথ দেখাতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে তুমি তাকে নিয়ে কোন এক সু-উচ্চ প্রাসাদশীর্ষে নির্জনে রাতটা কাটাতে পার। সেই নৈশ নির্জন প্রাসাদশীর্ষে কোন জনমানব থাকে না, শুধু ঝাঁকে

ঝাঁকে পায়রার দল সেখানে ঘুমিয়ে থাকে। রাত্রিশেষে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তুমি যাত্রা শুরু করবে। এক জায়গায় বেশী দেরী করো না। কোন সাধু ব্যক্তি বন্ধুর কার্যভার গ্রহণ করে কখনো অকারণে বিলম্ব করে না।

সেই সময় অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্পট পুরুষগুলো সারারাত অন্য কোন নায়িকার কাছে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেগিয়েযখন তাদের খণ্ডিতা উপেক্ষিতা স্ত্রীদের কাছে গিয়ে নানাভাবে তাদের ভুলিয়ে তাদের দুঃখের নয়নজল মুছিয়ে দেয় তখন তুমি যেন আবার আকাশে হঠাৎ সূর্যের পথ আটকে থেকো না। তাহলে সেই সব লম্পট পুরুষগুলো রাত্রি প্রভাত হয়নি ভেবে দেরী করবে বাড়ি ফিরতে। তাছাড়া তা করলে সূর্যদেবও রেগে যাবেন তোমার উপর। কারণ সূর্যও অন্যত্র রাত্রিবাস করায় নলিনী বিচ্ছেদব্যথায় কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছে তাঁর জন্য, শিশিরবাষ্পবিন্দুতে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। সূর্যদেবকে তাই তাঁর করসঞ্চালনে নলিনীর চোখের জল মুছিয়ে শান্ত করতে হবে তাকে। এমন সময় তুমি যদি তাঁর পথে বাধা দাও তাহলে তিনি রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিতে পারেন। অনেক নীচের স্তরের লোকের অভিশাপের পরিণাম কত খারাপ হয়, সাক্ষাৎ সূর্যদেবের অভিশাপের ত কথাই নেই।

এরপর কিছুটা গেলেই নির্মলসলিলা গম্ভীরা নদী দেখতে পাবে। সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের মত স্বচ্ছপ্রসন্ন তার হৃদয়। প্রসন্নসলিলা গম্ভীরা নদীর স্বচ্ছ হৃদয়ের মত সেই জলে তোমার ছায়া পড়বে। তুমি ছায়াময় দেহে সেই স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রবেশ করবে। নদীর বুকের উপর যখন তোমার কালো ছায়া পড়বে তখন চঞ্চল পুঁটিমাছগলি লাফাতে থাকবে। কালো মেঘের ছায়ায় সাদা সাদা পুঁটিমাছগুলিকে আরও সাদা দেখাবে। তখন মনে হবে, গম্ভীরা নদী যেন অনেক দিন পর তোমাকে পেয়ে সমস্ত গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে তোমার দিকে কুমুদফুলের মত সাদা কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করছে। হে মেঘ, তুমি তখন ধৈর্য ধরে থাকবে। তুমি আবার নিজে গম্ভীর হয়ে তার মদির কটাক্ষগুলিকে ব্যর্থ করে দিও না।

গ্রীষ্মের তাপে অন্যান্য নদীর মত গম্ভীরা নদীর জলও নীচে নেমে

গেছে। পাহাড়ের উপর হতে সুনীল বেতসলতাগুলি নদীর স্রোতের উপর ঝুলে পড়েছে এবং স্রোতের টানে নড়ছে। দেখে মনে হবে গম্ভীরারূপিণী কোন নায়িকা তার নিতম্বদেশ হতে স্খলিত সলিলরূপ সুনীল বসনখানি দুহাতে টেনে ধরে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তুমি লম্বিত কলেবরে যত তাড়াতাড়িই যেতে চাও না কেন, ঐ রকম অনাবৃতজঘনা কোন রমণীকে ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিই অমন বিবৃতজঘনা কামিনীকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না।

গম্ভীরা থেকে তোমাকে দেবগিরিতে যেতে হবে। ও পথে একটু গেলেই তোমার সকল ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। গম্ভীরাকে ছেড়ে আসার জন্য মনের মধ্যে যে অবসাদ জমবে তা সব কেটে যাবে। তোমার প্রথম বর্ষণে সিক্ত নিদাঘতপ্ত মাটি থেকে এক সোঁদা গন্ধ উঠে চারদিক ভরে ফেলবে। পাহাড় হতে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে সেই গন্ধ ভাসতে থাকবে। বড় বড় দাঁতওয়ালা হাতিগুলি সেই ঠাণ্ডা বাতাসের গন্ধ পেয়ে শুঁড় উঁচু করে সে বাতাস টানতে থাকবে। শুঁড়ের ছিদ্রপথে যে বাতাস প্রবেশ করে তাদের ভিতরটাও শীতল করে দেবে। চারদিকে যজ্ঞডুমুরের বনের সমস্ত ডুমুর সেই নববর্ষার শীতল বাতাসে পেকে উঠবে আর সেই বন হতে মন্দমধুর এক সুবাস ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। শীতল বাতাস সেই গন্ধ গায়ে মেখে এসে ধীরে ধীরে সেবা করবে তোমার।

সেই দেবগিরি পর্বতে দেবসেনাপতি কার্তিক চিরকাল অধিষ্ঠিত আছেন। অসুর নিপীড়িত দেবরাজ ইন্দ্রের সৈন্যসামন্তকে রক্ষা করার মানসে পার্বতীপতি দেবাদিদেব মহাদেব যে অতুলনীয় তেজ হুতাশনে নিক্ষেপ করেছিলেন, শেষে সেই তেজ থেকেই কার্তিকের জন্ম হয়। পরে এই কার্তিকই দেবরাজের সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। সেই দেবগিরিতে গিয়ে ফুলের মেঘ হয়ে গিয়ে জলের পরিবর্তে ফুল বর্ষণ করবে। তারপর সেই সব ফুল আকাশনদীর জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেই সব ফুল অজস্র ধারায় বর্ষণ করে পার্বতীপুত্র দেবসেনাপতি কার্তিককে স্নান করিয়ে দেবে। তাহলে তোমার অনেক পুণ্য হবে।

সেই দেবগিরিতে কার্তিকদেবের সেবা করার পর তোমার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে কয়েকটি মন্দ্রধ্বনি অর্থাৎ গুরু গুরু গর্জন করবে। সেই গর্জন পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতেই কার্তিকের বাহন ময়ূরটি পেখম তুলে নাচতে শুরু করে দেবে। বাহনের নৃত্য দেখে তার প্রভু স্কন্দদেবও আনন্দিত হবেন। পুত্রের প্রিয় বাহন বলে ভবানী উমাও ঐ ময়ূরকে বড় স্নেহের চোখে দেখেন এবং আদর করেন। তার চন্দ্র আঁকা একটা পালক খসে পড়লেই পদ্মফুলের অবতংস ফেলে সেই পালক কানে গুঁজে নেন তিনি। আবার কার্তিকের পিতা মহাদেবও পুত্রের বাহন ময়ূরটিকে স্নেহবশতঃ চোখের আড়াল করেন না কখনো। ময়ূরটি যেখানেই যায় তিনি সর্বদা চেয়ে থাকেন তার দিকে। তাই তাঁর ললাটচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্না গিয়ে তার মুখের উপর পড়ায় তার চোখদুটি একেবারে সাদা হয়ে যায় ও জ্বলজ্বল করে। হরপার্বতীর এত আদরের ময়ূরটিকে উপেক্ষা না করে তাকে একটু নাচিয়ে যেও।

হে মেঘ, শরবনজাত এই কার্তিকদেবকে অর্চনা করার পর তুমি যতই এগিয়ে যাবে, ততই এক আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়বে তোমার। দেখবে, আকাশপথে সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনারা জোড়ায় জোড়ায় বীণা বাজিয়ে গান করে বেড়াচ্ছে। তুমি ছুটে চলেছ দেখে তারা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে সরে যাবে পাছে তোমার গায়ের জল লেগে তাদের বীণার তার ভিজে যায়। তার পরেই দেখবে চর্মণ্বতী বা চম্বল নদী তরতর বেগে বয়ে চলেছে। ও যেন নদী নয়, রাজা রন্তিদেবের কীর্তিপ্রবাহ নদীর রূপ ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। রাজা রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করে কামধেনু সুরভির তনয়া গাভীদের নিধন করেছিলেন। সেই নিহত গাভীদের চর্ম হতে যে রক্ত ঝরেছিল সেই রক্তই চর্মণ্বতী বা চম্বল নদীর স্রোতোরূপে বয়ে চলেছে। তুমি তার সম্মান রাখতে তার পবিত্র জল স্পর্শ করার জন্য কিছুটা নীচে নেমো।

অনেক দূরে ঊর্ধ্বদেশ হতে চর্মণ্বতী নদীকে দেখলে মনে হবে একছড়া সাদা মুক্তোর মালা পড়ে আছে। পাথরে পাথরে বাধা পেয়ে কলকল শব্দে নদী ছুটে চলেছে আর তুলোর রাশির মত ফেনপুঞ্জ

পাথরের পাশে পাশে জমে পথে জলপ্রবাহকে ছেয়ে ফেলেছে। হে মেঘ, তোমার নবঘনশ্যাম কান্তি নিয়ে নদীর জলের উপর যখন ঝুঁকে পড়বে তখন আকাশচারী সিদ্ধগণ আকাশ থেকে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। তখন তাদের মনে হবে ধরণীদেবীর গলায় একছড়া মুক্তোর হার ঝুলছে আর তার মাঝখানে একটি নীলকান্তমণি শোভা পাচ্ছে। আকাশচারীগণ আর কোন কিছু না দেখে কেবল তোমাকেই দেখবে।

হে মেঘ, সেই চর্মন্বতী নদী পার হয়ে সোজা উত্তর দিকে গেলেই দশপুর নগর পাবে। সেই নগরের বধূগণ কত আকাঙ্খা ও আগ্রহভরে তোমার নয়নমনোহর রূপ অনিমেষ নয়নে দেখবে। তাদের চোখ যেমন সুন্দর তেমনি তাদের ভাবভঙ্গি আরও সুন্দর। তারা যখন ঊর্ধ্বনেত্রে তোমাকে দেখবে তখন তাদের চোখের পাতাগুলি নাচবে আর তার মধ্য হতে চোখের সাদা সাদা রং যেন বেরিয়ে আসছে এবং তাদের পিছন পিছন কালো তারাগুলির কালো রং যেন ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসছে। তা দেখে তোমার মনে হবে যেন কতকগুলি সাদা কুন্দফুল উপর দিকে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে আর তার পিছু পিছু কালো ভ্রমরের ঝাঁক ছুটে চলেছে। হে মেঘ, তোমার সুন্দর মূর্তিখানি সেই নগরবধূদের সামনে তুলে ধরে একবার দেখতে দিও। তবে যেন বেশী দেরী করো না।

এরপর যাবার পথে পড়বে ব্রহ্মাবর্ত দেশ। সরস্বতী আর দশদ্বতী নামক দেবনদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্মিত যে দেশ তারই নাম ব্রহ্মাবর্ত। এই ব্রহ্মাবর্তই হলো আর্যগণের আদি বাসভূমি। তুমি সে দেশের মাথার উপর দিয়ে যখন সোজা চলে যাবে তখন তোমার স্নিগ্ধ ছায়াপাতে কিছুকালের জন্য শীতল হয়ে যাবে সেই নিদাঘতপ্ত আর্যভূমি। তাতে তোমার পুণ্য হবে। এরপরই পাবে—কুরুপাণ্ডবের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এখনো সেখানে সেই ক্ষত্রিয় কুলান্তক যুদ্ধের কত চিহ্ন কত নর-কঙ্কাল চোখে পড়বে তোমার। তুমি যেমন ফুটন্ত পদ্মগুলির উপর অজস্র ধারাবর্ষণ করে ছিন্নভিন্ন করে দাও সেগুলিকে, তেমনি গাণ্ডীব-ধারী ধনঞ্জয় ঐ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজাদের উপর শতসহস্র শরবর্ষণ

করেছিলেন।

কুরুপাণ্ডবের সেই যুদ্ধে বন্ধু ও আত্মীয়প্রীতির জন্য উদারহৃদয় হলধারী বলদেব কোন পক্ষে যোগদান না করে যে নদীতীরে মনে বৈরাগ্য নিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং যেখানে তাঁর স্ত্রী রেবতী বলদেবের অতি-প্রিয় সুরা এনে দিলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যে নদীতীরে গিয়ে সমাধি অবলম্বন করেছিলেন, তোমার সামনে পড়বে সেই সরস্বতী নদী। সেই পুণ্যতোয়া নদীর কিছুটা জল যদি তুমি পান করো তাহলে তোমার ভিতরটা একেবারে শুচিশুভ্র হয়ে যাবে, শুধু তোমার বাইরের কালো রংটা থাকবে।

কুরুক্ষেত্র হতে তোমাকে যেতে হবে কনখলে। সেখানে 'প্রজাপতি মন্দির', 'দক্ষস্থান', 'সতীকুণ্ড' প্রভৃতি তীর্থগুলি দেখতে পাবে। দক্ষরাজার যজ্ঞস্থলের নাম দক্ষস্থান। আর দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দা শুনে যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন তারই নাম সতীকুন্ড। এই কনখলের দু'মাইল পশ্চিমে হরিদ্বারে এসে গঙ্গা পাহাড় হতে নেমেছেন। হিমালয়ের গাত্র বেয়ে ধাপে ধাপে গঙ্গা হরিদ্বারে নেমে এসেছেন। গঙ্গার প্রপাতগুলি উঁচু হতে বেগে পড়ছে আর পুঞ্জীভূত ফেনরাশি প্রতিটি প্রপাতের মুখের আশেপাশে জমেছে। দূর আকাশ হতে নীচের দিকে তাকালে তোমার মনে হবে, সগরপুত্রগণ এই ভাগীরথীর পবিত্র জলময় সোপান বেয়ে স্বর্গে উঠেছিলেন। সেই সোপানগুলি হিমালয়ের গায়ে পড়ে থেকে আজও ভগীরথের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

হে মেঘ, তুমি জানো, ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে গঙ্গা ধূর্জটির জটিল জটাজাল হতে ক্রমে এসে হরিদ্বারে পড়েছেন। তাঁর ফেন আর হাসির রং সাদা। পর্বতগাত্রে পাথরের খাঁজে খাঁজে গঙ্গার প্রপাতগুলির মুখে মুখে অনন্ত ফেনপুঞ্জ দেখে তোমার মনে হবে গঙ্গা যেন তাঁর তরঙ্গরূপ হাত উপরের দিকে বাড়িয়ে তাঁর স্বামী শিবের জটা ধরে টানছেন। তাঁর সপত্নী গৌরীদেবী রাগে তাঁর দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাইছেন আর গঙ্গা খিল খিল করে হাসছেন। হরিদ্বারে নেমে গঙ্গা হাত বাড়িয়ে

মহাদেবের জটা ধরে টানছেন, তাঁর তরঙ্গরূপ হাত দিয়ে চন্দ্রশেখরের কপালের চাঁদকে ধরে নাড়া দিচ্ছেন আর চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নাধারা গিয়ে গঙ্গার তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে। একবার দূর আকাশ হতে এই সুন্দর ছবিখানি দেখে নিও। তোমার জীবন সার্থক হবে।

হে মেঘ, আকাশে দিকে দিকে যে সব গজ আছে তাদের দিগ্‌গজ বলে। দেবতারা ঐ সব গজে করে আকাশ ভ্রমণ করে বেড়ান। সেই গজগুলি মাঝে মাঝে শুঁড় বাড়িয়ে ঊর্ধ্ববিহারিণী হিমালয়গাত্রবাহিনী ত্রিপথগ গঙ্গার জল টেনে পান করে। তোমার গায়ের কালো রং আর দেহের গঠন দেখে তোমাকেও সুরগজদের একজন বলে মনে হয়। কারণ তুমিও তাদের মত পৃথিবীপৃষ্ঠের নদনদী হতে জল শোষণ করে নাও। তুমি যখন আকাশে তোমার দেহের কিছুটা ঝুলিয়ে গঙ্গার পবিত্র স্ফটিকস্বচ্ছ সাদা জল পান করতে যাবে তখন তোমার কালো ছায়া পড়বে গঙ্গার জলের উপর। তা দেখে মনে হবে এখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হয়েছে। মনে হবে গঙ্গার অমলধবল প্রবাহে যমুনার নীল জল এসে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছে।

হে মেঘ, এরপর যেতে যেতে পতিতপাবনী গঙ্গার উৎপত্তিস্থল নগাধিরাজ হিমালয়ে গিয়ে উঠবে। ঐ হিমালয় পর্বতের এখানে সেখানে তুষারশীতল শিলাখণ্ডের উপর কস্তুরী মৃগের দল এসে বসে, শোয়, গড়াগড়ি দেয় আর তাদের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে সারা পর্বতটা। চিরতুষারাবৃত সতত সৌরভময় সেই পর্বত-শৃঙ্গের উপর তুমি যখন বসবে তখন তা দেখে মনে হবে বৃষভধ্বজ মহাদেবের সেই বিরাট সাদা ষাঁড়টা কোন এক জায়গায় নরম মাটির ঢিপিতে শিং বসিয়ে খেলা করার সময় সেই মাটির কিছুটা নরম কালো ভিজে মাটির একটা অংশ তার শিং-এর উপর লেগে আছে।

ঐ হিমালয়ে সরলদ্রুম অনেক দেবদারু গাছের বন আছে। সেই সব গাছগুলি যেন আকাশ ভেদ করে উপরে উঠে গেছে। বরফে ঢাকা পর্বতের উপর বাতাস বইছে আর পাহাড়ের গা ঘেঁষা দেবদারু গাছগুলির ডালে ডালে ঘর্ষণ হওয়ায় আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ

করে। সমস্ত বন পুড়তে থাকে। সেই দাবানলের স্ফুলিঙ্গগুলি আবার হাওয়ায় উড়ে গিয়ে চমরী মৃগদের লেজের চামরে পড়ছে আর চামরগুলিও পুড়ে যাচ্ছে। হে মেঘ, তুমি তখন কালবিলম্ব না করে সহস্রধারায় জোর একপশলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেই সব দাবাগ্নি নিবে যাবে এক মুহূর্তে। চমরীগুলিও বেঁচে যাবে আর অগ্নিদগ্ধ পর্বত-পৃষ্ঠও শীতল হবে। যারা সত্যিই বড়, তাদের ধনদৌলত যা কিছু সমস্তই বিপন্নদের উদ্ধার করার জন্য সতত প্রস্তুত থাকে।

হে মেঘ, ঐ হিমাচলে একরকমের মৃগ আছে যাদের আটটি করে পা আছে। তারা দিনরাত লাফালাফি করে বেড়ায়। তুমি তাদের পথ ছেড়ে দিলেও তারা যদি রাগের বশে তোমাকে ডিঙোতে গিয়ে পাথরে আছাড় খেয়ে হাত পা ভাঙে ত ভাঙুক। তবে তাদের মত নির্বোধদের একটু শিক্ষা দেবার জন্য খুব জোর শিলাবৃষ্টি করে তাদের বিব্রত করে তুলো। তারা ত দূরের কথা, বৃথা কাজে লাফাতে গেলে সবাই জব্দ হয় এইভাবে।

সেই হিমাচলে অনেক বড় বড় পাথরের উপর অর্ধেন্দুশেখর শিবের পদচিহ্ন আছে। দেখবে, কত সিদ্ধ দেবযোনিরা সেই সব পদচিহ্নকে নানা উপচার ও উপহারে সাজিয়ে সব সময় পুজো করছে। তুমি সেখানে একবার নেমে ভক্তিভরে ঐসব দেবপদচিহ্ন প্রদক্ষিণ করো। তাহলে তাতে অনন্ত ফল পাবে। যাঁরা শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে ঐ সব পদচিহ্ন দর্শন করেন তাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর তারা চিরকালের মত মহাদেবের সহচর প্রমথগণের পদলাভ করেন।

হে মেঘ, মহাদেবের সেই পাদপদ্মের কাছে আনন্দ-উল্লাস লেগেই আছে। পাহাড়ের বড় বড় মোটা মোটা বাঁশগুলির গায়ে যে সব অসংখ্য ছিদ্র আছে তার মধ্যে বাতাস ঢুকে হাজার হাজার বাঁশির মত বেজে উঠছে। আর সুকণ্ঠী কিন্নরীরা ও স্বর্গের নায়িকারা ত্রিপুরারি শিবের ত্রিপুরবিজয়ের কাহিনী কণ্ঠ কাঁপিয়ে গেয়ে যাচ্ছে। এই সময় হে মেঘ, তুমি যদি গুড়ু গুড়ু গর্জনে একবার মন্দ্রধ্বনি করো আর সেই গর্জন হিমালয়ের গুহায় গুহায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় তাহলে তা শত সহস্র

মৃদঙ্গধ্বনির মত শোনাবে এবং তা শিবের প্রার্থনাসঙ্গীতের কাজ করবে। কিন্নরীদের গান, কীচকের বাঁশির তান আর তোমার মৃদঙ্গধ্বনি মিলে মিশে সার্থক করে তুলবে শিবের প্রার্থনাসঙ্গীতকে।

হিমালয়ের সানুদেশে বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন করার পর তুমি সোজা চলে গিয়ে সামনে গরলামান্ধাতা নামে উঁচু পাহাড় পাবে। সে পাহাড় অতিক্রম করতে পারবে না, তাই সুড়ঙ্গপথে ওপারে গিয়ে উঠবে। বীর পরশুরাম অতীতে একদিন একটি বাণের আঘাতে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঐ সুড়ঙ্গপথ তৈরী করেন। কিন্তু সেই সরু সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করার জন্য তোমার দেহটাকে লম্বা করে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের বশে বশে বাঁকিয়ে পরে একটা স্তম্ভের মত উপরের দিকে উঠতে হবে। ভগবান বিষ্ণু যেমন বামনরূপে বলিকে ছলনা করার সময় তাঁর একখানা লম্বা পা উপরের দিকে ক্রমশ বড় করে স্বর্গরোধ করেছিলেন, তোমাকেও তেমনি দেখাবে। ঐ সুড়ঙ্গ সাধারণ এক সুড়ঙ্গপথ নয়, ভৃগুপুত্র পরশুরাম স্বর্গে ওঠার সময় ঐ পর্বতে বাধা পেয়ে বাণ নিক্ষেপের দ্বারা তা ভেদ করে সুড়ঙ্গপথ তৈরী করে, সে পথে স্বর্গরাজ্যে গমন করেন। তাই ওপথ ভার্গবের কীর্তির পথ।

হে মেঘ, ঐ গিরিপথ দিয়ে গিয়ে তুমি উপরে উঠতে থাকলে তোমার সামনে সাদা বরফের স্তূপে আশীর্যমণ্ডিত যে এক পর্বত পড়বে তার নামই হলো কৈলাস। আকাশচুম্বী কৈলাস পর্বতের সেই সব তুষার-শৃঙ্গগুলিতে সুরসুন্দরীরা এসে স্বচ্ছ নির্মল তুষারের উপর নিজেদের মুখ দেখে। তাদের আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না। কৈলাসের রাজা কুবেরের ভাই দুরন্ত রাবণ একবার ঐ পথে যাবার সময় তার বিশখানা হাত দিয়ে ঐ পর্বতকে সজোরে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এই পর্বতের গ্রন্থিগুলিতে ফাটল ধরে। সেই সব জায়গায় দেবদেবীরা কত লীলা ও আমোদ প্রমোদ করেন। কুমুদের মত শুভ্র তুষারশৃঙ্গমণ্ডিত কৈলাস আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে দেখে মনে হবে কৈলাসনাথ নটবর শিব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন তাই যেন জমে ঐ সাদা সাদা শৃঙ্গের আকার ধারণ করেছে। তা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাজলের গুটির মধ্যে যে কৃষ্ণতম বর্ণ থাকে, তোমার গায়ের রং ঠিক তেমনি কালো। কিন্তু তুষারাচ্ছন্ন কৈলাসের রংটা হলো হাতির কাটা দাঁতের ভিতরের অতি সাদা রংটার মত সাদা। তুমি তোমার সেই মসীকৃষ্ণ কলেবর নিয়ে শুভ্রবরণ কৈলাসের সানুদেশে তার নিতম্বের কিছু উপরে অধিত্যকাপ্রদেশে গিয়ে যখন বসবে, তখন মনে হবে বিশাল-বপু বলরামের সমুন্নত ও বিশাল কাঁধের উপর একখানি উত্তরীয় বস্ত্র স্থাপিত হয়েছে। মর্ত্যাচারী ও আকাশচারী সকলেই এক দৃষ্টিতে তোমাদের সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শন করবে, তোমাদের পানে তাকিয়ে থাকবে।

হে মেঘ, ঐ কৈলাসপর্বতই হরগৌরীর ক্রীড়াশৈল। তাঁদের বিহারের রঙ্গভূমি হলো এই কৈলাস। তুমি হয়ত সেখানে গিয়ে দেখবে শম্ভু পাছে গৌরী ভয় পান তাই হাত হতে সাপের বালা ফেলে দিয়ে গৌরীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পায়চারি করছেন অথবা ক্রীড়াশৈলের উপর মণিমাণিক্যময় যে তট আছে সেখানে পার্বতীকে উঠিয়ে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি তা দেখ তাহলে বিলম্ব না করে তোমার জলভরা নরম দেহখানি সোপানের মত করে ভক্তিভরে হরগৌরীর পায়ের সামনে স্থাপন করবে যাতে ধাপে ধাপে পা দিয়ে অনায়াসে তাঁরা উঠতে পারেন। তাহলে তোমার জীবন হবে সার্থক ও পবিত্র।

সেখানে যে সব সুরযুবতীরা ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ায় তারা তোমাকে মাথার উপর দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তোমার নরম দেহটাকে হাত উঁচু করে ধরার চেষ্টা করবে। তখন তাদের হীরের খোঁচা লেগে তোমার দেহে ছিদ্র হয়ে যাবে এবং সেই ছিদ্র দিয়ে শত শত ধারায় জল ঝরে পড়বে। মনে হবে ধারাযন্ত্রময় কোন গৃহ হতে জল ঝরে পড়ছে। যদি দেখ, দীর্ঘ তাপভোগের পর সুরযুবতীরা তোমায় দেখে ছাড়তে চাইছে না। তাদের হাত হতে ছাড়া পেতে দেরী হচ্ছে, তাহলে কয়েকটা গর্জন করে তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেবে। সেই গম্ভীর গর্জন একবার তারা শুনলেই দূরে সরে যাবে।

এই কৈলাসেই আছে সেই ত্রিভুবনখ্যাত মানসসরোবর যার স্বচ্ছশীতল

জলে অজস্র স্বর্ণকমল ফুটে আছে, যে সরোবরে দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত সেই সব স্বর্ণকমলের পরাগ-সুরভিত জলপান করতে আসে। প্রথমে তুমি সেই দেব-সরোবরের নির্মল জল কিছুটা পান করে তোমার ভিতরটা পূর্ণ করে নেবে। তারপর যদি সেই ঐরাবতকে দেখতে পাও তাহলে তোমার জলভরা দেহের একটা অংশ পাতলা ও চওড়া করে সেই গজ-রাজের মুখে লাগিয়ে দিও। ঠান্ডা জলে ভেজানো একখণ্ড কাপড় মুখে দিলে যেমন ভাল লাগে ঐ ঐরাবতেরও তেমনি ভাল লাগবে। তারপর কল্পতরুর রেশমের মোলায়েম কচি পল্লবগুলিকে বাতাসের মত কিছুটা কাঁপিয়ে দিও। এমনি করে নানাভাবে ক্রীড়া করে সেই গিরিরাজ কৈলাসকে উপভোগ করো।

ঐ তুষারধবল কৈলাসের কোণেই অবস্থিত আমাদের অলকাপুরী। হে মেঘ, তুমি কামচারী, ইচ্ছামত যখন যেখানে খুশি যেতে পার। তোমার অজানা কিছুই নেই। তুমি জান অলকার মত সুন্দরী নগরী আর একটিও নেই। পর্বতবক্ষে শোভমানা ঐ নগরীর পার্শ্বদেশ দিয়ে ধাপে ধাপে গঙ্গা নেমে বয়ে চলেছে আর পর্বতের উন্নত গাত্রে এখানে সেখানে নির্মিত হয়েছে কত অট্টালিকা। উপর হতে সেই নগরীকে দেখে তোমার মনে হবে যেন কোন নায়িকা তার শিথিল অঙ্গ এলিয়ে তার প্রণয়ীর কোলে পড়ে আছে। তার সুচিকণ বসনখানি বাতাসে কাঁপছে। কিন্তু উড়ে যাচ্ছে না একেবারে। কারণ সেই বিশ্রস্ত বসনের একটা অংশ সেই অলসাঙ্গী বিলাসিনীর দেহের ভারে চাপা পড়ে আছে। আর সেই সব অট্টালিকার ছাদে যে মেঘ জমে আছে তার থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তোমার তা দেখে মনে হবে সেই আলুলায়িতাকুন্তলা কামিনীর অলকদামের চূর্ণকুন্তলগুলি মুক্তাজাল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

উত্তরমেঘ

হে মেঘ, অলকাপুরীতে গিয়ে দেখবে সেখানকার বড় বড় অভ্রভেদী প্রাসাদগুলি তোমারই সমান উঁচু। তোমার মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ আছে, তেমনি সেই সব প্রাসাদের মধ্যেও সুন্দরী ললনারা বিদ্যুতের মত কক্ষগুলি আলোকিত করে চঞ্চল পদক্ষেপে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার মধ্যে যেমন রং বেরঙের ইন্দ্রধনু আছে তেমনি সেই অট্টালিকা-গুলিতেও নানারঙের বিচিত্র কত আলেখ্য ঝোলানো আছে। তোমার মধ্যে যেমন জল আছে, তেমনি সেই সব প্রাসাদকুট্টিমগুলি নানা স্বচ্ছ মণিজালে বিরচিত বলে মনে হয় জলে থৈ থৈ করছে তার মধ্যে। তোমারই মত উঁচু অলকার আকাশচুম্বী প্রাসাদগুলি যেন তোমাকেই স্পর্শ করছে। তুমি তাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছ আর তারা যেন তোমার তলভাগ লেহন করছে।

হে মেঘ, সেই অলকাপুরীতে ছয় ঋতু সমানভাবে বিরাজ করে বলে একই সময়ে সেখানে ছয় ঋতুর ফুল ফোটে। একই সময়ে শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্বকুসুম দেখে নয়ন সার্থক হবে তোমার। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। সেখানে দেখবে অলকাবাসিনী বধূরা সব সময় এই সব ফুল-সাজে সজ্জিত থাকে। তাদের হাতে সর্বদা শোভা পায় পদ্মফুল, চুলের গুচ্ছে ঝোলে কুন্দকুসুম, লোধ্রকুসুমে শুভ্র পরাগে প্রসাধিত তাদের মুখ সাদা হয়ে যায়। তাদের কবরীর দুপাশে থাকে সদ্য ফোটা কুরুবক ফুল, আবার দুকানে শোভা পায় দুটি সুগন্ধি শিরীষ ফুল।

অলকানগরীর পুষ্পোদ্যানগুলিতে কখনো ফুলের অভাব হয় না। সেখানকার ফুলগাছগুলিতে সব সময় ফুল ফুটে থাকে আর মধুমুগ্ধ ভ্রমরেরা গুনগুন শব্দে গুঞ্জরণ করতে করতে সেই সব ফুলগাছগুলিতে পাগলের মত উড়ে বেড়ায়।

মেঘ, আমার জন্মভূমি সেই অলকাপুরীতে চির আনন্দ বিরাজ করে। সেখানে মাঝে মাঝে শুধু আনন্দের আবেগে অশ্রু দেখা যায় চোখে।

দুঃখতাপের লেশমাত্র না থাকায় কাউকে চোখের জল ফেলতে দেখা যায় না। ফুলধনু মদনের ফুলশরের আঘাতেই প্রাণীদের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট। তাছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় না। সেখানে সবাই অমর, সবাই সুখী। সেখানে প্রণয়কলহ ছাড়া অন্য কোন কলহবিবাদ বা বিচ্ছেদ নেই। সেখানকার অধিবাসী যক্ষরা অনন্ত যৌবনের অধিকারী। তাদের যৌবন ছাড়া অন্য কোন বয়স নেই। সবাই অনন্ত যৌবন উপভোগ করে।

সেখানে গিয়ে দেখবে বড় বড় প্রাসাদের অমল ধবল চন্দ্রকান্তমণি-নির্মিত কুট্টিমগুলিতে নানারঙের ফুল ছড়ানো আছে। মনে হবে যেন রাশি রাশি আকাশের তারা লুটিয়ে পড়ে আছে। আর সেই নয়নমনোহর প্রাসাদকুট্টিমে বিলাসী যক্ষরা অনন্ত রূপযৌবনশালিনী কামিনীদের নিয়ে মধুপান করছে। সে মধু শুধু ফুলের মধু নয়। সে মধু পাওয়া যায় কল্পতরু হতে। তার থেকে উত্তম মদ আর নেই। সে মদ্যপানের ফলে অনন্ত আনন্দ লাভ করা যায়। যে একবার সে মদ পান করে তার আর ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মায় না। দেখবে তোমার স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনরূপ মৃদঙ্গধ্বনিতে সেই মধুপানের আনন্দের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

হে মেঘ, সেই অলকার প্রান্তবাহিনী মন্দাকিনীর বালুকাময় তটভূমির দিকে তাকালে দেখবে দেবপ্রার্থিতা যক্ষকন্যারা মন্দাকিনীর তটবর্তী স্বর্ণরেণুর মত বালুকাবেলায় মণি নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা করছে। কিন্তু অত ছোটাছুটি করেও সেই সব কন্যাদের কোন ক্লান্তি-বোধ হ'চ্ছে না। কারণ মন্দাকিনীর সলিলশীকরসিক্ত বাতাস তাদের সেবা করছে। আর তটস্থিত মন্দারবৃক্ষরাজির ছায়ায় তাদের রৌদ্রতাপ নিবারিত হচ্ছে।

অলকার সুন্দরীরা কোমরে গেরো দিয়ে কাপড় পরে। তাদের পাকা তেলাকুচোর মত লাল টলটলে অধর দেখে তাদের প্রিয়তমগণ অধীর হৃদয়ে তাদের পরিধানের যৌথ বসনের গেরো খুলে বস্ত্রহরণের জন্য টানাটানি করে। তাদের সামনে উজ্জ্বল শিখায় রত্নদীপ জ্বলে। সুন্দরী কামিনীরা

লজ্জায় প্রদীপটি নিবিয়ে ফেলার জন্য একমুঠো যে কোন চূর্ণ বস্তু প্রদীপের উপর ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু তা তৈল প্রদীপ নয়, স্থিতজ্যোতি রত্নপ্রদীপ বলে সেই চূর্ণমুষ্টিতে প্রদীপ নেবে না। তাই কামিনীরা লজ্জায় মরমে মরে যায়।

অলকার উঁচু উঁচু অট্টালিকাগুলিতে উপরতলার ঘরে ঘরে অনেক সুন্দর ছবি টাঙ্গানো আছে। ছোট ছোট মেঘগুলি বাতাসে ভাসতে ভাসতে একদিকের জানালা দিয়ে ঢুকে আর একদিকে বেরিয়ে যায়। ঘরের ভিতর জলভরা মেঘগুলি ঢুকে ছবিগুলোতে লাগায় জলবিন্দুর দাগ পড়ে তাদের গায়ে। তখন পরের ছবি মাটি করে দিয়ে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে শঙ্কিত হৃদয়ে যে যেদিকে পায় পালিয়ে যায় মেঘগুলি। সেই মেঘগুলিও তোমার মত। হে মেঘ, তুমি যেন ঐ রকম অপকর্ম করে বসো না। তা করলে তোমাকেও ছোটাছুটি করে পালাতে হবে। তাহলে আর আমার কাজ করা চলবে না।

শোন মেঘ, অলকার সুখসম্পদ ও আনন্দের সীমা নেই। সেখানকার ঘরগুলির মধ্যে রতিমন্দিরের মধ্যে শয়নের পালঙ্কের উপরে সুন্দর সুন্দর চন্দ্রাতপ খাটানো আছে এবং তাতে চন্দ্রকান্তমণির ঝালর দেওয়া আছে। প্রত্যেক ঝালরে একটি করে চন্দ্রকান্তমণি ঝুলছে। এখন একবার ভেবে দেখ সেই ঝালর এবং তাতে সেই চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়ার কি অপূর্ব শোভা। রাত্রিতে তুমি যখন চাঁদের উপর থেকে সরে যাও তখন সেই মেঘমুক্ত চাঁদের বিমল জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে এসে ঐ সব ঝালরের মণিগুলিতে লাগে আর তখন মণিগুলি ঘামতে থাকায় তা থেকে ঠাণ্ডা জলবিন্দু ঝরে পড়ে। দেখবে, সেই চন্দ্রাতপের তলে পালঙ্কের উপর রতিক্লান্ত কামিনীরা প্রিয়তমদের সুদৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অলস অঙ্গে অবশভাবে ঘুমিয়ে আছে অথবা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় চোখ বন্ধ করে আছে। ক্রমে প্রিয়তমদের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে আসায় এবং উপরের ঝালরের মণিগুলি হতে জল ঝরে পড়তে থাকায় সুন্দরীদের দেহের গ্লানি ও রতিশ্রমের ঘোর অনেকটা কেটে যায়।

অলকাবাসীদের ঘরে ঘরে এত রত্ন আছে যে তা ক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা

নেই। তাই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকতে হয় না তাদের। তাই তারা কর্মহীন অফুরন্ত অবসর সময় কাটাবার জন্য নগরীর নামকরা অপ্সরাদের সঙ্গে নিয়ে কুবের ভবনের বাইরের উদ্যানে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেই মনোহর উদ্যানের আর এক নাম বৈভ্রাজ চৈত্ররথ। সুকণ্ঠ কিন্নর-গণও ঐ উদ্যানে অলকাপতির কীর্তিনামা গেয়ে বেড়ায়। সেই সব কিন্নরদের সঙ্গে অলকানগরীর কামী বিলাসীরাও অপ্সরাদের জল নিয়ে গিয়ে মেলামেশা করে এবং গল্প করতে করতে বেড়িয়ে বেড়ায়। অলকানগরীতে রাত্রির অন্ধকারে কামিনীরা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে অভিসারে যায়। তখন তাদের দ্রুত গতির জন্য কেশগুচ্ছ হতে মাথার ফুল খসে পড়ে। সুরভি ও চন্দনদ্বারা গায়ে আঁকা লতা পাতার ছাপও শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কোথাও বা কানের দুল, কানে পরা পদ্ম ধুলোয় লোটায়। দ্রুত চরণক্ষেপের ঝাঁকুনিতে কোথাও বা পীবরস্তনের উপর শোভিত মুক্তার জাল পড়ে যায়। অপর কোথাও বা তাদের স্তনযুগলের দোলনে ও চাপে সে হার ছিঁড়ে পথে গড়াগড়ি যায়। অভিসারিকারা যত গোপনেই অভিসারে যাক না কেন, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বুঝতে পারে এই পথেই গত রজনীতে প্রিয় অভিসারে যাত্রা করেছিল সুন্দরী কামিনীরা।

অলকাপতি কুবেরের ভক্তির টানে মহাদেব অলকার বাইরের উপবনে চিরকাল সশরীরে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তিনি অলকা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না। তাই কামদেব মদন সর্বদা মহাদেবের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান। একবার ফুলশরের আঘাতে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য ভস্মীভূত হতে হয় তাঁকে। দেহটি হারিয়ে অতনু হয়ে শুধু প্রাণটি নিয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু মদনের কাজ অন্য কেউ করে। তাঁর ফুলশরের আঘাত কাজ না করলেও অলকার কামবিলাসিনী অভিসারিকারা সঙ্কেত স্থানে ছুটে যায়। প্রণয়ীরা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অলকার রসবতী কামিনীরা যখন মদির মন্থর গতিতে পথ চলতে চলতে বিলাসীকামীদের দিকে ভ্রূকম্পন করে চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে এবং নানরূপ আকার ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা পুরুষদের

মনকে মাতোয়ারা করে তোলে তখন মদনের ফুলশরের শতগুণ বেশী কাজ হয়। সুন্দরীদের মদির কটাক্ষ কামবাণের থেকে শতগুণ বেশী কার্যকরী। কামের বাণ ব্যর্থ হলেও তাদের কটাক্ষবাণ কখনো ব্যর্থ হয় না।

হে মেঘ, সেই অলকায় যে কল্পতরু আছে সেই কল্পতরু সকলের সব বাসনা পূর্ণ করে থাকে। সেখানকার রসবিলাসিনী কামিনীরা কল্পতরুবনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সাজসজ্জা বা বিলাসের উপকরণ চাইলেই সব পেয়ে যায়। কলহংসচিত্রিত নয়ন, মনোহর বসন, সুপেয় মদ, কনক কাঞ্চীদাম বা কাঁচুলি, সুন্দর সুন্দর তাজা ফুল ও কচি কচি পল্লব, নানা রকমের অলঙ্কার, আলতা প্রভৃতি কামিনীদের বেশভূষার সমস্ত উপকরণই কল্পতরু যোগায়।

সেই অলকায় কুবেরের রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে আমার বাড়ি। খুঁজে পেতে কোন কষ্ট হবে না। দূর হতেই ইন্দ্রধনুর মত বাঁকা আমার বাড়ির তোরণ দেখতে পাবে। তুমি উপর হতে দেখতে পাবে ঐ বাড়ির দিকে আঙ্গিনার একধারে একটি মন্দারগাছ আছে। আমার প্রিয়তমা কত যত্নে নিজের হাতে গাছটিকে বাড়িয়ে তুলেছে। কচি কচি পল্লবের ডালে গাছটি যেন ভেঙ্গে পড়েছে। এত নিচু হয়েছে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তার পল্লব ছোঁয়া যায়।

তুমি আরও দেখতে পাবে, আমার ঐ বাড়ির ভিতর একটি বড় দীঘি আছে যার ঘাট মরকত শিলা দিয়ে বাঁধানো। তার টলটলে জলে কত সোনার পদ্ম ফুটে আছে। সেই স্বর্ণ পদ্মগুলির মৃণাল আবার বৈদূর্য মণির দ্বারা তৈরী। মস্ত বড় দীঘি, সবুজ পাথরে তার ঘাট বাঁধানো। তার নীল জলে নীল মণিময় মৃণালের উপর শত শত স্বর্ণকমল ফুটে আছে। সে দীঘির শোভা এমনই অপরূপ যে, আমার বাড়ি হতে মানস সরোবর বেশী দূরে না হলেও হাঁসগুলি বর্ষাকাল এলেও ঐ দীঘি ছেড়ে মানস সরোবরে যায় না। বর্ষাকালে মানস সরোবরে যাওয়া তাদের ধর্ম হলেও আমার দীঘির গুণে ও শোভায় মুগ্ধ হয়ে সে ধর্ম ত্যাগ করেছে।

সেই দীঘির পাড়ে একটি ছোট ক্রীড়াশৈল আছে। এক সময় সেই

পর্বতে আমরা স্বামীস্ত্রীতে কত খেলা খেলেছি। অতিমসৃণ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা নির্মিত তার শিখরদেশ। সোনার কদলী তরুতে বেষ্টিত তার চারদিক। সেই পর্বতটি আমার প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীর বড় আদরের। তোমার ঘন নীল ধারে ধারে সোনার লতার মত যখন বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে ওঠে তখন আমার মনে মনে সেই ক্রীড়াপর্বতের ছবি জেগে ওঠে। আমি কাতর হৃদয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে তার কথা ভাবি।

ঐ ক্রীড়াপর্বতের নিকটেই একটি মাধবীলতার কুঞ্জ আছে যার চারদিক কুরুবক গাছে ঘেরা। সেই কুঞ্জের নিকটে আবার একটি অশোক ও একটি বকুলগাছ আছে। সেই রক্তবর্ণ ফুলে ভরা অশোকের ও সাদা সাদা ফুলে ভরা বকুলের কচি কচি পল্লবগুলি যখন বাতাসের ভরে কাঁপতে থাকে তখন মনে হয় তারা কত মিনতি করে কার কাছে এক অব্যক্ত প্রার্থনা জানাচ্ছে। মনে হয় অশোক আমার প্রিয়তমার বামচরণের তাড়না ভিক্ষা করছে আর বকুল তার মুখোচ্ছিষ্ট মদিরা পানের ভিক্ষা করছে। তুমি হয়ত জান, সুলক্ষণা ললনারা অকালে ফুল ফোটাবার জন্য অশোকে বামপদের আঘাত এবং বকুলে মুখমদিরা সিঞ্চন করে থাকে। তাতে শুধু অকালে ফুল ফোটে না, সেই চরণাঘাতে ও মুখমদিরাপানে অতি বড় নীরস নায়কের হৃদয়ও অসময়ে রসময় হয়ে ওঠে। অতি বড় শুষ্ক হৃদয়েও ফোটে কামনার ফুল।

ঐ তরুদুটির মধ্যে একটি সোনার যষ্টি মাটিতে পোঁতা আছে। ঐ যষ্টি গাছটার মূলদেশ। তার গোড়াটা তরুণ বাঁশের মত সবুজ চকচকে মণির দ্বারা বাঁধানো আর উপরে স্বচ্ছ স্ফটিকের দ্বারা নির্মিত একটি দাঁড় বসানো আছে। দিনের আলো যখন নীচে আসে, ঘন হয়ে আসে অপরাহ্নের ছায়া, তখন প্রাণের বন্ধু নীলকণ্ঠ ময়ূর এসে ঐ দাঁড়ের উপর বসে আর আমার প্রিয়তমা করতালি দিয়ে ঘুরে ফিরে তাকে নাচাতে থাকে। ময়ূরও তখন তার নীল কণ্ঠ উন্নত করে নাচতে থাকে তালে তালে। প্রেয়সীর হাতের জড়োয়ার চুরি বালা রুনু ঝুনু করে বেজে ওঠে। চারদিক যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায় এক স্বপ্নের আবেশে। আজ এই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

হে মেঘ, তুমি অতি সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি, সুতরাং আমার কথাগুলি তুমি ভুলবে না। আমার কথামত চললে আমার বাড়ি চিনতে পারবে। আমার বাড়ির আর একটি বিশেষ চিহ্নের কথা বলছি। দেখবে আমার বাড়ির সিংহদ্বারের দুই পাশে একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম আঁকা আছে। আমাদের অলকায় নির্ধন বা নিঃস্ব দরিদ্র কেউ নেই। যে যত ধনের মালিক তা তার বাড়ির দরজার গায়ে লেখা থাকে। কোটি অর্বুদ, খর্ব নিখর্ব, শঙ্খ পদ্ম এই সংখ্যায় আমি শঙ্খ পদ্ম ধনের অধিকারী। এই চিহ্ন দেখলেই আমার বাড়ি চিনতে পারবে। কিন্তু সূর্য অস্তমিত হলে পদ্মের যেমন আগের মত শোভা থাকে না, তেমনি আমার অভাবে শুধু আমার গৃহলক্ষ্মী নয়, আমার সাজানো বাড়িও শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

আমি তোমাকে আমার বাড়ির যে মনোরম ক্রীড়াশৈলের কথা বলেছি, সেই শৈলের নানা মনিমাণিক্যখচিত নিতম্বদেশে তোমাকে নামতে হবে। তবে ছোট পর্বতের নিতম্বদেশে নামবে বলে তোমাকে হাতির ছানার মত ছোট হতে হবে। তারপর সেই ক্রীড়া পর্বতের সানুদেশে বসে তোমার ভিতরকার বিদ্যুৎ একটু একটু করে ছাড়বে এবং সেই আলো ধীরে ধীরে আমার ঘরের ভিতরে জানালা দিয়ে ফেলবে। দেখো যেন সে আলোর তীব্রতায় ঘরের ভিতরে যে আছে সে চমকে না ওঠে। জোনাকিরা যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের উপর পড়ে মিট মিট করে জ্বলে, তেমনি তুমিও তোমার ঈষৎ-বিকীর্ণ বিদ্যুৎ নয়নে মিট মিট করে দেখবে। বড়ই দুঃখের কথা, সে কথা বলতে আমার বুক ফেটে যায়।

এইভাবে সেই ঘরের মধ্যে যাকে দেখবে সেই সুন্দরীই এই হত-ভাগ্যের প্রিয়তমা, দ্বিতীয় জীবন। সে কোন বাচালতা জানে না, বেশী কথা বলে না কখনো। এখন আবার তার একমাত্র সহচর আমি এত দূরে নির্বাসিত থাকায় সাথীহারা চক্রবাকীর মত গাঢ় উৎকণ্ঠায় একাকিনী বিরহভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। এখন তাই আরও নীরব হয়ে আছে। একে সে মাত্র ষোল বছরের তরুণী বালিকা, তার উপর দীর্ঘ

বিরহে আমার প্রতি তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেছে। তাই মনে হয় তার সেই অপূর্ব যৌবনকান্তি ও তারুণ্যের দীপ্তি আর নেই, প্রবল বিরহতাপে ম্লান হয়ে গেছে তার অঙ্গলাবণ্য। তুষারপীড়িত পদ্মের মত সব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

তুমি হয়ত দেখবে, আমার প্রিয়তমার চোখে অবিরত ঝরছে অশ্রুর ধারা। নিরন্তর কেঁদে কেঁদে আঁখি তার জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে। অনুক্ষণ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে তার। তাই মলিন হয়ে গেছে তার অধরোষ্ঠ। বাম করতলে রাখা কুন্তলঢাকা তার কাতর মুখখানি মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতই ম্লান।

অথবা দেখবে, হে মেঘ, আমার প্রিয়তমা আমার মঙ্গল কামনায় আমার কল্যাণে পূজাপার্বণ নিয়ে ব্যস্ত আছে। অথবা এই দীর্ঘ বিরহে আমি কতটা কৃশ হয়ে গিয়েছি তা মনে করে আমারই ছবি আঁকছে। অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ আমার অতি সাধের সারিকাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করছে। বলছে, তাঁর কথা কি মনে পড়ে? তুই তাঁর প্রিয়া, আমার মত তাঁর বিরহে তোরও বুকের ভিতরটা কি জ্বলছে? এইভাবে সেই জনহীন প্রাসাদে আমার প্রেয়সী কত কষ্টেই না একাকিনী পড়ে থেকে দিন কাটাচ্ছে।

হে সৌম্য, প্রশান্তমূর্তি, যে অবস্থাতেই আমার প্রিয়াকে দেখ না কেন, আশঙ্কার কোন কারণ নেই। হয়ত দেখবে সে তার কোলের উপর বীণাটি রেখে গান গাইবার চেষ্টা করছে। দীর্ঘ বিরহে সাজসজ্জা ও বিলাসব্যসন সব ত্যাগ করায় মলিন বসন পরে দিন কাটাচ্ছে। সেই মলিন কাপড়ে ঢাকা মলিন উৎসঙ্গে বা কোলে বীণা রেখে আমারই কথায় ভরা তারই রচিত একখানি গান গাইবার বড় আশা বড় সাধ ছিল তার। কিন্তু সে গান গাওয়া আর হলো না। বীণায় সুর তুলতে যেতেই চোখের জলে বীণার তার ভিজে যায়। আবার তারের জল মুছে ফেললে গানের পদ ভুলে যায়। এইভাবে একে একে সব চেষ্টা বিফল হয়ে যায় তার।

অথবা হয়ত গিয়ে দেখবে দরজার চৌকাঠের পাশে আটমাস যাবৎ

এই বিরহকালে প্রতিদিন একটি ফুল রেখে যত ফুল জমেছে সেগুলি গণনা করে দেখছে। দেখছে বিরহের কত দিন কেটে গেছে আর কত দিন বাকি আছে। অথবা হয়ত দেখবে কোন এক ঘরের দেওয়ালে দেহ এলিয়ে মনে মনে ও প্রাণে প্রাণে আমার সঙ্গে কল্পিত সংসর্গসুখ উপভোগ করতে করতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তার মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে। বিচ্ছেদকাতরা বিরহাতুরা ললনারা এইভাবেই কল্পিত মিলনানন্দে বিভোর হয়ে চিত্ত বিনোদন করে। তাপিত প্রাণ কিছুটা শীতল করে।

হে মেঘ, তুমি যেন দিনের বেলায় সেখানে গিয়ে আমার সংবাদ দিও না। কারণ সে একা থাকলেও দিনের বেলার কোন না কোন কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বিরহব্যথা তখন তার তত তীব্র হয় না। কিন্তু রাত্রিকালে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে ওঠে সে ব্যথা। ধূলিশয্যায় শয়ন করে সারা রাত্রি জেগে কাটায় সে। প্রথম রাত্রিতে কিছুটা ঘুমের আবেশ আসতে পারে। তাই রাত্রি গভীর হলে যখন সমস্ত জগৎ নিশুতি হয়ে যাবে, একেবারে স্তব্ধ ও নিশ্চুপ হয়ে উঠবে চারদিক, তখন তুমি সৌধবাতায়নে বসে তাকে আমার সংবাদ দান করে কিছুটা সুখী করো।

দেখবে এলোমেলো ধূলিমলিন শয্যায় একপাশে ফিরে শুয়ে আছে সে। দেখবে তার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীর রাত্রি শেষে পূর্ব দিকের শেষপ্রান্তে আকাশে যেমন ক্ষীণ একখানি চাঁদ দেখা যায় তেমনি ক্ষীণদেহে শয্যায় পড়ে আছে সে। মনে হবে তার জীবনদীপ নিববার আর বুঝি দেরী নেই। সুতরাং আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার সংবাদ শুনিয়ে বাঁচাও তাকে। যখন আমি তার কাছে থাকতাম, যখন সে ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদ করে রাতটা কাটিয়ে দিত তখন কত স্বপ্ন মনে হত রাত্রিটাকে, সে রাত্রি কোন দিকে কেটে যেত বোঝাই যেত না। কিন্তু ঘোর বিরহের দিনে রাত্রি ছোট হলেও যেন সে রাত্রি এত দীর্ঘ মনে হয় যে, তা যেন কাটতেই চায় না। আজ সে দীর্ঘ রজনী কেঁদে কেঁদে কাটাচ্ছে, তার দুগাল বেয়ে ঝরে

পড়ছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা।

জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে ঘরে পড়েছে। একদিন এই আলো আমাদের কতই না সুখের ছিল। রতিক্লান্ত চোখে সে আলোর দিকে চাইতেই ঘুমিয়ে পড়ত আমার প্রেয়সী, তার দেহমন জুড়িয়ে যেত। কিন্তু আজ বিরহের এই দুঃসহ দিনে জানালা দিয়ে আসা সেই আলোর দিকে চাইতে গেলেই তার চোখ জ্বলতে লাগল, তার বুকের ভিতর হু হু করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল আসায় সে আর চোখ বুজতেও পারল না। তখন তার আকর্ণবিস্তৃত নয়নপথ মেঘাচ্ছন্ন দিবসের না ফোটা না বন্ধ স্থলপদ্মের মত না বোজা না খোলা অবস্থায় রইল।

অথবা হয়ত দেখবে প্রেয়সী আমার ঘুমোবার চেষ্টা করছে। জাগ্রত অবস্থায় আমাকে পাবার বা দেখার আশা নেই। ঘুমোলে স্বপ্নের মধ্যে যদি আমার সঙ্গলাভ ঘটে এই আশায় সে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও জলভরা চোখ বন্ধ করতে না পারায় ঘুম আসছে না। প্রথম বিচ্ছেদের দিন হতে সে তেল মেখে স্নান করে না। রুক্ষ মাথায় স্নান করতে করতে তার চুলগুলি তামার তারের মত সরু হয়ে গেছে। তার সীঁথির দুপাশে কুন্তচূর্ণগুলি বর্ষারজনীর জলো বাতাসে উড়তে উড়তে তার দুগালের উপর এসে পড়েছে আর গণ্ডবাহী অশ্রুধারার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। তার উপর আবার উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার কোমল অধরপল্লব একেবারে চুপসে যাচ্ছে আর তার তারের মত সরু চুলগুলিও কাঁপছে আর গালের উপর উড়ে এসে পড়ছে। এই অবস্থায় সে মলিন শয্যার উপর পড়ে আছে।

তার উপর বিরহের প্রথম দিন হতে সে একবেণী করে চুল বাঁধছে। কবরীতে কোন মালা পরে না। তার মাথায় আছে একটা চুলের ঢিপির মত খোঁপা। বিরহশেষে আমি ফিরে গিয়ে সেই খোঁপা নিজের হাতে খুলব, বেণী ভেঙ্গে দেব। তাই সে চুল খোলে না। খোঁপার ভিতর রুক্ষ চুলগুলি চুলকাচ্ছে। কিন্তু নখের ডগাগুলি বেড়ে যাওয়ায় লম্বা নখের ডগায় চুল আটকে যাচ্ছে। নখ কাটতে

নেই। চুলকাতে গেলেই শক্ত মাটির ঢেলার মত খোঁপাটা গালের উপর এসে পড়ছে আর চুলগুলি নখে আটকে যাচ্ছে।

হে মেঘ, দেখবে তার গায়ে একটিও গয়না নেই। কোনমতে অতি কষ্টে যেন কালি হয়ে যাওয়া বিশীর্ণ অঙ্গলতিকাটি বিছানায় ফেলে রেখেছে। তার সেই শুষ্ক দেহভারের কথা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে, তুমি দেখলে কত ব্যথা পাবে। হে নব জলধর, তাকে দেখলে তোমারও নিশ্চয় নবজলবিন্দুরূপ অশ্রুবর্ষণ হবে। তুমি স্থির থাকতে পারবে না, কেঁদে ফেলবে। যাদের আত্মাটা নরম তারা সবাই পরের দুঃখে বিগলিত হয়ে যায়। আর তোমার ভিতরটা ত জলময়। তুমি যে তার দুঃখে কাতর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তোমার সঙ্গী অর্থাৎ আমার প্রিয়তমার মন যে আমার প্রতি কত অনুরক্ত, আমার উপর তার ভালবাসা কত গভীর তা আমি জানি বলেই এই প্রথম বারের বিরহে তার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস। সমাজে অনেকে যেমন নিজেদের দাম্পত্য প্রেম ভালবাসার কথা সকলের কাছে বলে নিজেদের সৌভাগ্য কীর্তন করে আমি কিন্তু তেমন করছি না। আমাকে বাচাল ভেবো না। তাছাড়া এখন ত আর বেশী কথা বলার দরকার নেই। হে ভাই, তুমি নিজে গিয়ে দেখবে আমি যা বলছি তা সব সত্য কি না।

তুমি নিকটে গেলেই আমার বিরহক্লিষ্টা প্রিয়া তোমার দিকে চোখ ফেরাবে। কুন্তলচূর্ণাবৃত সে চোখে আর সে শোভা বা মদিরা নেই। সে চোখে আর সে কাজল পরে না। রুক্ষ চুলের গুচ্ছগুলি এসে চোখের কোনে অপাঙ্গে পড়েছে। সেই মৃগনয়নার সতত সন্ত্রস্ত নয়নের উপর পাতাগুলি যখন কাঁপতে থাকবে, পদ্মের পাপড়ির মত ঈষৎ চঞ্চল হবে, তখন তোমার মনে হবে যেন নীল জলের মধ্যে মাছ নড়ে বেড়াচ্ছে আর সেই সব মাছের গায়ের নাড়া লেগে পদ্মের পাপড়িগুলিও নড়ছে।

হে মেঘ, তোমাকে দেখলেই তার বাম উরু থরথর করে কাঁপবে। রমণীদের বাম উরু কাঁপলে অচিরে প্রিয়মিলন হয়। তাই আমার

বিদূষী প্রিয়া বুঝতে পারবে স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটতে আর দেরী নেই। কিন্তু তার সেই উরু আর আগের মত নেই। তাতে আর আমার হাতের নখের চিহ্ন নেই। আগে মিলনকালে কোমরে কাপড়ের নিচে যে মুক্তার ঝালর পরত, নড়াচড়ার সময় সেগুলি তার উরুদেশে লাগত এবং তাতে তার সুখবোধ হত। মিলনের ও রতিসম্ভোগের পর খোলা ছাড়ানো তাজা কলাগাছের মত সাদা ধবধবে তার উরু ক্লান্তিভরে শিথিল ও অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ত আর আমি তখন তা নিজের হাতে টিপে দিতাম। তাই প্রিয় মিলনের অগ্রদূত তোমাকে দেখলেই তার বাম উরু কাঁপতে থাকবে।

ভাই মেঘ, তুমি গিয়ে যদি দেখ, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে, তাহলে কোন শব্দ করে তার ঘুম ভাঙ্গাবে না, তার কাছে নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করবে। জাগ্রত অবস্থায় তার দুঃখের অন্ত নেই। তাই যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণই শান্তিতে থাকে। সুতরাং তার ঘুম যেন ভাঙ্গিও না। সেই ঘুমের মধ্যে হয়ত সে স্বপ্নে আমাকেই দেখছে এবং গাঢ় আলিঙ্গনে আমার কণ্ঠ দুবাহুপাশে আবদ্ধ করে অচেতন-ভাবে পড়ে আছে। এই সময় তুমি গর্জন বা গোলমাল করলে তার স্বপ্ন টুটে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কণ্ঠদেশ হতে তার বাহুলতার বন্ধন খুলে যাবে। স্বপ্নের আলিঙ্গন নিমেষে ভগ্ন হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিণত হবে। অন্ততঃ একপ্রহরকাল সেই স্বপ্নের অলীক আলিঙ্গনটাকে উপভোগ করতে দিও তাকে।

দিগন্ত কাঁপানো মন্দ্রধ্বনি করে জাগাতে যেতে হবে না। ভোরবেলায় তোমার জলভরা ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে জেগে ওঠা মালতী ফুলের মতই তোমার শীতল জলকণাভরা মৃদুমন্দ বাতাস তার গায়ে গিয়ে লাগতেই তার চোখের পাতা খুলে যাবে আপনা থেকে। তখন সে উঠে বসে যে জানালায় তুমি গিয়ে বসবে সেই দিকে নিমেষহারা নয়নে তাকিয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা চোখে তোমার মত কিম্ভূত কিমাকার এক বস্তু দেখে তোমাকে চিনতে নাও পারে। তুমি তাই ধীরে ধীরে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে। কোনরূপ চঞ্চলতা

প্রকাশ করলেই অভিমানে মুখ ফেরাবে সে। তোমার বিদ্যুৎকে ভিতরে লুকিয়ে রাখবে। কারণ দু একবার বিদ্যুৎ চমকালেই সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তুমি বরং ধীরে ধীরে একটুখানি গুড় গুড় ধ্বনি করে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করবে।

প্রথমেই তুমি 'আমি তোমার স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু' এবং তাকে 'অবিধবে' বলে সম্বোধন করবে। তারপর বলবে, আমি মেঘ, আমাকে দেখে চমকে যেও না। তোমার স্বামীর কতকগুলি সুখের সংবাদ নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। তিনি তাঁর হৃদয়ের অনেক গোপন কথা আমাকে দিয়ে তোমাকে বলতে পাঠিয়েছেন। বিরহজনিত যত সব দুঃখ তাপ আমিই সব দূর করি। প্রবাসী পতিরা আমাকে আকাশে উদয় হতে দেখলেই যখন ব্যস্ত হয়ে বাড়ির পথে রওনা হয় এবং যখন দ্রুত পথ চলার ফলে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বিশ্রামে মগ্ন হয়ে থাকে তখন আমি আকাশে মন্দ্রধ্বনি করলেই তাদের আপন আপন প্রেয়সীদের প্রথম বিরহ দিনের বেণী খোলার জন্য পাগলের মত ছুটে যায় বাড়ির দিকে।

হে মেঘ, তুমি তার স্বামীর বন্ধু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ তুলে তোমার দিকে তাকাবে। পবনপুত্র হনুমান রামের সংবাদ নিয়ে অশোক বনে গেলে সীতা যেমন আগ্রহভরে তার দিকে চেয়েছিলেন, তেমনি আমার প্রেয়সী স্ত্রীও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তোমার দিকে তাকাবে। তুমি তার পতির মিত্র এবং তার সংবাদ এনেছ জেনে সে পরম সমাদরে তোমাকে আতিথ্য দান করবে এবং তোমার কথাগুলি শুনবে। বন্ধুর মুখে প্রিয়তমের সংবাদ পাওয়া আর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন—এই দুই এর মধ্যে বেশী একটা তফাৎ নেই।

ভাই মেঘ, তুমি শত বছর বেঁচে থাক, দীর্ঘায়ু হও। আমার প্রার্থনা পূরণ করতে গিয়ে পরোপকারের দ্বারা তোমার শ্লাঘাভাজন জীবনও সার্থক হয়ে উঠবে। তুমি তাকে বলবে, হে অবলা, এই দারুণ বিরহ সইবার মত বল তোমার কোমল হৃদয়ে নেই, এই ভেবে তোমার সেই প্রিয়তম কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। সে বেঁচে আছে এবং রামগিরি

পাহাড়ে রয়েছে। তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে কোন খবর পায়নি তাই আমার মুখে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে। হে মেঘ, তুমি ত জান জীবের প্রতিপদে বিপদ, বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। তাই দেখা হলেই 'কেমন আছ'—প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

তাকে বলবে, বিরহযন্ত্রণায় আজ তোমার যেমন শোচনীয় দশা হয়েছে তারও ঠিক তেমনি হয়েছে। অথচ বিধির বিড়ম্বনায় সে দূরে পড়ে আছে এবং আসার পথ তার রুদ্ধ। তোমার মত তারও অঙ্গ কৃশ হয়ে উঠেছে। বিরহতাপে তোমার দেহ যেমন নিশিদিন দগ্ধ হচ্ছে তেমনি তার সেই তাপে তার দেহমন জ্বলে পুরে খাক হচ্ছে। তোমার মত তারও নয়নজলের বিরাম নেই। তার জন্য তোমার প্রাণে যে উৎকণ্ঠা, তোমার জন্য তারও হৃদয়ে তেমনি উৎকণ্ঠা। তোমার মত সেও শুধু তোমার কথা ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছে। তুমি যেমন ক্ষণে ক্ষণে তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছ, সেও তেমনি তোমার চেয়ে বেশী উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

তাকে আরও বলবে, তোমার সখীদের সামনে অবাধে যে কথা বলা যায় সেই অগুহ্য কথাও তোমার মুখখানি স্পর্শ করার লোভে সে কথা বলার জন্য যে তোমার কানে কানে ঝুঁকে পড়ত, যে তোমাকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করত না, সে আজ বিধির বিপাকে এত দূরে পড়ে আছে যে সেখানে কথা যায় না, দৃষ্টিও যায় না। তোমার সেই বিরহবিধুর পতি আমি একজন অচেনা ব্যক্তি হলেও বাধ্য হয়ে আমার মুখে তার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ কথাগুলি পাঠিয়েছে। তুমি তা শোন।

শোন চণ্ডি, তুমি এমনই অনুপম এতই সুন্দর যে তোমার দেহসৌন্দর্য বা অঙ্গলাবণ্যের সামান্য সাদৃশ্যও অন্য কোন বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাই না। আমি বহু জায়গায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার শ্যামল অঙ্গলতিকার শোভা দেখার মানসে প্রিয়ঙ্গুলতিকার কাছে ছুটে যাই হরিণীর চকিত নয়নের মধ্যে তোমার চঞ্চল নয়নের দৃষ্টিকে খুঁজে পেতে চাই, তোমার মুখের অতুলনীয় শোভা দেখার জন্য পূর্ণিমার চাঁদের

দিকে তাকাই, তোমার আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশপাশের সৌন্দর্য দেখার আশায় আমি ময়ূরের কলাপুচ্ছের পানে চেয়ে থাকি আর তোমার কটাক্ষকালীন চঞ্চল ভ্রূবিলাস দেখার আশায় মন্দগামিনী নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে চেয়ে থাকি। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যেই তোমার দেহের কোন অঙ্গের কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাই না।

প্রণয়কলহে সামান্য খুঁটিনাটিতে তুমি যখন রাগে লাল হয়ে উঠতে, তোমার লাল মুখখানি, লাল গণ্ডস্থল, লাল চোখদুটি আরো লাল দেখার লোভে আমি ছল করে আরো তোমাকে চটাতাম। আর মনে মনে কত সুখ পেতাম। তোমার ক্রোধ প্রশমিত করে তোমাকে শান্ত করাব জন্য কোন উপায় না পেয়ে আমি তোমার পায়ে পডতাম। আজ বিরহ-কালে তোমার সেই মোহন মূর্তি দেখার জন্য পাথরের উপর লাল গিরিমাটি দিয়ে তোমার চেহারা আঁকি। তারপর তোমার সেই লাল ছবির চরণতলে আমার চেহারটা আঁকি। সত্যিকারের মিলন সম্ভব নয় বলে ছবিতে ছবিতে মিলন ঘটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু বিধির তাও সহ্য হয় না। চোখের জলে আমার দৃষ্টি লোপ পায়। তোমার চবণতলে আমাব মূর্তি আঁকা আর হয় না।

স্বপ্নে তুমি এসে একবার দেখা দেবে এই আশায় আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি। কখনো একটু ঘুম এলে তোমাকে পাবার আশায় নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করাব জন্য ঘুমের মধ্যেই হাত দুখানি শূন্যে বাড়িয়ে তোমাকে ধরতে চাই। হাত দুখানি অনেকক্ষণ শূন্যে উঁচু হয়েই থাকে। সেই জনমানবহীন বনপ্রদেশে ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে ধরার জন্য আমার সেই ব্যাকুলতা ও আমার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখে বনদেবতারা সমবেদনায় অশ্রু বিসর্জন কবতে থাকেন আর তাঁদের সেই মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুগুলি তরুপল্লবের উপর টপ টপ করে ঝরে পড়তে থাকে। পূজনীয়দের অশ্রু মাটিতে পড়লে অকল্যাণ হয় বলে তাঁরা মাটিতে না ফেলে তরুপল্লবের উপর তাদের নয়নের জল ফেলেন।

বর্ষার উত্তরের ঠাণ্ডা কনকনে বাদলা হাওয়া বইছে আর তার স্পর্শে দেবদারুতরুর কচি কচি পল্লবগুলি, পাতার কুঁড়িগুলির মোড়ক খুলে

ভেঙ্গে যাচ্ছে আর পাতার বোঁটা হতে ক্ষীরের মত সুন্দর সুগন্ধি আঠা ঝরছে। সেই সুগন্ধে বাদলা হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। তুমি যখন আমার কাছে আসতে বা পাশ দিয়ে চলে যেতে তখন তোমার দেহগাত্রের সৌরভ আমাকে পাগল করে তুলত। এখন তুমি যেদিকে আছ আজকের এই ঠাণ্ডা উত্তরের বাদলা বাতাসও সেই দিক থেকে আসছে এবং আমার আগে সে হয়ত তোমার দেহ স্পর্শ করে তোমার সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠেছে। তাই আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করার লোভে এই ঠাণ্ডা সুগন্ধি বাতাসকে আলিঙ্গন করতে যাই। ভাবি এইভাবে হয়ত মিলিত হতে পারব তোমার সঙ্গে।

সারা দিনরাত্রি এত জ্বালা এত যন্ত্রণা সমানভাবে সহ্য করতে পারছি না আমি। তোমার সেই চটুল নয়ন আর কুটিল কটাক্ষ আজ মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। দিন বা রাত্রি সব সময়েই তোমার কথা মনে পড়ে। রাত্রির তিনটি প্রহরের এক একটি প্রহরকে একশো বছর বলে মনে হয়। দিনের বেলায় আমার দেহ মন দুটোই জ্বলতে থাকে। পাহাড়ে রোদের তাপে আমার দেহটা যেমন দগ্ধ হতে থাকে তেমনি আমার বিশুষ্ক রুক্ষ প্রাণ বিরহের তাপে জ্বলতে থাকে। আমার তখন একটাই প্রার্থনা, দিনের তাপটা কি করে কমে। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত প্রার্থনা কে শোনে। আমি তোমার বিরহের তাপে জ্বলে পুড়ে ছটফট করছি। যেখানে যাই বা যা কিছু করি, কিছুতেই কোথাও শান্তি পাই না। এই অসময়ে কে আমাকে আশ্রয় দেবে?

অনেক ভাবনা চিন্তা করে নিজেকেই প্রবোধ দিই, এই কটা মাস কাটাতে পারলেই তোমার কাছে যেতে পারব। হে কল্যাণি, আমি আশীর্বাদ করি, তোমার মনে বল আসুক, তুমিও তোমার মনটাকে দৃঢ় করো। কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ো না। ধৈর্য ধরে থাক। এ সংসারে সুখ দুঃখ কখনো চিরদিন থাকে না। এ সংসারে কে এমন আছে যার ভাগ্যে চিরদিন সুখ বা চিরদিন দুঃখ ঘটে? মানুষের অবস্থা, তার সুখ দুঃখ চাকার নাভির মত উপরে নিচে ওঠানামা করে। আজ যার দুঃখ, কাল তার সুখ, আবার আজ যার সুখ, কাল তার দুঃখ। এ কথা

ভেবে সান্ত্বনা দিও নিজেকে।

আমাদের পুনর্মিলনের আর বেশী দেরী নেই। এটা এখন আষাঢ় মাস। এখন হতে চার মাস পরে কার্তিকের শুক্ল একাদশীতে শার্ঙ্গপাণি নারায়ণ যেদিন শেষশয্যা ত্যাগ করে উঠবেন, সেদিন আমার অভিশাপ মোচন হবে। তখন শরৎকালের শেষভাগ। সেই পরিণত শরতের মেঘমুক্ত চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত রজনীতে আবার আমরা মিলিত হব। তখন আমাদের অভিলাষ আর অপূর্ণ থাকবে না। তাই বলি হে প্রিয়, বাকি চারটা মাস কোনরকমে কাটিয়ে দাও।

হে মেঘ, তোমাকে আর একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি যাতে সে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে তুমি আমাব আপনজন এবং তোমাকে আমিই পাঠিয়েছি। তাকে বলবে, মনে পড়ে তোমার একদিনের কথা? কোন এক রাতে তুমি যখন আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিলে তখন হঠাৎ অকাবণে চীৎকাব করে কেঁদে উঠেছিলে। তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় কান্না দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তুমি কেঁদে উঠলে? তখন তুমি মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলে, লম্পট, আমি স্বপ্নে দেখলাম, তুমি অন্য এক নারীর সঙ্গে রতিক্রিয়া করছিলে। এই গোপন কথাটি বললে তার মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

হে অসিতাক্ষি, আজ তোমার কাছে সংবাদ পাঠাবার সময় তোমার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নের কথাই শুধু মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে যে সকল সংবাদ পাঠালাম, যে সব গুহ্যাতিগুহ্য কথা জানালাম তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি জীবিত আছি। আমার প্রতি কোন অবিশ্বাস করো না। মন্দলোকেরা বলবে দীর্ঘ বিরহে প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে যায়—সে কথায় তুমি কিন্তু কান দিও না। যারা অপ্রেমিক, প্রেমের মর্ম বোঝে না, তারাই বলে বিরহের তাপে প্রেম শুকিয়ে যায়। কিন্তু তারা জানে না, ভোগের সময় যে প্রেম শতমুখ থাকে, বিরহকালে সে প্রেম সহস্র ধারাযুক্ত হয়ে ওঠে। কারণ বিরহকালে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে মনে মনে কত রকম করে ভাবে। মিলনকালের স্বল্প পরিমাণ প্রেম বিরহকালে অগাধ অপরিমেয় প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

বরং ভোগে যে প্রেম ক্ষয় হয়, বিরহে ভোগের অভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সে প্রেম। তোমার মত রসিকাকে আর বোঝাবার কিছু নেই। সুতরাং অপরের কুকথায় কান দিও না।

হে মেঘ, তোমার সখী অর্থাৎ আমার প্রিয়তমার জীবনে এই হলো প্রথম বিরহের আঘাত। প্রথম বিরহের আঘাত বড় বিষম হয় বলেই সে এত কাতর হয়ে পড়েছে। তাই তুমি কোথাও কাল বিলম্ব না করে যথাশীঘ্র গিয়ে তাকে আমার সংবাদ দান করে বাঁচাও। সংবাদগুলি তার কাছে দিয়েই তুমি কৈলাস পর্বত হতে নেমে পড়বে। কারণ ঐ কৈলাসপর্বত একদিক দিয়ে বড় ভয়ঙ্কর স্থান। ত্রিলোচন শিবের ভয়াবহ ষাঁড়টা ঐ পর্বতের শিখরগুলিতে উৎখাত কেলি করে বেড়ায়। তার শিং-এর আঘাতে কঠিন পাথরের চূড়াগুলি ভেঙ্গে যায়। তুমি সেই শিখরদেশে গিয়ে বসলেই তোমার জলভবা নরম দেহ দেখে শিংএর খোঁচা মারতে পারে। দিনের বেলায় ষাঁড়টা তোমায় দেখলে আর নিস্তার নেই। আমার প্রিয়ার কাছ থেকে আসার সময় যা হোক একটা চিহ্ন নিয়ে আসবে। আমার কথাগুলির কি জবাব দিল সে তা আমাকে বলে যেও। প্রভাতকালে প্রস্ফুটিত কুন্দকুসুমগুলি যেমন প্রভাতসমীরনের আঘাতে বৃন্ত হতে ঝরে যায় আমারও তেমনি অবস্থা। দারুণ বিরহের তাপে আমার প্রাণ যায় যায়। এখন যদি তুমি তার সংবাদটা আমাকে এনে দাও তাহলে হয়ত বেঁচে যাই। তোমার আশায় পথ চেয়ে কোন-রকমে জীবন ধারণ করে আছি।

হে চিরসৌম্য, তুমি ধীর ও গভীরভাবে তোমার বন্ধুর এই প্রার্থনার কথা শুনলে, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। তবে কোন উত্তর না দিলেও তাতে আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। কেন না, তোমার কাছে পিপাসার্ত চাতকেরা জল চাইলে নীরবে তুমি জল দান করে থাক, একটি কথাও বল না। যাঁরা মহৎ, তাঁরা বন্ধুবান্ধবের প্রার্থিত কাজ সুসম্পন্ন করেই তাদের প্রার্থনার জবাব দেন, মুখে কোন কথা বলেন না। তাই আমি বুঝি, কথার জবাব না দিলেও কাজের মধ্য দিয়ে আমার প্রার্থনার উত্তর দেবে তুমি।

ভাই মেঘ, জানি, আমি তোমাকে যে অনুরোধ করেছি তা রক্ষা করার জন্য অনেক পাহাড় পর্বত, নদনদী, বনজঙ্গল ও কত দেশ অতিক্রম করে দূর অলকায় যেতে হবে তোমাকে। কিন্তু যত কষ্টই হোক, আমি বিপন্ন, আমার প্রতি তোমার ভালবাসার খাতিরে আমার প্রতি দয়া করে আমার কাজটুকু করো। তারপর নববর্ষার শোভা সৌন্দর্য উপভোগের জন্য যেখানে খুশি যেও। যথা ইচ্ছা বিচরণ ক'রো। তার আগে আমার কাজটি সম্পন্ন করে ফেলো। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, যেন আমার মত তোমার জীবনে কখনো এক তিলের জন্যও তোমার প্রিয়তমা বিদ্যুতের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ না ঘটে, আমার মত তোমাকে যেন বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না হয়।

কুমারসম্ভব

১ম সর্গ

দেবতাদের অধিষ্ঠানভূমি পর্বতরাজ হিমালয় ভূমণ্ডলের উত্তরদিক ব্যাপ্ত করে আছে। পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করে পৃথিবীর মানদণ্ডের মত বিরাজমান এই পর্বতের মত এতবড় পর্বত আর নেই। তাই হিমালয় পর্বতকুলের রাজা।

অতি প্রাচীনকালে জগৎপতি পৃথুর উপদেশে অন্যান্য পর্বতগণ হিমালয়কে বৎসরূপে কল্পনা করে গোরূপ বসুন্ধরাকে দোহন করেছিল। দোহনদক্ষ মেরুগিরি এই দোহনকার্য সম্পন্ন করেছিল। সেই সময় পর্বতগণ ধরিত্রীগর্ভ হতে নানারকমের উজ্জ্বল রত্ন, মণিমাণিক্য ও পরম দীপ্তিশালিনী বিভিন্ন রকমের ওষধি লাভ করেছিল।

হিমালয় অনন্ত রত্নের উৎপত্তিস্থল হলেও তার একটা দোষ আছে। এই হিমালয়ের বেশীর ভাগ অংশই চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন

থাকে। কিন্তু তাতে তার খ্যাতিপ্রতিপত্তির কোন হানি ঘটেনি। কারণ কোন ব্যক্তি নানাগুণে ভূষিত হলে তার একটা মাত্র দোষ সেই গুণাবলীর মধ্যে ডুবে যায়, কেউ তা ধরে না। চন্দ্রের যে কিরণরাশি সমগ্র জগৎকে উদ্‌ভাসিত করে সেই কিরণরাশির মধ্যে কলঙ্ক থাকলেও সে কলঙ্কের কথা কেউ ধরে না।

হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে উজ্জ্বল রঙের নানা রকমের গৈরিক ধাতু আছে। পর্বতের উপরিভাগে যখন খণ্ড খণ্ড জলহীন মেঘগুলি বাতাসে ভেসে বেড়ায় তখন পর্বতের গৈরিক ধাতুর আভা গিয়ে ঐ সব মেঘের গায়ে লাগায় আকাশটা লাল হয়ে ওঠে। পর্বতকামিনী বিলাসিনী সুন্দরী অপ্সরারা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে এসেছে ভেবে ব্যস্ততার সঙ্গে সাজগোজ করতে গিয়ে কেউ পায়ে কাজল ও চোখে আলতা দিয়ে বসল, কেউ বা কোমরে কণ্ঠহার পরে গলায় বস্ত্রহার পরল। এইভাবে তারা ভ্রান্তিবশে ব্যস্ততার মধ্যে সব ওলটপালট করে ফেলল।

জলভারাবনত মেঘমালা পর্বতের শীর্ষদেশ পর্যন্ত উঠতে না পেরে তার নিতম্বদেশে ঘুরে বেড়ায়। তখন ঐ মেঘমালার স্নিগ্ধ ছায়া নিচের সানুদেশে গিয়ে পড়ে। ফলে আকাশচুম্বী পর্বতের অর্ধভাগ সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে থাকে আর নিম্নভাগ আচ্ছন্ন থাকে গাঢ় শীতল ছায়ায়। পর্বতচারী সিদ্ধগণ তখন প্রখর সূর্যতাপে ক্লান্ত হয়ে সানুদেশে নেমে এসে ছায়ায় বসে শরীরটাকে শীতল করে তাপ-ক্লান্তি দূর করেন। কিন্তু মেঘ গলতে আরম্ভ করলে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে বিরক্ত হয়ে আবার রৌদ্রোজ্জ্বল শিখরদেশে উঠে গিয়ে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা পান।

এই হিমালয়ে যেমন অনেক সিংহ আছে তেমনি সিংহ শিকারী অনেক কিরাতও আছে। এখানে অনেক বড় বড় বন্য হাতিও আছে। সিংহরা যখন ঐসব হাতিদের হত্যা করে রক্তাক্ত চরণে তুষারাবৃত পর্বতের উপর দিয়ে বন থেকে বনান্তরে যায় তখন তাদের রক্তরাঙা পদচিহ্নগুলি বরফগলা জলে ধুয়ে যাওয়ায় কিরাতগণ তা দেখে সিংহীদের খোঁজ

করতে পারে না। কিন্তু নিহত গজদের ভাঙ্গা মাথার মধ্যে যে সব মুক্তো থাকে সেগুলি পথের উপরেই পড়ে থাকায় তা দেখে সিংহের গতিপথ চিনে নেয় কিরাতরা।

হিমালয়ের বিদ্যাধরীরা তাদের প্রিয়তমদের চিঠি লেখার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভুর্জপত্র কুড়িয়ে নিয়ে সিঁদুর বা পর্বত গাত্রবাহী তরল গৈরিকরস দিয়ে লিখতে থাকে। তখন লাল অক্ষরে পরিপূর্ণ সেই ভুর্জপত্র পরিণত বয়স্ক গজদের গাত্রস্থিত লোহিত চিত্রমালার মত শোভা পেতে থাকে।

হিমালয়ের গুহামুখ হতে উঠে আসা বাতাস চারদিকের বাঁশগাছ-গুলির গায়ের গোড়ায় কাটা ছিদ্রগুলির মধ্যে প্রবেশ করায় বাঁশের বাঁশির মত এক সময়ে শত শত ধ্বনি বেজে ওঠে। তা দেখে মনে হয় হিমালয়বাসী কিন্নরমিথুনেরা উচ্চগ্রামে গান্ধার রাগে গান গাইছে এবং পর্বতরাজ যেন তাদের সেই গানের তালে তালে বাঁশি বাজাচ্ছে।

হিমালয়ে বড় বড় দেবদারু গাছ আছে, আবার বড় বড় হাতিও আছে। সতত মদস্রাবী সেই সব হাতিদের মাথা থেকে অনবরত মদক্ষরণের ফলে তাদের কপোলদেশে দারুণ ঘা বা চুলকানি হয়। সেই কপোলদেশ যখন খুব জোর চুলকায় তখন তারা দেবদারুগাছের গায়ে কপোলগুলি ঘষতে থাকে। সেই ঘর্ষণের ফলে গাছগুলি থেকে ক্ষীরের মত ঘন ও সাদা আঠা ঝরতে থাকে। সেই মধুর গন্ধে পর্বতের সারা সানুদেশ ভরে যায়।

হিমালয়ে এমন সব লতা বা ওষধি আছে যা রাত্রিকালে জ্বলতে থাকে। অনেক গুহার মুখ ঐ সব লতায় ঢাকা। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। গুহার মধ্যে বড় বড় ঘর আছে। কিরাতগণ তাদের প্রেয়সীদের নিয়ে ঐ সব গুহার মধ্যে গিয়ে রাত কাটায়। সারারাত আমোদ-প্রমোদ করে। গুহামুখ ঢেকে থাকা সেই লতাগুলির আলোয় গুহাগৃহের ভিতরটা আলোকিত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতিদেবী যেন নিজে আড়ালে থেকে সারারাত্রি বিনা তেলে আলো সরবরাহ করেন কিরাতদের রতিমন্দিরে।

হিমালয়ে যে সব কিন্নর কিন্নরীরা বাস করে তাদের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর। তাদের হাবভাব, চলন বলন সব সুন্দর হলেও মুখগুলি ঘোড়ার মত। তারা ভাল গান গাইতে ও রসিকতা করতে পারে। কিন্নরীরা যখন তুষারাবৃত পথে চলাফেরা করে তখন সেই বরফের কনকনে ঠাণ্ডায় তাদের চাঁপার কুঁড়ির মত পায়ের আঙ্গুলগুলির ডগার তল ভাগটায় দারুণ কষ্ট হয়, মনে হয় জ্বলে যাচ্ছে। অথচ গুরু নিতম্ব ও দুর্বহ পীন পয়োধরের বোঝা নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পার হতে পারে না। কিন্নরীরা তখন বরফের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গজেন্দ্রগমনে হেলেদুলে যায়।

দিনের বেলাতেও হিমালয়ের গুহাগুলি ঘোর অন্ধকারে ভরা। দেখলে মনে হয়, দিবালোক ভয়ে ভীত পেঁচার মত যত সব অন্ধকার হিমালয়ের কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে আর মহাপ্রাণ হিমালয় তাদের নির্বিচারে তার বুকের গুহার মধ্যে আশ্রয় দান করেছে। যারা প্রকৃত মহান তাদের ধর্মই হলো ছোট বড় উচ্চনীচ নির্বিশেষে কোন রকম ভেদজ্ঞান না করেই সকল আশ্রয়প্রার্থীদের সমানভাবে আশ্রয় দান করা।

হিমালয় সত্যিই পর্বতকুলের রাজা। তার অধিত্যকাপ্রদেশের অভ্রভেদী দেবদারুগাছগুলির শ্যামল পত্রবিতান হিমালয়ের মাথার উপর রাজচ্ছত্রের কাজ করে। অসংখ্য চমরী মৃগের জ্যোৎস্নার মত সাদা সাদা কোমলপুচ্ছবিশিষ্ট লেজগুলি দোলাতে দোলাতে যখন চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তখন সেই চামরের মত লেজগুলির শোভায় গোটা হিমালয়টা ভরে যায়। মনে হয় ঐ সব চমরীসুন্দরীরা পর্বতরাজাকে চামর দুলিয়ে বাতাস করছে। সার্থক হিমালয়ের 'গিরিরাজ' নাম।

হিমালয়ের নিভৃত নির্জন গিরিগুহাগুলিতে রাত্রিকালে এসে কিন্নরকিন্নরীরা অবাধে সারারাত নর্মক্রীড়া করে। অসহিষ্ণু কিন্নরেরা যখন বস্ত্র হরণের গান করত তখন লজ্জায় মরে যেত কিন্নরীরা। কারণ গুহার দ্বারগুলি খোলা ছিল। এমন সময় কোথা হতে জলভরা একখণ্ড কালো মেঘ এসে গুহাদ্বারে পুরু কালো একটা পর্দার মত লেগে থাকত।

কিন্নরীরা তখন লজ্জার হাত হতে রক্ষা পেত।

এই হিমালয়ের বক্ষ হতেই গঙ্গা ধরাতলে নেমে এসেছেন। গঙ্গার পবিত্র নির্মল ধারা দিনরাত নিরন্তর ঝরে পড়ছে গিরিগাত্র বেয়ে। গঙ্গার জলপ্রপাতের কিছু কিছু জলকণাগুলি বাতাসে মিশে চারদিকে কেমন একটা ঠাণ্ডা জল ছড়িয়ে দিয়েছে। সে বাতাসে দেবদারু গাছগুলি মুহুর্মুহু কাঁপছে। ময়ূরগুলি ছোটাছুটি করছে আর তাদের মাথার পুচ্ছগুলি বাতাসে বিশ্লিষ্ট হয়ে কেমন শোভা পাচ্ছে। কিন্নরেরা মৃগয়া করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঐ বাতাস গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে।

হিমালয়ের শিখরদেশে সপ্তর্ষি নামে এক সরোবর আছে। সেই সরোবরে অনেক পদ্ম ফোটে। সূর্যালোকের অনেক উপরে সপ্তর্ষি নামে নক্ষত্রমণ্ডল আছে।

সপ্তর্ষিগণ তাঁদের পূজার জন্য ঐ সরোবর হতে ভাল করে না ফোটা পদ্মগুলি তুলে নিয়ে যান। শেষে তার নিম্নদেশের সূর্যদেবের কিরণে পুকুরের বাকি পদ্মগুলি বিকশিত হয়। সূর্যকিরণ সেখানে উপরের দিকে প্রসারিত হয়ে পদ্মগুলিকে ফোটায়। কারণ সেই সরোবরের পদ্মগুলি সৌরমণ্ডলের অনেক উঁচুতে অবস্থিত।

স্বর্গের দেবতাদের সুবিধা এই যে যেখানে যিনি যে যজ্ঞই করুন, দেবতারা সে যজ্ঞের ভাগ পান। কিন্তু যজ্ঞাদিতে যে সব উপকরণের দরকার হয় তার মধ্যে সর্বপ্রধান সোমরস হিমালয়ে জন্মায়। এই বিশাল পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে সামর্থ্যের দরকার হয় তা একমাত্র ভূধর হিমালয়েরই আছে। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি যিনি দেবদানব, যক্ষরক্ষ, জীবজন্তু, স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর স্রষ্টা—সেই বিধাতা আপনা হতেই হিমালয়কে শৈলাধিপতি বা পর্বতরাজ বলে ঘোষণা করেন। তাই তিনি দেবতাদের মত হিমালয়ের জন্যও একটি যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করলেন। ফলে মর্ত্যে থেকেও স্বর্গের দেবতাদের অন্যতমরূপে পরিগণিত হলেন।

সুবর্ণময় মেরুপর্বতের সঙ্গে হিমালয়ের সখ্যতা স্থাপিত হয়। তাছাড়া শাস্ত্রাদিতেও অধিকার ছিল হিমালয়ের। কে কেমন সম্মান ও

সম্ভ্রমের যোগ্য—সে জ্ঞান হিমালয়ের ছিল। তাই তিনি নিজের কুল-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনকাকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ করেন। মেনকাকে মুনিরাও পরম সম্মান করতেন। সুতরাং মেনকা সর্বতোভাবে অশেষ সম্মানভাজন হিমালয়ের অনুরূপ সহধর্মিণীই হয়েছিলেন।

রূপ, গুণ—সব দিক দিয়েই মেনকা স্বামী হিমালয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মিলন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। ক্রমে মিলনের কাল দেখতে দেখতে কর্পূরের মত উবে গেল। এদিকে মনোরম যৌবন-সৌন্দর্য্যে ধন্য উল্লসিতাঙ্গী গিরিরাজমহিষী মেনকা গর্ভবতী হলেন।

ক্রমে যথাসময়ে রাজমহিষী মেনকার মৈনাক নামে একটি পুত্রের জন্ম হলো। পুত্র মৈনাকও রূপ গুণে সর্বাংশে পিতামাতার অনুরূপ হলেন। পরমাসুন্দরী নাগকন্যারা এসে মৈনাককে পতিত্বে বরণ করল। অনন্ত রত্নের আকর জলনিধি সমুদ্রের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব জন্মাল। বৃত্রাসুরের নিধনকর্তা দেবরাজ ইন্দ্র যখন ক্রোধান্ধ হয়ে বজ্রাস্ত্রের দ্বারা পর্বতগুলির পাখা কেটে দিয়ে তাদের চলাফেরা বন্ধ করে দেন, মৈনাক তখন তাঁর বন্ধু সমুদ্রের গর্ভে আশ্রয় নেন।

মৈনাক জন্মের কিছুকাল পরে মেনকা আবার সন্তানসম্ভবা হলেন। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহাদেবের প্রথম পক্ষের পত্নী সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করে 'তুমি যেমন আমার পতির অপমান করলে, আমি যদি যথার্থ সতী হই, তবে এর উপযুক্ত প্রতিবিধান তোমার জামাতাই এসে করবেন।' এই বলে যে শরীরে পতিনিন্দা শুনেছিলেন, সেই শরীর যজ্ঞানলে ভস্মীভূত করেছিলেন। এখন তিনি অর্থাৎ সেই পতিব্রতা সতীদেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হবার মানসে পর্বতরাজ হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন।

ঠিকমত বুঝে গুণ ও নীতির প্রয়োগ করতে পারলে যেমন শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ হয়ে থাকে তেমনি সংযত প্রকৃতির গিরিরাজ হিমালয় সংযম-সাধিকা মেনকার সঙ্গে মিলিত হয়ে জগতের কল্যাণময়ী 'সতী'কে সমুৎপন্ন করলেন

যেদিন সতী গিরিরাজকন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হলেন সেদিন স্থাবরজঙ্গমসহ ত্রিভুবনের সকলেই পরম সুখে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। জগন্মাতার জন্মগ্রহণে ত্রিজগৎ হয়ে উঠল প্রফুল্লিত। দশদিক প্রসন্ন হয়ে উঠল। ধূলিহীন সুখস্পর্শ সমীরণে পৃথিবী ভরে গেল। আকাশমণ্ডল দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পরিপূর্ণ হলো এবং নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। স্থাবর জঙ্গম সকলেই বুঝল কি যেন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হলো বিশ্বচরাচরে।

নবজলধরের মন্দ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন পর্বতের প্রান্তভূমি হতে উপরিভাগের শিখরদেশ রত্নশলাকার অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, তেমনি জ্যোতির্ময়ী নবকুমারীর দেহলাবণ্যে প্রসূতি মেনকাদেবী অতুল শোভায় মণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

স্পর্শলেখা যেমন উদয়ের পর হতে দিনে দিনে নতুন নতুন কলার সংযোগে বৃদ্ধি পায় এবং বিশেষ সৌন্দর্যসম্পন্ন হয় তেমনি সেই নব-কুমারীর মনোরম দেহও দিন দিন বাড়তে লাগল। দিনে দিনে সে অঙ্গে লাবণ্য বেশী করে বিকশিত হতে লাগল।

পিতৃকুলের পরম আদরের বস্তু সেই নবকুমারীকে পিতা হিমালয় বংশানুযায়ী নামে অর্থাৎ পর্বতকন্যা বা পার্বতী বলে ডাকতেন। পরে যখন পার্বতী শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে যান তখন মেনকা 'উ', 'মা' ওগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে, যেওনা এই বলে বারবার নিষেধ করায় তাঁর নাম হয় উমা।

পার্বতী ছিলেন মাতাপিতার বিশেষ আদরের ধন। পুত্র মৈনাক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পর্বতরাজ হিমালয়ের স্নেহ পার্বতীর উপরেই ছিল বেশী। কন্যাকে তিনি সব সময় কাছে কাছে রাখতেন। কন্যার দিকে যতই তিনি চান, ততই প্রবল হয়ে ওঠে দেখার বাসনা। নয়ন কখনো তৃপ্ত হয় না। বসন্তকালে নানা কুসুম প্রস্ফুটিত হলেও ভ্রমর-শ্রেণী আম্রমুকুলেই বেশী আকৃষ্ট থাকে।

উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত শিখার দ্বারা যেমন দীপ, মন্দাকিনীর দ্বারা যেমন স্বর্গের পথ, ভ্রম ও অহঙ্কারবর্জিত বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা

যেমন জ্ঞানবান ও পণ্ডিত ব্যক্তি পবিত্র ও বিভূষিত হন, তেমনি পার্বতীর দ্বারা হিমালয়ও পবিত্র ও বিভূষিত হন।

পার্বতীরূপিনী জগন্মাতা উমা ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে অন্যান্য বালিকাদের মত খেলা করেন। তাই তিনি সখীদের সঙ্গে কখনো হিমাদ্রিবিহারিণী মন্দাকিনীর তীরে বালির দ্বারা বেদী নির্মাণ করতেন, কখনো বা কন্দুক বা খুঁটি নিয়ে কখনো বা পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে কত খেলা করতেন।

বিনা প্ররোচনায় শরৎকালে হংসমালা যেমন আপনিই গঙ্গায় এসে উপস্থিত হয় এবং রজনীযোগে জ্যোতিষ্মতী লতাসমূহে যেমন তাদের স্বকীয় দীপ্তিদান আপনা হতে জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে, তেমনি মেধাবিনী বালিকা পার্বতীর শিক্ষণকালে তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার আপনি এসে আশ্রয় করল। তিনি অনায়াসে বিদ্যাশিক্ষায় নৈপুণ্য লাভ করতে লাগলেন।

যে যৌবন রমণীর অঙ্গলতিকার সযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার, যে যৌবন মদ্য না হলেও হৃদয়ের ঘোর মত্ততাজনক, যে যৌবন কামদেবের কোন ফুলশর না হলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাণ, সেই অপরূপ যৌবনকাল এসে কিশোরী পার্বতীকে আবেষ্টন করল।

নবযৌবনে সমৃদ্ধ হয়ে পার্বতীর অঙ্গ সব দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে উঠল। পীনোন্নত বক্ষ, বিপুল জঘন, ক্ষীণ কটিদেশ—সব সম্পূর্ণরূপে শোভা পেতে লাগল। নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত আলেখ্যের মত এবং সূর্যকিরণবিকশিত শতদলের মত হিমালয়কন্যা কমনীয় কলেবর যৌবনাগমে কমনীয়তম হয়ে উঠল। দেহের কোথাও কোন খুঁত রইল না।

যৌবনভারাবনতাঙ্গী হিমালয়কন্যা যখন ধীরে ধীরে পদচারণা করতেন, ঈষদুত্তোলিত চরণপদ্মের অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুলি প্রতিপদক্ষেপে কঠিন মাটিতে পড়ার সময় তার নখ হতে কেমন যেন একটা আরক্তিম আভা ঝরে পড়ত। মনে হত, পার্বতী যেন তাঁর অঙ্গুলির নখপ্রভায় মাটির উপর স্থলপদ্ম-রাশি ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন।

পায়ে নূপুর পরে পার্বতী যখন মন্থর গমনে ঝুমঝুম শব্দ করে চলে যেতেন তখন মনে হত, তাঁর ঐ নূপুরনিক্কণ প্রতিদান হিসাবে পাবার জন্যই হয়ত রাজহংসীরা মন্দমনোহর মরালগমন শিক্ষা নিয়েছে।

তাঁর সুবর্তুল অথচ ক্রমশ কৃশভাবাপন্ন নাতিদীর্ঘ জঙ্ঘাদ্বয় বিধাতা এমনই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন যে বিধাতার সৌন্দর্যভাণ্ডারের সব সৌন্দর্য ঐ জঙ্ঘানির্মাণেই ব্যয়িত হয়েছিল। সেকারণে পার্বতীর অন্যান্য অঙ্গনির্মাণকালে বিধাতাকে লাবণ্য বা সৌন্দর্যসংগ্রহে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

সাধারণতঃ লোকে করিশুম্ভ বা হাতির শুঁড়ের সঙ্গে অথবা কদলী-তরু বা কলাগাছের সঙ্গে সুন্দরী নারীদের ঊরুভাগের তুলনা করে। কিন্তু পার্বতীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল। কারণ করিশুণ্ডের ত্বক কঠোর এবং কর্কশ, আর কদলীতরু বড় ঠাণ্ডা। তাই তারা কখনো পার্বতীর অতিসুকোমল এবং নাতিশীতোষ্ণ অসাধারণ ঊরুর উপমান-যোগ্য হতে পারে না।

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতীর কাঞ্চীগুণের স্থান অর্থাৎ রশনাধারণের অঙ্গ বা নিতম্ব এমনই অপূর্ব ছিল এবং তার শোভা এমনই অতুলনীয় ছিল যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর পার্বতীর নিতম্বদেশ মহা-দেবের অঙ্কদেশে স্থাপিত হয়েছিল। স্বয়ং মহাদেব নিজের অঙ্কে বা কোলে সেই নিতম্ব স্থাপন করে তাঁকে তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী করেছিলেন।

নিম্ননাভি পার্বতীর নাভিদেশের চারদিকে নবোদ্গত অতিসূক্ষ্ম রোমরাজি তাঁর নাভিগর্ভের মধ্যে ঈষৎ প্রবিষ্ট হয়ে এমনই শোভা পেত যে দেখলে মনে হত বুঝি তাঁর মেখলার মধ্যগত নীলকান্তমণির আভা নাভির উপরিস্থিত বসনগ্রন্থি ভেদ করে নাভিগর্ভে প্রবেশ করেছে।

পার্বতীর মধ্যভাগ অতিশয় কৃশ ছিল। কটিদেশের নীচে ত্রিবলী বা তিনটি বলি ছিল। ক্ষীণ মধ্যভাগ অতিক্রম করে পার্বতীর দেহের পীনোন্নত ঊর্ধ্বভাগে উঠতে কন্দর্প বা কামদেবের পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই হয়ত ঐ কটিদেশে ত্রিবলীর আকারে তিনটি ধাপ বা সোপান নির্মিত হয়েছে। এই সোপান বা সিঁড়ি যেমন কোমল তেমনি কমনীয়।

কমলনয়না পার্বতীর পরিবর্ধমান স্তনদ্বয় পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে এতই বেড়ে উঠেছিল যে সেই পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবৃন্ত স্তনদ্বয়ের মধ্যে এমন একটু ফাঁকও ছিল না যাতে অতিসূক্ষ্ম মৃণালসূত্র ঢুকতে পারে।

আমার মনে হয় পার্বতীর বাহুদ্বয় শিরীষ কুসুমের থেকেও কোমল ছিল। তা না হলে মকরকেতন মদন তাঁর শিরীষ ফুলের যে বাণ নিক্ষেপ করে ত্রিলোচন মহাদেবের চিত্তবিকার ঘটাতে পারেননি, তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই মদন মহাদেবের কণ্ঠ পার্বতীর বাহুপাশে আবদ্ধ করতে পারলেন কি করে ?

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতী যখন পীনোন্নত গলদেশে সুগোল মুক্তার হার পরতেন, তখন কে কার শোভা উৎপাদন করত, তা বোঝা যেত না। সেই নয়নরঞ্জন মুক্তাহারে পার্বতীর কণ্ঠ যেমন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠত তেমনি ঐ মুক্তাহারেরও সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। তারা পরস্পর পরস্পরের ভূষণ হত।

প্রকৃতিচপলা লক্ষ্মী রাত্রিকালে চন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আশ্রয় করলে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা ভোগ করতে পেতেন না। আবার দিনের বেলায় কমলদলে অধিষ্ঠিত হলে নৈশ চন্দ্রের সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু উমার অপরূপ মুখমণ্ডল একাধারে চন্দ্র ও পদ্মের সমতুল বলে লক্ষ্মী সেই বদনকে আশ্রয় করে একই সঙ্গে চন্দ্র ও পদ্মের সৌন্দর্য ভোগ করে প্রীত হতেন।

পদ্ম, শিরীষ, চম্পক প্রভৃতি কুসুম যদি অচিরোদ্গত নবপল্লবের উপর সন্নিবেশিত হয় অথবা স্বচ্ছনির্মল মুক্তাফল যদি ঈষদারক্ত বিদ্রুমের উপর সংস্থাপিত হয় তাহলে তার সঙ্গে হয়ত উমার আরক্ত অধর হতে বিচ্ছুরিত মৃদুমন্দ হাসির তুলনা করা যেতে পারে। পার্বতী যখন হাসতেন তখন সেই হাসির শ্বেত আভা তাঁর আরক্তিম অধরে পড়ে তাঁর মুখখানিকে উজ্জ্বল করে তুলত।

মধুরভাষিণী পার্বতী যখন অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বরে আলাপ করতেন, তখন কাকের দ্বারা প্রতিপালিত কোকিলের কণ্ঠস্বরও বিষমবদ্ধ বীণার

ধ্বনির মত কর্কশ শোনাত।

প্রবল বাতাসে একান্তচঞ্চল পদ্মের মত আয়তনয়না পার্বতী তাঁর সেই চঞ্চল দৃষ্টি চকিতনয়না হরিণীদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন, না হরিণীরাই তাদের চঞ্চল নয়নের কমনীয়তা আয়তাক্ষী পার্বতীর নিকট হতে গ্রহণ করেছিল তা বোঝা যেত না।

যেন অঞ্জনশলাকার দ্বারা অঙ্কিত পার্বতীর আকর্ণবিস্তৃত কুঞ্চিত ভ্রূলতার বিলাসমধুর ও চাঞ্চল্যময়ী কান্তি দর্শন করে কন্দর্প তাঁর সুন্দর ফুলধনুর গর্ব পরিহার করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এমন কুঞ্চিত ভ্রূর কাছে আমার ধনু অকিঞ্চিৎকর, সে ধনুর যা অসাধ্য, এই ভ্রূর তা সুসাধ্য।

তাদের পুচ্ছলোমরাজির সৌন্দর্যের গর্বে চমরী মৃগরা সর্বদাই গর্বিত। তাই তারা লেজের পুচ্ছগুলিকে সযত্নে পেটের নিচে লুকিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তারা লজ্জাহীন পশুজাতি। তাদের যদি কিছুমাত্র লজ্জা থাকত তাহলে তারা পার্বতীর আজানুলম্বিত ও তরঙ্গায়িত কেশকলাপ দেখে বুঝতে পারত, ঐ কেশপাশের তুলনায় তাদের পুচ্ছ-লোমরাজি কত হীন ও অকিঞ্চিৎকর। তা বুঝলেই সেই পুচ্ছের উপর আর তাদের অত টান থাকত না।

বিশ্ববিধাতা চন্দ্রচম্পক, কমল প্রভৃতি জগতের সমস্ত উপমান বস্তুর সৌন্দর্য একত্র সংগ্রহ করে তাদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে সর্বাঙ্গ-সুন্দরী পার্বতীকে নির্মাণ করেছেন। তা না হলে এমন নিখুঁত সুন্দরী মর্ত্যভূমিতে সম্ভূত হতে পারত না।

একদিন যথেচ্ছবিহারী দেবর্ষি নারদ সেই কন্যা পার্বতীকে পিতার সামনে দেখতে পেয়ে পর্বতরাজ হিমালয়কে বললেন, গিরিরাজ, আপনার এই কন্যা হৃদয়ের অপার প্রেমের প্রভাবে একদিন চন্দ্রশেখরের অদ্বিতীয় প্রণয়িনী ও অর্ধাঙ্গী হবেন।

দেবর্ষির উক্তি কদাচ মিথ্যা হতে পারে না, তাই পিতা হিমালয় কন্যা পার্বতীর বয়স বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলেও অন্য কোন পাত্রের সন্ধান করলেন না। কারণ মন্ত্রপূতঃ যজ্ঞীয় হবি একমাত্র অগ্নিদেবেরই প্রাপ্য,

অন্য কোন তেজযুক্ত পদার্থ তা লাভ করার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং কোন অভিলাষ জ্ঞাপন করছেন না বা কোন প্রস্তাব না করছেন দেখে গিরিরাজও তাঁর কন্যা সম্প্রদান বা তার বিয়ের কোন কথা প্রকাশ করলেন না। কোন অনুরোধ বা আগ্রহ না থাকায় সাধু ব্যক্তিরা অভিলষিত বিষয়েও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে থাকেন।

পূর্বজন্মে দক্ষমুখে পতিনিন্দা শুনে মর্মাহত হয়ে সুমুখী সতী যেদিন দেহত্যাগ করেছিলেন সেদিন হতেই সতীকান্ত পশুপতি সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন এবং দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি।

গিরিরাজ হিমালয় যখন নারদের আশ্বাসবাণী শুনে কন্যার বিবাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করছিলেন সেই সময় ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত মহাদেব ঐ হিমালয়েরই এক মনোরম সানুদেশে তপস্যার জন্য উপস্থিত হলেন। সেই সানুদেশে ঊর্ধ্বদেশ হতে পতিত গঙ্গার পূতপ্রবাহে দেবদারুবন নিত্য সিঞ্চিত। সেখানে মৃগদল নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং মৃগনাভিসৌরভে সমগ্র সানুদেশ সতত আমোদিত। কিন্নর কিন্নরীদের মধুর কলাসঙ্গীতে সেই সানুদেশের সমগ্র বনভূমি মুখরিত।

শিব যখন সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতেন তখন তাঁর অনুচর প্রমথগণ পুষ্পকুসুমের মালা কানে পরত। শীতল ও মসৃণ ভূর্জপত্র পরিধান করে শরীর জুড়োত, সুগন্ধি গৈরিকচূর্ণে দেহ বিলিপ্ত করে শিলাজতু সুরভিত শিলাতলে কখনো বসত, কখনো উঠত।

সেখানে মহাদেবের বাহন বৃষরাজ স্কন্ধদেশের বিরাট ককুদ দোলাতে দোলাতে ও সদর্পে গর্জন করতে করতে গিয়ে যখন কঠিন শিলার মত তুষারখণ্ডগুলি খুরের অগ্রভাগ দিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করত তখন গজজাতীয় মৃগগণ সন্ত্রস্তভাবে তার দিকে তাকাত। আবার দূরে সিংহ ডেকে উঠলে সেই সিংহধ্বনি সহ্য করতে না পেরে সদর্পে তার চতুর্গুণ গর্জন করত।

যার তপস্যায় ভক্তের কোন অভীষ্টই অপূর্ণ থাকে না, সেই ভক্তবাঞ্ছা

কল্পতরু দেবাদিদেব মহাদেব জানি না, কোন কার্যসিদ্ধির জন্য আজ তাঁর নিজের সামনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্থাপন করে তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন।

নিজেরই সানুদেশে দেবাদিদেব পরমপূজনীয় মহাদেব উপস্থিত হয়েছেন শুনে পর্বতরাজ হিমালয় গিয়ে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে অর্চনা করলেন এবং স্বর্গলোকের দেবপূজ্য ত্রৈলোক্যনাথের অতিথি হিসাবে সেবা করার জন্য কন্যা পার্বতীকে দুজন সখীসহ সেখানে পাঠালেন।

কামিনীকাঞ্চন তপস্যার ঘোর পরিপন্থী জেনেও জিতেন্দ্রিয় শম্ভু পার্বতীকে সেবা করার অনুমতি দান করলেন। কারণ বিকার বা চিত্ত-বৈকল্যের উপকরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাঁদের হৃদয়ে কোন বিকার জাগে না তাঁরাই প্রকৃত ধীর বা সংযমী।

সুকেশী পার্বতী প্রতিদিন শিবপূজার জন্য ফুল তোলেন, সমাধি-মগ্ন চন্দ্রশেখরের আসনবেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন, পূজা ও অভিষেকাদির জন্য জল আনেন, কুশাদি সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত সেবা করে যেতে লাগলেন মহাদেবের। এই সব সেবাকার্য করতে করতে যখন কোন শ্রান্তি বা খেদ জন্মাত তখন চন্দ্র-শেখরের ললাটচন্দ্রের শীতল কিরণজালে তাঁর সব ক্লান্তি ও খেদ দূর হয়ে যেত।

দ্বিতীয় সর্গ

হিমালয়ের সানুদেশে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের সেবায় পার্বতী যখন এইভাবে নিযুক্ত ছিলেন তখন স্বর্গলোকে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। প্রবল তারকাসুর স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে দেবতাদের বিতাড়িত করে। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধান প্রধান দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন।

দেবতাদের সেই শুষ্কমলিন মুখশ্রী দেখলে প্রসুপ্ত পদ্মপূর্ণ

শোভাহীন সরোবরের কথা মনে পড়ে। ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হতেই সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভাতসূর্যের মত আরক্ত ও প্রফুল্ল বদনে আবির্ভূত হলেন।

পিতামহ সেখানে আসামাত্র দেবতাগণ ত্রিভুবনের স্রষ্টা ও সর্ববিদ্যার আধার চতুর্মুখকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং সার্থক বাক্যদ্বারা সমস্বরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

হে ভগবন, সৃষ্টির পূর্বে কেবল আত্মারূপে বিরাজ করছিলে। পরে যখন তোমার সৃষ্টি করার বাসনা জাগে তখন সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের বিভাগ করে তুমি নিজে সত্ত্বগুণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, রজোগুণে পালনকর্তা বিষ্ণু এবং তমোগুণে সংহারকর্তা রুদ্রের রূপ পরিগ্রহ করে তিনমূর্তি ধারণ করেছিলে।

হে জন্মহীন, তোমারই সৃষ্ট কারণবারিতে তুমি যে অব্যর্থ সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করেছিলে, তোমার নিক্ষিপ্ত বীজ হতেই এই বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং তুমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল বলে কীর্তিত হও।

সৃষ্টির পূবে একমাত্র তুমিই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহাররূপী তিন অবস্থার দ্বারা নিজে অমিত অতুলনীয় শক্তির বিকাশ সাধন করে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের কারণ হয়েছ।

সৃষ্টিবাসনার বশবর্তী হয়ে তুমিই তোমাকে স্ত্রী এবং পুরুষরূপে বিভক্ত করেছ। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ তোমারই অংশ। তোমারই সেই মিথুনরূপী অংশ উৎপাত্তমাণ কীটপতঙ্গ হতে সকল জীবের পিতামাতা-স্থানীয়। তুমিই জগতের পিতা, তুমিই জগতের মাতা।

চার হাজার যুগে তোমার একদিন ও চার হাজার যুগে তোমার একরাত্রি।

এইভাবে তুমিই তোমার দিনরাত্রির বিভাগ করেছ। ঐ বিভাগ অনুসারে তুমি যখন জাগরিত থাক, তখনই জগৎ সৃষ্টিধর্মে ক্রিয়াশীল হয় এবং তোমার যখন নিদ্রিত অবস্থা তখন প্রলয় ঘটে জগতে। এইভাবে তোমারই নিদ্রা এবং জাগরণে জগতেও দৈনন্দিন প্রলয় এবং সৃষ্টি

হয়ে থাকে।

হে ভগবন! তুমি স্বয়ং এই চরাচর বিশ্বের কারণ, অথচ তোমার কোন কারণ নেই। জগতের তুমি সংহারকর্তা, কিন্তু তোমার কোন সংহারক নেই। তুমি জগতের আদি, জগৎ সৃষ্টির আগেও তুমি বিদ্যমান ছিলে, কিন্তু স্বয়ং তুমি আদিরহিত, চিরন্তন। তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর তুমি। তোমার প্রভু কেউ নেই, তুমিই তোমার প্রভু।

তোমার নিজের স্বরূপ একমাত্র তুমি নিজেই জান। অন্যের তুমি জ্ঞানাতীত। লোকহিতে তুমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে থাক, আবার প্রলয়কালে তুমি আপনাতে আপনি লীন হয়ে যাও। তোমার মহিমার অন্ত নেই।

হে পরম পুরুষ! জল সমুদ্রাদি তরল পদার্থই বল, অতি কঠিন মহাবিশ্বই বল—এ সবই তুমি। হালকা পদার্থই হোক, আর গুরু পদার্থই হোক এ সমস্তই তুমি। কাম্যরূপে তুমি যেমন ব্যক্ত বা প্রকাশিত হচ্ছ, কারণ তুমি তেমনি অব্যক্ত বা অপ্রকাশ রয়েছ। এমনিই তোমার বিভূতি।

হে ভগবন! যে অপৌরুষেয় বাক্যের আরম্ভ হলো ওঙ্কার এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরাত্ত—এই ত্রিবিধ স্বরসংযোগে বাক্যের উচ্চারণ করতে হয়, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ এবং যে সমস্ত যজ্ঞকর্মদ্বারা যে বাক্যের চরম ফল স্বর্গ, তুমিই সেই সনাতন বেদবাক্যের প্রণেতা।

তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকেই ভোগ এবং অপবর্গরূপ পুরুষার্থ প্রবর্তিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং মূলকারণ এবং তোমাকেই আবার সাক্ষীরূপে সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা ও উদাসীন কূটস্থ পুরুষ বলে থাকেন।

হে পরমদেব! যাঁরা অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ, তুমি তাঁদেরও পিতা, অর্থাৎ লোকে যাঁদের তর্পণ করে, তুমি তাদেরও তর্পনীয়। ইন্দ্রাদি দেবগণেরও তুমি দেবতা, লোকে যজ্ঞদ্বারা যে দেবগণের পূজা অর্চনা করে থাকে, সেই দেবগণ তোমার পূজা করে থাকেন। এই

জগতের যিনি ঈশ্বর তুমি তাঁরও উপর পরমেশ্বর এবং দক্ষ আদি সৃষ্টিকর্তাদেরও তুমি সৃষ্টিকর্তা।

তুমিই হবনীয় আদ্যাদি, আবার তুমিই হবনকর্তা, তুমিই যাজ্য এবং যজনকর্তা। এই ত্রিজগতে তুমিই অন্নময় পুরুষ এবং তুমিই চিরন্তন ভোক্তা। তুমিই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। জগতে তুমিই একমাত্র ধ্যেয় বস্তু, তোমা ছাড়া জগতে ধ্যানের বস্তু আর কিছু নেই।

বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের মুখনিঃসৃত এই শ্রবণমনোহর স্তব শ্রবণ করে অনুগ্রহপ্রবণ হৃদয়ে এবং প্রসন্ন নয়নে দেবতাদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন।

জগতের আদি কবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হতে যুগপৎ দ্রব্য গুণক্রিয়া জাতিভেদে চতুর্বিধ অবয়ববিশিষ্ট বাক্য উচ্চারিত হওয়ায় বাগ্‌দেবতার উক্ত চতুর্বিধ অবয়বধারণ যেন সার্থক হলো।

চতুরানন ব্রহ্মা বললেন, হে পরাক্রান্ত দেবগণ, তোমরা আজানুলম্বিত বাহুবলে ও নিজ নিজ প্রভাবে নিজ নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করছ বলেই জানি। তবু সেই নিজের নিজের অধিকার ছেড়ে সকলে একযোগে আজ উপস্থিত হয়েছ এখানে—দেখছি। তোমাদের স্বাগত সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। সব মঙ্গল ত?

আবার দেবেন্দ্রর যে বিপুল ধনু একদিন দুর্জয় বৃত্রাসুরকে নিহত করেছিল সেই অপরাজেয় ধনুর সেই সব নানা চিত্রোজ্জ্বল প্রভা আজ দেখছি না কেন? এর সকল তেজ যেন নিবে গেছে এবং ত্রিজগৎ বিজয়ী ইন্দ্রধনুর কোণগুলি যেন কিসের আঘাতে বাঁকা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তোমাদের মুখের সে প্রসন্নতা কোথায় গেল? তুষারাক্লিষ্ট নক্ষত্র-রাজির মত তোমাদের মুখ এত মলিন কেন?

শত্রুগণের একান্ত দুঃসহ, আবার বরুণের প্রধান আয়ুধ বা এই পাশ আজ তাঁর হাতে এমন নিস্তেজ হয়ে রয়েছে কেন? মন্ত্রৌষধি প্রভাবে আহতবীর্য ফণাধর কালসর্পের মত এর এ দুর্দশা কেন?

আজ কুবেরের হাতে তার সেই অজেয় গদা না থাকায় মনে হচ্ছে তার ঘোর পরাভব ঘটেছে, মনে হচ্ছে বনস্পতির শাখা-প্রশাখা কে যেন ভেঙ্গে

দিয়েছে। তাঁর মনে কি দারুণ আঘাত লেগেছে?

যম যে দণ্ডের বলে ত্রিভুবনের ধর্মরাজ বলে পরিগণিত তাঁর সে দণ্ডেরও আর আগের মত তেজ নেই। তিনি অধোবদনে সেই দণ্ড দিয়ে মাটিতে কি আঁকছেন। যমদণ্ড আজ অনলহীন অঙ্গারের মত ভূমিতে রেখাপাত করছে।

তেজঃপুঞ্জময় দ্বাদশ আদিত্যেরও আজ সে তেজ নেই। আজ আর তাঁরা আগের মত দুর্নিরীক্ষ্য নেই। আজ তাঁরা চিত্রার্পিতের মত সকলেরই পক্ষে দর্শনযোগ্য। কে যেন তাঁদের সেই চোখ ধাঁধানো দুর্ধর্ষ তেজ তুষারের মত শীতল করে দিয়েছে।

সমুদ্রগামী জলস্রোত যেমন বিপরীত দিকে ধাবিত হলে বোঝা যায় কে যেন তার গতিরোধ করেছে তেমনি মরুৎগণ বা ঊনপঞ্চাশ বায়ুও আজ বিপরীত দিকে বিশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হওয়ায় অনুমান হচ্ছে যেন তাঁদের গতিরোধ করেছে।

আজ একাদশ রুদ্রেরও দুর্দশার অন্ত নেই। আজ তাঁদের মস্তকের জটাকলাপ ঝুলে পড়েছে, এবং তাতে চন্দ্রলেখা দুলছে। একদিন তাঁরা যে মস্তক উন্নত করে হুঙ্কার ছাড়লে ত্রিভুবন কম্পিত হত, কিন্তু আজ তাঁদের সে মাধুর্য্য আর নেই।

দেবগণ পরিষ্কার করে বল কি হয়েছে? তোমরা ত সকলেই আপন আপন পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে। কোন বলবত্তর শক্তি বা বিশেষ বিধি এসে অধিকারচ্যুত করল তোমাদের?

নির্ভয়ে বল, তোমরা আমার পুত্রতুল্য। সকলে মিলে এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ তোমরা? আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি, কিন্তু সে সৃষ্টি রক্ষার ভার তোমাদের উপর। এখন বল, কি করতে হবে?

পিতামহের এই কথা শুনে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সহস্র নয়নে ইঙ্গিত করে দেবগুরু বৃহস্পতিকে পিতামহ ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। তা দেখে মনে হলো যেন মৃদুমন্দ বাতাসের হিল্লোলে সরোবরের অসংখ্য পদ্ম ঈষৎ কেঁপে উঠল।

দেবগুরু বৃহস্পতির দুটি মাত্র নয়ন হলেও জ্ঞান ও দূরদর্শিতায়

ইন্দ্রের সহস্র নয়নের থেকে সহস্রগুণে সুদক্ষ। দুইচক্ষুবিশিষ্ট বৃহস্পতিই দেবরাজের প্রকৃত চক্ষুস্থানীয়। বাগ্মী, দূরদর্শী দেবগুরু বৃহস্পতি করজোড়ে পদ্মাসন ব্রহ্মাকে বলতে লাগলেন ঃ

ভগবন! আপনি যা বলেছেন তা সবই ঠিক। আমাদের নিজ নিজ অধিকার এক প্রবল শত্রুর দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে। আপনি অন্তর্যামী, অন্তরেই বিরাজ করেন। সুতরাং আপনি আমাদের এই বিপদের কথা জানতে পারেননি?

আপনারই কাছে বরলাভ করে তারকানামে এক মহা অসুর উদ্ধত হয়ে উঠেছে। আকাশে ধূমকেতু উদিত হলে যেমন অমঙ্গলের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে জগদ্বাসী, তেমনি সেই প্রবল প্রতাপান্বিত তারকাসুরও জগৎকে আশঙ্কিত করে তুলেছে।

প্রখরকিরণ সূর্য তারকাসুরের ভয়ে ভীত হয়ে তার পুরীর ত্রিসীমানার মধ্যে আর তীব্র তাপ দান করতে পারেন না, শুধু যতটুকু কিরণে অসুরের দির্ঘিকার পদ্ম বিকশিত হতে পারে, ততটুকুই ভয়ে ভয়ে দান করেন। পাছে বেশী হয়ে পড়ে এই ভয়ে তিনি সতত কম্পিত।

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষতেই চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে তারকের পুরীতে উদিত হন এবং তার সেবা করেন। চন্দ্রশেখরের ললাটে যে সামান্য একটু চন্দ্ররেখা আছে তাই বাদ থাকে।

পাছে বায়ুভরে ফুল উড়ে বা ছিঁড়ে পড়ে এবং তিনি ফুলচুরির দায়ে ধরা পড়েন এই ভয়ে বায়ু তারকাসুরের উদ্যানে যান না, কেবল পাখায় যতটুকু হাওয়া হয় ততটুকু জোরে অসুরের পাশে থেকে তাকে হাওয়া করেন।

বসন্তাদি ছয় ঋতু নিজ নিজ ঋতুর ফুল ফুটিয়ে যুগপৎ তারকাসুরের সেবা করে। বাগানের মালী যেমন নানা গাছের ফুল দিয়ে বাগানের মালিকের সেবা করে, তেমনি ঋতুগুলিও একই সময়ে নানা ঋতুর ফুলে তারকের উদ্যান পরিপূর্ণ করে তার সামনে উপস্থিত থাকে। সেখানে ঋতুরা পর্যায়ক্রমে আসে না।

রত্নাকর বা সমুদ্র তার গর্ভজাত রত্নগুলির মধ্যে যে সব রত্ন তারকাসুরকে উপহার দেওয়ার যোগ্য সেই সব রত্নের কথাই শুধু দিনরাত ভাবে। ভাবে সেই রত্নগুলি পরিপুষ্ট হলেই তারকাকে উপহার দিয়ে তাকে খুশি করতে পারবে।

বাসুকি প্রভৃতি নাগরাজগণ রজনীকালে আপন আপন ফণাগুলি উঁচু করে তারকাসুরের চারদিকে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন। তাদের মাথার মণিগুলি জ্বলন্ত প্রদীপের নিশ্চল শিখার মত জ্বলজ্বল করতে থাকে। এইভাবে নাগরা তারকের সেবা করে। এমনই তার প্রতাপ।

তারকাসুরের একটুখানি অনুগ্রহ লাভের আশায় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের কল্পতরু হতে সমুৎপন্ন অনুপম কুসুমরাশি দূতের হাতে সর্বদা পাঠিয়ে উপহার দেন।

কিন্তু পিতামহ, এত উপকার করেও এতভাবে তার সেবা করেও তার মন পাই না, সে কোন আমাদের প্রত্যুপকার করে না। বরং যতই তার সেবা করি, যতই তার খোশামোদ করি ততই সে ত্রিভুবনকে পীড়িত করে, এমনই সে দুর্ধর্ষ।

সুরবধূদের কখনো নন্দনকাননের তরুলতার কোন পল্লব কানে পরার সখ হলে পাছে গাছেরা ব্যথা পায় তাই কত ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সেই পল্লব তুলতেন। কিন্তু নিষ্ঠুরহৃদয় তারকাসুর সেই তরুগুলির ফুল-ফল কখনো নির্দয়ভাবে ছিঁড়ছে, কখনো তাদের ডালপালা ভাঙ্গছে। এইভাবে গাছগুলির কি দুর্দশাই না করছে।

তারকাসুর যখন গভীরভাবে নিদ্রা যায় তখন যুদ্ধে বন্দী করা সুর-কামিনীগণ চামর দুলিয়ে সর্বক্ষণ বাতাস করেন। কিন্তু বেশী জোরে বাতাস করলে পাছে অসুরের নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে নিঃশ্বাসে যতটুকু বাতাস বয় ততটুকু বাতাস যাতে হয় এমনই ধীরে ধীরে চামর দুলিয়ে বাতাস করেন তাঁরা। নীরবে তাঁরা ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকেন তখন আর তাঁদের চোখের জল তাঁদের গাল ও বাহুলতার উপর পড়ে ও হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলকণা পড়তে থাকে।

উচ্চতম সৌরমণ্ডলে সূর্যের অশ্বগুলি যখন বিচরণ করে অথবা

সূর্যদেবের রথ টেনে বেড়ায় তখন সেই সব অশ্বদের ক্ষুরের আঘাতে সমুচ্চ মেরুপর্বতের যে সব শৃঙ্গগুলি উৎপাটিত হয়, তারকাসুর সেগুলি বাহুবলে বয়ে এনে তার উপবনে ক্রীড়াপর্বত ও বিহারশৈল নির্মাণ করেছে। এমনই তার ক্ষমতা।

স্বর্গলোকবাহিনী মন্দাকিনীর আর সেই পূর্বশ্রী নেই। তার মধ্যে যে জলটুকু পড়ে আছে তাও আবার দিগ্‌গজদের মদবারিতে কলুষিত। সেই মন্দাকিনীতে যে সব সোনার পদ্ম ফুটত তাদের শিকড় পর্যন্ত উপড়ে তুলে এনে দুরন্ত তারকাসুর তার নিজের সরোবরে লাগিয়েছে। মন্দাকিনীতে তাই আজ একটিও সোনার কমল ফোটে না।

কখন কোন পথ দিয়ে তারকাসুর এসে পড়বে এই ভয়ে আকাশে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে স্বর্গবাসীরা আর মর্তালোক দর্শনের সুখ অনুভব করতে পারে না।

যাজ্ঞিকরা যখন যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেন তখন আমরা যজ্ঞ-ভাগীরূপে সেখানে উপস্থিত থাকলেও কপট তারকাসুর দেবতার রূপ ধারণ করে যজ্ঞানলের মুখ হতেই আমাদের প্রাপ্য ঐ আজ্যাদি জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। অনাহারে চোখে অন্ধকার দেখি, কারণ ঐ আহুতি ছাড়া আমাদের আর কোন খাদ্য নেই।

শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অতুলনীয় অশ্ব দেবরাজের গৌরব ও গর্বের বস্তু। ঐ অশ্ব সেই দেবরাজের চিরকালসঞ্চিত অমলধবল যশোরাশির মূর্ত প্রতীক। কিন্তু সেই অশ্বরাজকে দুরন্ত অসুর বল-পূর্বক হরণ করে নিয়ে গেছে।

সেই নৃশংস তারকাসুরকে শাসিত করার জন্য যতরকম সম্ভব আমরা অনেক চেষ্টা করেছি ও করছি। কিন্তু তাকে কোনভাবেই শাসিত বা সংযত করতে পারছি না। যতই তেজোবর্ধক ওষুধ হোক না কেন, সান্নিপাতিক বিকারে যেমন কোন ফল হয় না, তেমনি তারকাসুরের ব্যাপারে আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। বলুন, আর কি উপায় আছে।

ক্রমে আমাদের জয়ের শেষ আশাও নির্মূল হলো। দুর্ধর্ষ অসুর

তারকের কণ্ঠচ্ছেদ করার জন্য বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু তাঁর সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই চক্র তার কণ্ঠদেশে লাগতেই তার কণ্ঠদেশ হতে আগুনের ফুলকি বার হতে থাকে। চক্রমুখ বেঁকে যায়। তখন সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি দেখে মনে হয় কৃষ্ণকায় অসুর যেন তার গলায় এক-ছড়া পদ্মরাগমণির হার পরেছে।

তারকাসুরের শক্তিমান হাতিগুলি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতগুলিকে পরাজিত করেছে। পর্বতের সানুদেশে দন্তাঘাত করার যে অভ্যাস আছে তাদের সেই অভ্যাসের বশে তারা পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি মেঘরাজদের গায়ে দন্তাঘাত করে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যেমন সংসারের কর্মবন্ধন ছিন্ন করার জন্য ধর্মের সাধনা করার ইচ্ছা করেন তেমনি আমরা সেই দুর্জয় অসুরকে নির্জিত করার জন্য একজন সুদক্ষ সেনাপতি প্রার্থনা করছি। আপনি ত্রিলোক সৃষ্টি করেছেন। এখন ত্রিলোক রক্ষা করার জন্য একজন সেনাপতি সৃষ্টি করুন।

আমরা এমন একজন সেনাপতি চাই যিনি দুর্ধর্ষ অসুরদের হাত হতে দেবসৈন্যদের রক্ষা করতে পারবেন এবং যাঁকে রণাঙ্গনে পুরোভাগে স্থাপন করে দেবরাজ ইন্দ্র স্ববলে বিজয়লক্ষ্মীকে বন্দী রমণীর মত উদ্ধার করেন।

দেবগুরু বৃহস্পতির এই কথা শেষ হলে পিতামহ ব্রহ্মা উত্তর দান করলেন। গুরুগম্ভীর গর্জনের পর মেঘমালা হতে যে প্রবল বর্ষণ হয় তার থেকে বেশী মনোহররূপে পিতামহের সেই গম্ভীর উক্তি প্রতিভাত হচ্ছিল।

বৎস, তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হবে, কিন্তু কিছুকাল প্রতীক্ষা করা প্রয়োজন। তোমাদের সেই প্রার্থিত সেনাপতির সৃষ্টি বিষয়ে আমি স্বয়ং আর কিছু করতে চাই না।

কারণ সেই তারকাসুর আমার বরেই এত বেড়ে উঠেছে। সুতরাং নিজে যাকে বাড়িয়েছি তাকে নিজের হাতে সংহার করতে চাই না। না জেনে কেউ যদি বৃক্ষরোপণ করে এবং পরে সেটিকে বিষবৃক্ষ বলে জানতে

পারে তাহলে সে তা নিজের হাতে কাটতে পারে না।

তারকাসুর আমার কাছে এই বরই চেয়েছিল, দেবতারাও আমাকে বধ করতে পারবে না। সে যখন কঠিন তপস্যা আরম্ভ করেছিল তার তেজে ত্রিভুবন হয়ত পুড়ে যেত। তাই তাকে আমি তার এই অভিলাষিত বর দান করেছিলাম। কোনমতে সে তপস্যার শান্তি করেছিলাম।

সেই প্রচণ্ড দৈত্য যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন ত্রিপুরারির বীর্যসম্ভূত কেউ ছাড়া কে তার প্রতাপ সহ্য করতে পারবে?

তমোগুণের অতীত পরমাত্মরূপী মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ, প্রকৃত মাহাত্ম্য আমি বা বিষ্ণু সঠিক জানি না। তিনি এতই বড়।

সেই জ্যোতির্ময় মহাদেব এখন তপস্যায় সমাহিত। অয়স্কান্ত মণির দ্বারা যেমন অতি কঠিন লোহাকেও আকর্ষণ করা যায় তেমনি ত্রিলোকসুন্দরী উমার সৌন্দর্যের দ্বারা শম্ভুর সমাধিনিশ্চল হৃদয়কে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করো।

এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার এবং অষ্টমূর্তিকারী শম্ভুর জলময়ী বীর্য একমাত্র হিমালয়কন্যা উমাই ধারণ করতে পারে।

সেই নীলকন্ঠ শিবের আত্মা অর্থাৎ উমার গর্ভজাত শম্ভুর সেই পুত্রই তোমাদের সেনাপতিরূপে অসুরযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আপন বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী সুরকামিনীদের বিরহবন্ধ বেণী মোচন করবেন। অসুরদের পরাজিত করে তাঁদের উদ্ধার করবেন।

এই উপদেশ দান করেই জগৎকারণ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। দেবতারাও মনে মনে কর্তব্য স্থির করে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র মহাদেবের হৃদয় দ্রবীভূত করার বিষয়ে কন্দর্পকেই সমর্থ মনে করে তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধির জন্য দ্বিগুণবেগে তাঁকে স্মরণ করলেন।

স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভুবনমোহন মদন এসে হাজির হলেন ইন্দ্রের কাছে। তিনি ছুটে এসেছেন। তখন তাঁর কণ্ঠদেশে প্রণয়িণী রতির হাতের বালার দাগ দেখা যাচ্ছিল। তখনো সে গাঢ় আলিঙ্গনের দাগ মিলিয়ে যায়নি। সুন্দর পুষ্পধনুটি ঝোলানো ছিল তাঁর কাঁধে।

দেখে মনে হচ্ছিল যেন লাবণ্যময়ী রমণীর সুললিত ভ্রূলতা। তাঁর সঙ্গে ছিল মদনের চিরসখা বসন্ত, আর সেই বসন্তের হাতে পঞ্চবাণ আমের মুকুল। এইরকম মনোহর রূপে দেবসভায় এসে উপনীত হলেন রতিপতি কন্দর্প।

তৃতীয় সর্গ

দেবরাজ ইন্দ্র যখন দেবসভায় বসে ছিলেন এমন সময় মদন গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সহস্র লোচনই একসঙ্গে পড়ল মদনের উপর। প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের দিকে না তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে মদনকে স্বাগত জানালেন। প্রয়োজন পড়লে নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তিও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে প্রভুর।

ইন্দ্র মদনকে টেনে নিয়ে সিংহাসনের পাশে বসালেন। ইন্দ্র তাঁকে এইভাবে সমাদরের সঙ্গে আসন দান করলে নিজেকে ধন্য মনে করলেন কন্দর্প। ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে তিনি মাথা নিচু করে বিনয়ের সঙ্গে ইন্দ্রকে বললেন ঃ

হে দেব, আজ্ঞা করুন, ত্রিজগতের মধ্যে কোথায় কি কাজ করতে হবে। আমাকে আপনি দয়া করে স্মরণ করেছেন এটাই আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আমি চাই আপনি কোন না কোন কর্ম সম্পাদনের আদেশ দিয়ে আমার সে সৌভাগ্যকে বর্ধিত করুন। কোন ব্যক্তি কি আপনার ইন্দ্রত্বপদ কেড়ে নেবার আশায় দীর্ঘকঠোর তপস্যায় রত হয়ে আপনার অসূয়াভাজন হয়েছে? কে সে আহাম্মক, তার নামটা বলুন। আমার ফুলধনুর শক্তির কথা আপনি জানেন। আমি এখনই পুষ্পধনুর এক বাণে তাকে এমনই জর্জরিত করে তুলব যে সে আমার যে কোন নির্দেশ নির্বিবাদে পালন করবে।

আপনি যাকে চান না এমন কোন ব্যক্তি কি জন্ম-জরা-মৃত্যু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ অনন্ত ক্লেশকর এই সংসারজীবন হতে চিরনির্বাণ লাভের

জন্যই কি মুক্তিপথের সাধনা করছে ? দুদিন পর সে হয়ত আপনার এই রাজ্যে এসে উপস্থিত হবে। বলুন তার পরিচয়। আমি এখনই তার কাছে এমনই একদল সুন্দরীকে পাঠিয়ে দেব যারা তার সামনে গিয়ে ভ্রূলতার কম্পনে অতি মনোহর ও মদির কটাক্ষ হানবে আর সেই কটাক্ষের প্রভাবে তার সব সাধনা ও জপ তপ সব রসাতলে যাবে। ফলে সে আবার সংসারপাশে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

প্রবীণ শুক্রাচার্যের কাছে ধর্ম, অর্থ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে যিনি জিতেন্দ্রিয় ও জটিল সংসার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করেছেন বলে গর্ববোধ করেন, এমন কোন ব্যক্তিও আমার হাত হতে অব্যাহতি পাবে না। আপনি তার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার অনুরাগরূপ গুপ্তচরকে পাঠিয়ে তার সব গর্ব খর্ব করব। বর্ষার অতি বেগবান ও বর্ধিত জলপ্রবাহ যেমন নদীর দুই তীরকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় তেমনি আমিও আপনার সেই শত্রুর সকল ধর্মকর্ম সমূলে বিনাশ করব।

কোন পতিব্রতা সুন্দরী তার দেহসৌন্দর্যে আপনার মনকে কি চঞ্চল করে তুলেছে ? তার নামটা বললেই আমি সেই নিতম্বিনী কামিনীর এমন অবস্থা করব যাতে সে লজ্জার মাথায় পদাঘাত করে এখনি এসে আপনার কণ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ করবে।

হে কামিন ! আপনি কি কোন উদ্ধতমদা চণ্ডবেগা কামিনীর কাছে কামযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন অথবা কি কোন অপরাধের জন্য তার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন ? আপনি কি তার পায়ে পড়লেও সে ক্ষমা করেনি ? তার নামটা বললে আমি তার এমন অবস্থা করব যে সে কামতাপে জর্জরিত হয়ে পল্লবশয্যায় পড়ে অনুতাপে ছটফট করবে।

হে বীর, প্রসন্ন হয়ে আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। আপনার অমোঘ বজ্রাস্ত্র এখন বিশ্রাম করুক কিছুকাল। দেবতাদের মধ্যে এমন কোন শত্রু আছে, এমন কোন সৈন্য আছে, আমার বাণের আঘাতে যার ভুজবীর্য ব্যর্থ না হবে ? আমার বাণের আঘাতে সে এমনই হীনবল হয়ে পড়বে যে সে সুন্দরীদের রোষকম্পিত অধরের দিকে তাকালেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। আপনার দয়ায় ত্রিভুবনে আমার অসাধ্য কাজ কিছুই

নেই। আমার সখা ঋতুরাজ বসন্তকে যদি সহচররূপে পাই, তাহলে সংহারমূর্তি পিনাকপানি ত্রিপুরারিরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারি। অন্যান্য ধনুর্ধরের কথা ছেড়েই দিলাম।

প্রয়োজন হলে মদন হরেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারেন—এই কথায় ইন্দ্রের আহ্লাদের সীমা রইল না। তিনি উরুদেশ হতে একখানি পা নামিয়ে পাদপীঠের উপর ভর দিয়ে বসলেন। ইন্দ্র হরের সমাধি ভঙ্গের যে উপায়ের কথা ভাবছিলেন মদন সেই কথাই বলে ফেললেন। তিনি আহ্লাদিত হয়ে মদনকে বললেন ঃ

হে সখে, তুমি যা যা বললে তা সবই তোমাতে সম্ভব। তোমার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে আমার দুটি অস্ত্র—একটি আমার বজ্র আর একটি হলো তুমি। তপস্যার বলে যারা বলীয়ান, তাদের ক্ষেত্রে আমার বজ্রের কোন প্রভাব খাটে না। কিন্তু এমন কোন বীর বা বলীয়ান নেই যেখানে তোমার গতিবিধি নেই, এমন কোন কাজ নেই যা তুমি করতে পার না।

বন্ধু, তোমার সামর্থ্য আমি জানি বলেই একটি গুরুতর কার্যে নিযুক্ত করতে চাই আজ তোমাকে।

তোমাকে আপনার জন ভাবি বলেই এতবড় কাজের ভার তোমার উপর দিচ্ছি। শেষ বা অনন্তনাগ পৃথিবীকে ধারণ করতে সমর্থ জেনেই বিষ্ণু তা ধারণ করার জন্য অনন্তকে নিযুক্ত করেছিলেন।

বৃষধ্বজ মহাদেবকে পর্যন্ত তোমার ফুলশরের দ্বারা বিব্রত করে তুলতে পার—তোমার নিজের এই উক্তির দ্বারা আমার কার্য সম্পাদনের আভাস দিয়েছে। যজ্ঞভাগী দেবতারা এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। সে শত্রুর অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠেছেন তাঁরা। এখন তাঁদের অভিপ্রায়ের কথা বলছি তোমায়।

এই দেবতারা চান—শিববীর্য হতে সমুৎপন্ন একজন সেনাপতি, তাহলেই এঁরা অসুরযুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন। কিন্তু মহাদেব এখন সমাধিমগ্ন এবং মন্ত্রজপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে লীন। তবু তোমার একটি ফুলশরেই তিনি দেবতাদের অভিপ্রায়ের

অনুরূপ কার্য সাধন করবেন। একার্য একমাত্র তুমিই পার, অন্যের তা অসাধ্য।

সেই সংযতহৃদয় মহাদেব যাতে পরম সংযমসাধিকা হিমালয়কন্যা পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত হন, সেই কাজটুকু তোমায় করতেই হবে। সারা ত্রিভুবনের রমণীকুলের মধ্যে একমাত্র পার্বতীই তাঁর বীর্য ধারণে সমর্থ—একথা পিতামহ ব্রহ্মা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পিতা হিমালয়ের অনুমতিক্রমে পার্বতী সেই পর্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে তপস্যারত মহাদেবের সেবা করতে গেছেন। এই সংবাদ আমি আমার গুপ্তচররূপিণী অপ্সরাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। সুতরাং পার্বতীকে তুমি সেখানেই পাবে।

সুতরাং কালবিলম্ব না করে দেবকার্যসিদ্ধির জন্য যাত্রা করো। যদিও এই কার্য হরের হৃদয় আকর্ষণরূপ ব্যাপার, তথাপি পার্বতীরূপ কারণ ছাড়া একার্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। বীজের দ্বারাই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ঠিক, কিন্তু জলসেচ ছাড়া অঙ্কুর জন্মায় না। এক্ষেত্রে তুমিই বারিতুল্য।

এই দেববৃন্দের বিজয়লাভের একমাত্র কারণ সেই শূলপানির প্রতি তোমার অস্ত্র প্রযুক্ত হবে। তাহলে সার্থক হবে তোমার ফুলশর ও বাণ। অতি সাধারণ একটা কাজ কেউ প্রথম করতে পারলে তাতে তার খ্যাতি হয়। সুতরাং এতবড় একটা কাজ যদি তুমি করতে পার তাহলে তাতে অনন্ত কীর্তির অধিকারী হবে তুমি।

স্বর্গরাজ্যের ত্রিলোকপূজ্য দেবতারা আজ তোমার কৃপাপ্রার্থী। তাছাড়া এ কাজ ত্রিজগতের মঙ্গলজনক। অথচ এ কাজে কোন হিংসা নেই, এতে কারো জীবননাশ করতে হবে না। তোমার ফুলধনুকের দ্বারাই সিদ্ধ হবে এ কার্য। সত্যিই তুমি এক অতুলনীয় বীর।

হে মন্মথ, যদিও একাই তুমি এ কাজ করতে পার, তবু তোমার চির-সহচর ঋতুরাজ বসন্ত তোমার সহায় হবে আপনা হতে। আগুন জ্বলে উঠলে বাতাস আপনা হতেই এসে প্রবলভাবে বয়ে সে আগুনকে বাড়িয়ে দেয়। আগুনকে ছেড়ে বাতাস যেমন থাকতে পারে না; তেমনি তোমাকে

ছেড়ে মধুমাসও থাকতে পারে না।

মদন আনতমস্তকে দেবরাজের আদেশ শিরোধার্য করে প্রস্থানের জন্য উদ্যত হলেন। তাঁর মনে হলো এই আদেশ যেন প্রভুর প্রসাদদত্ত মালা। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রও মদনের অঙ্গ স্পর্শ করে আপ্যায়িত করলেন তাঁকে। দেবরাজের ঐ হাত তাঁর অতিপ্রিয় ঐরাবতের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে তাকে চাপড় মারায় তা কর্কশ হয়ে উঠেছিল। মদন সেই করস্পর্শে সম্মানিত মনে করলেন নিজেকে।

তখন মদন হিমালয়ে অবস্থিত মহাদেবের আশ্রমে গমন করলেন। তাঁর চিরসখা বসন্ত ও চির-অনুরাগিণী পত্নী রতিও তাঁর সঙ্গে চলল। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, আমার এতে মৃত্যু হলেও দেবরাজের আদেশ আমি পালন করব। তবু আশঙ্কায় তাঁদের হৃদয় কাঁপতে লাগল।

তাঁরা রুদ্রদেবের সেই তপোবনে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শান্তস্নিগ্ধ আশ্রমে তপস্যা ও যোগসমাধির পরিপন্থী বসন্তঋতু সেখানে আত্মপ্রকাশ করল। ফলে তপোবন পরিণত হয়ে উঠল বিলাসীর উপবনে। তপোবনে এইভাবে অকাল বসন্তের আগমনে মদনও উৎসাহিতবোধ করলেন।

সূর্যের উত্তরায়ণেই বসন্তের মলয় বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণায়ণে অবস্থানকালের নির্ধারিত সময় পার হবার আগেই সূর্যদেব হঠাৎ উত্তর-দিকে গমন করতে থাকলে পরিত্যক্তা দক্ষিণ দিক দক্ষিণা বায়ু বা মলয়-সমীরণ প্রবাহিত করল। তা দেখে মনে হলো পতিব্রতা স্ত্রীকে সহসা ত্যাগ করে তার স্বামী অন্য কোন রমণীর নিকট গেলে সেই পতিব্রতা নারী যেমন কোন বাদ প্রতিবাদ না করে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তেমনি দক্ষিণা দিকও সূর্য তাকে অসময়ে ত্যাগ করে গেলে মলয় বাতাসরূপ দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল নীরবে। যে অশোকতরুতে অকালে ফুল ফোটাতে হলে সুন্দরীদের নূপুরপিঞ্জরমুখর পদাঘাতের প্রয়োজন হয়, সেই অশোকতরুর স্কন্দ হতে কচি পল্লবটি পর্যন্ত ফুলে ফুলে ভরে গেল।

আম্রবক্ষে কচি কচি নতুন পল্লব ও পাতা দেখা দিল। ঝাঁকে ঝাঁকে

ভ্রমর গিয়ে বসল তার উপর। লাল পল্লবের উপর কালো কালো ভ্রমর বসায় এক অপূর্ব শোভা দৃষ্ট হলো। তা দেখে মনে হলো বসন্ত ঋতু পঞ্চবাণের প্রধান বাণ চ্যুতমুকুলের উপর ভ্রমরচ্ছলে লিখে দিল।

সোনালী রঙের কর্ণিকা ফুলের শোভায় বনভূমি জ্বল জ্বল করতে লাগল। কিন্তু সে ফুলে গন্ধ না থাকায় মনে বড় আঘাত লাগল। বিশ্বস্রষ্টার এটাই হলো রীতি। গুণে রূপে কোন বস্তুকেই তিনি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করেন না। সবেতেই একটু খুঁত রেখে দেন।

ভাল করে ফোটেনি বলে পলাশফুলের লাল কুঁড়িগুলিকে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা দেখা যেতে লাগল। মনে হলো, বনস্থলীরূপিনী নায়িকারা অচিরাগত নববসন্তরূপ নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তাই তাদের সর্বাঙ্গে অসহিষ্ণু নায়ক ঋতুরাজ বসন্তের নখচিহ্নগুলি শোনিতোচ্ছলরূপে দেখা যাচ্ছে।

বসন্তের সৌন্দর্যলক্ষ্মী সুন্দরী ললনার মত নিজেকে সজ্জিত করতে বসলেন। ঘনকৃষ্ণ ভ্রমরকুল তার চঞ্চল নয়নে কজ্জলরচনার কাজ করল। বসন্তের প্রারম্ভে তিলফুলগুলি ফোটায় ও তাতে ভ্রমর বসায় তাঁর বসনে কজ্জলচিহ্নশোভিত পত্ররচনার অভাব পূরণ করল। এদিকে বালসূর্যের মত সুন্দর অরুণরাগে চ্যুতমুকুল শোভিত হওয়ায় মনে হতে লাগল বসন্তলক্ষ্মী সুকোমল অধর লাক্ষা রাগে রঞ্জিত করেছেন।

নববসন্ত সমাগমে প্রকৃতিচঞ্চল মৃগগুলি অত্যন্ত মদোদ্ধত ও চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সুখস্পর্শ দক্ষিণ বাতাসের প্রতিকূলে উল্লাসভরে ছোটাছুটি করতে লাগল। পিয়ালতরুর বিকশিত মঞ্জরীগুলি হতে পরাগ উড়ে এসে তাদের আকর্ণবিস্তৃত নয়নে পড়ে তাদের প্রায় অন্ধ করে ফেলল। তাই তারা ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল। তাদের এই ছোটাছুটিতে সমগ্র বনভূমি তরুতলপাতিত শুষ্ক পত্রের মর্মর-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। চারাপাতার উপর মৃগগুলি লাফাতে থাকায় বনের মর্মরধ্বনি আরো জোরালো হয়ে উঠল।

অচিরবিকশিত সহকারমঞ্জরী চিবিয়ে চিবিয়ে কোকিলগুলি

তাদের সুমধুর কুহুস্বরে সারা তপোবন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলল। যে সব অভিমানিনীরা মান করে বসেছিল ঐ কুহুধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই মান ঝেড়ে ফেলে মানের শিরে পদাঘাত করল।

হিমালয়ের দুরন্ত হিমে ও তীব্র কনকনে শীতে কোমলাঙ্গী কিংপুরুষ কামিনীদের সুকোমল অধর ফেটে যেত বলে তারা অধরে কপোলে কুঙ্কুম লেপন করত। এখন আর সেই হিম বা শীতের তীব্রতা না থাকায় অধরে বা গণ্ডদেশে লাল কুঙ্কুম লেপন করে না। তাই এখন তাদের ওষ্ঠ সাদা ও মুখচ্ছবি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। তাদের সুন্দর মুখে বসন্ত সমাগমে আবার কিছু কিছু ঘাম দেখা দেওয়ায় তাদের গণ্ডে ও কপোলে যে সব পত্ররচনা ছিল তা লেপটে গেছে।

সেই রুদ্রতপোবনবাসী তপস্বীরা অকস্মাৎ অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিকার দেখা দিল তাঁদের তপোসংযত চিত্তে। তাঁরা তা বুঝতে পেরে সেই চিত্তবিকার দমন করে মনটাকে সংযত করে তুললেন।

মদন তাঁর প্রিয়তমা রতির সঙ্গে তাঁর ধনুতে ফুলেব বাণ জুড়ে যখন মহাদেবের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন সেখানকার সকল জীবজন্তুর মধ্যে এক ভাববিকার দেখা দিল। তারা সকলে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয়ে প্রণয়রসসিক্ত এক ভাবের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে শৃঙ্গার ও রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতে লাগল।

বসন্তের আবির্ভাবে ফুলগুলি মকরন্দ বা মধুতে পূর্ণ হয়ে উঠলে ভ্রমরপঙক্তি মধুপানের জন্য সেই সব ফুলে গিয়ে বসল। প্রথমে ভ্রমরেবা মধুপান করার পর তাদের পীত অবশিষ্ট মধু তাদের প্রিয়া ভ্রমরীরা পান করতে লাগল। এমন সময় সেই কুলগাছের তলায় প্রেমালস কৃষ্ণসার মৃগগুলি তাদের শৃঙ্গের অগ্রভাগ গিয়ে মৃগীদের নয়ন কণ্ডুয়ন করে দিতে লাগল। চির আকাঙ্খিত প্রিয়তমের স্পর্শে সুখের আবেশে তন্দ্রালস হয়ে পড়ল মৃগীরা।

হস্তিনীরা পদ্মপূর্ণ জলাশয়ে জলপান করতে গিয়ে দেখল

পদ্মপরাগে আচ্ছন্ন সারা জলাশয়ের জল সুগন্ধী হয়ে উঠেছে। তাই সেই সুগন্ধী জল একা পান করতে না পেরে শুঁড় দিয়ে কিছুটা টেনে নিয়ে তার পাশে প্রিয়তম হস্তীর মুখে জলপূর্ণ শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিয়ে তার প্রিয়তমকে জলপান করাতে লাগল। আর সেই জলাশয়েরই তীরে চক্রবাক পদ্মের মৃণাল খেতে গিয়ে খানিকটা খেয়ে বাকিটুকু তার প্রিয়তমা চক্রবাকীকে দিল।

কিন্নর কিন্নরীরা মুখে গালে কপোলে সুগন্ধী অনুলেপনের দ্বারা পত্ররচনা করত। বসন্ত সমাগমে তারা উল্লসিত হয়ে গান গাইতে লাগল আর গীতিশ্রমের জন্য তাদের পত্রশোভিত মুখে কিছু কিছু ঘাম ফুটে উঠল। তার উপর আবার পুষ্পরস দিয়ে তৈরী মদ্য পান করে নেশায় তাদের আকর্ণবিস্তৃত নয়নগুলি ঢুলু ঢুলু করতে লাগল। এইসব দেখে শুনে কিন্নরেরা স্থির থাকতে না পেরে গানের মধ্যেই তাদের প্রিয়াদের মুখচুম্বন করতে লাগল।

অকালবসন্তের আগমনে গাছগুলি নবপল্লব ও নব নব শাখায় নত হয়ে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে আর তরুণ লতাগুলিও থোকা থোকা ফুলের ভারে ঝুঁকে পড়ে গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে নিমেষে গাছের উপর দিকে উঠতে লাগল। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে ঐ লতাদের আরক্ত পল্লবগুলি কাঁপতে লাগল। তা দেখে মনে হলো, লতারূপিনী বধূরা যেন কুসুম-গুচ্ছরূপ পীনস্তনভারে আনত হয়ে তরুরূপ প্রিয়তমাদের আলিঙ্গন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আর তাদের আরক্ত পল্লবরূপ মনোহর অধর আবেগভরে কাঁপছে। প্রিয়তম তরুগণও তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনার্থিনী আপন আপন প্রিয়তমাদের সাদরে বরণ করে নিচ্ছে। বাহুপাশে তাদের বেঁধে ফেলছে।

নববসন্ত সমাগমে মধুরকণ্ঠী দিব্যাঙ্গনাদের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করেও কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য হলো না মহাদেবের। তিনি বরং আরো বেশী করে আত্মানুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, নিজেরাই নিজেদের প্রভু, কোনরূপ বিঘ্ন তাঁদের সমাধি ভঙ্গ করতে পারে না।

শঙ্করের পরম ভক্ত কিঙ্কর নন্দী বাম হস্তে একগাছি স্বর্ণবেত্রে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সমাধিমগ্ন মহাদেবের লতাগৃহদ্বার পাহারা দিচ্ছিলেন। বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত ও চমকিত হলেন তিনি। প্রমথদের চিত্তবিকার দেখে বিরক্তির উদ্রেক হলো তাঁর মনে। কিন্তু পাছে মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ হয় তাই তিনি একটি কথাও বললেন না। তিনি কেবল তাঁর তর্জনী ঈষৎ কম্পিত করে ইঙ্গিতে সকলকে চুপ করতে বললেন।

নন্দীর এক ইঙ্গিতেই কেবল প্রমথগণ নয়, তৎক্ষণাৎ নীরব ও নিস্পন্দ হয়ে উঠল সমগ্র বনভূমি। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণ। তরুরাজি, ভ্রমর পঙক্তি, পক্ষিকুল, মৃগদল—সব নীরব হয়ে গেল। নন্দীর ভাব তর্জনী হেলনে সমগ্র বনভূমি যেন চিত্রার্পিতের মত স্পন্দনশূন্য হয়ে উঠল।

মদন তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নন্দীর পিছন দিক দিয়ে মহাদেবের ধ্যানস্থানের পার্শ্ববর্তী শাখাঘন পুন্নাগবৃক্ষের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, বিষম নয়নের ঐ স্থান তাঁর পক্ষে সামনে শুক্রযুক্ত স্থানের মতই সর্বনাশকর।

মদন এইভাবে গাছের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন, এক অতিবিশাল দেবদারু গাছের মূলদেশ বেদির মত বাঁকানো এবং সেই বেদির উপর বাঘছাল বিছানো। তার উপর পরম সংযমশীল ত্রিলোচন সমাধিমগ্ন।

মদন দেখলেন, মহাযোগী মহেশ্বর বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ নিশ্চল, সরল ও সমুন্নত। স্কন্ধদ্বয় সন্নতভাবে অবস্থিত। তাঁর হাতদুটি কোলের উপর উত্তানভাবে সন্নিবেশিত থাকায় মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটি শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

তাঁর জটাজাল কালসর্পের দ্বারা চূড়ার মত উন্নত করে আবদ্ধ। কর্ণদ্বয় দ্বিগুণীকৃত রুদ্রাক্ষের মালার অবতংসযুক্ত। কণ্ঠদেশের কাছে উভয় মুখের গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম ধারণ করে আছেন তিনি। নীলকণ্ঠের নীল আভায় সেই চর্মও নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন।

তাঁর তিনটি নয়ন নাসিকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করে নিহিত ছিল এবং তাদের তারাগুলি ছিল স্তিমিত ও নিশ্চল। তাদের মধ্যে কোন উগ্রতা বা তীব্রতা ছিল না। তাঁর ভ্রূগুলির মধ্যেও কোন চাঞ্চল্য ছিল না। সেগুলি চিত্রিতের মত মনে হচ্ছিল। সেই স্পন্দনহীন, স্থির, অর্ধনিমীলিত নেত্রত্রয় নাসাগ্রে নিহিত থাকায় তা হতে নিম্নদিকে একটা জ্যোতি ইতস্ততঃ নিঃসৃত হচ্ছিল।

ত্রিলোচন তখন শরীরমধ্যবর্তী বায়ুগণকে রোধ করে রেখেছিলেন এ কারণ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির আড়ম্বর নেই, এমন একখানি জলভরা গম্ভীর মেঘ অথবা তরঙ্গসংঘাতহীন প্রশান্ত সমুদ্র অথবা বায়ু-প্রবাহবর্জিত স্থানে অবস্থিত একটি নিশ্চল শিখাধারী একটি প্রদীপ।

কন্দর্প দেখলেন, সমাধিমগ্ন ত্রিলোচনের ললাটনেত্রের মধ্য হতে জ্যোতির শিখা বা আলোর ধারা বার হচ্ছে। ঐ জ্যোতির শিখা চন্দ্র-শেখরের শিরোদেশ হতে উদ্গত হয়ে নেত্রপথে বার হচ্ছিল। স্তিমিত নয়ন ত্রিলোচনের মৃণালসূত্রের থেকেও কোমল শিরঃস্থিত চন্দ্রকলাকে যেন ঝলসিয়ে দিচ্ছিল।

সেই যোগমগ্ন ত্রিপুরারি যোগবলে দেহের নবদ্বার হতে নিবৃত্ত করে নিজের মনকে হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে সংস্থাপিত করে রেখেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাকে অবিনাশী ও সনাতন বলে জানেন, সেই আত্মাকে নিজের মধ্যে সাক্ষাৎ করছেন।

মদন কিছুদূর থেকে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের এই বিষম নয়নকে দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। অমন ভীষণতম নয়নত্রয়বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রুদ্রকে আক্রমণের কল্পনা করতেও ভয় হতে লাগল তাঁর। শিথিল হয়ে আসতে লাগল তাঁর অঙ্গের গ্রন্থিগুলি। কোন মুহূর্তে যে মদনের হাত হতে ফুলধনু ও বাণ খসে পড়ল তা তিনি বুঝতেই পারলেন না।

যোগমগ্ন মহেশ্বরের ললাটপানে তাকিয়েই এইভাবে মদন যখন হতচৈতন্যপ্রায় হয়ে উঠলেন তখন পর্বতরাজ হিমালয়কন্যা উমা তাঁর সহচরীরূপী দুজন বনদেবতাকে সঙ্গে করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উমার যে দেহসৌন্দর্যে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই

দেহসৌন্দর্য দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে মদনের নির্বাপিতপ্রায় বীর্যবহ্নি আবার জ্বলে উঠল।

পার্বতী বসন্তকুসুমের কতকগুলি আভরণে সেজে এসেছিলেন। অরুণবর্ণ অশোকপুষ্প পদ্মরাগমণিকেও হার মানিয়েছিল। কর্ণিকার-কুসুম সুবর্ণের মত শোভা পাচ্ছিল। অমলধবল সিন্ধুবার পুষ্পের মালা মুক্তার হারের অভাব পূরণ করেছিল।

পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে তিনি যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। প্রভাতের অরুণরাগের মত আরক্ত বল্কলবসন পরেছিলেন তিনি। এই সব সাজসজ্জায় সজ্জিতা মন্থরগমনা পার্বতীকে দেখে মনে হচ্ছিল, কুসুমস্তবকের ভারে অবনতা একটি লতা ধীর গমনে চলে আসছে।

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতী একটি বকুলমালাকে চন্দ্রহার করে পরে-ছিলেন। তা আবার নিতম্ব দেশ হতে বারবার খসে পড়ছিল আব বারবার তিনি হাত দিয়ে তা ধারণ করছিলেন। তাঁর সেই নিতম্ব-বর্তিনী বকুলমালা দেখে মনে হচ্ছিল, কামদেব তাঁর ধনুকের একটি গুণ বা ছিলা পার্বতীর ঐ নিতম্ববিম্বে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

একটি ভ্রমর তাঁর সুগন্ধী নিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে বিম্বফলতুল্য অধরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দংশনভয়ে তিনি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে হস্তধৃত পদ্মদ্বারা তাকে বারবার নিবারণ কর-ছিলেন।

তাঁকে দেখে কামকান্তা রতিও লজ্জা পাচ্ছিলেন। এমন অনবদ্য সৌন্দর্যশালিনী পার্বতীকে দর্শন করে তাঁর মনে এই আশার সঞ্চার হলো যে, মহাদেব যতই জিতেন্দ্রিয় হোন, এই রূপলাবণ্যের সাহায্যে তিনি ফুলশর নিক্ষেপ করে কৃতকার্য হতে পারেন।

এমন সময় উমা গিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রাণেশ্বরের সমাধিকুটিরের দ্বারদেশে দেখা দিলেন। ঠিক সেই সময় মহাযোগী শম্ভুও হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার জ্যোতি দর্শন করে কিছুক্ষণের জন্য যোগবিরত হলেন।

যোগবিরত মহেশ্বর এবার ধীরে ধীরে যখন তাঁর প্রাণায়ামধৃত প্রাণ-

বায়ুকে ছাড়তে লাগলেন, তখন তাঁর দেহও পূর্ব অবস্থায় ফিরে এল এবং খুব বেশী ভারযুক্ত হলো। তাঁর ভারে পর্বতোপরি যোগস্থানটি বসে যেতে লাগল। তখন ধরিত্রীধারণকারী বাসুকি নাগ চাপ পেয়ে ফণাগ্রভাগ উঁচু করে তুলে বীরাসনে উপবিষ্ট মহাদেবও তাঁর আসনটি শিথিল করে দিলেন।

এই সময় দ্বাররক্ষী নন্দী গিয়ে মহাদেবকে জানালেন শৈলসুতা অর্থাৎ হিমালয়কন্যা তাঁর সেবা করতে এসেছেন। মহাদেবও ভ্রূকম্পদ্বারা তাঁকে আসতে অনুমতি দিলেন। নন্দী তখন উমাকে মহাদেবের সাধনকুটিরে পাঠিয়ে দিলেন।

উমা যখন মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সখীদ্বয় তাদের নিজেদের হাতে চয়ন করা বসন্তের ফুল ও পল্লবগুলি মহাদেবের চরণ মূলে অঞ্জলি দিলেন।

পার্বতী এবার তাঁর চিরপ্রার্থিত বৃষধ্বজকে প্রণাম করলেন। প্রণাম-কালে তাঁর আনত মস্তক হতে নীলবর্ণ কেশকলাপের মধ্যে শোভিত নবীন কর্ণিকার কুসুম ও কর্ণের অবতংসরূপী নবপল্লব একই সঙ্গে খসে পড়ল মাটিতে। উমার মত একজন ত্রিলোকসুন্দরী যুবতী তাঁকে প্রণাম করলেও মহাদেবের কোন ভাবান্তর ঘটল না।

কিন্তু মহাদেব প্রণতা পার্বতীকে আশীর্বাদ করলেন, এমন পতি প্রাপ্ত হবে যিনি তোমাকে ছাড়া আর কারো দিকে চাইবেন না। মহাদেবের এই আশীর্বাদ পরবর্তী জীবনে বর্ণে বর্ণে সফল হয়েছিল। পরমেশ্বর মহাদেবের উক্তি কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।

কামদেব সুযোগ বুঝে তাঁর ফুলধনুটিকে তুলে ধরে মহাদেবকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। ভাবলেন, উমা আর একটু অগ্রসর হলেই তিনি বাণ বিক্ষেপ করবেন। এইভাবে তিনি পতঙ্গের মত না জেনে মহাদেবের লোচনবহ্নিতে দগ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ত্রিলোচনের ভীষণ মূর্তি দর্শনে কোনক্রমেই সাহসে ভর করে শর নিক্ষেপ করতে পারলেন না।

পার্বতী মন্দাকিনী হতে নিজের হাতে পদ্ম তুলে সেই পদ্মের বীজ

সূর্যের কিরণে শুষ্ক করে সেই সব ভ্রমরকৃষ্ণ পদ্মবীজ দিয়ে একছড়া অতিসুন্দর জপমালা গেঁথেছিলেন। আজ সেই মালা নিজের পল্লবতুল্য হাতে করে নিয়ে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চন্দ্রশেখরের বাঞ্ছিত চরণে তা উপহার দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

ভক্তের প্রিয় ত্রিলোচন যেমন সেই মালাটি উমার আরক্ত করপল্লব হতে গ্রহণ করার জন্য হাতটি তোলার উপক্রম করলেন অমনি কামদেবও তাঁর অমোঘ সম্মোহন বাণ পুষ্পধনুতে সংযোজন করলেন।

আকাশে চন্দ্র উদিত হলে সমুদ্রের জলরাশি যেমন কিছুটা চঞ্চল ও উত্তাল হয়ে ওঠে তেমনি কন্দর্পের বাণসন্ধানের ফলে মহাদেবেরও ধৈর্য কিছুটা টলে উঠল। বিম্বাধরা উমার বদন কমলের উপর মহাদেবের তিনটি নয়নই যেন একই সঙ্গে পতিত হবার উপক্রম হলো।

এদিকে শৈলসুতা উমারও কিছুটা ভাবান্তর ঘটল। তাঁর দেহযষ্টি অচিরোদ্গত নবীন কদম্বের মত কন্টকিত হয়ে উঠল। তিনি ত্রিলোচনের দিকে লজ্জায় আর চাইতে পারলেন না। তিনি কেবল আনত নয়নে মুখখানি ফিরিয়ে ত্রিলোচনের সামনে চিত্রার্পিতের মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহাদেব নিজের চিত্তের এই আকস্মিক চাঞ্চল্যে বিরক্ত হলেন। কিন্তু নিমেষ মধ্যেই জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে সে চাঞ্চল্য সব দূরীভূত করে ফেললেন। এই চিত্তবিকারের কারণ কি তা দেখার জন্য রোষ-কশায়িত নয়নে চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

অদূরে নয়নোক্ষেপে উদ্যত মদনকে দেখতে পেলেন।

তপস্যার প্রতি এই আক্রমণের জন্য রুদ্রের ক্রোধের আর সীমা রইল না। তাঁর তিনটি নয়নই ধক ধক করে জ্বলে উঠল। সহসা ত্রিলোচনের সেই রোষারক্ত ললাট নয়ন থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বার হতে লাগল।

এ ব্যাপারে সর্বনাশের আশঙ্কায় দেববৃন্দ আগে হতেই আকাশে উপস্থিত ছিলেন। শিবের রোষরুদ্র নয়ন হতে উদ্গীরিত এই অগ্নিশিক্ষা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, মদনের আর নিস্তার নেই। তাঁরা তখন হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ

সংবরণ করুন, বলে চীৎকার করে উঠলেন। কিন্তু দেবতাদের এই আবেদন ধ্বনি যখন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, মর্ত্যে এসে পেঁছিতে পারেনি তখন মহাদেবের সেই নেত্রানলে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন মদন।

কামদেবপত্নী রতি এই মহাদেবের ললাটনেত্রের অগ্নিশিখা দেখেই ভয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রুদ্রের এই ভয়ঙ্কর রোষানল ভস্মীভূত করে ফেলবে তাঁর প্রিয়তমকে। কিন্তু মদন যখন সত্যি সত্যিই সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেলেন তখন তাঁর স্বামীর এই সর্বনাশের সকরুণ দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন না। সেই মূর্ছাবস্থা ও অজ্ঞানতা সর্বনাশের এই দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁকে অনুভব করতে না দিয়ে তাঁর পরম মিত্রের কাজ করল।

বজ্র যেমন বনের কোন প্রকাণ্ড বনস্পতির উপর পড়ে তাকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করে অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি মহাযোগী মহেশ্বর তাঁর তপস্যার বিঘ্নকারী সেই কামদেবের ধ্বংসসাধন করার পরই অন্তর্হিত হয়ে পড়লেন মুহূর্তে। তিনি ভাবলেন, নারী জাতির কাছে থাকা আর উচিত হবে না।

এদিকে পার্বতী দেখলেন তাঁর সম্মানী পিতার সমুন্নত অভিলাষ, তাঁর নিজের অনিন্দ্যসুন্দর ললিতকান্তি কলেবর সব ব্যর্থ হলো। তাঁর সৌন্দর্যের যেন কোন মূল্যই নেই শিবের কাছে। তার উপর সখীদের সামনে তাঁর বহুবাঞ্ছিত প্রিয়বল্লভের দ্বারা এইভাবে উপেক্ষিত হয়ে অপমানিতবোধ করলেন তিনি। মর্মে যেন মরে গেলেন। তখন কোন উপায় না দেখে শূন্য হৃদয়ে অবনত মস্তকে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন তিনি। কিন্তু রুদ্রের সেই জ্বলন্ত রোষবহ্নির কথা বারবার স্মরণে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো তাঁর।

হিমালয় কন্যার গতিবিধি ও অবস্থা আগে হতেই লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন রুদ্ররোষভয়ে ভীত তাঁর কন্যার নয়ন নিমীলিত হয়ে আসছে এবং তিনি অচৈতন্যপ্রায় হয়ে উঠেছেন তখন তিনি দ্রুতবেগে কন্যার কাছে গিয়ে দুবাহু দিয়ে উমাকে তুলে ধরে নিজের বাড়ির দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। দেবহস্তীরা যেমন

দন্তসংলগ্ন মৃণালিনীকে নিয়ে আকাশপথে ছুটে যায় তেমনি বেগভরে হিমালয় তাঁর কন্যার দেহটিকে তুলে ধরে ছুটে চললেন।

চতুর্থ সর্গ

কামবধূ রতি এতক্ষণ মোহে বিবশ ও বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়েছিলেন। এবার সদ্য বৈধব্যের বেদনা তাঁকে দিয়ে অনুভব করাবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনলেন।

সেই মহাপ্রলয়ের পর রতির নাম উল্লিখিত হলো বটে, কিন্তু প্রথমে সে নয়নে কিছু দেখতে পেলেন না। ক্রমে চারপাশের বস্তুগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চারদিকে নিবিষ্ট মনে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের যিনি বহু আকাঙ্খিত ধন, সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সেই চিরসুন্দর প্রাণেশ্বরকে দেখতে পেলেন না। সেই প্রিয়তম যে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা তিনি প্রথমে বুঝতেই পারলেন না।

'হে আমার হৃদয়ের নাথ, কোথায় তুমি'—এই বলেই কম্পিত পায়ে রতি যেমন সামনে গিয়ে তাকালেন, অমনি দেখলেন, পুরুষাকৃতি এক ভস্মস্তূপ মাটিতে পড়ে আছে।

কামসখা ও সহচর বসন্তের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। তিনি বুঝতে পারলেন যে হরকোপানল দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তিনি, সেই কোপানলেই দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছেন তাঁর পতি।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কামপ্রিয়া রতি পাগলের মত আবার পড়ে গেলেন মাটিতে। ধূলিজালে ধূসর হয়ে উঠল তঁার পীনস্তনমণ্ডল। শিথিল হয়ে উঠল তাঁর কপাল। রতির স্মরণ বিলাপে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলী। রতির এই শোক-বিলাপে সর্বংসহা ধরিত্রীদেবীও যেন কেঁদে উঠলেন।

হে প্রিয়, তোমার যে অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর বিলাসীদের উপমানস্থল ছিল সেই সর্বলোকমনোহর দেহের আজ এই দশা! আজ তোমার এই দশা দেখেও হতভাগিনী আমি শতধাবিদীর্ণ হচ্ছি না।

হে দয়িত, সেতুভঙ্গ করে জলস্রোত যখন চলে যায়, তখন তার মধ্যগত মৃণালিনীর যে দশা হয় আমাকে সেই দশায় ফেলে রেখে, এতকালের প্রেম ভালবাসা সব ত্যাগ করে কোথায় পালালে তুমি ? আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না।

কোনদিন তুমি ত আমার প্রতিকূল বা কোন বিরক্তিকর কার্য করনি, আর আমিও তোমার কোন বিরুদ্ধাচরণ করিনি। তবে আজ কি কারণে রতির এই বিলাপ ও আর্তনাদেও তাকে দেখা দিচ্ছ না ?

প্রাণাধিক, এখন তুমি শুধু স্মৃতির বিষয় হয়ে রইলে। হে ঈশ্বর, আমাদের রতিমন্দিরে যখন তুমি আনমনে অন্য কোন ললনার নাম করে বলতে তখন রশনার পাশে অর্থাৎ আমার নিতম্বের চন্দ্রহারের বন্ধনে আবদ্ধ করতাম তোমাকে। আমার কানের অবতংসরূপ কমলের দ্বারা তাড়না করতাম তোমাকে। তখন সেই পদ্মফুলের পরাগে দুচোখ ভরে যেত তোমার। তুমি কষ্ট পেতে।

তুমি আমাকে কত সময়ে বলতে, রতি, তুমি সর্বদাই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে আছ। কিন্তু নাথ, আজ বুঝছি, সেই সব কথা তুমি আমাকে শুধু ভোলাবার জন্যই বলতে। তা না হলে আজ তোমার দেহ বিনষ্ট হলেও তোমার হৃদয়বাসিনী রতি তেমনই রইল।

হে হৃদয়বল্লভ, তুমি এইমাত্র পরলোকে গেছ, সুতরাং আমার অনুগমনের কাল উত্তীর্ণ হয়নি এখনো। আমিও তোমার পদানুসরণের জন্য মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু বিধি জগৎকে বঞ্চিত করল। কারণ তোমার অভাবে জগতের সকল সুখ অন্তর্হিত হলো। দেহীদের সমস্ত দৈহিক ও মানসিক সুখের তুমিই একমাত্র কারণ।

প্রিয়তম, নিশীথিনী যখন সূচীভেদ্য তিমিরের গাঢ় অবগুণ্ঠনে আবৃত এবং আকাশ যখন জলদের মন্দ্রধ্বনিতে কেমন যেন গম্ভীর ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে তখন তুমি ছাড়া আর কে অনুরাগিনী অভিসারিকাদের তাদের বাঞ্ছিত সঙ্কেতস্থানে নিয়ে যাবে ? তুমি সেই অবলা কামিনীদের হৃদয়ে বলসঞ্চার করো বলেই অত দুর্যোগের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথে সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রিয়তমের কাছে ছুটে যায়।

মদাতুরা রমণীরা বারুণী সেবন করলে তাদের অরুণ নয়ন মত্ত ও আঘূর্ণিত হত, তাদের মত্ততাযুক্ত কথা বেধে যেত মুখে, তবু তারা হৃদয়মধ্যে তোমাকে পেয়ে তোমার প্রভাবে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠত। আজ তোমার অভাবে কামহীন হৃদয়ে তাদের সেই সকল হাবভাব ও চোখমুখের অবস্থা ব্যর্থ হয়ে যাবে সব। সুখের পরিবর্তে সে সব হবে শুধু বিড়ম্বনার কারণ।

হে অঙ্গ, আজ তুমি নেই, আজ তোমার জগতোন্মাদক মনোহর কলেবর চিরদিনের মত বিলুপ্ত। আজ তা শুধু কথার বিষয় হয়েছে। একথা তোমার প্রিয়বন্ধু চন্দ্র জানতে পারলে কত ব্যথা পাবেন মনে! কৃষ্ণপক্ষ চলে গেলে তিনি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েও আগের মত সুখ পাবেন না তাঁর পূর্ণিমার হাসি আর আগের বিশ্ববিমোহন হবে না। প্রতিপদাদি শুদ্ধাযোগ তিথিতে তিনি তাঁর ক্ষীণ ভাব হয়ত পরিত্যাগ করবেন না।

হে পঞ্চবাণ, বল দেখি, সেই হরিৎ ও অরুণ বর্ণে শোভিত বৃন্তে যখন নূতন রসাল মুকুল গুঞ্জরিত হবে এবং কোকিলের কুহুধ্বনিতে বোঝা যাবে চূত মঞ্জরী ফুটেছে তখন সেই চূত মুকুল কার বাণ হবে, কে তাকে আদর করে ধনুকে জুড়ে সারা জগতের উন্মাদনা জাগাবে?

ঐ কালোভ্রমরের পঙ্‌ক্তি কতবার তোমার ধনুকের গুণ বা ছিলা হয়েছে, তোমার বিশ্ববিমোহন কাজে কত সহায়তা করে তাদের ভ্রমরজন্ম সার্থক করেছে। আজ তুমি নেই জেনে তারা গুনগুন রবে গুমরে গুমরে কাঁদছে। আমার সঙ্গে তারাও বিলাপ করতে করতে চোখের জলে মাটি ভাসিয়ে দিচ্ছে।

ওঠ প্রিয়তম। তোমার সেই ত্রিলোকমোহন মনোহর দেহ ধারণ করে আবার গাত্রোত্থান করো। দৌতকর্মনিপুণা মঞ্জুভাষিণী কোকিলাকে তোমার মালিনী রতির কাছে আর একবার দূতী করে পাঠাও। তুমি ত জান, মধুকণ্ঠী কোকিলার গান শুনে রতির সব ক্রোধ, সব মান অভিমান কোথায় চলে যায়।

হে স্মর, একদিন অতি সঙ্গোপনে মাটিতে মাথা খুঁড়ে কত সকরুণ

মিনতি জানিয়ে তুমি আমার আলিঙ্গন প্রার্থনা করতে, সম্ভোগের জন্য লালায়িত হতে। আজ আমি সেই কথা মনে করে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছি। শান্তি পাচ্ছি না মনে।

তোমার মত রতিকুশল আর কে আছে? ঋতুজাত নানাবিধ কুসুম দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর আভবণ তুমি নিজে আমার জন্য তৈরী করে দিয়েছিলে। সেই সব অলঙ্কার আজও আমি পরে আছি। অথচ তোমার নয়নমনোহর কলেবর আর দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি আমাকে যখন আমার অঙ্গরাগ করছিলে, নিজের হাতে আমাকে সাজাচ্ছিলে, সেই সময় নির্মম নির্দয় দেবতারা তোমাকে স্মরণ করল আর তুমি চলে গেলে। এস প্রিয়তম, ফিরে এস। আমার বাম চরণে আলতা পরানো এখনো হয়নি, বাকি আছে।

তবে তোমার কাছে যাচ্ছি প্রিয়তম। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে দুর্বার বেগে ছুটে যায়, তেমনি আমিও তোমার অনুসরণ করছি। তা না হলে হয়ত স্বর্গের সুরকামিনীরা তোমাকে নানাভাবে ভোলাবার চেষ্টা করবে।

যদিও আমি এখনই তোমার অনুগমন করছি, তথাপি মদনের দেহাবসানের পর তার রতি ক্ষণকালও জীবিত ছিল—এই অপবাদ বা কলঙ্ক থেকে আমি কখনও নিস্তার পাব না।

হায়, কি করে আমি তোমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করব? তোমাকে একবার কেমন করে সাজাব বলত। এমন অতর্কিতভাবে যে তোমার দেহ ও জীবন দুই-ই অন্তর্হিত হবে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

তুমি যখন তোমার ফুলধনুটি কোলের ভিতর চেপে ধরে অশোক, অরবিন্দ, শিরীষ ও নবচূতমঞ্জরীর দ্বারা বিরচিত বাণগুলি একে একে হাত দিয়ে টেনে সোজা করতে এবং সস্মিত মুখে বসন্তের দিকে চাইতে তখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মোহনমূর্তি ও মনোহর অঙ্গভঙ্গি দেখে নিজের সৌভাগ্যের গর্বের মধ্যে ডুবে যেতাম। আজ সেকথা স্মরণ না করে পারছি না।

নিত্যনূতন ফুল দিয়ে যে বসন্ত তোমাকে তোমার ধনুক তৈরী করে দিত, সে ধনুকের অব্যর্থ শরসন্ধানের হাত হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিস্তার ছিল না। আজ তোমার এই দুর্দিনে তোমার সেই অন্তরঙ্গ সখা বসন্ত কোথায় লুকোল? তীব্র ক্রোধবশে পিনাকপানি কি তাকেও তোমার মত ভস্মীভূত করেছেন?

রতির এই আর্তনাদের মত কথাগুলো বিষাক্ত বাণের মত ঋতুরাজ বসন্তের হৃদয়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল। তখন তিনি আর থাকতে না পেরে শরীর ধারণ করে রতির সামনে উপস্থিত হলেন। ভাবলেন সান্ত্বনা দেবেন রতির শোকে।

পতিশোকাতুরা রতি পতির বন্ধু মধুমাসকে দেখে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন। দুহাত দিয়ে বক্ষস্থলে আঘাত করতে লাগলেন। সে আঘাতে তাঁর স্তনকুম্ভদ্বয় কতই না আহত হলো। দুঃখের সময়ে আত্মীয় স্বজনকে দেখলে দুঃখীর দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়। তখন তার আর জ্ঞান থাকে না।

রতি তখন কাঁদতে কাঁদতে বসন্তকে বললেন, বসন্ত, ঐ দেখ তোমার সখাব কি অবস্থা! তাঁরই দগ্ধ দেহের ভস্ম কপোতের মত ধূসর ছাই একটু একটু করে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। একবার চেয়ে দেখ।

একবার ওঠ, চেয়ে দেখ, তোমার অন্তরের বন্ধু মাধব বা বসন্ত কত যন্ত্রণা ভোগ করছে তোমার বিরহে। মানুষের প্রেম-ভালবাসা নিজের প্রিয়তমার প্রতি কখনো কখনো চঞ্চল বা কম বেশী হতে পারে, কিন্তু সুহৃদের উপর তা চিরদিন সমানই থাকে।

হে মদন, একদিন তোমার যে বন্ধু ত্রিজগতের মানুষ ত তুচ্ছ, দেবদানব গন্ধর্বকে পর্যন্ত তোমার মৃণালসূত্রের গুণবিশিষ্ট ও কোমল কুসুমের বাণযুক্ত ধনুকের বশবর্তী করত, সেই বসন্ত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবার তার দিকে ফিরে চাও।

হে বসন্ত, তোমার সেই প্রাণসম সখা মদন বায়ুতাড়িত প্রদীপের মত চিরকালের জন্য নিবে গেছে। জন্মদুঃখিনী হতভাগিনী আমি রতি, সেই নির্বাপিত দীপের বর্তিকার মত পড়ে আছি। যতদিন বাঁচব,

তাঁর অসহ্য বিরহরূপ দুঃখের ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকব।

বিধি আমাকে জীবিত রেখে কামদেবকে নিহত করায় সম্পূর্ণ হলো না তাঁর কার্য। ওটা হলো অর্ধহত্যার কাজ। অচল অটল যে বনস্পতিকে লতা এসে আশ্রয় করে, গজরাজ এসে সে বনস্পতিকে যদি উৎপাটিত করে বা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সেই উপায়হীন হতভাগ্য লতা ত আপনা হতেই মাটিতে পড়ে যাবে।

সুতরাং হে বসন্ত, এমন বন্ধুজনের একটা কাজ দয়া করে করো। তাড়াতাড়ি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, আমি তাতে প্রবেশ করে সকল জ্বালা জুড়াই। তুমি আমাকে স্বামীর কাছে যেতে দাও।

আমি চৈতন্যবতী রমণী, কিন্তু যারা চৈতন্যহীনা তারাও পতির অনুগামিনী হয়। জ্যোৎস্না চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়, সৌদামিনী মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় লুকিয়ে পড়ে। চাঁদ ছাড়া জ্যোৎস্না, মেঘ ছাড়া বিদ্যুৎ কখনো দেখা যায় না। প্রমদারা যে পতির অনুগামিনী হয় একথা ত ঐ অচেতন বস্তুরাই প্রমাণ করে দিচ্ছে।

হে বসন্ত, এমন একদিন ছিল যেদিন নানারকমের চূর্ণ গন্ধদ্রব্যে বক্ষস্থল রঞ্জিত করে তোমার বন্ধুর সঙ্গে নবপল্লবরচিত সুখশয্যায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতাম। আজ তোমার সেই বন্ধু মদন না থাকলেও তার দেহের ভস্মরাশি এখনো পড়ে আছে। আমি সেই ভস্মরাশির দ্বারা আমার তনু রঞ্জিত করব এবং অগ্নিকেই পল্লবশয্যা জ্ঞান করে তার উপর এ দেহ ঢেলে দিয়ে সকল জ্বালা জুড়োব।

হে প্রিয়দর্শন, তুমি ত বহুবার রতি ও মদনের ফুলশয্যা রচনা করে দিয়েছ। আমাদের পতি-পত্নীর সুখের জন্য কত কি করেছ। আজ প্রণিপাতের সঙ্গে যুক্ত করে প্রার্থনা করছি একবার জন্মের মত আমার চিতাশয্যা রচনা করে দাও।

হে বসন্ত, আমি চিতায় শয়ন করার পর আমাকে অগ্নিদান করে একবার তোমার মলয়সমীরণ সঞ্চালিত করে সেই চিতানলটা বাড়িয়ে দিও। যেন আমার পুড়তে দেরী না হয়। তুমি ত জান যে তোমার বন্ধু কন্দর্প আমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারেন না।

এরপর আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে তুমি এক অঞ্জলি জল দিও। তুমি ছাড়া আজ এই ঘোর বিপদের দিনে আর কেউ নেই। তোমার সেই অর্পিত জলাঞ্জলি পরলোকে তোমার সখা মদন আমাকে নিয়ে একসঙ্গে পান করবেন।

হে মাধব, যখন আমাদের উদ্দেশ্যে তুমি শ্রাদ্ধশান্তি করবে, সেই সময় তোমার বন্ধুকে মনে করে গোটাকতক চঞ্চল নবপল্লবমিশ্রিত আমের মুকুল উৎসর্গ করো। তুমি তো জানো, তোমার সখা মদন নবীন রসাল মঞ্জরীকে কত ভালবাসেন। এই শেষ অনুরোধটি ভুলো না।

এইভাবে পতির চিতানলে দেহত্যাগ করার জন্য রতি যখন বদ্ধ-পরিকর হলেন, তখন সহসা এক দৈববাণী হলো। অকস্মাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাতে নিদাঘতপ্ত হ্রদমধ্যবর্তী গতপ্রাণকল্পা শফরী যেমন আশ্বস্ত হয় সেই দৈববাণী শুনে রতিও তেমনি আশ্বস্ত হলেন।

সে দৈববাণীতে বলল, হে কুসুমায়ুধপত্নী, স্থির হও, চিতানলে আত্মাহুতি দিও না। তোমার পতি মদন আবার মিলিত হবে তোমার সঙ্গে। যে অপকর্মের জন্য মদন মহাদেবের লোচনবহ্নিতে পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছেন তা শ্রবণ করো।

পঞ্চবাণ মদনের অত্যাচারে প্রজাপতি ব্রহ্মার একদিন ঈষৎ চিত্তবিকার ঘটেছিল এবং তিনি নিজ কন্যা সরস্বতীর দিকে সকাম দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রহ্মা বৈকল্য দমন করে উদ্ধত কামকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপের ফলেই হরকোপানলে ভস্মীভূত হলেন কামদেব।

প্রজাপতি ব্রহ্মার এই অভিশাপে ধর্মরাজ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কামের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তখন বললেন, যেদিন তপস্যার দ্বারা পার্বতী মহাদেবকে তাঁর প্রতি অনুরক্ত করতে পারবেন এবং যেদিন মহাদেব পার্বতীকে বিবাহ করার পর উমার মত পত্নীলাভে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হবেন সেদিন তিনি কামকে পুনরায় জীবনদান করবেন। কন্দর্প তাঁর ত্রিলোকমনোহর কলেবর

ফিরে পাবেন আবার। জিতেন্দ্রিয়গণ ও জলধরগণ অমৃত ও বজ্র উভয়েরই উৎপত্তিস্থল।

সুতরাং হে সুন্দরী, তোমার এই কলেবর দগ্ধ করো না, বরং সযত্নে রক্ষা করো। কারণ তোমার প্রিয়তমার সঙ্গে তোমার এই দেহের মিলন অবশ্যম্ভাবী। গ্রীষ্মে সূর্যদেব নদীর সব জলরাশি শোষণ করে নিলেও গ্রীষ্মের শেষে আবার জলপ্লাবন দেখা দেয় সে নদীতে।

এই এক অদৃশ্যরূপ প্রাণী রতির মরণবুদ্ধি নিবারণ করল। সেই আকাশবাণী মিথ্যা হবার নয়। দেবতার প্রসাদে আবার মদনের সঙ্গে রতির মিলন হবে—এই সব কথা বলে বসন্ত রতিকে সান্ত্বনা দিলেন।

এই ঘটনার পর হতে রতি কবে পার্বতীর সঙ্গে ত্রিলোচনের পরিণয় হবে তার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বিরহদশায় দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল তাঁর দেহলতিকা। দিনের বেলায় চাঁদের নিষ্প্রভ রেখা যেমন তার সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে কোনক্রমে আকাশের গায়ে লেগে থাকে, বিপন্না রতিও তেমনি পুনর্মিলনের আশায় কোনমতে প্রাণধারণ করে রইলেন। তাঁর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল।

পঞ্চম সর্গ

হিমালয়কন্যা উমা যখন চোখের উপর দেখলেন, পিনাকীর লোচন-বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল কন্দর্প, তখন তাঁর দেহসৌন্দর্য কত অকিঞ্চিৎকর তা বুঝে নিজের রূপকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত আশা ও অভিলাষ মদনকে ভস্মসাৎ করে সমূলে ধ্বংস করেছেন মহাদেব। প্রিয়তমের আকর্ষণ যে রূপের কষ্টিপাথর সে রূপ যখন তাঁর প্রাণবল্লভকে আকর্ষণ করতে পারল না তখন সে রূপের আর প্রয়োজন নেই।

তাই পার্বতী এবার একাগ্রতাসহকারে কঠোর তপস্যার দ্বারা নিজের বিফল সৌন্দর্যকে সফল করে তোলার জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন। তিনি

বুঝতে পারলেন, তপস্যা ছাড়া কখনো ঐ রকম মৃত্যুঞ্জয়ী পতি ও তার প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। তপস্যাপ্রভাবে পতির প্রেম ও দীর্ঘজীবন দুই-ই লাভ করেছিলেন সতী তাপসী পার্বতী।

গিরীশের প্রতি আসক্ত হয়ে কন্যা পার্বতী কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছেন শুনে মা মেনকা গিয়ে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনন্ত ক্লেশকর মুনিদের এই তপশ্চারণ ব্রত হতে বারবার নিবারণ করতে লাগলেন।

মেনকা বললেন, কেন, মা, তোমার এই দুষ্কর তপস্যা কিসের জন্য? শচী প্রভৃতি বৈবাহিক দেবতারা ত তোমার ঘরের লোক। তোমার পিতৃগৃহে কোন দেবদেবী আসেন না? ইচ্ছা করলেই ত তাঁদের অর্চনা করতে পার। তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যার এই কঠোরতা তোমার সহ্য হবে না। অতি মৃদুল শিরীষ ফুল ভ্রমরের পদভার সহ্য করতে পারে বলে কি কোন পাখির ভার সহ্য করতে পারে? এই কৃচ্ছ্র-সাধন তোমার এ শরীরে সহ্য হবে না।

মাতা মেনকা কন্যাকে এইভাবে নানা উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু কোন উপদেশই পার্বতীকে নিবৃত্ত করতে পারল না তপস্যার সেই দৃঢ় সংকল্প হতে। নিম্নগামী জলস্রোতের মত অভিপ্রেত বিষয়ে বদ্ধপরিকর হৃদয়কে কেউ কখনো ফেরাতে পারে না।

এরপর স্থিরচিত্ত উমা একদিন তাঁর এক অভিন্নহৃদয়া সখীকে দিয়ে তাঁর পিতা হিমালয়কে জানালেন যে যতদিন তাঁর অভিলাষ সিদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত তিনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন। কন্যার কামনার কথা হিমালয় জানতেন বলে আর দ্বিরুক্তি করলেন না।

কন্যার অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে কন্যার অনুরূপ হয়েছে ভেবে পিতা হিমালয়ের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি প্রসন্ন হৃদয়ে পার্বতীকে তপস্যার অনুমতি দিলেন। পার্বতীও পিতার অনুমতি পেয়ে ময়ূরা-দিসেবিত হিমালয়ের একটি শৃঙ্গে তপস্যা করতে গেলেন। গৌরী ঐ শৃঙ্গে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে পরে ঐ শৃঙ্গ তাঁর নামে গৌরীশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

তপস্যায় গিয়ে পার্বতী তাঁর আগেকার বেশভূষা সব ত্যাগ করলেন। দৃঢ়সঙ্কল্পা পার্বতী সর্বপ্রথম কণ্ঠের হারছড়া খুলে ফেললেন। একদিন এই হার তাঁর চন্দনচর্চিত বক্ষে লহরে লহরে গড়িয়ে বিলুপ্ত করে দিত তাঁর স্তনলিপ্ত চন্দন। আজ সেই হারের বদলে তিনি অচিরোদিত সূর্যের মত পিঙ্গলবর্ণ বল্কল কণ্ঠে ধারণ করলেন। তাঁর পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের স্থূল ও সমুন্নত পার্শ্বদেশে আহত হয়ে সেই বল্কলের ধারগুলি ক্রমে যেন বিশীর্ণ হতে লাগল। তা ক্রমে পরতে পরতে ছিঁড়ে খুলে গেল।

গৌরীর আজানুলম্বিত কেশপাশে তাঁর মুখখানিকে আগে যেমন সুন্দর দেখাত, আজ জটাভারেও তেমনি সুন্দর মনে হলো। কমলদলে যখন চঞ্চল ভ্রমরমালা এসে বসে তখনই যে তা শুধু সুন্দর ও মনোহব দেখায় তা নয়, শৈবালদলে বিজড়িত পথও তেমনি সুন্দর দেখায়। যা যথার্থ সুন্দর তা সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়।

তাপসীবেশা উমা ব্রত ও তপস্যার জন্য তিন গুণ করে অর্থাৎ তিন লহর মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করলেন। একদিন যে নিতম্বে মনিময় রশনা পরতেন, আজ মুঞ্জরিত কঠিন মেখলার বন্ধনে লাল হয়ে উঠল সে নিতম্বদেশ। তার কঠিনতার সংস্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগল তাঁর কলেবর।

উমা একদিন তাঁর অধরোষ্ঠ লাক্ষারাগে রঞ্জিত করতেন এবং খেলার সময় কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনের উপর পড়ে যে কন্দুক লাল হত তা ধরতেন। আজ তপস্যা করতে বসে সেই সব বিলাসের বস্তু ত্যাগ করেছেন। আজ হাত দিয়ে তাঁকে কুশ কাটতে হয় বলে অঙ্গুলিগুলি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে এবং তাতে দিনরাত রুদ্রাক্ষের জপমালা ধারণ করে আছেন।

উমা আগে অমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করতেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় তাঁর কবরীচ্যুত একটি ফুলের আঘাতে কত ব্যথা পেতেন। আজ সেই উমা অনাবৃত ভূমিতলে বসে থাকতে থাকতে যদি কখনো একটু ক্লান্তিবোধ করেন তখন নিজের বাহুলতার উপর মাথা রেখে মাটিতেই শুয়ে পড়েন।

তপস্যাকালে ব্রতনিয়ম পালনের জন্য সমস্ত বিলাস ও হাবভাব ত্যাগ করতে হয়। তাই মনে হয় তপস্বিনী উমা তপশ্চর্যার প্রারম্ভে তাঁর বিলাসচেষ্টিত অঙ্গভঙ্গি ও সততচঞ্চল দৃষ্টি যথাক্রমে কৃশ লতায় ও হরিণীদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন যদি কখনো সুদিন আসে তাহলে তা ফিরিয়ে নেবেন। যদি তা না হবে তাহলে লতাসমূহ অমন মধুর ও লীলায়িত নর্তন বা আন্দোলন কোথায় পেল আর হরিণীরাই বা অমন স্পন্দিত ও সততচঞ্চল দৃষ্টি কোথা হতে লাভ করল ?

প্রয়োজনমত পার্বতী অনলসভাবে আশ্রমের ছোট ছোট গাছগুলিতে ঘট ভরে জলসেচন করতেন। মনে হত জননী যেন তাঁর কচি কচি শিশুগুলিকে স্তন্যপান করিয়ে বিবর্ধিত করছেন। অনেক পরে দেব-সেনাপতি কার্তিক তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের হাতে লালিত এইসব গাছগুলিব উপর তাব যে অপত্যস্নেহ জন্মেছিল তা কিন্তু তিলমাত্রও কমেনি।

তপস্যাকালে উমা কিছুই খেতেন না। বনজাত তৃণ, ধান প্রভৃতি যা কুড়িয়ে আনতেন তা বনের হরিণীগুলিকে নিজের হাতে খাওয়াতেন। তার ঐ স্নেহসুলভ আচরণে বন্য হরিণগুলি তাকে এত বিশ্বাস করত যে যদি কখনো তিনি কৌতূহলবশতঃ কোন হরিণের চোখ টেনে ধরে সখীদেব চোখের সঙ্গে মেপে দেখতেন কার চোখ বড, তাহলে তখন কিন্তু হরিণরা নড়ত না বা পালিয়ে যেত না। উমা যখন অভিষেক বা স্নানের পর বল্কল বা উত্তরীয় ধারণ করে প্রজ্জ্বলিত হোমানলে হবন করতেন এবং স্তবপাঠ করতেন তখন কত কঠোরতপা ঋষিরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। ধর্মাচরণে যিনি প্রবীণ তাঁর বয়সগণনা কেউ করে না। ধর্মভাবের প্রবীণতাই তাকে সর্বজন-পূজনীয় করে তোলে।

অহিংসা, অতিথি সৎকার, অগ্নিপরিচর্যা প্রভৃতি গুণের অনুশীলনের দ্বারা সেই গৌরীশৃঙ্গ ক্রমে পরম পবিত্র স্থান হয়ে উঠল। সেখানে পরস্পর বিরোধী হিংস্র জন্তুরা তাদের জন্মগত হিংসাভাব পরিহার করল। পথিক বা অতিথিরা যে গাছের কাছে যে ফল চাইতেন সে গাছ

তাই তাদের দিয়ে সেবা করত। নবনির্মিত পর্ণশালার মধ্যে দিনরাত হোমানল সঞ্চিত থাকত। সমস্ত তপোবনটাই এক স্বর্গভাবে পরিণত হয়ে উঠল।

দেবী পার্বতী যখন দেখলেন যথাসম্ভব কঠোর তপস্যা করেও অত কৃচ্ছ্রসাধনাতেও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারলেন না, বাঞ্ছিত চন্দ্রশেখরের দয়া হলো না, তখন দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে নিজের দেহের কমনীয়তা ও শক্তিসামর্থ্য উপেক্ষা করে আরও দুশ্চর ও কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হলেন।

আগে যিনি সামান্য একটি কন্দুক বা ঘুঁটি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ঘামে গলে যেতেন, কত ক্লান্তি অনুভব করতেন, আজ সেই রাজনন্দিনী উমা কৃচ্ছ্রতপাঃ মুনিদেরও দুঃসাধ্য এক কঠোর তপস্যায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। এই সব দেখে মনে হয়, তাঁর কলেবর সোনার পদ্মে গঠিত। তাই পদ্মের স্বভাবে তাঁর প্রকৃতি অত মধুর ও কোমল এবং কঠিন সোনার ধাতুর স্বভাবে তাঁর হৃদয় এত দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তা না হলে তাঁর মন এত কঠিন ও অনমনীয় হয়ে উঠবে কেন ?

মন্দগামিনী কৃশোদরা পার্বতী প্রবল গ্রীষ্মে চারদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তার মধ্যে গিয়ে হাসি মুখে বসতেন। স্থির নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে তপ্তপ্রখর মার্তণ্ডের দিকে চেয়ে থাকতেন। গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ড সূর্যকিরণে তাঁর চোখ ঝলসে যেত। কিন্তু তপস্বিনী পার্বতী তা লক্ষ্য করতেন না। এইভাবে তিনি পঞ্চাগ্নি তপস্যা করতেন।

নিদাঘ সূর্যের প্রখর তাপে তপ্ত হয়ে উমার মুখখানি যখন লাল হয়ে উঠত, তখন তা একটি অরুণরাগরঞ্জিত ফুটন্ত পদ্মের মত মনে হত। সেই সুন্দর মুখ সুন্দরতর হয়ে উঠত। কিন্তু প্রচণ্ড তাপের ফলে তাঁর নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগে একটা কালো রেখা ভেসে উঠতে লাগল। চোখের কোণ কালো হয়ে উঠলে তা দেখে মনে হলো প্রস্ফুটিত পদ্মে যেন ভ্রমর এসে বসল।

মেঘের জল আর চাঁদের কিরণ ছাড়া বৃক্ষবল্লরী যেন আর কিছুই

খায় না। উমাও অন্য কিছুই খেতেন না। তপস্বিনী উপবাসিনী উমা এবং তরুলতার উভয়েরই খাদ্যবস্তু ছিল এক। এতই কঠোর ছিল তাঁর তপস্যা।

সারা গ্রীষ্মকালটা পঞ্চবিধ অগ্নির মধ্যে তপস্যা করতেন উমা। চারদিকে জ্বলতে থাকা আগুনের থেকেও প্রবলতর বেগে সূর্যদেব জ্বলতেন আকাশে। উমার দেহ পুড়ে খাক হত। গ্রীষ্মের শেষে নববর্ষার বৃষ্টিজল প্রথম তপ্ত ভূমিতলে পড়লে যেমন মাটি হতে একটা তাপ ওঠে তেমনি প্রতপ্তদেহা উমাও উষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়তেন।

তপস্বিনী উমা যখন ঊর্ধ্বনেত্রে সূর্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতেন, -তখন বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তার চোখের পাতায় এসে পড়ত, কিন্তু তাঁর চোখের পাতা এতই কোমল যে একবিন্দু জলের ভারও সহ্য করতে পারত না বলে সে জলবিন্দু পাতার সঙ্গে সঙ্গে উমার অধরে পড়ত। কিন্তু তাতেও সেই কোমল অধরে আঘাত লাগত। তখন সে জলবিন্দু অধর থেকে পীনস্তনের উপর পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তাঁর উদরে পড়ত এবং গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁর নাভিদেশের মধ্যে প্রবেশ করত।

যে শৃঙ্গের উপর তপস্যা করতেন উমা তা ছিল তুষারাচ্ছন্ন ও কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর মাঝে মাঝে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ত। তবু তিনি সেই প্রবল হিম, শৈত্য, তুষার আর বৃষ্টির মধ্যে সেই শৃঙ্গের অনাবৃত স্থানেই বসে থাকতেন। পর্ণকুটিরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। সারারাত্রি বিদ্যুৎ চমকাত। মনে হত অন্ধকার রাত্রি যেন তড়িন্ময় দৃষ্টিতে অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকানির দ্বারা সাক্ষী হিসাবে মাঝে মাঝে দেখত তপস্বিনী উমার কৃচ্ছ্রসাধন ঠিকমত হচ্ছে কি না।

পৌষমাসের শীতের রাত্রিতে তুষারাবৃত শৃঙ্গভূমির উপর তুষার ও বৃষ্টির মধ্যে বসে একমনে তপস্যা করে যেতেন উমা। সেই শীতের রাত্রিতে আবার জলে শুয়ে তপস্যা করতেন। যে সব চক্রবাক চক্রবাকী বিধির বিধানে সারারাত্রি পরস্পরে মিলিত হতে না পেরে পরস্পরের জন্য কাঁদত, আর্তনাদ করত, তাদের দুঃখে দয়াবতী পার্বতীর বুক ফেটে যেত। চোখে জল আসত।

সারারাত্রি সমগ্র দেহ আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে উমা যখন তপস্যা করতেন তখন তাঁর পদ্মগন্ধি মুখখানি শুধু জলের উপর ভেসে থাকত। আর সেই প্রবল হিম আর শীতে তাঁর অধরপত্র থরথর করে কাঁপত। অন্য কালে দিনের বেলায় পর্বতগাত্রের সেই জলাশয়ে কত পদ্মফুল ফুটে থাকত আর তাদের পাপড়িগুলি কাঁপত। কিন্তু এখন এই দারুণ তুষারপাতের ফলে জলাশয়ে আর পদ্মফুল ফোটে না। রাত্রিকালে এখন উমার সুন্দর মুখখানি জলের উপর ভেসে থাকায় মনে হচ্ছে তুষারবর্ষণে জলাশয়ে পদ্ম না থাকায় উমা যেন সেই পদ্মের অভাব পূরণ করছেন। বিশেষ করে সে পদ্ম ফুটত দিনের বেলায় আর উমার অনুপম মুখপদ্ম দিনেরাতে সমানভাবে ফুটছে।

গাছের যে পাতাগুলি খসে পড়ে তার রসপান করে জীবন ধারণ করাই তপস্যার চরম উৎকর্ষ। কিন্তু উমা গাছের স্বতশ্চ্যুত পাতাটি পর্যন্ত ছুঁতেন না। এই কারণে মঞ্জুভাষিণী উমাকে পুরাণবিদ্ পণ্ডিতগণ অপর্ণা বা 'পর্ণপরিত্যাগিনী' বলে ডাকতেন।

অচিরজাত মৃনালের মত অতিকোমল দেহলতাকে অতিকঠোর তপশ্চারণার মধ্য দিয়ে দিন রাত কষ্ট দিতে লাগলেন উমা। তাঁর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল। তবু বিশ্রাম বা বিরতি নেই। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা তপস্বীরা যে পুণ্য সঞ্চয় করতেন, তা উমার তপস্যার কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হত।

এইভাবে যখন পার্বতীর দিন কাটছিল তখন একদিন একজন জটাধারী যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সেই ব্রহ্মচারীর হাতে ছিল পলাশদণ্ড, পরিধানে কৃষ্ণসারচর্ম। ব্রহ্মতেজে সেই যুবকের সমস্ত দেহ ও চোখমুখ যেন জ্বলছিল। সোজা সরল ভাষা ছিল মুখে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর দেহে।

অতিথিসৎকারপরায়ণা পার্বতী এই নবীন অতিথিকে পরম সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। তেজপুঞ্জসমুজ্জ্বল পবিত্রতাব্যঞ্জক দেহের এমনই মহিমা যে গৃহত্যাগী ব্যক্তিরাও সেই দেহধারী ব্যক্তিকে সমাদর

না করে পারে না।

সেই নবীন ব্রহ্মচারী উমার আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর সহজভাবে ব্রহ্মচারিণী উমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ

হে ব্রহ্মচারিণী, তোমার হোমাদি কার্যের উপযুক্ত সমিধ ও কুশাদি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় ত? তোমার স্নানাদির যোগ্য জলের কোন অভাব হয় না ত? এত কঠিন তপস্যায় তোমার কোমল তনুর কোন কষ্ট হয় না? এই তপস্যা তোমার সামর্থ্যের অনুরূপ ত? কারণ শরীররক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শরীর থাকলে সকল ধর্মাচরণ সম্ভব হয়, শরীর না থাকলে সব ধর্মই মাটি হয়।

ভদ্রে, তোমার হাতের জলসেচনে ঐ যে লতাসমূহের নবপল্লব উদ্‌গত হয়েছে তা অবিচ্ছিন্নভাবে এই রকমই থাকে ত? ব্রতপালনের জন্য তুমি কতকাল তোমার সুন্দর অধরোষ্ঠ রক্তরাগে বঞ্চিত না করলেও তা স্বভাবতই এতই রক্তবর্ণ যে ঐ অচিরোদ্‌গত লাল পল্লবগুলি স্বচ্ছন্দে উপমিত হতে পারে তার সঙ্গে।

হে তাপসী, তোমাকে ভালবেসে যে সব হরিণ তোমার হাতের কুশ-গুচ্ছ কেড়ে নেয়, তোমার প্রেমমুগ্ধ সেই সব হরিণের প্রতি বিরক্ত হও না ত? হে কমলাক্ষী, তোমার আকর্ণবিস্তৃত সদাচকিত নয়নের কিছুটা সাদৃশ্য ঐ হরিণীরা তাদের নিজ নিজ নয়নে দেখাতে চায়।

পার্বতীর সুন্দর আকৃতি, ত্রিলোকবিমোহন রূপ কখনো পাপ কার্য করতে পারে না—আজ তোমাকে দেখে বুঝলাম এই আবহমান প্রচলিত প্রবাদ বর্ণে বর্ণে সত্য। তপশ্চর্যাকালীন তোমার এই চরিত্র কঠোরতপা মুনিঋষিদেরও শিক্ষার স্থল।

ভদ্রে, পর্বতরাজ হিমালয়ের উপর কলনাদিনী স্বর্গগঙ্গার পবিত্র জলধারা এসে কলকল শব্দে পড়ছে। সে ধারায় সপ্তর্ষিগণের পুজোপহার ও কুসুমসম্ভার ভেসে আসায় মনে হচ্ছে ঐ স্বর্গচ্যুত জলধারা হাসতে হাসতে হিমাদ্রিশীর্ষ অভিষিক্ত করছে। কিন্তু সে ধারায় হিমালয় ততটা পবিত্র হচ্ছে না, তোমার এই অপাপবিদ্ধ চরিত্রে ও অদ্ভুত তপস্যার

যতটা পবিত্র হচ্ছেন। মোট কথা, হিমালয় আজ তোমার কৃপায় ভরে গেলেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থ ও কামকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ধর্মকে নিষ্কাম চিত্তে আশ্রয় করেছ তুমি। তাই আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই সার। তা না হলে তোমার মত মেধাবিনী কখনো তাকে হৃদয়ে বরণ করে নিত না।

হে ব্রহ্মচারিণী, তুমি আমাকে যেভাবে আতিথ্য দান করলে তাতে আর এখন আমাকে পর ভাবতে পার না। পরকে কেউ কখনো এত আদর যত্ন করে না। কিন্তু তুমি লজ্জায় এমন সংকুচিত হচ্ছ কেন? সাধু সজ্জনের সঙ্গে দুচারটে কথা বললেই আত্মীয়তা জন্মায়—পণ্ডিতরা এই কথাই বলেন। সুতরাং আমাদের আত্মীয়তা হতে কি আর বাকি আছে? এখন ত আর আমি তোমার পর নই।

হে তাপসী, তোমার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলে এই ব্রাহ্মণ যুবক অর্থাৎ আমি যত বাচাল বা চপল হই না কেন, আমার সকল দোষ তুমি ক্ষমা করো। কেন না, তোমার গুণের সীমা নেই। তোমার এই আত্মীয় অর্থাৎ আমি দুএকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি বিশেষ গোপনীয় না হয় তা হলে কৃপা করে বলবে।

ত্রিভুবনের আদি বিধাতা হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম, পিতা তোমার পর্বতরাজির অধিপতি। সুতরাং কোন সুখ, কোন ঐশ্বর্যই তোমার পক্ষে দুর্লভ নয়। বরং তা অতিশয় সুলভ। তার উপর ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্যরাশি যেন তোমার অনিন্দ্যসুন্দর কলেবরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আছে তোমার নবীন অচিরোদ্ভিন্ন যৌবন—এর যে কোন একটাই তপস্যার ধন। কিন্তু এই সবগুলিই তুমি বিনা তপস্যাতেই পেয়েছ। সুতরাং আর তুমি কি চাও যার জন্য এত কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছ?

হে কৃশোদরী, যারা মনস্বিনী ও অভিমানিনী তারা কখনো কখনো পারিবারিক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে সংসারধর্ম ত্যাগ করে নবীন বয়সে তাপসীর বেশ ধারণ করে। কিন্তু তাও ত মনে হয় না। কারণ

তোমার মত এমন ফণিনীর মণিতে হাত দিতে কার এমন সাহস হবে ?

হে তাপসী, খুলে বল ত, তুমি কেন যৌবন বয়সের অনুরূপ বেশ-ভূষা ত্যাগ করে বৃদ্ধ বয়সের বেশ ধারণ করেছ, গাছের বল্কল পরিধান করেছ ? এই বয়সে তোমাকে তা কি মানায় ? তুমিই বলত, সন্ধ্যাকালে নীল আকাশে তারার মালা পরে যখন চাঁদ হাসে তখন কি সূর্য উদিত হয় ?

তুমি কি স্বর্গকামনায় তপস্যা করছ ? তা যদি হয় তাহলে তোমার শ্রম নিরর্থক। কারণ তোমার পিতৃভবন স্বর্গের সব দেবতাদেরই লীলাক্ষেত্র। তবে কি উপযুক্ত পতিলাভের জন্য তোমার এই তপস্যা ? কিন্তু তোমার মত সর্বাঙ্গসুন্দরীর পক্ষে এ শ্রম এ তপস্যা বৃথা। রত্নকেই লোকে যত্ন করে খুঁজে নেয়, রত্ন কখনো কারো খোঁজ করে না।

গৌরী, তোমার উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসই আমার সব প্রশ্নের উত্তর দান করেছে। তোমার হৃদয়ের কথা এতে সব বলা হলেও আমার মনের সংশয় যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না, তোমার প্রার্থিত কেউ থাকতে পারে। কারণ তুমিই সকলের প্রার্থিত, তোমাকেই সবাই চায়, সেক্ষেত্রে তুমি কাউকে চাও, এটা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

তা যদি হয় তবে দেখছি তোমার আকাঙ্ক্ষিত যুবক অতিশয় নির্দয় ও পাষাণপ্রাণ। তোমার নিটোল গণ্ডস্থলে কর্ণের অবতংসরূপী পদ্ম কতদিন দুলে পড়ে না। তোমার চাঁচরকেশ জটা বেঁধে পাকা ধানের শীষের মত হয়েছে, তার বন্ধ শিথিল হওয়ায় কপোলে ঝুলে পড়েছে। এই সব দৃশ্য সেই হৃদয়হীন যুবা কোন প্রাণে উপেক্ষা করছে ? কে সে নির্বোধ ?

কঠোর চান্দ্রায়ণাদি মুনিজনের অনুষ্ঠিত ব্রতপালন করতে গিয়ে তোমার দেহ ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। প্রখর সূর্যতাপে তোমার ভূষণধারণের স্থানগুলি পুড়ে কালি হয়ে গেছে। দিনের বেলায় ম্লান চন্দ্ররেখার মত আপাণ্ডুর কৃশাঙ্গী তোমাকে দেখে কোন হৃদয়বান পুরুষ ঠিক থাকতে পারে ?

তুমি যাকে চাও, যার জন্য এই তপস্যা, তোমার সেই বাঞ্ছিত প্রিয়

ব্যক্তির ভাগ্য খুবই খারাপ। তার হৃদয়ে হয়ত সৌন্দর্যের প্রতি কোন আসক্তি নেই। তা না হলে তোমার যে কুঞ্চিত পক্ষ্মলবিশিষ্ট সুন্দর কুটিল নয়ন দেখার জন্য লোকে লালায়িত হত, সেই হতভাগ্য নিজে তা উপভোগ করল না এবং কাউকে দেখতেও দিল না। ধিক তার জীবনে।

হে গৌরী, আর কতকাল এই বৃথা শ্রম করে তপস্যার অনলে সোনার অঙ্গ পোড়াবে? ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমিও অনেক তপস্যা করেছি, আমার সে তপস্যার ফল এক তিলও ক্ষয় হয়নি, সব সঞ্চিত আছে। সে ফলের অর্ধভাগ আমি তোমায় না হয় দান করছি যার দ্বারা তুমি তোমার অভিলষিত প্রিয় ব্যক্তিকে লাভ করো। সেই সাধু ব্যক্তিটির পরিচয় জানার ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

এইভাবে সেই নবীন ব্রাহ্মণযুবক অন্তরঙ্গ ব্যবহারে পার্বতীর হৃদয়নিহিত গূঢ় অভিলাষটিকে আকর্ষণ করলেন। পার্বতী তার উত্তরে একটি কথাও বললেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর না দিলে পাছে অতিথি অবমাননা বোধ করেন এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তিনী সখীকে ইঙ্গিত করলেন। তাঁর অঞ্জনশূন্য নয়ন কাঁপতে কাঁপতে সখীর চোখের উপর পড়ল।

তখন উমার সেই সখী ব্রহ্মচারী অতিথিকে বলল, সাধুবর, যদি আপনার শোনার একান্তই কৌতূহল হয়ে থাকে তাহলে শুনুন, কিজন্য আমাদের এই সখী তাঁর অতিকোমল কলেবর এত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করেছেন। কিজন্য অতিপেলব শতদল দুঃসহ আতপতাপ নিবারণে উদ্যোগিনী হয়েছেন।

ইনি ইন্দ্র প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্যশালী দেববৃন্দের কাউকে পতিত্বে বরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন না। মদনকে ভস্মীভূত করে যিনি প্রমাণ করেছেন সৌন্দর্যের মোহে তাঁর চিত্ত বিগলিত হয় না, সেই 'অরূপহার্য' পিনাকপানিকে পতিরূপে পাবার জন্যই উমা এই কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন।

পূর্বে মদন যখন ত্রিপুরারিকে পুষ্পবাণ মেরেছিলেন, তখন তাঁর এক বিষম হুঙ্কারধ্বনিতে সে বাণ ত্রিপুরারির দেহ স্পর্শ করতে পারে

নি, মাঝপথ হতে ফিরে আসে। কিন্তু তা উমার মর্মস্থল একেবারে বিদ্ধ করে। পুষ্পবাণ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাই ত্রিপুরারির রোষাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেও সে বাণ উমার হৃদয়কে জর্জরিত করে তুলল।

সেইদিন থেকে উমা পিতৃগৃহে বাস করছিলেন বটে, কিন্তু দুঃসহ মদনতাপে তাঁর দেহমন পুড়ে খাক হচ্ছিল। মদনতাপ নিবারণের জন্য এই বালা ললাটে গাঢ় চন্দনের এমন তিলক পরতেন যে তাতে তাঁর কুন্তলচূর্ণগুলি একেবারে ধূসর হয়ে যেত। তাঁর তপ্ত দেহকে শীতল করার জন্য পাথরের মত শক্ত বরফের চাপের উপর পড়ে থাকতেন। কিছুতেই তাঁর দেহ মনের জ্বালা জুড়োত না।

ত্রিপুরারির ত্রিপুরবিজয়াদি অলৌকিক কাহিনী পার্বতী যখন গান করতেন তখন বাষ্পভরে তাঁর কণ্ঠ স্খলিত হত। অনেক কিন্নররাজকন্যা সেই সব গান নিয়ে আলোচনা করতে করতে পার্বতীর প্রিয়সখী হয়ে উঠেছিল। তারা পার্বতীর সেই সকরুণ কান্নার ধ্বনির মত গান শুনে নয়নজল সংবরণ করতে পারত না।

সখী আমাদের রাত্রিতে ঘুমোতে পারে না। যদিও বা শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসে, অমনি হঠাৎ সে 'হে নীলকণ্ঠ, আমাকে ফেলে কোথায় যাও' বলে ঘুমের ঘোরে একথা বলতে বলতে কার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরার জন্য হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে সে পাগলের মত হয়ে যায়।

উমা নিজের হাতে চন্দ্রশেখরের কত সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। নির্জনে বসে কোন একখানি ছবি নিয়ে তিনি বলেন, হে অন্তর্যামী, পণ্ডিতরা বলেন, তুমি সর্বদা সকল ঘটে বিরাজ করছ। তা যদি হয়, তবে তোমার একান্ত আশ্রিতা, তোমাতেই সমর্পিতপ্রাণা উমাকে কি করে ভুলে আছ তুমি? তুমি কি আমার অন্তরের কথা বুঝতে পারছ না? এই সব বলে চিত্রাঙ্কিত চন্দ্রশেখরকে কত অনুযোগ করে।

সেই জগৎপতি চন্দ্রশেখরকে পাবার জন্য অনেক কিছু করেও উমা যখন দেখলেন কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, পাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না, তখন তিনি তাঁর পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যার জন্য এই তপোবনে এসে বাস করতে লাগলেন।

হে ব্রহ্মচারী, চারদিকে বড় বড় যে সব গাছ দেখছ এগুলি আমাদের সখী উমার স্বহস্তরোপিত। যেদিন সে প্রথম তপস্যায় বসে সেদিন সে এই গাছগুলি রোপণ করে। সখীর তপস্যার তারা সাক্ষী হিসাবে বিরাজ করছে। আজ দেখ, তারা কত বড় হয়েছে। ফলভারে তারা নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু চন্দ্রশেখরকে পাবার যে আশায় উমার এই কঠোর তপস্যা, সে আশার একটুখানি অংকুরও উদ্গত হলো না, ফল ত দূরের কথা।

বর্ষণের অভাবে কর্ষিত ভূমি যেমন শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, তপস্যা করতে করতে আমাদের সখীরও তেমনি দশা হয়েছে। সেই বিশুষ্ক কর্ষিত ভূমিতে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জলবর্ষণে তার বুক শীতল করে দেন, তেমনি করে অতি দুর্লভ মহাদেব কত দিনে যে সখীর অভিলাষ পূরণ করে তার বুক শীতল করে দেবেন তা আমরা জানি না।

উমার সখীর এইসব অকপট কথাগুলি শুনতে শুনতে ব্রহ্মচারী যুবকের চোখে মুখে এক আনন্দের ও সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি হৃদয়ের এই হর্ষোৎফুল্ল ভাব কোনমতে চেপে রেখে উদাসীন-ভাবে উমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যা শুনলাম তা কি সত্যি না আমার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে?

পাছে অতিথির অবমাননা হয় এই আশঙ্কায় আর নীরব থাকতে পারলেন না উমা। তিনি কুসুমকলির মত অঙ্গুলিগুলি জড়ো করে স্ফটিকের জপমালা হাতে নিয়ে কন্যাজনসুলভ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে সংক্ষেপে হৃদয়ের অতি নিগূঢ় কথাটি বলে ফেললেন।

তিনি বললেন, হে বেদবিদ্যা পারদর্শী, আপনি যা শুনলেন, তা সব সত্য। এই হতভাগিনী শিবলাভরূপ অতি উচ্চতম স্থান লঙ্ঘন করতে যথার্থই আকুল। আমার সকল তপস্যা তাঁকেই পাবার জন্য। বলতে পারেন এটা একটা দুরভিলাষ, কিন্তু অভিলাষের কোন সম্ভব অসম্ভব বলে কিছু নেই। জীবের মনোবাসনা কখনো শক্তির পর্যা-লোচনা করে প্রবৃত্ত হয় না।

উমার কথা শেষ হলে ব্রহ্মচারী বললেন, মহেশ্বরকে আমি জানি।

একবার যার কাছে গিয়ে চরম অবমাননা লাভ করেছ, আবার তাকেই পাবার জন্য তপস্যা করছ! সতত কুকর্মে আসক্ত মহেশের কথা মনে করে তোমার এই অভিলাষ ও আরাধনা সমর্থন করতে পারলাম না।

পার্বতী, তোমার এই এমন সুন্দর হাতখানি যখন মঙ্গলচূর্ণরঞ্জিত সূত্রে শোভা পাবে তখন তোমার এই হাত কিকরে শম্ভুর হাত প্রথম গ্রহণ করবে? তার হাতে কালসর্প জড়িয়ে আছে। প্রথম প্রথম ভয় করবে না ত সে হাত গ্রহণ করতে?

একবার ভেবে দেখ, বরবধূর কাপড়ের গাঁটছড়াই বা বাঁধবে কি করে? তোমার পরিধানে থাকবে বিবাহের কলহংসচিত্রিত বসন আর মহেশের পরিধানে থাকবে রক্তাক্ত গজচর্ম যার থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে পড়বে। ভেবে দেখ, তোমাদের দুজনের কাপড়ে কি গাঁটছড়া বাঁধা যাবে?

বিবাহের পর তোমার সুন্দর পা দুখানি যখন শ্বশুরবাড়ির চতুঃশালায় প্রবেশ করবে তখন সেখানে সারা আঙ্গিনায় ফুল ছড়ানো থাকবে আর তুমি তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। তা না হয়ে তোমার এমন সুন্দর আলতাপরা পা দুখানি পড়বে শ্মশানে যেখানে মড়ার মাথার খুলিতে চারদিক পরিপূর্ণ।

সেই ত্রিনেত্র মহেশ তোমাকে আলিঙ্গন করবে। তোমার এই দেবভোগ্য স্তনদ্বয়ের উপর শ্মশানের ছাই লাগবে। কারণ মহেশ দিনরাত শ্মশানের চিতাভস্ম মেখে বেড়ায়।

তারপর বিবাহের পর তোমাদের বরকনের রকম দেখে হাসতে থাকবে জগতের লোক। গজরাজের উপর চড়ে বরকনে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার পরিবর্তে একটা বৃদ্ধ ষাঁড়ের উপর চড়ে যেতে হবে তোমাদের। তোমাদের সেই দুর্দশা দেখে সাধু সজ্জনরা অবশ্য মুখের হাসি চেপে মাথা নিচু করে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা উপহাস করবে। হাসিতে ফেটে পড়বে।

পিনাকীর সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করে তোমার অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই পিনাকীর মোহে পড়ে জগতের আনন্দস্বরূপ চন্দ্রকলার কি দুর্দশা হয়েছে! আর ত্রিজগতের নয়ন জ্যোৎস্নারূপিনী

তুমিও মাটি হতে বসেছ তার জন্য।

যার তিনটি চোখ, জন্মের কোন স্থিরতা নেই, চিতাভস্ম যার দেহের অনুলেপ, বিষধর কালসর্প যার অলঙ্কার, পরিধান যার দিগ্‌বসন অর্থাৎ যে উলঙ্গ, সেই মহেশের মধ্যে তুমি বরের এমন কোন গুণ দেখলে যার জন্য তুমি তপস্যা করছ?

সুতরাং অনুরোধ করি, এই অসদিচ্ছা হতে এখনো চিত্ত নিবৃত্ত করো। তোমার মত লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত সুলক্ষণা কন্যা আর মহেশের মত এক অপদার্থ ব্যক্তি—এ দুইএর মধ্যে কখনো মিলন হওয়া উচিত নয়। শ্মশানে যে সব শূল পোঁতা আছে সেই সব শূলে বেঁধে বধ্য ব্যক্তিদের প্রাণ সংহার করা হয়। কোন জ্ঞানবান পুরুষ কি সেই সব শূলকে বেদবিহিত পশুবন্ধনের যূপের মত মনে করে অর্চনা করে থাকে? শ্মশানশূলের পক্ষে যূপবৎ অর্চনা যেমন অসম্ভব, তেমনি মহেশের পক্ষে তুমিও অসম্ভব।

ব্রহ্মচারী অতিথি যখন পার্বতীর অভীষ্টদেবের বিরুদ্ধে নানা অকথা কুকথা বলতে লাগলেন তখন তা শুনতে শুনতে পার্বতীর অধরোষ্ঠ কাঁপতে লাগল এবং অপাঙ্গযুগল লাল হয়ে উঠল। পার্বতী তখন বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে বক্র নয়নে ব্রাহ্মণ যুবকের দিকে চাইলেন।

তিনি বললেন, তুমি যেভাবে হরের সম্বন্ধে আমাকে বলছ তাতে আমার এই ধারণা হয়েছে তাঁর বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জান না তুমি। যারা অজ্ঞ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য তারাই অলোকসামান্য মহাত্মাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে থাকে। তাঁদের কার্যকলাপের কারণ অজ্ঞ বা জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না।

যারা সংসারের বিপদাপদ এড়াবার জন্য সতত ব্যাকুল, যারা ঐহিক সুখের জন্য সর্বদা লালায়িত, তারা শুধু নিজের ভাল খুঁজে বেড়ায়। যিনি ত্রিজগতের আশ্রয়স্থল, যাঁর আকাঙ্ক্ষার কিছুই নেই, তিনি নিজের জন্য কি করবেন? এই ধরনের মহাপুরুষের কাছে ফুলের মালা ও কন্দর্প—সবই সমান।

তুমি মূঢ়মনা, তাই তাঁকে অপদার্থ বলছ। সেই দেবাদিদেব মহাদেব যত দারিদ্রই হোন, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের কারণ। তাঁর কৃপায় অতি দীন হীনও রাজা মহারাজা হতে পারে। যতই তিনি শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান না কেন, তিনিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তাঁর আকার যত ভীষণই হোক না কেন, আসলে তিনি শান্তমূর্তি সদাশিব। তুমি ত দূরের কথা, ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে সেই পিনাকপানির যথার্থ স্বরূপ জানতে পেরেছে।

সেই পিনাকপানি ভূষণই ধারণ করুন, বা বিষধর কালসর্পের মালাই পরুন, তাঁর পরিধানে ক্ষৌমবসন থাক বা গজচর্মই থাক, তাঁর হাতে নরকপাল বা মস্তকে চন্দ্রই শোভা পাক—তিনি বিশ্বরূপ। সেই রূপাতীত রূপবানের স্বরূপ কে বুঝতে পারে ?

তুমি শ্মশানের যে চিতাভস্মের কথা বলে শ্লেষ করেছিলে, সেই চিতাভস্ম দেবাদিদেব মহাদেবের অঙ্গ স্পর্শ করে পবিত্র হয়ে উঠেছে। তুমি কি জান, সেই নটরাজ যখন তাণ্ডব নৃত্য করেন তখন তাঁর অঙ্গচ্যুত ঐ চিতাভস্ম দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাড়াতাড়ি অঙ্গে লেপন করে কৃতার্থ ও ধন্য হন।

তিনি দরিদ্র বলে বৃষের স্কন্ধে গমনাগমন করেন—তুমি বলেছ। কিন্তু সেই বৃষভ বাহন যখন চলে যান, তখন মদস্রাবী দিগ্‌গজে বিচরণ-কারী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি গজপৃষ্ঠ হতে নেমে তাঁর চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণাম করে কৃতার্থ হন। তখন সেই প্রণামরত দেবরাজের মস্তকস্থিত প্রস্ফুটিত মন্দারকুসুমের পরাগে মহেশ্বরের চরণযুগল রঞ্জিত হয়।

তুমি অসৎ প্রকৃতির লোক, আত্মা তোমার অধঃপতিত, তাই তুমি তাঁর অনেক দোষের কথা বলেছ। কিন্তু এই দোষকীর্তন করতে গিয়ে একটা সত্য কথা বলে ফেলেছ। তাঁর জন্মের স্থিরতা নেই। কিন্তু যিনি স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মারও উৎপত্তির কারণ তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে ?

অথবা এই সব বাদানুবাদের প্রয়োজন কি ? তুমি তাঁর সম্বন্ধে যা

যা শুনেছ বা তাঁকে যেমন জান, তিনি তেমনই হোন, অথবা তার চেয়ে খারাপই হোন, তাঁকেই স্বেচ্ছায় আমার মন প্রাণ সমর্পণ করেছি সম্পূর্ণ-রূপে। যে যথেচ্ছাচারী তিনি কি কখনো স্তুতিনিন্দার ধার ধারে? কোন নিন্দায় তিনি দৃষ্টিপাত করেন না।

উমার এই কথার পর ব্রহ্মচারী কম্পিত অধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা দেখে উমা তাঁর সখীকে বললেন, সখী, এই ব্রাহ্মণ যুবকেব ওষ্ঠ কাঁপছে, কি যেন বলতে চাইছে, ওকে থামাও। আমি ওর কথা আর শুনতে চাই না। শুনলে পাপ হবে। কারণ মহাপুরুষের যারা নিন্দা করে, তারাই শুধু পাপী নয়, যারা তা শোনে তারা তাদের থেকে বেশী পাপী।

এই বলে রাগ কবে উমা যেমন উঠে চলে যাবার জন্য রওনা হলেন এবং তাঁর স্তনাচ্ছাদন বল্কল স্খলিত হয়ে পড়ল তখন বৃষভধ্বজ মহাদেব নিজমূর্তি ধারণ করে সস্মিতমুখে দুবাহু বাড়িয়ে উমার গতিরোধ করলেন।

বহু তপস্যালব্ধ তাঁর প্রাণেশ্বরকে অকস্মাৎ দেখে বাত্যাহত নলিনীর মত কাঁপতে লাগলেন উমা। তাঁর তপস্যাক্লিষ্ট ক্ষীণ কলেবর ঘামের জলে যেন স্নান করে উঠল। তিনি স্থানান্তরে যাবার জন্য যে চরণ শূন্যে তুলেছিলেন সে চরণ শূন্যেই তোলা রইল। দ্রুতধাবিনী কোন স্রোতস্বতী যেমন পথে কোন পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সামনে যেতে পারে না আবার পিছনেও যেতে পারে না তেমনি পর্বতরাজকন্যা আর অগ্রসর হতে পারলেন না, আর পিছনেও ফিরতে পারলেন না। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দভাবে।

তখন স্বমূর্তি ধারণ করে চন্দ্রশেখর বললেন, হে অবনতাঙ্গী, তুমি তপস্যার দ্বারা আমাকে ক্রয় করেছ। আজ হতে আমি তোমার গুণমুগ্ধ দাস হলাম।

চন্দ্রশেখরের মুখ থেকে এই কথাগুলি শুনে গৌরী এতদিনের তপস্যার সব ক্লেশ, সব গ্লানি ভুলে গেলেন। তিনি যেন নবজীবন লাভ করলেন।

ষষ্ঠ সর্গ

দেবাদিদেব মহাদেবের বহুপ্রার্থিত দর্শনলাভের পর গৌরী একজন সখীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, আমি এখনো কন্যা, পিতা আমার প্রভু। সুতরাং কৃপা করে আমার পিতা পর্বতরাজ যাতে আপনার হাতে আমাকে দান করেন তার ব্যবস্থা করুন।

সখীর মুখে সংবাদ পাঠিয়ে উমা মহাদেব বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রইলেন। বসন্তকালে সহকারলতা যেমন তার যা কিছু বলার বা ঋতুরাজকে যা কিছু জানাবার সমস্ত কোকিলার কুহুধ্বনিচ্ছলে জানিয়ে নিজে উৎফুল্ল হৃদয়ে বিরাজ করে, তেমনি উমাও সব কথা বলার ভার দিয়ে নিজে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রইলেন।

কন্দর্পদর্পহারী মহাদেব 'তাই হবে' বলে উমাকে বিদায় দিয়ে অঙ্গিরা, মরীচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব স্মরণ করামাত্র সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল নিজ নিজ জ্যোতিপুঞ্জের দ্বারা আকাশ উদ্‌ভাসিত করে তৎক্ষণাৎ অরুন্ধতীকে নিয়ে মহাদেবের সামনে আবির্ভূত হলেন।

সেই আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর তীরবর্তী মন্দারকুসুমগুলি উড়ে এসে তার ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর পড়ছে, ভাসছে ও খেলা করছে। দিক্‌নাগদের মদবারিগন্ধে সুগন্ধি হয়ে উঠেছে তার জলরাশি। মহাদেবের সামনে ঋষিরা এসে যেন সেই সুগন্ধি জলরাশিতে স্নান করলেন।

সেই সব ঋষিদের যজ্ঞোপবীতগুলি রত্নময়, পরিধানে স্বর্ণময় বল্কল, হাতে রত্নময় জপমালা। দেখলে মনে হয় যেন মুক্তাফলসমন্বিত ও কাঞ্চনবল্কলবিশিষ্ট কল্পতরুরাজি রক্তসূত্রে শোধিত হয়ে হিমালয় প্রদেশে নেমে আসছে।

সৌরলোকের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত সপ্তর্ষিলোক হতে ঋষিরা যখন নামছিলেন তখন তাঁদের দেখে সূর্যদেব স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর রথের অশ্বগুলিকে থামিয়ে রশ্মিধারণ করে ঋষিদের গায়ে যাতে আঘাত

না লাগে তার জন্য রথের পতাকা নামিয়ে দিলেন। যিনি ত্রিলোকের উপাস্য দেবতা, সেই সূর্যদেবও ঋষিদের প্রণাম করে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে রইলেন তাঁদের দিকে।

মহাপ্রলয়কালে জগতের সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সপ্তর্ষিরা হন না। কল্পান্ত সংকটে পৃথিবী যেমন বাহুলতার দ্বারা মহাবরাহের দশন আশ্রয় করেন এবং সেই দশনের দ্বারাই প্রলয়পয়োধিজল হতে উদ্ধার লাভ করে তাতেই বিশ্রাম করেন, তেমনি সপ্তর্ষিরাও সেই মহাবরাহের দশন বা দন্তকে আশ্রয় করে উদ্ধার পান।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টির পর যা যা বাকি ছিল সে সব এই সপ্তর্ষিগণই সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্যই ব্যাস প্রমুখ পুরাণকারেরা এঁদের পুরাতন ধাতা বা অতিপ্রাচীন সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত করে থাকেন।

জন্ম জন্মান্তরজাত তপস্যার ফল ভোগ করলেও তপস্যা করে যাচ্ছেন তাঁরা। কারণ তাঁদের তপস্যা সকাম নয়, তাই ফলসিদ্ধিতে নিবৃত্ত হন না তাঁরা। তাঁদের তপস্যা নিষ্কাম বলে তপস্যার খাতিরেই তপস্যা করে যান তাঁরা।

শিবের সকাশে যে সব ঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরুন্ধতী। সতীকুল শিরোমণি নির্নিমেষ নয়নে স্বামী বশিষ্ঠের চরণের দিকে চেয়ে আছেন। দেখলে মনে হয় কঠোরতপা ঋষিদের সিদ্ধি মূর্তি পরিগ্রহ করে অনন্ত শোভায় দীপ্যমান হয়ে আছে।

জগদীশ্বর শঙ্কর সমাগত ঋষিদের ও সতীসাধ্বী অরুন্ধতীকে সমান সমাদরের সঙ্গে নিরীক্ষণ করলেন। স্ত্রী পুরুষের ভেদজ্ঞান না করে মহাত্মারা শুদ্ধ চরিত্র দেখেন। সজ্জন ধার্মিকের চরিত্রই পূজার যোগ্য। স্ত্রী পুরুষের হিসাব গণনা সেখানে নিরর্থক।

সমাগত সপ্তর্ষিদের সঙ্গে অরুন্ধতীকে আসতে দেখে বিবাগী শম্ভুর পত্নীপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। কারণ সাধ্বী সহধর্মিনী ধর্মাচরণের প্রধান সহায়।

পার্বতীর প্রতি শম্ভু সদয় হওয়াতে এবং তাঁর মনে দারপরিগ্রহের

অভিলাষ জাগাতে পূর্ব অপরাধে ভীত হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেবের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এইভাবে পরম স্বস্তি-বোধ করতে লাগলেন অতনু।

সামনে বিশ্বচরাচরের একমাত্র ধ্যেয় জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরকে দেখে বেদাধ্যয়নপর সপ্তর্ষিদের কলেবর আনন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠল। তাঁরা চন্দ্রশেখরের যথাবিধি অর্চনা করে বলতে লাগলেন ঃ

আমরা নিয়ম করে যে বেদাধ্যয়ন করেছিলাম, হোমানলে যথাবিধি আহুতি দিয়েছিলাম এবং চান্দ্রায়ণাদি যে কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলাম আজ আপনার দর্শনলাভে বুঝলাম আমাদের সেই সব তপস্যা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের ফল পরিপক্ক হয়েছে এতদিনে।

হে দেব, আপনি ত্রিজগতের অধীশ্বর, আপনার যে মন ব্রহ্মাদিরও অবাঙমানসগোচর সেই মনে যখন আমাদের স্মরণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই বলতে হবে আমাদের সকল সাধনা সকল তপস্যার ফল পরিপক্ক হয়েছে।

হে দেব, আপনি যাদের হৃদয়ে দেখা দেন, তাদের মত ভাগ্যবান আর কে থাকতে পারে? তাদের জীবন সার্থক। যে আপনি বেদ ব্রহ্ম সব কিছুর উৎপত্তিস্থল সেই আপনিই যখন আমাদের স্মরণ করেছেন, এ কি আমাদের কম ভাগ্যের কথা?

হে দেব, আমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপরে ঠিক সপ্তর্ষিলোক সৌরলোক ও চন্দ্রলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু আজ আপনার সানুগ্রহ স্মরণে শুধু স্থানের দিক থেকে নয়, সম্মানের দিক থেকেও আমরা অনেক উপরে স্থাপিত হলাম।

ভগবান, আজ আপনার এই অনুগ্রহে ও স্মরণে আমরা বড়ই গৌরবান্বিত বোধ করছি। কারণ মহাপুরুষের কৃপায় সমাদৃত ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

হে বিরূপাক্ষ, আপনি আজ আমাদের স্মরণ করায় যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি তার কিছুমাত্র জানাবার ভাষা ও সামর্থ্য আমাদের নেই। আপনি প্রাণীদের অন্তরাত্মাস্বরূপ অন্তর্যামী পুরুষ, সুতরাং আমাদের মনের অবস্থা সবই বুঝতে পারছেন।

হে শঙ্কর, আপনাকে আমরা নয়নসম্মুখে দেখলেও আপনার স্বরূপ আমরা বুঝতে পারছি না। হে কৃপাময়, কৃপা করে একবার নিজের স্বরূপ বিবৃত করুন। আপনি সব জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

হে বিশ্বনাথ, এ আপনার কোন রূপ? যে রূপে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে থাকেন এ রূপ কি সেই রূপ? এই কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা না কি পালনকর্তা বিষ্ণু? অথবা একি আপনার সেই বিশ্বসংহারকারী রুদ্ররূপ? নিজে আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কৃতার্থ করুন আমাদের।

অথবা থাক, আমাদের এ প্রার্থনা পূরণ করতে হবে না। এখন কৃপা করে বলুন, কি করতে হবে আমাদের। আপনার স্মরণমাত্রই এসেছি আমরা।

সপ্তর্ষিদের কথা শেষ হলে পরমেশ্বর মহাদেব যখন উত্তরদানের জন্য মুখ খুললেন তাঁর দশনচ্ছটায় তাঁর ললাটচন্দ্রের কান্তি বা সৌন্দয আরো বেড়ে গেল।

তিনি বললেন, ঋষিগণ, তোমরা জান, আমি আত্মস্বার্থে অর্থাৎ নিজের জন্য কিছু করি না। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি অষ্টবিধ যে সব পদার্থ নিয়ে আমার অষ্টমূর্তি গঠিত, সেই সব পদার্থ পরার্থে নিয়োজিত! তাদের নিজের কোন প্রয়োজন নেই।

আমি স্বার্থলেশশূন্য হলেও আজ শত্রুদলিত দেবগণ আমার একটি পুত্রের জন্য বার বার প্রার্থনা করেছেন আমার কাছে। তৃষ্ণার্ত চাতক যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তড়িন্ময় জলদের কাছে জলবর্ষণ প্রার্থনা করে, তেমনি দেবতারাও শত্রুকুল নির্মূল করার জন্য আমার একটি সন্তান ভিক্ষা করছেন।

যজমান যেমন হোমানল উৎপাদনের জন্য অরণি নামক অগ্নিমন্থন কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করতে চায়, আমিও তেমনি একটি পুত্রলাভের জন্য পার্বতীকে চাই।

সপ্তর্ষিবৃন্দ, তোমরা আমার এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য হিমালয়ের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যা পার্বতীকে প্রার্থনা করো। কারণ সৎপুরুষের

দ্বারা সংঘটিত বিবাহসম্বন্ধ কখনো কুফলপ্রসূ হয় না।

সেই প্রসিদ্ধ, সমুন্নত, সুপ্রতিষ্ঠ ও বসুন্ধরার ভারনির্বাহক হিমালয়ের সঙ্গে আমার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলে আমি কোনভাবে বঞ্চিত হব না। সর্বতোভাবেই আমি সাফল্য লাভ করব।

পার্বতীর জন্য হিমালয়কে কি বলতে হবে তা তোমাদের শিখিয়ে দিতে হবে না। কারণ সাধু সজ্জনেরা তোমাদের প্রণীত আচার আচরণ পালন করতেই সকলকে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

এই বিবাহব্যাপারে পূজনীয় অরুন্ধতীই প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে যোগাযোগ করবেন। কেন না এই সব কাজে কুলনারীদেরই প্রাধান্য। তাঁদের ভূমিকাই বেশী।

অতএব এখন কালবিলম্ব না করে এই কার্য সম্পাদনের জন্য ওষধিপ্রস্থ নামক হিমালয়ের উপবে চলে যাও। যেখানে মহাকোশী নদী নির্ঝরের আকারে বার হয়েছে সেখানে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।

মহাযোগী পরম জিতেন্দ্রিয় পবমেশ্বর মহাদেব এইভাবে পরিণয়ের জন্য উদ্যোগী হলে প্রজাপতিতনয় সপ্তর্ষিমণ্ডল সব লজ্জা ত্যাগ করলেন। তাঁদের মত মাননীয় ঋষিরাও সপত্নীক বলে এতদিন তাঁরা বিবাহব্যাপারে সঙ্কোচ বোধ করতেন। আজ সে সঙ্কোচ কেটে গেল।

'আচ্ছা এখনি যাচ্ছি' বলে সেই মুনিমণ্ডল হিমালয় অঙ্গনে প্রস্থান করলেন। ভগবান ত্রিলোকনাথ মহাদেবও পূর্বনির্দিষ্ট মহাকোশী প্রপাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মনোরথের মত গতিতে ঋষিগণ বিদ্যুৎবেগে সুনীল আকাশমার্গে উঠে অবিলম্বে সেই ওষধিপ্রস্থে গিয়ে উপনীত হলেন।

অপরিমিত ধনরত্নে অমিত সম্ভারে পরিপূর্ণ অলকানগরীকে যেন তুলে এনে ঐ ওষধিপ্রস্থ নগররূপে স্থাপন করা হয়েছে। অথবা স্বর্গের অতিরিক্ত অংশকে তুলে এনে এই নূতন নগর ও উপবেশন স্থাপন করা হয়েছে।

এই নগরের চারদিক গঙ্গাব প্রবাহে পরিবেষ্টিত যেন পরিখার দ্বারা

শোভিত। বড় বড় মণিশিলার প্রাচীর বেষ্টনে সেই নগর সুরক্ষিত। সেই নগরের প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ নিয়ত জ্যোতির্ময় লতাগুল্মের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সে নগব যেমন সুরক্ষিত তেমনি শোভা ও সৌন্দর্যে মনোরম।

সেখানে কেউ কারো হিংসা করে না। অতি মনোহর কোটি চন্দ্রের প্রভায় যেন সতত সমুজ্জ্বল। সেখানে কেউ কোন প্রাণীকে ভয় করে না, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা হিংসাভাব ভুলে গেছে। যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্নরেরা সে নগরের অধিবাসী। বনদেবতারা সেখানে পুরকামিনী।

সেখানে সমুন্নত প্রাসাদসমূহের শিখরদেশে প্রায়ই মেঘ লেগে থাকে। সে মেঘ গুড় গুড় শব্দ করে। সেই শব্দ প্রাসাদমধ্যে প্রতি-ধ্বনিত হওয়ায় মনে হয় বুঝি তালে তালে মৃদঙ্গ বাজছে।

সেই ওষধিপ্রস্থনগরে অত্যুচ্চ কল্পতরুরাজির শাখায় চিরনবীন পল্লবগুলি বাতাসের আঘাতে পত পত শব্দে উড়তে থাকে। বড় বড় রাজপুরীতে সবুজ ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করে পতাকা নানা সজ্জায় সজ্জিত করে উড্ডীন করা হয়। তাছাড়া প্রকৃতিদত্ত পল্লবাংশুকের পতাকা শোভা পেতে থাকে।

রাত্রিকালে স্ফটিক হর্ম্যগুলিতে সুরম্য সুরাপান স্থানগুলি ঝলমল করে। আকাশে উদিত তারাগুলির নির্মল প্রতিবিম্বগুলি সেই সব হর্ম্যসমূহে পড়ে।

সেই সব হর্ম্যরাজির প্রকোষ্ঠে যে সব ওষধিপ্রদীপ জ্বলে, জানালা দিয়ে সেই প্রদীপের আলো পথের উপর পড়ায় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে অভিসারিকারা সেই আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যায়। তারা অন্ধকার বুঝতে পারে না বা কোন বাধা পায় না।

সে নগরে সকলে অনন্ত যৌবনানন্দ উপভোগ করে। সেখানে প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য বলে কোন কিছু নেই। সেখানে পুরবাসীদের রতিখেদজনিত কোন অস্বস্তি তাদের সুখনিদ্রাকে ব্যাহত করে না।

সেই ওষধিপ্রস্থনগরে শত্রুগণের কোন শত্রুতা ছিল না, পরম মিত্রভাবে

সকলে বসবাস করত। যা কিছু কলহবিবাদ তা শুধু অভিমানিনী যুবতীদের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। সেই সব যুবতীরা যখন প্রেমের ব্যাপারে রেগে যেত তখন তারা চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি তুলে তাদের যুবক প্রিয়তমদের শাসাত। ক্রোধে তাদের ভ্রূলতা আকুঞ্চিত হত এবং তাদের ওষ্ঠগুলি কাঁপতে থাকত। মানিনীদের মানভঞ্জনের জন্য অসহায় পতি ও প্রেমিকরা নানাভাবে কাকুতি মিনতি করত।

সেই নগরের বাইরে গন্ধমাদন নামে এক অতি সুন্দর উপবন ছিল। শুধু নামে নয়, কাজেও তা ছিল সত্যিই গন্ধমাদন। তার সুগন্ধে আমোদিত হয়ে থাকত সারা নগর। শত শত কল্পতরুতে পরিপূর্ণ সে উপবন। পথিক বিদ্যাধরগণ পথ চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন সেই কল্পবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে বিশ্রাম করত এবং ক্রমে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হিমালয়ের সেই অপূর্ব নগর নিরীক্ষণ করে চলে গেলেন। বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে তাঁরা স্বর্গকামনায় পূর্ণ জীবনে যে কৃচ্ছ্রসাধনা ও কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন তা ব্যর্থ মনে করতে লাগলেন। তাঁরা সেই নগর দেখে ভাবলেন বেদ বৃথাই স্বর্গের প্রশংসা করেছে। আমরা বেদবিহিত স্বর্গলাভের জন্য এত দুষ্কর তপস্যাদি করে বঞ্চিত হয়েছি।

ঋষিরা যখন আকাশপথে হিমালয় সদনে সবেগে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন তখন নগরতোরণরক্ষী দৌবারিকগণ ঊর্ধ্বমুখে দেখতে লাগল তাঁদের। তাঁদের পিঙ্গলজটাজাল চিত্রার্পিত অনলশিখার মত নিশ্চলভাবে শোভা পাচ্ছিল আকাশের গায়ে।

আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়ে ঋষিগণ যখন বৃদ্ধানুক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে হিমালয়ভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন জলমধ্যে প্রতিফলিত সূর্যপঙক্তির মত এক অনির্বচনীয় শোভার সৃষ্টি হলো।

সেই সব জগৎপূজ্য ঋষিদের আসতে দেখে পর্বতরাজ হিমালয় অর্ঘ্য নিয়ে দূর হতে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটে গেলেন। তাঁর দ্রুতক্ষিপ্ত পদভরে বসুন্ধরা যেন নেমে যেতে লাগল।

শিলাময় সমুন্নত হিমালয়ের মধ্যবর্তী নানা ধাতু তাম্রবর্ণ অধরের মত এবং সমুচ্চ দেবদারুবৃক্ষ বিরাট ভুজদণ্ডের মত মনে হতে লাগল। তাঁর বক্ষস্হল ছিল শিলাময়। সুতরাং আজ বর্ণে বর্ণে তিনি সার্থক-নামা বলে প্রতিপন্ন হলেন।

তারপর হিমালয় সেই ঋষিদেব যথাবিধি অর্চনা করে নিজে পথ দেখিয়ে তাঁদের অন্তঃপুরে নিয়ে চললেন।

অন্তঃপুরে ঋষিগণ বেত্রনির্মিত আসনে উপবেশন করলেন। পর্বত-রাজ নিজেও আসন গ্রহণ করলেন। তারপর যুক্ত করে সেই সর্বশক্তিমান মুনিদের বলতে লাগলেন।

হে ঋষিবৃন্দ, আজ অকস্মাৎ আপনাদের এই শুভাগমনে আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনাদের এই পদার্পণ আমার কাছে বিনা মেঘে বারিবর্ষণ অথবা বিনা কুসুমে ফলোদ্‌গমের মত মনে হচ্ছে। ধ্যানে যাঁদের দর্শনলাভ করা যায় না, তাঁরা আজ নিজে থেকে স্বয়ং এই দীনের গৃহে এসে উপস্হিত হয়েছেন—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আপনাদের এই অনুগ্রহে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। ঘোর অজ্ঞানতায় অন্ধ আমি, তবু মনে হচ্ছে আমি যেন মহাজ্ঞানী, তা না হলে আপনাদের অত অনুগ্রহ আমি লাভ করতাম না। আমার পাষাণের মত দেহখানি যেন সহসা সোনা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি এই পৃথিবীতে থেকেও যেন স্বর্গে উঠেছি। আপনাদের অনুগ্রহরূপ পরশপাথরের স্পর্শে আজ আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম।

হে মহর্ষিবৃন্দ, আজ হতে আমি চরাচর স্হাবর-জঙ্গমের পবিত্রতার নিদর্শন হয়ে রইলাম। আপনাদের মত দেবগণের পদরজস্পর্শে তীর্থে পরিণত হলো আমার কঠিন বক্ষস্হল। পাপস্খালনের জন্য কত জীব আসবে এখানে। কারণ সাধু সজ্জনেরা যে স্হানে পদার্পণ করেন সেই স্হানই তীর্থ।

হে পূজনীয় দ্বিজোত্তমগণ, আজ আমি দুটি জিনিসে পবিত্র বলে মনে করছি নিজেকে। এক হলো, আমার শীর্ষদেশে পতিতপাবনী গঙ্গার পতন এবং অপরটি হলো আমার বক্ষে আপনাদের পদপ্রক্ষালনরূপ

বারি—এই দুটি জিনিসের সংযোগেই পবিত্রতম হয়ে উঠেছি আমি।

হে মুনিবৃন্দ, আমার দেহ একই সঙ্গে গতিশীল ও স্থিতিশীল। আজ আপনাদের দ্বিধাবিভক্ত অনুগ্রহে কৃতার্থবোধ করছি। আমার গতিশীল দেহ আপনাদের দাসানুদাসের কর্ম করতে উৎসুক, আর আমার স্থিতিশীল দেহ আপনাদের পাদস্পর্শে পবিত্র। আপনাদের ভৃত্যদেরও অধম আমি। আমাকে আপনাদের কোন কার্যসাধনের আদেশদান আর আমার মস্তকে চরণার্পণ—এই দুই-ই পরম ভাগ্যের কথা আমার পক্ষে।

হে পূজ্যগণ, শৃঙ্গ উপশৃঙ্গ, উপত্যকা প্রভৃতি অঙ্গাদির দ্বারা যদিও আমি দিক দিগন্ত ব্যাপ্ত করে আছি, যদিও আমার কলেবর সুবিশাল, তথাপি আজ আপনাদের শুভাগমনরূপ সম্মান ও অনুগ্রহে যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করছি তা আমার এই বিশ্বব্যাপী কলেবরেও ধরছে না।

পরম তেজজ্যোতিসম্পন্ন আপনাদের আবির্ভাবে আমার যে শুধু গুহাগত অন্ধকার অপসারিত হলো তা নয়, আমার অন্তর্নিহিত যে রজোগুণরূপ অন্ধকার এবং তার থেকেও গাঢ় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারও দূরীভূত হলো আপনাদের দর্শনলাভে।

আপনাদের কোন প্রয়োজনই দেখছি না। কারণ আপনাদের ইচ্ছানুরূপ যে কোন কার্য অবিলম্বে মুহূর্তমধ্যে সাধিত হতে পারে। তাই আমার মনে হচ্ছে কোন কাজ বা প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়, শুধু আমাকে কৃতার্থ ও পবিত্র করার জন্যই আপনারা কৃপা করে আগমন করেছেন এখানে।

তা হলেও কৃপা করে কোন না কোন একটা কাজের আদেশ দান করুন আমাকে। কারণ ভৃত্যদের কোন একটা কাজে নিয়োগ করাই হলো প্রভুর প্রধান অনুগ্রহ। আজ আমি আপনাদের সেই অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

এই আমি, আমার স্ত্রী ও আমার কুলের প্রাণস্বরূপ কন্যা—এদের মধ্যে আপনাদের কার্যে যার প্রয়োজন বলুন, আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের

সেবার জন্য প্রস্তুত। রত্ন মণি-মাণিক্য প্রভৃতি বাহ্যবস্তু ত অতি তুচ্ছ কথা।

জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হিমালয়ের কথাগুলি গুহামুখে যখন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তখন মনে হতে লাগল হিমালয় যেন দুবার করে বলছেন একই কথা।

হিমালয়ের কথা শেষ হলে ঋষিগণ তাঁদের বক্তব্য প্রকাশে উৎসুক হয়ে অঙ্গিরা ঋষিকে উত্তর দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অঙ্গিরাও তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

তিনি বললেন, আপনি যে উদার উক্তিগুলি করলেন, তার থেকে কঠোরতর কার্যও সম্ভব আপনার পক্ষে। আপনার অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলিই শুধু সমুন্নত নয়, আপনার হৃদয়ও অতিশয় সমুন্নত।

পুরাবিদগণ, আপনাকে যে বিষ্ণুর স্থাবর বা স্থিতিশীল স্বরূপ-রূপে কীর্তন করতেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত। কারণ আপনার কুক্ষি বিষ্ণুর কুক্ষির মত স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থসমূহের আধার।

শেষনাগ তার মৃণালের মত কোমল ফণাবলীতে বসুমতীর ভার কি কখনো বহন করতে পারত যদি না আপনি পাতাল হতে নিজে ভূভার ধারণ করে না থাকতেন? অতএব হে পর্বতরাজ, আপনার মহিমার ইয়ত্তা নেই।

হে পর্বতরাজ, আপনার অবিচ্ছিন্ন কীর্তিরাশি এবং গঙ্গাদি অমল স্রোতস্বতীগুলি পবিত্রতার দ্বারা সমানভাবে ত্রিজগৎ পুণ্যময় করে তুলছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে আপনার কীর্তিরাশি যেমন পরপারের দেশগুলিতে যাচ্ছে তেমনি আপনার নদীসমূহের জলধারাও সমুদ্রে গিয়ে লীন হচ্ছে।

বিষ্ণুর চরণ হতে উদ্ভূত বলে বিষ্ণুপদী গঙ্গা যেমন গৌরব করে থাকেন, তেমনি সমুন্নতশীর্ষ আপনিও তাঁর দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থল বলে তাঁর কম গৌরব নয়।

ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করেছিলেন তখনই তাঁর মাহাত্ম্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঊর্ধ্বদেশ ও অধোদেশ ব্যাপ্ত করেছিল। তাঁর

পদত্রয়ের মহত্ত্ব ত্রিভুবনব্যাপী পরিদৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আপনি স্মরণাতীত কাল থেকে দশদিক জুড়ে বিরাজ করছেন সতত।

ইন্দ্রাদি যজ্ঞাংশভাগী দেবতাগণের মধ্যে আপনিও পরিগণিত আছেন বলে ইন্দ্রাদির মত আপনিও যজ্ঞের ভাগ পেয়ে থাকেন। এজন্য সুমেরুপর্বতের সমুচ্চ হিরন্ময় শৃঙ্গের গর্বও খর্ব হয়েছে আপনার গৌরব ও গর্বের কাছে।

হে পর্বতরাজ, আপনার যা কিছু কাঠিন্য, উচ্চতা ও ঔদ্ধত্য তা শুধু আপনার শিলাময় দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আপনার ভক্তিনম্র জঙ্গম দেহ সাধু সজ্জনদের আরাধনার উপযুক্ত। এ দেহে কাঠিন্য ও ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই।

এখন আমাদের আগমনের কারণটা শুনুন। কাজটা কিন্তু আপনারই, আমাদের নয়। শুধু কর্তব্যের উপদেশদানের জন্যই আমরা এসেছি। এ কার্যের প্রকৃত ফলভাগী আপনিই।

অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ গুণের দ্বারা যিনি ভূষিত এবং অন্য কোন পুরুষে যে গুণাবলী কখনো পরিদৃষ্ট হয় না, এই সব সর্বাতিশায়ী গুণগরিমায় যিনি বিভূষিত এবং ঈশ্বর এই শব্দের যিনি একমাত্র প্রতিপাদ্য, যাঁর মস্তকে অর্ধচন্দ্র সতত শোভমান, ভূমি, জল, বায়ু, অনল প্রভৃতি যাঁর নিজের অষ্টবিধ মূর্তির পরস্পরের সহায়করূপে সংযুক্ত আছে, অশ্বগণ যেমন পরস্পর মিলিত হয়ে কোন যান টেনে নিয়ে যায় তেমনি ঐ অষ্টবিধ মূর্তির দ্বারা যিনি এই বিরাট বিশ্বকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যোগীগণ, সর্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপ যে শম্ভুকে সর্বদা ধ্যানধারণার দ্বারা জানতে চেষ্টা করেন, যে শম্ভুর পদ দর্শন করতে পারলে সংসারযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না, সেই জগতের সকল কার্যের দ্রষ্টা, ভক্তবাঞ্ছাপরিপূরক শম্ভু আমাদের মাধ্যমে আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করছেন।

সরস্বতী যেমন অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা বিশ্বজগতে সুফলদায়িকা হন, তেমনি সেই দেবাদিদেবের সঙ্গে আপনার কন্যার সংযোগ

হলে বিশ্বের পরম কল্যাণ সাধিত হবে। সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান হলে তা পিতার আনন্দের হেতু হয়ে থাকে। সে কন্যার পিতাকে আর দুঃখ-ভোগ করতে হয় না।

স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্বচরাচর আপনার কন্যাকে মাতৃরূপে স্বীকার করে ধন্য হোক। আপনি সেই সুযোগ দান করুন। কেন না, ভগবান শম্ভু জগতের পিতা।

সেই নীলকণ্ঠ শম্ভুকে আপনি আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করলে দেবতারা প্রথমে সেই নীলকণ্ঠকে প্রণাম করে পরে যখন আপনার কন্যাকে প্রণাম করবেন তখন তাঁদের কীরিটখচিত মণিজালের প্রভায় উমার পদকমল স্মরঞ্জিত হবে। এ কি কম ভাগ্যের কথা।

আপনার কন্যা উমা হবেন বধূ, আপনি হবেন সম্প্রদানকর্তা, আমরা হয়েছি তার জন্য আপনার দ্বারে প্রার্থী আর বর হবেন শম্ভু, চিরমঙ্গলময় শিব। সুতরাং এই শুভকার্য সর্বাংশে আপনার বংশের পক্ষে অনন্ত কীর্তিকর এবং গৌরবজনক।

সেই বিশ্বগুরু শঙ্কর যাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই স্তব করে, অথচ যাঁর স্তবযোগ্য কেউ নেই, যিনি জগতের পূজ্য, অথচ যাঁর পূজ্য কেউ নেই, সেই জগদ্‌গুরু শঙ্করকে কন্যাদান করে আপনিও গুরুস্থানীয় হোন। তাহলে আপনি মহাদেবেরও স্তবযোগ্য ও বন্দনীয় হবেন।

দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন হিমালয়কে এইসব কথা বলছিলেন তখন পার্বতী লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত হয়ে পিতার পাশে নতমুখে বসে খেলার জন্য সংগৃহীত পদ্মগুলির পাপড়ি গণনা করছিলেন। সেই দিকেই যেন চিত্ত ছিল তাঁর অভিনিবিষ্ট।

অঙ্গিরা ঋষির কথায় হিমালয়ের চিত্ত আনন্দে ভরে গেল। কিন্তু তিনি কোন কথা বলার আগে তাঁর রাণী মেনকার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। কারণ কন্যার বিবাহ ব্যাপারে গৃহস্থগণ প্রায়ই গৃহিণীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

পতিব্রতা মেনকাও স্বামীর অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন। সাধ্বী রমণীরা পতিদেবতার বাসনার বিরুদ্ধবাদিনী হন না। সর্বতো-

ভাবে ও কায়মনোবাক্যে তিনি স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্তন করেন।

ঋষিদের কথা শেষ হলে ‘এ কথার প্রকৃত উত্তর এই হলো’ ভেবে হিমালয় বিবাহকালোচিত মাল্যভূষণে বিভূষিতা কন্যা পার্বতীকে সামনে তুলে ধরে বললেন ঃ

এস মা, বিশ্বরূপ মহেশ্বরের হাতে তোমাকে আজ ভিক্ষারূপে দান করছি। এই জগদ্বরেণ্য মুনিগণ তোমাকে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে এসেছেন। সৎপাত্রে কন্যাদান করে আমি আজ কৃতার্থ হলাম।

পর্বতরাজ হিমালয় কন্যাকে এই কথা বলার পর ঋষিদের বললেন, এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদের প্রণাম করছে।

পর্বতরাজের এই উদারমহৎ কথা শুনে ঋষিবৃন্দ অবশ্যম্ভাবী ফলযুক্ত আশীর্বাদের দ্বারা সংবর্ধিত করলেন উমাকে।

অতি সমাদরভরে উমা যখন ঋষিদের প্রণাম করছিলেন তখন তাঁর কানের কাঞ্চনকুণ্ডলটি খসে পড়ে। অরুন্ধতী তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। পার্বতী লজ্জায় মাথা নত করে বসে রইলেন।

উমার জননী মেনকা কন্যাস্নেহে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। দেবী অরুন্ধতী সেই অনন্যসাধারণ বরের অনন্ত গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

এবার হিমালয় সেই জটাচীরধারী ঋষিদের বিবাহের তিথি ও শুভলগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ‘তিন দিন পর’। এই বলে গমনোদ্যত হলেন তাঁরা।

যাবার আগে তাঁরা হিমালয়কে আবার নানাভাবে আপ্যায়িত করে গেলেন। তারপর শিবের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, অভিপ্রেত কার্য সিদ্ধ হয়েছে। এই বলে শিবের কাছে বিদায় নিয়ে আকাশপথে চলে গেলেন তাঁরা।

হিমালয়নন্দিনী উমাকে পাবার জন্য পশুপতির আগ্রহ অতিশয় বেড়ে গেল। তিনটি দিন অতি কষ্টে কাটাতে লাগলেন তিনি। এই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা যখন শঙ্করকে এমন উন্মনা করে তুলতে পারে তখন অন্যজনের ত কথাই নেই।

সপ্তম সর্গ

এরপর সপ্তর্ষিগণের নির্ধারিত তিন দিন অতিবাহিত হলে শুক্লপক্ষের জামিত্র গুণান্বিত অর্থাৎ লগ্ন হতে সপ্তম স্থানের শুদ্ধিযুক্ত তিথিতে নগাধিরাজ হিমালয় আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসমারোহে কন্যা উমার বিবাহসংস্কার সম্পাদন করলেন।

পার্বতী পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন বলে নগরবধূরা সকলেই বিবাহের আনুষঙ্গিক মঙ্গলকার্য সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সব বাড়ির মেয়েরাই উমার বিবাহের ব্যাপারে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে ওষধিপ্রস্থ নগর ও হিমালয়বাসীদের অন্তঃপুর— সব একাকার হয়ে বিশাল একটি বাড়ির মত মনে হতে লাগল।

রাজপথ মন্দারতরুর কুসুমরাশির দ্বারা শোভিত ও চীনদেশীয় অতিসূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকামালায় সজ্জিত করা হলো। মাঝে মাঝে নির্মিত হলো সুর্বতোরণ। তাদের দীপ্তিতে ওষধিপ্রস্থনগরের রাজপথ এমনই উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে তা দেখে মনে হতে লাগল সাক্ষাৎ স্বর্গধামই যেন ওষধিপ্রস্থনগরে পরিণত হয়েছে।

যদিও হিমালয় ও মেনকার আরও পুত্রকন্যা ছিল তথাপি বিবাহের পর উমাকে স্বামীগৃহে চলে যেতে হবে বলে তিনি পিতামাতার প্রাণের অধিক হয়ে উঠলেন। মাতাপিতার মনে হতে লাগল যেন কতকাল পরে উমাকে পেয়েছেন, তাই দেখে আর তৃপ্তি হয় না। যেন একবার দেহত্যাগ করে আত্মীয়স্বজনদের আকুল শোকসাগরে ভাসিয়ে আবার যেন ফিরে এসেছেন উমা।

হিমালয়ের বিরাট বংশের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই স্নেহভালবাসা সব যেন শুধু উমার উপরেই পড়ল। তাদের সকলের আপন আপন সন্তান থাকলেও আজ উমাকেই সকলে বেশী ভালবাসতে লাগল। সকলেই আশীর্বাদ করতে করতে উমাকে কোলে নিতে লাগলেন এবং নানা রকমের অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

মৈত্রমুহূর্তে অর্থাৎ উদয়মুহূর্ত হতে তৃতীয় মুহূর্তে যখন উত্তর

ফাল্গুনী নক্ষত্র গিয়ে চাঁদের সঙ্গে মিলিত হয় সেই শুভলগ্নে জীবৎ-পুত্রিকা রমণীরা হরিদ্রা ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা উমাকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

শ্বেতসর্ষপযুক্ত দূর্বাঙ্কুরে তাঁর সীঁথি শোভিত হলো। নাভিদেশ আবৃত করে কৌশেয় বসন পরানো হলো। পরে তাঁর হাতে একটি বাণ দেওয়া হলো। এই সব ধারণ করে উমা যখন দাঁড়ালেন তখন মনে হলো যেন তাঁর মত সর্বাঙ্গসুন্দরীর অঙ্গলাভ করে ঐ সব বেশভূষাই অলঙ্কৃত হয়েছে।

তন্বী উমার হাতে ক্ষত্রিয় বালিকার বিবাহকালোচিত বাণটি দেওয়া হলে কৃষ্ণপক্ষের অবসানে শুক্লপক্ষে সৌরকর দ্বারা ক্রমবর্ধিত চন্দ্রকলার মত শোভা পেতে লাগলেন তিনি।

লোধ্রকুসুমের শ্বেতপরাগ দ্বারা প্রথমে উমার গায়ের তেল মার্জনা করার পর গাঢ় ও সুগন্ধি কালেয় নামক গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁর অঙ্গরাগ করে দেওয়া হলো। তারপর তাঁকে স্নানকালোচিত একখানি বসন পরানো হলো। পরে আয়তীমতী পুরকামিনীরা তাঁকে চতুস্তম্ভ-সমন্বিত স্নানঘরে নিয়ে চললেন।

সেই মরকত শিলাময় ও নানা মণিমুক্তাখচিত স্নানঘরের ভিতরে উমাকে বসিয়ে স্বর্ণকুম্ভের জল দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন তাঁরা। স্নানকালে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠল চারদিকে।

মঙ্গলস্নানের পর নির্মলকলেবরা পার্বতী যখন পতিসমীপে গমনের উপযুক্ত ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করলেন অর্থাৎ মনোহর শাড়ী ও কাঁচুলি পরলেন তখন বর্ষাবসানে প্রস্ফুটিত কাশফুলের দ্বারা পরিশোভিত ধরিত্রীদেবীর মত অপূর্ব সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি।

তারপর সেই স্নানগৃহ হতে চন্দ্রাতপমণ্ডিত ও মণিময় স্তম্ভ চতুষ্টয়ের দ্বারা শোভিত এক সুরম্য মণ্ডপের মাঝখানে একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর পাতা মণিময় আসনে বসানো হলো পার্বতীকে। এরপর বিচিত্র সাজসজ্জায় সজ্জিত করে তুলতে হবে।

সেই সব প্রসাধিকা কামিনীরা কৃশাঙ্গী পার্বতীকে বেদীর উপর

পূর্বমুখী করে বসিয়ে নিজেরাও তাঁর সামনে বসলেন। তখন নিসর্গ-সুন্দরী গিরিকন্যার অকৃত্রিম রূপলাবণ্যে তাঁরা এমন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন যে ভাবতে লাগলেন, এমন সুন্দরী মেয়েকে আবার কি সাজাব? এই সব ভাবতে ভাবতে তাঁরা উমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রসাধনদ্রব্য ও বেশভূষা হাতের কাছে থাকলেও অকৃত্রিম সৌন্দর্যবতী উমাকে কৃত্রিম সাজে সাজাতে মন সরছিল না তাঁদের। তাই বিলম্ব হচ্ছিল।

প্রথমে স্নানান্তিকা সিক্তগাত্রী উমার দেহের আর্দ্র বা ভিজে ভিজে ভাব সুগন্ধি ধূপের ধূমসংযোগে দূর করা হলো। তারপর তাঁর কুসুম-খচিত কুঞ্চিত কেশপাশ মাঝে মাঝে হরিদবর্ণের মধুদ্রুম কুসুমের মালা দিয়ে সুন্দরভাবে বেঁধে দেওয়া হলো।

পার্বতীর অঙ্গলতিকাটিকে শ্বেত অগুরুমিশ্রিত গোরোচনার দ্বারা নানারকমের পত্ররচনায় সুশোভিত করে দিলেন। তাতে চক্রবাকশোভিত পতিতপাবনী গঙ্গার কান্তি পার্বতীর দেহলাবণ্যের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলো।

আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশকলাপে পার্বতীর সুন্দর মুখখানিতে এমনই শ্রী জন্মাল যে এর কাছে ভ্রমরযুক্ত পদ্ম বা কৃষ্ণমেঘলাঞ্ছিত চন্দ্রও হার মানল।

পার্বতীর কপোলতল লোধ্রপরাগের বিলেপনে চর্চিত হওয়ায় তার ধবলতা বা শুভ্রতা আরও বেড়ে গেল। তাতে আবার গোরোচনার বিন্যাসে তার রক্তাভ ভাবও প্রকাশ পেল। তাঁর কানে নবোদ্ভিন্ন যবাঙ্কুর প্রদত্ত হলো। তখন ঐ শ্বেতরক্তাভ কপোলে যবাঙ্কুর যুক্ত হয়ে এমনই অপূর্ব শোভা ধারণ করল এবং শ্বেত, রক্ত ও হরিৎ এই ত্রিবর্ণের সংমিশ্রণে এমনই শ্রী জন্মাল যে সেদিকে একবার চোখ পড়লে আর চোখ ফেরানো যায় না।

অনবদ্যাঙ্গী উমার নিম্নোষ্ঠের মধ্যভাগে একটি রেখা থাকায় মনে হত তা যেন সমান দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। হিমালয় প্রদেশের প্রবল শৈত্যে পাছে ওষ্ঠ ফেটে যায় সেই জন্য মধু, কুঙ্কুম আর মোম দিয়ে একরকমের

প্রলেপ তৈরী করে তা উমার ওষ্ঠে লাগানো হত। ঐ প্রলেপযুক্ত তাঁর তরল ওষ্ঠ তরলতম হয়েছিল। অচিরে হরসমাগমরূপ যে সৌভাগ্যের সংঘটন হবে তার সূচনা করার জন্য সেই অপূর্ব লাবণ্যময় ওষ্ঠ সেই সার্থকতার কথা স্মরণ করে কাঁপছিল।

কোন এক সখী পার্বতীর চরণকমল অলক্তরাগে রঞ্জিত করে নানা শুভ কামনাপূর্ণ আশীর্বাদ করল এবং রহস্যচ্ছলে বলল, উমা, এই অলক্তলাঞ্ছিত চরণে তোমার পতির চন্দ্রকলা স্পর্শ করো। উমা তখন লজ্জা ও ক্রোধভরে কোন কথা না বলে হাতের মালাছড়া দিয়ে সখীকে প্রহার করলেন।

কমলাক্ষী উমার নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত এমনই সুন্দর যে প্রসাধিকারা শুভকার্যে নয়নে কজ্জল পরাতে হয় বলেই উমার নয়নে কজ্জল পরান, সে কজ্জলে সে নয়নের কোন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে তা পরান না।

অলঙ্কার পরার পর উমার দেহের কোমলতা হয়ে উঠল অনির্বচনীয় কুসুমভারে আনত লতার মত, নক্ষত্ররাজি বিরাজিত রজনীর মত এবং প্রভাতরল বক্ষে ভাসমান বিহঙ্গশোভিত নদীর মত অলঙ্কারের ভারে দেহলাবণ্যের বৃদ্ধি ঘটল।

এরপর দর্পণের সামনে দাঁড়ালেন উমা। নির্মল দর্পণে তাঁর সালঙ্কারা মূর্তির প্রতিবিম্ব দর্শন করে আনন্দে মোহের একটা জড়তায় উমার চোখ বুজে আসতে লাগল। চন্দ্রশেখরের সকাশে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি। রমণীকুলের সাজসজ্জার চরম সার্থকতাই হলো আপন আপন প্রিয়তমের দ্বারা সন্দর্শন।

যথাবিধি স্ত্রী-আচার সম্পন্ন হবার পর মা মেনকা কন্যার সামনে এলেন। তাঁকে আজ কন্যার কপালে নিজের হাতে তিলক পরাতে হবে। মেনকা তাই তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মনঃশিলা চূর্ণের সঙ্গে হরিতালদ্রব মিশিয়ে একটি টিপ করে কন্যার চিবুক ধরে তার কপালে পরাতে গিয়ে কন্যার মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। সেই প্রথম যখন কিশোরী উমার স্তনকলির ঈষৎ উদ্গম লক্ষ্য করেছিলেন তখনই কন্যাকে সৎপাত্রে

সমর্পণ করার বাসনা জেগেছিল তাঁর মনে। তারপর স্তনকুসুম দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই বাসনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ উমা এক বিশ্ববরেণ্য সৎপাত্রে অর্পিত হচ্ছেন বলে তাঁর সেই বাসনা পূরণ হচ্ছে। সেই অভিলাষের অভিব্যক্তিস্বরূপ উমার কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পরিয়ে দিলেন।

এবার উমার হাতে মেষাদি রোমনির্মিত বিবাহের মঙ্গলসূত্র বাঁধতে গিয়ে মেনকাব দুচোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল। কিন্তু সূত্রবন্ধনের স্থানটি দেখতে না পেয়ে তিনি যেমন উমার হাতের অন্য এক স্থানে সুতাগাছটি বাঁধতে গেলেন অমনি উমার ধাত্রী এসে মেনকার হাতখানি সঠিক স্থানে সরিয়ে দিলেন। মেনকাও তখন কন্যার হাতে সূত্রবন্ধন করলেন।

উমার হাতে এবার একখানি নূতন দর্পণ দেওয়া হলো। নূতন ক্ষৌমবসন পরিধারিণী উমা সেই স্বচ্ছ দর্পণ হাতে তুলে নিলেন। তখন ক্ষীরসমুদ্রের ফেনরাশিবিহসিত সততপ্রসন্ন বেলাভূমির মত এবং পূর্বোদিত চন্দ্রের কিরণজালে সমুদ্ভাসিত শারদ রজনীর মত তাঁর এক অপূর্ব শোভা দৃষ্ট হলো।

গৃহদেবতাদের পূজা আগেই করানো হয়েছিল। মেনকা এখন কুলের অবলম্বনভূতা কন্যাকে সেই গৃহদেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করালেন। পরে একে সাধ্বী রমণীদের পাদবন্দনা করালেন।

উমা তাঁদের প্রণাম করলে সতী রমণীরা 'পতির অখণ্ড প্রেমলাভ করো' বলে আশীর্বাদ করলেন। লজ্জারুণমুখী উমাও লজ্জায় মাথা নত করলেন। উমা নিজগুণে পতির শুধু অনন্ত প্রেম লাভ করেননি, তিনি প্রকৃতপক্ষে পতির অর্ধাঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন।

কৃতী, সভ্য ও কর্মকুশল হিমালয় তাঁর পূর্ববাসনামত বিবাহের প্রাথমিক শুভ কার্যাদি সুসম্পন্ন করার পর বন্ধুবান্ধব পরিপূর্ণ সম্প্রদান সভায় বৃষবাহন চন্দ্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন।

এদিকে কৈলাস পর্বতে বরপক্ষের বিবাহের প্রাথমিক কার্যাদি বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সম্পাদিত হলো। ত্রিলোকপূজ্য বরের সাজসজ্জা ও

অলঙ্কারসামগ্রী মাতৃকামণ্ডলী এসে মহাদেবের সামনে রেখে দিলেন।

মাতৃমণ্ডলীর প্রতি গৌরব দানের জন্য জগদীশ্বর বিবাহকালোচিত সেই প্রসাধনসামগ্রী একবার হাত দিয়ে মাত্র স্পর্শ করলেন। তাঁর যে চিরন্তন বেশভূষা ছিল তাই তাঁর অভিলাষের অনুরূপ আকার ধারণ করে অপূর্ব অলঙ্কারে পরিণত হলো।

বিভূতিভূষণের চিরাদৃত ভস্মই হলো অপূর্ব গন্ধানুলেপ। নরকপাল হলো শিরোভূষণ। তাঁর পরিধেয় গজচর্মের প্রান্তভাগ রোচনারাগে রঞ্জিত হয়ে পরিণত হলো ক্ষৌমবসনে।

ললাট-অস্থির মধ্যে সতত দীপ্তিময় ও স্তিমিতপিঙ্গল তারাবিশিষ্ট ত্রিলোচনের তৃতীয় নয়নে এমনই স্থির নিশ্চলভাবে তাঁর ললাটফলকে শোভা পাচ্ছিল যে তা হরিতালদ্রবের তিলক বলে মনে হচ্ছিল।

তিলকের মত কঙ্কনাদি আভরণেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। গলায় ও বাহুতে যেখানে যেসব বিষধর সর্প সর্বদা বিজড়িত ছিল সেগুলি সেইসব স্থানের অলঙ্কারে পরিণত হলো। কিন্তু তাই বলে তাদের ফণাস্থিত মণির শোভা কিছুমাত্র ম্লান হলো না। সেই মণিগুলি অলঙ্কাররূপী সর্পগুলির মাথায় জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল।

চন্দ্রশেখরের মস্তকে যে বাল চন্দ্রকলা দিনরাত্রি সমানভাবে শোভা পেত তাতে তৃতীয়া ও চতুর্থীর চন্দ্রলেখার মত কোন কলঙ্ককালিমা দেখা যেত না। দিনের বেলাতেও সেই মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা হতে অল্পবিস্তর কিরণের ছটা বিচ্ছুরিত হত। সুতরাং চূড়ামণি বা কোন কৃত্রিম শিরোভূষণের কোন প্রয়োজন হলো না।

আপন যোগশক্তিবলে জগদীশ্বর মহাদেব বিবাহকালোচিত অনুপম বেশভূষা ধারণ করলেন। তিনি এইভাবে সুসজ্জিত হলে তাঁর অনুচর প্রমথগণ তাঁর সামনে একখানি স্ফটিকস্বচ্ছ খড়্গ এনে ধারণ করল এবং মহাদেব তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগলেন।

তারপর তাঁর বাহন বিশালকায় বৃষভরাজকে আনা হলো বিশ্বনাথের সামনে। ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত ছিল সেই বৃষরাজের পৃষ্ঠদেশ। বৃষরাজ বিশ্বনাথের উপর অগাধ ভক্তির জন্য তার বিরাট বপু সঙ্কুচিত করল।

তখন বিশ্বনাথ নন্দিকেশ্বরের বাহুতে ভর দিয়ে বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। মনে হলো কৈলাসনাথ যেন তাঁর অতিপ্রিয় অমলধবল কৈলাসপর্বতে উঠলেন।

দেবাদিদেব শঙ্কর যখন বিবাহবাসরে যাবার জন্য বৃষপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন তখন সপ্ত মাতৃকারাও আপন আপন পুষ্পকাদিরথে তাঁর অনুগমন করলেন। রথের গতির জন্য তাঁদের কর্ণভূষণগুলি কাঁপতে লাগল এবং সেগুলি ঝলমল করতে লাগল। তাঁদের মুখমণ্ডলের নির্মল প্রভায় মনে হলো তাঁরা যেন মুখে কত কুসুমরেণু মেখেছেন। এইভাবে তাঁদের গমনকালে মনে হলো আকাশে বুঝি কত পদ্মফুল ফুটে বাতাসে কাঁপছে। নীল আকাশ ফুল্ল শতদলপূর্ণ নীল সরোবরের আকার ধারণ করল।

সেই কনককান্তি মাতৃমণ্ডলীর পিছনে শ্বেত নরকপালধারিণী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী দেবী চলেছেন। তাতে মনে হলো যেন শ্বেতবর্ণের বলাকায় পরিশোভিত হয়ে সুনীল মেঘমালা ছুটে চলেছে আর তার পুরোভাগে হেমকান্তি বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে।

বিবাহের এই শোভাযাত্রার সামনে অগ্রগামী প্রমথগণ মঙ্গলময় বাদ্য বাজাতে বাজাতে চলল। সেই দিগন্তবিসারী বাদ্যধ্বনি আকাশচারী বিমানসমূহে প্রতিধ্বনিত হয়ে দেববৃন্দকে যেন জানাল শঙ্করের বিবাহের শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। ত্রিলোকনাথের সেবার এই হলো প্রকৃষ্ট সময়।

বিশ্বকর্মা নিজে ত্রিলোকপূজ্য শঙ্করের মাথায় ধরার উপযুক্ত একটি ছত্র নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সূর্যদেব সেই ছত্র শঙ্করের মাথার উপর ধরলেন। সেই শ্বেতছত্রের ধবল ঝালরের প্রান্তভাগ যখন শিবের জটাজুটমণ্ডিত মস্তকের উপর পত পত করে উড়তে লাগল তখন মনে হলো তাঁর মাথার উপর হিমালয় হতে পতিত গঙ্গার শ্বেতধারা পতিত হচ্ছে।

গঙ্গা ও যমুনা আপন আপন নদীরূপ পরিহার করে মূর্তিমতী রমণীর রূপে এসে বরবেশী শম্ভুকে বাতাস করতে লাগলেন। আজ

আর তাঁদের সমুদ্রগামিনী শ্বেত ও কৃষ্ণ নদী আকৃতি নেই, তবু তাঁদের হস্তধৃত চামরক্ষেপণে মনে হলো সত্য সত্যই যেন গঙ্গাযমুনার হংসমালা এসে উড়ে পড়ছে ও নড়ছে চড়ছে।

ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন হবির্ভুক হোমানলের মাহাত্ম্য বর্ধিত হয় তেমনি 'জয় হোক' বলে ত্রিজগতের আদি বিধাতা ও শ্রীবৎসচিহ্নশোভিত পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ বিষ্ণু এসে শঙ্করের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ধিত করলেন।

সেই একই মূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হন মাত্র। আসলে তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কখনো হর বিষ্ণুর পূর্ববর্তী, কখনো আবার বিষ্ণু হরের আদিভূত, কখনো আবার ব্রহ্মা দুজনের পূর্ববর্তী, আবার কখনো হরিহর ব্রহ্মারও পূর্ব-বর্তীরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। সুতরাং এঁদের মধ্যে বড় ছোট বিচার করতে যাওয়া বৃথা।

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁদের ছত্র চামর ঐরাবত প্রভৃতি নিজ নিজ ঐশ্বর্যের যা কিছু চিহ্ন তা দূরে রেখে অতীব বিনীত বেশে ত্রিলোচনের সামনে উপস্থিত হলেন এবং শিবের সঙ্গে দর্শন করিয়ে দেবার জন্য নন্দীকে বারবার হাত দিয়ে সংকেত জানাতে লাগলেন। নন্দীও দেব-বৃন্দকে দেবাদিদেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। দেবতারাও যুক্ত-করে দেবাদিদেবকে প্রণাম করলেন।

জগদীশ্বর তখন মাথাটি ঈষৎ কম্পিত করে কমলযোনি ব্রহ্মাকে, দুএকটি কথা বলে বিষ্ণুকে এবং একটু হেসে সুরপতি ইন্দ্রকে সংবর্ধিত ও আপ্যায়িত করলেন। অন্যান্য দেবতাদের দিকে একবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করতেই তাঁরা পরম পরিতুষ্ট হলেন।

তখন সপ্তর্ষিবৃন্দ অগ্রসর হয়ে মহাদেবের উদ্দেশ্যে 'জয়' এই শুভ-কামনা ঘোষণা করলেন। মহেশ্বর তখন বললেন, এই বিবাহযজ্ঞে পূর্ব হতেই ত আপনাদের আমি অধ্বর্যুর পদে বরণ করেছি।

তখন বিশ্বাবসুপ্রমুখ পরম বিপুল বীণাবাদক গন্ধর্বগণ শম্ভুর ত্রিপুর বিজয়াদি অবদানের কথা গান করে গাইতে লাগল। এইভাবে

সকলের সঙ্গে রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি তামসভাবের অতীত দেবাদিদেব মহাদেব হিমালয় নগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

শম্ভুর বাহন বৃষভরাজ তার বিশাল বপু দুলিয়ে শূন্যপথে শম্ভুকে বহন করে নিয়ে চলল। তার গলাবিলম্বী ছোট ছোট স্বর্ণঘন্টাগুলি হতে এক সুখশ্রাব্য রুনু রুনু ধ্বনি উঠতে লাগল। তার সুদীর্ঘ শৃঙ্গদ্বয়ে কত মেঘ আবিদ্ধ হতে লাগল এবং কতক শৃঙ্গে লেগে রইল। মনে হলো বৃষভরাজ কোন নদীতটভূমিতে উৎখাতকেলি করেছিল বলে তার শৃঙ্গে পঙ্ক লেগে আছে। বৃষভরাজ গমনকালে সেই মেঘখণ্ডশোভিত শৃঙ্গদ্বয় মুহুর্মুহু কাঁপাচ্ছিল।

দ্রুতগামী বৃষভরাজ অবশেষে সেই ওষধিপ্রস্থনগরে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে নগর নগরাজ হিমালয়ের দ্বারা এমনই সুরক্ষিত যে তার কোন বিপক্ষ বা শত্রু তার ত্রিসীমানাতেও পেঁছিতে পারে না। পরিণয়ার্থী ত্রিলোচন বৃষভপৃষ্ঠে বসে সেই নগরের দিকে চাইতে চাইতে যাচ্ছিলেন। তা দেখে মনে হলো যেন তাঁর পিঙ্গল নয়নের দৃষ্টিপাত-রূপ সুবর্ণসূত্রজালের দ্বারা সেই দূরবর্তী নগরকে আকর্ষণ করে নিকটে টেনে এনেছেন। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তাঁরা পেঁছিতে পারতেন না।

মহাদেব ত্রিপুরবিজয়কালে নিজের একটা বাণ দিয়ে আকাশের একটা পথ গমনাগমনের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। সেই পথেই তিনি চলাফেরা করতেন। আজও ত্রিপুরারি সেই পথে গিয়ে ওষধিপ্রস্থ নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করলেন। পুরবাসীগণ নবমেঘসদৃশ নীল-কণ্ঠকে দেখে কৌতূহল নিবৃত্ত করল।

ভাবী জামাতা ত্রিলোকনাথ মহাদেব এসেছেন শুনে নগাধিরাজ হিমালয় তাড়াতাড়ি আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে জামাতাকে অভ্যর্থনা জানাতে বললেন। বহু ঐশ্বর্যশালী আত্মীয়স্বজন উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে গজপৃষ্ঠে তাঁর অনুগমন করলেন। তা দেখে মনে হলো ফুল্লকুসুমিত বৃক্ষরাজিসহ হিমালয়ের নিতম্বদেশটা ঐ শোভাযাত্রারূপে অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে।

ওষধিপ্রস্থ নগরের বিশাল তোরণদ্বারের অর্গল উন্মোচিত হলো। দুদিক হতে দুটি দল—একদিকে শিবানুগামী দেবদল আর একদিকে নগেন্দ্রানুগামী নগদল এসে পরস্পর সম্মুখীন হলো। উভয় দলের ঘনঘটার শব্দ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মনে হলো দুদিক হতে দুটি প্রবল জলধারা একই সেতু ভগ্ন করে উভয়ে উভয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে সমুচ্ছ্বাসে সম্মিলিত হয়েছে।

ত্রিলোকপূজ্য জগদীশ্বর শঙ্কর যখন নগরাজকে প্রণাম করলেন, তখন হিমালয় জানতে পারেননি যে ত্রিলোকপূজ্য মহেশ্বরের মাহাত্ম্যপ্রভাবে তাঁর মাথা দূর হতেই আনত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন তা বুঝতে পারেননি।

ওষধিপ্রস্থনগরের রাজপথে এত পুষ্পবর্ষণ করা হয়েছিল যে তাতে চলতে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। জামাতার শুভাগমনে অপরিসীম আনন্দের আবেগে ও আতিশয্যে তাঁর চোখমুখ এক অপূর্ব প্রফুল্লতায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল নগরাজের। তিনি তাড়াতাড়ি সকলের আগে জামাতার সামনে উপস্থিত হলেন এবং কুসুমাস্তীর্ণ নগরপথ দিয়ে তাঁকে সমৃদ্ধিপূর্ণ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

তখন জগদীশ্বর শঙ্করকে দর্শন করার জন্য পূর্ব হতেই অত্যন্ত সমুৎসুক পুরবাসীরা সবাই হাতের কাজ ফেলে প্রাসাদশীর্ষে ছুটে গেল। তাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো ও হট্টগোল বেধে গেল।

সুবিধামত স্থানে সর্বাগ্রে পেঁছিবার জন্য কোন সুন্দরী এতই তাড়াতাড়ি ছুটলেন যে তাঁর কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত হলো ও তা হতে ফুলের মালা খসে পড়ল। কিন্তু উপায় নেই। তিনি শিথিল কেশপাশ একহাতে ধরে ছুটে চলেছেন। তা যে বাঁধতে হবে সে খেয়ালও তাদের ছিল না।

কোন কামিনীর চরণে প্রসাধনকারিণী আলতা পরাচ্ছিল। কিন্তু শোভাযাত্রার কলরব শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাধিকার হাত হতে পা ছিনিয়ে নিয়ে সেই কামিনী এক ছুটে জানালার পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। ফলে মেঝের উপর বাতায়ন পর্যন্ত এক পায়ের আলতার দাগ পড়ে গেল।

যদিও রমণীদের বাম চোখেই প্রথমে অঞ্জন বা কাজল পরাতে হয়, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কোন সুন্দরী ডান চোখে কাজল দিয়ে কজ্জল-শলাকাটি হাতে করেই ছুটে গেল। বাম চোখে আর কাজল দেওয়া হলো না। ফলে তার একটি চোখ সকজ্জল বা কালো আর একটি চোখ অকজ্জল বা সাদা রয়ে গেল।

অন্য এক সুন্দরী শোভাযাত্রা দেখার জন্য গবাক্ষের দিকে তাকিয়েই ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি করে যেতে গিয়ে তার নিতম্ব হতে বসন খসে গেল আর সে হাত দিয়ে কোমর হতে খসে পড়া বসন ধরেই ছুটে গেল। তখন তার হাতের অলঙ্কারের প্রভায় তার নাভিগহ্বরটি ভরে গেল।

কোন সুন্দরী বসে চন্দ্রহার গাঁথছিল। অর্ধেক গাঁথা হতেই শোভা-যাত্রা দেখার জন্য ছুটে গেল। তাড়াহুড়ো করে যাওয়ায় গতিস্খলনে অর্ধগ্রথিত চন্দ্রহারের মণিগুলি ঝরে পড়ল। শুধু তার আঙ্গুলের মধ্যে হারের সুতাগাছটি রয়ে গেল।

সেকালে সুরকামিনীরা সুরাপান করত। গবাক্ষগুলি সেই পুর-সুন্দরীদের আসবগন্ধমধুর মুখ পরম্পরায় ভরে থাকত। তাদের ভ্রমর-সদৃশ ঘনচঞ্চল নয়নের সংযোগে মনে হত সেই সব বাতায়নরাজি যেন শতদলরাজিতে অলঙ্কৃত হয়েছে।

দেখতে দেখতে চন্দ্রশেখর অসংখ্য পতাকাশোভিত ও তোরণরাজি-বিরাজিত রাজপথে এসে পড়লেন। সেই দিনের বেলাতেও তাঁর ললাট-চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় অমলধবল সুসজ্জিত প্রাসাদশীর্ষগুলির দ্যুতি দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

পুরসুন্দরীগণ সেই অনন্যমনোহর ও অপূর্বদর্শন বিবাহের বেশ-ভূষায় সজ্জিত মহেশ্বরকে এমনই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যে সে নয়নে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হলো না। মনে হলো তাদের অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় শুধু চক্ষুতে প্রবিষ্ট হয়ে একমনে সেই অবাঙ্‌মানসগোচর চিরসুন্দরকে দেখতে লাগল।

এইভাবে দেখার পর সেই সুন্দরী কামিনীরা বলাবলি করতে লাগল, কোমলাঙ্গী অপর্ণা যে কঠোর ও দুঃসাধ্য তপস্যা করেছিল তা আজ

সার্থক হয়েছে। এমন অপরূপ বরের দাসীত্ব করতে পেলেও জীবন সার্থক হয়। এমন নয়নমনোহর বরের অঙ্কশয্যায় যে অধিরোহণ করবে তার কত সৌভাগ্য !

এই বরকন্যা—দুই-ই অতুলনীয়। এমন মনোহরকান্তি উমা-মহেশ্বরকে প্রজাপতি যদি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না করতেন তাহলে এই দম্পতিকে বিধাতা যে অনন্যসাধারণ রূপ সৃষ্টি করেছেন তা একেবারেই নিরর্থক হত।

এই শঙ্কর তাঁর ক্রোধাগ্নিতে মদনকে দগ্ধ করেছিলেন—একথা ঠিক নয়। এমন যার অপরূপ রূপ তাঁর দ্বারা এমন নিষ্ঠুর কর্ম সম্ভব নয়। মনে হয়, এই অপূর্ব কান্তি ত্রিলোকমোহন দেবাদিদেবকে দেখে নিজের সৌন্দর্য খর্ব হলো মনে করে কন্দর্প লজ্জায় নিজেই নিজের দেহ অগ্নিতে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হিমালয় তাঁর অপার সামর্থ্য ও শক্তিবলে ধরিত্রীকে ধারণ করে আছেন বলে তাঁর মস্তক সর্বদাই গর্বোন্নত। তার উপর তিনি এই জগদীশ্বর শঙ্করের সঙ্গে জামাতৃ সম্বন্ধ স্থাপন করে সেই সর্বোন্নত মস্তককে সর্বাপেক্ষা উন্নত করলেন। তাঁর উচ্চতর মস্তক সম্বন্ধগুণে উচ্চতম হলো।

ওষধিপ্রস্থ নগরের পুরকামিনীদের মুখে ঐসব কথা শুনতে শুনতে ত্রিলোচন ক্রমে গিয়ে হিমালয় সদনে উপস্থিত হলেন। চারদিকের গবাক্ষজাল হতে অঞ্জলি অঞ্জলি লাজবৃষ্টি হচ্ছিল। তা আবার জনতার বাহুস্থিত কেয়ূরঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

হিমালয়ভবনে শিব উপস্থিত হওয়ামাত্র বিষ্ণু এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সেই হাতে ভর দিয়ে মহেশ্বর তাঁর শ্বেতকায় বৃষভরাজ হতে অবতরণ করলেন। মনে হলো শরতের জলহীন ধবল মেঘ হতে সূর্যদেব যেন সরে যাচ্ছেন। কমলাসন ব্রহ্মা আগে আগে চললেন। শঙ্কর তাঁর পিছু পিছু গিয়ে হিমালয় ভবনের এক কক্ষে প্রবেশ করলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ যথাক্রমে শঙ্করের অনুগমন

করলেন। ভূতনাথের অনুচরবৃন্দও তাঁর পিছু পিছু চললেন। সকলেই প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে মনে হলো কোন একটা অব্যর্থ কার্যসিদ্ধির অনুকূল কারণগুলি একত্র সমবেত হয়েছে।

সেই কক্ষমধ্যে আসন পরিগ্রহ করার পর শশুর হিমালয়ের দ্বারা আনীত রত্ন, অর্ঘ্যোদক, মধুমিশ্রিত দধি প্রভৃতি মধুপর্ক দ্রব্যাদি এবং নূতন দুটি ক্ষৌমবসন—সমস্তই মন্ত্র উচ্চারণ করে গ্রহণ করলেন।

অন্তঃপুর রক্ষকগণ অতি বিনীতভাবে ক্ষৌমবস্ত্রধারী মহেশ্বরকে বধূ উমার কাছে নিয়ে গেল। নবোদিত চন্দ্রকিরণস্পর্শে উত্তাল ফেন-মালাশোভিত সমুদ্র যেন শান্ত বেলাভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এল।

জীবলোক যেমন শরতের সমাগমে পরম শোভমান হয়ে ওঠে, শরৎ-চন্দ্রের বিপুল জ্যোৎস্নারাশিতে কুমুদরাজি বিকশিত হয় এবং বর্ষণভারে নদীর জলরাশি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয় তেমনি কুমারী উমার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় মহেশ্বরের চক্ষু কুমুদের মত বিকশিত এবং শারদ-নদীর মত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

সেই কক্ষে বর ও বধূ পরস্পরের দর্শন লালসায় অধীর হয়ে উঠলেও সহসা চারচক্ষুর মিলন হতেই দুজনেই চমকে উঠলেন। উমা মহেশ্বরের নেত্রাবলী লজ্জাবশতঃ বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করতে লাগল।

কচি পল্লবের মত আরক্ত আঙ্গুলের শোভায় ভরা উমার হাতখানি হিমালয় তুলে ধরলেন এবং অষ্টমূর্তি মহেশ্বর তা গ্রহণ করলেন। উমার সেই আতাম্র করকিশলয় দেখে মনে হচ্ছিল ত্রিলোচনের ভয়ে ভীত হয়ে কন্দর্প যেন একদিন উমার দেহের রূপসাগরে লুকিয়ে ছিলেন এবং আজ এতকাল পরে সেই লুক্কায়িত মদনের প্রথম আলোকিত অঙ্কুর মহেশ্বর উমাকর-ভ্রমে গ্রহণ করলেন।

এই মিলনকালে উমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং পুরুষোত্তম মহেশ্বরের আঙ্গুলগুলিও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। এই মিলন-মুহূর্তে কামদেব যেন তাঁর অখন্ড প্রভাব সমানভাবে বিভক্ত করে দিলেন নবদম্পতির মধ্যে।

অন্য কোন বিবাহবাসরে এই উমামহেশ্বর উপস্থিত থাকলে বরবধূর

শোভার অন্ত থাকে না, এমনই তাঁদের মাহাত্ম্য। আর আজ সেই উমা-মহেশ্বর স্বয়ং তাদের বিবাহের জন্য মিলিত হয়েছেন। তাঁদের শোভা বর্ণনার অতীত।

পরস্পরসংলগ্ন দিনরাত্রি যেমন জ্যোতিষ্মান মেরুপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি পরস্পরসংযুক্ত নবদম্পতিও প্রজ্জ্বলিত শিখাসম্পন্ন হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করে শোভা পেতে লাগলেন।

উমামহেশ্বর দুজনে দুজনের সংস্পর্শে আনন্দে এমনই তন্দ্রালস হয়ে পড়ছিলেন যে নিমীলিত হয়ে আসছিল তাঁদের চক্ষু। হিমালয়ের কুলপুরোহিত বরবধূকে তিনবার বৈবাহিক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়ে সেই অগ্নিতে উমাকে দিয়ে লাজ বা খৈ বিসর্জন দেওয়ালেন।

পূজনীয় পুরোহিতের আদেশ অনুসারে উমা সেই লাজধূমের অঞ্জলি মুখে দিতে লাগলেন। সেই ধূমশিখায় উমার গণ্ডস্থল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হলো, সেই ধূম মুহূর্তকালের জন্য তাঁর কর্ণের অবতংসস্বরূপ কমলের স্থান অধিকার করল।

সেই আচার-ধূমের গ্রহণে উমার অমল গণ্ডস্থল আরক্ত হয়ে উঠল। নয়নের কৃষ্ণ অঞ্জনরাগ ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কর্ণের যবাঙ্কুরের অবতংস ম্লান হয়ে পড়ল অতিশয়।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত বধূ উমাকে বললেন, বৎসে, আজ তোমার বিবাহে এই হুতাশন কর্মদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী হলেন। তুমি আজ হতে নির্বিকার চিত্তে তোমার স্বামী শিবের সঙ্গে ধর্মাচরণ করবে। আজ হতে তুমি এঁর সহধর্মচারিণী হলে।

মহেশ্বরপত্নী উমা যেন অপাঙ্গ পর্যন্ত কর্ণদ্বয় প্রসারিত করে পুরোহিতের সেই বচনসুধা পান করলেন। গ্রীষ্মের প্রখরতাপে পরিতপ্ত পৃথিবী যেন বর্ষার প্রথম জলধারা আকণ্ঠ গ্রহণ করে সুশীতল হয়ে উঠল।

স্বামী শঙ্কর এবার উমাকে বললেন, 'ঐ ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করো'—গৌরী কোনমতে মুখখানি উঁচু করে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ও বিনম্রবচনে অতিকষ্টে বললেন, দেখেছি।

প্রবীণ পুরোহিত এইভাবে তাঁদের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করলেন। জগতের মাতাপিতাস্থানীয় সেই উমামহেশ্বর সর্বাগ্রে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন।

প্রণাম করলে পিতামহ ব্রহ্মা জগন্মাতাকে 'আয়ুষ্মতী, বীরপ্রসবিনী হও' বলে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ব্রহ্মা অনন্ত বাঙময়ের অপার জলবিন্দুরূপ হয়েও অষ্টমূর্তি শঙ্করকে কি বলে আশীর্বাদ করবেন ভেবে ক্ষণকাল স্তিমিতচিত্তে চিন্তা করলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর বিভূতির কণামাত্র, সেই দেবোত্তমের অনুরূপ আশীর্বাদ কি সহজ কথা?

তারপর সেই নবদম্পতি সুসজ্জিত চতুষ্কোণ বেদীর উপর সুবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হলেন। এরপর লোকাচারমূলক পরমস্পৃহনীয় আর্দ্র অক্ষত দূর্বা প্রভৃতির কর্ষণ প্রসন্ন হৃদয়ে উপভোগ করলেন।

পদ্মালয়া লক্ষ্মী এসে সেই নবদম্পতির মস্তকে পদ্মের ছত্র ধারণ করলেন। সেই ছত্রের প্রান্তস্থিত উৎপলদলে জলবিন্দুগুলি দুলে দুলে মুক্তার ঝালরের মত শোভা পেতে লাগল। সরল ও সুদীর্ঘ মৃণালের দণ্ডে সেই কমলময় ছত্র এক অতি অপূর্ব শ্রী ধারণ করল।

বাগ্‌দেবতা সরস্বতী এসে দ্বিবিধ শব্দজালপূর্ণ ভাষায় সেই দম্পতিকে স্তব করতে লাগলেন। জগদ্বরেণ্য শঙ্করের স্তব প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় শঙ্করীর অতিকোমল সুখশ্রাব্য প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল।

অপ্সরারা নবদম্পতির সামনে অপূর্ব হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে জগতের আদিতম এক নাটক অভিনয় করে দেখাল। নটরাজ শিব-শিবানী একযোগে সেই আদিম নাটক দর্শন করলেন। সেই নাটকের অভিনয় সর্বাংশে সেই দম্পতির দর্শনের উপযুক্তই হয়েছিল। যেখানে যে রসে যে বৃত্তি, যে রাগের অবতারণার নিয়ম, ঠিক সেই রস, সেই বৃত্তি ও সেই রাগের অবতারণা করে অভিনয়টিকে সুষ্ঠু করে তোলা হলো। যথানিয়মে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি, শৃঙ্গারে কৌশিকী, বীরে সাত্বতী প্রভৃতি বৃত্তি সেই সেই রসে অনুকূলভাবে প্রযুক্ত হলো। উমামহেশ্বর ক্ষণকাল সেই উপাদেয় অভিনয় দর্শন করে পরম আনন্দ উপভোগ করলেন।

সেই অভিনয় দর্শনে মহেশ্বরের চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে উপযুক্ত সুযোগ বুঝে ইন্দ্রাদি দেবগণ করজোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, বিধি তৃতীয় নেত্রানলে ভস্মীভূত কন্দর্পকে যদি ত্রিলোচন শাপমুক্ত করে পূর্বদেহ পুনরায় দান করেন, তাহলে এই মিলনকালে পঞ্চানন কন্দর্প এসে নবদম্পতিকে সেবা করতে পারেন।

ইন্দ্রাদির প্রার্থনায় ত্রিলোচন আর দ্বিরুক্তি করলেন না। কারণ তাঁর সে রাগ পড়ে গেছে। অন্য রাগের আবির্ভাবে বিষমাক্ষ এখন প্রসন্নাক্ষ হয়েছেন। পঞ্চশর কন্দর্প এখন যত ইচ্ছা তাঁকে বাণ মারতে পারেন বলে তিনি দেবতাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

তারপর দেবতাদের বিদায় দিয়ে চন্দ্রশেখর হিমালয়নন্দিনী উমার হাত ধরে বাসরঘরে গমন করলেন। সুবর্ণ পূর্ণকুম্ভে তার দ্বারদেশ সুসজ্জিত এবং নানাপ্রকার কুসুমাদি ও আলিম্পনাদি দ্বারা সেই গৃহ পরিশোভিত ছিল। ভূমিতলে স্থণ্ডিলে বরবধূর শয্যা বিরচিত হয়েছে। শঙ্করীকে নিয়ে শঙ্কর সেখানে প্রবেশ করলেন।

অচিরবিবাহজনিত মনোহর লজ্জাভূষণে গৌরী এতই বিতাড়িত ও শোভান্বিত হয়ে পড়লেন যে সেই আনতবদনার মুখখানি আর একবার দেখার জন্য যতই উঁচু করতে যান, গৌরীর মুখ ততই নিচু হয়ে যায়। মুখে কোন কথা বলেন না। শয্যাসহচরীদের বিশেষ জিদে অস্পষ্ট ভাষায় দু একটা কথার জবাব দেন। শম্ভু তখন কৌতুক করার জন্য তাঁর সহচর ভূতপ্রেতদের ইশারা করে নাচতে বললে তারা কিম্ভূত কিমাকার মুখভঙ্গি করে নাচতে লাগলে তা দেখে উমা আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

অষ্টম সর্গ

পাণীপীড়নোৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিবর্তন দেখা দিল উমার চেহারার মধ্যে। তিনি আর এখন পর্ণভক্ষণরতা তাপসী নন, নবপরিণীতা বধূ। বহুবাঞ্ছিত বহুতপস্যালব্ধ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে উমার আপাদমস্তক সমস্ত কলেবর বসন্তোৎফুল্ল লতিকার

মত বিকশিত ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নবপরিণীতা ও প্রণয়িনীর সেই মনোরম অবস্থাদর্শনে কত নূতন নূতন ভাব জাগল চন্দ্রশেখরের চিত্তে।

শঙ্কর কথা বলতে চাইলেও কোন কথা বলেন না উমা। আঁচল ধরে টানলেও তিনি তা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যান। শয্যায় গিয়ে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। এই সব প্রতিকূলতায় অনুকূল বল্লভ চন্দ্রশেখর পরম তৃপ্তি পান।

একদিন কৌতূহলবশতঃ শঙ্কর ঘুমের ভান করে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইলেন। পার্বতী এসে ঘুমটা কত গভীর তা দেখার জন্য স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন ত্রিলোচনের তিনটি চোখই খুলে গেল এবং তিনি মৃদু হাসতে লাগলেন। হরের চোখে হরপ্রিয়া গৌরীর চোখ পড়তেই গৌরীর মনে হলো হঠাৎ যেন চোখে বিদ্যুতের ঝলক লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নয়ন মুদ্রিত করে ফেললেন।

কটিদেশের বসনগ্রন্থি শিথিল করার জন্য শঙ্কর যেমন ধীরে ধীরে উমার নাভিদেশে করসঞ্চালন করতে থাকেন, উমার সর্বাঙ্গ কম্পিত হতে থাকে। স্বামীর হাত চেপে ধরে সে যাত্রা রক্ষা পেতে চান। কিন্তু তার আগেই হৃদয়ের মিলনোচ্ছ্বাসের জন্য আপনিই খুলে যায় সে নীবিবন্ধন।

'সখি, যখন লোকজন থাকবে না, তখন শঙ্করকে এইভাবে সেবা করবে।' এই বলে সহচরীরা কত শিখিয়ে দেয় উমাকে। কিন্তু শঙ্কর তাঁর সামনে এলেই ভয়ে ত্রাসে ও লজ্জায় সখীদের সব উপদেশের কথা ভুলে যান উমা।

পার্বতীর এই স্তব্ধনীরব ভাবটা কাটাবার জন্য শম্ভু তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তবু কোন কথা বলতেন না লজ্জারুণমুখী উমা। শুধু স্বামীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হাঁ বা না বলে জবাব দিতেন।

শঙ্কর যখন নির্জনে উমার পরিধানের বসনখানি টেনে কেড়ে নিতেন, উমা তখন ত্রিলোচনের দুটি চোখে হাত দিয়ে চেপে ধরতেন। উমা ভাবতেন, শঙ্কর তাঁর এই নগ্ন অবস্থা দেখতে পাবেন না। কিন্তু ত্রিলোচনের ললাটনেত্রটি ঢাকা পড়ত না। সে চোখটি

উমার দিকে চেয়ে থাকত আর এইভাবে উমার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হত। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন।

নববধূর এই সব হাবভাব জগদীশ্বর শঙ্করের অভিলাষ পূরণের যতই পরিপন্থী হোক না কেন, তাঁর তা ভাল লাগত। প্রণয়াকুল শিবের কার্যসাধনে পার্বতীর এই সব প্রতিকুলতা ও বাধাদান শিব পছন্দ করতেন। চুম্বনপরাঙ্মুখী পার্বতী স্বামীর চুম্বনের কোন প্রতিদান দিতেন না অথবা স্বামীর গাঢ়নিবিড় আলিঙ্গনকালেও পাষাণ প্রতিমার মত নিশ্চেষ্ট থাকতেন। পার্বতীর এই মধুর অপ্রগলভ প্রকৃতি মিলন-কালে সহায়তা না করলেও শঙ্কর এই সব ব্যাপারই উপভোগ করতেন।

নববধূ উমা আসলে মিলনকালে কোন আতিশয্য বা বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। কিন্তু অধরক্ষতবর্জিত চুম্বন ও নখচিহ্নহীন নখাদির অত্যাচার স্বামী যখন একটু সদয়ভাবে করতেন তখন উমা কোন বাধা দিতেন না। শঙ্কর প্রচন্ড রকমের কোন বাড়াবাড়ি করতে গেলে বাধা দিতেন উমা।

বরবধূর রাত্রিকালের বৃত্তান্ত জানার জন্য সখীরা যখন প্রশ্নবাণে পার্বতীকে জর্জরিত করে তুলত তখন লজ্জাযুক্তা উমা সখীদের নিরাশ করতেন না। বরং তা সব বলার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন।

নিভৃতে নির্জনে প্রিয়তম পতিদেবতার অত্যাচারের চিহ্ন, নখদন্ত প্রভৃতির ক্ষত দেখার জন্য পার্বতী যখন দর্পণের সামনে বসতেন তখন শঙ্কর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পার্বতীর পিঠের দিকে গিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু উমা নিজের মুখ দেখার জন্য সেই দর্পণের দিকে তাকাতেই তাতে শঙ্করের প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন। অমনি লজ্জায় মুষড়ে পড়ে কত কি করতেন।

জননী মেনকা কন্যার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতেন তাঁর উমাশশী স্বামী নীলকন্ঠের কত আদারিণী হয়েছে। তা দেখে আনন্দের সীমা থাকত না মেনকার। নবিবাহিতা কন্যা পতির প্রিয় হতে পেরেছে জানতে পেরে সব মাতাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

কিছুকালের মধ্যেই নবপরিণীতা পার্বতীকে নিজদেশে নিয়ে এলেন

শঙ্কর। কামদেব মদনের উপভোগক্ষম নূতন রাজ্যে প্রবেশ করে পার্বতীও প্রণয় ও সুরতক্রিয়ার ব্যাপারে স্বামীর প্রতিকূলতা ছেড়ে দিলেন। তাঁর সব আপত্তি লোপ পেল ক্রমে ক্রমে।

আলিঙ্গনে প্রত্যালিঙ্গনদানে, চুম্বনকালে মুখের অপরাবির্তনে অর্থাৎ মুখটি সরিয়ে না নিয়ে ও রশনাদামের অপহরণে স্বামীকে বাধা না দিয়ে পার্বতী সব কিছু মেনে নিতেন বলে শঙ্করের প্রীতির আর শেষ রইল না।

কিছুদিনের মধ্যে নবদম্পতির প্রথম দর্শনসঞ্জাত হৃদয়ের প্রীতিভাব ক্রমে পরিণত হলো প্রগাঢ় অনুরাগে। পারস্পরিক কটাক্ষবিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিরোহিত হলো সব প্রতিকূল ভাব। উভয়ে উভয়কে দেখার জন্য ও আলাপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এক নিমেষের জন্য একজন চোখের আড়াল হলে অন্য জন চোখে অন্ধকার দেখতেন।

অভিলাষের অনুরূপ অথবা তার থেকেও বেশী মনোহর পতি পেয়ে বধূ উমারও অনুরাগ যতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল বা শঙ্করের হৃদয়েও উমার প্রতি ততখানি বা তার থেকে বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। জাহ্নবী যত এঁকে বেঁকে যে পথেই যান না কেন, তাঁর লক্ষ্য যেমন শুধু সমুদ্রের দিকে, তেমনি সমুদ্রও জাহ্নবীর প্রথম প্রবাহোচ্ছ্বাস আস্বাদন করে কৃতার্থ হবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।

একান্ত নির্জনে জগদীশ্বর শঙ্করের কাছে পার্বতী রতিমন্দিরের করণকারণ ও রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় সব শিক্ষা করেছিলেন। আর সেই সব শিক্ষার প্রতিদানরূপে শিষ্যা পার্বতীও যুবতীদের কামকলায় নৈপুণ্য কতখানি তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি গুরুদক্ষিণা সুদে আসলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আত্মানুরূপিণী প্রণয়িনী লাভ করে মহাদেবের অসহিষ্ণুতা অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। উমা বেদনাকম্পিত হাতে মহাদেবকে কিছুক্ষণের জন্য নিবারিত করে নিজের মুক্ত ও দশনক্ষত অধরপল্লবের জ্বালা—স্বামীর ললাটচন্দ্রের সুশীতল কিরণে মাঝে মাঝে জুড়িয়ে নিতেন।

চুম্বনকালে মহাদেবের ললাটনেত্রও দেবীর অলকনিহিত গন্ধচূর্ণে

যখন উপহত হত তখন বিকচকমল গন্ধপূর্ণ উমার মুখের বাতাসের দ্বারা হরচক্ষুর আবিলতা দূর হয়ে যেত। অর্থাৎ উমা ফুৎকার দিয়ে হরনয়নের চূর্ণ ধূলি সব উড়িয়ে দিতেন। (মহাদেবের ললাটনেত্রের উপর উমার কুন্তলচূর্ণের পতন বিপরীত রতিক্রিয়া সূচিত করে।)

এইভাবে মহাদেব পূর্বদগ্ধ ও ভস্মীভূত মদনকে পুনরুজ্জীবিত করে উমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে করতে হিমালয়ভবনে এক-মাসকাল বাস করলেন।

শঙ্কর এবার নিজের দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হিমালয়ের অনুমতি নিয়ে অপ্রতিহতগতি বাহন বৃষভরাজের পৃষ্ঠে উমাকে নিয়ে আরোহণ করলেন। তাঁর বাহনের উপর চড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিমালয়ের এখানে সেখানে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে পর্বতরাজ হিমালয়ও কন্যার বিরহে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন।

পবনের মত দ্রুতগতি বাহনের উপর চড়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই দেব-দম্পতি মেরুপর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণকালে শঙ্কর বৃষপৃষ্ঠে পীনস্তনী পার্বতীকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিজে তাঁর পিছনে বসে-ছিলেন। স্বর্ণশিখর মেরুপর্বতে স্বর্ণপল্লবে বিরচিত সুখশয্যায় নর্মক্রীড়ানিপুণ শঙ্কর উমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করতেন।

নানারকম রতিক্রীড়ায় বিমুগ্ধ ও পার্বতীর বদনকমলের গন্ধসেবী ভৃঙ্গের মত শঙ্কর মন্দারপর্বতের নিতম্বদেশে নানা উপভোগ্যস্থানে কিছুকাল বাস করলেন। সেই পর্বত নিতম্বের শিলাগুলিতে তখনো পদ্মনাভ বিষ্ণুর হস্তধৃত বলয়ের চিহ্ন বর্তমান ছিল। ঐ পর্বতকে মন্থনদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে সমুদ্রমন্থন হয়েছিল এবং তাতে বিষ্ণুও যোগদান করেছিলেন। অচিরোদ্‌গত অমৃতের শীকরসংস্পর্শে পর্বতের মধ্যভাগ সুশীতল হয়ে গিয়েছিল। আজও তা তেমনিই সুশীতল আছে। হরপার্বতী সেই রমণীয় ও শ্রমক্লেশহারী পার্বত্য অঞ্চলে মনের সুখে কিছুদিন যাপন করলেন।

যক্ষপতি কুবেরের অনন্ত সৌন্দর্যপূর্ণ কৈলাসপর্বতে উমা-মহেশ্বর

যখন বাস করছিলেন তখনকার একটি ঘটনায় তাঁদের এই কৈলাসবাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তাঁদের মনে। কোন এক জ্যোৎস্নারাতে পর্বতের শিখরদেশে তাঁরা যখন নির্মেঘ নির্মল চাঁদের আলোয় বসে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন সহসা রাবণ সেই পর্বতের পাদদেশে এক প্রবল পদাঘাত করায় সমগ্র পর্বতটা কেঁপে ওঠে। উমা তখন ভয় পেয়ে গিয়ে ছুটে এসে তাঁর মৃণালভূজ দিয়ে নীলকণ্ঠকে জড়িয়ে ধরেন। উমা নিজে থেকে স্বামীকে এইভাবে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরায় স্বয়ংগ্রহাশ্লেষ সুখের সমাগমে পুলকিত হয়ে উঠলেন শঙ্কর। তাঁর মনে হলো বিমল চন্দ্রালোক বিমলতর হয়ে উঠেছে যেন।

শঙ্কর যখন শঙ্করীকে নিয়ে মলয়পর্বতে বিহার করে বেড়াতেন তখন চন্দনবর্নবিহারী গন্ধবহ দক্ষিণা বাতাস লবঙ্গকেশর উড়িয়ে এনে চাটুকারের মত উমার সকল ক্লান্তি দূর করে দিত। রতিশ্রমকাতরা উমার সকল শ্রান্তি, দেহের সকল গ্লানি ঐ মলয় বাতাসে সুরভিত সুশীতল স্পর্শে দূর হয়ে যেত।

সুরতক্রীড়ায় আজ আর কোন লজ্জা বা জড়তার ভাব নেই উমার মধ্যে। আজ উমা মাঝে মাঝে সোনার শতদল দিয়ে তাড়না করেন প্রিয়তমকে। শঙ্করও জল ছিটোতে থাকেন উমার চোখে মুখে। উমা তখন দিশাহারা হয়ে সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নদীর জলে শফরীর ঝাঁক লাফাতে থাকায় মনে হয় উমা যেন আর এক-ছড়া রশনা পরেছেন।

নন্দনবনে নীলকণ্ঠ যখন পারিজাত কুসুম দিয়ে পার্বতীর অলকদাম সাজিয়ে দিতেন তখন কত পুণ্যের ফলে এমন পতি লাভ করা যায়, একথা ভাবতে ভাবতে সুরকামিনীরা সকাম হৃদয়ে ও নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতেন উমা-মহেশের দিকে।

এইভাবে উমার সঙ্গে উমানাথ কিছুকাল পার্থিব অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করে বেড়াবার পর একদিন সূর্যের অস্তগমনকালে স্ত্রীকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের চির মনোরম বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শঙ্কর সেই গন্ধমাদন বনে একটি হিমশিলায় বসলেন আর শঙ্করী

তাঁর বাম বাহুতে ঠেস দিয়ে বসলেন। শঙ্কর তখন সেই অস্তাচলগামী স্তিমিত সূর্যের মনোহর সৌন্দর্য দর্শনে বিহ্বল হয়ে শঙ্করীকে বললেন ঃ

প্রিয়ে, দেখ দেখ, ঐ অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের দিকে তাকাও। তোমার নয়নের তিনভাগের একভাগ লাল, ঠিক পদ্মের মত। তাই মনে হচ্ছে কমলিনীপতি সূর্য অস্তাচলে যাবার সময় তাঁর কমলের সৌন্দর্য তোমার নেত্রদ্বয়ে গচ্ছিত রেখে চলে যাচ্ছেন। যেন প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎকে সংহার করছেন।

স্বামীর মুখে নিজ নয়নের এই প্রশংসা শুনে উমা সলজ্জমুখে মাথা নত করলেন। তখন আনতমুখী উমার সেই লজ্জারুণভাব শঙ্কর মনেপ্রাণে অনুভব করে বললেন, হে, আনতাঙ্গী, ঐ দেখ নির্ঝরের জলকণায় আগের মত আর সূর্যকিরণ স্পর্শ হচ্ছে না। সূর্য তাঁর কিরণসঙ্কোচ করে দূরে চলে যাওয়ায় তোমার পিতার জলপ্রপাতগুলির চারদিকে আর নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনুর শোভা দেখা যাচ্ছে না।

প্রিয়ে, ঐ দেখ, রাত্রি আগত দেখে চক্রবাকমিথুন কেমন বেদনাবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তারা দুজনে পদ্মের কেশর খেতে শুরু করেছে। দিনের বেলায় ওদের মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। রাত্রিকাল আগত দেখে ওরা কাঁদতে কাঁদতে মুখ ফিরিয়ে দুজনে দুদিকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ঐ দেখ, বন্য হস্তিগুলি দিনের বেলায় যেখানে ছিল তাপ নিবারণের জন্য সেখানকার শল্লকীতরুগুলির কত শাখা ভেঙ্গে চুরমার করেছিল এবং সেই সব শল্লকী তরুর শাখা-স্রুত নির্যাসে সে স্থান সুরভিত শীতল হয়েছিল। এখন রাত্রিকালে তারা জলপান করে না বলে সেই ছায়াশীতল স্থান ছেড়ে এসে প্রাণভরে জলপান করছে। সন্ধ্যাকালে জলের পদ্মগুলি মুদে যাওয়ায় তাদের মধ্যস্থিত ভ্রমরগুলি পদ্ম কোষে কেমন আটকে গেছে।

হে মিতভাষিণী, কথা বলছ না কেন? ঐ দেখ, সূর্যদেব পশ্চিমদিকের প্রান্তভাগে হেলে পড়েছেন আর তাঁর সুদীর্ঘ লাল প্রতিবিম্ব

এসে কেমন লম্বিতভাবে সরোবরের বীচিবিক্ষুব্ধ সুন্দর বক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে। যেন দিনপতি সূর্য সরোবরের উপর হিরণ্ময় সেতুবন্ধন করেছেন।

. বড় বড় শ্বেতদশনযুক্ত বিপুলকায় বরাহগুলি সরোবরের পঙ্কময় অল্প জলে নেমে তার কর্দমাক্ত বক্ষ আলোড়িত করে সারাদিনের তাপটা কাটিয়ে সন্ধ্যাকালে বনের দিকে ছুটছে। তাদেব করালধবল বক্র দশন বা দাঁতগুলি চকচক করছে। মনে হচ্ছে যেন মৃণালের সাদা সাদা ডাঁটা-গুলি মুখে করে তারা ছুটছে।

দিনের আলো ক্রমে কমে আসায় সৌরতাপের তীব্রতা গোধূলিকালের মনোহরতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঐ দেখ, কৃষ্ণচূড়ায় কলাপী গিয়ে বসেছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় শিখণ্ডীর কলাপগুলি যেন সোনার জলে রঞ্জিত করা হয়েছে। আর তারা নিঃশব্দে ম্লান সন্ধ্যায় মন্দীভূত মৃদু মাধুর্যময় আবেগ পান করছে।

সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়ায় পূর্বদিকপ্রান্তে গাঢ় অন্ধকার এসে জমেছে। আকাশের কোন কোন স্থানে সামান্য একটু আলোর আভা চিকচিক করছে মাত্র। মনে হচ্ছে আকাশরূপী নিদাঘশুষ্ক এক বিশাল জলাশয় পড়ে আছে যার পূর্বদিকটি কালো পাঁকে ভরা আর অন্য দিক-গুলিও জলশূন্য হয়ে পড়েছে।

পার্বতী, এই সময় আমাদের আশ্রমের শোভা একবার দেখ। মৃগ-গুলি পর্ণশালায় প্রবেশ করছে। আম্রতরুরাজির মূলদেশবেষ্টিত আলবালগুলি জলে ভরে দেওয়া হয়েছে। হোমধেনুরা গোচারণের মাঠ হতে ফিরে আসছে। হোমাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে। এই সব কিছুর সমন্বয়ে অপূর্ব হয়ে উঠেছে আশ্রমের শোভা।

ঐ দেখ, দিনমণির অস্তগমনে ফুটন্ত কমলগুলি বুজে আসছে, কিন্তু একেবারে মুদ্রিত হচ্ছে না। কার জন্য বক্ষোদ্বার ঈষদুন্মুক্ত করে রেখেছে। ক্ষণকাল মধ্যে তার প্রিয়তম ভ্রমর এসে আশ্রয়ভিক্ষা করবে বলেই কমলিনী তার হৃদয়ের দুয়ারটি অল্প একটু খুলে রেখেছে।

ঐ দেখ, অস্তমিতপ্রায় লোহিতবর্ণ অল্পাবশিষ্ট কিরণমালা দূরে

পশ্চিমদিগন্তে হেলে পড়ায় কেমন শোভা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন দোদুল্যমান কেশরমালায় শোভিত বন্ধুজীবক কুসুমের তিলকে বিমণ্ডিত হয়ে কোন কন্যা বিরাজ করছে।

রাত্রিকালে অগ্নিতে সূর্যদেব তাঁর তেজ রক্ষা করেন বলে অগ্নি তখন সতেজ আর সবিতা তেজোহীন হয়ে পড়েন। ঐ দেখ, সন্ধ্যাকালে সূর্যদেব অগ্নিতে নিজের তেজ রক্ষা করে অস্তাচলে যাচ্ছেন আর তাঁর কিরণ পান করে বালখিল্য প্রভৃতি যে সব মহর্ষিরা সৌরলোকে ভ্রমণ করেন তাঁরা মধুরস্বরে সামগানের দ্বারা সূর্যদেবের স্তব করছেন। ঋষিদের সুমধুর স্বর শুনে সূর্যরথের অশ্বগুলি কেমন বিমুগ্ধ হয়ে কান খাড়া করে আছে।

ঐ দেখ, উচ্চতম সৌরলোক হতে কত বেগে সূর্যাশ্বগুলি নীচে সমুদ্রকূলে অবতরণ করছে। এই অবতরণকালে নিম্নমুখ অশ্বগুলির স্কন্ধরোমরাজি এসে তাদের চোখের উপর পড়ায় তাদের দৃষ্টিরোধ হচ্ছে আর রথের যুগদণ্ডে তাদের কেশরগুলি জড়িয়ে যাচ্ছে। সবিতৃদেব যেন সমুদ্রবক্ষে দিবসভাগকে নিহিত করে অস্ত যাচ্ছেন।

দেখ দেখ, সূর্যদেব অস্তগমন করায় ঐ বিরাট আকাশটা যেন নিঃসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অতিতেজসম্পন্ন মহৎদের এই পরিণতিই হয়। তাঁরা অভ্যুদিত হয়ে যে স্থান জ্যোতির্ময় করে তোলেন তাদের তিরোধান মাত্রেই সে স্থান অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

অস্তাচলশিখরে সবিতৃদেব গিয়ে উপস্থিত হতেই সন্ধ্যাদেবীও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সূর্যদেবের অনুগমনে তিলমাত্রও বিলম্ব করলেন না। সূর্যোদয়কালই সন্ধ্যা বলে প্রসিদ্ধি আছে, তাই সন্ধ্যাকে পুরোভাগে রেখে সূর্য উদিত হন। সূর্যাস্তের সময় অর্থাৎ সূর্যের পতনের সময় সাধ্বী সন্ধ্যাদেবী সূর্যের অনুগমন করে থাকেন কালবিলম্ব না করে।

ঐ দেখ, পীত কপিশ প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে মেঘের প্রান্তভাগগুলি ও ঋজু কুটিল কোণগুলি অপূর্ব শোভা লাভ করেছে। তুমি দেখবে বলে সন্ধ্যা স্বয়ং তুলি দিয়ে মেঘপ্রান্তগুলিকে নানা রঙে চিত্রিত

করে রেখেছে।

ঐ দেখ, সন্ধ্যাকাল আগত হওয়াতে সব লাল হয়ে গেছে। সিংহের কেশরসমূহে, নবপল্লবশোভিত দ্রুমশ্রেণীতে নানাবর্ণরঞ্জিত শিলাময় শৃঙ্গসমূহে সূর্য যেন সন্ধ্যার অরুণ রাগ ভাগ করে করে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

ঐ দেখ, শাস্ত্রবিধানজ্ঞ তপস্বীগণ পদাগ্রভাগে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পরম ভক্তি সহকারে পবিত্র জলের অঞ্জলি দিয়ে অর্ঘ্যদান করে শুদ্ধমানসে সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীর উপাংশু জপ করছেন।

হে মধুরভাষিণী, আমারও আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। তুমি ক্ষণকালের জন্য আমায় অনুমতি দাও। আমি যথাকালকর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে নিই। তোমার বাকবিন্যাসচতুর সখীগণ এই সময়টুকু একথা সেকথা বলে আনমনা করে রাখবে তোমায়।

প্রাণবল্লভের এই কর্মান্তরের কথায় মনে বড় আঘাত পেলেন উমা। তিনি ছাড়া শঙ্করের যে অন্য কোন কাজ থাকতে পারে এই প্রথম তিনি জানলেন। তাই তিনি অন্তরের বেদনায় ও অভিমানে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে স্বামীর কথা কানে না শোনার ভান করে সখী বিজয়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

দেবী যখন অভিমান ভরে এইভাবে মুখ ফিরিয়ে সখীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন সেই সময়ের মধ্যে মহেশ্বরও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সায়ংকৃত্য সমাপণ করে ফিরে এলেন প্রিয়তমার কাছে। রোষারুণাক্ষী ও বার্তালাপে পরাঙমুখী প্রিয়তমাকে বললেন ঃ

দেবী, ক্রোধ পরিহার করো। আমি ত কিছু করিনি। শুধু সন্ধ্যাকৃত্য করেছি। ধর্মানুশীলন ছাড়া অন্য কোন কারণে তোমার দিক থেকে মুখ ফেরাইনি কখনো। চক্রবাক চক্রবাকীকে ছেড়ে কোথাও না গেলেও মাঝে মাঝে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তবু প্রেমের দিক থেকে তারা অভিন্ন আত্মাই থাকে। আমিও তেমনি তোমার সহধর্মকারী, অন্য পরতন্ত্র।

হে শোভনাঙ্গী, তুমি ত জান, পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃপুরুষদের

সৃষ্টি করে তাঁর যে মূর্তি পিতৃগণের মধ্যে ন্যস্ত করেছিলেন, সেই মূর্তিই সাংপ্রাতমুহূর্তে উদয়কালে ও অস্তকালে সন্ধ্যারূপে বন্দিত হয়ে থাকে। অভিমানিনী, সেইজন্যই পিতামহের এই সন্ধ্যারূপিনী মূর্তিকে আমি এত গৌরব দান করি।

পার্বতী, একবার পূর্বদিকে চেয়ে দেখ, ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। সন্ধ্যা যেন মাটিতে একেবারে লুটিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, যেন কোন দ্রবীভূত গৈরিক ধাতুর নদী বয়ে যাচ্ছে আর তার পৃষ্ঠতটে ঘননীল তমালতরুশ্রেণী শোভা পাচ্ছে।

আর ঐ অন্যদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সন্ধ্যার শেষ লোহিত রশ্মি রক্তের রেখার মত চক্রাকারে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এক রণভূমি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তাক্ত কৃপাণ ধারণ করেছে।

হে দীর্ঘনয়নে, একবার নয়ন উত্তোলন করে দেখ, দিনযামিনীর সন্ধিসময়ে অর্থাৎ সায়ংকালে সন্ধ্যার শেষ লোহিত আভা সুমেরু পর্বতে বিলীন হয়ে যাওয়ায় তার অন্ধকার দেখতে দেখতে দশদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ঐ দেখ, বিরাট পৃথিবীটা দেখতে দেখতে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। ঊর্ধ্ব, অধঃ, পার্শ্ব, সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ—কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। যেন নৈশ জগৎ তিমিররূপ জরায়ুর দ্বারা আবৃত হয়ে দুঃসহ গর্ভবাস করতে শুরু করেছে।

ভাল-মন্দ, নির্মল-পঙ্কিল, স্থাবর-জঙ্গম, বক্র-সরল—সব আজ অন্ধকারের প্রভাবে একাকার সমান হয়ে গেছে। কারো কোন বৈশিষ্ট্য আর বোঝার উপায় নেই। অসতের যে বুদ্ধিতে সকলের সকল প্রভেদ বা পার্থক্য তিরোহিত হয়েছে সে বুদ্ধিতে শতধিক।

হে কমলনয়নে, নৈশ তিমির দূর করার জন্য দশপূর্ণমাসাদি যজ্ঞকারীদের পরম বন্ধু নিশানাথ চন্দ্র উদিত হচ্ছেন। পূর্বদিকবধূদের মুখকে কে যেন কেতকীকুসুমের পরাগে আবৃত করে দিল। পূর্বদিক মুখে চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নার প্রথম রেখাপাত দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোন প্রবাসপ্রত্যাগত পতি তার প্রিয়তমার বিরহম্লান মুখে সুগন্ধি

চূর্ণ লেপন করে সে মুখের ম্লানিমা ঘুচিয়ে দিচ্ছে।

সম্যকভাবে উদিত হয়নি যে চন্দ্র তা মন্দারগিরির অন্তরালে পড়ায় নক্ষত্ররাজিবিরাজিত নিশিথিনীর কি অপরূপ শোভা হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন প্রিয়সখীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছ আর আমি তোমার বাক্যাবলী গোপনে শোনার জন্য চুপি চুপি তোমার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

পার্বতী, ঐ দেখ, কোন প্রগলভা কামিনী যেমন তার সারাদিনের অভিলাষ ও মনের তরঙ্গগুলিকে চেপে রেখে সান্ধ্যসমীরণের কাছে তার গোপন কথাগুলি সহাস্যবদনে প্রকাশ করে থাকে তেমনি ঐ পূর্বদিকরূপ নায়িকা সায়ংকালে অপ্রকাশিত চন্দ্রমণ্ডলকে রজনীসখীর আগ্রহাতিশয্যে সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে এবং চন্দ্রমণ্ডল সুপ্রকাশিত হওয়ায় তার ঈষৎ-প্রসৃত জ্যোৎস্নারাশি ঐ দিকবধূর হাসির মত মনে হচ্ছে।

প্রিয়ে, একবার উপরে আকাশের দিকে এবং একবার নীচে সরোবরের দিকে তাকিয়ে দেখ, কি অপূর্ব শোভা জন্মেছে। শ্যামলতার পরিপক্ক ফলের মত ঈষৎ তাম্রাভ অচিরোদিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সরোবরের উপর পড়ায় আকাশ ও সরোবরবক্ষ দুই-ই সমান রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে রাত্রিকাল বলে তুল্যবর্ণ চক্রবাকযুগল মিলিত হতে পারছে না বলে তাদের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদের আলো এবং সরসীবক্ষে তার প্রতিবিম্ব পড়ায় পরস্পরদূরবর্তী বিরহখিন্ন চক্রবাক মিথুনের দৃষ্টি মনে পড়ছে।

অচিরোদভিন্ন যবাঙ্কুরের মত অতি সুকুমার চন্দ্রাকিরণ এমনই ঘনীভূত মনে হচ্ছে যে যেন অনায়াসে নখাগ্রের দ্বারা তার কিছুটা ছিঁড়ে এনে তোমার কর্ণের অবতংস করা যায়।

বশংবদ নায়কের মত চন্দ্রমা তার প্রিয়া রজনীকে তার তিমিরকল্প কেশকলাপ আঙ্গুল দিয়ে ধারণ করে নিকটে আকর্ষণ করে মুখচুম্বন করছে আর প্রিয়তমের সংস্পর্শে জাত আনন্দের আবেগে রজনীর কমল-রূপ নয়ন ক্রমেই বুজে আসছে।

পার্বতী, নবোদিত চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোৎস্নায় আকাশের অন্ধকার

কতক কেটে গেলেও কতক এখনো সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়নি। এই অর্ধ-আলোকিত ও অর্ধতীমিরিত আকাশ দর্শনে মানস সরোবরের কথা মনে পড়ছে। মানস সরোবরের যে দিকে মদস্রাবী গজরা ক্রীড়া করতে থাকে সে দিকটা কলুষিত হয় আর যেদিকে তারা ক্রীড়া করে না সে-দিকটি নির্মল থাকে। আজ আকাশেরও সেই অবস্থা।

কোন কারণবশতঃ কোন রাজা যেমন তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর ঈষৎ বিরক্ত হলেও নির্মল প্রকৃতির ঐ মন্ত্রীগণের উপর অচিরেই প্রসন্ন হন, তেমনি চন্দ্রদেবও উদয়কালীন রক্তবর্ণ পরিহার করে ধীরে ধীরে নির্মল পরিধিবেষ্টিত হয়ে উঠলেন। কালদোষে কখনো কারো মধ্যে কোনরূপ বিকার জন্মালেও পরিশুদ্ধ অমাত্যদের সংস্পর্শে রাজার সে বিরক্তি স্থায়ী হয় না।

পার্বতী, চন্দ্রের কিরণ কেবলমাত্র যে সব স্থান সমুচ্চ ও সমুন্নত সেই সব স্থানের উপরেই পড়ছে। কিন্তু যে সব নিম্নস্থান গর্ত বা গুহাগহ্বরে ভরা, রাত্রির অন্ধকার সেই সব স্থানে গিয়ে লুকোচ্ছে। বিধাতা নিশ্চয় গুণ ও দোষের নিজের নিজের পরিণাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ঐ দেখ, হিমালয়ের নিতম্বদেশে তরুস্কন্ধে শিখিকুল চাঁদের আলোয় কেমন ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু তারা আর ঘুমোতে পারল না। পর্বতস্থিত চন্দ্রকান্ত শিলাসমূহে চাঁদের আলো পড়ায় তা হতে টুপ টুপ করে জলবিন্দু নিদ্রিত ময়ূরকুলের গায়ে পড়ায় তারা জেগে উঠছে।

হে অনিন্দ্যসুন্দরী, ঐ দেখ, কল্পতরুরাজির শীর্ষদেশে শশাঙ্কের রশ্মিরেখা এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন কল্পবৃক্ষগুলির কাছ থেকে চন্দ্রদেব বাহু প্রসারিত করে কর আদায়ের জন্য অমল ধবল মুক্তাহার গুণে নিতে উৎসুক হয়েছেন।

ঐ দেখ, অমন যে অমল ধবল জ্যোৎস্না তাও আজ কোথাও শ্বেত, কোথাও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাচ্ছে। পর্বতের যে সকল স্থান উন্নত ও সমতল জ্যোৎস্না সেখানে পূর্ণ প্রকাশিত, আর যে স্থান নিম্ন ও অসমতল সেখানে জ্যোৎস্নায় অন্ধকার মেশানো। দেখে মনে হচ্ছে এক

প্রকাণ্ড গজরাজের সঙ্গে বহুবিধ বর্ণ শোভা পাচ্ছে। কেন না, তারও অঙ্গের কোন স্থান শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও আবার পিঙ্গলাভ।

এইদিকে আবার কুমুদফুলগুলি চাঁদের এমনভাবে জ্যোস্নারূপ রস বা মদ্য আকণ্ঠ পান করে বসেছে যে সেই নিপীত রসের মাত্রাধিক্যে আর স্থির থাকতে পারছে না তারা। কুমুদফুলগুলির সবটাই এখন ফুটে উঠেছে এবং দিনের বেলায় যে সব ভ্রমর আটকে পড়েছিল তার মধ্যে, তারা এবার ছাড়া পেয়ে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করে দিয়েছে।

চণ্ডী, ঐ কল্পতরুটি একবার দেখ। তা হলে কেমন অমল ধবল ও অতিসূক্ষ্ম এক বসন লম্বিত হয়ে ঝুলছে। কিন্তু সে বসন জ্যোৎস্নার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তা যে একখানি বসন তা মনেই হচ্ছে না। কাপড়খানা যখন এদিক ওদিক উড়ছে তখনই বোঝা যাচ্ছে ওটা একখানা কাপড়।

আবার দেখ, তরুলতাদির ঘন পত্রাবলীর ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে কোন তরুমূলে পড়ে ঝলমল করছে। মনে হচ্ছে বৃক্ষমূলে রাশি রাশি সুকোমল কুসুম ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইচ্ছা করলেই হাত দিয়ে তোলা যায় এবং তোমার কেশদাম পর্যন্ত সাজিয়ে দেওয়া যায়।

হে অনিন্দ্যসুন্দরমুখী, ঐ দেখ, প্রতি রাত্রিতে যে তারাটি এসে তাড়াতাড়ি চাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হয় সেই যোগতারাটি কেমন ধীরে ধীরে এসে মিলিত হচ্ছে। আর তার অঙ্গজ্যোতিতে কেমন আলোকিত হয়ে উঠেছে চারদিক। দেখে মনে হয় যেন কোন নবোঢ়া কন্যা সভয়ে ও সলজ্জভাবে কাঁপতে কাঁপতে তার নবপ্রণয়ীর কাছে আসছে।

পার্বতী, তুমি চাঁদের দিকে চেয়ে আছ, আর ঐ পরিণত সব রাতের মত গৌরকান্তি তোমার স্বচ্ছসুন্দর গণ্ডস্থলে চাঁদের কিরণ পড়ে কেমন ঝলমল করছে। সারা কপোলফলক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে তোমার ঐ গণ্ডদেশ হতে বিচ্ছুরিত হয়েই জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

ঐ দেখ, ঈষদারক্ত চন্দ্রকান্ত শিলাসমূহের গাত্রের নিম্নভাগে চাঁদের কিরণ পড়ায় তা হতে কেমন জল গলে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন এই

গন্ধমাদনবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবতা চন্দ্রকান্ত মণিনির্মিত পানপাত্রে কল্পতরুপ্রসূত রক্তগর্ভ সুরা নিয়ে নিজেই তোমার সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। কারণ তুমি গম্ভীর প্রকৃতির এবং কোথাও যাও না। তাই তিনি স্বয়ং এসেছেন।

আমি ভেবে পাচ্ছিনা, এই কল্পতরুপ্রসূত মধুপানে তোমার স্বভাব-সুন্দর মুখের সৌন্দর্য কি এমন বাড়বে! তোমার মুখ সর্বদা আপনিই কেশর বা বকুলফুলের গন্ধে ভরা এবং তোমার নয়নদ্বয়ও ঈষদারক্ত।

কিন্তু তাই বলে মুখ ফেরালে চলবে না। তোমার সখীরা যখন মধ্যরাতে উপস্থিত হয়েছে তখন তাদের সম্মানটা রাখা উচিত। একটু তোমাকে খেতে হবেই। এই বলে শঙ্কর নিজের হাতে পার্বতীকে ধরে একটু মদ্যপান করালেন।

সেই মদ্যপানে পার্বতীর মানসিক ও দৈহিক বিকার জন্মাতে লাগল। তাঁর তখনকার অবস্থা আম্রতরুর সঙ্গে রসাল লতিকার মিলিত হওয়ার দৃশ্য মনে পড়িয়ে দিল।

সুমুখী উমার মুখসৌন্দর্য মদের প্রভাবে আরও বেড়ে গেল। স্বভাবসুন্দরী যেমন মদ্যপানে আরক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন তেমনি তাঁর অবস্থা দেখে মহাদেবের হৃদয়ের শতমুখী অনুরাগ সহস্রমুখী হয়ে উঠল। উমা কেবল মদের অধীন হয়ে পড়লেন না তিনি সেই মদে স্বামীর কাছেও আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

অবশাঙ্গী উমার মুখসৌন্দর্য, আঘূর্ণিত নেত্র, মুক্তানিভ স্বেদচিহ্ন, ও হৃদয়োন্মাদক মৃদু হাসি দেখে ত্রিলোচন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তিন চোখেই প্রাণভরে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে বিম্বোষ্ঠীর অধর পান করতে লাগলেন।

মদ্যপ্রভাবে উমা যখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এলিয়ে পড়লেন তখন মহাদেব তাঁকে তুলে ধরে মণিময় প্রস্তর বিরচিত রতিমন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেবাদিদেবের ইচ্ছাতেই সেই মন্দির নানারূপ ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। শিথিলতনু উমাকে তুলে নিয়ে যাবার সময় তাঁর নিতম্বের স্বর্ণমেখলা ঝুলছিল এবং তাঁর বিপুল জঘনভারে মহাদেবকে

বেশ একটু বেগ পেতে হচ্ছিল তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে।

তারাপতি চন্দ্র যেমন শরতের মেঘহীন ধবল শয্যায় স্বপ্রিয়া রোহিণীর সঙ্গে শয়ন করেন, তেমনি হাঁসের মত শুভ্র প্রচ্ছদপটে সমাবৃত ও শরতের নির্মল জাহ্নবীপুলিনের মত মনোহর শয্যায় প্রিয়তমা উমাকে নিয়ে মহাদেব শয়ন করলেন।

সেই দেবদম্পতির নর্মক্রীড়াকালে উৎকট হাতে কেশগ্রহণের ফলে চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থিত চন্দ্রের চরম দুর্দশা হলো এবং রতিশাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে নখাঘাতের সীমা পরিসীমা রইল না। দেবীর বসন ছিঁড়ে গেল। দুজনেরই প্রবল বিজিগীষা জাগল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কাউকে বরণ করলেন না। তবু নীলকণ্ঠের রতিতৃপ্তি হলো না।

কিন্তু কোমলাঙ্গী উমার সুকোমলতা স্মরণ করে উমাবল্লভ শঙ্করের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি চক্ষুশায়িতা উমাকে নিয়ে কিছুকাল আনন্দনিমীলিতচক্ষু হয়ে রইলেন। এমন সময় আকাশস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবনত হয়ে আলো বর্ষণ করে দেবদম্পতির সেবা করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে মিলনের সুখরাত্রি প্রভাত হলো। যে কৈশিকরাগে প্রাণে অনুরাগ জন্মায়, নীরক্ষ সময়েও অনুরাগ জাগে, কিন্নরগণ সেই কৈশিকরাগে উমার মদনগীতি আরম্ভ করল। সেই গানে স্বপ্নের আবেশ জাগল। সরোবরে যেমন স্বর্ণকমলরাজি ফুটতে লাগল তেমনি কিন্নরদের কণ্ঠস্বরের সুরমূর্ছনা সমন্বিত স্তবগানে মহাদেব নিদ্রাত্যাগ করলেন।

মানস সরোবর বিহারী সুশীতল প্রভাবের মুক্ত সমীরণ গন্ধমাদন বন আলোড়িত করে প্রবাহিত হতে লাগল। স্ফুটনোন্মুখ কমলদলের সৌরভ গায়ে মেখে সেই সুরভিত বাতাস এসে যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ দেবদেবীর গায়ে লাগল তখন আপনা থেকেই সেই আলিঙ্গন যেন শিথিল হলো। তাঁরা সেই মনোহর প্রভাতসমীরণ সেবন করতে লাগলেন।

প্রভাতের আলো দেখে তাড়াতাড়ি শিথিলবসনা উমা কাপড়ের আঁচল দিয়ে উরুমূলের নখ চিহ্নাদি আবৃত করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু

সেদিকে চোখ পড়ায় মহাদেবও আনন্দভরে প্রিয়ার বসনসংযম নিবারণ করতে লাগলেন।

সারারাত্রি জাগরণে পার্বতীর নেত্রকমল লাল হয়েছিল, অধরের দুর্দশার সীমা ছিল না, ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হয়ে উঠেছিল কেশপাশ, তিলক হয়ে উঠেছিল স্থানচ্যুত। প্রেমের সাগর হর তাঁর প্রিয়তমার এই অবস্থা যতই দেখতে লাগলেন ততই অনুরাগে ভরে গেল তাঁর হৃদয়।

প্রভাতের নির্মল আলোকে দশদিক ভরে গেলেও গাত্রোত্থান বা শয্যাত্যাগ করলেন না উমাপতি। স্খলিত পরিচ্ছদ, ছিন্নমেখলা শোভিত ও চরণের অলক্তরাগে চিত্রিত মনোহর শয্যায় চন্দ্রচূড় পড়েই রইলেন।

এইভাবে হৃদয়ের অপার আনন্দ উপভোগের জন্য প্রিয়তমার মুখমদিরামৃত নিশিদিন পান করতে শঙ্করের অন্তরে এতই অভিলাষ জাগল যে, কোন বিশেষ কাজের জন্য উমার সখী বিজয়া এসে মুহূর্ত-মাত্র দর্শনলাভের বাসনা জানালেও শঙ্কর তা পূরণ করতেন না।

দেখতে দেখতে উমার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে শম্ভুর দীর্ঘ দেড়শত ঋতু অর্থাৎ পঁচিশ বছর কেটে গেলেও তাতে শম্ভুর আনন্দ সুখতৃষ্ণা মিটল না। বরং বারিধিগর্ভনিহিত বাড়বানল যেমন জলসঙ্ঘাতের ফলে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তেমনি শম্ভুর কামানলও ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল।

নবম সর্গ

একদিন রতিক্রিয়াকালে মহাদেব যখন প্রিয়ার মুখকমলের মধুপানে মত্ত ছিলেন তখন দেখলেন, একটি পারাবত রতিমন্দিরে প্রবেশ করছে।

সেই পারাবতটি মহেশ্বরের কান্তার রতিকূজন অনুকরণ করে ঘূর্ণায়মান রক্তনেত্রে কখনো গলদেশ স্ফীত, কখনো বা উন্নত করে মনোরম পুচ্ছদেশ আনমিত করছিল।

তখন তার পক্ষমূলদ্বয় কিছুটা বিশৃংখলভাবে অবস্থিত ছিল।

শঙ্খধবল সেই পারাবত মদভরে সানন্দে মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ প্রেম-জড়িত লোমশপদে বিচরণ করতে লাগল।

রতিদ্বিতীয় মদনের মথিত সুধার হ্রদ হতে নবোত্থিত ফেনপুঞ্জের মত সেই পারাবতকে দেখে চন্দ্রশেখর ক্ষণকালের জন্য আনন্দিত হলেন।

পরক্ষণেই দেবাদিদেব মহাদেব পারাবতের অলৌকিক আকৃতি দেখে সন্দিহান হয়ে তার তথ্য জানার জন্য চিন্তা করে দেখলেন, অগ্নিদেবই এই মায়া বিহঙ্গমূর্তি ধারণ করে এসেছেন। তখন তিনি তাঁর সম্ভোগ নিকেতনে অগ্নির গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে প্রবেশের জন্য ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করে রুদ্রমূর্তি হয়ে উঠলেন।

তা দেখে দেব হুতাশন নিজমূর্তি ধারণ করে ত্রাসে কম্পিত ও স্খলিত অঞ্জলিপুটে স্মরশাসন মহাদেবকে বলতে লাগলেন ঃ

হে প্রভু, আপনি ত্রিজগতের একমাত্র অধীশ্বর। আপনি সর্বদাই স্বর্গবাসী দেবতাদের বিপদ বিনাশ করে থাকেন। এজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যগণ দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে আজ আপনার উপাসনা করছেন।

আপনি প্রিয়ার প্রেমাবেশবশে থেকে নিভৃতে নির্জনে কতকাল অতিবাহিত করলেন। দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ আপনার দর্শন না পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন।

হে সর্বজ্ঞ, আপনার সেবার অবসর প্রতীক্ষা করার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে অনুরোধ করায় আমি সময়োচিত বিহঙ্গরূপ ধারণ করে আপনার অন্বেষণে এখানে এসেছি। কারণ আমি জানি এ সময় প্রেমাবিষ্ট পারাবতরূপে এখানে আসতে বাধা পেতে হবে না।

অতএব হে ভগবান, এই সব কথা বিবেচনা করে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। সকল দেবতাই আপনার শরণার্থী এবং শত্রুদের দ্বারা পরাভূত। তবে বলুন দেখি, কিভাবে কালাতিপাত আর সহ্য হবে?

হে দেব, আপনি প্রসন্ন হয়ে অবিলম্বে একটি পুত্র উৎপাদন করুন। দেবরাজ তাঁকে সেনাপতিপদে বরণ করে স্বর্গলক্ষ্মীর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হবেন এবং আপনার প্রসাদে ত্রিজগৎ পালন করবেন।

শঙ্কর তখন দেব হুতাশনের সেই সঙ্গত প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন

হলেন। বাগ্মীগণ এইভাবে মনোহর স্তুতিবাক্যে প্রভুর ক্রোধ অপনয়ন করে থাকেন।

শঙ্কর তখন তারকারির উৎপাদনের জন্য দেবসেনাপতির উপযুক্ত শৌর্যবীর্যদীপ্ত প্রতাপের কথা মনে করে মনে মনে আপন কর্তব্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে ঊর্ধ্বনেত্রা মহাদেবের সুরতক্রিয়ায় ব্যাঘাত হওয়ায় যুগান্ত-কালাগ্নির মত অসহনীয় রেতঃ স্খলিত হলো। তখন তিনি সেই অমোঘ বীর্য বহ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।

রুদ্রদেবের জ্বলন্ত অনলসদৃশ অমোঘবীর্য নিক্ষেপের ফলে অগ্নির বিশুদ্ধ দেহ সহসা উষ্ণনিঃশ্বাসের বাতাসে দূষিত মুকুরের মত অতিশয় বিবর্ণ হয়ে উঠল।

কিন্তু সুরতক্রিয়ায় রতিতৃপ্তিজনিত আনন্দরসলাভে বাধা পেয়ে ব্যথিত হয়ে ক্রোধভরে অগ্নিকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন উমা, হুতাশন, আজ তুমি অতি বিষম ও গর্হিত কাজ করেছ। তুমি সর্বভক্ষ্য, ধূমগর্ভ ও আমার অভিশাপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হও।

দক্ষের অভিশাপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্রের মত ও হিম দ্বারা নষ্ট পদ্মকোষের মত অগ্নি তখন বিরূপাক্ষের রেতোপাতে বিরূপ দেহ ধারণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

তখন মহেশ্বর সুরতাগারে অগ্নির প্রবেশে ক্রোধে ও লজ্জায় নম্র-বদনা স্ফূর্তিহীনা পার্বতীকে শৃঙ্গাররসপূর্ণ নানা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে লাগলেন।

রতিক্লান্তিতে পার্বতীর ললাটদেশ হতে বিগলিত স্বেদবিন্দুর দ্বারা নয়নাঞ্জন ধৌত হওয়ায় তাঁর অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের চারদিকে যে সব কালিমা জমেছিল, শঙ্কর ভাবাবেশে অবসন্ন ও স্বেদযুক্ত কম্পিত হাতে উত্তরীয়াঞ্চল দিয়ে তা ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিয়ে আবার অকলঙ্ক করে তুললেন সে মুখচন্দ্রকে। তারপর পার্বতীর শ্রম অপনোদনের জন্য ব্যজন করতে লাগলেন।

রতিরঙ্গে পার্বতীর কবরী শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছিল কাঁধের

উপর। তা হতে পুষ্পদাম বিগলিত হয়ে পড়েছিল। চন্দ্রশেখর পারিজাত কুসুমের মালা দিয়ে আবার তা সাজিয়ে বেঁধে দিলেন সে কবরী।

চন্দ্রশেখর সুমুখী উমার দুই গণ্ডে মৃগনাভি দ্বারা সুরতবিষয়ক বিচিত্র পত্রাবলী আবার রচনা করে দিলেন। মনে হলো যেন মদনের মোহপ্রসারী মন্ত্রের অক্ষরমালা লিখিত হয়েছে।

তারপর তাঁর মুখরূপ রথের কর্ণদ্বয়ে চক্রাকৃতি কানবালা সন্নিবেশিত করলেন। মনে হয়, নিশ্চয় মহাদেব বিশ্বরূপী জয়াভিলাষে মদন দ্বিচক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ করলেন।

মহাদেব যখন পার্বতীর কণ্ঠে মুক্তামালা তাঁর স্তনদ্বয়ের উপর লম্বিত করে দিলেন, তার শোভা একমাত্র পাশাপাশি দুটি মেরুশৃঙ্গদ্বয়ের উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী ধারার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠল।

সুরতকালীন উদ্দাম নখক্ষতশোভিত উমার নিতম্বদেশে প্রেমময় হর পুনরায় যে কাঞ্চীদাম বন্ধন করলেন, তা মদনের চঞ্চল চিত্তহরিণের বন্ধনের পাশ বলে মনে হয়েছিল।

নিজের ললাটাগ্নিশিখা দিয়ে অঞ্জন প্রস্তুত করে সেই পদ্মনয়নার ধৌতাঞ্জন নয়নযুগলে আবার নতুন করে অঞ্জন লাগিয়ে দিলেন। পরে নিজের রোমাঞ্চিত নীলবর্ণ কণ্ঠে সেই অঙ্গুলি ঘর্ষণ করলেন।

শঙ্কর এবার কমলাক্ষী উমার চরণকমলের অগ্রভাগ নিজের হাতে অলক্তরঞ্জিত করে হস্তলগ্ন সেই অলক্তরাগ নিজের মস্তকের গঙ্গাসলিলে ধৌত করলেন। মনে হলো যেন সপত্নীগাত্রে প্রিয়ার চরণস্পর্শী হাতের মার্জনা করে তার উপর যথেষ্ট ভালবাসার পরিচয় দিলেন।

প্রেমময় শঙ্কর এবার প্রিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসার আতিশয্য দেখাবার জন্য নিজের দেহলগ্ন ভস্ম দিয়ে একখানি মণিময় দর্পণ মেজে পরিষ্কার করে তাতে পার্বতীকে তাঁর বেশভূষা দেখালেন।

সেই মণিদর্পণে পার্বতী নিজদেহের সম্ভোগচিহ্ন দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তখন হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ যেন রোমাঞ্চচ্ছলে দেহের উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

পার্বতী তাঁর প্রাণভল্লব দ্বারা বিরচিত সাজসজ্জা দর্পণে প্রতিফলিত দেখে ঈষৎ হেসে বড়ই লজ্জিত হলেন এবং সৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন।

এই সময় পার্বতীর প্রিয়বয়স্যা জয়া ও বিজয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করে দেখল, পার্বতী প্রিয়তমের কোলের উপর বসে আছেন। তখন তারা তাদের প্রিয়সখীর চিত্তবিনোদন করতে লাগল।

তখন বাইরে বৈতালিকগণ চিত্রিত চারুবেদীতে মঙ্গলগান গাইতে লাগল। গন্ধর্বগণও পিনাকপানির আমোদ প্রমোদের জন্য শঙ্খধ্বনির সঙ্গে গান গাইতে লাগল।

এমন সময় সেবক নন্দী দ্বারদেশে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে জানাল, দেবগণ তাঁর চরণদর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

তা শুনে ভক্তবৎসল ভগবান শঙ্কর প্রিয়তমার হাত ধরে বিহার-প্রকোষ্ঠ হতে নির্গত হয়ে দেবতাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন একে একে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করে মহেশ্বর ও জগন্মাতা মহেশ্বরীর চরণবন্দনা করলেন।

যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন পেয়ে দেবগণ বিদায় নিয়ে আপন আপন স্থানে চলে গেলেন। শঙ্কর ও পার্বতী বৃষের উপর আরোহণ করে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মন অপেক্ষা দ্রুতগামী সেই বৃষযানে তাঁরা মধ্য আকাশে উপনীত হলে আনন্দে গগনচারী বৈমানিকগণ অঞ্জলিপুটে তাঁদের স্তুতিবন্দনা করতে লাগলেন।

সুরতশ্রমে খিন্ন ক্লিষ্ট উমা-মহেশ্বর মধ্য আকাশে প্রবাহিত পারিজাত সুরভিত শ্রমহারিণী মন্দাকিনীর শান্তস্নিগ্ধ বায়ুসেবনে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলেন।

ক্রমে তাঁরা অভ্রভেদী শিখরমালায় বিরাজিত স্ফটিকগিরি কৈলাসে উপনীত হলেন। ঐ গিরিশৃঙ্গে অর্ধচন্দ্র সতত সমুদিত থাকে। সে অর্ধচন্দ্রের বিভূতির সীমা নেই এবং তা ভোগীদের ভোগে অদ্ভুতভাবে অলঙ্কৃত। তাই তাকে দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর বলে মনে হয়।

এই গিরিশৃঙ্গে সিদ্ধরমণীগণ দর্পণের মত স্বচ্ছ স্ফটিকফলকে প্রতিফলিত আপন আপন প্রতিবিম্ব দূর হতে দর্শন করে অন্য কামিনী এসে অভিমানভরে পাদপ্রণত প্রণয়ীদের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করে না।

সেই স্বচ্ছ স্ফটিকফলকে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়লে স্ফটিকের উজ্জ্বলতায় তিরোহিত হয়ে যায় চন্দ্রকিরণ। তার উপর চাঁদের কলঙ্ক-রেখা বিভিন্ন স্থানে গৌরীর অনুলেপাবশিষ্ট পরিত্যক্ত কস্তুরিকারসের মত প্রতীয়মান হতে থাকে।

হস্তীগণ সেই স্ফটিকফলকের মুকুরতুল্য ভিত্তিতে আপন আপন প্রতিবিম্ব দেখে অন্যহস্তীভ্রমে রোষভরে ভীষণভাবে দন্তাঘাত করতে থাকে আর তার ফলে নিজেরাই ব্যথা পায়।

রাত্রিকালে যখন স্ফটিকফলকের উপর তারকাপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন সিদ্ধ বধূগণ রাত্রিকালে চ্যুত মুক্তাহারভ্রমে তাদের গ্রহণ করতে গিয়ে লজ্জিত হয়।

আকাশচারীদের বিলাসদর্পণস্বরূপ চন্দ্রমা যখন সেই স্ফটিকগিরির শিখরদেশে উদিত হন তখন মনে হয় যেন তা শিবনিবাস কৈলাসের একখানি চূড়ামণি।

দেবগণ কামপীড়িত হয়ে প্রিয়ার সঙ্গে রমণের জন্য প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হলেও সেই স্ফটিকফলকে আপন আপন প্রতিবিম্ব দেখে জন-সঙ্কলভ্রমে বিপন্ন বোধ করতে থাকেন।

এ স্থান এমনই ভোগবিলাসময় স্থান যে দেব চন্দ্রমৌলিও এ স্থানে প্রিয়ার সঙ্গে ইচ্ছামত বহুকাল অবিরত মনোহর প্রেমলীলায় অতিবাহিত করেছিলেন।

বিধানময়ী হিমালয়নন্দিনী দেবাদিদেব মহাদেবের হাত ধরে বেত্রহাতে অগ্রগামী নন্দীর প্রদর্শিত পথে লীলাভঙ্গিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

প্রিয়ার চিত্তবিনোদনের জন্য শঙ্কর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা ভৃঙ্গীকে ইংগিতে নাচবার আদেশ দিলে সেই ভৃঙ্গী তার বিকট দন্ত বিকাশ করে দীর্ঘজটিল শিখা সঞ্চালন করে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল।

ভৃঙ্গীর নৃত্যে প্রীত হবার পর চামুণ্ডাকে নৃত্যের জন্য আদেশ দিলেন মহাদেব। চামুণ্ডা তখন প্রভুর প্রিয়তমা পত্নীর প্রীতির জন্য কণ্ঠলম্বিত লোলনৃমুণ্ডমালা আন্দোলিত করে দংষ্ট্রাকরালমুখে ভীষণ তাণ্ডবনৃত্যে প্রবৃত্ত হলেন।

এই সব ভীষণাকৃতি বিকট নৃত্য দর্শন করে তরুণী উমা ভীতি-বিহ্বলা হয়ে প্রিয়তমের কোলে বসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন গাঢ়ভাবে। প্রিয়তমার এই আশ্লেষলাভই হলো প্রেমময় হরের ভীষণ তাণ্ডবনৃত্যের আদেশদানের উদ্দেশ্য।

এইভাবে শঙ্কর প্রিয়তমার উচ্চ পীনপয়োধরে নিপীড়িত ও সম্ভ্রমালিঙ্গনে আলিঙ্গিত হয়ে তৎক্ষণাৎ পুলকিত ও মদনাবেশে বিভোর হয়ে পড়লেন।

এমনি করে চন্দ্রশেখর পার্বতীর বিচিত্র বিলাসলীলায় প্রীত হয়ে কৈলাস অঞ্চলেই ভক্ত প্রমথদের সঙ্গে পরমানন্দে বাস করতে লাগলেন।

দশম সর্গ

এদিকে বহ্নি মহাদেবের নিক্ষিপ্ত মহাতীব্র রেতঃ শরীরে মেখে দেবসভা মধ্যে সুরগণপরিবৃত দেবরাজের নিকট উপস্থিত হলেন।

দেবেন্দ্র অগ্নিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত সহস্রনয়ন নিক্ষিপ্ত করে দেখলেন, তাঁর অঙ্গ অতিশয় কুৎসিত ও ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

অগ্নির এই অবস্থা দেখে দেবরাজ ক্ষুব্ধ অন্তরে বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্নির উপর সরাসরি মহাদেবের ক্রোধের কারণ কি তা ভেবে পেলেন না।

দেবগণ সকলে লজ্জানম্র মুখে অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজের দ্বারা নির্দিষ্ট আসনে অগ্নি উপবেশন করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুতাশন, তুমি কোথায় কিভাবে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হলে?

দেবরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অগ্নি বলতে লাগলেন—

হে সুরনায়ক, আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশে পারাবতরূপ ধারণ করে ভয়ে কম্পমান হৃদয়ে গৌরীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় আসক্ত স্মরশাসন মহাদেবের নিকট গিয়েছিলাম।

সেই সর্বজ্ঞ দেবাদিদেব আমার কপটতার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রোধভরে জ্বলন্ত ললাট-অগ্নিতে আমাকে আহুতি দেবার মনস্থ করলেন।

তখন আমি অতিশয় নম্রভাবে সঙ্গত সুমধুর ভাষায় তাঁর যে স্তুতিবাদ করলাম তাতে তিনি প্রসন্ন হলেন আমার উপর। স্তবস্তুতি করলে কারই বা মনস্তুষ্টি না হয়?

শরণাগতবৎসল জগৎপিতা শঙ্কর আমাকে সেই দুর্নিবার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নির গ্রাসভয় হতে পরিত্রাণ করলেন এবং গিরিসুতা পার্বতীর নিবিড় আলিঙ্গন পরিত্যাগ করে রতিক্রিয়া হতে বিরত হলেন।

কিন্তু কামকেলি অকস্মাৎ ভঙ্গ হওয়ায় তাঁর দুর্বহ অমোঘ বীর্য স্খলিত হলো। কিন্তু ত্রিজগদ্দাহক সেই অসহ্য বীর্যধারণক্ষম অন্য কোন আধার না পেয়ে উপস্থিত আমার দেহের উপর নিক্ষেপ করলেন।

আমি এখন সেই তাপজনক দুর্বিসহ তেজোদ্বারা দগ্ধ হয়ে নিজের দুর্বহ দেহভার বহন করতে অক্ষম হয়েছি।

হে বাসব, অজস্র ও অতি মহৎ সেই বীর্যদ্বারা আমি এখন অতিশয় দগ্ধ হচ্ছি। আপনি এখন আমার প্রাণরক্ষা করে উপকারসাধন করুন।

অগ্নির এই কাতরোক্তি শ্রবণ করে দেবরাজ মনে মনে উপস্থিত বিপদের শান্তির জন্য চিন্তা করতে লাগলেন।

তারপর অগ্নির তেজোদগ্ধ শরীরে হাত বুলিয়ে দেবরাজ তাঁকে বলতে লাগলেন:

হে হব্যবাহন, স্বাহা, স্বধা ও হন্তকারদ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবগণ, পিতৃগণ ও নরগণ—সকলের তুষ্টিবিধান করে থাক। কারণ তুমিই তাঁদের মুখ।

হোতৃগণ তোমাতে হবনীয় ঘৃতাদি দ্রব্যদ্বারা হোম করেন, এরা পাপ-

পরিশূন্য হয়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ করে থাকেন। অতএব একমাত্র তুমিই স্বর্গলাভের কারণ।

হে হুতাশন, তপস্বীগণ মন্ত্রপূতঃ হবি তোমাতে হোম করে সিদ্ধিলাভ করে থাকেন, অতএব তুমি তপস্যারত প্রভু।

তুমি ঘৃতদ্রব্যাদি আদিত্যমণ্ডলে উপনীত করে থাক। তাতে সূর্য মেঘরূপে পরিণত হয়ে বারিবর্ষণ করে থাকেন। সেই জল হতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং সেই অন্নদ্বারা প্রজাসকল জীবনধারণ করে থাকে। অতএব তুমিই জগতের পিতা।

হে অন্তশ্চর, তাতেই তাদের উৎপত্তি হয়, তুমিই জীবিতস্বরূপ এবং জগতের প্রাণপ্রদ।

একমাত্র তুমিই সমগ্র জগতের উপকারী। তুমি ছাড়া এই সংসারে কার্যসম্পাদনে অন্য কে সমর্থ হয়?

হে অনল, দেববৃন্দের কার্যসম্পাদনে কেবল তুমিই সমর্থ। যারা পরোপকারব্রতে নিরত, তাদের বিপত্তিও মহতী শ্লাঘার বিষয়।

পূর্বে দেবী ভাগীরথী আমাদের ভক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হয়েছেন। তুমি তাঁর সলিলমধ্যে নিমগ্ন হলে তিনি তোমার উৎকট তাপ নির্বাপিত করবেন।

হে হব্যবাহন, তুমি আর বিলম্ব করো না, গঙ্গায় গমন করো। অবশ্যকর্তব্য কার্যে সত্বরতা সিদ্ধির জন্যই অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

সেই দেবী সুরতরঙ্গিনী শম্ভুর জলময়ী মূর্তি। তিনিই নিকট হতে সেই দুর্বহ শম্ভুবীজ নিয়ে ধারণ করবেন।

এই কথা বলে দেবরাজ ইন্দ্র চুপ করলেন। তখন অগ্নি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে বলে সুরতরঙ্গিনীর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তারপর কিছু পথ অতিক্রম করে হিরণ্যরেতা নিঃশেষ ক্লেশনাশিনী স্বর্গগঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন।

সেই সুরনদী স্বর্গারোহণের সোপানশ্রেণীর স্বরূপ। মোক্ষমার্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি মালিন্যরাশি বিনাশকারিণী এবং সংসারদুর্গ হতে পরিত্রাণকারিণী।

তিনি মহেশ জটাজুটবাসিনী, অখিল পাপনাশিনী, সগরবংশের মুক্তিদাত্রী ও ধর্মধারিণী।

তিনি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মালোক হতে নির্গত হয়ে তিনটি স্রোতোধারায় এই ত্রিভুবন পবিত্র করছেন।

অগ্নিকে তাঁর কাছে আগত দেখে তিনি সুপ্রসন্ন হলেন। তারপর উত্তাল ঊর্মিরূপ হস্তদ্বারা কার্যসিদ্ধির জন্য আহ্বান করলেন।

সেই সময় মত্তমদির মরালগণ কলনাদ সহকারে মিলিত হলে মনে হলো তিনি যেন অগ্নিকে বলছেন, আমি তোমার দুঃখনাশ করে কল্যাণ-সাধন করব।

এইভাবে স্বর্গগঙ্গা তটাভিমুখে উত্থিত ঊর্মিমালার সাহায্যে যেন প্রীতিপূর্বক অগ্নিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

তখন তাপার্ত অগ্নি গঙ্গার জলে নিমগ্ন হলেন। বিপদে অভিভূত কেউ কখনো কোন কাজে বিলম্ব করে না।

এইভাবে অগ্নি সেই কল্যাণকারিণী, শ্রমহারী, পুণ্যভারশালী, পরিত্রাণকারী গঙ্গাবারিতে নিমগ্ন হয়ে দুঃসহ তাপ হতে মুক্ত হলেন।

অগ্নি তখন বিপদনাশিনী উত্তালতরঙ্গময়ী গঙ্গাতে তাঁর অন্তর্গত তাপরূপ মহেশ্বরের তেজ সংক্রামিত করলেন।

গঙ্গা সাদরে শম্ভুর সেই তেজ গ্রহণ করলে অগ্নি বিপুল সুখ ও স্বস্তিলাভ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অগ্নিদেব এবার সুধাসারের মত সেই গঙ্গাসলিলে স্নান করে পরম তৃপ্তিলাভ করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

এদিকে আকাশবাহিনী গঙ্গা দেবাদিদেব মহাদেবের দুর্বিসহ মহৎ তেজ ধারণ করে অতিশয় পরিতপ্ত হয়ে উঠলেন।

প্রলয়াগ্নির শত শত শিখাদ্বারা যেন ভয়ঙ্করভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গঙ্গাসলিল। ফলে গঙ্গার মধ্যে যেসব জন্তুরা বাস করত তারা সেই অসহনীয় উত্তাপে কাতর হয়ে নদীর জল থেকে বেরিয়ে এল।

সেই দুর্বিসহ ব্রহ্মতেজ ধারণে সুরধুনীর জল অতিশয় উষ্ণ, ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড ভারযুক্ত হলেও সুরধুনী তা ধারণ করে রইলেন।

মাঘমাসে জগতের চক্ষুস্বরূপ সূর্যের উষ্ণরশ্মি কিছুটা ঊর্ধ্বগামী হলে কৃত্তিকা নামে ছয়টি নক্ষত্র গঙ্গাস্নানের জন্য সুরধুনীতে গমন করলেন।

গঙ্গার গগনস্পর্শী শুভ্রবর্ণ অসংখ্য তরঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গা ঐ তরঙ্গরূপ হস্তসংকেতদ্বারা স্বর্গবাসীদের দর্শন ও আচমনাদি করতে বলছেন।

সুস্নাত মুনিগণ দূর্বাক্ষতসহ পূজার উপযুক্ত যে সব পুষ্প নিবেদন করেছেন তার দ্বারা তীরদেশ সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ব্রহ্মধ্যানে আসক্ত, যোগযুক্ত, বীরাসনস্থ, যোগনিদ্রাগত ব্যক্তিরা গঙ্গার তীরদেশে অবস্থিত রয়েছেন।

ব্রহ্মর্ষিগণ দিব্যনদী স্বর্গগঙ্গাকে দর্শন করে অতিশয় আনন্দিত হলেন। এই অমৃতবাহিনী নদী দর্শনমাত্র কার না আনন্দবিধান করে থাকেন ?

দেবাদিদেব চন্দ্রচূড় যাঁকে মস্তকে বহন করেন, যাঁর দর্শন পুণ্যজনক, কৃত্তিকাগণ আন্তরিক আনন্দসহকারে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হলেন।

তাঁরা বিনম্র হয়ে নির্বাণপদদায়িনী, দেবীস্বরূপিণী, দিব্যরূপিণী, বিষ্ণুপদী গঙ্গাকে বন্দনা করলেন।

বহু সৌভাগ্যবলে যাঁকে নিশ্চিত লাভ করা যায়, যিনি মোক্ষের প্রতিভূস্বরূপা, কৃত্তিকারা সেই সতী স্বর্গগঙ্গাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্তব করতে লাগলেন।

গঙ্গার জল বিমল ও পবিত্র। এই গঙ্গা মুক্তিরূপ নারীর সঙ্গবিষয়ে দূতকর্মে অভিজ্ঞ অর্থাৎ তিনি মোক্ষসংঘটনকারক। সুস্নাতা, তপঃ-পরায়ণা কৃত্তিকারা সেই জলসংস্পর্শে প্রক্ষালিতমন হয়ে স্নান করলেন।

কৃত্তিকাদের ভাগ্যফললাভ নিকটবর্তী হয়েছিল। তাই সুরধুনীতে স্নান করে তাদের আত্মা কৃতার্থপুণ্য হলো এবং তাঁরা আনন্দের সঙ্গে নিজেদের সম্মানিতবোধ করতে লাগলেন।

গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান করার ফলে মহাদেবের সেই অমোঘ রেতঃ ছয়জন কৃত্তিকার দেহের অভ্যন্তরে তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হলো।

তাঁরা সেই দুর্বহ দহনাত্মক রুদ্রতেজ ধারণ করে বিষসমুদ্রে নিমগ্ন হওয়ার মত দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করতে লাগলেন।

তাঁরা সেই দুর্বহ তেজ বহনে আর্ত ও অসমর্থ হয়ে যেন জ্বলন্ত অগ্নি অন্তরে ধারণ করে জল হতে বেরিয়ে এলেন।

গঙ্গার দ্বারা পরিত্যক্ত সেই তীব্র অমোঘ শৈববীর্য তাঁদের উদরমধ্যে সংস্থিত হওয়ায় তাঁরা গর্ভত্ব প্রাপ্ত হলেন।

সম্যক জ্ঞানবতী কৃত্তিকারা সেই তেজ গর্ভে পরিণত হয়েছে জেনে ও তা বহনে অসমর্থ হয়ে স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

এরপর সেই ছয়জন কৃত্তিকা ভয় ও লজ্জার সঙ্গে শরবনে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করলেন।

তাঁরা সেই শরবনে চন্দ্রকলার মত সুকোমল সেই গর্ভ পরিত্যাগ করে ক্ষণকালমধ্যে আকাশে নিক্ষেপ করলেন। তখন শত শত সূর্যের প্রতি স্পর্ধাকারী সেই অপরিমেয় তেজ ব্রহ্মার মস্তককে উপহাস করেই যেন ছয়টি মুখ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করল।

একাদশ সর্গ

তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা করলে সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা মূর্তিমতী আবির্ভূত হয়ে সেই নবজাত শিশুটিকে নিজের সুধাপূর্ণ স্তনপান করাতে লাগলেন।

শিশুটি গঙ্গার সুধাধারাপূর্ণ স্তনদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে পান করে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। কৃত্তিকারাও ছয়জনে লালন পালন করতে থাকলে সে শিশু অদ্ভুত এক লোকোত্তর আকৃতি ধারণ করলেন।

তখন সুরধুনী ভাগীরথী, অগ্নি ও ষট্‌কৃত্তিকারা সকলেই সেই শিশুকে দর্শন করে আনন্দিত হলেন। এই আনন্দের আবেগে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল তাঁদের চোখ। তখন তাঁদের মধ্যে কে এই দিব্যকুমারকে লাভ করবেন তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলো।

এই অবসরে শঙ্কর পার্বতীর সঙ্গে স্বেচ্ছাবিহার করার মানসে মনের থেকেও বেগবান বিমানে আরোহণ করে আকাশপথে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন।

হরপার্বতী তখন ছয়দিন বয়সের সেই ষড়ানন কুমারকে দর্শন করে প্রভূত আনন্দ লাভ করলেন। সেই দিব্য কুমারকে দর্শন করে স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব জেগে উঠল অন্তরে। নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল।

দেবী গৌরী এবার চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিব্যাকৃতি ঐ শিশুটি কে? এটি কোন্ ধন্যতম পুরুষের সন্তান এবং ভাগ্যবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা কোন্ নারীই বা তার মাতা?

এই স্বর্গগঙ্গা, এই অগ্নি ও এই ষট্‌কৃত্তিকারা সকলেই 'এ আমার পুত্র, তোমার নয়' বলে, নির্লজ্জভাবে কেন কলহ করছেন?

হে ঈশ, ত্রিভুবনের শিরোরত্নভূত এই শিশুটি এঁদের মধ্যে কার? অথবা দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, উরগ ও রাক্ষস—এই সবদের মধ্যে এ শিশু কার সন্তান তা আপনি বলুন আমাকে।

কৌতূহলপরায়ণা প্রেয়সীর কথা শুনে চন্দ্রচূড় ঈষৎ হাসি হেসে নিবিড় আনন্দের সঙ্গে প্রিয়ার সুখবিধানের জন্য বলতে লাগলেন:

হে কল্যাণী বীরজননী, এই ত্রিলোকনন্দন তোমারই পুত্র। দেবগণের কল্যাণকর এই পুত্ররূপ সৃষ্টি তোমার ছাড়া আর কার হতে পারে?

হে দেবী, তুমিই জগতের মঙ্গলকারণ এই শিশুর সৃষ্টির বিধান। রত্নাকরেই রত্নের উৎপত্তি হয়, তুমিই একথার সামার্থ্য বিচার করে দেখ।

আমি অগ্নিতে যে অমোঘ বীর্য নিহিত করেছিলাম, অগ্নির দ্বারা তা আবার সুরধুনীতে সংক্রামিত হয়েছিল। পরে ষট্‌কৃত্তিকা সুরধুনী গঙ্গাতে অবগাহন করলে বীর্য তাদের উপরে প্রবেশ করে গর্ভভাব প্রাপ্ত হয়। তারপর তারা শরবনে সে গর্ভ নিক্ষেপ করে। পরে সেই গর্ভ হতে চরাচর বিশ্বজগতের মহোৎসবস্বরূপ এই অভূতপূর্ব সন্তান উৎপন্ন হয়েছে।

হে নগরাজনন্দিনী, অখিল বিশ্বের প্রিয়দর্শন এই পুত্রদ্বারা তুমি সুপুত্রবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা হয়েছ। অতএব আর বিলম্ব করো না।

তোমার নিজের পুত্রকে আপন ক্রোড়ে স্থাপন করো।

চন্দ্রমৌলি মহাদেব এই কথা বললে সমস্ত চরাচর জগতের পালয়িত্রী শৈলরাজদুহিতা পার্বতী প্রফুল্লিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান হতে অবতরণ করলেন। তখন দেববৃন্দ তাড়াতাড়ি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করে তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন। পার্বতীও সেই শিশুকে গ্রহণ করতে উৎকণ্ঠিতমনা হলেন।

সুরধুনী গঙ্গা, দেব হুতাশন ও ষট্‌কৃত্তিকারা কৃতাঞ্জলি হয়ে পার্বতীকে প্রণাম করলেও তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে উৎকণ্ঠিতা পার্বতী কুমারকে কোলে নিলেন। কারণ পুত্রজন্মোৎসবে কোন রমণী আনন্দে মত্ত না হয়ে পারে না।

সেই শিশু তাঁর সম্মুখে থাকলেও পার্বতী আনন্দজনিত অশ্রুভারে আকুললোচনা হয়ে তাঁকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু হস্তযুগল দিয়ে স্পর্শ করে এক অপূর্ব সুখানুভূতি লাভ করলেন।

পার্বতী যখন বিস্ময় ও হর্ষে উৎফুল্ল হলেন, আনন্দাশ্রুর ধারা ঝরে পড়তে লাগল তাঁর নয়নদ্বয় হতে এবং বাৎসল্যরস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো তখন শিশুটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো।

তিনি সেই শিশুকে ক্ষণকাল দর্শন করেই নিমেষশূন্য সহস্র নয়ন পেতে ইচ্ছা করলেন, কারণ পুত্রদর্শনরূপ মঙ্গলকার্যে প্রতিক্ষণ দেখেও কারো চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না।

যে কোমল করযুগল প্রণত দেবতা ও অসুরদের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে পার্বতী সেই করযুগল দ্বারা নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের মত পরমসুন্দর সেই নবজাত কুমারকে নিজ কোলে গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবদনা পার্বতী সুধার আধারস্বরূপ আপন পুত্রকে কোলে নিয়ে পুত্রবতী রমণীদের অগ্রপূজ্যা হলেন।

স্বাভাবিক বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত ও নিবিড়তম আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়ে জগন্মাতা পার্বতী সামনে এগিয়ে গিয়ে কুমারকে কোলে নিলে তাঁর স্তন হতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হতে লাগল।

সুরধুনী ও ষটকৃত্তিকারা কামনাযুক্ত লোচনে সেই ষড়ানন কুমারকে

বারবার দেখতে থাকলেও সেই কুমার অখিল লোকমাতা পার্বতীর স্তন্য-পান করতে লাগলেন।

চন্দ্রশেখরের পত্নী পার্বতী আনন্দাশ্রুপূর্ণ একটি মুখদ্বারা সেই কুমারের একটি মৃণালের উপরিস্থিত ছয়টি পদ্মের মত শোভমান ছয়টি মুখ ক্রমে ক্রমে চুম্বন করতে লাগলেন।

হেমগিরির হেমলতা হেমফল, স্বর্গনদী সুরধুনী, পদ্ম এবং পূর্ব-দিক নবোদিত চন্দ্রকে ধারণ করে যেমন শোভা পান, পার্বতীও তেমনি কুমারকে কোলে নিয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

চন্দ্রশেখর প্রীতমনে হাত বাড়িয়ে ধরলে কুমারকে কোলে নিয়ে গগনস্পর্শী বিমানে আরোহণ করলেন।

মহেশ্বরও আনন্দভরে রোমাঞ্চিত হয়ে সুকুমার আত্মজের প্রতি বাৎসল্য ভাবের বশবর্তী হয়ে হিমালয়নন্দিনীর কোল হতে কুমারকে গ্রহণ করলেন। আবার পার্বতীও স্বামীর অঙ্ক হতে কুমারকে নিজ অঙ্কে গ্রহণ করলেন।

পরে শৈলসুতা প্রীতিসুধার একমাত্র পাত্র সেই পবিত্র পুত্রকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তখন চন্দ্রশেখর বেগবান বিমানযোগে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

এর পর মহাদেব স্ফটিকশৈলশিখরস্থিত মনোহর নিজধামে অধিষ্ঠিত হয়ে বহু প্রমথ প্রভৃতি অনুচরবর্গসহ পুত্রের জন্মোৎসব করার জন্য আদেশ দান করলেন।

তখন মহাদেবের নৃত্যগীতনিপুণ প্রমথগণ বিপুল আনন্দে গিরিরাজ-কন্যার পুত্রের জন্ম মহোৎসব করতে আরম্ভ করল।

প্রমথগণ স্ফটিকনির্মিত আলয়গুলিতে বহু স্বর্ণময় তোরণ নির্মাণ করল। তাদের উজ্জ্বলতায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল আকাশমণ্ডল। সন্তানক কুসুমের মালা দিয়ে শোভিত হলো সেই সব তোরণ।

এর পর দেবতাগণ বিভিন্ন বাদ্য বাজিয়ে সকল দিক নিনাদিত করে তুলল। মনে হলো সেই উৎসবের কথা সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করার জন্যই এত সব বাজনা বাজছে।

সেই মহোৎসব দর্শন করার জন্য গন্ধর্ব ও বিদ্যাধররমণীগণ পাবর্তীর গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতীর কাছ থেকে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে মঙ্গলগান করতে শুরু করলেন।

মাতৃকাগণও মঙ্গলজনক উপকরণদ্রব্য হাতে নিয়ে শৈলরাজনন্দিনীর গৃহে উপস্থিত হলেন। তারপর পার্বতীর মস্তকে দূর্বাঘাস দান করে মার মত তাঁকে নিজ নিজ কোলে গ্রহণ করলেন।

অপ্সরাগণও আনন্দ ও কৌতুকরসে নিমগ্ন হলো। অঙ্ক্য, আলিঙ্গ্য ও ঊর্ধ্বক নামক বাদ্যগুলি বাজতে থাকলে বীণায় ভাবরসানুগত স্বর-সংযোগ করে স্বরচিত গান গাইতে গাইতে নৃত্য করতে লাগল।

সেই মহোৎসবকালে সুখকর বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। দিকসকল প্রসন্ন হলো। বহ্নি ধূমশূন্য ও দীপ্তিমান হয়ে উঠল। জলসমূহ নির্মল হলো এবং অন্তরীক্ষ প্রসন্ন ভাব ধারণ করল।

তখন ধনিকগৃহগুলিতে বাদ্যমান দুন্দুভিসকল গম্ভীর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চরবে ধ্বনিত হতে লাগল। আকাশমণ্ডলে দেবতা-দের বিমানসমূহ পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে ভ্রমণ করতে লাগল।

এইভাবে হরপার্বতীর পুত্রজন্মোৎসব আনন্দে উন্মত্ত করে তুলল অখিল বিশ্বকে। কেবলমাত্র তারকাসুরের ঐশ্বর্যলক্ষ্মী কম্পিত হতে লাগলেন।

ক্রমে আনন্দের আদিকারণ কুমার তাঁর বিচিত্র বাল্যলীলার দ্বারা গিরিশ ও গিরিজার চিত্তহরণ করলেন। বালকের ক্রীড়াচপলতা কার না আনন্দবিধান করে থাকে?

উমা ও মহেশ্বর হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁদের এক একটি মুখ দিয়ে পুত্রের অজাতদন্ত মনোহর ছয়টি মুখ গভীরভাবে চুম্বন করতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে।

সেই শিশু কোথাও স্খলিত, কোথাও অস্খলিত, কোথাও কম্পিত, কোথাও অকম্পিত লীলাময় গতির দ্বারা মাতাপিতার আনন্দ বর্ধন করতে লাগলেন।

গৃহের অঙ্গনে খেলা করতে করতে ধূলিধূসর শিশু অকারণ হাস্য-

চ্ছটায় নিজের মুখচন্দ্র পরিব্যাপ্ত করে মুহুর্মুহু অর্থহীন অস্ফুট কথা বলতে বলতে মাতাপিতার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাতে তাঁদের আনন্দ বেড়ে যেত আরও।

সেই বালক কখনো হরবাহন বৃষের শৃঙ্গদুটি ধরে, কখনো পার্বতী-বাহন সিংহকে নির্ভয়ে ধরে, আবার কখনো বা ভৃঙ্গীর শিখাগুচ্ছ টেনে মাতাপিতাকে আনন্দ দান করতে লাগলেন।

মহেশনন্দন সেই কুমার কখনো কখনো পিতার কোলে গিয়ে বাল-স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য বিস্তার করতে করতে নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থিত সর্প-গণের দাঁতগুলি গণনা করতেন।

কখনো বা সেই কুমার শিবের কণ্ঠস্থ নরকপালমালার মুখকোটর-গুলিতে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁতগুলি মুক্তাফল ভেবে গ্রহণ করতে যেতেন।

সেই বালক কখনো হর্ষভরে মহাদেবের মস্তকস্থিত গঙ্গার শীতল জলে নিজের অঙ্গ নিমগ্ন করে রাখতেন। তারপর সেই অঙ্গ খুব শীতল হলে তাঁর হাতদুটি পিতার ললাটলোচনের অগ্নিতে উষ্ণ করে নিতেন।

কখনো বা কুমার কৌতুকবশে জটাজুটধারী শিবের মুকুটস্থিত প্রলম্বিত চন্দ্রকলাটিকে নিজের কণ্ঠ বাঁকিয়ে সশব্দে চুম্বন করতেন।

এইভাবে শিশুর মনোহারী বাল্যলীলাগুলি দেখতে দেখতে হর-পার্বতীর চিত্ত আনন্দরসে সিক্ত হয়ে উঠত। দিনরাত্রি কিভাবে কেটে যেত তা বুঝতে পারতেন না।

এইভাবে নানারকমের মনোরম বাল্যলীলা দেখিয়ে কুমার ছয়দিনেই অনেকখানি বেড়ে উঠে নবযৌবন লাভ করলেন। নিজের বুদ্ধিবলে সকল শাস্ত্র ও বিদ্যাশিক্ষাও লাভ করলেন।

দ্বাদশ সর্গ

অনন্তর দুরাত্মা অসুরকুল দ্বারা উপদ্রুত হয়ে অতিশয় দুঃখিতচিত্তে শচীপতি ইন্দ্র তৃষ্ণার্ত চাতক যেমন জলাশয়ের কাছে জল প্রার্থনা করে তেমনি অন্ধকরিপুর মহাদেবের সান্নিধানে গমন করলেন।

অতিশয় গর্বিত অসুরের ত্রাসে আকাশপথ রুদ্ধ হয়েছিল। তথাপি ইন্দ্র অতিকষ্টে অলক্ষিতভাবে সেই পথ দিয়েই হরপার্বতীর নিকট পবিত্র কৈলাসপর্বতে অবতীর্ণ হলেন।

ইন্দ্র মেঘাত্মক বিমান হতে সারথি মাতলির হাত ধরে অবতীর্ণ হয়ে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জলসন্নিধানে গমনের মত পিনাকপানির আলয়াভিমুখে গমন করতে লাগলেন।

তিনি একাকী হলেও স্ফটিকফলকগুলিতে প্রতিফলিত নিজের বহুতর দেহ দর্শন করতে করতে প্রভুর বাসভবনে উপনীত হলেন।

বিচিত্র মণিখণ্ডদ্বারা বিরচিত শঙ্করের সৌধ-অঙ্গনের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন সুরপতি ইন্দ্র। সেই দ্বারদেশে সুবর্ণ দণ্ডধারী নন্দী দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নন্দী সহসা দেবরাজকে দর্শন করেই তাঁর হেমদণ্ডটি কক্ষে রেখে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন এবং নিজে মহেশ্বরের কাছে গিয়ে দেবরাজের আগমন সংবাদ দিলেন।

জগদীশ্বর শঙ্কর ভ্রূভঙ্গিদ্বারা অনুমতি দান করলে নন্দী নিজে দেবগণসহ দেবরাজকে সঙ্গে করে ত্রিলোচনের শোভন ভবনের অভ্যন্তরে নিয়ে এলেন।

তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র দেখলেন মহাদেব নন্দী, ভৃঙ্গি ও প্রমথাদি অনুচরবর্গের সঙ্গে মণিময় সভাস্থলে বিরাজ করছেন।

মহেশ্বর যে জটাজুট ধারণ করেছিলেন তা সর্পরজ্জুদ্বারা ঊর্ধ্ব-চূড়াকৃতিতে আবদ্ধ ছিল। সর্পদের মাথায় মণির ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত ছিল সেই জটাজুট। গৈরিকাদি ধাতুসমন্বিত অত্যুচ্চ সুমেরুশৃঙ্গের মত তা সুশোভিত ছিল।

তাঁর উৎসঙ্গদেশে অর্থাৎ কোলের উপর পার্বতী বসে ছিলেন। তাঁর জটাজুটের মধ্যে উত্তুঙ্গতরঙ্গসংকুলা গঙ্গাদেবী অবস্থিত থেকে তাঁর নিজের শারদমেঘের মত শুভ্র ফেনপুঞ্জের দ্বারা যেন উপহাস করছিলেন পার্বতীকে।

মহেশ্বরের মস্তকে অধিষ্ঠিত চন্দ্রকলা মস্তকস্থিত সুরধুনীতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সে চন্দ্রকে অসংখ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তুষারশুভ্র কিরণরাজি দ্বারা ঐ চন্দ্র যেন হিমানীপুঞ্জের শোভা ধারণ করেছিল।

মহাদেবের ললাটনেত্রটির ভাস্বর তেজের কাছে চন্দ্রসূর্যও হার মানে। যুগান্তকালে ঐ নেত্র হতেই চিরপ্রোথিত অগ্নি নির্গত হয়ে থাকে। এই অগ্নিই মদনদহনকারী।

শিবের নীলবর্ণ কন্ঠের অপূর্ব কান্তি দেখে মনে হয় যেন গৌরী কৌতুকবশে সেই কণ্ঠে নীল মণিমাণিক্যগ্রথিত এক হার বেঁধে দিয়েছেন।

শিবের দুই কর্ণে সদাই রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বয় শোভমান। চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার শোভা। মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র ও সূর্য তাঁর কর্ণদ্বয় কুণ্ডলস্থলে অবস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করছেন।

প্রলয়কালে কালগ্রাসে নিপতিত দেবতা ও অসুরদের চিতাভস্ম বিলেপনে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠেছে শিবের বর্ণ। মহামাতঙ্গের চর্ম পরিধান করেছেন তিনি। মেঘমণ্ডিত হিমগিরির মত শোভমান হয়ে তিনি বিরাজ করছেন।

দেবাদিদেব মহাদেব হাতের তালুতে ব্রহ্মার কপালপাত্র ধারণ করে আছেন। বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণুর দ্বারাও তিনি সেবিত হন। মানুষের অস্থিখণ্ডসমূহ আভরণরূপে বিরাজ করে তাঁর অঙ্গে। রণান্তসূচক বৃহৎ ত্রিশূল ধারণ করে আছেন।

তাঁর কণ্ঠদেশে পুরাতনী ব্রহ্মকপালমালা বিধৃত। তাঁর মস্তকের চন্দ্রকলা হতে যে অমৃতের স্রোত ক্ষরিত হচ্ছে তাতে নিমজ্জিত হয়ে সেই কপালমালা পুনর্জীবিত হয়ে বেদপাঠে নিরত হয়েছে।

চারদিকে বিস্তৃত বিদ্যুল্লতার দ্বারা যেমন শারদ মেঘখণ্ড শোভা পায়, নবীন কনকলতিকাসদৃশ্য কান্তিমতী গিরিরাজকন্যা গৌরী সবিলাসভঙ্গিতে তাঁর কোলের উপর উপবিষ্ট থাকায় মহেশ্বরও তেমনি শোভা পেতে লাগলেন।

পিনাক নামে যে শরাসন গর্বদৃপ্ত অন্ধকাসুরের প্রাণ সংহার করেছিল, যা মহাশূরদের রমণীগণের বৈধব্যের কারণ হয়েছিল, মহাদেব ছাড়া অন্য কেউ যা ধারণ করতে পারে না এবং যার দ্বারা মহাদেব পূর্বে কামদেবকে অনায়াসে ভস্মীভূত করেছিলেন, সেই পিনাক নায়ক শরাসন মহেশ্বরের হাতে বিধৃত রয়েছে।

তিনি মহার্ঘ মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্র কণকময় শুভ আসনে সমাসীন। তাঁর দুপাশে দুজন প্রমথ দাঁড়িয়ে শুক্লবর্ণ চামর দিয়ে তাঁকে বাতাস করছে।

মহাদেব কুমারের দিকে সানন্দে তাকিয়ে আছেন। ঐ কুমার অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষায় খুবই অনুরক্ত। প্রমথরা বিস্ময় সহকারে তা লক্ষ্য করছে এবং স্ফটিকময় কৈলাস দীপালোক সহকারে সেই কুমারের আরতি করছে।

শচীনাথ ইন্দ্র পার্বতীপতি মহাদেবকে এই অবস্থায় দেখে কিছুক্ষণ বিস্মিত মনে ক্ষুব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বস্তুতঃ তেজসমষ্টির আধারকে দর্শন করলে কোন ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ না হয় ?

দেবরাজ ইন্দ্র বিকশিত কমলকাননের মত সুশোভিত মহেশ্বরকে সহস্রচক্ষুদ্বারা দেখে পুলককণ্টকিত কলেবর হয়ে উঠলেন। তিনি কুসুমরাশিসমাকুল আম্রতরুর মত শোভা ধারণ করলেন।

দেবেন্দ্র সহস্রচক্ষুদ্বারা মহাদেবকে দেখে বিশেষ কৃতার্থম্মন্য হলেন। মহেশ্বরকে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। তিনি একরকম বিরূপতা ধারণ করলেন। তা দেখে মনে হলো পত্নী শচীদেবীর রোষবশে তিনি যেন ঐরকম বিরূপতা ধারণ করেছেন।

তখন মহাদেবের পাশে সংস্থিত অস্ত্রশস্ত্রধারী সুমেরু পর্বতের মত বলীয়ান কুমারকে দর্শন করে দেবরাজ মনে মনে অরাতিবিজয়ের আশা পোষণ করতে লাগলেন।

তারপর নন্দী প্রকোষ্ঠের সামনের দিকে স্বর্ণবেত্রটি রেখে শিবের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে নীলকণ্ঠ, অমরাবতীনাথ দেবেন্দ্র আপনাকে প্রণাম করার অপেক্ষায় সামনে উপস্থিত রয়েছেন। দর্শন দান করে দেবরাজের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তখন ত্রিলোকপূজ্য ত্রিপুরারি মহাদেব প্রীতিসহকারে অমৃতধারা-বর্ষণতুল্য দৃষ্টিদ্বারা দেবগণবন্দ্য সুরপতিকে অনুগৃহীত করলেন।

দেবপুরীর একমাত্র অর্চনীয় ইন্দ্র এবার অবনতমস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পূজনীয় দেবাদিদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করলেন। তখন তাঁর কিরীটের অগ্রভাগ হতে পারিজাতকুসুমরাশি স্খলিত হয়ে মহেশের চরণকমলের উপর পড়ে গেল।

ত্রিদশপতি দেবেন্দ্র সর্বজনপ্রণম্য মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করে কৃতার্থতার পবিত্র পাত্রস্বরূপ হলেন।

তারপর পরমভক্তিপরায়ণ অন্যান্য দেবগণ প্রমথবৃন্দের সামনে মহেশ্বর পাদপীঠের প্রান্তে ভূমিতে মাথা নত করে যথাক্রমে ত্রিপুরারিকে প্রণাম করলেন।

প্রভু মহাদেবের আদেশে প্রমথেরা শুভ কনকাসন আনয়ন করল। দেবরাজ ইন্দ্র মহেশ্বরের পুরোভাগে সেই আসনে উপবেশন করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। বস্তুতঃ প্রভুর প্রসাদ কোন ব্যক্তির প্রীতির কারণ না হয়?

জগদীশ্বর মহাদেব সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যান্য দেবতাদের সম্মানিত করলে তাঁরাও পরম পুলকিত হয়ে প্রভুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে উপবেশন করলেন।

তখন মহাদেব বলাসুরবৈরি ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দকে তারকাসুর দ্বারা পরাজিত, শ্রীহীন, ক্লিষ্টবদন ও করপুটে সংস্থিত দেখে দয়ার্দ্রচিত্তে বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

হে সুরবৃন্দ! তোমরা বীরবর, অস্ত্রধারী, তোমাদের পরাক্রমের সীমা নেই। তবে কেন হিমবিন্দুপাতে ক্লিষ্ট কমলের মত তোমাদের মুখ শ্রীহীন ও হীনভাবাপন্ন হয়েছে?

হে দেববৃন্দ! আপন আপন মহাপুণ্যরাশি সত্ত্বেও তোমরা কি দেবলোক হতে বিতাড়িত হয়েছ? কিন্তু বহুদিন হতে তোমরা চামর ছত্রাদি আধিপত্যসূচক চিহ্নগুলি ধারণ করে আসছ। সেগুলি ত পরিত্যাগ করনি।

হে সুরবৃন্দ! তোমরা সম্মানের যোগ্য ও প্রধান। তবে কেন স্বর্গপুরী ত্যাগ করে মানুষের মত ধরাতলে বিচরণ করছ।

পাপের ফলে মানুষ যেমন চিরকালসঞ্চিত পুণ্য হতে পরিভ্রষ্ট হয়, তেমনি অনন্যসাধারণসিদ্ধ হয়েও তোমরা পরমরমণীয় স্বর্গধাম হতে বহির্গত হয়েছ কেন?

হে সম্মানার্হ সুরবৃন্দ! নিদাঘকালে প্রচণ্ডতাপবশে জলাশয়ের জল যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, তোমাদের অনির্বচনীয় ধৈর্য তেমনি বিনষ্ট হয়েছে কেন?

হে সুরবৃন্দ! ইন্দ্রাদি তোমরা সকলে কাতর হয়ে যুগপৎ এখানে সমাগত হয়েছ। বল দেখি, তোমরা কি ত্রিভুবনবিজয়ী বলিষ্ঠ তারকাসুরের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে এসেছ?

সেই মহাদৈত্যদ্বারা তোমাদের এই পরাভব উপশমিত করতে একমাত্র আমিই কি পারি? বস্তুতঃ দাবাগ্নি কর্তৃক কাননদহনরূপ বিপদ দূর করতে একমাত্র মহামেঘ ভিন্ন আর কে পারে?

মদনদমনকারী মহেশ্বর এই কথা বললে আশ্বস্ত হলেন দেবগণ। তাঁদের মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রুজলে আর্দ্র হলো। তাঁরা তখন অপরূপ শোভা প্রাপ্ত হলেন।

শিবের কথা শেষ হলে উপযুক্ত অবসর দেখে দেবরাজ বলতে লাগলেন। যে কথা উপযুক্ত অবসরে কথিত তা সম্পূর্ণ ফলোদয়ের কারণ হয়ে থাকে।

দেবরাজ বললেন, হে সর্বজ্ঞ, আপনি মোহান্ধকারের অপহারক, আপনার বিনাশ নেই। অলঙ্ঘিতদীপ্তি জ্ঞানপ্রদীপালোকে আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই বিদিত আছেন।

অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, বাহুবলশালী, দুর্ধর্ষ, দেবধ্বংসকারী

তারকাসুর ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করে স্বর্গপুরী হতে আমাদের বিতাড়িত করেছে। আপনি কি তা জানেন না ?

সেই অসুর প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে অমোঘ বররূপ প্রসাদ লাভ করে দোর্দণ্ডপ্রতাপে ও অতুলবিক্রমে ত্রিলোক জয়ের উদ্দেশ্যে আমাকে ও অন্য সব সুরবৃন্দকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে।

পূর্বে আমরা স্তুতিবাদের সঙ্গে ব্রহ্মার আরাধনা করলে তিনি আমাদের বলে দেন, মহেশ্বরের পুত্র দেবসেনাপতির পদ গ্রহণ করে এই তারকাসুরকে সংহার করবেন।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই ত্রিদিববাসী দেবগণ তারকাসুর দ্বারা আমাদের পরাভবরূপ হৃদয়জ্বালা ও তার প্রভুত্ব সহ্য করে আসছেন।

ওষধি যেমন নিদাঘকালে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ক্লিষ্ট ও শুষ্ক হয়ে আষাঢ় মাসের নবীন মেঘের প্রত্যাশা করে থাকে, আমরাও তেমনি এই কুমারের প্রতীক্ষায় আছি। এঁকে আমাদের সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুমতি দান করুন।

আপনার এই কুমার রণাঙ্গনে আমাদের অগ্রভাগে থেকে ত্রিভুবনলক্ষ্মীর হৃদয়মাল্যতুল্য সেই মহা অসুরকে সমূলে উন্মূলিত করে আমাদের সকল দুঃখকষ্ট দূর করবেন।

হে নাথ, আপনার এই পুত্র মহাসংগ্রামে অগ্রবর্তী হয়ে তীক্ষ্ম শরদ্বারা মহা মহা অসুরদের শিরচ্ছেদ করুন। আর সেই সব অসুরদের পতিবিয়োগবিধুরা রমণীরা বিলাপধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করতে থাকুক।

যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পুত্রের দ্বারা তারকাসুর পশুদের উদ্দেশে বলি প্রদত্ত হোক। যুদ্ধে নিহত দৈত্যরা শৃগালাদি পশুদের দ্বারা ভক্ষিত হোক। এই অগ্রবর্তী দেবগণ বন্দিনীভূতা দেবরমণীদের বেনীবন্ধন মোচন করে দেবেন অর্থাৎ যে তারকাসুর তাঁদের বন্দী করেছে তাকে সংহার করে তাঁদের উদ্ধার করবেন।

দেবেন্দ্র এই কথা বললে স্মরারিপু হাদেব তারকাসুরের উপদ্রবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারপর দেবতাদের প্রতি কৃপাবশতঃ আবার বলতে

লাগলেন ঃ

হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, তোমরা আমার কথা শোন। এই মহাদেব তোমাদের অভিলাষ পূরণের জন্য পুত্রসহ সজ্জিত হয়ে আছে।

আমি নিয়তাত্মা বা জিতেন্দ্রিয় হয়েও আগেই গিরিরাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেছি। তার একমাত্র কারণ এই যে তাঁর গর্ভে এক বীরপুত্র উৎপাদন করে শত্রু সংহার করব।

অতএব তোমরা সেই তারকাসুরনিপাতে সমর্থ আমার পুত্রকে তোমাদের সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত করে সেই অরাতিকে সংহার করো। এই ইন্দ্র সুরবৃন্দের সঙ্গে পুনরায় স্বর্গসুখ ভোগ করতে থাকুন।

মহাদেব এই কথা বলে ঘোর সমরোৎসবে সমুৎসুক আত্মজ ষড়াননকে বললেন, তুমি সংগ্রামে সেই সুরশত্রু তারকাসুরের সংহারসাধন করো।

কুমারও আনতমস্তকে শূলপাণি মহাদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিলেন। বস্তুতঃ পিতৃভক্ত সন্তানদের পিতৃ-আদেশ সর্বপ্রকারে পালন করাই পরম ধর্ম।

দেবাদিদেব শূলপানি আত্মজের প্রতি অসুরের সঙ্গে সংগ্রাম করার আদেশ দান করলে পুত্রের বিক্রম স্মরণ করে গিরিরাজনন্দিনী পরম আনন্দ লাভ করলেন। পুত্রের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করলে কোন বীরপ্রসবিনী মাতা পুলকিত হয়ে ওঠেন না?

দেবরাজ ইন্দ্র বীরবর, বিক্রমশালী, অসুররমণীদের নয়নরঞ্জনহারী বৈধব্যসম্পাদক, বিশ্বের ত্রাণকর্তা হরনন্দনকে লাভ করে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হলে কোন ব্যক্তি আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না?

ত্রয়োদশ সর্গ

কুমার এবার যুদ্ধযাত্রাকালোচিত রমণীয় বেশে সজ্জিত ও দেববৃন্দ-দ্বারা অনুগম্যমান হয়ে আনতমস্তকে মহেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণাম করলেন।

তখন 'হে বীর, হে বৎস, তুমি সংগ্রামে ইন্দ্রবৈরীকে সংহার করে দেবরাজের পদ অচলপ্রতিষ্ঠ করো' এই বলে মহাদেব প্রণত কুমারকে আশীর্বাদ করে আনন্দের সঙ্গে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে অভিনন্দন করলেন।

এর পর কুমার আনত দেহে ও আনত মস্তকে মাতৃপদে প্রণাম করলে পার্বতীর স্তন হতে আনন্দভরে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। এইভাবে বীরপ্রবর ষড়াননের অভিষেকপর্ব সম্পন্ন হলো।

পুত্রবৎসলা হিমাচলনন্দিনী পুত্রকে কোলে নিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, অরাতিবিজয় করে বীরপ্রসবিনী আমাকে কৃতার্থ করো।

দৈত্যপতি তারকাসুরের বিপত্তির প্রত্যক্ষ কারণস্বরূপ যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাপরায়ণ সেই কুমার গিরিনন্দিনী ও মহেশ্বরের অনুমতি নিয়ে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করলেন।

ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দও হরপার্বতীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কুমার কার্তিকেয়ের অনুগমন করতে লাগলেন।

দেবগণের আকৃতি দীপ্যমান প্রভায় সতত সমুদ্ভাসিত। তাঁরা যখন কোথাও গমন করেন তখন দিনের বেলাতেও যেন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রমালায় সমাকীর্ণ হয়ে ওঠে।

আকাশপটে চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্র ও গ্রহমণ্ডলের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হয় তেমনি সমধিক কান্তিমান ষড়াননও সুরগণের মধ্যে শোভা পেতে লাগলেন।

শচীপতি ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ হরপার্বতীপুত্রের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রম করে ক্ষণকালমধ্যে নিজধাম স্বর্গলোকে উপনীত হলেন।

বহুদিন পর স্বর্গলোক দৃষ্টিগোচর হলে মহাসুর তারকার ভয়ে দেবগণ তখনি প্রবেশ করতে সাহস পেলেন না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করতে লাগলেন।

তখন দেবগণ ভয়ার্ত অবস্থায় 'তুমি আগে যাও, আমি যাব না' এই সব কথা বলে স্বর্গে প্রবেশ না করে নিজেদের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হলেন।

স্বর্গলোকদর্শনজনিত হর্ষে দেবতাদের মুখে বিশুদ্ধ মৃদুহাস্য ফুটে উঠল, নয়নদ্বয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁরা কুমারের মুখকমলের দিকে শত্রুভীতিজনিত আর্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

বলবীর কার্তিকেয়ের মুখচন্দ্র সবিলাস হাস্যে নিয়ত সমুদ্ভাসিত। তিনি তারকাসুরের আগমন প্রতীক্ষায় অগ্রবর্তী হবার বাসনায় দেবতাদের বলতে লাগলেন ঃ

হে ত্রিদিববাসীগণ, এখন আর তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা সকলে স্বর্গলোকে প্রবেশ করো। তোমরা সেই মহাসুর শত্রুকে প্রত্যক্ষ করেছ আগে, এখন সে এইকালেই আমার নয়নসম্মুখে পতিত হোক।

সেই অসুরের যে বাহুদণ্ড স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণের জন্য চালিত হয়, আবার এই বাণরাশি সেই মুহূর্তেই লীলাচ্ছলে তার সেই বাহুদ্বয়ের রুধির পান করুক।

আমার এই শক্তি সর্বত্র অব্যাহতগতি। এর প্রভাব ও তেজ সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে থাকে। এই অস্ত্র স্বর্গলক্ষ্মীর বিপদ বিনাশ করে সেই সঙ্গে শত্রুর মস্তক গ্রহণ করে তোমাদের আনন্দ বিধান করুক।

অন্ধকাসুরনিধনকারী মহেশ্বরের পুত্র কার্তিকেয় দৈত্যসংহারের জন্য সংগ্রামে উৎসুকচিত্ত হয়ে এই কথা বললে দেবতাদের মুখপদ্ম বিকশিত ও প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। তখন সকলে ষড়াননের অভিনন্দন করতে লাগলেন।

আনন্দাতিশয্যবশতঃ দেবরাজও পুলকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে সহস্র নেত্র বিস্ফারিত হলো। তিনি কার্তিকেয়ের উত্তরীয়ের সঙ্গে নিজের বস্ত্র বিনিময় করলেন। এ দৃশ্য বড়ই রমণীয়।

তখন আদিবৃদ্ধ চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মা হর্ষাতিশয্য হেতু আনন্দাশ্রু পূর্ণ নেত্রে চারটি মুখ দিয়ে ষড়াননের ছয়টি মুখে মনোরমভাবে চুম্বন করলেন।

গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ আনন্দভরে ত্রিপুরারিপুত্র কার্তিকেয়কে 'সাধু সাধু' বলে ধন্যবাদ দিতে লাগল। চারদিকেই 'হে বীর বিজয়ী হও' এই কথা ধ্বনিত হতে লাগল।

নারদপ্রমুখ দেবর্ষিবৃন্দও ভাবী তারকবিজয়ী কুমারকে অভিনন্দন করে তাঁর কনকখচিত উত্তরীয়ের সঙ্গে নিজেদের বল্কল বসন বিনিময় করলেন।

হস্তীগণ যেমন যূথপতি গজরাজের সাহায্যে বনে প্রবেশ করে, তেমনি সুরবৃন্দ অনন্তশক্তিসম্পন্ন অস্ত্রধারী কুমারের সাহায্যে স্বর্গলোকে প্রবেশে উৎসাহী হলেন।

স্বর্গবাসী দেবতারা প্রথমে সুরনদী মন্দাকিনীতে উপস্থিত হলেন। জলকেলিনিরত সুরবালারা সর্বদা অঙ্গরাগ ধৌত করায় ঐ সুরতরঙ্গিনীর জলপ্রবাহ পীতবর্ণ ধারণ করেছে।

ঐ সুরনদী জলকেলিরত দিগ্‌গজদের শুঁড়দণ্ডে আহত অতিভীষণ তরঙ্গরাজি দ্বারা তীরবর্তী বৃক্ষসকলের আলবালগুলি বারবার প্লাবিত করছে।

ক্রীড়ানুরাগিণী সুরবালাগণ কাঞ্চনময় ও মণিমাণিক্যগর্ভ বালুকাদ্বারা উৎকৃষ্ট বেদী নির্মাণ করে নদীর তীরভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন।

নদীর জলে যে সব স্বর্ণপদ্ম ফুটে আছে, সৌরভলুব্ধ মধুকরদের গুঞ্জনে তারা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। স্বর্গহংসদের ক্রীড়ামত্ততায় তারা চঞ্চলভাব ধারণ করেছে। ঐ সব স্বর্ণপদ্ম ও তাদের স্খলিত পরাগরাশিতে পীতবর্ণ হয়ে উঠেছে নদীর জল।

যে সকল সুরবালা কৌতূহলবশে দর্শন করার জন্য সেখানে আগমন করে তীরভূমিতে অবস্থান করেন, নদীতরঙ্গে তাঁদের মূর্তি-প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তীরদেশ দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত করে ঐ নদী তাদের মুহুর্মুহু প্রীতি সম্পাদন করে।

দেবরাজ ইন্দ্র এই সুরনদীকে বহুদিন পর দেখে পরম আনন্দ লাভ করলেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি কার্তিকেয়কে তা দেখাতে লাগলেন।

তখন দেববৃন্দ পুরোভাগে চারদিক বেষ্টন করে দাঁড়ালে কুমার সেই অদৃষ্টপূর্বা সুরনদীকে দেখে বিস্ময়ভরে উৎফুল্লনেত্র হয়ে উঠলেন।

তারপর কুমার সেই নদীর সামনে গিয়ে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করে

দেবগণের স্তবনীয়া সেই সুরধুনীর ভক্তি ও আনন্দসহকারে স্তুতিবাদ করতে লাগলেন।

তখন প্রস্ফুটিত কমলদলকে কম্পিত করে, আলিঙ্গনসহকারে তরঙ্গ-রাজির সঙ্গে মিলিত হয়ে গণ্ডদেশের শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু দূর করে নদীবায়ু ষড়াননের সেবা করতে লাগল।

এর পর মহেশ্বরপুত্র যেতে যেতে দেখলেন দেবেন্দ্রের নন্দন নামে যে ক্রীড়া-উপবন আছে, তা সামনে বিরাজিত। সেই নন্দনকাননের বৃক্ষসকল ভগ্ন, উৎপাটিত ও বহুখণ্ডে খণ্ডীকৃত হয়েছে।

ঐ কানন দেবশত্রু অসুরদের দৌরাত্ম্যে শ্রীহীন হয়েছে, এই কথা বিবেচনা করে কার্তিকেয়ের নয়নদ্বয় ক্রোধভরে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। ভ্রূকুটির উদয় হওয়ায় তাঁর মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠল।

তিনি আরও দেখলেন, যে অমরাবতী অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সারভূত ছিল তার বিলাস-উদ্যান আজ নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। তার বিমানপথ ভ্রমণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং তার অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়েছে।

এইভাবে প্রচণ্ড অরাতির অভিভবে শ্রীহীন ও দীনদশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অমরাবতী। পুত্রকলত্রকহীনা রমণীর মত সে এখন শোচনীয় মূর্তি ধারণ করেছে। তা দেখে অতিশয় করুণা জাগল কার্তিকেয়ের অন্তরে।

এর পর তিনি দুশ্চেষ্টিত দেবশত্রুর উপর জাতক্রোধ ও সংগ্রামে উৎসুক হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী দেখতে দেখতে অকুতোভয়ে প্রবেশ করলেন তার মধ্যে। দেববৃন্দও তাঁর অনুগামী হলেন।

দৈত্যদের গজরাজির দশনাঘাতে সেখানকার স্ফটিক সৌধশ্রেণীর অভ্যন্তরভাগগুলি ক্ষুণ্ণ ও গবাক্ষজাল সর্পদের নির্মোক বা খোলসে আচ্ছন্ন হয়েছে দেখে তিনি বিষণ্নভাব ধারণ করলেন।

সেই রাজধানীর লীলাসরোবরগুলিতে যে সব স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল সেগুলি সমুৎপাটিত ও তার জলরাশি দিগ্‌গজদের মদরসে দূষিত হওয়ায় সুবর্ণময় হংসপঙ্‌ক্তি সেই সব সরোবর পরিত্যাগ করেছে এবং

সেখানকার বৈদূর্যশিলাসমূহও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে নবীন তৃণ জন্মে তাদের আবৃত করে ফেলেছে। রাজধানীর শত্রুকৃত এই দুরবস্থা দেখে কুমার একই সঙ্গে বিষণ্ণ ও লজ্জিত হয়ে উঠলেন।

তারপর দেবরাজ পুরোবর্তী হয়ে কার্তিকেয়কে তাঁর বৈজয়ন্ত নামক অট্টালিকায় নিয়ে গেলেন। সেই অট্টালিকার ভিত্তি কনকময়। তারকাসুরের গজরাজির দশনাঘাতে সে অট্টালিকাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তার রত্নময় গবাক্ষরাজি ঊর্ণনাভের জালে রুদ্ধপ্রায় হয়ে রয়েছে।

এইভাবে দেবরাজ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এবং দেবগণের সঙ্গে কুমার নানাবিধ মণির রশ্মিজালবিচ্ছুরিত সোপানমার্গ অতিক্রম করে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন।

কল্পতরুসমূহ সে অট্টালিকার নৈসর্গিক তোরণ। তার চারদিক পারিজাত ফুলের মাল্যদ্বারা বিমণ্ডিত। নারদপ্রমুখ দেবর্ষিরা তাতে মঙ্গলপাঠে নিরত রয়েছেন। সুরললনাগণ তার অভ্যন্তরে কুমারকে দর্শন করার জন্য প্রবেশ করেছেন। কুমার সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন।

তারপর তিনি দেবদৈত্যকুলের আদিস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপের পাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করে করযোড়ে ছয়টি মস্তক আনত করে প্রণাম করলেন। তারপর ভক্তিসহকারে অবনত হয়ে কশ্যপপত্নী দেবজননী অদিতির বিশ্ববন্দিত পাদদ্বয়ে যথাবিধানে প্রণাম করলেন।

তখন যার বলে কুমার সংগ্রামে ত্রিভুবণবিজয়ী প্রচণ্ডবীর্য তারকাসুরকে জয় করতে পারেন, কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি সেইমত আশীর্বাদ করে তাঁকে সংবর্ধনা করলেন।

কুমারকে দর্শন করার জন্য সেখানে অদিতির অনুগত যে সব শ্রেষ্ঠ দেবতা এসেছিলেন কুমার তাঁদের প্রণাম করলে তাঁরাও আশীর্বাদ দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

তারপর কুমার দেবাধিপতি ইন্দ্রের পত্নী পুলোমনন্দিনী শচীকে প্রণাম করলে তিনিও আশীর্বাদসহকারে তাঁর সংবর্ধনা করলেন।

কশ্যপের অদিতি প্রভৃতি অন্যান্য পত্নীগণ এবং সপ্তমাতৃকারা অতীব

আনন্দসহকারে সমবেত হয়েছিল। কুমার ভক্তিভরে তাঁদের চরণে প্রণত হলে তাঁরাও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

তখন ইন্দ্রপ্রমুখ ত্রিদিববাসীরা মিলিত হয়ে হর্ষভরে কল্লোলিতচিত্ত কুমারকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন।

এরপর অনন্তবিক্রম শিবনন্দন ষড়ানন সমগ্র সুরসেনার সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ও পূর্ণশ্রী প্রাপ্ত হলে দেবমণ্ডলীর অন্তঃকরণে তারকা-সুরজয়ের আশা জাগ্রত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শোকদুঃখ বিসর্জন দিলেন।

চতুর্দশ সর্গ

তখন সমরোৎসুক, জিগীষু অন্ধকারিতনয় ষড়ানন কার্তিকেয় তারকা নামে মহা পরাক্রমশালী সবলে বধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ রণসাজে সজ্জিত হলেন।

শক্তিধারী ধনুর্ধারী কার্তিকেয় মনের থেকেও দ্রুতগামী অপ্রতিহত-গতি, জয়শ্রীপদ ও অতীত দুঃসহ বিজিত্বর নামক মহারথে আরোহণ করলেন।

এক ব্যক্তি তখন ষড়াননের মাথার উপর আতপ নিবারণ কনকছত্র ধারণ করলেন। ঐ ছত্র সুরলক্ষ্মীর বিপদ-নিবারক সুরশত্রুর শ্রীলাবন্দক, অরাতিধ্বংসকারক ও অতীব মনোরম।

তখন কুমারকে শারদীয় চন্দ্ররশ্মির মত শ্বেতবর্ণ, মনোরম চামরশ্রেষ্ঠ দ্বারা বাতাস করা হতে লাগল। কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণেরা সম্মুখভাগে থেকে উচ্চৈস্বরে সেই যুদ্ধকামী কার্তিকেয়ের স্তুতিবাদ করতে লাগলেন।

তখন সুরাধিপতি ইন্দ্র যাত্রাকলোচিত মনোরম পরিচ্ছদ ও গিরিপক্ষ-বিদারণক্ষম বজ্র ধারণ করে স্ফটিকাচলপ্রতিম ঐরাবতে আরোহণ করে ষড়াননের অনুগামী হলেন।

অগ্নিদেব গিরিশৃঙ্গতুল্য সমুচ্চ মদগর্বিত মেষবাহনে আরূঢ় হয়ে

শত্রুদের উপদ্রব হেতু রোষবশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে সুমহৎ আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করে কার্তিকেয়ের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন।

এরপর নীলাচলসদৃশ ভীমমূর্তি শৃঙ্গদ্বারা জলদজাল খণ্ডবিখণ্ড-কারী প্রেতরাজ বৈবস্বতঃ মদোদ্ধত মহিষবাহনে আরোহণ করে হাতে দণ্ডাস্ত্র গ্রহণ করে কুমারের অনুগামী হলেন।

তারপর মহাসুর তারকের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ মহারুষ্ট ভীমমূর্তি নৈঋত প্রেতবাহনে আরূঢ় হয়ে যুদ্ধের জন্য শিবনন্দন ষড়াননের অনুসরণ করলেন।

যুদ্ধোন্মত্ত বরুণ নবোদিত মেঘের মত ভীষণদর্শন সুবৃহৎ মকর-বাহনে উপবিষ্ট হয়ে হাতে দুর্নিবার পাশাস্ত্র ধারণ করে তিপুরারির আত্মজের অনুগামী হলেন।

বায়ুদেবের বাহন মৃগ পূর্বাদি-দিকসমূহস্থ আকাশপট আক্রমণ করতে পারে। তার দুটি উৎকট শৃঙ্গ আছে। সে দুর্নিবার, বিক্রমশালী ও বৃহত্তম। পবনদেব সেই মৃগবাহনে আরোহণ করে সমরক্রীড়ার জন্য ব্যস্তভাবে তখনি ষড়াননের অনুগামী হলেন।

যে গদা অরাতির রক্ত পানকরা পারণা করতে ইচ্ছুক, সেই গদাস্ত্র ধারণ করে কুবের নরবাহনে আরোহণ করে সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন হবার জন্য সমুদ্যত জয়েচ্ছু কুমারের অনুগমন করলেন।

তারপর পিনাকনামক একাদশ রুদ্র মহাভুজঙ্গ দ্বারা জটাজুট বন্ধন করেও জয়াবহ ত্রিশূলাস্ত্র ধারণ করে হিমগিরিতুল্য শ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ বৃষবাহনে আরূঢ় হয়ে সমরোদ্যত ষড়াননের অনুগামী হলেন।

মহা সমরোৎসবে অনুরাগী অপরাপর সুরবৃন্দও সংগ্রামের জন্য সমুদ্যত হয়ে নিজ নিজ মহারণ বাহনে অধিষ্ঠান করে কুমারের অনুগামী হলেন। তখন জ্ঞানী যুদ্ধদলিত হর্ষে তাঁদের বদনকমল অপূর্বশ্রী ধারণ করল।

তারপর শিবনন্দন কুমার সুরবৃন্দের সেই মহতী সেনাবাহিনী নিয়ে সংগ্রামের জন্য যাত্রা করলেন। ঐ দেবসেনাবাহিনী উদ্যত কাঞ্চনময় ধ্বজদণ্ডদ্বারা পরিব্যাপ্ত, প্রস্ফুরিত নানা কৃতি ছত্রদ্বারা সমুদ্ভাসিত, সকল

মেঘসদৃশ রথরাজির শব্দে ভয়াবহ এবং গজরাজদের ঘণ্টানিনাদদ্বারা শ্রবণকর্কশ কোলাহলে পরিপূরিত। ঐ সেনাবাহিনীর হাতে যে সব উজ্জ্বল অস্ত্ররাশি আছে, তার প্রভাদ্বারা দশদিক ও আকাশমার্গ সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দেবসেনারা যখন মহাকোলাহলে চলতে আরম্ভ করল তখন তাদের ঘনসন্নিবিষ্ট ধ্বজপঙক্তি দ্বারা দিগ্বলয়, আকাশমণ্ডল ও ধরাতল নিরুচ্ছ্বাস হয়ে উঠল।

সেই সময় দেববৃন্দের গম্ভীর হুঙ্কার শ্রবণে অসুরদের ঐশ্বর্য-লক্ষ্মী কম্পিত হয়ে উঠলেন। ঐ ধ্বনি দিকচক্রবালে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে আরও গম্ভীর হয়ে আকাশের উদর পর্যন্ত ব্যাপ্ত করল। ঐ ধ্বনি বৈমানিকদের দ্বারা বাদ্যমান পটহশব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও বিস্তার লাভ করল চারদিকে।

তখন আকাশমার্গ সেনাদের চরণোত্থিত ধূলিজালে সমাকীর্ণ হলো। বাদ্যমান পটহধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়াতে মনে হলো যেন ঐ ধ্বনি মল্যমান পর্বতকে তিরস্কৃত করছে। সেই ধ্বনি শুনে অসুরললনাদের গর্ভপাত হয়ে যেত। তাই মনে হলো আকাশমণ্ডল ঐ প্রতিধ্বনিচ্ছলে বারবার শব্দ করছে।

কনকাচল সুমেরু হতে সঞ্জাত ধূলিরাশি ও রথরাজি দ্বারা চূর্ণীকৃত, অশ্বদের ক্ষুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ। গজরাজদের কর্ণচালন দ্বারা বিস্তারিত, পতকাপঙ্ক্তি দ্বারা কম্পিত ও সমীরণ দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্রমে সে ধ্বনি আকাশপথে আরোহণ করল।

কনকময় উপত্যকায় যে সব ধূলি ছিল তা রথযোজিত অশ্বদের ক্ষুরদ্বারা বিদলিত ও শব্দায়মান সমীরণ দ্বারা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে নিরতিশয় দিগ্‌ভ্রান্তি উৎপাদন করতে লাগল।

অসংখ্য স্বর্ণরেণু বায়ুদ্বারা তাড়িত ও দেবসেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বে, নিম্নে, অগ্রদেশ ও পশ্চাৎদেশ সর্বত্র প্রসারিত হয়ে নবোদিত সূর্যের মত শোভা ধারণ করল।

স্বর্গভূমিতে নিজেদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় তা দেখে

গজকুলপতিগণ পাতাল হতে উত্থিত অন্য হস্তী এসে কুপিত হয়ে বারবার তার উপর দশনাঘাত করতে লাগল।

রমণীয় সিন্দুর পরাগরঞ্জিত গজসেনারা মনোরম ভঙ্গিতে যেতে যেতে সামনে কাঞ্চনময় সুমেরুপর্বতে প্রতিবিম্বিত নিজেদের প্রতিকৃতি দেখতে পেল না।

দেবরাজের সেনাবাহিনী এইভাবে সমরসাগরে ঝম্পদান করতে উদ্যত হয়ে কলরবে গুহাদেশ পরিপূরিত ও বিকম্পিত করতে করতে ত্বরিত-গতিতে সুমেরু পর্বত হতে অবতরণ করতে লাগল।

মহাবলিষ্ঠ দেবসেনাসমূহেরও চীৎকার রথরাজির উৎকট ঘর্ঘর শব্দ, ঐরাবতের গলঘণ্টাধ্বনি ও বৃংহিতশব্দ শুনেও সুমেরু পর্বতের গুহাশায়ী নিদ্রিত সিংহগণের নিদ্রা ভাঙ্গল না।

মহারথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে সমধিক পুষ্ট ও ভেরীধ্বনির সঙ্গে মিশে আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেও ঐ সমস্ত সিংহ অটলভাবে থেকে তাদের মৃগরাজ নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করল।

মহতী যুববাহিনীর কলধ্বনি গিরিতটভাগ বিদীর্ণ করল। তা শুনে পর্বতবাসী সিংহরা নিজেদের বিক্রমশীল প্রভুত্বহেতু আরও গর্বিত হয়ে উঠল।

মৃগসমূহ সুরসৈন্যদের চীৎকার শুনে ভয়ে অনেক দূরে পালিয়ে গেল। কিন্তু মৃগরাজেরা দৈন্যভরে গুহা হতে বার হয়ে নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করতে লাগল।

অমরাবতীবাসীগণ সকলে কৌতুকপরায়ণ ও প্রমোদাভিলাষী হয়ে দূর হতে দর্শন করতে থাকলে সেই শোভন দেবসৈন্যগণ সুমেরুর বিস্তৃত প্রান্তভূমির নিকট উপস্থিত হলো।

সেই সময় পীত, কৃষ্ণ, লোহিত ও শুভ্রবর্ণ অমিত পরিমাণে সমুড্ডীন সুমেরু প্রান্তরের গৈরিক ধাতুরেণু দ্বারা আকাশমণ্ডল গন্ধর্বনগরের ভ্রান্তি ধারণ করল অর্থাৎ আকাশপটে বিভিন্ন বর্ণে অনুরঞ্জিত গন্ধর্বনগর আবির্ভূত হয়েছে বলে মনে হতে লাগল।

সৈন্যদের সংঘর্ষনজনিত বিপুল ধ্বনি উঠে কর্ণকুহর বিদীর্ণ করতে

লাগল। সে ধ্বনি মথ্যমান সমুদ্রগর্জন অপেক্ষাও গম্ভীর এবং ঐ মহাশব্দ ভূগর্ভ পূরিত করে প্রভূত পরিমাণে শোনা যেতে লাগল।

ঐরাবত প্রভৃতি গজপতিদের দিগন্ত প্রসারিত গুরুতর বৃংহিত, অশ্বগণের ভীষণ হ্রেষারব এবং রথরাজির গম্ভীর, ভয়াবহ উচ্চনাদে পটহধ্বনি বিলুপ্ত হলো।

দেবসেনাবাহিনী হতে ধূলিজাল উত্থিত হয়ে মুহূর্ত মধ্যে দৈত্যদের অন্তঃপুরবাসিনী ললনাদের কেশপাশ, চক্ষুপল্লব, স্তনমণ্ডল এবং অসুর-যোদ্ধাদের রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দেবসেনামণ্ডলী হতে ধূলিজাল উত্থিত হয়ে আদিত্যমণ্ডল ও আকাশপট আচ্ছন্ন করে ফেললে হংসরা তা দেখে মেঘ ভেবে মানস সরোবরের দিকে যাত্রা করল। ময়ূরেরা আনন্দভরে নাচতে লাগল।

দেবসৈন্যগণের মধ্য হতে ধূলিজাল নবীন মেঘমালার মত আকাশপট আচ্ছন্ন করলে কাঞ্চনময়ী পতাকাসমূহ দীপ্যমান হয়ে বিদ্যুল্লতার মত শোভা পেতে লাগল।

সেই ধূলিজাল দ্বারা আকাশমার্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগ সমাচ্ছন্ন হলে তা দেখে সকলে এই ধূলিজাল ঊর্ধ্ব হতে নিম্নভাগে আসছে অথবা নিম্নভাগ হতে ঊর্ধ্বদেশে উঠছে, তা বুঝতে না পেরে তর্ক করতে লাগল।

সৈন্যদের সূচীভেদ্য নিবিড় পদধূলিরাশির দ্বারা ঊর্ধ্ব, নিম্ন, সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্ব কোন দিকেই জীবগণের নেত্রগতি বা দৃষ্টি প্রসারিত হলো না। অর্থাৎ সকলেরই দৃষ্টি অবরুদ্ধ হলো।

অনবরত নানারকমের বাদ্যবাজনা বাজতে থাকলে তা শুনে দিক্‌হস্তীদের মদজল স্তব্ধ হয়ে গেল। দেবগণের বিমানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রতিধ্বনিত হওয়াতে ঐ বাদ্যধ্বনি আরও পুষ্ট হলো। মনে হলো আকাশই যেন মুহুর্মুহু গর্জন করছে।

সেই মহতী সেনাবাহিনী ভূমিতল সমাকীর্ণ করে ফেলল। সৈন্যসংখ্যা কত তা নির্ণয় করা যায় না। তারপর সেই বাহিনী দেবপুরীতে গমন করল। কিন্তু সেখানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে তা

ভয়ে চকিতভাব ধারণ করল।

উন্মত্ত হস্তীদের বৃংহিতধ্বনি, উন্নত তুরঙ্গদের হ্রেষারব ও গম্যমান মেঘমালার মত রথসমূহের চক্রদর্শনে সমগ্র ধরাতল যেন নিরুদ্ধপ্রাণ ও আকুল হয়ে উঠল।

মহাগজদের উচ্চনাদ, দোদুল্যমান ঘণ্টাগুলির ধ্বনি এবং বীরবৃন্দের রণোন্মত্ত ও অরাতিগণের হর্ষনাশক তুমুল শব্দ পূর্বাদি দিকসমূহ মুখরিত হয়ে উঠল।

অগণিত যে সব হস্তী নদীসমূহে পতিত হলো তাদের মদক্ষরণ রূপ মলিনপ্রবাহে নদীগুলি পূর্ণ হলো। পরে অসংখ্য অশ্বের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি পতিত হওয়াতে সে জল কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। শেষে তার উপর দিয়ে অগণিত রথ চালিত হওয়ায় সেই কর্দম আবার স্থলীভূত হলো অর্থাৎ স্থলত্ব প্রাপ্ত হলো

ধাবমান অশ্বসমূহের ক্ষুর এবং রথ ও গজরাজির পদাঘাতে উচ্চভূমি চূর্ণীকৃত হয়ে উচ্চ ও নিম্নভূমি সমান হয়ে উঠল।

আকাশ ও পূর্বাদি দিকসমূহের মধ্যভাগে প্রতিনাদিত যে শব্দ ভয়াবহ হয়ে উঠল, যে শব্দে গিরিরাজির তটভূমি বিদীর্ণ হলো, সে শব্দে কম্পিত হয়ে উঠল সমুদ্রের জলরাশি। সেই ভেরীধ্বনির দ্বারা সমগ্র ভূতল পরিপূর্ণ হলো।

সমীরণ হিল্লোলে বিকম্পিত, চঞ্চল, নিবিড়ভাবে সকল দিকে সঞ্চারিত, শব্দায়মান কাঞ্চনঘণ্টাসমন্বিত লক্ষ লক্ষ ধ্বজবস্ত্র আকাশ-পটস্থিত ধূলিসমুদ্রে ডুবে গেল।

মদোন্মত হস্তীদের গললম্বিত ভয়াবহ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে বিস্তারিত ও ভীষণ বৃংহিতধ্বনির জন্য সৈন্যদের পটহশব্দ সম্যকরূপে শ্রবণগোচর হলো না।

দিকসমূহকে সৈন্যনিনাদে ভীষণভাবে মুখরিত এবং রজস্বলা ও বিস্রস্তবসনা দেখে দিনপতি সূর্য সারা জগৎব্যাপী অন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

সৈন্যসমূহ বেগভরে প্রথমে আক্রমণ ও পরে আকাশস্থ ধূলিকারাশি

স্পর্শ করে দূষিত করাতে দিগঙ্গনারা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়েই যেন ভেরীনাদের গম্ভীর প্রতিধ্বনিচ্ছলে গর্জন করতে লাগল।

হস্তীগণ প্রবল সমীরণদ্বারা পরিচালিত গিরিরাজির মত শূন্যমার্গে অবগাহন করল। রথরাজি জলভারাবনত মেঘমালার মত ভূতলে অবতরণ করল। এইভাবে সেই সময় এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল।

সেই সুরসেনাবাহিনী মহাবলিষ্ঠ অসুরদের প্রচণ্ড সংহারকালে ভীষণধ্বনিসহকারে আবির্ভূত হয়ে অপার সমুদ্রের মত সব দিকে পূর্ণ-ভাব ধারণ করল। সেই সঙ্গে সেই সুরসেনা গিরিসমূহকে আচ্ছাদিত করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগল।

পঞ্চদশ সর্গ

এইভাবে অন্ধকারিতনয় কুমারকে সেনানী ও অগ্রগামী করে বল-নিসূদন ইন্দ্র দেবসৈন্যগণসহ সংগ্রামে উপস্থিত হলো। অসুরদের কাছে এই হৃদয়কম্পনকারী সংবাদ ঘোষিত হলো।

বিজয়শ্রীমান স্মরারিনন্দন কার্তিকেয় সৈন্যাপত্য গ্রহণ করে জয়শীল সুরসেনাগণসহ সমাগত হয়েছেন শুনে অসুরেরা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বহুক্ষণ অবস্থান করতে লাগল।

তখন অসুরেরা মিলিত হয়ে দৈত্যাধিপতি তারকের নিকট উপস্থিত হয়ে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করে প্রণত হয়ে নিবেদন করল, স্মরনিসূদন মহেশ্বরের পুত্র যুযুৎসু ষড়ানন জম্ভজিৎ দেবেন্দ্রর সঙ্গে সমাগত।

অসুরদের মুখে এই কথা শুনে অসুররাজ তারক বলল, 'আমি ত্রিলোককে কিংকরস্বরূপ করে রেখেছি। বহুবার সংগ্রাম করেও শচীনাথ আমাকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়নি। এখন দেখছি মহেশ্বর-নন্দনের বলে নিঃসংশয়ে আমাকে পরাজিত করবে।' এই কথা বলে তারকাসুর বিকৃতস্বরে হেসে উঠল।

তখন ক্রোধবশে ত্রিজগৎ বিজয়ী তারকাসুরের অধরোষ্ঠ কাঁপতে লাগল। সে দর্পিত বাহুবলোদ্ধত সেনাপতিগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করতে অনুমতি দান করতে লাগল।

আদেশ পাওয়ামাত্র বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ সেই মুহূর্তে চারদিকে মিলিত হয়ে চত্বরদ্বারে প্রধান প্রকোষ্ঠে দাঁড়াল।

দ্বাররক্ষক দৈত্যরাজকে দেখাল অসংখ্য মহাভুজ সেনানী আনতমস্তকে তাঁর সামনে অবস্থান করছে। অনেক সমরসমুদ্র আলোড়িত করে বহু শত্রু নাশ করে তারা সকলে গর্বে উদ্ধত হয়ে আছে।

এবার মহাবল দৈত্যরাজ তারক ভীষণ রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করল। এই রথ বলবিমর্দন দেবেন্দ্রর বীর্যকেও অবসন্ন করে। এই রথের ভয়াবহ শব্দ শুনলে দিক্‌গজদের মদক্ষরণ রুদ্ধ হয়; তারা আর বৃংহিতধ্বনি করতে পারে না। কি পর্বত, কি সমুদ্র, কেউ সে রথের গতিরোধ করতে পারে না।

প্রভুকে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখে অসুরসেনারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত গর্জন করতে করতে তার অনুগামী হলো। তাদের সমুজ্জ্বল পতাকা-রাজি দ্বারা সূর্যকিরণ আচ্ছন্ন হলো। ভূতলগত ধূলিজাল উত্থিত হয়ে দিগন্তদেশ ও আদিত্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলল।

দেববৃন্দের অভিমুখগামী অসুররাজের সেনাবাহিনী হতে যে ধূলিরাশি উত্থিত হলো তা দিক্‌গজদের দশনশাখায় লেগে শুভ্র হয়ে উঠল এবং মদবারিপূর্ণ কুম্ভদেশে পড়ে তা কর্দম হয়ে উঠল।

দৈত্যসেনাদের গিরিগুহাবিদারী উৎকট, গম্ভীর পটহশব্দ দ্বারা মহাসমুদ্র উদ্বেল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং শূন্যবাহিনী জাহ্নবী সহসা স্ফীত হয়ে উঠলেন।

স্বর্গতরঙ্গিনী গঙ্গা দৈত্যরাজের মহাসেনাদের কোলাহলে চঞ্চল পদ্ম-সংযুক্ত শত শত উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারা দেবলোকের গৃহশ্রেণীকে অভিষিক্ত করতে লাগলেন।

এদিকে সংগ্রামে গমনরত দেবশত্রু তারকের পুরোভাগে নানাবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হলো। এই সমস্ত উৎপাত বা অশুভ লক্ষণ-পরম্পরা সকলকে অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে।

তখন অশুভসূচক ঘোরতর শকুনিমালা দৈত্যসেনাদের উপরিভাগে এসে সূর্যকিরণ আবৃত করে শূন্যপথে পরিভ্রমণ করতে লাগল। ঐ সব

শকুনিরা পরিশেষে দৈত্যদের মাংস ভক্ষণ করতে ইচ্ছুক।

সেই সময় সমীরণদেব মুহুর্মুহু সবেগে প্রবাহিত হয়ে অসুরদের ছত্র ভগ্ন ও ধ্বজপতাকা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন। ধরাতল হতে ধূলিজাল উঠে সকলের চক্ষু আকুল করে তুলল। সেই সঙ্গে বিকম্পিত তুরঙ্গ বা অশ্ব ও বৃহৎ রথসকল অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদ্যোমার্জিত অঞ্জনরাশির মত ভীমকলেবর মহাসর্পেরা মুখবিবর বিষানল উদ্গীরণ করতে করতে অসুরদের পুরোভাগে পথ অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করতে লাগল।

তখন দিননাথ সূর্যদেব কুণ্ডলিকৃত মহাভীষণ সর্পের মত গোলাকৃতি রূপ ধারণ করলেন। তা দেখে মনে হলো যেন সূর্যদেব মহাশত্রু তারকাসুরের প্রতি ক্রোধবশে তার সংহার সূচনা করে ঐ বেশ ধারণ করেছেন।

শৃগালগণ তেজোরাশির আধার সূর্যের অভিমুখে মণ্ডলাকারে সমবেত হয়ে শ্রুতিকঠোর শব্দে ধ্বনি করতে লাগল।

তখন দিনের বেলাতেও তারাকুল চপল ও বেগবান হয়ে দৈত্যসেনাদের চারদিকে পতিত হতে লাগল। তা দেখে সকলে ভাবতে লাগল, এই যে উৎপাতপরম্পরা ঘটছে, দেবশত্রু তারকের প্রাণসংহারই তার পরিণামফল।

মেঘ না থাকলেও ঘোররবে প্রজ্জ্বলিত তেজোরাশিদ্বারা অখিল দিক ও আকাশমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হলো এবং অখিল লোকের হৃদয় বিদীর্ণ করে শূন্যদেশ হতে বজ্রাস্ত্র পতিত হতে লাগল।

আকাশমণ্ডল হতে ঘন ঘন রুধিরাস্থিসহ জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি বর্ষিত হতে লাগল। দীপ্যমান পূর্বাদি দিকসকলের মুখ হতে ধূমরাশি উত্থিত হতে লাগল এবং দশদিক গর্দভকণ্ঠের মত ধূসরবর্ণ ধূলিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

বজ্রধ্বনির মত শব্দসহকারে মেঘ প্রাদুর্ভূত হলো। সে মেঘের গর্জনে পর্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়, আকাশমার্গ ও পূর্বাদি দিকরন্ধ্রসমূহ পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কর্ণমূল বিদারিত হয়ে যায়। ঐ ধ্বনি শমনরাজের

গর্জনকেও অভিভূত করে ফেলে।

ঐ সময় ভূমিকম্প হওয়াতে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। গিরিব্রজ বিদীর্ণ হলো। সুরারাতি তারকের সেনামণ্ডলস্থ বৃহৎকায় হস্তী ও অশ্বসকল পতিত হতে আরম্ভ করল। পদাতিকেরা পরস্পর পরস্পরের উপর এসে পড়তে লাগল।

সারমেয়গণ দেবশত্রু তারকাসুরের পুরোভাগে এসে ঊর্ধ্বমুখে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে শ্রুতিকর্কশ করুণনাদে ক্রন্দন করতে করতে প্রস্থান করল।

এইভাবে পরিণামভীষণ কুলক্ষণপরম্পরা বারবার দর্শন করেও দুর্দৈবগ্রস্ত অসুররাজ তারক ক্রোধবশে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যম হতে ক্ষান্ত হলো না।

এই সব কুলক্ষণ দর্শন করে অশুভ আশঙ্কায় সুবিজ্ঞ অমাত্যদের অনেকে যুদ্ধযাত্রা করতে নিষেধ করলেও মহাবলিষ্ঠ তারকাসুর সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গমন করতে লাগল। মোট কথা, গ্রহবিপাকে নীতির দিক থেকে অন্ধ হলে মহতের হিতোপদেশে কোন কাজ হয় না।

দৈত্যরাজের যাত্রাপথে প্রতিকূল বায়ুবেগে তারকাসুরের মস্তকোপরি সুবর্ণছত্র ভূতলে পড়ে গেল। তা দেখে মনে হলো যেন প্রেতরাজের আহার সম্পাদনের জন্য প্রসারিত স্বর্ণপাত্র বিরাজ করছে।

তারকাসুরের মস্তক হতে মুহুর্মুহু মুক্তাফলরাজি স্খলিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে মনে হলো যেন প্রভু তারকের মস্তক পরিণামে কর্তিত হবে বুঝতে পেরেই সুবিজ্ঞ মস্তক শোকবশে মুক্তাফলপাতন-স্থলে অশ্রুরাশি বিসর্জন করে ক্রন্দন করছে।

পরিণামে তারকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা জেনেই যেন শকুনিসমূহ আহারের আশায় ব্যগ্র হয়ে মুহুর্মুহু অসুররাজের মস্তক অভিমুখে পতিত হতে লাগল।

কিঙ্করেরা চারদিক হতে সেই সব শকুনিদের তাড়াবার চেষ্টা করলেও নিবৃত্ত হলো না তারা।

সকলেই দেখতে পেল তারকাসুরের উপরিভাগে এক মহাভুজঙ্গ

রয়েছে। তার বর্ণ সদ্যপতিত অঞ্জনের মত, তার ফণাস্হিত মণির প্রভায় কিরণসমূহ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। সে যখন ফূৎকার করছে, তখন বিষরূপ উল্কানল নির্গত হচ্ছে।

ঐ সময় অসুরপতি তারকের রথের অগ্রদেশে প্রবল আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুন রথের অশ্বদের রোমরাজি, কর্ণচামর, ধনু, বাণ, তূণীর সব কিছুই দগ্ধ করে ফেলল।

এইভাবে বারবার অশুভসূচক উৎপাতরাজি দ্বারা তাড়িত হয়েও যখন গর্বান্ধ তারক নিবৃত্ত হলো না রথযাত্রা হতে, তখন আকাশমার্গ হতে দৈববাণী উচ্চারিত হলো।

হে মদান্ধ, তুমি তোমার বাহুবলের গর্বে দৃপ্ত হয়ে জয়শীল পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে মিলিত মহেশনন্দন ষড়াননের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য গমন করো না।

নৈশ তমোরাশি যেমন সূর্যদেবকে পরাজিত করতে পারে না, তেমনি অসুরগণ ছয়দিনজাত রণাভিমুখ কুমারকে পরাভূত করতে পারবে না। তোমার মত তুচ্ছ ব্যক্তির সঙ্গে কার্তিকেয়ের বিবাদ কি সম্ভব?

যাঁর একটিমাত্র বাণের আঘাতে অভ্রভেদী, শতশৃঙ্গবাণ ও দিক্‌বলয়-দ্বারা চারদিকে পরিবৃত ক্রৌঞ্চগিরি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্যে রন্ধ্র উৎপন্ন হয়েছিল, সেই কুমারের সঙ্গে তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া কি সম্ভব?

যিনি কামারি শিবের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নরপতিদের নিবিড় শোণিতোদক দিয়ে পিতৃতর্পণ করে নিজের রোষাগ্নি নির্বাপিত করেছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলক্ষয়ের কালারিতুল্য সেই ভৃগুরামও যাঁর সঙ্গে সংগ্রামে সমর্থ নন, সেই সারা ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র বীর যড়াননের সঙ্গে যুদ্ধে কেন তুমি সমুদ্যত হচ্ছ?

হে মদমূঢ়, গর্ব বিসর্জন দাও। স্মরণিসূদন শিবতনয়ের শক্তি নামক অস্ত্রের নিকট গমন করো না। এখন জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বীরকুমারের শরণাগত হও, তাহলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করতে সমর্থ হবে।

বলিশ্রেষ্ঠ মহাসুর এই আকাশবাণী শ্রবণ করে ক্রোধবশে গর্বদৃপ্ত হয়ে

ত্রিলোক-কম্পনকারী হয়েও কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে আকাশস্থ দেবগণকে বলতে আরম্ভ করল।

হে গগনচারী সুরশ্রেষ্ঠগণ, কামারিনন্দন ষড়াননের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা কি করছ? আমার বাণাঘাতে তোমাদের অঙ্গক্ষত হওয়াতে যে ব্যথা তোমরা পেয়েছ তা এখনি কি করে ভুলে গেলে?

হে শূন্যচারী সুরবৃন্দ, সারমেয়সকল যেমন কার্তিক মাসে মদমত্ত হয়ে ওঠে, তোমরাও তেমনি মাত্র ছয়দিনবয়স্ক শিশু ষড়াননের বল আশ্রয় করে এ কি প্রলাপোক্তি করতে আরম্ভ করলে? যামিনীর শেষভাগে জম্বুক বা শৃগালেরা যেমন ইচ্ছামত নিরর্থক চীৎকার করে থাকে, তেমনি তোমাদের প্রলাপোক্তিও অর্থহীন।

তোমাদের সঙ্গহেতু গর্ভতপস্বী মহাদেবের এই পুত্রও বিনা অপরাধে বিনষ্ট হবে সন্দেহ নেই। চোরের সঙ্গবশতঃ অচোরও যেমন বিনাশ পায়, তেমনি প্রথমে তোমাদের সংহার সাধন করার পর এই শিশুকেও নিধন করব।

বলিশ্রেষ্ঠ অসুররাজ তারক এই কথা বলে মহাভীষণ কৃপাণ অস্ত্র গ্রহণ করল। তখন সুরবৃন্দ ভয়বিহ্বল হয়ে পরস্পর জানুসংঘর্ষণ করে দূরে পালিয়ে গেলেন।

এরপর রথী তারকাসুর বিকট হাস্য করে সেই ভীষণ কৃপাণাস্ত্র কোষমুক্ত করল এবং তা ধারণ করে সারথিকে বলল, তুমি এখনি দেবেন্দ্রের কাছে আমার রথ নিয়ে চল।

তারপর মহাসুর তারক মন অপেক্ষাও বেগবান সারথিপরিচালিত রথে আরোহণ করে যেতে যেতে ক্রমে সম্মুখবর্তী ভয়ঙ্করাকার সুরসৈন্যসাগরে উপনীত হলেন।

সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ দেবসৈন্য দেখে মহাবীর তারক যুদ্ধামোদে কৌতূহলী হয়ে উঠল। আনন্দভরে তার বাহুদুটিও অতিশয় রোমাঞ্চিত হলো।

তখন দেবেন্দ্রের সেনাবাহিনী রণাঙ্গনে সমরক্রীড়া করার উদ্দেশ্যে অতিশয় আনন্দিত হয়ে মন অপেক্ষা দ্রুতবেগে শত্রুর দিকে ধাবিত হলো।

সংগ্রামেচ্ছু ব্যক্তি কি যুদ্ধে বিলম্ব করতে পারে ?

ঐ সময় তারকের অসুরসৈন্যরূপ অগ্রবর্তী দেবসেনার অভিমুখে ধাবিত হলো। তারা বাহুদণ্ড সমুদ্যত করে প্রতিপক্ষীয়দের নিকট আপন আপন নাম উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল।

দেবশ্রেষ্ঠগণ পুরোভাগে শত্রুসৈন্যদের দেখে অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু অসুরসৈন্যরা কুমারের নিকট অতিশয় তুচ্ছ বলে অনুমিত হলো। তিনি যেন তাঁর চক্ষুর কোন ভাগমাত্রদ্বারা অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের দর্শন করতে লাগলেন।

তখন অন্ধকারিতনয় ষড়ানন প্রচণ্ড সমরজনিত আনন্দলাভের জন্য শত্রুসৈন্যদর্শনে ভয়বিহ্বল যুববৃন্দের প্রতি প্রসাদামৃতপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন।

শক্তিধর কুমারের দৃষ্টিপাতমাত্র যজ্ঞভুক দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সকলেই। তাঁরা মনে মনে স্থির করলেন, আমিই সংগ্রামে শত্রুকে পরাজিত করব, অন্য কেউ নয়। বস্তুতঃ বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সমাগমে কার বলবৃদ্ধি না হয়ে থাকে ?

জয়কামী দেবেন্দ্রসেনা ও দৈত্যসেনা দু পক্ষই তখন নিজ নিজ হাতে অস্ত্র ধারণ করে পরস্পর সংগ্রামের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করল। স্তুতিপাঠকেরা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদের মহাবিক্রমের বিষয় বর্ণনা করে সকলের শ্রুতিগোচর করে তুলল।

ক্রমে সংহারকার্য সম্পাদনের জন্য রণক্ষেত্রে সমাগত অখিল দিক্‌ব্যাপী প্রেতরাজের আতিথ্যভোজী অর্থাৎ দেবাসুর সৈন্যসমূহের শব্দায়মান কোলাহলধ্বনি সমুদ্‌গত হলো। গিরিরাজির তটভূমি বিদারণে সমর্থ সেই কোলাহলের শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের উদর হলো পরিপূরিত।

ষোড়শ সর্গ

এইভাবে দেবাসুরসৈন্যবৃন্দ সমবেত হলে পরস্পর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র-সমূহ দ্বারা উভয় পক্ষের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হলো।

সংগ্রামের জন্য পদাতিকের সামনে পদাতিক, রক্ষীর সামনে রক্ষী,

অশ্বারোহীর সামনে অশ্বারোহী এবং গজারোহীর সামনে গজারোহী সৈন্যরা দাঁড়াল।

তখন কুলপতি স্তুতিপাঠকেরা ঘোরতর যুদ্ধের জন্য ধাবমান যোদ্ধাদের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করল।

স্তুতিপাঠকেরা যোদ্ধাদের বিক্রমের বিষয় কীর্তন করতে শুরু করলে সমরোৎসুক বীরেরা তাঁদের পুরোভাগে ক্ষণকাল বিলম্ব করে তাবপর যুদ্ধে মনোনিবেশ করলেন।

বীরবৃন্দ পরস্পর একত্র হয়ে যুদ্ধজনিত হর্ষে তাঁদের শরীর স্ফীত করলেন। পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁদের দেহ। ক্রমে তাঁদের হাত থেকে কবচসমূহ ছিন্ন হয়ে গেল।

বার্ধক্যের কারণে পলিত জন্মালে মানুষ যেমন পান্ডুবর্ণ ধারণ করে তেমনি খড়্গদ্বারা কবচসমূহ ছিন্ন হলে তাঁর মধ্যকার তুলারাশিদ্বারা আকাশমন্ডল ও দিকসমূহ পান্ডুবর্ণ হয়ে উঠল।

যোদ্ধাদের রক্তে আপ্লুত চারদিকে সূর্যরশ্মিসম প্রচন্ড কিরণে প্রজ্জ্বলিত খড়্গসকল বিদ্যুল্লতার মত মনে হতে লাগল।

যোদ্ধারা যে সব বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল সেই সব বাণ ভীষণ ভুজঙ্গের মত মুখ হতে অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করে আকাশমন্ডল পরিব্যাপ্ত করে ফেলল।

ধনুর্ধারী যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে যে সব বাণ মারতে লাগল সেই সব বাণ তাদের দেহ ভেদ করাতে তাদের রক্ত শূন্যমুখ দিয়ে ধরাগর্ভে প্রবেশ করতে লাগল।

সমরোৎসবে আনন্দিত মহাযোদ্ধাদের শররাজি প্রথমে হস্তীদের শরীর বিদীর্ণ করার পর তাদের পতিত করে নিজেরাও পতিত হলো।

প্রজ্জ্বলিতাগ্র শরসমূহ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে আকাশপথ পরিব্যাপ্ত করলে আকাশবিহারী দেববৃন্দ দূরস্থানে পলায়ন করতে প্রবৃত্ত হলো।

ধনুর্ধরদের শরসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ, প্রপীড়িত ও বিহ্বল হয়ে আকাশমন্ডল যেন শ্যেনপক্ষীর স্বরচ্ছলে কর্কশস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল।

আকর্ণ আকর্ষণসহকারে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দূরে ধাবিত হওয়ায় তাতে অনুমান হলো যেন তারা যুদ্ধাভিলাষী বীরদের রক্তপানের আস্বাদ লাভের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সংগ্রামে বীরবৃন্দ যখন হস্তে তরবারি ধারণ করল, তখন সেই সব তরবারির দীপ্তিচ্ছটা দর্শনে মনে হলো যেন তারা ছটাচ্ছলে শত্রুনিধনে বীরদের সহায় হয়ে হাস্য করছে।

সেই ধূলিনিবিড় অনন্ত সংগ্রামে তরবারিসকল রুধিরলিপ্ত ও বীরগণের হস্তে স্ফুরিত হয়ে বিদ্যুল্লতার সাদৃশ্য ধারণ করল।

সংগ্রামে যুদ্ধার্থীদের প্রাণনাশক অস্ত্রসকল স্ফুরিত হওয়াতে মনে হলো যেন যমরাজের লেলিহান জিহ্বাযন্ত্র বিরাজ করছে।

চক্রযোদ্ধৃগণের চক্রান্তসকল শোভনকান্তি তীক্ষ্ণাংশু সূর্যদেবের কিরণমালার মত সমস্ত রণাঙ্গন পরিভ্রমণ করতে লাগল।

কোন কোন যোদ্ধা সম্মুখে আগত বীরদের ঘোরনাদে ক্ষুব্ধ হয়ে অশ্ব হতে পতিত হলে অনেকে গর্বহেতু অচেতন হয়ে পড়ল।

সংগ্রামানুরক্ত কোন যোদ্ধা বধোদ্যত কোন বীর অভিমুখাগত হলে আনন্দ লাভ করল, কিন্তু শত্রুকৃত প্রহারে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন রণভূমি হতে প্রত্যাবৃত্ত হলো তখন আবার বিষাদে মগ্ন হয়ে উঠল।

সংগ্রামকালে কোন কোন বীর অনেক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করার পর আগে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হলো।

কিছু যোদ্ধা বাহুদণ্ডে রোমাঞ্চ ধারণ করে যুদ্ধের জন্য সম্মুখাগত রণদুর্মদ বীরদের অভিনন্দন করতে লাগল।

রণাঙ্গনে অস্ত্রশস্ত্র প্রহারে গজরাজির কুম্ভদেশ বিদীর্ণ হওয়াতে যে সমস্ত মুক্তাপঙক্তি স্খলিত হলো তা দেখে মনে হলো ঐ সব মুক্তা বীরদের রোপিত কীর্তিবীজের অঙ্কুররূপে শোভা পাচ্ছে।

রণক্ষেত্রে বীরদের হুঙ্কারে ভয় পেয়ে যে সকল হস্তী পলায়ন করতে লাগল, তারা অঙ্কুশাঘাত গ্রাহ্য না করে চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল।

মহাবলিষ্ঠ হস্তীরা রণাঙ্গনে শরদ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হয়ে যোদ্ধাদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে চারদিক পরিভ্রমণ করতে করতে রক্তনদীতে নিমগ্ন হলো।

উঁচু উঁচু বয়সমূহ শোণিতনদীর স্রোতে নিমগ্ন হয়ে পড়লে রক্ষীরা বিপক্ষকে লক্ষ্য করে হুঙ্কারশব্দে বাণসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হলো।

খড়্গদ্বারা অশ্বদের মস্তক ছেদন করলেও মাটির উপর নিপতিত হবার আগেই রথীরা তরবারির আঘাতে শত্রুদের মাটিতে ফেলে দিল।

অস্ত্রদ্বারা যে সকল বীরের মস্তক কাটা গেল, তারা ভূপতিত হয়েও দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করে রোষভরে তীব্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হলো।

অর্ধচন্দ্রাকারে মহা মহা যোদ্ধাদের মস্তক ছেদিত হলে শ্যেনপক্ষীরা তাদের চরণ দিয়ে তাদের মৃতদেহগুলি ধরে ঊর্ধ্বে উড্ডীন হলে তার দ্বারা আকাশতল পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল।

পদাতিক ও অশ্বারোহীরা সম্মুখস্থিত হস্তীদের দন্তের উপর আরোহণ করে ক্রোধভরে গজারোহীদের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হলো।

গজারোহীগণ শত্রুদ্বারা কর্তিত হলে হস্তীসমূহ চারদিক পরিভ্রমণ করাতে মনে হলো যেন প্রলয়কালীন বায়ুবিকম্পিত পর্বতরাজি শোভা পাচ্ছে।

গজরাজি পরস্পর সংগ্রামের জন্য একত্র হলে যোদ্ধারা অস্ত্রদ্বারা মহাবলসহকারে যুদ্ধ করতে করতে পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হলো।

হস্তীসকল ক্রোধভরে পরস্পর সমবেত হলে তাদের দশনাঘাতে যে অগ্নি উৎপন্ন হলো সেই অগ্নিদ্বারা অস্ত্রপ্রহারে গতপ্রাণ বীরবৃন্দ ভস্মীভূত হয়ে পড়ল।

মহাগজবৃন্দ পদাতিক বীরদের আক্রমণ করলে গজারোহীরা অস্ত্রপ্রহারে সম্মুখে আগত হস্তীদের প্রাণসংহার করতে আরম্ভ করল।

মত্ত মাতঙ্গগণ শুণ্ডদণ্ডদ্বারা বীরগণকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে তাদের প্রাণসংহার করল। সেই বীরবৃন্দ স্বর্গগতি প্রাপ্ত হলো। তাদের দেহমাত্র পড়ে রইল ধরাতলে।

বীরবৃন্দ সুতীক্ষ ধার অস্ত্রপ্রহারে হস্তীদের শুণ্ডদণ্ড ছেদন করে ফেললে ঐ সকল শুণ্ডদণ্ড ভূগর্ভে প্রোথিত হলো। কিন্তু তাতেও যোদ্ধারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হলো না।

হস্তীদের শুণ্ডদ্বারা যে সকল পদাতিক প্রাণত্যাগ করে স্বর্গপুরীতে উপনীত হলো, অনুরাগময়ী সুরললনারা বা দিব্যাঙ্গনারা সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের গ্রহণ করল। এইভাবে সংগ্রামে যারা প্রাণবিসর্জন দেয় দিব্যাঙ্গনারা তাদের সাদরে গ্রহণ করে।

গজারোহীরা শরদ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও মূর্ছিত হলেও ধনুর্ধারী ও অশ্বারোহীরা পুনরায় তাদের সঙ্গে সংগ্রাম বাসনায় তাদের চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অবস্থান করতে লাগল।

কোন পদাতিক বীর খড়্গাঘাতে প্রতিপক্ষের মহাক্রুদ্ধ কোন হস্তীর শুণ্ড কর্তন করে তার মুসলাকৃতি দন্তদ্বয় গ্রহণের জন্য তার পৃষ্ঠে আরোহণ করল।

কোন পদাতিক বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে খড়্গাঘাতে প্রতি-পক্ষের হস্তীর দন্তযুগল আমূল উৎপাটিত করে ফেলল। তারপর সে হস্তী মাটিতে পড়ে যেতে না যেতেই সেখান হতে বেরিয়ে এল।

কোন হস্তী বিপক্ষের কোন বীরকে শুণ্ডদণ্ডদ্বারা আক্রমণ করলে সেই বীর খড়্গাঘাতে সে হস্তীর প্রাণসংহার করল, কিন্তু তার নিজের দেহ অক্ষত রয়ে গেল।

একজন অশ্বারোহী বিপক্ষের একজন অশ্বারোহীর বক্ষদেশে প্রাসাস্ত্র নিক্ষেপ করলে সেই আহত যোদ্ধা যখন ভূপতিত হলো তার বক্ষে যে প্রাদাস্ত্র বিদ্ধ হয়েছে তা সে জানতেই পারল না।

একজন বীর যোদ্ধা শত্রুর প্রাসাস্ত্রে জীবন বিসর্জন দিয়েও সে অশ্বপৃষ্ঠে ছয়ভাগে উপবিষ্ট হয়ে হস্তে প্রাসাস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিতের মত ভ্রমণ করতে লাগল।

কোন অশ্বারোহী শস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন করে ধরাশায়ী হলেও তার অশ্ব শৃংখলমুক্ত হয়েও প্রভুকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল না। শোকে অভিভূত হয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

কোন অশ্বারোহী বিপক্ষের দ্বারা সুতীক্ষ্ণ ভগ্নাস্ত্রদ্বারা বিদারিত ও ভূপাতিত হয়েও মূর্ছিত হলো না। সে ক্রোধভরে শত্রুকে সংহার করতে বাসনা করল।

দুজন অশ্বারোহী পরস্পর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও আহত হওয়ায় অশ্বপৃষ্ঠ হতে ধরাতলে পতিত হলো। তারপর ক্রোধভরে বলসহকারে পরস্পরের কেশ আকর্ষণ করে হাতে হাতে সংগ্রাম করতে লাগল।

রথীবৃন্দের দ্বারা রথীগণ নিহত হলে তাদের হস্তধৃত ধনু স্খলিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেল। কিন্তু তারা স্থিরভাবে রথের উপর উপবিষ্ট থাকায় তাদের জীবিতের মত মনে হতে লাগল।

কোন রথী অস্ত্রাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে বিপক্ষের রথী তাকে আর আঘাত করল না। কিন্তু পুনর্বার তার সঙ্গে যুদ্ধ করার লোভ সংবরণ করতে না পেরে তার জ্ঞানসঞ্চারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বরাস্ত্রধারী দুজন রথী পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বর্গধামে প্রস্থান করল। কিন্তু সেখানে গিয়েও একটি অপ্সরাকে লাভ করার জন্য দুজনে আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো।

মনোহরকান্তি দুজন রথী অর্ধচন্দ্রাকারে পরস্পর ছিন্নমস্তক হলে তাদের মস্তকদ্বয় আকাশমার্গে উঠে নাচতে নাচতে ভূতলশায়ী আপন আপন স্কন্ধমূর্তি দর্শন করতে লাগল।

রক্তস্রোতে রণাঙ্গন পিচ্ছিল হয়ে উঠলে এবং তূর্যধ্বনি নিনাদিত হলে প্রেতরথীরা গান করতে আরম্ভ করল। তখন স্কন্ধগুলি দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে নৃত্য করতে লাগল।

এইভাবে দেবদৈত্যদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে সমগ্র রণভূমি জুড়ে রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল। হস্তীসকল সে নদীতে ডুবে গেল। তখন অসুরপতি তারক ক্রোধভরে চক্ষুযুগল লোহিতবর্ণ করে ভয়াবহ ভ্রূকুটিসহ সংগ্রামের জন্য ইন্দ্রপ্রমুখ দিক্‌পালদের অভিমুখে ধাবিত হলো।

সপ্তদশ সর্গ

তারপর ইন্দ্রপ্রমুখ দিকপালগণ দেখলেন, অসুররাজ তারক পুরোভাগে আসছে। সমরলীলাজনিত কৌতূহলবশত সে মহানন্দে পরিপূর্ণ। সে শরসন্ধান করে দিগ্‌বলয় ও আকাশমণ্ডল অন্ধকার করে ফেলেছে। দিকপালগণ তাকে দেখামাত্র গর্বভরে সংগ্রামের জন্য সমবেত হলেন।

মহামেঘ যেমন অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ করে অত্যচ্চ পর্বতরাজিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি অসুররাজ তারক বিকট হাস্য করে শরবর্ষণ দ্বারা মহাবিক্রমশালী দেববৃন্দকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

গরুড় যেমন সর্পকুলকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় দৈত্যপতি তারকের বাণরাশি ইন্দ্র আদি দেবগণের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে ক্ষণকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ছেদ করে ফেলল।

বহ্নি যেমন তৃণপুঞ্জ আবৃত করে তেমনি সুরবৃন্দের শরবাশিতে আবৃত হয়ে তারকাসুর নিজের নামাঙ্কিত ভয়ঙ্কর বাণরাশিদ্বারা আকাশ ও দিকসকল আচ্ছন্ন করে দেবতাদের বাণসমূহ খন্ডন করতে লাগল।

অসুরপতি এবার দৃপ্ত ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে অবজ্ঞার সঙ্গে যে সব শর নিক্ষেপ করল সেই সব শর ভয়াবহ ভুজঙ্গমূর্তি ধারণ করে দেবগণকে নিবিড়ভাবে বন্ধন করে ফেলল। অর্থাৎ নাগপাশে আবদ্ধ হলেন দেবগণ।

এইভাবে দৈত্যরাজের দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে বিমুখ হলেন দিকপালেরা। নিঃশ্বাসবায়ুতে আকুল হয়ে উঠল তাঁদের মুখ-মণ্ডল। তাঁরা এই বিপদ হতে নিস্তারলাভের জন্য শিবনন্দন ষড়াননের নিকট আগমন করলেন।

ষড়ানন কার্তিকেয়ের দৃষ্টিপাতমাত্র নাগপাশবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করলেন দেবগণ। তখন তাঁরা মহাবল কুমারের নিকটে এসে তাঁর স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হলেন।

এরপর তারকাসুর তার সারথিকে বলল, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা আমার দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়েও কিশোর বালক ষড়াননের কটাক্ষপাতে

মুক্তিলাভ করল। সুতরাং এখনি তুমি বাহুবলদৃপ্ত ঐ কুমারের কাছে রথচালনা করে নিয়ে চল আমাকে। আমি আগে তাকে বধ করে পরে ঐ শৃগালাদি পশুদের বলিদান করব।

তখন সারথিদ্বারা পরিচালিত অসুররাজের রথ প্রলয়কালীন মেঘের মত গম্ভীর ধ্বনিতে কার্তিকেয়ের অভিমুখে ধাবিত হলো। বহু শত্রু-সৈন্য সেই রথচক্রে পিষ্ট হলো। তাদের মাংস, অস্থি ও রক্তে অনুলিপ্ত হলো রথচক্র।

প্রলয়কালীন বায়ুচালিত গিরিরাজের মত সেই দৈত্যরথ সৈন্যদের দলিত ও পিষ্ট করতে করতে ভীষণ মূর্তিতে এগিয়ে আসছে দেখে দেবসেনারা ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল।

দিকপালদের সেনাবাহিনীকে বিক্ষুব্ধ ও ষড়াননকে রণক্রীড়াকৌতুক সমুৎসুক দেখে তারকাসুর বিশাল বাহুযুগলে কার্মুকদণ্ড ধারণ করে প্রচণ্ড হয়ে শিবনন্দন ষড়াননের কাছে এসে বলতে লাগল ঃ

রে তাপস, শম্ভুর পুত্র, আমার প্রতি বাহুবল প্রদর্শনের অহঙ্কার ত্যাগ করো। ইন্দ্রের কার্যসম্পাদন হতে নিবৃত্ত হও তুমি। তোমার বাহুদুটি অতিশয় কোমল, গুরুভারবহনে অক্ষম। সুতরাং আমার শস্ত্রপ্রয়োগে কি ফল ?

তুমি গিরীশ ও গৌরীর পুত্র। আমার ভয়াবহ বাণসমূহদ্বারা শমন-ভবনে যাবার উদ্যোগ করছ কেন ? এখন রণস্থল হতে দূরে সরে যাও। এখন নিজের প্রাণ রক্ষা করে জনকজননীর কাছে গিয়ে তাঁদের বরণীয় অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করো।

হে গিরীশনন্দন, তুমি নিজে বিশেষ বিবেচনা করে জম্ভনিসূদন ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ আমাকে ত্যাগ করে প্রস্থান করো অচিরে। ঐ দেবেন্দ্র নিজে অগাধ জলে নিমগ্ন হবার আগেই তোমাকে মগ্ন করে ফেলবে।

তারকাসুরের এই কথা শুনে ত্রিলোচননন্দন কার্তিকেয়ের অধরোষ্ঠ ক্রোধভরে কাঁপতে লাগল। চক্ষুদুটি রক্তকমলের মত লোহিতবর্ণ ধারণ করল। তিনি কার্মুকের দিকে দৃষ্টিপাত করে শক্তিঅস্ত্র স্পর্শ করে আত্মানুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

তিনি বললেন, হে অসুরাধিপতি, তুমি গর্বিতভাবে যে কথা বললে তা তোমার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমি তোমার প্রচণ্ড ও মহতী ভুজবল প্রত্যক্ষ করতে বাসনা করি। অতএব তুমি অস্ত্র ধারণ ও কার্মুকে জ্যা-যোজনা করো।

ত্রিপুরারিতনয় ষড়ানন এই কথা বললে তারকাসুর ক্রোধভরে অধরোষ্ঠ দংশন করতে করতে বলল, তুমি যুদ্ধের জন্য উৎকট বাহুবলে দর্প প্রকাশ করছ। এখন আমার যে সমস্ত বাণ অরাতিগণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে ফেলে তা সহ্য করো।

তখন কার্তিকেয় ক্রোধবশে ভীষণমূর্তি ভুজঙ্গরাজতুল্য প্রচণ্ড শরাসনে জয়সাধন শরসকল যোজনা করলে অসুরপতি তারকও তৎক্ষণাৎ শত্রুপক্ষের দুর্নীরিক্ষ্য ধনুতে বিশাল জ্যা রোপণ করে ভয়াবহ বাণসকল যোজনা করে ফেলল।

দিতিতনয় তারক কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করলে তা রাশি রাশি শর উৎপাদন করল। তা দেখে মনে হলো যেন ঐ সমস্ত শর নিবিড় কিরণদ্বয় দ্বারা শূন্যদেশে চিত্রকর্ম নিষ্পন্ন করে দিগ্‌বধূদের বার্ধক্যহেতু শুভ্রতা উৎপাদনে অভিলাষী হয়েছে। অর্থাৎ তারকনিক্ষিপ্ত শরসমূহের তেজে দশদিক শুভ্রবর্ণ ধারণ করল।

বাণরাশির নিনাদে ভয়চকিত হয়ে উঠল যোদ্ধারা। ইন্দ্রের যাবতীয় সৈন্য অন্ধ হয়ে উঠল সেই শব্দে। দেবশত্রু তারকের শরাসননির্গত দীপ্যমানজ্যোতিসম্পন্ন বহুসংখ্যক বাণদ্বারা স্মরারিনন্দন কার্তিকেয় এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে কেউ তাঁকে দেখতে পেল না।

এরপর স্মরহর মহেশ্বরপুত্র ষড়ানন কার্মুক গাঢ়ভাবে আকর্ষণ করে তাতে জ্যা যোজনা করলে সেই ধনু হতে চারদিকে যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বাণরাশি উৎক্ষিপ্ত হলো তার দ্বারা দেবশত্রু তারকের জয়শীল শরসকল মুহূর্তমধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

আকাশচারীদের কষ্টের হেতুরূপ অসুরপতিকৃত শরবর্ষণ নিবারিত হলে তৎক্ষণাৎ কামারিনন্দন ষড়ানন সূর্যের মত দেদীপ্যমান ও দুর্নিবার্য তেজোরাশির আধারস্বরূপ হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

তখন ষড়ানন রণাঙ্গনে অতিদুঃসহ মহাগম্ভীর তেজ ধারণ করলে মায়াবী বলিষ্ঠ তারকাসুর সঙ্গে সঙ্গে মায়াযুদ্ধের অবতারণা করল।

জয়িষ্ণু দুর্বিনীত তারকাসুর দেখল, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদ্বারাও কুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করা বিফল। তখন সে কুপিত হয়ে নিকট হাস্য করে তাচ্ছিল্যভরে তার ধনুতে বায়ব্যাস্ত্র যোজনা করল।

বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ও গম্ভীর শব্দসহকারে প্রবলবেগে বায়ু বইতে আরম্ভ করল। ধূলিজাল উত্থিত হয়ে আকাশতল ও সকল দিক আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রখররশ্মি ভাস্করদেব আচ্ছাদিত হলে প্রলয়কালীন ভ্রমের মত ভ্রম উৎপন্ন হলো।

দেবসৈন্যদের কুন্দকুসুমের মত সমুজ্জ্বল ছত্ররাজি সেই বায়ুবেগে তাড়িত ও কলহংসরাজির মত সমুড্ডীন হয়ে মেঘের মত আভাসম্পন্ন ধূলিধূসর আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

সেই বায়ুবেগে দেবসৈন্যমণ্ডলীর নবমল্লিকাকুসুমের মত মনোহর-দর্শন পতাকাসমূহ খণ্ড খণ্ড হয়ে শূন্যমার্গে নীত হলো। মনে হলো যেন আকাশতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ খণ্ড খণ্ড বস্ত্রের ছলে সহস্র সহস্র লীলা প্রকাশ করছে।

সেই বায়ুপ্রভাবে সুরসৈন্যমধ্যগত মহা হস্তীরা তাড়িত ও আর্ত হয়ে রণভূমিতে নিপতিত হতে লাগল। তাদের পৃষ্ঠদেশে যে সব আস্তরণ ছিল তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। দেবরাজ কুপিত হয়ে বজ্রাঘাতে পক্ষচ্ছেদ করলে পর্বতের যে অবস্থা হয়, ঐ সমস্ত মহাগজ তখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হলো।

সেই প্রচণ্ড বায়ুবলে অশ্বসকল মুহুর্মুহু বিকম্পিত হতে লাগল। প্রধান প্রধান সারথিরা বিশ্রস্ত হয়ে পড়ল। এইভাবে সুরবাহিনীর রথরাজি চারদিকে রণভূমিতে পড়ে যেতে লাগল।

সেই বায়ুর প্রচণ্ডবেগে পীড়িত হয়ে দেবসৈন্যমধ্যগত অশ্বারোহীগণ অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করতে লাগল। তারা অস্ত্রপ্রহারে আহত না হলেও নিজ নিজ অশ্বসকল ভূপাতিত হওয়াতে নিজেরাও ধরাশায়ী হতে আরম্ভ করল।

দেবগণের যে সকল পদাতিক সৈন্য ছিল তারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীর হলেও সেই বায়ুবেগে তাড়িত হয়ে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। তাদের হাত থেকে অস্ত্রগুলি পড়ে গেল মাটিতে। তারা কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে বায়ুতাড়িত পত্রের মত একান্ত ঘূর্ণ্যমান হয়ে আকাশতল হতে ভূপতিত হতে আরম্ভ করল।

অসুরপতি তারকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্রের ফলে দৈত্যসৈন্যরা এইভাবে প্রপীড়িত হলে তা দেখে শস্ত্রবিশারদ ষড়ানন তখন এক অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তার করলেন। এই প্রভাবই স্বর্গলক্ষ্মীকে দেবলোকে ফিরিয়ে আনার একমাত্র কারণ।

কুমারের প্রভাবে বায়ব্যাস্ত্র হতে মুক্তিলাভ করে আবার স্বাস্হ্য ফিরে পেয়ে দেবরাজের সৈন্যরা পুনর্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। তা দেখে দেবশত্রু তারক ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করল।

বর্ষাকালে মেঘ যেমন নীলবর্ণ ধারণ করে তেমনি অসিতবর্ণ নীলোৎপলরাজির মত গাঢ় ধূমরাশি ঐ অস্ত্র নির্গত হয়ে পূর্বাদি দিকসমূহ তিমিরাবৃত করে ফেলল। দৃষ্টির অগোচর হয়ে পড়ল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। পরে আকাশপ্রান্তে প্রসারিত হলো।

এইভাবে অসিতবর্ণ নিবিড়মলিন ধূমপুঞ্জ দিকচক্রবাল আবৃত করে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলল। মেঘের উদয় হয়েছে, এই ভ্রমে আনন্দিত হয়ে রাজহংসেরা মানস সরোবরে গমন করতে ইচ্ছা করল।

কল্পান্তকালে কালাগ্নি যেমন ভীষণদৃশ্য হয়, তার মত অতুলনীয় সেই অগ্নিবাণ তার শিখামালা দ্বারা সব দিক ও আকাশতল নিবিড় কপিলবর্ণ করে দেবসৈন্যদের মধ্যে চারদিক প্রদীপ্ত করে তুলল।

সেই প্রতিবন্ধবিহীন প্রদীপ্ত বহ্নির অতুলনীয় শিখাসমূহ ও জলদসন্নিভ ধূমপুঞ্জদ্বারা আকাশতল পরিবেষ্টিত হলে মনে হলো যেন সমগ্র আকাশমার্গ বিদ্যুল্লতাতে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে।

তারকানিক্ষিপ্ত অস্ত্র হতে নির্গত সেই অগ্নিদর্শনে ভীত হয়ে সূর্যপ্রভৃতি আকাশচারীরা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন। সেই সুদুঃসহ

অগ্নিদ্বারা দহ্যমান ও অতিশয় আকুল হয়ে সমস্ত সুরসৈন্যেরা মহেশাত্মজ কুমারের কাছে গেলেন।

এইভাবে ঘনীভূত অগ্নিদ্বারা দেবসৈন্যদের অভিভূত ও কাতর দেখে অন্ধকারিতনয় ষড়ানন মৃদু হাস্য করে কার্মুকে বারুণাস্ত্র যোজনা করলেন।

বারুণাস্ত্র সন্ধান করামাত্র প্রলয়কালীন বহ্নির প্রচণ্ড ধূমসদৃশ ঘোরতিমিরপুঞ্জতুল্য মেঘমালা গর্জন করতে করতে গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে আকাশমার্গে প্রাদুর্ভূত হলো।

তার অব্যবহিত পরেই কল্পান্তকালীন চঞ্চল প্রেতরাজের ভীমদর্শন লোলজিহ্বার মত ঘোরাকার বিদ্যুল্লতা আকাশমার্গে ভয়াবহ গর্জন করতে করতে দিগ্বলয়কে কৃষ্ণবর্ণ করে সেই মেঘমালার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হলো। তা দেখে চমকে উঠল সকলে।

কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনীর মত গাঢ় অসিতবর্ণ জলপূর্ণ মেঘমালা ঘোরতর গর্জনসহকারে আকাশে বিরাজিত হলো। তখন সেই মেঘমালার অন্তর্গত বিদ্যুল্লতার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারদিক। তাই কারো দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটল না।

ক্রমে আকাশতল ও সমস্ত দিক আবৃত করে গর্জন করতে করতে সেই মেঘরাজি প্রভূত পরিমাণ ধারাসম্পাতে চারদিকে জলবর্ষণ করতে লাগল।

তখন সেই বারুণাস্ত্র হতে উৎপন্ন মেঘরাজি গাঢ় অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন ও গম্ভীর গর্জননাদে অসুরদের কাতর করে জলবর্ষণ করতে থাকলে তার দ্বারা নির্বাপিত হয়ে গেল সেই বিশ্বব্যাপী বহ্নি।

এদিকে অসুররাজ তারক ক্রুদ্ধ হয়ে আকর্ণ আকর্ষণ করে কার্মুকে ক্ষুরপাস্ত্র যোজনা করে সেই ভয়াবহ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কুমারকে আঘাত করল। তা দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে ইন্দ্রের সৈন্যরা পালাতে লাগল।

যোগাভ্যাসকালে নীরস নিরাসক্ত যোগী যেমন যথানিয়মাদি যোগ-সাধনার প্রভাবে সাংসারিক সকল বিষয়াসক্তিকে ছেদন করেন, সংগ্রাম-

ক্রীড়াযোগী ষড়াননও তেমনি তাঁর শর দ্বারা অসুরদের শর ও শরাসন ছেদন করে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

অসুরাধিপতি তারক তখন রোষানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে ডান হাতে ভয়ঙ্কর তরবারি ধারণ করে রথ ছেড়ে কুমার কার্তিকেয়ের দিকে ধাবমান হলো।

দেবসৈন্যরা যার ভুজবল নিবারণ করতে পারে না সেই দৈত্যরাজ তারককে নিকটে উপস্থিত দেখে শিবতনয় কুমারের মুখপদ্ম হর্ষভরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি তখন প্রলয়কালীন বহ্নিসম শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

তখন কার্তিকেয়ের সেই শক্তি নামক অস্ত্র তার প্রভারাশিদ্বারা আকাশ ও দিক্‌বলয় সমুদ্ভাসিত করে দিকপালদের আনন্দাশ্রু ও অসুরদের শোকাভিতপ্ত অশ্রুর সঙ্গে অসুররাজ তারকের বক্ষপ্রদেশে নিপতিত হলো।

প্রলয়বায়ুর দ্বারা পর্বতশৃঙ্গ যেমন বিদীর্ণ হয় তেমনি শক্তি অস্ত্রের আঘাতে অসুররাজ তারক গতপ্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তা দেখে দেবেন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করলেন। অপরিসীম পুলকে কণ্টকিত হয়ে উঠল তাঁদের শরীর।

প্রলয়কালে পতিত পর্বতরাজের মত তারকাসুর যে স্থানে নিপতিত হলো, সেখানকার ভূমি তার দেহের গুরুভার সহ্য করতে না পেরে পাতালগর্ভে প্রবেশের উপক্রম করল। তখন অনন্তদেব অতিকষ্টে ফণামালাদ্বারা সেই স্থান ধরে রাখলেন।

তখন আকাশ হতে কল্পতরুকুসুমবৃষ্টি বর্ষিত হয়ে অসুরনিসূদন স্মরারিনন্দনের মাথার উপরে পতিত হতে লাগল। সেই কুসুমবৃষ্টি স্বর্গনদী মন্দাকিনীর জলশীকরস্পর্শে সুস্নিগ্ধ ও তার চারদিকে সৌরভলুব্ধ মধুকরেরা আশ্রয় করে আছে।

সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীরে হর্ষজনিত রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়ে বর্ম ভেদ করে তা প্রকাশিত হলো। সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁদের মুখশ্রী। তাঁরা তারকনিসূদন ষড়াননের ভুজবলের অজস্র প্রশংসা

করতে লাগলেন।

এইভাবে স্মরারিনন্দন কার্তিকেয় ত্রিলোকশল্যস্বরূপ অসুরপতি তারককে যুদ্ধে নিহত করলে বলবিমর্দন দেবেন্দ্র স্বর্গধামের আধিপত্য লাভ করে জয়শ্রীসম্পন্ন হলেন। দেববৃন্দ তখন নিজ নিজ চূড়ামণি স্পর্শ করে তাঁর পাদমূলে প্রণাম করতে লাগলেন।

নলোদয়

প্রথম সর্গ

হে হৃদয়, এই সংসারের পাপরূপ অতিগহন ও অতিক্রমের অযোগ্য ভীষণ কান্তারের দাবাগ্নিসদৃশ নানাবিধ বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর উচ্ছেদ করে ত্রিজগতের রক্ষাকর্তা যদুবংশতিলক শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করো না।

যে ভগবান নররূপে গোপী অর্থাৎ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গোপকামিনীগণ সস্পৃহ নয়নে যাঁকে পান করত, হৃদয়ে ধারণ করত, এই জগৎ যাঁর দ্বারা সুরক্ষিত, যিনি কংসের দ্বেষভাজন হয়েছিলেন এবং কালিয় নাগ যাঁকে হিংসা করত সেই যদুনন্দনকে ভুলো না।

যাঁর শত্রুগণ এই সংসারে কখনো কোন মান মর্যাদা প্রভৃতি উন্নতির ভাগী হয় না, যিনি চরণস্পর্শে শকটকে বিচলিত করেছিলেন, যাঁর কাছে মস্তক অবনত করলে সেই অবনত পরম ভাগবত ব্যক্তিকে লোকে মহাপুরুষজ্ঞানে চিরদিন স্মরণ করে থাকে এবং যাঁর কাছে অবনত হলে এই দুঃখকষ্টময় সংসারে আর বারবার যাওয়া আসা করতে হয় না, সেই যদুনন্দনকে ভুলো না।

ভ্রমররাজি যেমন মদস্রাবী মাতঙ্গের নিকট সর্বদা মদবারিরূপ পরম উপাদেয় আহার্য পায় তেমনি সতত ভঙ্গপ্রবণ ও নানা অত্যাচারদলিত

এই জগৎ যাঁর কৃপায় দৈত্যকুলের সংহাররূপ পরম হিতকর কার্য লাভ করেছিল এবং স্তুতিনিন্দায় সমভাবে থেকে মানবকুল যাঁর ধ্যানে সর্ববিধ কল্যাণ লাভ করে থাকে সেই যদুনন্দনকে ভুলো না।

এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর নামটি বড় সুন্দর ছিল—নল। কোথায় কোন নীতির প্রয়োগ দরকার, কিরকম রাজনীতির কি উপকারিতা তা তিনি নিপুণভাবেই জানতেন। কোন বিপর্যয় বা অত্যাচার উপদ্রব না থাকায় তাঁর সুশাসনে রাজ্যের সকলেই পরম সুখে কালযাপন করত। পৃথিবীর যা কিছু উত্তম, যা কিছু সারবস্তু সে সবই তিনি অধিকার করেছিলেন।

সেই রাজা নল সেনারূপ নৌকাসহযোগে আলোড়িত করে শত্রুরূপ জলময় নদীসমূহ উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর রাজত্বকালে কোন ব্যক্তিই কামাদি বিলাস ব্যসনের বশীভূত হত না। তাঁর রাজ্যে এত হস্তী ছিল যে তাঁর বনভূমির প্রায় প্রতি বনস্পতিই মাতঙ্গগণের বন্ধনস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হত।

অপরাধ করলে যার কাছে পুত্রেরও নিস্তার ছিল না, যাঁর সমস্ত ধনাগম সাধু সজ্জনের সেবায় ব্যয়িত হত, যিনি অন্যান্য রাজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে স্বয়ং ধনলক্ষ্মীর মহাসাগররূপে পরিণত হয়েছিলেন এবং যাঁর সুতীক্ষ্ম অসি ভীষণ গদা প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ ঐ ধনসাগরে অন্য কোন প্রবল শক্তির প্রবেশের প্রধান অন্তরায়রূপ ভীষণ জলজন্তুর মত ছিল। নিজের অজেয় প্রভাবে তিনি সব রক্ষা করতেন।

সেই গুণাভিরাম রাজা নলের গুণে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং বিষ্ণু এবং মহাদেব তাঁর রাজ্যের অতি নিকটে সর্বদা বিরাজ করতেন এবং তাঁর রাজ্যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ অনেক ক্ষত্রিয় বাস করত। এই সব কারণে দেবমাতা অদিতি, চন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতির সঙ্গে শোভমান স্বর্গের সঙ্গে তাঁর রাজ্য সমকক্ষ ছিল। তাঁর অখণ্ড প্রভাববলে অন্যান্য সমস্ত শত্রুরই প্রাধান্য খণ্ডিত ও বিলুপ্ত হয়েছিল।

আমি সর্বজনসেব্য এক সৎকাব্য প্রণয়নমানসে নলরাজার চরিত্রবর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। মহারাজ নল অবিশ্বাসী, অনুরাগহীন সৈন্য কখনো

রাখতেন না। তাঁর রাজত্বকালে তাঁর যাগযজ্ঞের বাহুল্যে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞমণ্ডপ সুসজ্জিত হয়েছিল।

সূর্যের মত তেজোপুঞ্জময় যে নলের শাসনগুণে দিক্‌মণ্ডল শোভিত হত এবং যুদ্ধের শেষে দেখা যেত যিনি সর্বত্রই জয়যুক্ত, কখনো কোন যুদ্ধেই যাঁর পরাজয় ঘটেনি, শত্রুসমূহের সাক্ষাৎ কৃতান্তকল্প সেই অলোকসামান্য প্রভাবশালী রাজা নল অমিতশক্তিবলে ও অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করতেন।

যে নল কন্দর্পতুল্য মনোহর মূর্তি ধারণ করতেন, এবং যিনি সহস্র বৎসর পরমায়ু পেয়ে জীবিত ছিলেন, যিনি রুদ্রকুমার অর্থাৎ মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়তুল্য ছিলেন, সে নলের কাছে দুর্জয় শত্রুরাও প্রাণভয়ে বিকট শব্দ করতে করতে পরাজিত হত।

অশ্বনিয়মন, অশ্বশিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যায় তিনি এমনই পারদর্শী ছিলেন যে এই সব বিদ্যায় পারদর্শী ঋতুপর্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃপতিরাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। পরম শত্রুর প্রতিও কৃপাপরবশ ছিল তাঁর চিত্তবৃত্তি। সর্বদা নীতিপথ ধরে চলতেন বলে তাঁর রাজ্যলক্ষ্মী অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হয়েছিলেন।

বহু আয়াস স্বীকার করে কোনক্রমে একবার যারা তাঁর কাছে আশ্রয় পেত, তিনি সেই আশ্রিতকে যেকোনভাবে রক্ষা করতেন। তিনি কোনরূপে অপব্যয় করতেন না এবং সৎকার্যের জন্য ধনসঞ্চয় করতেন। তিনি কোনরূপ ছলচাতুরী প্রভৃতি মায়া জানতেন না। সুপ্রসিদ্ধ বীরসেন তাঁর পিতা ছিলেন।

শত্রুকুল সমূলে ধ্বংস করে যিনি পৃথিবীতে বিপুল যশ বিস্তার করেছিলেন তাঁর চরিতকথা বড়ই শুভকরী। সে কথা যে শ্রবণ করে তার পুণ্য জন্মে। প্রতিপক্ষের বনমাতঙ্গগুলিকে তিনি এমনই আঘাত করতেন যে তারা উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে দাঁত গুঁজে ছটফট করত।

যে নল রাজ্যের সব পাপকর্ম নিবারণ করে বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের পরামর্শ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের মধ্যে যারা প্রবল, সেই সব নৃপতিরা আপন আপন অপরাধ দূর করে এসে

সেই নলকে প্রণাম করতেন। অর্থাৎ আনত মস্তকে নলের বশ্যতা স্বীকার করতেন।

বিদর্ভদেশে ভীম নামক এক রাজার বংশে দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যা ত্রিজগতে রূপে গুণে পরম মাননীয়া ছিলেন। প্রভূত ধনসমাগমের জন্য রাজা ভীম অখণ্ড সম্মানের অধিকারী হলেও তার জন্য কোন দম্ভ বা অহঙ্কার ছিল না তাঁর মনে। অতিশয় প্রবল শত্রুও রাজা ভীমের কাছে এসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাত।

যাঁদের সংসারে আবির্ভাব ও সমস্ত কার্যই পূজার যোগ্য, সেই উমা, রমা ও অপ্সরা শ্রেষ্ঠা রম্ভার মত সৌন্দর্যশালিনী ভীমনন্দিনী দময়ন্তী যৌবনে উপনীত হলেন। তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়ে কন্দর্পের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলত। তাঁর উরুদ্বয় রামরম্ভা তরুর মত একান্ত মনোরম ছিল।

সেই দময়ন্তী যেমন রমণীকুলের রত্ন অর্থাৎ সর্বাংশে সর্বোত্তমা ছিলেন, তেমনি রাজা নলও মানুষের সব সম্পদের আলয় ছিলেন। এই নলরাজার হৃতসর্বস্ব শত্রুসমূহ কিছুতেই লোকালয়ে থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না। তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রাণভয়ে মরুস্থলীতে পালিয়ে গিয়েছিল।

সেই সুন্দরী দময়ন্তী যেমন রাজন্যকুলের শ্রেষ্ঠ নলকে কামনা করলেন তেমনি শৌর্যবীর্যে দেদীপ্যমান নলও দময়ন্তীকে কামনা করলেন। বীরশ্রেষ্ঠ নল যেমন জগদ্ব্যাপিনী সমরবিজয়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সুন্দরীকুলশ্রেষ্ঠা দময়ন্তীও তেমনি আপন সৌন্দর্যে ও সৌকুমার্যে জগদ্বিখ্যাত রমণীদের পরাজিত করেছিলেন।

সূর্যকিরণবিহীন ছায়াময় মনোহর উদ্যানে গমন করলে হয়ত আমার আজকের এই মনের বিকার অর্থাৎ কন্দর্পের জ্বালা প্রশমিত হবে, এই ভেবে মহারাজ নল রথে আরোহণ করে সেখানে গমন করলেন।

উদ্যানে যাবার পরই স্বরতাপতপ্ত নল দেখলেন অজ্ঞাত কোন সৌভাগ্যে নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি পক্ষী এসে তাঁর অদূরে পতিত হলো। বিস্ময় এবং স্নেহবশতঃ রাজা নল তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সারসপক্ষীর মত হৃষ্টপুষ্ট অথবা সাগরদেরও সম্মানাস্পদ সেই বিহঙ্গসমূহ তখন কলরব করতে করতে উচ্চৈস্বরে নলকে বলল, হে হিংসারহিত নরপতি, তুমি আমাদের পীড়া দিও না। তুমি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমরাও তোমাকে সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।

হে নল, তুমি মকরকেতন কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দরতর। তোমার এই সর্বোত্তম সৌন্দর্যের কথা আমরা ভীমনন্দিনী দময়ন্তীর কাছে গিয়ে শতমুখে ব্যক্ত করব। সেই রাজকন্যা তোমাতে অতিশয় আসক্তিমতী হয়ে তোমার সঙ্গে বিরাজ করুক। আর তুমিও তাঁর সকাশে গমন করে মনের অভিলাষমত ক্রীড়া করো।

নির্মাণদক্ষ ময়দানবের চরম সৌন্দর্য সৃষ্টিরূপিণী সেই দময়ন্তী যখন সখীদের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন তখন সেই বিহঙ্গগণ উদ্যানচারিণী রাজনন্দিনীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে এরা বলতে লাগল।

হে ভীমনন্দিনী, রূপে গুণে তুমি লক্ষ্মীর সমকক্ষা। তাই বলি চন্দ্রবদন পরম পরন্তপ শত্রুকুলের আশাচ্ছেদনকারী এবং সর্বতোভাবে কুমারী কন্যাদের একমাত্র কামনার পাত্র নলের প্রণয়িনী হও।

সেই হংসদের এইরূপ কথা শুনে অতীব আনন্দিত হলেন দময়ন্তী এবং উচ্ছল প্রেমরসে নিমজ্জিত হলেন। তাঁর হৃদয়ে কন্দর্পের প্রভাব উপস্থিত হলো। তিনি হংসদের কথার প্রত্যুত্তর দান করলেন এবং তাদের নলের আলয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

যার তুলনায় দেবগণও অকিঞ্চিৎকর এবং যিনি ধনরত্নের সাগরসদৃশ সেই নলের সন্নিধানে হংসগণ পুনরায় আগমন করে নানাভাবে ত্রিলোকসুন্দরী দময়ন্তীর অলোকসামান্য রূপসৌন্দর্যের প্রশংসা কীর্তন করতে লাগল।

নলের কাছে হংসগণ দময়ন্তীর প্রশংসা করলে দময়ন্তীর মনও চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে কোন শান্তি পেলেন না। তাঁর অনুপম রূপলাবণ্যে পরম সম্মানসম্পন্ন নলও আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এদিকে দময়ন্তীও দিনরাত নল নৈষধ প্রভৃতি নলের নামাবলী চিন্তা করতে করতে বিরহশয্যায় আশ্রয় নিলেন।

অনন্তর রাজা ভীম সশৈল-সাগরা পৃথিবীর অলঙ্কাররূপিণী যৌবনসুলভ আনন্দ এবং অনুরাগে উৎফুল্লহৃদয়া ও যৌবন সমাগমের স্তনোদ্গমাদি চিহ্নে পরিপুষ্ট কলেবরা, অনুরাগহৃষ্টা স্বকীয় কন্যারত্নের মানসিক সন্তাপ দর্শন করলেন।

তা দর্শন করে রাজা ভীম যথাবিধি স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান করলেন। মহারাজ ভীমও পরম রূপশালী পুরুষ ছিলেন। লক্ষ্মীর তনয় স্বয়ং কন্দর্প তাঁর রূপসৌন্দর্য দর্শনে তাঁর স্তব করতেন। সব দিক দিয়ে সবার বড় ছিলেন তিনি। বয়োবৃদ্ধিগত জরার লেশমাত্র ছিল না তাঁর দেহে।

সৈন্যসামন্তসহ রাজারা দলে দলে সহাস্যমুখে সেই স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভ্রমর পরিশোভিত মালা ঐ সব রাজাদের মস্তকদেশ শোভাযুক্ত করেছিল।

সমরস্থলে শত্রুকুলক্ষয়কারী দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ স্বয়ম্বর সভায় যাত্রা করলে স্বর্গবাসী দেববৃন্দের আপন আপন সৈন্যগণও স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না।

তারপর আজানুলম্বিতবাহু অন্যতেজখর্বকারী রাজা নল সেই মহোৎসবে উপস্থিত হলেন। তেজঃপুঞ্জপ্রদীপ্ত সহস্রকিরণের দ্বারা যেমন দিবাভাগ শোভা পায়, তেমনি নলের সমাগমে সেই স্বয়ম্বর সভাও শোভা পেল।

যে সব রাজারা যুদ্ধে শত্রুকুলের উপর জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করতেন, যাঁদের মুখবস্ত্র ফুটন্ত পদ্মের মত ছিল এবং যাঁরা কখনো অসত্যভাষণ করতেন না, সেই সব রাজাদের এবং স্বর্গবাসী দেববৃন্দকে নলের দেবকান্তি উপহাস করত। অর্থাৎ তাঁরা নলের সঙ্গে উপস্থিত হবারও যোগ্য ছিলেন না।

নল বাহুবলে নিজের অখণ্ড যশ সর্বদা পালন করতেন এবং পরের তেজপুঞ্জ খর্ব করতেন। তিনি শত্রুসম্পদের উচ্ছেদকর্তা ছিলেন। তাঁর চন্দ্রবদন দেখে দেবগণ যেন লজ্জায় অসাড় হয়ে পড়তেন।

অপরের অজেয় পরমপরাক্রান্ত শত্রুগণের সাক্ষাৎ অনলস্বরূপ এবং

কোনরূপে বেশভূষা না করলেও যাঁকে দেহকান্তিতে দেবতারা জয় করতে পারতেন না, সেই সর্বোত্তম নলকে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন ঃ

হে নল, যে রমণীয় গুণাবলী আমাদের পরম সন্তাপের কারণ হয়েছে, যার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তুমি সেই ভীমনন্দিনী দময়ন্তীর নিকট গিয়ে তার জন্য আমাদের হৃদয়ের তাপের কথা বল। দ্বারপালগণ তোমাকে দেখতে পাবে না। কেন না, আমাদেরই মায়ায় তুমি অদৃশ্য হবে।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বললে পরম বিবেকসম্পন্ন মহারাজ নল দময়ন্তীর কাছে গমন করলেন। রাজা নল সেখানে উপস্থিত হলে সেখানে কোন রমণীই আর ধৈর্যধারণ করতে পারল না।

নল বললেন, হে ভৈমি, আমার নাম নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু এবং যমের দূতরূপে আমি তোমার নিকট আগমন করেছি। ঐ সব দেবগণ সম্পদ, নীতি এবং সম্মানসহ তোমাকে অভিলাষ করে এঁরা তোমার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন জানবে।

হে অপ্সরাসদৃশী, দেহধারীদের প্রভু সেই দেবগণ মদনতাপজনিত প্রবল দুঃখে নিমগ্ন হয়েছেন, সুতরাং তুমি ঐ দেববৃন্দের নিকট অভিসার করো। তুমি তাঁদের কাছে যাও এবং স্বয়ম্বর মাল্য দান করো। তাহলে সতত রসোচ্ছল স্বর্গে কত রকমের সুখসম্ভোগ করতে পারবে।

কিন্তু নলোৎসুকহৃদয়া দময়ন্তী নলের মুখে দেবতাদের নানাপ্রকার স্তুতিবাক্য শুনেও দেবতাদের সম্বন্ধে তিলমাত্র অভিলাষ বা অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করলেন না। মৃণালনোলুপ হংসী যেমন মরুস্থলীজাত কোন পদার্থে আকৃষ্ট হয় না, তিনিও তেমনি দেবগণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না।

আয়তনয়না দময়ন্তী নিজজ্ঞানে নলকে দেখে কন্দর্পের অত্যন্ত বশবর্তিনী হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তাঁর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেল। দেবগণকে তিনি যে কখনো বরণ করবেন না তা নিষধরাজ নলকে বলে দিলেন।

নল স্বয়ং যে ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধনের জন্য দময়ন্তীর সকাশে

গিয়েছিলেন সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের চরণে প্রণাম করে দময়ন্তীর প্রত্যাখ্যানের বিষয় তাঁকে বিবৃত করলেন। ঐ সময় সেই স্থান বাদ্যে মুখর ছিল।

অনন্তর নৃপতিবৃন্দ অতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে ভ্রমর-গুঞ্জনমুখর স্বয়ম্বরসভায় আপন আপন স্থানে উপবেশন করলেন। হরিণাক্ষী দময়ন্তীও সেখানে স্বস্থানে উপস্থিত হলেন।

সভায় সমাগত রাজগণকে প্রজাবর্গ নতমস্তকে প্রণাম করার পর স্তুতিপাঠকগণ যখন ঐ রাজাদের এবং উপস্থিত দেববৃন্দের নামগ্রহণ করে তাঁদের পরিচয় দিতে লাগল, তখন সেই সৌন্দর্যশালিনী—

দময়ন্তী কয়েকজন পুরুষকে দর্শন করলেন। তাঁরা সকলেই অনলের মত দীপ্তিসম্পন্ন। তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁদের কলেবর স্ফূর্তিযুক্ত হলো এবং পাছে ভীমনন্দিনী নলকে বরণ করে বসেন সেই আশঙ্কায় সকলেই নলের রূপ ধারণ করলেন। সেই সব নকল নলদের মধ্যে কোনটি আসল নল তা বোঝার বা ভেদ নিরূপণের কোন উপায় ছিল না।

স্বয়ম্বর সভায় সকলকেই নলরূপে বিদ্যমান দেখে দময়ন্তী বললেন, আমি যদি সতী হই এবং কখনো মিথ্যা বলে না থাকি, সহস্র দুঃখকষ্টে পড়েও আমি যদি অন্যায় পথে পদার্পণ না করে থাকি, যদি জীবনে কখনো দানধ্যান করে থাকি, তাহলে স্বর্গের অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান প্রকৃত নল এই সব নলসমূহের মধ্যে প্রকটিত হোন অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করুন।

অথবা অন্য কোন পুরুষে আসক্তিমতী না হয়ে আমি যদি নলেই একমাত্র অনুরাগিনী হই, তাহলে দেবসভারূপ এই বনের মাতঙ্গস্বরূপ সেই নলদেহকান্তি আবির্ভূত হয়ে আমাকে রক্ষা করুক। অর্থাৎ মাতঙ্গ যেমন নলরাজিকে পদদলিত করে তেমনি এই কপট নলরূপী দেবতাদের মধ্যে প্রকৃত নলের কান্তি আবির্ভূত হয়ে এঁদের বিতাড়িত করে নলের অনুরাগিনী আমাকে এই ঘোর সমস্যা হতে রক্ষা করুন।

এইরূপ দৃঢ়সংকল্পসহকারে সুপরিচ্ছদধারিণী দময়ন্তী তখন

দেবতাদের দিকে চেয়ে দেখলেন, দেবতারা দেবত্বহেতু মর্ত্যে এসেও মৃত্তিকাস্পর্শ করেননি, মাটি হতে কিছুটা ঊর্ধ্বে অবস্থিত রয়েছেন। আর যখন তাঁর প্রাণেশ্বর নলের দিকে চাইলেন তখন দেখলেন তিনি মর্ত্যধর্ম অনুসারে মৃত্তিকা স্পর্শ করে বিরাজ করছেন। অবস্থাগত এই তারতম্যে তিনি সহজেই দেবগণ ও নলের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করে ফেললেন।

দেবগণের দ্বারা বারবার প্রার্থিত হয়েও দময়ন্তী সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত না করে সখীদের সঙ্গে প্রীতিরসোচ্ছল হৃদয়ে সমীপবর্তী নলকেই বরণ করলেন। যৌবনাগমে তাঁর হৃদয়ের প্রিয় সমাগমবাসনা তাঁর ভ্রমরচঞ্চল নয়নে ফুটে বার হচ্ছিল।

যিনি নিজের সতীত্বতেজে সাক্ষাৎ উমাসদৃশী ছিলেন, সেই চন্দ্রবদনা দময়ন্তীর দ্বারা পতিত্বে বৃত হয়ে নল যেন অধিকতর কান্তিমান হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। রুদ্রের মত তেজস্বী নল ধরাতলে সর্বাপেক্ষা গুণশালী পুরুষ ছিলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ নলের চিত্তবৃত্তি দম্ভহীন ও মদশূন্য জেনে বর প্রদান করে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। নল যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধিগৌরবে অতিমাত্র সম্পন্ন ছিলেন তেমনি তাঁর কান্তিও অলোকসামান্য ছিল।

তারপর মহামহিম গৌরবে সালঙ্কৃত ও শত্রুগণের কপটতাবিনাশ-কারী মহারাজ নল প্রিয়তমা দময়ন্তীর সঙ্গে নানা সমৃদ্ধির আকর-স্বরূপ নিজ রাজপুরীতে উপস্থিত হলেন। নানারূপ ধনাগম এসে আশ্রয় করল তাঁকে।

নিজ রাজধানীতে দময়ন্তীকে নিয়ে নল উপস্থিত হলে সেখানকার জনসাধারণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত ও চন্দ্রের মত বিমল হাস্যচ্ছটায় প্রস্ফুরিত হয়ে আনন্দে কোলাহল করতে লাগল। তারা উজ্জ্বলবর্ণ সুরাপান করে নানারকম ক্রীড়া ও আনন্দোৎসব করতে লাগল। রাজ-দম্পতির মঙ্গল কামনায় দেবতাদের অর্চনায় প্রবৃত্ত হলো তারা।

দ্বিতীয় সর্গ

তারপর সেই সর্বলোকসুন্দরী দময়ন্তীকে নিয়ে শত্রুকুলের গর্ব খর্বকারী নল নিজ রাজধানীর রতিমন্দিরে নানা রসময়ী ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন।

বলবত্তায় সমুদ্রতুল্য নল আনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যেমন শ্রীসম্পন্ন হলেন, দময়ন্তীও তেমনি সতত প্রেমরসে বিগলিতহৃদয় হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। তখন বসন্ত সমাগমে মদমুখর সারসগণের কলরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ও প্রফুল্ল কুসুমসৌরভে আমোদিত হয়ে উঠল।

পরপুরুষপৃষ্ঠা কামিনীর মত চন্দ্রকরস্পর্শে লজ্জিত হয়ে নলিনী এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল। আজ নলিনীকান্ত দিনপতি সূর্য শালী-ধান্যমঞ্জরীর অগ্রভাগের কান্তি জয় করে হস্ত প্রসারিত করে সেই লজ্জাসংকুচিত নলিনীকে প্রস্ফুটিত করলেন। তার সঙ্গে ভ্রমর-রাশির আশাও নতুন হয়ে উঠল।

বসন্তসমাগমে উন্মাদ সারসকুলের কূজনে পরিপূরিত হলো পৃথিবী। কুরুবকতরুসমূহে দেখা দিল নবপল্লবের অঙ্কুর। জলের পঙ্কিলতা দূর হলো এবং তাতে কমলদল এমনই শোভিত হয়ে উঠল যে তা দেখে সকলের মন বিমোহিত হয়ে পড়ল।

অতিপ্রখর সূর্যকররাশি প্রবল হিমের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে প্রভাব বিস্তার করল চারদিকে। বসন্তসমাগমে মদনদেব তাঁর বাণরূপ কালসর্পের দ্বারা নলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। একে সূর্যের তাপ, তার উপর মদনের জ্বালা—নল তাই বাধ্য হয়ে তাঁর উৎসবপূর্ণ ভবনে প্রবেশ করলেন।

সুপ্রসিদ্ধ চম্পককলিকাগুলি কন্দর্পের সূচীরূপে আবির্ভূত হলো। তার মধ্যে জগতের এতই বেদনাদায়িকা শক্তি নিহিত ছিল যে সেই বেদনায় কত বিরহীর প্রাণবিয়োগ হলো।

বিরল ও নাতিবৃহৎ পত্রবিশিষ্ট পলাশতরুকে প্রচুর পুষ্প আবির্ভূত

হলো। ঐ পুষ্পসমূহ দেখতে কন্দর্পরূপ হলেও ঘৃণিত রাক্ষসের ভক্ষণযোগ্য প্রবাসী বিরহীদের রক্তাক্ত মাংসের মত মনে হতে লাগল। কন্দর্প যে কত বড় নিষ্ঠুরহৃদয় তাই এতে প্রমাণিত হলো।

ঋতুরাজ বসন্তের হৃদয়োন্মাদিকা কান্তিদর্শনে প্রণয়ীদের মনে আদি-রসোদ্দীপক বিভাবাদির আবির্ভাব হলো। বসন্তের রাত্রি মত্ত মাতঙ্গের মত শোভা পেতে লাগল এবং তার উপর চন্দ্রকলা বিরহীহৃদয়মর্দনকারী রাত্রিরূপ গজরাজের দন্তের মত বিরাজ করতে লাগল। ঐ দন্তের দ্বারা রাত্রিরূপ মাতঙ্গ পত্নীবিযুক্ত বিরহীদের হৃদয়ে অশেষ বেদনা দিতে লাগল।

এই দুরন্ত বসন্তকালে যে পুরুষ কামিনীদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে তাদের শোকতরঙ্গ সমুৎপন্ন করছে এবং নিজ নিজ হৃদয়ের মত্ততা সম্ভোগের অভাবে বৃথা নষ্ট হচ্ছে সেই হতভাগ্য পুরুষের সকল আশা চারদিকের অশোকমঞ্জরীতে পতিত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনরূপী হুঙ্কার শব্দের দ্বারা বিধ্বস্ত করে দিচ্ছেন কন্দর্প।

বসন্তাগমে পৃথিবী যেন কামদেবের যুদ্ধের রণভূমিতে পরিণত হলো। মদোন্মত্ত সারসকুলে ছেয়ে গেল চারদিক। দুর্জন প্রভাবশালী কন্দর্প বিরহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করলেন।

এই হৃদয়োন্মাদক বসন্তকালে এমন কোন পুরুষ আছে যে হৃদয়ের চঞ্চলতাবশতঃ সুন্দরী কামিনীদের না পেয়ে মৃতপ্রায় না হচ্ছে? তাই দয়াবতী কামিনীরা ঐ সব পুরুষদের কাতর প্রার্থনায় অমত না করে মদবর্ধক নানারকম মধুপান করছে।

যে যে কথায় কামিনীদের হৃদয় আরও মদমত্ত করে তোলা যায় কোকিলরা সুমধুর কুহু স্বরে সেই সব কথা বলে বিরহীদের যেন তিরস্কার করছে।

বসন্ত সমাগমে সমধিক শোভা পেতে লাগলেন চন্দ্রদেব। সহকার তরুতে পিককুলের মধুর গান বেড়ে উঠল আরও। ময়ূরবৃন্দ নাচতে ও কেকাধ্বনি করতে লাগল।

রসাল মঞ্জরীসমুল্লসিত এই মধুর বসন্তকালে এমন কোন পুরুষই

নেই যে দুঃসহ বিরহ সহ্য করতে পারে। আবার এমন কোন কামিনী নেই যে প্রিয়তমের সঙ্গে পূর্বকলহের কথা বিস্মৃত না হন। এই কালে কামিনীদের পতির সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করার কোন প্রবৃত্তিই থাকে না।

মদনের দৌত্যকার্যের ভার নিয়ে অর্থাৎ লোকোন্মাদনারূপ কার্যে ব্রতী হয়েই যেন ভ্রমরপঙক্তি অনুরাগভরে ফুলের মধু পান করে একেবারে মেতে উঠল। বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ছোটাছুটি করে গান আরম্ভ করে দিল তারা। তাদের সেই গুনগুন গানে ঋতুরাজ বসন্তের শোভা বেড়ে গেল আরও।

বসন্তের নির্মল আকাশে ভ্রমরসমূহ মদভরে বিচরণ করতে থাকায় দর্শকের মনে বিষম ভ্রম উৎপন্ন হলো। তাদের মনে হলো বুঝি কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা আকাশতলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশের ঐ ভ্রমরমালাকে নবমেঘমালা মনে করে কামিনীগণ বিরহার্ত হৃদয়ে অবিলম্বে নিজ নিজ মানুষের সঙ্গে মিলিত হলো।

এই উপভোগক্ষম বসন্তকালে যে নির্বোধ ব্যক্তি নানাপ্রকার সুরতোৎসব হৃদয়ে বিস্তারলাভ করার আগেই গৃহ ছেড়ে বিদেশে যায় তার মত অজ্ঞান ও বিবেকহীন অতি কমই আছে। কারণ বসন্ত ঋতু-জনিত মত্ততাকে জোর করে রোধ করলে ফল বিপরীতই হয়ে থাকে। নানাবিধ দৈহিক অস্বাস্থ্য ও মনোবিকারে সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যে অবোধ ললনা ক্রোধভরে নূতন মালা গাঁথার ছল করে নিকটবর্তী প্রিয়তমের কাছে না যায়, অল্পকালমধ্যেই সেই প্রিয়তমের অভাবে ঐ কামিনী অনুতাপ ভোগ করে। শেষে চুপ করে পড়ে থাকে। এইভাবে সে আত্মকৃত অকার্যের ফল ভোগ করে।

সে আক্ষেপ করে বলে, হে পর্বতজাত তরুবর, তুমি কত বড়, কত উচ্চ, আকাশে উঠে কুসুমরূপ নেত্র উন্মীলন করে চেয়ে আছ। কত সুস্থ ও স্নিগ্ধ তোমার দেহ। তুমি যদি আমার পতিকে দেখতে পাও তাহলে তাকে বলো, যাতে আমি এই বসন্ত ঋতুতে সত্বর তার সঙ্গে সতত ক্রীড়ারতা লক্ষ্মীর মত ক্রীড়া করতে পারি তিনি যেন তা করেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট হতে কোন উত্তর পেল না। এতে কন্দর্পরূপ কালসর্প

তার হৃদয়ে আরও অধিক জ্বালা উৎপাদন করল।

যে বসন্তকালে ঋতুরাজকে আগত দেখে অতি তুচ্ছ ভ্রমররাজিও হৃদয়ের লালসায় গুনগুন করে কত কি ব্যথা জানায়, সেই দুরন্ত সময়ে এমন কোন কামিনী আছে যে হৃদয়ে বিরাজমান পুষ্পধনু মদনকে সহ্য করতে পারে?

মদনের মত অনমনীয় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও তার অতিপ্রভাবে নলের বুদ্ধি জড়তাপ্রাপ্ত হলো। তিনি আর কালবিলম্ব না করে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দারতরুশোভিত মনোহর উদ্যানবাটিকায় গমন করলেন।

সর্বাংশে পতির অনুরূপ ভীমনন্দিনী চন্দ্রবদন ও পরম মাননীয় সেই নলের অনুগামিনী হয়ে নন্দনকাননতুল্য ঐ উদ্যানবাটিকায় গিয়ে পরম আনন্দিত হলেন।

অন্যান্য আরও অনেক সুন্দরী ঐ উদ্যানে গিয়েছিলেন। 'এইদিকে একবার তাকাও, এইদিকে একবার ঐ সুন্দর চক্ষে কটাক্ষ নিক্ষেপ করো' —প্রিয়তমের এই সাদর বাক্যে সেই কামিনীদের অঙ্গলতিকা আনন্দে রোমাঞ্চিত হলো। তাদের করধৃত বলয় কাঁপতে লাগল। তারা প্রত্যেকেই পৃথকভাবে নানা আরাম উপভোগ করতে লাগল। সেই সব সুন্দরী ললনাদের উদরে নয়নমনোহর ত্রিবলী শোভা পাচ্ছিল।

ঐ রমণীদের মধ্যে কেউ অভিমানিনী হয়ে নবকুসুমভারে আনত বৃক্ষে শোভিত ঐ উদ্যানের কোন স্থানে গিয়ে লুকোতে চাইত না। কেন না, নায়কশ্রেষ্ঠ নল তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে বারবার নানা চাটুবাক্যে ও সুন্দর সুন্দর মালার উপহারদানে আত্মাপরাধ স্খালন করে ঐ মানিনীর মান ভঙ্গ করতেন।

কোন মানিনীকে দূতী বলছে, সখী, এখনই দেখতে পাবে তোমার উল্লসিত নবযৌবনসুন্দর কলেবর দর্শনে এই দুরন্ত বসন্তকালে তোমার সামান্য ক্রোধেও ঐ পুরুষের কত কষ্ট কত বিষাদ জন্মাবে। তার ঐ মধুরযৌবন শুকিয়ে যাবে এবং তোমার পদপ্রান্তে পড়ে কত স্তবস্তুতি করতে করতে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে।

হে সখী, কালহরণ করো না। অতিপ্রবৃদ্ধ বসন্ত তরুলতাদের

কুসুমভারে পরিপূর্ণ করেছে। মধুমাসের সেই নবীন সৌন্দর্য অস্তমিত হতে বসেছে। লোকসমক্ষে যা পুরাতে পারবে না, তাড়াতাড়ি আড়ালে সেই সব বাসনা পূরণ করে নাও। অস্তগমনোন্মুখ এই বসন্তের সেই লক্ষ্মীশ্রী বা সৌন্দর্য এবার আর আগের মত রমণীয়রূপে ফিরে আসবে না।

এইভাবে আদর করে দূতী বা সখী বারবার অনুরোধ করলে সেই নায়িকা সেই প্রিয়সন্নিধানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সেই চিরপ্রিয় প্রিয়তমও ললাটপতিত কৃষ্ণ কুন্তলদামে শ্যামায়মানা পদ্মসম কামিনীর সঙ্গে নানা আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়ে উঠলেন।

কোন রসিক নায়ক বললেন, প্রিয়ে দেখ, এই সরোবরতীর কি সুন্দর এবং নির্জন। তীরতরুশ্রেণী পল্লবাবলী কেমন স্তবকে স্তবকে বেড়ে উঠে শোভা পাচ্ছে। একটি বকও কোথাও দেখা যাচ্ছে না এমনই নির্জন এই স্থান। এমন উপভোগে উপযুক্ত স্থানে কি তোমার মান করে-বসে থাকা শোভা পায়? এই বলেই ঐ নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জমধ্যে নিয়ে গেলেন।

কোন সুন্দরী গিয়ে লোহিত পরাগজালে লালে লাল এক প্রফুল্ল বৃক্ষের সামনে দাঁড়াল। তার অমলধবল হাস্যচ্ছটায় সেই রেণুলোহিত বৃক্ষ সাদা হয়ে গেল একেবারে। ফলে সেই কামিনী কুসুম চয়নের জন্য গিয়ে দাঁড়ালেও কুসুম আর দেখতে পেল না, দেখল গোটা গাছটাই সাদা।

আর একটি ষোড়শী কুসুমতরুর আলবালে গিয়ে দাঁড়াল। নবপল্লবে মণ্ডিত ঐ বৃক্ষের শোভা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান ঐ তন্বী ঠিক একটি লতার মত শোভা পাচ্ছিল।

কোন পরিহাসপ্রিয়া কৃশাঙ্গী গিয়ে যখন লতাবলয়মধ্যবর্তিনী সখীদের মধ্যে লুকোল তখন তার প্রিয়বল্লভ ঐ সখীদের কলহাস্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনে সখী ও লতা হতে তার প্রণয়িনীকে চিনে বার করল।

কোন কামিনীর নয়নে কুসুমিত বৃক্ষের পরাগ পড়ায় তা কলুষিত হলো। তখন সে তার চোখের পরাগ বার করবার আশায় তাড়াতাড়ি তার কান্তের কাছে চলে গেল। তারপর এক কৌশলেই বশীভূত করে

নিল সেই নায়কের হৃদয়। কি করে কেমন ভঙ্গিতে নিজের পতি বা নায়কের সামনে তুলে ধরতে হয় নিজেকে সে বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করে ঐ কামিনী।

কোন কামী নিজের প্রণয়িনীর সামনে অপরাধ করেও নানাপ্রকার ছল ও কপট চাটুবাক্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে প্রমাণ করল। প্রিয়মুখের ঐ সব স্তোকবাক্যে ভুলে সেই সরলহৃদয়া ললনা তার অপরাধী প্রাণাধিকের উপর আর ক্রোধ প্রকাশ করল না।

অন্য এক অপরাধী পতি তার অভিমানিনী প্রিয়ার কাছে নানাপক্ষী-সখাকুল উপবনের এমনই প্রশংসা উচ্চকণ্ঠে জুড়ে দিল যে তাতেই ঐ মানিনীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে অবাক হয়ে ঐ উপবনস্তুতি শুনতে লাগল আর সেই অবসরে ক্রমে চতুর নায়কও নিজের অপরাধ স্খালন করে নিল। ক্রমে মান ভেঙ্গে গেল।

কোন কামুক আবার প্রাণসখা, অভিমানিনী ও সৌন্দর্যমণ্ডিতা প্রিয়ার স্পৃহনীয় পদাঘাত আনত দেহে মাথা পেতে ধারণ করল।

কুসুমসৌরভবাহী এবং সুশীতল মন্দ সমীরণের সংস্পর্শে একান্ত মনোহর উদ্যানবাটিকায় নিজ নিজ প্রিয়তমকে নিয়ে বিলাসিনীগণ নিজের সুরম্য ভবন পরিত্যাগ করে আমোদপ্রমোদের জন্য গমন করল।

কামীগণ এই সময় স্থল পরিত্যাগ করে জলবিহারে মত্ত হয়ে উঠল। কামীজন সেই মনোহর উদ্যানমধ্যবর্তিনী রমণীদের সঙ্গে অভিলাষমত বিহার করার পর নিকটস্থিত ফুল্লকমলদলশোভিত সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তখন অয়ি গুণামৃত প্রস্রাবিনী, তুমি কি জলবিহারে যাবে না?—বলে সরলহৃদয়, রসময় প্রিয়ংবদ নল সত্বর পদক্ষেপে দময়ন্তীকে নিয়ে সেই সরোবরে অবতীর্ণ হলেন।

অপঙ্কিল ও অতিপ্রবৃদ্ধ সেই সরোবরের নয়নরঞ্জিনী কান্তি সরসী-মধ্যবর্তিনী চক্রবাকী, কুররী, হংসী প্রভৃতি সেই মনোজ্ঞমূর্তি নলের মন হরণ করল।

অতিপ্রবল তিমি মৎস্যাদি সেই সরোবরজলে থাকলেও এবং স্বভাব-

ভীরু কামিনীরা সেখানে সমাগত হয়ে বিহারকামনায় একান্ত চঞ্চল হলেও ঐ সব জলবিহঙ্গদের ভয়ে নানারকম আশঙ্কা করতে লাগল। তবু তারা ভাবল, যদি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে ঈষদান্দোলিত এই সরোবরের জলে একটু বিহার করা যায় তবে তাতে ক্ষতি কি ?

সুন্দরীবৃন্দ জলে নেমে যেমন জলক্রীড়া করতে শুরু করল অমনি বেণুরঞ্জিত কমলদল পরিহার করে ভ্রমরগণ উড়ে এসে সামনের কামিনী-গণের মদরাগরঞ্জিত মুখে বসতে লাগল।

তারপর ঐ সব কামার্তহৃদয়া রমণী নলের সঙ্গে যখন জলবিহার করতে আরম্ভ করল তখন সরসীস্থিত কমলিনীসমূহ আন্দোলিত হওয়ায় তার উপরকার ভ্রমরপঙক্তি গুঞ্জরণ করতে করতে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

জলবিহারকালে আন্দোলিত সরোবরবক্ষে তরঙ্গভঙ্গে কমলদল যখন ঘন ঘন কাঁপতে লাগল তখন কৃশাঙ্গী রমণীরা জলে কুমীর এসেছে ভেবে ভীত হয়ে পড়ল। কমলিনীদের নৃত্যবঙ্গভূমিস্বরূপ ঐ সরোবরের শোভা অপূর্ব হয়ে উঠল।

দীর্ঘক্ষণব্যাপী বিহারের পর রমণীরা জল হতে উঠে পড়ল। সরোবরের সেই সুনির্মল জলে কলমুখর সারসগণ নিরন্তর সশব্দে খেলা করছিল বলে তার সুনীল বক্ষ ফেণপুঞ্জে ভরে গিয়েছিল। তা দেখে মনে হলো যেন আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে।

ক্রমে সূর্যদেব অস্তগমনে উদ্যত হলে জলবিহারিণী রমণীরাও আলোকপ্রভায় সমুদ্ভাসিত আপন আপন আবাসভবনে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। সুন্দরীগণ উদরের ত্রিবলীভারে ঈষৎ আনত হয়ে মন্হরপদে যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন তাদের অপূর্ব দেহসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরগণ উড়ে এসে বসছিল তাদের উপর।

অয়ি প্রিয়ে দময়ন্তী, মদনবিকারে জর্জরিত আমার দেহ। আমি সে বিকারকে বিনাশ করতে চাই, তুমি আমার অভিলাষ পূরণ করে আমাকে সাহায্য করো—এই কথা বলতে বলতে নল তাঁকে আকাশচুম্বী সমুচ্চ একটি প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। ঐ প্রাসাদের গাত্রগুলি হৃদয়ের উন্মাদনা-

বর্ধক মদনের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপপূর্ণ চিত্রে শোভিত ছিল।

সূর্যদেব গোধূলির অরুণরাগে সুরঞ্জিত হলেও তাঁর সেই অরুণিমা কমলদলে সংক্রান্ত হলো না। এখন যদি সেই সহস্রকিরণ সূর্য তাঁর কিরণরূপ কর প্রসারিত করেন কমলের দিকে তাহলে তিনি পরস্বাপহারী বলেই প্রতিপন্ন হবেন।

সূর্যের কিরণ যে যে স্থান হতে প্রতিনিবৃত্ত হলো সেই সব স্থানে প্রগাঢ় তিমিরজাল ছড়িয়ে পড়ল।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সূর্যকে আবৃত্ত করে ফেলল। বিহঙ্গকুল কূজন করতে আরম্ভ করল চারদিকে। সর্বত্র একটা আরক্ত আভায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মেষগণ পালে পালে ঘরে ফিরতে লাগল এবং আকাশে অসংখ্য তারকা হেসে উঠল।

তারপর সমুদ্রগর্ভ হতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উদিত হলেন। মনে হলো, জগজ্জয়ী কন্দর্পের রজতকুম্ভ শোভা পাচ্ছে। চন্দ্রের অভ্যুদয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করল। কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্করূপ অলঙ্কারধারী, বিরহী পথিকদের সাক্ষাৎ যমতুল্য প্রতিরাত্রিতে সমুদিত চন্দ্রকে কোন বিরহিনীই দেখতে পেল না। বসন্তের চন্দ্র এতই হৃদয়োন্মাদক।

তারপর হিমশীকরবাহী জ্যোৎস্নাবর্ধনকারী নিশাপতির কিরণজাল জগতের সর্বত্র হাস্যচ্ছটার মত ছড়িয়ে পড়ল।

চন্দ্রকিরণজালে জগৎ হেসে ওঠার পর বিকলহৃদয় নায়কগণ যথাসাধ্য অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন বধূদের কাছে। ক্রমে সেই অনুনয়-চাতুর্যের দ্বারা অবশীভূত কামিনীদেরও বশীভূত করে নিলেন।

সহাস্যমুখে ও নানারকম হাবভাবের সঙ্গে সুরাসুরগণ যেমন অমৃতপানে উন্মত্ত হন, তেমনি দুঃসহ কন্দর্পশরে একান্ত অসহিষ্ণু হয়ে নায়কগণ সেই মদ্যপানের ফলে যে সব কামিনী অভিমানভরে নায়কের অবাধ্য হয়েছিল, তারা একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ল। আবার যারা নায়কের বশংবদ ছিল তারা মদ্যপানের ফলে অতিশয় উচ্ছৃংখল হয়ে উঠল। হৃদয়ে উদ্রিক্ত কন্দর্পের সৌন্দর্যে রমণীদের এতই শ্রী জন্মাল যে শোভাদেবী যেন নিমেষের মধ্যে শতগুণ বেড়ে উঠলেন।

মদ্যপূর্ণ পাত্রগুলির উপর অনেক ভ্রমর এসে বসেছিল। কামিনী-দের সঙ্গে কামীগণ অনুরাগভরে যেমন সেই মদপান করতে গেল অমনি ভ্রমরগুলিও উড়ে পালিয়ে গেল। সুরার প্রভাবে সকলে সব অপরাধ ভুলে গিয়ে বিস্তৃত শয্যায় আশ্রয় নিল।

তারপর সসাগরা ধরণীর মধ্যে উপভোগক্ষম গুণগরিমায় ভূষিতা ও নানাপ্রকার লীলাবিলাসাদিতে পারদর্শিনী বরকামিনীরা ও তাদের সহচর যুবকবৃন্দ মদনোৎসবে মত্ত হয়ে অপূর্ব শ্রীলাভ করল।

রূপ ও গুণের দ্বারা যিনি লক্ষ্মীকেও পরাজিত করেছিলেন সেই সরলা ও চিরানন্দময়ী দময়ন্তীর সঙ্গে স্নিগ্ধহৃদয় নল বিহার করতে লাগলেন।

নিঃশঙ্কহৃদয় সরলা দময়ন্তী তাঁর প্রিয়তম নলের সাহচর্যে কৃত-কৃতার্থ হয়েছিলেন। দময়ন্তীকে পেয়ে নলেরও অন্তরের সকল সাধ পরিপূর্ণ হয়েছিল। মদনের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে নানা-রূপ ক্রীড়ারস অনুভব করতে লাগলেন তিনি। পরস্পরের সংসর্গে তাদের পরস্পরের শোভা যেন শতগুণ বেড়ে গেল।

এইভাবে মহারাজ নল নানাপ্রকার আনন্দরস অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁর ভাগ্যে এ সুখ টিকল না। নানা কপটতার আধার কলির আক্রমণ জনিত বহুবিধ দুর্বিপাক এসে তার সব সুখ ধ্বংস করে দিল। বাহুবলের দ্বারা ধনাগম ঘটিয়ে নানা মঙ্গলকর কার্যের অনুষ্ঠানের যে পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কলি এসে তা সব নষ্ট করে দিল।

সতত উৎসবসম্পন্ন বিশালবুদ্ধি ও ধনসম্পদে কুবেরতুল্য নল বিবাহের পর পৃথিবী পালনে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর শোভা শত-গুণ বর্ধিত হলো।

তৃতীয় সর্গ

স্বয়ম্বর সভা শেষ হবার পর কণ্ঠে জলদসদৃশ দেবগণ সেই নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদে দেদীপ্যমান মহোৎসব হতে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা

করলেন। পথের মাঝে তাঁরা সবরকম সৎকার্যের পরিপন্থী কলিকে দেখতে পেয়ে কোথায় যাচ্ছ বলে জিজ্ঞাসা করলেন।

রূপগুণে পরম যশস্বিনী ভীমনন্দিনী যে দময়ন্তীরূপে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাতলে সেই দময়ন্তীর জন্য আমি অত্যন্ত উন্মনা হয়েছি। তাকেই লাভ করার আশায় আমি আজ মর্ত্যলোকে যাচ্ছি।

কলি এই বললে সেই অমর দেবগণ বললেন, আর সেখানে যেও না। সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী এবং উমা অপেক্ষাও সর্বাংশে বরেণ্যা সবলা দময়ন্তী নলকেই পতিত্বে বরণ করেছেন।

স্বয়ম্বর-উৎসবের নানাবিধ আনন্দরসপানে প্রহৃষ্টহৃদয় যজ্ঞাংশভাবে দেবতাদের মুখে নলদময়ন্তীর এই স্বয়ম্বরসংবাদ শ্রবণ করে মদান্ধ কলি স্বভাবসুলভ অপকারপ্রবৃত্তির বশে অতিশয় ক্রোধান্ধ হয়ে উঠল।

কলি বলল, প্রবলশক্তি দেবশ্রেষ্ঠদের দুর্বল জ্ঞান করে যে দময়ন্তী দুর্বুদ্ধিবশে নলেতে অনুরাগিণী হয়েছে, অচিরোৎফুল্লা লতা যেমন তরুণ তরুর সঙ্গে মিশে থাকে, তেমনি নলের সঙ্গে মিশে থাকতে তাকে কখনই দেব না। নলের সঙ্গে ঘরসংসার করতে সে পারবে না।

প্রবলশক্তি কলি এই অভিশাপ দান করে নলের দেহে প্রবেশ করার জন্য তাঁর গতিবিধি ও কার্যকলাপের ছিদ্র অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হলো। বনবিহারমত্ত নলের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর সর্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।

তাঁর দেহে কলির প্রবেশ করার পর নল তাঁর ভ্রাতা পুষ্করের দ্বারা কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে পত্নী দময়ন্তীকে নিয়ে তাঁর সমৃদ্ধশালিনী রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

পরম শত্রু পুষ্কর নলকে নানাপ্রকার কটুবাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা করল। তাঁর যথাসর্বস্ব কেড়ে নিল। হতভাগ্য নল বহুমূল্য রাজবেশ ত্যাগ করে অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

কণ্টকাকীর্ণ বনপথে সজল নয়নে পদক্ষেপ করে নল যখন ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁকে দেখে অন্যেরাও অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি।

ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত কাতর নলকে কেউ কোনরূপ সাহায্য করেনি। সারাদিন অনাহারেই কাটাতে হত তাঁকে।

দময়ন্তীর পরিহিত বসনের কিছুটা অংশ পরিধান করতেন নল। একদিন একটি হংস ধরার বাসনায় নল তাঁর পরিহিত সেই বসনটুকু হংসের উপর নিক্ষেপ করতেই সেই বসন নিয়ে হংসটি উড়ে গিয়েছিল।

নলের সেই মনোহারিণী রাজলক্ষ্মী বা রাজোচিত বাসভবন ছিল না। কলিমায়াজাত হংসগণ দময়ন্তীর সঙ্গে ক্রীড়ার জন্য এসে নলের যে সামান্য একখণ্ড বসন পরিধানে ছিল তাও নিয়ে চলে গেল। কিন্তু মনস্বী নলের এত কিছু সত্ত্বেও ক্রোধ জন্মাল না। তিনি ক্ষমারূপ জলযানের দ্বারা ক্রোধরূপ সিন্ধু উত্তীর্ণ হলেন। সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যমদ ও আত্মাভিমান দূরে ছুঁড়ে ফেললেন।

তাপের প্রখরতায় আমাদের মেদমাংস জ্বলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় স্বামী স্ত্রী দুজনে দুজনের দেহ আবৃত করে অতিকষ্টে দুজনে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেলেন। নানা বৃক্ষবেষ্টিত ও অভিনব সানুদেশবিরাজিত পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন।

কলির আক্রমণে নলের এমনই মতিভ্রম ঘটেছিল যে একদিন 'বর্তমানে ঘোর বিপদে এই নীতিই অলঙ্ঘনীয়' মনে করে সেই বনমধ্যে ঘুমন্ত দময়ন্তীর সেই বস্ত্রের কিছুটা ছিঁড়ে রেখে সুপ্তা সহধর্মিণীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। দময়ন্তী একা সেই বনমধ্যে পড়ে রইলেন।

শত্রুগণের গর্বাপহারী নল কলির দ্বারা সংঘটিত নানারূপ দুঃখ বিড়ম্বনায় একান্ত বিধুর হয়ে ইতস্ততঃ পর্যটন করতে লাগলেন। যিনি যত বড়ই হোন না কেন, পূর্বকৃত স্বকর্মের ফলভোগ সকলকেই করতে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে নল একটি দাবানলময় বনে প্রবেশ করে দেখলেন মৃগগণ আর্তস্বরে চীৎকার করছে। বিহঙ্গকুল অতিশয় তাপে কাতর হয়ে ছটফট করছে। বিশাল ধনরাজি অগ্নিদাহে পুড়তে পুড়তে ভীষণ আকার ধারণ করেছে।

নানা দৈবদুর্বিপাকে উদ্‌ভ্রান্তপ্রাণ নল শুনলেন, 'নল এদিকে এস'

বলে কে রোদন করছে। তা শুনে সূর্যপ্রভব নল 'অনাথ, তোমার ভয় নেই' বলতে বলতে সেই দিকে ছুটে গেলেন।

পরম করুণাময় নল সেই আর্তধ্বনি শুনে অতি সত্বর তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর 'কে তুমি বল, তোমার কি হয়েছে, ভয় নেই, স্থির হও' বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

নিকটে গিয়ে নল দেখলেন, কর্কোটক নাগ দাবানলে দগ্ধ হয়ে দাহযন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছে না। সে প্রায় মুমূর্ষু, বাঁচার আশা কম। দয়ালু নল তাকে ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন।

জীবহিতৈষী নল সেই দাহকাতর সর্পকে ধরে যেমন সরাতে গেলেন অমনি ঐ বিষধর সর্প দংশন করল তাঁকে। বিষের জ্বালায় নলের দেহ কালো এবং ছোট হয়ে গেল। নল বলে তাঁকে চিনবার কোন উপায় রইল না। সর্প বলল, আমি তোমাকে দংশন করেছি বটে, কিন্তু বিষের জ্বালা তোমাকে সহ্য করতে হবে না।

কর্কোটক নাগ আরও বলল, আমি তোমাকে এই বস্ত্রখণ্ড দিচ্ছি, 'এর মাহাত্ম্যে এই বসন গ্রহণের পর কলির প্রভাবমুক্ত হবে তোমার দেহ। তোমার সকল বিপদ আপদ কেটে যাবে। যারা যশের আশ্রয় হন, সকলরকম গুণ এসে তাঁদের বরণ করে এবং ক্রমে তাঁরা সর্ববিধ অভ্যুদয়ের ভাজন হয়ে থাকেন। তুমিও তাই হবে।

কর্কোটক বলল, রাজন, তোমার কোন পাপ নেই। তুমি বিষদাহে ছোট হয়ে গেছ, তা হও। সব অভিমান ত্যাগ করে এই ক্ষুদ্র দেহেই তুমি ঋতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করো। মানুষের বিপদের শেষ নেই।

'শান্তিলাভের জন্য ঋতুপর্ণের নিকট গমন করো। তাতেই সুখ পাবে।' নলকে এই কথা বলে মার্তণ্ডের মত তেজস্বী সর্পরাজ কর্কোটক অন্তর্হিত হলো। সজ্জন ব্যক্তিদের সরল ও কর্মকুশল মিত্র কোথায় না থাকে?

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নল প্রেমবশতঃ কর্কোটকপ্রদত্ত সেই বসনখানি গ্রহণ করলেন। নানা হিংস্রজন্তুতে পূর্ণ ও আত্মরক্ষার উপায়শূন্য সেই মহা অরণ্য হতে ঋতুপর্ণের নিকট গমন করলেন।

ঋতুপর্ণও পরম আহ্লাদসহকারে নলকে সারথির কার্যে নিযুক্ত করলেন। সারথি নল যখন রথ চালাতেন তখন রথের অশ্বগুলিও তারস্বরে শব্দ করতে করতে অতিদ্রুত ধাবিত হত।

এদিকে নল দময়ন্তীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর দময়ন্তীর সহসা নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলেন, কোথাও নল নেই। সেই অবস্থায় তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সুখশান্তিটুকুও তিরোহিত হলো। জীবন নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের আধার বলে মনে হতে লাগল।

একদিন যে রমণী পতির সঙ্গে কত প্রাসাদ ও উপবনে কত আনন্দরস পান করেছিলেন, কত রমণসম্ভোগে কাল কাটিয়েছিলেন, আজ সেই দময়ন্তী রামবিরহিতা সীতার মত গহন বনে একাকিনী অবসন্ন হয়ে পড়লেন। চিন্তা ও ভয় তাঁকে ঘিরে ধরল।

নল পরিত্যক্তা দময়ন্তী সেই বনের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বনের কোন স্থান বিষধর কালসর্পে পরিপূর্ণ কোথাও বা তরুরাজি ভ্রমরজালে আচ্ছন্ন এবং কোন স্থান বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও।

'হে রাজন, তুমি অসি, তূণীর প্রভৃতির সহায়ে শত্রুকুলের বিনাশ করে বন্ধুবান্ধবদের কত বিপদ হতে রক্ষা করতে, আর আজ সেই তুমি বনমধ্যে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করে কোথায় অন্তর্হিত হলে।' এই বলে দময়ন্তী সেই নির্জন বনে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর আর্তনাদ ও অঙ্গবিক্ষেপে মাথার কৃষ্ণবর্ণ বেণী ইতস্ততঃ দুলতে লাগল।

হে অনুপম, তুমি ত মানবধর্মশাস্ত্রানুগত সমস্ত রীতিনীতিতে পরম পণ্ডিত। এমন সুপণ্ডিত হয়ে তুমি কি করে গহনবনচারিণী নিরাশ্রয়া ও চিরদিন কুলমর্যাদারক্ষা ব্রতে দীক্ষিতা সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করলে?

হে স্বামী, আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার এই পরিত্যাগরূপ পাপ কলির প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘোর বিপদে তোমার কোন দোষই দেখছি না। এ সবই কলির কার্য।

দময়ন্তী নিজেকে বললেন, হে আমার আত্মা, যতক্ষণ তুমি

দেহত্যাগ না করছ তোমার মধ্যগত বিরহানলদগ্ধ আমার হৃদয়গত পতিদেবতা নল জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যবর্তী লৌহখণ্ডের মত কত অসহ্য কষ্টই না পাচ্ছেন। অতএব সত্বর তুমি আমাকে ত্যাগ করো।

হে কমনীয়, হে নিঃশঙ্কহৃদয়, হে সস্মিতবদন, তোমার আত্মীয়-স্বজনবৃন্দ তোমার রাজ্যে তোমাকে অধীশ্বররূপে পেয়ে সর্ববিধ সুখ-সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এমন সর্বজনপ্রিয় তুমি আজ কোন অজ্ঞাত কারণে অন্তর্হিত হয়েছ?

বিলাপরতা দময়ন্তী বনমধ্যচারী মৃগকে জিজ্ঞাসা করলেন কাঁদতে কাঁদতে, হে মৃগ, যাঁর অনন্ত কীর্তি স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালেও ধরে না, এত বিপুল যাঁর যশ, যে বীরশ্রেষ্ঠ নিমেষমধ্যে বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করতে পাবেন, বল কুরঙ্গ, আমার সেই হৃদয়স্থল এই পর্বতের কোন সানুদেশে বিরাজ করছেন?

হে অশোক, আমি তোমাকে প্রণাম করছি, আমার অর্চনা তুমি গ্রহণ করো। নারী এই সম্মান দান করার ফলে অকালে কুসুমোৎপত্তি হবে তোমার। তোমার সঙ্গে আমার চিরকালের যে প্রণয় জন্ম নিল তা স্মরণ করে তোমার প্রণয়াস্পদ এই নারীকে তোমার নামের সম্মান দাও অর্থাৎ তুমি নিজে যেমন অশোক বা শোকহীন তেমনি আমারও সকল শোক দূর করো।

সেই অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদারপ্রকৃতির দময়ন্তী এইভাবে উত্তুঙ্গ দেবদারুপরিপূর্ণ অরণ্যে বিলাপ করতে করতে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে লাগলেন। আর্তনাদ সহকারে ছুটতে ছুটতে নির্জন ও তৃণাদি-শূন্য এক শুষ্ক মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ভীমনন্দিনী দময়ন্তী সেই মরুপথে ভ্রমণ করতে করতে এক বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে মদনাতুর ছিন্নহৃদয় মৃগকুল সশব্দে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল এবং ব্যাধগণ চারদিকে বিচরণ করছিল। সেই বনের মধ্যে বিশালকায় অজগরসমূহ এখানে সেখানে পড়ে ছিল।

সজলনয়না উৎকণ্ঠিতহৃদয়া, শোভনাক্ষী ও সুন্দর নাসিকাবিশিষ্টা, রমণীকুলোত্তমা ভীমনন্দিনী, আর্তস্বরে কাঁদতে কাঁদতে যেমন এক ভীষণ

অজগরের সামনে পড়লেন, অমনি সেই কালভুজঙ্গ তাঁকে গ্রাস করে ফেলল।

তখন রিপুতেজোহারী দৃপ্ততেজা এক শবর দময়ন্তীর গ্রাসকারী সেই অজগরের মুখবিবরে অসিধার প্রবেশ করিয়ে তাকে আক্রমণ করল। অজগরের সেই অবস্থা দেখে সকলেই তাকে উপহাস করেছিল।

দুর্দৈব বশে একান্ত দুর্বলদেহা কৃশাঙ্গী দময়ন্তীকে সেই জনহীন কান্তারে একাকিনী পেয়ে কামার্ত কিরাত তাঁকে কামনা করল। নির্জনে কোন রূপসী নারীকে পেলে কোন্ কামান্ধ কামনা না করে?

সে বলল, দেখ কামিনী, এই দুর্গম বনমধ্যে উপস্থিত হয়ে আমি তোমার প্রাণাপহারী অজগরের মুখ হতে তোমাকে রক্ষা করেছি। আমার উপর প্রসন্ন হও। আমি তোমার শরণাগত হলাম। শরণাগত অধীনকে কে যত্ন না করে?

অয়ি শোভনমুখ শশাঙ্কসুন্দরী, আমাকে তোমার দাস বলে মনে করো।—কিরাতের এই ঘৃণ্য উক্তি শুনে ক্রোধে দময়ন্তী আগুন হয়ে উঠেছিল। সতী ভীমদুহিতা ক্রোধারুণ নেত্রে যেমন ঐ পাষণ্ড নিষাদের দিকে চেয়ে শাপ দিলেন, অমনি সে যেন পুড়তে পুড়তে মেদমাংসহীন দেহে মাটিতে পড়ে গেল।

কামান্ধ শত্রুকে এইভাবে ক্রোধানলে দগ্ধ করে সতী দময়ন্তী একবার আকাশচুম্বী সমুচ্চ বনস্পতির দিকে, একবার পার্শ্ববর্তী পর্বতের গুহার দিকে চাইতে চাইতে অন্য এক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাদচারিণী রাজমহিষী দময়ন্তী সেই জলবিন্দুশূন্য ও দাবানলমুক্ত পর্বতসঙ্কুল অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে বিলাপ করতে লাগলেন। হে অনন্ত দুঃখপূর্ণ, ক্লেশবহুল বন্ধু অন্তঃকরণ, আর কেন? সত্বর মরণকে বরণ করে সকল জ্বালা জুড়াও।

হে বৃক, তুমি ক্রোধের সঙ্গে ভীম বিক্রমে এসে আমাকে আক্রমণ করো। দূরে যেও না। আশীর্বাদ করি তোমার পত্নী লক্ষ্মীর মত হয়ে তোমার সঙ্গে ঘরসংসার করুক। নানা দুর্ভাগ্য বশে একান্ত দুর্গত, আমার নিষ্করুণ প্রিয়তমের বিহনে আমার আর কি সুখ!

হে রাক্ষস, আমার মেদ মাংস প্রভৃতি আস্বাদন করো। ক্ষুধায় কষ্ট পেও না, আমায় ভক্ষণ করো, আমি স্বেচ্ছায় আত্মদান করছি। হে দয়ার হৃদয়, দুঃখিনীকে দয়া করো।

হে সুখ সৌভাগ্যদায়ী ব্রাহ্মণ, আমার এই বিপদকে অনন্ত সমুদ্রের মত জেনো। হে দেবতাদের মঙ্গলকারী মহাদেব, আমাকে অভয় দান করো, ঘোর দুঃখের নিলয়স্বরূপ এই ভয় হতে আমাকে অন্তত দুএকটা আশ্বাসবচনেও রক্ষা করো।

হে নিষধপতি নল, তোমার পরম শত্রু পুষ্কর নির্ভয় হৃদয়ে অচলা লক্ষ্মীকে নিয়ে কত সুখসমৃদ্ধি ভোগ করছে। আর তুমি সকল বাসনা পরিহার করে অনন্ত দুঃখে পতিত হলে।

তরুণ ও ঘনিষ্ট মানবের দর্পহারী হে নিষধ রাজ্যেশ্বর! তুমি যখন শত্রুকুল সংহারে উদ্যত হবে, তখন তোমাকে দেখে অর্থাৎ তোমার সেই সংহারমূর্তি দর্শন করে দুর্নীতিপরায়ণ বিপক্ষগণ পলায়ন করবে। এমন শক্তিশালী তুমি একবার তোমার চরম ক্রোধানল উদ্গীরণ করো।

হে নীতি, সংযম ও সম্মান প্রাপ্ত বীর, তুমি যেকোন রাজ্যে গিয়ে বাস করবে সেখানে উন্মার্গগামী দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুগণ তোমারই প্রাদুর্ভাবে সত্বর বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

হে বাঞ্ছিতশ্রদ্ধ, ন্যায়পথভ্রষ্ট শত্রুগণের উচ্ছৃংখল মাতঙ্গসমূহের কবলে পতিত হয়ে যেন তোমার কোন বিপদ না ঘটে। তোমার অভিপ্রায়সাধনে সতত তৎপর হিতৈষীগণপূর্ণ স্বরাজ্যে ফিরে এস। কোথায় তুমি একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছ? এই বলে নীতিপরায়ণা ভীমদুহিতা বারবার বিলাপ করতে লাগলেন।

বিরহকাতরা ও নিরপরাধা সেই কৃশাঙ্গী দময়ন্তী ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সামনে দেখলেন, নানা মণিরত্ন নিয়ে একদল ধনী বণিক তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছে। তাদের দেখে নিরাশ্রয়া রাজকুমারী যেন অকূলে কূল পেলেন। তাঁর হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হলো।

একসঙ্গে এতগুলি লোক দেখে প্রথমে দময়ন্তী ভীত হয়ে পড়লেও এ সুযোগ তিনি ছাড়তে পারলেন না। কার্যসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ

অনুসন্ধানের জন্য ঐ বণিকগণের সঙ্গে যাওয়াই তিনি প্রকৃষ্ট বলে স্থির করলেন। কিন্তু সেই বণিকবৃন্দ, স্ত্রীলোক বলে তাঁকে সঙ্গে নিতে কিছুতেই রাজী না হলেও জলমধ্যবর্তিনী শফরী যেমন পরিবৃদ্ধ জলযুগলের সঙ্গে পা ভাসিয়ে চলে যায় তিনিও তেমনি ঐ বণিকগণের সঙ্গে চললেন।

ক্রমে দুর্গম পথে নানাবিধ কষ্টভোগ করে দময়ন্তী দুর্নীতিনিবারক মহারাজ সুবাহুর ধনধান্যপূর্ণ রাজধানীতে উপনীত হলেন। সুবাহুর যেমন প্রচুর ধনাগম ছিল, তেমনি তার অনুরূপ বহুবিধ সমৃদ্ধিতে সেই রাজধানী শোভা পাচ্ছিল।

পতিবিচ্ছেদ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দময়ন্তী। তিনি সুবাহুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হলে রাজমাতা পরম সমাদরে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর মনের সকল ত্রাস দূর হলো। নানা রাজভোগ তাঁকে দেওয়া হলেও কেবল শরীরধারণের জন্য যেটুকু গ্রহণ করা উচিত সেইটুকু গ্রহণ করে শোকাকুল হৃদয়ে বাস করতে লাগলেন তিনি।

একমাত্র নীতি ও ন্যায়পথ অবলম্বন করে সামান্য দুঃখিনী নারীর মত পায়ে হেঁটে অনেক বনপথ অতিক্রম করেছিলেন। এতদিনে এই রাজঅন্তঃপুরে এসে জীবনের ভয় আর তাঁর রইল না।

চতুর্থ সর্গ

মহারাজ ভীম সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতির উপায়গুলিতে এতই সুপণ্ডিত ছিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাজারা তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এইরকম জগদ্ব্যাপী প্রভাবে সমালঙ্কৃত ভীম নলের দুর্দশার কথা শুনে অনুচরবর্গের সঙ্গে পরিশ্রমসহকারে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

চিরকাল শত্রুর অসিধারার অস্পৃশ্য মহানুভব ভীমের আদেশে অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুর আদেশে শিষ্যের মত অতি যত্নে দিনরাত নলের খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে।

এরপর ঐ অন্বেষণকারী ব্রাহ্মণদের সুদেব নামে একজন ঘুরতে

ঘুরতে দময়ন্তী যে নগরে ছিলেন সে নগরে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্ধান পেলেন।

দময়ন্তী এবার পিতৃভবনে চলে গেলেন এবং সুদেবও দময়ন্তী-প্রাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ বহু ধন লাভ করল। দময়ন্তী পতিকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচুর চেষ্টা করতে লাগলেন।

নলের অন্বেষণকারীদের দময়ন্তী বলে দিলেন, তোমরা সব সময় এই কথা বলে তাঁর খোঁজ করবে। বলবে, হে আমার বস্ত্রখণ্ডের অপহারক, কোথায় তুমি? আমার এই দুর্দশা তোমার কীর্তির পরিচায়ক নয়। তোমার সেই চিরানুগত ব্যক্তি আমি তোমায় ডাকছি।

দময়ন্তীর আদেশমত নলের অন্বেষণকারীরা ছদ্মবেশে নানা পর্বত ও অরণ্য পার হয়ে সেই কথা সকলকে বলে বেড়াতে লাগল। তারা গরুড়ের মত দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই অন্বেষণকারীদের একজন এসে নীতিপথানুগামিনী দময়ন্তীকে বলল, দময়ন্তী, তোমার ভয়ের কারণ সত্বর তোমাকে ত্যাগ করবে। চৈতন্যসম্পন্ন লোকের পক্ষে সহ্য করা যা অসম্ভব তেমন কোন বেদনা তোমাকে আর কখনো সহ্য করতে হবে না।

অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের নিকট গিয়ে তোমার কথা আমি উচ্চ কণ্ঠে বলেছি। সেই লক্ষ্মীবান রাজা মন্ত্রীগণের সঙ্গে সব কথা শুনলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

কিন্তু দেখতে ছোট এবং হাত দুটি দীর্ঘ নয় এমন একটি লোক আমাদের দেখে পথিমধ্যে এসে নির্জনে চুপি চুপি যা বললেন তা বলছি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই লোকটি রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কাজ করে এবং তাঁরই ভবনে থাকে। রাজভবনে সে অনেক দুষ্কর কার্যও করতে পারে।

সে আমাদের বলল, দেখ, তোমরা সেই ধর্মানুরাগিণী দময়ন্তীকে বলবে, তিনি যেন কৃপা করে ক্রোধ না করেন। আজ তাঁর অভিলষিত ব্যক্তি কপর্দকশূন্য হয়ে বসনহীন ও যানবাহনহীন অবস্থায় পতিত হয়েছে। তার এই শোচনীয় অবস্থা তিনি যেন বিচার করে দেখেন।

সেই ব্যক্তির এই সত্য বচনে আমার শ্রম সার্থক হলো ভেবে আমি তোমার নিকট তা বলতে এসেছি।

এই কথা শুনে দময়ন্তী আনন্দিত হয়ে সংবাদদাতা ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন এবং পারিতোষিকস্বরূপ প্রচুর ধন দান করলেন।

এই সংবাদ পাওয়ার পর সেই সুদূর ও নানাসমৃদ্ধিপূর্ণ অযোধ্যা হতে গরুড়ের মত দ্রুতগতিতে একদিনে বহুদিনের পথ অতিক্রম করে ঋতুপর্ণের নিকটে কৃতজ্ঞতাঋণ শোধ করে ঋতুপর্ণকে নিয়ে নল যাতে সত্বর চলে আসেন তার জন্য পার্বতীর মত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। সেই সঙ্গে নিজ বুদ্ধিকৌশলেও কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন।

বুদ্ধিমতী দময়ন্তী নানা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে তাঁর বিশ্বাসভাজন এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে গোপনে রাজা ঋতুপর্ণকে বলে পাঠালেন, দময়ন্তী শীঘ্রই স্বয়ংবৃতা হবেন। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা শত বিপদে পড়েও কখনো ঘৃণিত পথ আশ্রয় করেন না, দময়ন্তীও তা করলেন না।

দময়ন্তীপ্রেরিত ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে গোপনে স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়ে রাজা ঋতুপর্ণ আনন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। কবচ, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি বীরোচিত ভূষণে ভূষিত হয়ে গোপনে নলকে বললেন, হে সাধু, আজকের দিনটা যেন বৃথা না যায়। আজ যেভাবেই হোক, দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে গিয়ে পেঁছিতে হবে। কেন না, যদি একবার দময়ন্তীকে লাভ করতে পারি, তবে রাজলক্ষ্মী চিরদিনের মত বাঁধা থাকবেন আমার ঘরে।

হে সারথি, সেই বধূ দময়ন্তী যেন সদগুণে আমাকে আবদ্ধ করেই আকর্ষণ করছেন। এ সংসারে তাঁর মত বধূ কার না চিত্ত হরণ করে? লোকমুখে শুনলাম কালই তাঁর স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠান হবে। তা হলে এখান হতে প্রায় শত যোজন দূরে সেই সভাস্হলে আজই গিয়ে উপস্হিত হওয়া দরকার।

রাজা ঋতুপর্ণ আরও বললেন, হে সারথি, রাত্রি এক প্রহর গত হবার আগেই তুমি যদি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার তাহলেই সভায় যোগদান করতে পারি। দময়ন্তীর কৌশলের কথা না জেনেই একথা বললেন ঋতুপর্ণ। তাঁর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। কামান্ধ ব্যক্তিরা কি

কালবিলম্ব সইতে পারে ?

যদি আমার সারথি অশ্বগুলিকে ভাল করে চালিত করে তাহলে দময়ন্তী কালই নিশ্চয় আমাকে ভজনা করবে এই ভেবে নিজের ধারণানুসারে দময়ন্তীলাভ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন ঋতুপর্ণ। ক্রমে চিত্তবিকারের অধীন হয়ে পড়লেন তিনি।

এরপর সারথি নল দ্রুতগামী, নানা অস্ত্রে পূর্ণ, বলিষ্ঠ তুরঙ্গযুক্ত ও অত্যন্ত শব্দকারী রথে আরোহণ করলেন এবং শত্রুকুলবিনাশী রাজা ঋতুপর্ণকেও তাতে চাপিয়ে যাত্রা করলেন।

রথ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মহারাজ ঋতুপর্ণের স্কন্ধস্হিত উত্তরীয় রথের বেগ হতে উদ্ধৃত বায়ুবশে হঠাৎ উড়ে গিয়ে এক অসনবৃক্ষে লেগে গেল। রাজা ফিরে দেখতে দেখতে পথ বহুদূর পার হয়ে গেল। রথের এই দ্রুত গতি দেখে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না রাজার।

নল প্রজাপতি দক্ষের মত তপঃসিদ্ধ ও অশ্বচালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা ঋতুপর্ণও দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ ও কলিবৃক্ষের ফলগণনায় পারদর্শী ছিলেন। তা দেখে নলের পরম আনন্দ হয়। তিনি তাই ভাবেন, এঁর নিকট আমি কলিদহন বিদ্যা শিখে নেব এবং তার পরিবর্তে এঁকে আমার অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়ে দেব।

নল এবং ঋতুপর্ণ উভয়েই পরম বীর। বাহুযুদ্ধে তাঁরা দুজনেই দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। প্রভূত ক্ষমতাশালী এই বীরদ্বয় পরস্পরের বিদ্যানৈপুণ্য দর্শনে বিস্মিত হয়ে সলিলস্পর্শ করে পরস্পরের বিদ্যাবিনিময় করলেন। ঋতুপর্ণকে নল অশ্ববিদ্যা এবং নলকে ঋতুপর্ণ কলিদহন বিদ্যা দান করলেন।

তারপর কলিদহনে নলের অতিশয় শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় তাঁকে ত্যাগ করে কলি গিয়ে এক বিশাল বৃক্ষেতে আশ্রয় করল। কিন্তু ঋতুপর্ণের নিকট হতে লব্ধ অক্ষবিদ্যাপ্রভাবে নল সেখানেও কলিকে তাড়া করলেন। তখন মহাবিপদে পড়ল কলি।

তখন কলি কোন উপায় না দেখে বলল, হে নল, তোমার হৃদয়মধ্য-

বার্তিনী দময়ন্তীর হুতাশনসম ক্রোধে পড়ে আমি মারা যেতে বসেছি। দুঃখের অনলে নিরন্তর পুড়ছি। নিরুপায় আমি তোমার শরণ নিলাম। আমাকে আশ্রয় দাও, রক্ষা করো।

কলি নত হয়ে পড়ায় মহাত্মা নল সেই নানামায়াধর ইন্দ্রজালনিপুণ কলিকে অব্যাহতি দিলেন। শত্রুগণের নতিস্বীকারে যিনি শত্রুত্ব বিস্মৃত হন তিনি অনন্ত যশের ভাজন হয়ে থাকেন।

পরম শত্রু কলি নলকে ছেড়ে গেলে মহাত্মা নল আশ্বস্ত হৃদয়ে অশ্বচালনা করতে লাগলেন। ঋতুপর্ণও অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করে গেলেন। নল মনে মনে ভাবতে লাগলেন হায় ঋতুপর্ণ কাল দেখছি, দময়ন্তী তোমার আর না হয়ে যাবে না। নলের হাসি পেল। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীকে পাবার জন্য ছুটছেন।

ক্রমে দিনের আলো কমে আসতে লাগল। এদিকে নিষ্পাপ, সজ্জনবল্লভ নলও ঋতুপর্ণকে নিয়ে সেই সমৃদ্ধিশালী প্রিয়তমা দময়ন্তীর নিবাসস্থলী কুণ্ডিনপুরীতে গিয়ে পেঁাছলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ উপস্থিত হলে রাজা ভীম বিনয়সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন এবং নানা প্রণয়সম্ভাষণ করে তাঁর আকাশচুম্বী প্রাসাদমধ্যে সাদরে নিয়ে গেলেন।

রাজা ভীমের প্রাসাদচত্বরে প্রবেশ করে রাজপুরীতে বহুলোকের দ্বারা শৃংখলার সঙ্গে অনুষ্ঠিত উৎসবাদি দেখে বিস্মিত হলেন ঋতুপর্ণ। ভীম রাজা হিসাবে কত অসীম সম্পদবিশিষ্ট এবং নিজে তাঁর তুলনায় কত নগণ্য তা ভেবে মনে মনে বড় ক্লেশ অনুভব করলেন।

কর্কোটক প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করে নলের মন শান্ত ও পবিত্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর আর সে মতিবিভ্রম ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন প্রাণসদৃশী ভীমনন্দিনী তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যই স্বয়ম্বররূপ ছল অবলম্বন করেছেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সুপরিকর ও মনোহর বাসগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন।

পরদিন স্বয়ম্বরসভার অনুষ্ঠান হলে নল দ্রুতবেগে রথচালনা করে সভাভিমুখেই আসছেন দেখে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন নল-

প্রিয়া দময়ন্তী। কত রকমের সুখসম্ভোগের কথা উদিত হলো তাঁর হৃদয়ে।

শত্রুকুলধ্বংসকারী, শোভনমুখপদ্মবিশিষ্ট ও সত্যপ্রিয় আমার প্রাণবল্লভ কিসের অভাবে ঋতুপর্ণের আবাসে অবস্থান করছেন, একথা ভেবে বড়ই বিষণ্ন হলেন দময়ন্তী এবং এক সখীকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই সখী নলের কাছে গিয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে তাঁর চিত্তবিনোদন করে দময়ন্তীর প্রাসাদে নিয়ে এল নলকে।

সুপরিচ্ছদধারী নল সেই কর্কোটকপ্রদত্ত বস্ত্র ধারণ করে কলিপ্রভাবজাত কদর্য আকৃতি পরিহার করলেন। দীর্ঘদিন পর আবার মিলন হলো উভয়ের। দময়ন্তী পূর্বাপর নলের প্রতি অবিচলিতচিত্ত ছিলেন। নল এবার রাজা ভীমের প্রাসাদেই দময়ন্তীর সঙ্গে পরম সুখে বাস করতে লাগলেন।

বহুদিন পর রাজা ভীমের প্রাসাদের একটি সুরম্য কক্ষে দময়ন্তীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে তাঁর শ্বশুর রাজা ভীমের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

শত্রুবিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ঋতুপর্ণ প্রভাতকালে নলকে নিজেরই মত শ্রীমান ও সৌন্দর্যশালী দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। সেই কদাকার সারথিই যে সুন্দরকান্তি রাজা নল তা দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁর। নলও হাসতে হাসতে নানা ধনরত্নের দ্বারা সম্মানিত করে বিদায় দিলেন ঋতুপর্ণকে।

দময়ন্তীর প্রবোধবাক্য এবং মধুর ব্যবহারে পূর্বের সব দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে ভীমের প্রাসাদে অসঙ্কোচে বাস করতে লাগলেন নল। নলের মুখচন্দ্র দর্শন করে বিচ্ছেদকাতর পুরবাসিনীদেরও সকল দুঃখকষ্ট দূর হয়ে গেল। এইভাবে একমাস কেটে গেল।

এরপর শত্রুবিজয়ী নল অস্ত্রসজ্জার দ্বারা সুসজ্জিত মহতী সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর রাজধানীতে গমন করে এক বিপুল সংগ্রামে রাজ্যাপহারী ভ্রাতা পুষ্করকে আহ্বান করলেন।

অর্থাৎ অনন্তশক্তি শঙ্কর আপনাদের মঙ্গল করুন।

নান্দীশেষে সূত্রধার প্রবেশ করল। সাজঘরের দিকে চেয়ে সূত্রধার বলল, ওগো নান্দি, তোমার সাজসজ্জা যদি হয়ে থাকে তাহলে এইদিকে এলে ভাল হয়।

সূত্রধারপত্নী সন্দিধ অমনি এসে উপস্থিত হয়ে বলল, আর্যপুত্র, এই ত আমি।

সূত্রধার। দেখ লক্ষ্মী, আজ এই রাজসভায় যত সব সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত হয়েছেন। আজ আমরা কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নামক একখানি নূতন নাটকঅভিনয়ের দ্বারা সমাগত পণ্ডিতদের সেবা করব। সুতরাং আমাদের বিশেষ সাবধান হতে হবে। প্রত্যেক অভিনেতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। অভিনয়কালে কুশীলবগণ যাতে বিশেষ অভিনিবেশসহকারে অভিনয় করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

নটি। তুমি অভিনয়কার্যে যেমন সুদক্ষ এবং আজকের অভিনয়ের জন্য যে ধরনের যোগাড়যন্ত্র করেছ তাতে কোন ব্যাপারে কোন ত্রুটি হবে বলে ত মনে হচ্ছে না।

সূত্রধার। তা নয়। ত্রুটি না হওয়া বা অভিনয়কার্যে যে দক্ষতার কথা তুমি বলছ সেসব বিষয়ে গর্ব করবার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতরা তৃপ্ত না হবেন, আমাদের অভিনয় দর্শনে তাঁরা আনন্দ না পাবেন, ততক্ষণ আমরা যত নিপুণই হই না কেন, আমার মতে আমাদের সে নৈপুণ্যের কোন মূল্যই নেই। যিনি যতবড় শিক্ষিতই হোন না কেন, নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারেন না।

নটি। তা ঠিক, এখন কি করতে হবে আদেশ করো।

সূত্রধার। এতবড় রাজসভা যে শিক্ষিত সামাজিকে পরিপূর্ণ তাঁদের পরিতৃপ্তি সম্পাদন ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বল। তাই আমার ইচ্ছা, এই সবে পরম উপভোগের যোগ্য যে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হচ্ছ সেই কালের অনুকূল তুমি একটা গান করো। (নটির গান)

এই সময় দিনের বেলায় তাপ খুব প্রখর হলেও একবার জলে অবগাহন করলে এতই আরাম বোধ হয় যে গ্রীষ্মের সব তাপ সব গ্লানি দূর হয়ে যায় মুহূর্তে। তার উপর পারুল ফুলের সুগন্ধ গায়ে মেখে কেমন মৃদুমন্দ বনবাতাস বইছে। যে কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় গিয়ে বসলেই ঘুমে দুচোখ ভরে আসে। যতই দিনের শেষ ঘনিয়ে আসে ততই তার রমণীয়তা বেড়ে যায়।

শিরীষ ফুলের কেশরগুলি এত কোমল যে ভ্রমরেরা কত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাদের চুম্বন করছে। একটু জোর করলেই কেশরগুলি হয়ত মুষড়ে পড়বে, এই তাদের ভয়। বিলাসিনীরা কত আস্তে আস্তে সুকুমার শিরীষফুল তুলে তাদের কানের অবতংস করছে। পাছে সামান্য একটু টান লাগলেই কেশর ঝরে যায়, এই ভয়ে তারা ধীরে ধীরে কানে পরছে।

সূত্রধার। প্রিয়ে, কি সুন্দর গান। চেয়ে দেখ, অভিনয়দর্শনাথী সামাজিকদের চিত্ত তোমার সঙ্গীতের মাধুর্যে এমনই আকৃষ্ট হয়েছে যে কারো মধ্যে কোন নড়াচড়া নেই, সব চুপচাপ নিস্পন্দ। সমগ্র রঙ্গভূমি যেন একখানি পটে চিত্রিত ছবি। এখন বল ত, কোন নাটক অভিনয় করে এঁদের সেবা করি?

নটি। এই প্রথমেই ত তুমি বললে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নামক এক অতি অপূর্ব নাটক আজ অভিনয় করতে হবে। তবে আবার কোন নাটক অভিনয় করবে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

সূত্রধার। আর্যে, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ, আমি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম। যদি বল কেন? তবে শোন।

ঐ অতিবেগবান হরিণটা যেমন ঐ রাজা দুষ্মন্তকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি তোমার এই গীতিমাধুর্যে আমার চিত্ত এতই বিমোহিত হয়েছে যে পূর্বের কথা আর আমার মনে কিছুই নেই। সব ভুলে গেছি। (উভয়ের প্রস্থান)

পলায়মান অনুসরণরত অবস্থায় রথারোহণে রাজা ও সারথির প্রবেশ। সারথি একবার বাণ ক্ষেপণোদ্যত রাজার দিকে ও ...ন

পলায়মান মৃগের দিকে তাকাল।

সারথি। হে দীর্ঘজীবী, ধনুকে ছিলা পরিয়ে আপনি বাণ নিক্ষেপ করার জন্য ছুটছেন আর ঐ মৃগ পুরোভাগে প্রাণভয়ে ছুটছে। তা দেখে আমার দক্ষযজ্ঞের কথা মনে পড়ছে। আমি যেন দেখছি, প্রজাপতি দক্ষ প্রাণভয়ে ভীত মৃগরূপ ধারণ করে দৌড়াচ্ছে আর সতীবিনাশে ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব রুদ্রমূর্তিতে পিনাক উত্তোলন করে তাঁর পিছন পিছন ছুটছেন।

রাজা। সারথি, ঐ চিত্রমৃগটি আমাদের বহুদূর টেনে এনেছে। তার অবস্থাটা একবার দেখ, কি সুন্দর দেখতে। আগে আগে হরিণটা ছুটছে আর আমাদের রথ পিছু পিছু তাড়া করছে। প্রাণভয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে একদৃষ্টে রথের দিকে চেয়ে আছে। চোখে একটা পালকও নেই। মুখ ফিরিয়ে দৌড়ানোতে দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। পাছে পিছন দিকে বাণটা লাগে এই ভয়ে দেহের পিছন দিকের খানিকটা পেটের নীচু দিয়ে দেহের সম্মুখভাগের মধ্যে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে। পরিশ্রমে কাতর হওয়ায় তার মুখটা ফাঁক হয়ে গেছে। হাঁ করে ছুটতে থাকায় যে ঘাসগুলি চিবাচ্ছিল, সবে খেতে শুরু করেছিল সেই অর্ধ-চর্বিত ঘাসগুলি মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। এত বেগে ছুটছে যে মনে হচ্ছে শূন্যে ছুটছে, মাটিতে পা পড়ছে না।

আমরা এত বেগে অনুসরণ করলেও হরিণটা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে তাকে আর ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না।

সারথি। দীর্ঘজীবন, এ স্থানটা বড়ই বন্ধুর—উঁচু নীচু। তাই আমি ঘোড়ার রাশ একটু টেনে ধরেছি এবং সেই কারণেই মৃগ ও আমাদের এত ব্যবধান মনে হচ্ছে। এখন আপনি সমতল ক্ষেত্রে এসে পড়েছেন। সুতরাং আর ঐ মৃগ পালাতে পারবে না। সমতলভূমিতে আমাদের রথের বেগের সঙ্গে মৃগ ছুটে পারবে কেন?

রাজা। তাহলে সমতলভূমিতে যদি এসে থাকি তবে এবার ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দাও। ঘোড়াগুলি প্রাণপণে ছুটুক।

সারথি। যে আজ্ঞা। (বলে সারথি রাশ ছেড়ে দিল এবং ঘোড়া-গুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তখন রথের বেগ দেখে সারথি বলল)

রাজন, দেখুন দেখুন, আপনার অশ্বসমূহের কি ক্ষিপ্র গতি! রাশ ছেড়ে দেওয়ায় অশ্বগুলি প্রাণপণে ছুটছে। তাদের দেহের পূর্বার্ধ কেমন যেন দীর্ঘ বা লম্বা হয়েছে এবং কর্ণসজ্জার জন্য কর্ণমূলে সংবদ্ধ ছোট ছোট চামরগুলির অর্ধভাগ অর্থাৎ ঘাড়ের লম্বমান রোমাবলী কেমন নিশ্চল শঙ্কিত সজারু-পৃষ্ঠের কাঁটার মত সোজা হয়ে রয়েছে। কি বেগেই না দৌড়াচ্ছে! তাদের নিজেদের ক্ষুরের আঘাতে সমুত্থিত ধূলিও তাদের আগে যেতে পারছে না। অনুকূল বাতাসে ধূলিরাশি উড়লেও তারা যেন বাতাসকে হার মানাচ্ছে। মনে হচ্ছে পলায়মান মৃগের দ্রুতগমন দেখে ঈর্ষাবশে তারা দ্রুততর বেগে ছুটছে।

রাজা। তাই ত, এ যে দেখছি আমার অশ্বগুলি বেগে সূর্য ও ইন্দ্র—উভয়ের অশ্বকেই ছাড়িয়ে গেল। দেখছ না সারথি, কি দুরন্ত বেগে রথ ছুটছে। এইমাত্র যে বস্তুটা দূরে খুব সরু দেখছিলাম, দেখতে দেখতে তারা কত বড় হয়ে যাচ্ছে। কত বড় মোটা দেখাচ্ছে। আবার যে সব বস্তুগুলির মধ্যে সত্যি সত্যিই ফাঁক ছিল, হঠাৎ সেগুলোকে মনে হচ্ছে সব জোড়া লেগে গেছে।

বাঁকা বস্তুগুলিকে চোখের সামনে সোজা মনে হচ্ছে। এত বেগে রথ ছুটছে যে পাশে বা দূরে বলে কিছুই মনে হচ্ছে না। আগে যেটা দূরে ছিল, একনিমেষে তাকে কাছে এবং যা কাছে ছিল তাকে দূরে দেখছি। সত্যিই কি আশ্চর্য!

সারথি। এই দেখ, একে মারলাম বলে বাণ যোজনা করতে সহসা নেপথ্য থেকে কে বলে উঠল, ওহে রাজন, এটি আশ্রমের মৃগ, একে হনন করা উচিত নয়।

সারথি। (শুনে ও দেখে) মহারাজ, আপনার ও আপনার শরপথে অবস্থিত কৃষ্ণসারের মাঝখানে কয়েকজন তপস্বী এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা। (অতি ব্যস্ততার সঙ্গে) তাহলে রথের অশ্বগুলিকে থামাও।

সারথি। আচ্ছা। (রথ থামাল)

শিষ্যের সঙ্গে একজন তপস্বীর প্রবেশ

বৈখানস। (হাত তুলে) রাজন, এটি আশ্রমের মৃগ, একে বধ করা উচিত নয়। এই অতিকোমল মৃগের দেহে আপনার ভয়ঙ্কর অস্ত্র কখনো নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়। রাশিকৃত তুলার মধ্যে একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়লে তার যে অবস্থা হয় ঐ বাণের আঘাতে এই নিরীহ প্রাণীরও সেই অবস্থা হবে। নিমেষমধ্যে মরে যাবে। একবার ভেবে দেখুন ত, এইসব নিরপরাধ হরিণের জীবন কত ভঙ্গুর এবং একটি বাণের আঘাতে তা কত বিপন্ন হতে পারে। ওদের কোমল জীবন আর আপনার বজ্রের মত কঠিন, সুতীক্ষ্ম বাণ—এদের মধ্যে কত প্রভেদ। এই দেহ বাণের যোগ্য? সুতরাং আপনার ঐ সংহিত বাণ যা ধনুকের ছিলায় যোজনা করেছেন তা খুলে নিন। আপনারা ক্ষত্রিয়, আপনাদের অস্ত্র বিপন্নকে রক্ষার জন্য, নিরীহ নিরপরাধকে মারবার জন্য নয়।

রাজা। এই বাণ খুলে নিলাম। (বাণ খুলে নিলেন)

বৈখানস। মহারাজ, আপনি পুরুকুলের প্রদীপ, অবতংসস্বরূপ। সুতরাং আপনার এই কার্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আজ্ঞামাত্র বাণের প্রতিসংহার করা আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে খুবই উপযুক্ত হয়েছে। আপনি যেমন সুশীল ও বিনয়ভূষিত, এইরূপ একটি গুণবান চক্রবর্তী পুত্রলাভ করুন এই আশীর্বাদ আমি করছি।

রাজা। (প্রণাম করে) আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম।

বৈখানস। রাজন, আমরা এখন সমিধ সংগ্রহের জন্য চলেছি। এই মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কাশ্যপ ঋষির আশ্রম দেখা যাচ্ছে। যদি কোন বিশেষ কাজের ক্ষতি না হয় তাহলে এই আশ্রমে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করুন। তাছাড়া ওখানে গেলে বুঝতে পারবেন, তপস্যাই যাদের একমাত্র ধন, সেই ঋষিদের সর্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ বেদ-বোধিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা পরম রমণীয় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড কেমন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ আশ্রমের ত্রিসীমানাতেও আসতে পারে না। ঐ সব দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার ধনুর্বাণধারী হস্ত কি পরিমাণে ঋষিদের রক্ষা করছে। হে রাজন, আপনার নিরন্তর পরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করে আপনি নিঃসন্দেহে

আনন্দিত হবেন।

রাজা। কুলপতি কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন ?

বৈখানস। সম্প্রতি তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়ে তাঁরই দুরদৃষ্ট শান্তির জন্য সোমতীর্থে গমন করেছেন।

রাজা। বেশ, তাঁকেই আমি দর্শন করব। তাহলেই কুলপতির প্রতি আমার ভক্তি যে কত প্রগাঢ় তা তিনি বুঝতে পরবেন। তিনিই তা মহর্ষিকে জানাবেন।

বৈখানস। তবে আমরা বিদায় নিই। আপনি আশ্রমে যান। (শিষ্যসহ বৈখানসের প্রস্থান)

রাজা। সারথি, অশ্বচালনা করো। চল যাই, পবিত্র আশ্রম দর্শন করে আত্মা পবিত্র করি।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ। (সারথি রথ চালাতে লাগল)

রাজা। (চারদিকে তাকিয়ে) সারথি, কেউ বলে না দিলেও এটা যে ঋষিদের আশ্রম তা বেশ বুঝতে পারছি।

সারথি। কি করে বুঝলেন ?

রাজা। কেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ? ঐ দেখ, তরুতলে কত তৃণধান্য পড়ে আছে। ঐ সকল তরুর মধ্যে যে সব শুকপক্ষী বাস করে, তাদের মুখ হতে ঐ ধানের শীষগুলি নীচে পড়ে গেছে। ঋষিরা শিলোহতবৃত্তি। তাঁদের সংগৃহীত নীবার বা ধান্যের দুচারটে শীষ শুকপক্ষীরা মুখে করে বাসায় নিয়ে আসে এবং কোটরে বসে খায়। কোটরে ঢোকার সময় ও খাওয়ার সময় কিছু কিছু নীচে পড়ে যায়। আবার ঐ দিকে দেখ, পাথরগুলি কেমন তেলের মত চকচকে। নিশ্চয় তার উপর ইঙ্গুদী ফল থেঁতো করে তেল বার করা হয়েছে। তা না হলে অত তৈলাক্ত হবে কেন ? ঋষিরা ইঙ্গুদী তেল ছাড়া আর কোন তেল মাখেন না। আবার ঐ দিকে দেখ, এখানে কোন ভয় নেই, আমাদের কেউ মারবে না, এই বিশ্বাসে হরিণগুলি কেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রথের শব্দ শুনছে। পালাচ্ছে না এদিকে ওদিকে। ওদিকে জলাশয়ের পথের দিকে চেয়ে দেখ, যে সব তরুত্বকের বন্ধনে ঋষিরা দেহ

আবৃত করেন, গমনরত ঋষিদের বল্কলের প্রান্তভাগ হতে ক্ষরিত জলধারায় পথগুলিতে কেমন রেখা পড়েছে।

সারথি। হ্যাঁ সবই ঠিক।

রাজা। (একটু এগিয়ে গিয়ে) আশ্রমবাসীদের কোন বিরক্তির কারণ বা বাধাবিঘ্ন যাতে না জন্মে তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। সুতরাং এইখানেই রথ থামাও। আমি নামি।

সারথি। আমি রথ টেনে ধরেছি, আপনি নামুন।

রাজা। (নেমে) সারথি, তপোবনে কোন জাঁকজমকের দরকার নেই। খুব নম্রভাবে ও অনুদ্ধত পরিচ্ছদে প্রবেশ করাই ঠিক। সুতরাং এইগুলি তুমি ধর। (সারথিকে রাজা তাঁর আভরণ ও ধনু প্রভৃতি দিলেন ও বললেন) সারথি, আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের দেখে ও সম্মান প্রদর্শন করে ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি অশ্বগুলির পিঠ ধুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।

সারথি। যে আজ্ঞা। (রাজা চলে গেলেন)

রাজা। (কিছুটা গিয়ে ও দেখে) এই ত আশ্রম প্রবেশের দ্বার, এখন ভিতরে যাই। (প্রবেশমাত্র একটা শুভলক্ষণ অনুভব করে) একি, এই আশ্রম ত শমগুণপ্রধান, অথচ আমার বাহু স্পন্দিত হচ্ছে কেন? এরূপ সমগুণপ্রধান স্থানে দক্ষিণ বাহুস্পন্দনের ফলে আমার মত ক্ষত্রিয়ের পরিণয় সম্ভাবনা কোথায়? অথবা যা হবার তার উপায় বুঝি সব জায়গাতেই ঘটে থাকে।

(নেপথ্য হতে কে যেন বলল, এইদিকে, এইদিকে সখীগণ।)

রাজা। (কানপেতে শুনে) ওকি, দক্ষিণ দিকের উদ্যানে যেন কাদের আলাপ শোনা যাচ্ছে। তবে ঐ দিকেই যাই। (এগিয়ে দেখে) এ যে দেখছি, কয়েকজন তাপসদুহিতা ছোট ছোট জলসেচনের কলস নিয়ে কচি কচি গাছগুলিতে জল দেবার জন্য এই দিকেই আসছে। আহা কি সুন্দর! চোখ জুড়িয়ে যায়। রাজঅন্তঃপুরেও ত এমন রূপ, এমন ললিত কলেবর দেখা যায় না। যদি সত্য সত্যই এরা আশ্রমবাসিনী ও তাপসদুহিতা হন, তবে দেখছি অযত্নবর্ধিতা বনলতার নিকট সযত্নরক্ষিতা

উপবনলতার পরাজয় ঘটল। আচ্ছা, এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু দেখি।

(জলসেচনোদ্যতা শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

শকুন্তলা। এদিকে এস সখীরা।

অনসূয়া। ওগো শকুন্তলা, আমার মনে হয়, তাত কাশ্যপের তুমি যতটা প্রিয়, আশ্রমের এই ছোট ছোট গাছগুলি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়। তা যদি না হবে, তবে নবমালিকা ফুলের মত তুমি কোমল, অথচ তোমাকে দিয়ে এই গাছের গোড়ায় তিনি জল ঢালছেন। এত কষ্টের কাজে লাগিয়েছেন।

শকুন্তলা। শুধু পিতা ভার দিয়েছেন বলেই যে জল ঢালছি তা নয়, এই গাছগুলির উপর আমারও ভ্রাতৃস্নেহ আছে। ভাইএর মত ওদের দেখি।

রাজা। এই কি সেই কণ্বদুহিতা? তা যদি হয় তবে দেখছি পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব ঘোর অবিবেচক। এমন মেয়েকেও কি এত কঠোর কৃচ্ছ্র ও কষ্টকর কার্যে নিযুক্ত করতে আছে? এই নিসর্গসুন্দর ও কোমলকান্ত কলেবরকে যিনি দুষ্কর তপস্যার যোগ্য করতে অভিলাষ করেন তিনি অতিকোমল নীল কমলের পাপড়ির ঘায়ে শমীবৃক্ষের কঠিন শাখা ছেদন করার প্রয়াস পেতে পারেন। আচ্ছা, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যথেচ্ছবিহারিণী শকুন্তলাকে কিছুক্ষণ দেখি। (তাই করলেন)

শকুন্তলা। সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আমার বাকলটা এত শক্ত করে পরিয়ে দিয়েছে যে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বাকলের গ্রন্থিটা একটু শিথিল বা আলগা করে দাও।

অনসূয়া। দিচ্ছি। (আলগা করে দিল)

প্রিয়ংবদা। আমার পরানোর দোষ নাই। আসলে দোষটা তোমার যৌবনের। যে যৌবন পলে পলে তোমার পয়োধর যুগলকে বিস্তৃত ও স্ফীত করে তুলছে তাকে দোষ দাও না কেন? তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

রাজা। মহর্ষির কি কোন বিবেচনা নেই? তিনি এমন শরীরে বন্ধন পরিয়েছেন কেন? এই বয়সে এই পরিধেয় যৌবনের ঘোর প্রতিকূল। কি আশ্চর্য! কিন্তু দেহের রূপ ও যৌবনের গুণে অমন

বিশ্রী পরিধেয়েও সুন্দর মানিয়ে গেছে প্রফুল্লকমল নৈশকালযোগেও সুন্দর দেখায়, পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন কলঙ্কযুক্ত হলেও কত শোভা বিস্তার করে, তেমনি এই কৃশাঙ্গী ও অপূর্ব সুন্দরী শকুন্তলা কঠিন বল্কল পরিধান করেও কত মনোহারিণী হয়েছে। অথবা যাদের আকার স্বভাবতই সুন্দর, তারা যা পরে, যা করে সবই সুন্দর দেখায়। সব বেশভূষাই তাদের অলঙ্কারের কার্য করে।

শকুন্তলা। সখী, দেখ দেখ, সমীরণভরে ঐ নবীন বকুলবৃক্ষের নবপল্লব ঈষদান্দোলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে, যেন বকুল অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় ডাকছে, সুতরাং ওর অনুরোধ শুনি। (অগ্রসর হলেন)

প্রিয়ংবদা। ওগো শকুন্তলা, ঐখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াও। তুমি ওর কাছে যাওয়ায় মনে হচ্ছে ঐ নবীন বকুলভরা যেন লতার সঙ্গে সমাগত হলো।

শকুন্তলা। সখী, এত মিষ্টি কথা বল বলেই তোমাকে সবাই প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা। প্রিয়ংবদা দেখছি প্রিয় হলেও সত্য কথাই বলেছে। তার কথা প্রিয় এবং মিষ্ট হলেও বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন না, শকুন্তলার অধর নবোদ্গত পল্লবের অরুণিমায় সুশোভিত এবং বাহুদ্বয় অচিরজাত বিটপের মত সুন্দর। আর তার যৌবন বিকশিত কুসুমরাশির মত তার আপাদমস্তক ছেয়ে আছে। সুতরাং কুসুমিত লতার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করে প্রিয়ংবদা ঠিকই করেছে।

অনসূয়া। ও শকুন্তলা, তুমি যে নবমালিকার নাম রেখেছিলে বনজ্যোৎস্না। ঐ দেখ, সে কেমন স্বয়ম্বরা হয়েছে, নিজেই গিয়ে সহকারতরুকে আশ্রয় করেছে। তুমি কি একে ভুলে গেলে ?

শকুন্তলা। একে যেদিন ভুলব সেদিন নিজেকেও ভুলব। (লতার নিকট গেল) ও অনসূয়া, দেখ, এদের দুজনেরই কি সুন্দর সময়, পরস্পরের কি রমণীয় সমাগমকাল উপস্থিত। বিকশিত নবকুসুমরূপ যৌবনে বনজ্যোৎস্না-লতিকা যেমন সুশোভিত, অচিরোদ্গত কিশলয়ে সহকারতরুও তেমনি মনোহর। বনজ্যোৎস্নার পক্ষে ঐ সহকার সত্যই

উপভোগের যোগ্য। (সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)

প্রিয়ংবদা। অনসূয়া, কি জন্য শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নার দিকে একমনে চেয়ে থাকে তা কি জান ?

অনসূয়া। না ভাই, কেন বলত ?

প্রিয়ংবদা। ও ভাবে, ঐ বনজ্যোৎস্না যেমন তার মনের মত তরুর সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে আমিও কি তেমনি আমার মনোমত বর লাভ করতে পারব ?

শকুন্তলা। এটা তোমার নিজের মনের কথা। (এই বলে তরুদের মূলে জল ঢালতে লাগলেন)

রাজা। আচ্ছা, এই শকুন্তলা কি মহর্ষি কণ্বের অসবর্ণা পত্নীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর ভার্যার গর্ভসম্ভূতা ? কিন্তু এখন আর এ সংশয় কেন ? জীবনে কখনো কোন সদাচারবিগর্হিত কার্য আমি করিনি। আমার অপাপবিদ্ধ মন যখন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তখন নিশ্চয় ইনি আমার মত ক্ষত্রিয়জনের পরিণয়যোগ্য। কোন বস্তু গ্রাহ্য, কোন বস্তু অগ্রাহ্য, তার ত প্রমাণের প্রয়োজন নেই। যাঁরা সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁদের অন্তঃকরণই সেক্ষেত্রে প্রধান প্রমাণ। তবু ভাল করে একে জানা দরকার।

শকুন্তলা। (অতি ব্যস্তভাবে) ও অনসূয়া, ও প্রিয়ংবদা, ঐ দেখ, নবমালিকায় জল ঢালায় তা হতে একটা ভ্রমর উড়ে আমার মুখের দিকে আসছে। (ভ্রমরকে বাধা দান)

রাজা। হে ভ্রমর, সার্থক তোমার জীবন। এই তাপসদুহিতা আমার মত ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্য কি না জানার জন্যই আমি ব্যাকুল। আর তুমি ওকে যথেচ্ছ ভোগ করে নিচ্ছ। একবার শকুন্তলার চঞ্চল অপাঙ্গশোভিত ও কম্পিত নয়নে বারবার স্পর্শ করছ, আবার কখনো অতিগোপনভাষী মনের মানুষের মত তার কানের কাছে গিয়ে কি মর্মের কথা বলছ গুনগুন স্বরে। কখনো বা ধরাতলে সকল সুখসম্ভোগের সার তার সুকোমল অধরসুধা পান করছ। শকুন্তলা দুই হাতে বাধা দিয়েও ঠেকাতে পারছে না তোমাকে। ধন্য তুমি !

শকুন্তলা। এই অসভ্য ভ্রমরটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ঠিক আছে,

আমি অন্য দিকে যাচ্ছি। (একপা পিছন দিকে গিয়ে) এযে দেখছি এদিকেও আসছে। সখীরা কোথায়? তোমরা আমাকে বাঁচাও। এই দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় মেরে ফেললে। ওর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো।

সখীরা উভয়ে। (সস্মিতমুখে) আমরা রক্ষা করবার কে? জান না, তপোবনে রাজার অধিকার, তিনি এর রক্ষাকর্তা? দুষ্মন্তকে ডাক।

রাজা। (মনে মনে) আত্মপ্রকাশের এই ত সুযোগ। ভয় নেই, ভয় নেই। এই ভাবের ব্যবহারে আমি যে রাজা তা ধরা পড়বে। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা যাক।

শকুন্তলা। (পিছন ফিরে দেখে) একি, এদিকেও আমায় তাড়া করছে?

রাজা। (ব্যস্তভাবে কাছে গিয়ে) অসভ্য ও দুর্বিনীতদের উপযুক্ত শাস্তিদাতা পুরুবংশীয় রাজা এখনো পৃথিবী শাসন করছেন। এমন সময়ে মধুর প্রকৃতি ও সরলা তাপসদুহিতাদের উপর কে অবিনয় প্রকাশ করছে? কার এত সাহস?

(তিনজনেই রাজাকে দেখে বিব্রত হয়ে পড়ল)

অনসূয়া। না মশাই, বিশেষ অনিষ্ট ঘটেনি। একটা ভ্রমর কোথা হতে এসে আমাদের এই প্রিয়সখীকে অত্যন্ত আকুল করে তুলেছিল, তাতেই সে বড় কাতর হয়ে পড়েছে। (শকুন্তলাকে দেখাল)

রাজা। (শকুন্তলার দিকে ফিরে) তপস্যা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে ত?

(শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নত করে রইল)

অনসূয়া। (শকুন্তলা রাজার কথার জবাব না দেওয়ায়) হ্যাঁ বিশিষ্ট অতিথির সমাগমলাভে এতদিনে তপস্যা সুসম্পন্ন হলো—বলতেই হবে। শকুন্তলা, শীঘ্র যাও, পর্ণশালা হতে কিছু ফল ও অর্ঘ্যপাত্র তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। এই কলসের জলেই পা ধোয়ার কাজ চলবে। জল আর আনতে হবে না।

রাজা। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মধুমাখা কথার

দ্বারাই অতিথিসৎকার সুসম্পন্ন হয়েছে।

প্রিয়ংবদা। বেশ, তাহলে মশাই, এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে কিছুক্ষণ বসে শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও ত জলসেচনকার্যের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দেখছি।

অনসূয়া। ওগো শকুন্তলা, অতিথির অনুরোধ রাখা কর্তব্য। এস, আমরাও বসি। (সকলে বসল)

শকুন্তলা। (আত্মগতভাবে) কেন এই অতিথিকে দেখার পর থেকেই কি যেন একটা ভাব উদিত হচ্ছে আমার মনে। এ ভাব ত তপোবনের অনুকূল নয়। বরং ঘোর বিরুদ্ধ। একি ?

রাজা। (সকলকে ভাল করে দেখে) বাঃ তোমাদের তিনজনেরই যেমন সমান বয়স, তেমনি সমান রূপ। তাই তোমাদের প্রণয় এত মধুর মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া, কে এই ব্যক্তি ? যেমন সৌম্য-মূর্তি তেমনি গম্ভীর ভাব। যেন কত প্রভাবসম্পন্ন পুরুষ। কোন পরিচয় নেই, তবু মধুর আলাপে চিরপরিচিত বন্ধুর মত মনে হচ্ছে।

অনসূয়া। সখী, আমারও জানতে খুব ইচ্ছা করছে। (প্রকাশ্যে) মশাই, আপনার সুমধুর কথাবার্তায় কেমন একটা অসংকোচের ভাব জন্মেছে। তাই দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কোন রাজর্ষি বংশের আপনি অলঙ্কার ? কোন দেশের অধিবাসীদের বিরহসাগরে ডুবিয়ে আপনি চলে এসেছেন এবং কি জন্যই বা আপনি এমন সুকুমার হয়েও আপনি এত কষ্টকর তপোবন পর্যটনের পরিশ্রম স্বীকার করেছেন ?

শকুন্তলা। (আত্মগত) হৃদয়, অত উতলা হয়ো না। তুমি যা জানতে চাইছ অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা করছে।

রাজা। (আত্মগত) এখন কি করেই বা আত্মপরিচয় দিই আর কি করেই বা আত্মগোপন করি ? একটু ঘুরিয়েই বলি না কেন। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে, আমি পুরুবংশীয় রাজার দ্বারা বিচারকার্যে নিযুক্ত আছি। তপোবনের কাজকর্ম ঠিকমত সুসম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা জানবার জন্যই

এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি।

অনসূয়া। তবে দেখছি, তপস্বীরা এতদিনে স-নাথ হলো। অর্থাৎ তারা আর নিরাশ্রয় নয়। আপনার মত মহাপুরুষ যখন তাদের আশ্রয়, তখন তা পরম সৌভাগ্যের কথা।

(অনসূয়ার স-নাথ অর্থাৎ নাথযুক্ত এই উক্তিতে শকুন্তলা হৃদয়ের প্রেমানুভূতি চেপে রাখতে পারল না। লজ্জায় যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল। রাজারও আকার প্রকারে কিছুটা ভাবান্তর ঘটল। শকুন্তলা আর রাজার এই চিত্তচাঞ্চল্য দেখে সখীদুজন জনান্তিকে বলল)

সখীদ্বয়। ওগো শকুন্তলা, যদি আজ এখানে পিতা উপস্থিত থাকতেন ?

শকুন্তলা। থাকলে কি হত ?

সখীদ্বয়। কি হত শুনবে ? আজ তিনি তাঁর জীবনসর্বস্ব দিয়েও এই অতিথিপ্রবরকে পরিতৃপ্ত করতেন।

শকুন্তলা। দূর হও। মনে মনে কি যেন একটা মতলব এঁটে কথা বলছ তোমরা। তোমাদের কথা শুনতে চাই না।

রাজা। আমিও তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু একটা কথা জানতে চাই।

সখীদ্বয়। মশাই, আপনার এই অভিলাষ আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি যে কিছু জানতে চাইছেন, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি।

রাজা। শুনেছি, ভগবান কাশ্যপ আজন্ম ব্রহ্মচারী, ধর্মানুষ্ঠানে ও ব্রহ্মচিন্তায় নিরন্তর রত। তিনি দ্বারপরিগ্রহ করেননি। অথচ এই সখী তাঁর দুহিতা, এটা কিকরে সম্ভবপর ?

অনসূয়া। শুনুন তাহলে। রাজা কুশিকের পুত্র কৌশিক এই কুলনামে প্রসিদ্ধ এক অতি মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষির নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন।

রাজা। হ্যাঁ, শুনেছি।

সখীদ্বয়। তিনিই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার জনক। পরে

নির্জন বনমধ্যে সখী পরিত্যক্তা হন। তখন লালনপালনের দ্বারা পিতা কণ্বই সখীর পিতা বলে পরিচিত হন।

রাজা। 'পরিত্যক্তা'—এই শব্দে আমার বড়ই কৌতূহল জাগছে। কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা আদ্যন্ত শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।

অনসূয়া। তবে শুনুন। পূর্বোক্ত ঐ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর তপস্যায় স্বর্গের দেবতারা অতিশয় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর তপস্যাভঙ্গের জন্য তাঁরা মায়াবতী মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠান।

রাজা। তা বটে। অন্যের তপস্যায় দেবতাদের স্বভাবতই ভয় জন্মে। পাছে তপোপ্রভাবে কোন বরলাভে ঐ তপস্বী স্বর্গরাজ্য অধিকার করে বসেন, এই আশঙ্কায় অপরের কঠোর তপস্যা দেববৃন্দের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে।

অনসূয়া। একে মনোহর বসন্তকাল, তাতে আবার মেনকার হৃদয়োন্মাদক রূপ। বিশ্বামিত্রের ক্রমে (আর বলতে না পেরে লজ্জায় থেমে গেল)

রাজা। বাকিটুকু আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। ইনি নিশ্চয় অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা।

অনসূয়া। ঠিক তাই।

রাজা। এবার ঠিক বুঝতে পারছি। তা না হলে কি কোন মানবীর মধ্যে এই ধরনের অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্ভব? মাটির পৃথিবী হতে কখনো কি জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে? কখনই নয়।

(শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হয়ে রইলেন)

রাজা। (আত্মগত) তবে আমার অভিলাষপূরণের সুযোগ আছে দেখছি। কিন্তু সখীরা পরিহাসছলে অনুরূপ বরলাভের কথা বলায় মনে একটা সন্দেহ জাগছে। মহর্ষি কণ্ব কি একে কোন পাত্রে বাগ্দান করেছেন? অথবা শকুন্তলা নিজেই মনে মনে কাউকে বরণ করেছে? এই দুই সংশয়ে চিত্ত আমার বড়ই আকুল হয়ে উঠছে। তা যদি হয়

তাহলে সকল আশাই ব্যর্থ হবে।

প্রিয়ংবদা। (লজ্জারুণমুখী শকুন্তলার দিকে চেয়ে রাজার দিকে মুখ ফিরিয়ে) আপনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ?

(শকুন্তলা তর্জনী সঞ্চালনের দ্বারা প্রিয়ংবদাকে শাসাতে লাগলেন)

রাজা। তুমি ঠিক ধরেছ। তোমাদের পবিত্র চরিত্রের বৃত্তান্ত জানবার একটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ত আছেই, তাছাড়া আরও একটা বিষয় জিজ্ঞাসার ছিল।

অনসূয়া। তার জন্য এত সংকোচ কেন ? তপস্বীদের ত গোপন করার কিছুই নেই। আপনি দ্বিধাহীন হৃদয়ে যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রাজা। জানতে চাই, তোমাদের এই সখী শকুন্তলা কি যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাপসব্রত অবলম্বন করেই কাটাবেন ? কন্দর্প-রাজ্যের ত্রিসীমানাও মাড়াবেন না, অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারিণী সেজে হরিণীদের সঙ্গেই কালযাপন করবেন ? ওঁর চোখ তাদের চোখের মত, তাই শকুন্তলা তাদের এত ভালবাসেন। সুতরাং সারাজীবন তাদের সঙ্গে কাটাবার বাসনা হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রিয়ংবদা। বিয়ে ত দূরের কথা, আমরা একে নারী, তার উপর আবার তাপসকন্যা। সামান্য যে কোন কাজে, এমন কি ধর্মাচরণেও আমাদের স্বাধীনতা নেই। সুতরাং কি হবে না হবে তা বলতে পারি না। শুধু এইটুকু জানি যে অনুরূপ পাত্রে শকুন্তলাকে সম্প্রদান করার বাসনা তাত কন্বের আছে। যতদিন তা না জুটবে ততদিন এর বিয়ে দেবেন না।

রাজা। (মনে মনে) তবে ত দেখছি, আমার এই প্রার্থনা, অর্থাৎ শকুন্তলা লাভের আশা নিতান্ত অসম্ভব নয়। যা যা শুনলাম তাতে আমার আশা পূরণ হলেও হতে পারে। সুতরাং তোমাকে বলি, হে হৃদয়, শকুন্তলাকে অভিলাষ করো। এতক্ষণ ত শকুন্তলাকে পাবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও করতে পারছিলে না। তোমার ত শুধু এই আশাতেও সুখ। এতক্ষণে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। শকুন্তলা তোমার পক্ষে

সুলভ না হলেও দুর্লভ নয়। তুমি ক্ষত্রিয়, ঋষিকন্যা তোমার স্পর্শেরও অযোগ্য বলে শিহরিত হচ্ছিলে, যাকে আগুন ভেবে ও আগুনে হাত দিলে পতঙ্গের মত পুড়ে যাবে ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিলে তা মোটেই আগুন নয়, পরন্তু তা অতি সুশীতল ও সুখস্পর্শ রত্ন। ও অপ্সরার কন্যা, তুমি রাজা, তোমার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।

শকুন্তলা। (রাগের ভান করে) অনসূয়া, আমি চললাম, এখানে আর থাকব না।

অনসূয়া। কেন?

শকুন্তলা। গৌতমী পিসীর কাছে গিয়ে বলব যে এই প্রিয়ংবদা যা মনে আসছে তা-ই বলছে।

অনসূয়া। সেকি সখী? এত বড় অভ্যাগত অতিথির পরিচর্যা, আদর আপ্যায়ন সব ছেড়ে ইচ্ছামত চলে যাওয়া কি ঠিক? তোরই উপর যে আজ অতিথি সেবার ভার।

(শকুন্তলা এ কথার উত্তর না দিয়েই চলতে লাগল)

রাজা। (শকুন্তলাকে ধরার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন এবং কোন-রকমে আত্মসংবরণ করে মনে মনে বললেন) কামীদের কামনার বস্তু সম্বন্ধে যখন যা করতে সাধ হয় তা না করলেও মনে হয় তাদের তারা তা করেছে। এই ত শকুন্তলা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে আমিও তার পিছু পিছু যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আর কি, কিন্তু শিষ্টতা আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করায় আমি তার অনুসরণ করলাম না। তবু মনে হচ্ছে, শকুন্তলার সঙ্গে কত দূর গিয়ে শেষে ফিরে এসেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের আসন থেকে একদিনও নড়িনি।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলাকে আটকে) তোমার এভাবে চলে যাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক না। আমি যেতে দেব না।

শকুন্তলা। (ভ্রূকুঞ্চন করে) কেন?

প্রিয়ংবদা। তুমি আমার কাছে দু কলসী জল ধার করেছ। আগে ধার শোধ করো, তারপরে যেখানে ইচ্ছা যাবে। (এই বলে জোর করে

শকুন্তলাকে ফেরাল)

রাজা। (প্রিয়ংবদাকে) দেখুন, অনেকক্ষণ ধরে ফুলগাছে জল ঢালায় এঁকে পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। অনবরত কলসী তুলতে তুলতে বাহুমূল কেমন যেন অবশ হয়ে পড়েছে। বাহুদ্বয় শিথিল লতার মত ঝুলছে। হাতের তলা লাল হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ায় স্তনদ্বয় কাঁপছে। কানের অবতংসরূপী শিরীষ ফুল কেমন দুদিকে দু গালের উপর ঘামে আটকে গেছে। সারা মুখখানি ঘর্মবিন্দুতে ভরে গেছে। খোঁপার বাঁধন খুলে যাওয়ায় চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে। তাই একহাতে চুলগুলি ধরে থাকলেও তা চোখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এততেও কি বুঝতে পারছেন না, শকুন্তলা কত কাতর হয়ে পড়েছেন। যাই হোক, আপনার কাছে ওঁর যে ঋণ তা আমিই শোধ করছি। (এই বলে নিজের আংটি খুলে প্রিয়ংবদার হাতে দিতে উদ্যত হলেন)

(দুই সখী আংটির উপর লেখা রাজার নাম দেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।)

রাজা। আমাকে অন্য কিছু ভাববেন না। আমি একজন রাজপুরুষ, রাজার কাছ থেকে এই আংটি উপহার পেয়েছি।

প্রিয়ংবদা। তা যদি হয়, তবে এ আংটি যে আঙ্গুলে আছে সেই আঙ্গুলেই থাক। আপনার মত সাধু ব্যক্তির কথাতেই এর ঋণ শোধ হয়েছে। (মৃদু হেসে) ও শকুন্তলা, দয়ার সাগর এই মহাপুরুষ, না না, মহারাজ তোর ঋণ শোধ করে দিয়েছে। এখন যেখানে ইচ্ছা যা।

শকুন্তলা। (মনে মনে) আর গিয়েছি। (প্রকাশ্যে) যাই না যাই আমার ইচ্ছা—তুমি বলার কে ?

রাজা। (শকুন্তলার দশা দেখে মনে মনে) আমি এঁর উপর যেমন, ইনিও কি আমার উপর তেমনি অনুরক্ত হয়েছেন ? অথবা আর এই সংশয় কেন ? এর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার অনুমানই ঠিক, অর্থাৎ আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। কারণ যদিও ইনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, তবু আমি যখন কথা বলি তখন উনি

কান খাড়া করে থাকেন। চোখে চোখ পড়লেই তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলেও বেশীক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে থাকতে পারেন না। অনুরক্ত না হলে এসব হয় না।

(নেপথ্য হতে কারা উচ্চকণ্ঠে ও ব্যগ্রভাবে বলতে লাগল) হে তাপসবৃন্দ, আশ্রমচারী পশুসমূহের প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ হও। কারণ মৃগয়ার জন্য রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন। ঐ দেখ, সৈন্যসামন্তের অশ্বসমূহের ক্ষুরের আঘাতে রক্তবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হয়ে আমাদের আশ্রমতরুশাখায় বিলম্বিত জলসিক্ত বল্কলরাজিতে পড়ছে। মনে হচ্ছে, লোহিতাভ পঙ্গপালে আশ্রমবৃক্ষসকল ছেয়ে গেছে। বিশেষতঃ একটি বন্যহস্তী রাজকীয় রথে ভীত ও চকিত হয়ে আমাদের ধর্মারণ্যে প্রবেশ করছে। ঐ বনমাতঙ্গের আকার কি ভীষণ! একটা দাঁত তার স্কন্ধে বক্রভাবে সংলগ্ন। ঐ ভয়ঙ্কর দন্তাঘাতে কত বড় বনস্পতিকে সে ধূলিসাৎ করছে। ঐ দেখ, দ্রুতগতিনিবন্ধন তার পায়ে কত লতাপাতা বলয়াকারে জড়িয়ে গেছে। শান্ত হরিণকুল দলবদ্ধ হয়ে বিশ্রাম করছিল। তাকে দেখে প্রাণভয়ে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। ঐ বনহস্তীটা আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ উপস্থিত হয়েছে। তোমরা সাবধান হও।

(সকলে কানপেতে সেই বিপদবার্তা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন)

রাজা। (মনে মনে) ছিঃ ছিঃ, আমার অনুচরগণ আমাকে খুঁজতে এসে তপোবন তোলপাড় করে তুলেছে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

অনসূয়া। মশায়, এই অরণ্যবৃত্তান্তে অর্থাৎ বন্যহস্তীর সংবাদে আমরা বড়ই আকুল হয়ে পড়েছি। সুতরাং অনুমতি করুন, আমরা পর্ণশালায় যাই।

রাজা। (প্রশান্তভাবে) তোমরা যেতে পার। আমিও যাই যাতে আশ্রমে আর উপদ্রব না ঘটে সেদিকে যত্ন রাখিগে। (সকলে উঠে পড়ল)

সখীদ্বয়। মশায়, যেমনভাবে করা উচিত আমরা সেভাবে আপনার আতিথ্য সৎকার করতে পারলাম না। সুতরাং আর একবার দেখা দিলে

কৃতার্থ হব।

রাজা। সেকি? না না, আমি তোমাদের দেখেই কৃতার্থ হয়েছি। এর থেকে আর কি অতিথি সৎকার আছে?

শকুন্তলা। ও অনসূয়া, অচিরোদ্‌গত কুশাঙ্কুরে আমার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, আর পরিহিত বল্কলখানিও কুরুবকতরুর ডালে জড়িয়ে গেছে। সুতরাং আমার জন্য একটু অপেক্ষা করো। আমি ততক্ষণ বল্কলখানি ছাড়িয়ে নিই। (এই বলে ঘাড় বাঁকিয়ে বল্কল ছাড়াবার ছলে রাজাকে দেখতে দেখতে মন্দগমনা শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন)

রাজা। নগরে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা নেই। যাই, সঙ্গের লোক-জনদের জড় করে তপোবনের অদূরে রেখে আসি। কিন্তু এ কি হলো? শকুন্তলার কথা ত কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সামনে চলেছি বটে, কিন্তু আমার চঞ্চল হৃদয় পিছনের দিকে সেই কন্বদুহিতার দিকে ছুটে চলেছে। হৃদয় হারিয়ে শুধু মাংসপিণ্ডময় দেহটাই যেন এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাণটা সেইখানে পড়ে আছে। বাতাসের প্রতিকূলে জোর করে একটা ধ্বজদণ্ড নিয়ে চললে তার নিশানটা যেমন পিছনদিকে পতপত করে উড়তে থাকে, শুধু দণ্ডটাই সামনের দিকে যায়, আমারও আজ সেই দশা ঘটেছে। (সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিষণ্ণ বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) দেখলে তোমরা? এই মৃগয়ারত রাজার সহচর হয়ে শেষে প্রাণটাই গেল দেখছি। আর পারি না। রোজ ভোরে বেরিয়ে এই মৃগ, বরাহ, এই বাঘ—এই করে দুপুর পর্যন্ত বনে বনে ছুটতে ও সারা বন ঘাঁটতে হয়। দারুণ গ্রীষ্মকাল, গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত যেন পুড়ে গেছে। এমন একটু ছায়া নেই যে মাথাটা

রাখি। যত সব ঝরণা ও জলা সব শুকিয়ে গেছে। জলার কোণে যদিও বা একটু জল আছে, তাও গাছের পাতা পড়ে পচায় কটু ও লাল হয়ে গেছে। কিন্তু কোন উপায় নেই, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম, কাজেই সেই কটু জলই পান করতে হয়। রোজ অনিয়মিতভাবে খেতে হয়, খাওয়া দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আর খাওয়ার জিনিসই বা কি অপূর্ব। লোহার শূলে ফুঁড়ে আগুনে ঝলসানো মাংসই প্রধান খাদ্য। তা-ই খেতে হয়। তাও আবার রোজ জোটে না। আবার ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন ঘোড়ার পিঠে পিঠে ঘুরতে সারা শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে থাকে। গাঁটগুলো টনটন করে বলে রাত্রিতে ঘুমোতে পারি না। শেষ রাত্রিতে যদিও বা একটু তন্দ্রা আসে তাও শিকারীদের চেঁচামেচিতে ও হাঁকডাকে ছুটে যায়। শীঘ্র এই সব আপদ ঘুচবে বলে মনে হয় না। কারণ সেদিন আমরা কিছুটা পিছনে পড়েছিলাম, তখন রাজা একাকী একটা হরিণকে তাড়া করতে করতে এক তপোবনে ঢুকে পড়েন এবং আমাদের ভাগ্যদোষে এক তাপসদুহিতাকে দেখেন। তাকে দেখার পর থেকে বাড়ি ফেরার নাম করেন না। এই সব দুর্ভাবনা করতে করতে রাত কেটে গেল, রাজার চোখে একটুও ঘুম এল না। যাক, এতক্ষণে হয়ত রাজার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত হয়ে থাকবে। একবার দেখা করিগে। (কিছুদূর গিয়ে দেখে) এই মৃগয়ার বেশে রাজা ঐ দিকেই আসছেন। পরিচারিকারা কেউ ধনুর্বাণ, কেউ বনফুলের মালা হাতে নিয়ে রাজার সঙ্গে আসছে। আমি হাত পা বাঁকিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াই, তাতে যদি অন্ততঃ আজকের দিনটা রেহাই পাই। (নিজের অষ্টাবক্র লাঠিতে ভর দিয়ে যেন কত কষ্টে দাঁড়িয়ে রইল)।

পরিচারিকাবেষ্টিত রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রিয়তমা শকুন্তলাকে যে সহজে লাভ করা যাবে না, তা আমি বিলক্ষণরূপেই জানি। তবু তার হাবভাব ও আকার ইঙ্গিত দেখার জন্য মন আমার পাগল হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনেরই পরস্পরগত অভিলাষ অপূর্ণ রয়ে গেছে, আমরা কেউই কাউকে ভোগ করতে পারছি না, তবু দুজনেরই মন দুজনের পরস্পরগত অনুরাগ–

সূচক আকার ইঙ্গিত দেখে অতিশয় প্রীতিলাভ করছে। (একটু হেসে) এইভাবেই প্রণয়ার্থীরা উপহাসাস্পদ হয়। তারা নিজের মনের মত করে প্রার্থনীয় প্রেমাস্পদের হৃদয়ের অবস্থাটা কল্পনা করে নেয় এবং সেই কল্পিত অবস্থার কথা চিন্তা করে সুখ পায়। আমারও আজ সেই দশা ঘটেছে। সেই যে তপোবনে শকুন্তলা যদিও অনুরাগভরে অন্যদিকে ইচ্ছামত দৃষ্টিপাত করছিল এবং আমার দিকে তাকায়নি, তবু সে নিতম্ব ভরে বিলাসবশে মন্দ মন্দ গমন করছিল এবং প্রিয়ংবদা তাকে যেতে দেব না বলায় সে 'কেন' বলে ভ্রূকুঞ্চন করে সখীকে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিল —আজ মনে হচ্ছে তার এই সমস্ত কার্যের লক্ষ্য ছিলাম যেন আমি। কি আশ্চর্য! কামী ব্যক্তি তার কামনার পাত্রের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপই নিজের অনুকূলে কল্পনা করে নিয়ে সুখী হয়। নায়িকার সমস্ত কার্যই আত্মবিষয়ক বলে ধরে নিয়ে সুখ পায়।

বিদূষক (অষ্টাবক্রের মত দাঁড়িয়ে) হে বয়স্য, আমার হাত পা আর সরছে না। নাড়তে পারছি না। তাই শুধু কথার দ্বারাই আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

রাজা। এত গাত্র-বেদনার কারণ?

বিদূষক। বাঃ, নিজেই চোখে খোঁচা মেরে চোখের জল পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করছ?

রাজা। বুঝলাম না।

বিদূষক। বয়স্য, আচ্ছা বল ত, বেতসলতা স্রোতে পড়ে এঁকে বেঁকে যে কুব্জের মত চলে, সে কি নিজের ইচ্ছায় না নদীর স্রোতই তার কারণ?

রাজা। নদীর স্রোতই তার কারণ।

বিদূষক। আমারও দুর্দশার কারণ তুমি।

রাজা। কি করে?

বিদূষক। এইভাবে রাজকার্য ছেড়ে এই গহন বনে দিনরাত ঘুরে ঘুরে শেষকালে একটা বনের পশুর মত হয়ে গেলে! কি আর বলব। রোজ শিকারের সন্ধানে ছোটাছুটি করতে করতে শরীরের সমস্ত গাঁট-

গুলি এতই অবশ হয়ে পড়েছে যে নড়াচড়াও করতে পারছি না। দোহাই তোমার, অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও আমায় রেহাই দাও, একটু জিরিয়ে নিই।

রাজা। (মনে মনে) এও দেখছি এই কথা বলছে। কাশ্যপদুহিতা শকুন্তলার কথা ভেবে ভেবে আমারও আর মৃগয়ায় স্পৃহা নেই। এই শরাসনে ছিলা পরিয়ে ও বাণ যোজনা করে রেখেছি বটে, কিন্তু হরিণের উপর সে বাণ নিক্ষেপ করতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না। যারা আমার প্রিয়তমার সঙ্গে বনে বাস করছে এবং তাকে অমন সুন্দর চাউনি শিখিয়েছে সেই সব হরিণদের উপর কোন প্রাণে বাণ নিক্ষেপ করি?

বিদূষক। তুমি যেন মনে মনে কি ভাবছ? আমার কথায় কান দিচ্ছ না। আমার অরণ্যে রোদনই সার হলো।

রাজা। (সহাস্যে) কি আর ভাবব? বন্ধুর বাক্য কি লঙ্ঘন করা যায়? তাই বিশ্রাম করাই ভাল মনে করছি।

বিদূষক। বেঁচে থাক। (বলেই প্রস্থান করতে উদ্যত হলো।

রাজা। দাঁড়াও বন্ধু! এখনো আমার কথা শেষ হয়নি।

বিদূষক। হুকুম করো।

রাজা। আগে একটু জিরিয়ে নাও। পরে আমার অতি সামান্য একটা কাজে তোমায় একটু সাহায্য করতে হবে।

বিদূষক। কি কাজে? মোয়া খাওয়া নাকি? তা যদি হয় তাহলে আমাকে কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলেই ভেবেছ।

রাজা। বলব এখন। কে আছ?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। (প্রণাম করে) আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা। রৈবতর্ক, সেনাপতিকে একবার ডাক ত।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান ও সেনাপতিকে নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) এই যে, আদেশ দানের জন্য উন্মুখ হয়ে মহারাজ এই দিকেই চেয়ে আছেন। আপনি নিকটে যান সেনাপতি মশায়।

সেনাপতি। (কিছুদূর হতে রাজাকে দেখে মনে মনে) যদিও

মৃগয়ায় বহু দোষ তথাপি আমাদের মহারাজের পক্ষে এটা একটা মহান গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অনবরত সবলে কঠোর ধনুকের গুন টানতে টানতে তাঁর দেহের পূর্বাধাটা সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। মাংসপেশীগুলি কড়া হয়ে উঠছে। এমন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের প্রখর তাপেও মহারাজ কাতর হন না বা থামেন না। শরীরের মাঝে মেদগুলি কমে যাওয়ায় দেহটা একটু কৃশ হলেও ব্যায়ামের গুণে বেশ বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে। পর্বতবিহারী মাতঙ্গের মত ঈষৎ ক্ষীণ মনে হলেও সমস্ত দেহটাই কেমন যেন প্রাণবন্ত বলে মনে হচ্ছে। আলস্য বা জড়তা নেই বিন্দুমাত্র। (সামনে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। প্রভু, বনের কোথায় কি জন্তু আছে তা জানা হয়ে গেছে। সুতরাং আর বৃথা দেরী করা কেন ?

রাজা। আমার এই বন্ধু মাধব্য মৃগয়ার এত নিন্দা করছে যে আমার আর এতে উৎসাহ নেই।

সেনাপতি। (জনান্তিকে বিদূষককে) সখা, কিছুতেই রাজী হয়ো না। নাছোড়বান্দা হয়ে থাক। প্রভুর মেজাজ বুঝে পরে বলব। (প্রকাশ্যে রাজাকে) এ মুখটা যা ইচ্ছা বলুক না। মৃগয়া ভাল না মন্দ, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ত মহারাজ নিজেই। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন ত। মৃগয়ায় শরীরের মত সব বাজে মেদ কমে যাওয়ায় দেহটা হালকা হয়, সকল কাজেই উৎসাহ বেড়ে যায়, ভুঁড়ি মোটেই হতে পারে না। তারপর কখনো ভয়ে, কখনো ক্রোধে বন্য জন্তুর চিত্ত কেমন দেখায়, কেমন বিকৃত হয়, তাও দেখতে পাওয়া যায়। শিকার যখন প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে তখন সেই দ্রুত পলায়মান শিকারকে বাণে বিদ্ধ করতে পারাই শিকারীর চরম সার্থকতা। সুতরাং যারা শিকারের নিন্দা করে করুক, আপনিই বলুন ত, এত আমোদ, এত উৎসাহ আর কোন কাজে পাওয়া যায় ?

বিদূষক। আর সে মহারাজ নেই, প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াও আর একটা ভয়ঙ্কর বুড়ো ভালুকের মুখে গিয়ে পড় আর সে তোমার নাকটি নিশ্চিহ্ন করে খেয়ে ফেলুক। মানুষের নাক তাদের বড় প্রিয়।

রাজা। সেনাপতি, তোমার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আশ্রমের অতি নিকটে আছি আমরা। এ সময়ে হিংসা মোটেই সঙ্গত নয়। সুতরাং তোমার কথা আমি রাখতে পারলাম না। আজ বন্য মহিষকুল বনমধ্যবর্তী স্বল্পজল গর্তাদিতে ও শুষ্কপ্রায় জলাশয়াদিতে নির্ভয়ে অবগাহন করুক এবং তাদের শৃঙ্গের দ্বারা সেই পঙ্কিল জল আলোড়িত করুক। আর আজ বনের মৃগসমূহ হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক। ছায়াশীতল তরুতলে আজ তারা দল বেঁধে এসে বিশ্রাম করুক ও জাবর কাটুক। আমরা বনে ঢোকার পর তা তাদের ভাগ্যে ঘটেনি। আজ বন্য বরাহগুলি পঙ্কিল জলাশয়ে পড়ে নির্ভয়ে দূর্বামূল ভক্ষণ করুক—বহুদিন তারা তা খায়নি। আজ এই ধনুকের ছিলা ঢিলে করে দিচ্ছি। এও একটু জিরিয়ে নিক।

সেনাপতি। আপনি মালিক, যেমন ইচ্ছা করুন।

রাজা। তাহলে যারা আগে গিয়ে বন তোলপাড় করে তুলছে, পাছে কোন জন্তু পালায় সেই জন্য বনটাকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি করছে তাদের ফিরিয়ে আন। দেখ, আমার সৈনিকরা তপোবনের শান্তি যেন নষ্ট না করে, ভাল করে নিষেধ করে দাও। মনে রেখো, তপোবন যতই শান্তি ও অহিংসাপূর্ণ হোক না কেন, তার মধ্যে নিগূঢ় আছে বিশ্বদহনকারী তেজ। সেনাপতি জান ত, সূর্যকান্তমণি যতই সুখস্পর্শ হোক না, কারো তেজ সে সইতে পারে না। গায়ে লাগলেই তা অগ্নি উদ্গীরণ করে।

সেনাপতি। যে আজ্ঞা প্রভু।

বিদূষক। কেমন? তোমার মৃগয়ার বাসনা, বনে বনে লাফালাফি করে বেড়ানোর সখ চুলোয় যাক।

(সেনাপতির প্রস্থান)

রাজা। (অনুচরবর্গের দিকে চেয়ে) তোমরা আমার মৃগয়ার বেশ নিয়ে যাও। আর বৈরতক তুমিও নিজের কাজে যাও।

(অনুচরবর্গের প্রস্থান)

বিদূষক। তুমি ত মাছিটি পর্যন্ত তাড়ালে। এখন কিছুক্ষণ ঐ

গাছের ছায়ায় উপবেশন করো। ঐ দেখ, গাছটার উপর লতার জাল এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হচ্ছে যেন সুন্দর একটি সবুজ চাঁদোয়া খাটানো রয়েছে। তুমি একটু বস। আমিও ততক্ষণে একটু আরাম করে নিই।

রাজা। আচ্ছা আগে চল।

বিদূষক। এস তুমি। (উভয়ে এগিয়ে গিয়ে বসলেন)

রাজা। মাধব্য, তোমার চোখই বৃথা, কারণ এমন একটা দেখার জিনিস দেখলে না।

বিদূষক। কেন? তুমিই ত আমার চোখের সামনে রয়েছ।

রাজা। সবাই নিজেরটিকেই সুন্দর দেখে, তাই তুমিও আমায় দেখছ। আমি কিন্তু আশ্রমের অলঙ্কাররূপী সেই শকুন্তলার কথা বলছি। তাকে ত তুমি দেখনি।

বিদূষক। (মনে মনে) বলুক না শকুন্তলার কথা, আমি ও প্রসঙ্গ তোলার সুযোগই দেব না। (প্রকাশ্যে) সখা, তুমি দেখছি, ঋষিকন্যাকেই শেষে কামনা করে বসলে।

রাজা। সখা, ভুল তোমার। যা অগ্রাহ্য, তেমন বস্তুতে পুরুবংশীয়-দের মন টলে না। তুমি যাকে ঋষিকন্যা বলছ, সেই শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত তুমি কি জান? শকুন্তলা মুনিকন্যা হলেও স্বর্গলোকবাসিনী মেনকার গর্ভজাত এবং তার দ্বারা পরিত্যক্ত। পরে মহর্ষি কণ্ব তাকে কুড়িয়ে পেয়ে পালন করেন। তাই সে কণ্বের দুহিতা। সে যেন আকন্দতরুর উপর পতিত একটি নবমল্লিকা ফুল। আসলে আকন্দফুল নয়।

বিদূষক। (সহাস্যে) পিণ্ডি খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখ মরে আসলে যেমন শেষে একটু তেঁতুল খেতে সাধ হয়, তোমারও দেখছি সেই দশা হয়েছে। অমন সব রাণী মহারাণীতে তোমার সাধ মিটল না। কিংবা বুঝি অরুচি ধরেছে। মুখ বদলানো দরকার তাই এই অভিলাষ। তাই না?

রাজা। তুমি ত তাকে দেখনি, তাই এই কথা বলছ। দেখলে

একথা বলতে না।

বিদূষক। দেখার আর দরকার কি? তোমার যাতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, সে জিনিস নিশ্চয় খুব ভাল হবেই। সকলের সেরা হবেই।

রাজা। বয়স্য, অধিক আর কি বলব? তার দেহের কথা মনে করলে এই কথাই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা আগে তাকে চিত্রপটে চিত্রিত করে পরে জীবনদান করেছেন। অথবা মনোমত উপকরণসামগ্রীগুলি সংকলন করে বিধাতা মনে মনেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যথাস্থানে বিন্যাস করে তার দেহ নির্মাণ করেছেন। হাত দিয়ে নির্মাণ করলে দেহের এমন রূপলাবণ্যের এমন মাধুরী কখনো সম্ভব হত না। সে এক অভূতপূর্ব স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি।

বিদূষক। যা বললে তা যদি সত্য হয় তাহলে দেখছি এতদিনে সকল রূপসীদেরই গর্ব খর্ব হলো।

রাজা। সখা, আমার মনে হয়, শকুন্তলা এমনই একটি ফুটন্ত ফুল, এখনো পর্যন্ত যার আঘ্রাণ কেউ নেয়নি, অথবা এমন একটি নধর নবপল্লব যা এখনো পর্যন্ত নখ দিয়ে কেউ স্পর্শ করেনি। অথবা যেন অক্ষয় পুণ্যরাশির অখণ্ড বা সম্পূর্ণ ফলস্বরূপ। কি নির্মল রূপ! জানি না কার ভোগে লাগবে। কাকে বিধাতা গৌরবান্বিত করবেন।

বিদূষক। তা যদি হয়, তবে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে দখল করো। তা না হলে কোন দিন হয়ত ঐ সব তপস্বীদের কারো হাতে পড়বে। ওরা ইঙ্গুদীফল থেঁতো করে মাথায় ঘষে ঘষে কটা চুলগুলি তামার শলাকার মত করে তুলেছে। ওদের হাতে পড়লেই তার রূপের দশা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

রাজা। সখা, তুমি জান না, সে এখন পরাধীন, আর তার অভিভাবকও এখন তার কাছে নেই।

বিদূষক। আচ্ছা, তাকে দেখে তার চোখমুখের ভাবভঙ্গি কিছু বুঝতে পেরেছ কি?

রাজা। তাপসদুহিতারা স্বভাবতই অতি শান্ত প্রকৃতির, কোনরূপ চাঞ্চল্য বা চপলতা তাদের নেই। তবু যখনি আমি তার চোখের সামনে

পড়েছি, তখনই শকুন্তলা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কোন একটা ছল করে হেসে উঠেছে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি সে হাসি শুধু আমারই জন্য। তার হৃদয়নিহিত অভিলাষ অর্থাৎ আমার প্রতি অনুরাগ সে লজ্জার আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলেও সে তা একেবারে চেপে রেখে দিতে পারেনি, আকারে ইঙ্গিতে অনেকটা প্রকাশ করে ফেলেছে।

বিদূষক। সেকি ? দেখামাত্রই তোমার কোলে চড়ে বসেনি ? এতেও তোমার যখন সাধ মিটছে না, তখন সেটা হলেই ঠিক হত।

রাজা। অতটা না হোক, শত লজ্জা সত্ত্বেও শকুন্তলা তার মনের প্রকৃত অবস্থা ঢেকে রাখতে পারেনি। চলে যাওয়ার সময় তার হৃদয়ের প্রকৃত ছবিটা বার হয়ে পড়েছে। কারণ দু এক পা গিয়ে পায়ে কুশ বিঁধেছে বলে হঠাৎ থেমে গেল এবং গাছের ডালে তার পরনের বাকল জড়িয়ে না গেলেও তা ছাড়াবার ছলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বিদূষক। বাঃ, তাহলে ত দেখছি এই বিদেশেও পথের সম্বল প্রচুর জুটেছে তোমার। এখন সেই চাউনি স্মরণ করে দিন কাটাও। তুমি তপোবনটাকে শেষে উপবন করে তুলবে দেখছি।

রাজা। ভাই, কয়েকজন তপস্বী আমায় চিনে ফেলেছে। এখন ভাব দেখি, কি উপলক্ষ্যে অন্ততঃ আর একবার আশ্রমে ঢুকতে পারি ?

বিদূষক। তোমরা হলে রাজা। তোমাদের আবার অন্য উপলক্ষ্যের দরকার কি ? গিয়ে বল, তোমরা যে তৃণধান্য ছড়িয়ে রেখেছ তার ছয়-ভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য, তাই আদায় করতে এসেছি।

রাজা। দূর বোকা। এইসব মুনিঋষিদের রক্ষা করি বলে বিনিময়ে একটা জিনিস আমরা পেয়ে থাকি। জিনিসটা এতই স্পৃহণীয় যে রাশি রাশি ধনরত্ন দূরে ঠেলেও আমরা তা কামনা করি। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কাছে কররূপে যা পাই তা প্রচুর হলেও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু বনবাসী মুনিগণ তাঁদের অতিকৃচ্ছ্র তপস্যালব্ধ ফলের ছয়ভাগের একভাগ যা আমাদের দেন তার ক্ষয় নেই, কখনো ফুরোয় না। তার সঙ্গে কোন ধনরত্ন বা মণি মাণিক্যের তুলনাই হয় না।

নেপথ্য হতে শোনা গেল, যার নিকট এসেছি সেই রাজা এখানেই উপস্থিত আছেন।

রাজা। (তা শুনে) ওদের ধীর প্রশান্তগম্ভীর স্বর দ্বারা তপস্বী বলেই বোঝা যাচ্ছে।

দৌবারিক। (প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, দুজন ঋষিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা। তাহলে তাড়াতাড়ি দুজনকে নিয়ে এস এখানে।

দৌবারিক। (প্রস্থান ও ঋষিকুমারদের নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) ভগবানরা এই দিকেই আসুন।

(ঋষিদ্বয় রাজাকে অনিমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন)

প্রথম ঋষি। কি আশ্চর্য! এতবড় তেজপুঞ্জপূর্ণ দেহ রাজার, অথচ নিকটে যেতে একটুও ভয় বা দ্বিধা হচ্ছে না। এরূপ হবারই কথা। কারণ এঁর সঙ্গে ঋষিদের বেশী পার্থক্য নেই। ঋষিরা যেমন আশ্রমে বাস করেন তেমনি ইনিও সর্ববিধ ভোগসুখে পরিপূর্ণ সংসার-আশ্রমে নিস্পৃহভাবে বাস করে থাকেন। ঋষিদের মত ইনিও প্রজাকুলের সংরক্ষণ-রূপ কৃচ্ছ্রকর্মের দ্বারা প্রতিদিন তপঃ সঞ্চয় করে থাকেন। কঠোরতপা ঋষিদের গুণগরিমার কথা যেমন স্বর্গ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছায় তেমনি এঁর নাম ও বিপুল খ্যাতি চারণগণ এত তারঃস্বরে গান করে যে সে ধ্বনিতে আকাশ ভরে যায়। যদিও ইনি রাজা এই আখ্যায় ভূষিত তথাপি এঁর কর্মপদ্ধতি ও লোকহিতৈষণায় এঁকে সকলেই রাজর্ষি বলে কীর্তন করে থাকে।

দ্বিতীয়। গৌতম, বল নামক দুর্ধর্ষ দানবেরও যিনি নিধনকর্তা, প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্র যাঁকে বন্ধু বলে গৌরববোধ করে থাকেন, ইনিই কি সেই দুষ্মন্ত?

প্রথম। হ্যাঁ ভাই।

দ্বিতীয়। তাহলে দেখছি, নগরের তোরণদ্বারের বিশাল অর্গলের মত দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের দ্বারা ইনি যে একাকী এই জলধিমেখলা বিরাট পৃথিবীকে লালন করে থাকেন তাতে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের কিছু নেই।

দেবগণ দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও যে দানবযুদ্ধে এই দুষ্মন্তের জ্যাযুক্ত ধনুকে ও দেবরাজের বজ্রে তুল্যভাবে নির্ভর করে জয়ের আশা করে থাকেন, তাও বিচিত্র নয়। মর্ত্যের এই রাজা স্বর্গের ইন্দ্রের সর্বাংশেই সমকক্ষ।

উভয় ঋষি। (নিকটে গিয়ে) রাজন, বিজয়যুক্ত হোন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করে) আপনাদের দুজনকে অভিবাদন করি।

উভয়ে। আপনার মঙ্গল হোক। (রাজার হাতে ফল দিলেন)

রাজা। (প্রণামপূর্বক গ্রহণ করে) কি আদেশ বলুন।

উভয়ে। আপনি যে এখানে আছেন, তা আশ্রমবাসীরা সবাই জানেন। তাই তাঁরা একটা প্রার্থনা জানাতে চান।

রাজা। কি আদেশ তাঁরা করতে চান—বলুন।

উভয়ে। পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকায় রাক্ষসরা আমাদের যাগযজ্ঞে নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাই কয়েক-দিনের জন্য আপনি যদি শুধু সারথিকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকেন তাহলে আমাদের রক্ষা হতে পারে—এই হলো আশ্রমবাসীদের প্রার্থনা।

রাজা। এই আদেশে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত বোধ করছি।

বিদূষক। বাঃ, এটা দেখছি তোমার অনুরূপ গলহস্ত অর্থাৎ তুমি যেদিকে যেতে চাইছ তোমার গলায় ধাক্কা দিয়ে তোমায় সেইদিকেই এগিয়ে দিল।

রাজা। (মৃদু হেসে দৌবারিককে) বৈরতক, তুমি এখনি গিয়ে আমার নাম করে আমার শরাসন ও সারথিকে আসতে বল।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

ঋষিদ্বয়। (আনন্দিত হয়ে) মহারাজ, আপনার পূর্বপুরুষদের আচরিত পথের পথিক আপনি। সুতরাং কয়েকদিন আশ্রমে বাস করে অনাথ তপস্বীদের রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই বটে। কারণ আপনি যে বংশের অবতংস, সেই বংশের পূর্বপুরুষগণ বিপন্নকে অভয়দানে চিরদিন দীক্ষিত ছিলেন। তাঁরা এই কাজকে অতি পবিত্র একটি পুণ্যকর্ম বলে মনে করতেন।

রাজা। (প্রণাম করে) আপনারা একটু এগিয়ে যান। আমি পিছন পিছন যাচ্ছি।

উভয়ে। আপনি সর্বত্র বিজয়ী হোন।

রাজা। মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার সখ আছে ?

বিদূষক। আগে খুবই ছিল, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনে আর একটুও সখ নেই। সব শুকিয়ে গেছে।

রাজা। ভয় কি ? আমার কাছেই ত থাকবে।

বিদূষক। তাহলে দেখছি এ যাত্রা রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচলাম।

দৌবারিক। (প্রণাম করে) মহারাজের বিজয়যাত্রার জন্য রথ সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু এদিকে দেবীদের কি আদেশ নিয়ে নগর হতে একজন দূত এসেছে।

রাজা। (আগ্রহের সঙ্গে) জননীরা পাঠিয়েছেন ?

দৌবারিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজা। শীঘ্র ভিতরে নিয়ে এস।

দৌবারিক। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান ও দূতের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ) মহারাজ ঐ বসে আছেন, নিকটে যাও।

দূত। রাজার জয় হোক। দেবী আজ্ঞা করেছেন, আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁর উপবাসের পারণা হবে অর্থাৎ ব্রত উদ্‌যাপিত হবে। সেইদিন অবশ্যই আপনি গিয়ে দেবীর আনন্দবর্ধন করবেন।

রাজা। তাই ত, একদিকে তপস্বীদের রক্ষাকার্য, অন্যদিকে গুরুজনদের আদেশ—দুই-ই অপরিহার্য। এখন কোনদিকে যাই।

বিদূষক। কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাক।

রাজা। ঠাট্টা নয়। সত্যিই আমি মহাচিন্তায় পড়লাম। দুটিই অপরিহার্য কার্য, অথচ এক স্থানের নয়। দুটিই ভিন্ন স্থানের। আমার মনটা যেন দুদিকে দুই কর্তব্যের টানে সমান দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। কোন বেগবান নদের খরস্রোত যদি সামনের কোন পর্বতে বাধা পায় তাহলে তার স্রোত যেমন দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আজ আমার মনের সেইরকম অবস্থা। (একটু চিন্তা করে) সখা, আমার মা তোমাকে

পুত্রতুল্য মনে করেন। অতএব তুমিই একটু কষ্ট করো। তপস্বীদের বিশেষ জরুরী কাজের জন্য আমি যে কতখানি ব্যস্ত আছি তা এখান থেকে ফিরে মার কাছে গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দাও। আমার প্রতিনিধি-রূপে তাঁর পুত্রের কার্য করো।

বিদূষক। আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি ভেবো না আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি।

রাজা। (সহাস্যে) সেকি, তোমার দ্বারা কি একাজ সম্ভব ?

বিদূষক। একটা কথা, রাজার ছোট ভাই যেমনভাবে গেলে মানায় আমি কিন্তু তেমনিভাবে যাব।

রাজা। নিশ্চয়। তপোবনের কোনরূপ অশান্তি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই সমস্ত অনুচর সৈন্যসামন্তকে তোমারই সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

বিদূষক। তাহলে দেখছি, আমি মহারাজ হয়ে উঠলাম।

রাজা। (মনে মনে) এই ব্রাহ্মণ খুবই হালকা প্রকৃতির। আবার এই শকুন্তলাঘটিত ব্যাপারটা রাণীমহলে বলে দিতে পারে। একে এবিষয়ে একটা কথা বলে দিই। (বিদূষকের একটি হাত ধরে প্রকাশ্যে) ভাই, ঋষিদের অনুরোধ রাখা উচিত, তাই আশ্রমে যাচ্ছি। তাপসদুহিতা শকুন্তলায় আমার কোন আসক্তি নেই। ভেবে দেখ, আমরা ঘোর সংসারী রাজা রাজড়া, আর তারা হলো খাঁটি বনবাসী, মৃগশিশুর সঙ্গে একত্রে লালিত পালিত—এই দুই-এ কি কখনো মিলন হয় ? সখা, ঠাট্টা করে তোমাকে যে শকুন্তলার কথা বলেছি তা যেন সত্য বলে মনে করো না। বুঝলে ?

বিদূযক। হ্যাঁ বুঝলাম। (সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

কুশহাতে জনৈক কণ্বশিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। মহারাজ দুষ্মন্তের কি আশ্চর্য প্রভাব। যেমন তিনি আশ্রমে প্রবেশ করলেন অমনি আমাদের যাগযজ্ঞের সকল বাধাবিঘ্ন দূর হলো, উপদ্রবকারী রাক্ষসেরা কোথায় পালিয়ে গেল। ধনুকে আর বাণ যোজনা করতে হলো না। বাণ সন্ধানের আগে ধনুকের ছিলাটি দু'একবার টেনে দেখার সময় যখন টনটন শব্দ হচ্ছিল তখন সেই শব্দ শোনামাত্র রাক্ষসরা দূরে হতেই পালিয়ে গেল, সামনে আসা ত দূরের কথা। রাজা যেন এক হুঙ্কারে সব আপদ তাড়িয়ে দিলেন। যাই, যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের জন্য এই কুশগুলি ঋত্বিকদের দিয়ে দিই। (একটু এগিয়ে কাকে দেখে) প্রিয়ংবদা, কার জন্য এই সব বেনার মূল, মৃণাল আর পদ্মের পাতা নিয়ে যাচ্ছ ? (দূর হতে উত্তর শুনে) কি বললে ? গ্রীষ্মের প্রবল তাপে শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে, তাই তার শরীরের তাপ নিবারণের জন্য এই সব নিয়ে যাচ্ছ ? তাহলে তাড়াতাড়ি যাও। সখী, সে যে কুলপতি ভগবান কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। আমিও গিয়ে শকুন্তলার জন্য গৌতমীর হাতে যজ্ঞীয় শান্তি জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

পূর্বরাগার্ত চিত্তে রাজার প্রবেশ

রাজা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) তপস্যার ক্ষমতা যে কত প্রবল এবং সেই বালিকাও যে সম্পূর্ণরূপে তপস্বীর কত অধীন—উভয়ই আমি বিলক্ষণ জানি। অর্থাৎ বিন্দুমাত্র সীমা অতিক্রম করলে যে কি ঘোর পরিণাম ঘটতে পারে তা জানি। আবার মহর্ষির অনুমতি ছাড়া যে শকুন্তলার এক পাও নড়বার সাধ্য নেই তাও জানি। তবুও শকুন্তলা হতে হৃদয় ফেরাতে পারছি না। তাকে পাব না জেনেও পাবার আশায় ছুটছি। হে প্রবলপ্রতাপ কন্দর্প ! কামী ব্যক্তি কামানলে দগ্ধ হয়ে বড় আশা করে তোমার এবং চন্দ্রের নিকট যায়। তুমি যত পীড়া দাও ততই তারা তোমার বেশী বশীভূত হয়ে পড়ে এবং চন্দ্রকিরণে তথাপি প্রাণ শীতল হবে ভেবে চাঁদের দিকে চেয়ে কৃপা ভিক্ষা করে, তোমরা

উভয়েই তাদের প্রতারিত করো। কেন না, তুমি না কি ফুলবাণ আর চাঁদ ও শীতল দ্যুতি—কিন্তু তোমাদের দুইজনের এই দুই বস্তু অর্থাৎ তোমার ফুলের বাণ আর চাঁদের শীতল কিরণ—এই উভয় পদার্থই আমার মত হতভাগাদের বেলায় একেবারে বিপরীত। চাঁদ তার শীতল কিরণের দ্বারা যেমন অগ্নিবর্ষণ করে, তুমিও তেমনি তোমার ফুলের বাণগুলি বজ্রের মত কঠিন করে আঘাত করো। তোমাদের ঐ সব বিশেষণ আমাদের পক্ষে একেবারে বিপরীত। (একটু এগিয়ে) এখন কি আর করি? যজ্ঞ হয়ে গেছে, যাজ্ঞিক ঋষিরা বিশ্রামের অনুমতি দিয়েছেন। কোথায় গিয়ে এই শ্রান্ত হৃদয়কে একটু জুড়াই? (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে) প্রিয় শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া আর কিসেই বা বুক জুড়োবে? গিয়ে দেখি কোথায় সে? (সূর্যের দিকে চেয়ে) এই-রকম দুপুরবেলায় প্রখর রৌদ্রতাপে সখীদের নিয়ে শকুন্তলা প্রায়ই মালিনীতীরে লতাকুঞ্জসমূহের মধ্যে কাল কাটিয়ে থাকে। সেই দিকেই যাই একবার। (একটু এগিয়ে যেন বাতাস স্পর্শ করে) বাঃ, এখানকার দুপুরবেলায় বাতাসটা কি সুন্দর। পদ্মগন্ধ যেমন সৌরভময়, মালিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলির জলের ছিটে থাকায় আবার তেমনি ঠাণ্ডা। মদনের তাপে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ছে। ইচ্ছা হচ্ছে এই বাতাসটাকে সারা অঙ্গ দিয়ে চেপে ধরি, তাতে যদি একটু জুড়ায়। (এগিয়ে চার-দিকে চেয়ে) এই বেতসলতামণ্ডিত কুঞ্জে শকুন্তলা থাকলেও থাকতে পারে। কেন না, এই কুঞ্জের প্রবেশদ্বারে ঐ যে পাণ্ডুবর্ণের বালির উপর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই তার, তা না হলে ঐ পদাঙ্কের পুরোভাগটা কেমন একটু ভাসা-ভাসা বালির ভিতর ততটা ধসেনি আর গোড়ালির দিকটা বালিতে একেবারে বসে গেছে। সব পদচিহ্নই ঐ রকম। মনে হচ্ছে, নিতম্বিনী শকুন্তলার গুরু নিতম্বের ভারে পায়ের পিছনটা ঐ বালিতে ঢুকে গেছে আর সামনের আঙ্গুলের দিকটা উঁচু হয়ে ভেসে আছে। পায়ের দাগগুলিও একেবারে টাটকা। আবার লতামণ্ডপে ঢোকার দাগ দেখছি, বেরোবার দাগ দেখছি না। সুতরাং নিশ্চয় সে এর ভিতরেই আছে। এই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে

দেখা যাক। (এগিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আনন্দের সঙ্গে) এতক্ষণে চোখ জুড়োনোর জিনিস পেলাম। ঐ যে ফুলের রাশিতে একটা মস্ত চওড়া পাথরের উপর আমার মূর্তিমতী বাসনা শকুন্তলা শুয়ে আছে, আর তার দুই সখী দুপাশে বসে আছে। এদের এই নিভৃত আলাপ একটু কান পেতে শুনি। (সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)

সখীদ্বয়। (বাতাস করতে করতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে) ও শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়া ভাল লাগছে ত?

শকুন্তলা। তোমরা কি হাওয়া করছ?

(দুই সখীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল এবং পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল)

রাজা। শকুন্তলার শরীর খুবই অসুস্থ দেখছি। তার এ অসুখ কি গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য না আমি যা ভাবছি সেই জন্য? (একটু চিন্তা করে) না, যা ভাবছি সেইজন্যই বটে। প্রিয়ার স্তনদ্বয়ে বেনার মূল বেটে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এক হাতের মৃণালের বালা কোথায় খসে পড়েছে। কিন্তু এত কষ্টতেও আমার প্রেয়সীর দেহলতা কত সুন্দর। দেখে সাধ মেটে না। প্রবল গ্রীষ্ম এবং উৎকট মদনজ্বালা—এদের উভয়ের তাপই যদি সমান হয় তবুও কিন্তু যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের অত্যাচার এত সুন্দর দেখায় না। এটা নিশ্চয় মনের পীড়াই বটে।

প্রিয়ংবদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখা হতে শকুন্তলার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর দেখছি। তাঁর জন্যই কি সখীর এই অসুখ?

অনসূয়া। সখী, আমারও সেই আশঙ্কাই হচ্ছে। যাই হোক, জিজ্ঞাসা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) সখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমার অসুখ বড়ই বেশী দেখতে পাচ্ছি।

শকুন্তলা। (শয্যা হতে কুসুমাবৃত দেহের পূর্বার্ধটা উঁচু করে) অনসূয়া, কি যেন বলতে চাইছিলে?

অনসূয়া। আমরা দুজনে মদনের ব্যাপার বুঝি না, শাস্ত্রও পড়িনি। তবে লোকপরম্পরায় জেনেছি, মদন কাউকে আক্রমণ করলে যে দশা হয়

তোমারও তাই হয়েছে। এখন খুলে বলত, কার জন্য এত কষ্ট? কি জন্য কি হলো? ভাল করে জানতে পারলে প্রতিবিধান করা যায়।

রাজা। অনসূয়ারও ঠিক আমারই মত সন্দেহ জন্মেছে। তাহলে আমি নিজের মনের মত করে ভেবে নিচ্ছি—একথা আর চলে না।

শকুন্তলা। (আত্মগত) প্রাণ থাকতে একথা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারব না। সখীরা যতই জেদ করুক, হঠাৎ একথা বলতে আমার সাধ্য হবে না।

প্রিয়ংবদা। সখী অনসূয়া ঠিকই বলেছে। কেন শুধু শুধু নিজের পীড়া উপেক্ষা করছিস? দিন দিন তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছিস। শুধু শরীরের কান্তিটুকু ছাড়া তোর আর কি আছে?

রাজা। প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছে। সে শকুন্তলা আর নেই। তার সুগোল গালদুটি শুকিয়ে টোল খেয়ে গেছে। সে পীনোন্নত বক্ষ বা স্তনের সে কাঠিন্য আর নেই, সব যেন ধসে পড়েছে। কটিদেশ এত ক্ষীণ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শরীরের পূর্বার্ধ আর বইতে পারছে না। বাহুমূল শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে আর অমন সুন্দর রং পাণ্ডুর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বসন্তলতিকার পাতাগুলিতে যখন গ্রীষ্মের গরম হাওয়া লাগে তখন তা দেখে যেমন দুঃখও হয়, আবার দেখতে ইচ্ছাও করে, তেমনি মদনের জ্বালায় শকুন্তলা যতই অভিভূত হোক, তাকে দেখে যেমন প্রাণে ব্যথা লাগছে তেমনি দেখতে ইচ্ছাও হচ্ছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

শকুন্তলা। সখী, কাকেই বা বলব? নিজের দুঃখের কথা বলে তোদেরও দুঃখের কারণ হব মাত্র।

সখীদ্বয়। সেইজন্যই আমরা শুনতে চাই। কারণ প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথা বললে তার ভার অনেকটা লাঘব হয়। একজনের কাছে যেটা দুর্বহ, ভাগ হলে তার ভার কতকটা সহ্য করা যায়।

রাজা। যারা সুখেদুঃখে জীবনের চিরসঙ্গী, সেই সখীদ্বয় বারবার শকুন্তলার মনের দুঃখের কারণ যখন জিজ্ঞাসা করছে তখন তাদের সে তা বলবেই বলবে। আর আমিও অচিরেই সে কারণ শুনতে পাব।

সেই ছাড়াছাড়ির সময়ে বারবার বক্রকণ্ঠে আমার দিকে শকুন্তলা চেয়েছিল—একথা সত্য, তবু কিন্তু শকুন্তলা কি উত্তর দেয়, তার মনোবেদনার প্রকৃত কারণ কি বলে তা শোনার জন্য প্রাণ আমার ছটফট করছে।

শকুন্তলা। সখী, যেদিন হতে তপোবনের রক্ষাকর্তা সেই রাজর্ষিকে দেখেছি, সেই থেকে তাঁর বিষয় ভেবে ভেবে আমার এই দশা ঘটেছে।

রাজা। (সানন্দে) যা শুনবার শুনলাম। কন্দর্পই আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছিলেন, আবার তিনিই আমার বুক জুড়িয়ে দিলেন। বর্ষার সূর্যদেব যেমন কিছুক্ষণ প্রখর রৌদ্রে বিশ্ব তাপিত করে পরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়ায় জীবলোকের তাপ দূর করেন, আজ কন্দর্পও আমার পক্ষে ঠিক তাই করলেন। শুধু আমি নই, শকুন্তলাও আমার জন্য কাতর জেনে আমার সকল কষ্টের অবসান হলো।

শকুন্তলা। তোরা যদি সঙ্গত মনে করিস তবে যাতে আমার প্রতি সেই রাজর্ষির দয়া হয় সেইভাবে কাজ কর। না হলে আমার জন্য এক-গণ্ডুষ তিলজল দে, মৃত্যু আমার নিশ্চিত।

রাজা। এই কথায় আমার সকল সন্দেহ মিটল।

প্রিয়ংবদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া, যা দেখছি, তাতে শকুন্তলা অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে। দুদিন সহ্য করার শক্তিও এর নেই। যাঁকে সে চিত্ত সমর্পণ করেছে তিনি পুরুবংশের অলঙ্কার, মহান লোক। সুতরাং সখীর এ অভিলাষ যথার্থই প্রশংসার যোগ্য।

অনসূয়া। ঠিক বলেছিস।

প্রিয়ংবদা। (প্রকাশ্যে) সখী শকুন্তলা, রাজার প্রতি তোর এই অনুরাগ সত্যি তোরই যোগ্য। দেখ, মহানদী সাগরে গিয়েই সঁপে দেয় নিজেকে। আবার সহকার ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষ কি পত্রপল্লবযুক্ত লতার ভার সহ্য করতে পারে? সুতরাং তোদের উভয়ের এই অনুরাগ সর্বাংশেই উভয়ের অনুরূপ।

রাজা। বাঃ, দুই সখীরই এক সুর শকুন্তলার মতেই মত। তা হবে না-ই বা কেন? বিশাখা নামে তারাদুটি যে সর্বদাই চন্দ্রবিম্বের

অনুকরণ করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

অনসূয়া। এমন কি একটা উপায় হতে পারে যাতে তাড়াতাড়ি অথচ খুব গোপনে সখীর অভিলাষ পূর্ণ করা যায় ?

প্রিয়ংবদা। গোপনে কাজটা করাই শক্ত। তবে তাড়াতাড়ি রাজর্ষির কৃপালাভ খুব সহজই হতে পারে।

অনসূয়া। কি করে ?

প্রিয়ংবদা। মনে নেই, সেই রাজর্ষি কতবার সপ্রণয়নয়নে শকুন্তলার দিকে চেয়েছিলেন ? তাতেই তাঁর হৃদয়ের অভিলাষ বেরিয়ে পড়েছে। আবার এই ক'দিনে চেহারাটাও রাতজাগা মানুষের মত রোগা হয়ে গেছে।

রাজা। তাই ত সত্যই রোগা হয়ে পড়েছি। এই যে সোনার বালাগাছটা ঢিলে হয়ে বারবার খসে পড়ছে প্রকোষ্ঠ হতে। সারারাত হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি। হৃদয়ের আগুনে চোখের জল পর্যন্ত গরম। হাত বেয়ে সেই গরম জল গড়িয়ে বালায় খচিত মণিগুলিতে লাগায় তা কালো হয়ে গেছে একেবারে। ধনুকের ছিলা টানতে টানতে প্রকোষ্ঠে বড় একটা দাগ পড়েছে। কিন্তু শরীরটা এতই শুকিয়ে গেছে যে বালাগাছাটা সে দাগের ভিতরেও বসে না, ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

প্রিয়ংবদা। (একটু ভেবে) একখানা প্রণয়পত্র রচনা করা যাক। পরে দেবতার প্রসাদের ছল করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাজাকে পাঠিয়ে দেব।

অনসূয়া। মতলবটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক, শকুন্তলা কি বলে।

শকুন্তলা। কোন দিন আমি তোদের কথায় আপত্তি করে থাকি ?

প্রিয়ংবদা। তাহলে নিজের মনের মত একটা গীতিকবিতা রচনা কর।

শকুন্তলা। আচ্ছা ভাবছি। কিন্তু পাছে সেটা কারো ভাল না লাগে এই ভয়ে বুকটা দুরদুর করে কাঁপছে।

রাজা। হে ভীরু, যে তোমার গানে কান দেবে না, তোমায় অবজ্ঞা

করবে ভাবছ, সেই ব্যক্তি একবারমাত্র তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুলিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। প্রিয়া, যে লক্ষ্মীকে চায় সে তাঁকে পাক না পাক লক্ষ্মী স্বয়ং যাকে অনুগ্রহ করতে চান সেই ব্যক্তিকে ত অতি সহজেই পেতে পারেন।

সখীদ্বয়। শকুন্তলা, তুই এমন করে নিজের গুণের অপমান করিস না। তোকে যে একবার অনুরাগের চোখে দেখেছে সে তোর গান শুনবে না বা তোর চিঠি পড়বে না এ ধারণা তোর হলো কি করে? বল দেখি, সন্তাপহারিণী শরতের জ্যোৎস্নাকে কেউ কি অঞ্চলের আবরণে আড়াল দেয়?

শকুন্তলা। (মৃদুমন্দ হেসে) তোরা যা বলছিস করছি। (উঠে বসে চিন্তা করতে লাগল)

রাজা। আহা, কি সুন্দর ছবি। নিমেষহারা নয়নে প্রিয়াকে একবার ভাল করে দেখে নিই। আমাকে যে পদে চিঠি দিতে হবে, প্রিয়া তার পদগুলি কত নিপুণভাবে চিন্তা করছে। একটা ভ্রূ মাঝে মাঝে ঈষৎ কুঞ্চিত ও ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হচ্ছে, যেন মনের মধ্যে কত ভাঙ্গা গড়া চলছে। সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে ও কপোল রোমাঞ্চিত হয়ে যেন আমার উপর সখীর অনুরাগের কথা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে।

শকুন্তলা। গান যা হোক একটা ভেবেছি, কিন্তু লিখবার ত কিছু নেই কাছে।

প্রিয়ংবদা। এই টিয়ে পাখির পেটের তলার নরম পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে কোনমতে অক্ষরগুলি লিখে নে।

শকুন্তলা। (তাই লিখল) একবার শোন ত, কেমন হলো।

সখীদ্বয়। শুনছি, বল।

(শকুন্তলা প্রণয়পত্র পড়তে লাগল)

হে নির্দয়, তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি একান্ত অনুরাগিণী হয়ে নিরন্তর সন্তাপে ভুগছি। আমার সমস্ত অঙ্গ সর্বদা তোমার ধ্যানেই নিমগ্ন। চক্ষু চায় তোমাকে দেখতে, হস্ত তোমাকে স্পর্শ করতে চায়, কর্ণ চায় তোমার মধুর কথা শুনতে এবং মুখ চায়

তোমার বিষয় আলাপ করতে। হে কঠিন, তুমি ত জান না কি দিন কি রাত্রি কন্দর্প আমাকে সন্তাপিত করছে।

রাজা। (সহসা কাছে গিয়ে) হে কৃশাঙ্গী, মদন তোমাকে তাপিত করছে সত্য, কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে না, আমাকেও নিরন্তর পুড়িয়ে মারছে। তুমি কি জান না যে দিনের বেলায় চন্দ্র যতটা বিপন্ন হন, কুমুদিনী ততটা হয় না।

সখীদ্বয়। আসুন, আসুন, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে ঠিক যে সময়টিতে আপনার দরকার সেই সময়েই এসেছেন। এটা বড়ই আনন্দের বিষয়।

(শকুন্তলা উঠতে যাচ্ছিল)

রাজা। থাক, থাক, কষ্ট করতে হবে না, অতিকোমল কুসুমশয্যায় থেকেও তোমার অঙ্গলতিকা ছটফট করছে এবং অভিনব মৃণাল-খণ্ড সমূহের সংঘর্ষণে সৌরভময় হয়েছে। সেই অতি পরিতৃপ্ত শরীরকে কষ্ট দিয়ে আমার সঙ্গে লোকাচার রক্ষা করা উচিত না। তুমি উঠো না।

অনসূয়া। বয়স্য, তাহলে আমাদের এই শিলাখণ্ডের একপাশেই বসুন।

(রাজা উপবেশন করলেন, শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরে গেল)

প্রিয়ংবদা। আপনাদের উভয়েরই অনুরাগ আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু না বললেও চলে। কিন্তু সখীর দশা দেখে চুপ করে থাকতেও পারছি না। তাই দু একটা কথা বলতে চাই।

রাজা। ভদ্রে, না বলাটা ঠিক নয়। যে কথা বলতে ইচ্ছা করে তা না বললে মনঃপীড়া হয়।

প্রিয়ংবদা। নিজের অধিকারে যারা বাস করে, তাদের দুঃখকষ্ট নিবারণ করাই কি আপনাদের প্রধান রাজধর্ম নয়?

রাজা। এর চেয়ে বড় আমাদের কোন ধর্ম নেই।

প্রিয়ংবদা। তা যদি হয় তবে আমাদের এই প্রিয়সখী আপনাকে ভেবে ভেবে এই দশায় এসে পৌঁছেছে, মদনের উৎপীড়নে এর প্রাণ

ওষ্ঠাগত, অনুগ্রহ করে এর প্রাণরক্ষা করা আপনার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ উচিত।

রাজা। ভদ্রে, এই অনুরোধে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হলাম। কিন্তু আপনার সখীর প্রাণরক্ষার জন্য যেমন অনুরোধ করছেন, দয়া করে এ অধীনের জন্যও তাঁকে একটু বলুন। দুজনেরই সমান অবস্থা।

শকুন্তলা। (প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) ও প্রিয়ংবদা, রাজর্ষির হৃদয় রমণীদের বিরহে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত। সুতরাং ওঁকে অনুরোধ উপরোধ করা বৃথা।

রাজা। হে চঞ্চলাক্ষ্মী, তুমি সর্বক্ষণই ত আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত রয়েছ। সুতরাং আমার মনের অবস্থা সমস্তই বিদিত আছ। তবু যদি আমাকে অনাসক্ত বলে মনে করো, তবে জানলাম, এতদিনে মদনের বাণে যে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, তা আজ সত্যই গেল। তোমার অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শতবার শ্রেয়ঃ।

অনসূয়া। দেখুন বয়স্য, শুনেছি, রাজা মহারাজাদের অনেক মহিষী থাকে। সুতরাং সখীর জন্য তার আত্মীয়স্বজনদের যাতে শোক-দুঃখ করতে না হয় তা দেখবেন।

রাজা। ভদ্রে, বেশী কি আর বলব ? তবে এটা স্থির জানবে যে, বহু মহিষী থাকলেও আমার কুলের শ্লাঘার কারণ কেবল দুটি—একটি নীলাদ্রিবসনা পৃথিবী আর তোমাদের সখী শকুন্তলা। চতুঃসিন্ধু-মেখলা পৃথিবীর পতি বলে আমি যতটা গৌরবান্বিত, তোমাদের সখীর প্রণয়াস্পদ বলে ততোধিক গৌরবান্বিত।

সখীদ্বয়। বুক জুড়িয়ে গেল। নিশ্চিন্ত হলাম।

প্রিয়ংবদা। (তীক্ষ্ণনয়নে দূরে চেয়ে) অনসূয়া, ঐ দেখ, এই দিকে চেয়ে ঐ হরিণের ছানাটা কত ছোটাছুটি করে তার মাকে খুঁজছে। চল, ওকে ওর মার কাছে নিয়ে দিয়ে আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

শকুন্তলা। তোরা আমাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলে কোথা যাস ? একজন অন্ততঃ ফিরে আয়।

সখীদ্বয়। পৃথিবীর যিনি আশ্রয়, তিনি তোর কাছে দাঁড়িয়ে। ভয়

কি? (প্রস্থান)

শকুন্তলা। দুজনেই চলে গেল?

রাজা। গেলেই বা, তাতে কি? ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কি করতে হবে বল—যেমন শ্রান্তি দূর করার জন্য অতি শীতল পদ্মের পাতার পাখায় ঠাণ্ডা হাওয়া করব কি? অথবা হে সুন্দরী, রক্তকমলের মত লাল পাদুখানি কোলের উপর রেখে টিপে দেব কি?

শকুন্তলা। মান্য লোকের দ্বারা ওসব কাজ করিয়ে আমি অপরাধিনী হতে চাই না। (গাত্রোত্থান করে চলে যেতে উদ্যত হলো)

রাজা। সুন্দরী, এখনো অনেক বেলা আছে আর তোমার দেহেরও এই অবস্থা, এখন ওঠা উচিত কি? কমলপত্রের দ্বারা এখনো তোমার স্তনদ্বয় সন্তাপ আশঙ্কায় ঢাকা আছে, অসহনীয় ক্লেশের গুরুভার তোমার সুকোমল অঙ্গলতিকা বহন করতে পারছে না। এ সময়ে ফুলের শয্যা ছেড়ে রৌদ্রে যাওয়া কি তোমার সঙ্গত? (বলেই জোর করে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেরালেন)

শকুন্তলা। তুমি পুরুবংশের অলঙ্কার, এমন বিনয় প্রকাশ কি তোমার সাজে? আমি যতই মদনানলে দগ্ধ হই না কেন, নিজের উপর আমার কোন প্রভুত্ব নেই। আত্মদানে আমি অসমর্থ।

রাজা। ভীরু, ভয় করছ কেন? কুলপতি কণ্ব কি শ্রৌত, কি স্মার্ত—সকল ধর্মই জানেন। তিনি যখন বুঝবেন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে তখন কোন দোষ মনে করবেন না এতে। আমি বেশ জানি, পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ অনেক বর এবং রাজর্ষিকন্যা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং ঐ সব কন্যার পিতারা সানন্দে ঐ সব গান্ধর্ব বিবাহ অনুমোদন করেছেন।

শকুন্তলা। আমাকে ছাড়। আমি সখীদের কাছে যাব।

রাজা। বেশ ত ছাড়ব।

শকুন্তলা। কখন?

রাজা। অপরিচুম্বিত ও অতিকোমল সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের মধু তৃষিত ভ্রমর যেমন পান করে তার তৃষ্ণা মেটায়, হে সুন্দরী, তেমনি করে

তোমার এই অপরিক্ষত নধর অধরের আস্বাদে আমার পিপাসার যখন শান্তি হবে তখন তোমাকে মুক্তি দেব, এখন নয়। (এই বলে রাজা শকুন্তলার মুখ উঁচু করতে চেষ্টা করতে লাগলেন আর শকুন্তলা হাত দিয়ে তা নিবারণ করতে লাগল)

(নেপথ্যে) চক্রবাকবধূ, তোমার প্রিয় সহচর অর্থাৎ চক্রবাককে সাধ মিটিয়ে আপ্যায়ণ করে নাও, কারণ রাত্রি আগতপ্রায়। রাত্রিকালে চক্রবাকমিথুন একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না।

শকুন্তলা। (অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে) হে পৌরব, নিশ্চয় আর্যা গৌতমী আমার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য এই দিকে আসছেন। আপনি শীঘ্র ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান।

রাজা। যাচ্ছি। (বলে গাছের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন)

শান্তিজলপাত্র হাতে গৌতমী ও দুই সখীর প্রবেশ

সখীদ্বয়। আর্যা গৌতমী, এই দিকে আসুন, এই দিকে।

গৌতমী। (শকুন্তলার কাছে গিয়ে) জাদু আমার, শরীরের সন্তাপের উপশম হয়েছে কি?

শকুন্তলা। একটু ভাল বোধ হচ্ছে।

গৌতমী। এই কুশাগ্রিত শান্তিজলে তোমার দেহের সকল তাপ জুড়িয়ে যাবে। (শকুন্তলার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে) বৎস, অপরাহ্ন ঘনিয়ে আসছে। চল আমরা পর্ণশালায় যাই (গমনোদ্যত)

শকুন্তলা। (মনে মনে) হে হৃদয়, যার জন্য তুমি পাগল সে যখন আপনিই এসে দেখা দিল, তখন লজ্জায় সংকোচে কি হয়ে গেলে আর এখন সে কোথায় গেল ভেবে অনুতাপে মরছ। এখন অমন কর কেন? (যেতে যেতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বললে) হে লতামণ্ডপ, হে আমার সর্বসন্তাপনিবারণ, অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি আবার এস ভাল করে ভোগ করার জন্য (বলে দুঃখের সঙ্গে সকলের সঙ্গে চলে গেলেন)

রাজা। (পূর্বস্থানে এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) হায়, যে যা চায় তার সে পথে কত বাধা! কি করলাম আমি? সেই কুঞ্চিতনয়না শকুন্তলার

মুখখানি যখন আমি উঁচু করে ধরেছিলাম এবং সে আঙ্গুল দিয়ে অধরোষ্ঠ ঢেকে 'না হবে না, হবে না' বলছিল, এবং তাতে সেই মুখের সৌন্দর্য যেন শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল, শেষে মুখখানা কাঁধের দিকে বাঁকিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, হায়, তখন আমি তার উঁচু করা মুখে চুম্বন করলাম বা কেন ? কেউ তখন বাধা দেবার ছিল না। এখন যাই কোথায় ? কোথায় গিয়ে এই তাপিত প্রাণ জুড়োই ? অন্যত্র কোথায় যাব ? তার থেকে যে লতামণ্ডপে প্রিয়া ছিল, কতরকমে ভোগ করেছে, এখন সে নেই। সব যেন শূন্য, একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। তবু ঐখানে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাই। এই যে শীতল শিলাখণ্ডের উপর তার ফুলের শয্যা এখনো পড়ে আছে। বিচ্ছেদতাপে তার উপর ছটফট করত বলে ফুলগুলি কেমন নিষ্পেষিত মনে হচ্ছে। এই যে ফুলশয্যার পাশে পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে লেখা তার এই প্রণয়পত্রখানি কেমন মলিন হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হাতের মৃণালের বালাগাছিটিও ধুলোয় গড়াচ্ছে। যেদিকেই চাই, সব দেখি তার স্মৃতিচিহ্নে ভরা। শূন্য হলেও তার জাজ্জ্বল্যমান স্মৃতিতে ভরা এই লতাকুঞ্জ হতে চোখ ফেরাতে পারছি না। বেরিয়ে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

(কোন দিক হতে কে যেন বলতে লাগল)

হে রাজন, সর্বনাশ উপস্থিত। আশ্রমে সান্ধ্যকালীন হোমাদি কার্য আরম্ভ হতেই সেই হোমানলোজ্জ্বল যজ্ঞবেদীর চারদিকে, সান্ধ্য মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ এবং ভীতিজনক রাক্ষসদের ছায়া পড়ছে। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসের আক্রমণ-আশঙ্কায় আমরা সকল আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছি।

রাজা। তাই নাকি ? আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

কুসুমচয়নরত সখীদ্বয়ের প্রবেশ

অনসূয়া। প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্বদ্বারা শকুন্তলা যোগ্য পতি লাভ করেছে, তার সব বিপদ কেটে গেছে এবং এই জন্য আমার হৃদয় নিশ্চিন্ত

হয়েছে, তবুও একটা বিষম ভাবনার বিষয় আছে।

প্রিয়ংবদা। কি সে ভাবনা ?

অনসূয়া। আশ্রমের যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় ঋষিরা রাজর্ষি দুষ্মন্তকে বিদায় দিয়েছেন। তিনিও নিজের রাজধানীতে গিয়ে অন্তঃপুরের আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করছেন। এখন কি আর আশ্রমের কোন কথা মনে আছে ? এটাই আমার ভাবনার বিষয়।

প্রিয়ংবদা। এর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। এমন আকৃতির পুরুষ কখনো পাষাণ হতে পারে না। আমার কিন্তু অন্য চিন্তা। তাত কণ্ব এই ব্যাপারটা শুনে না জানি কি করে বসেন।

অনসূয়া। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই অনুমতি দেবেন।

প্রিয়ংবদা। কি করে বুঝলি ?

অনসূয়া। দেখ, গুণবান পাত্রে কন্যাদান করাই জনকজননীর প্রধান অভিলাষ। দৈব কৃপায় যদি সে পাত্র অনায়াসেই পাওয়া যায় তবে ত সেটা গুরুজনদের সৌভাগ্যের কথা।

প্রিয়ংবদা। (ফুলের সাজির দিকে চেয়ে) সখী, পূজার উপযুক্ত ফুল ত তোলা হয়েছে।

অনসূয়া। আরো তুলতে হবে। শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চনা করতে হবে।

প্রিয়ংবদা। ঠিক বলেছ। (আবার দুজনেই ফুল তুলতে লাগল)

(নেপথ্যে) এই আমি গো।

অনসূয়া। (কান পেতে শুনে) সখী, কোন অতিথি এসে ডাকছে না ত ?

প্রিয়ংবদা। ডাকুক না, শকুন্তলা ত কুটিরেই আছে। (আত্মগত) তবে সে আর নিজের মধ্যে নেই। শকুন্তলা আছে সত্য, কিন্তু তার হৃদয় আর তাতে নেই।

অনসূয়া। থাক। এই ফুলেই হয়ে যাবে। (উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) এত বড় স্পর্ধা! তবে শোন অতিথির অবমাননাকারিণী,

আমি দুর্বাসা, সারাজীবন তপস্যা ছাড়া যার অন্য কোন কাজ নেই সেই আমি তোর দরজায় দাঁড়িয়ে আর তোর খেয়াল নেই। যার ভাবনায় আত্মহারা হয়ে তুই আমায় চিনতে পারলি না, হাজার মনে করিয়ে দিলেও মাতাল যেমন তার প্রথম প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করতে পারে না তেমনি সেই ব্যক্তিও তোর কথা কিছুতেই মনে করতে পারবে না।

প্রিয়ংবদা। হায়, হায়, কি সর্বনাশ হলো। কোন পূজনীয় ব্যক্তির কাছে অপরাধ করে বসল শকুন্তলা। ও ত এখন আর ওর মধ্যে নেই। (সামনে চেয়ে) ও বাবা, এ যে মহর্ষি দুর্বাসা। সামান্য ত্রুটিতে যিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠেন। এত বড় একটা অভিশাপ দিয়ে হন হন করে সবেগে চলে যাচ্ছেন। কার সাধ্য ওঁকে ফেরায়। আগুন ছাড়া কে আর দগ্ধ করতে পারে ?

অনসূয়া। ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে থামা গিয়ে। আমি এর মধ্যে পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসছি।

প্রিয়ংবদা। যাচ্ছি। (প্রস্থান)

অনসূয়া। (যেতে যেতে পা পিছলে গেল) হায়, এ কি হলো? যেতে যেতে পা পিছলে গিয়ে আমার হাত থেকে পুষ্পপাত্র পড়ে গেল। এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন। (ফুলগুলো কুড়োতে লাগল)

প্রিয়ংবদার প্রবেশ

প্রিয়ংবদা। সখী, ঋষির স্বভাবটা বড় কুটিল। কারো স্তুতিমিনতি শুনতে চায় না। তবু অতি কষ্টে একটু নরম করেছি।

অনসূয়া। বল ত, কি করলি ?

প্রিয়ংবদা। যখন ফিরতে চান না, তখন বললাম, ভগবান, শকুন্তলা আপনার কন্যার মত। তপস্যার ক্ষমতা যে কত বড় তা যদি সে জানত, তবে কি এতবড় অপরাধ কখনো করতে পারত ? প্রথম অপরাধ মনে করে এটা তাঁর ক্ষমা করুন।

অনসূয়া। তারপর ?

প্রিয়ংবদা। শেষে বললেন, আমার কথা কখনো নড়তে পারে না, তবে এইটুকু করতে পারি যে কোনরূপ অভিজ্ঞান বা চিহ্ন যদি দেখাতে

পারে তাহলে এ অভিশাপের মোচন হবে।—এই কথা বলতে বলতে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি।

অনসূয়া। তাহলে এখন মনকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে। রাজর্ষি দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যাবার সময় 'এই স্মৃতিচিহ্নটা থাকুক' বলে তাঁর নিজের নামাঙ্কিত আংটিটা নিজের হাতে সখীকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং প্রয়োজন হলে শকুন্তলাকে নিজেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কারো দরকার হবে না।

প্রিয়ংবদা। সখী, চল দেবার্চনাটা সেরে ফেলি। (উভয়ে এগিয়ে গেল)

প্রিয়ংবদা। (সামনে চেয়ে) অনসূয়া, একবার চেয়ে দেখ, বাঁ হাতে মুখ রেখে শকুন্তলা কিভাবে বসে আছে। রাজর্ষির ভাবনায় ও নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, অতিথির কথা ত দূরের ব্যাপার।

অনসূয়া। প্রিয়ংবদা, এখন এসব কথা বলো না বাইরে, মুখেই থাক। প্রিয়সখী শকুন্তলা বড় নরম প্রকৃতির মেয়ে। তাকে রক্ষা করতে হবে ত।

প্রিয়ংবদা। তা আর বলতে হবে না। নবমল্লিকালতায় কে আর গরম জল ঢেলে দেয়। (উভয়ের প্রস্থান)

ঘুম হতে ওঠা কণ্বের জনৈক শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। গুরুদেব কাশ্যপ (কণ্ব) গত রাত্রিতে প্রবাস হতে ফিরে এসেই আমাকে আদেশ দিয়েছেন, প্রভাতের দিকে দৃষ্টি রেখো, খুব ভোরে এসে খবর দিও। তাই বেরিয়ে গিয়ে দেখি, রাত্রি আছে কি নেই। (বেরিয়ে এসে চারদিক দেখ) ভোর হয়ে গেছে দেখছি। প্রভাতকালের কি অপূর্ব সৌন্দর্য! ব্রীহি, যব, গোধূম, কলায় প্রভৃতি ওষধিসমূহের পরম শ্রীসম্পাদনের অধিপতি চন্দ্র ঐ পশ্চিমদিকে অস্তগমন করছেন। যাবার সময় সেই নিশাকালোচিত বিশ্ববিমোহন ও নয়নানন্দ সৌন্দর্যের কিছুই নেই। আর পূর্বদিকে ত্রিজগতের অর্চনীয় সূর্যদেব আবির্ভূত হচ্ছেন। তাঁর এই উদয়কালে তাঁর পুরোভাগে অরুণ আসছেন। সহস্র-রশ্মির ত কথাই নেই, ঐ অরুণের প্রভাবেই জগতের সকল অন্ধকার অপসৃত

হয়েছে এবং ব্রহ্মাণ্ড লোহিতাভ হয়ে উঠেছে। যাঁর অস্তগমন তিনি একা আর যাঁর অভ্যুদয় তাঁর আগে আগে কত জাঁকজমক! তিনি আজ অর্ক, অর্চনীয়। অভ্যুদয়শীল সূর্যদেবকে অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা করতে জগৎ-বাসীরা সমুৎসুক। উত্থান ও পতনের কি অপূর্ব দৃশ্য! আজ একই সময়ে এই তেজোময় বস্তুদ্বয় বিপদ ও সম্পদের দ্বারা নিজ নিজ দুঃখের ও সুখের দশার মধ্য দিয়ে জীবকে যেন শিক্ষা দিচ্ছে, চিরদিন কখনো সমান যায় না। ঐ ত আকাশে অস্তগমনোদ্যত চন্দ্রের এবং উদয়োন্মুখ সূর্যের ঐ অবস্থা। আবার এদিকে ধবাতলে ঐ সরোবরে ঐ কুমুদিনীর কি শোচনীয় দশা। চন্দ্রমাশালিনী গত রজনীতে যে কুমুদিনীর দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যেত সেই কুমুদিনী চন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সে নৈশ সৌন্দর্যের এখন লেশমাত্র নেই। কুমুদিনীর সেই অনুপমকান্তি স্মৃতির বিষয় হয়ে উঠেছে এখন। কুমুদবিরহে অচেতন কুমুদিনীর যখন এই অবস্থা তখন না জানি, যারা চৈতন্যসম্পন্ন অথচ, সম্পূর্ণ অসহায়, প্রতিকারের কোন উপায় যাদের নেই, সেই সব অবলা ললনাদের পক্ষে বাঞ্ছিত প্রিয়ব্যক্তির দূরদেশে অবস্থানে কত অসহ্য কষ্টই হয়।

যবনিকা না সরিয়ে অনসূয়া প্রবেশ করল

অনসূয়া। জটিল সংসারের ব্যাপার কত জটিলতম! সংসারী লোকেরা কেমন ব্যবহার করতে পারে, কোনটা তাদের কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য সে বিষয়ে অসংসারী বনবাসীরা বিন্দুবিসর্গও জানে না, তবু একথা বলতে পারি যে রাজার পক্ষে শকুন্তলার প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয়নি। বরং তিনি শকুন্তলার উপর ঘোর অবিচারই করেছেন। এতদিন কি এত চুপচাপ থাকা উচিত হয়েছে।

শিষ্য। যাই, গুরুকে বলি গিয়ে হোমের সময় আগতপ্রায়। (প্রস্থান)

অনসূয়া। অনেকক্ষণ জেগেছি। কিন্তু জেগে উঠেই বা কি করব? রোজ সকালে উঠে যে সব অবশ্য করণীয় কাজগুলি করি, আজ সে সকল কাজেও হাত পা নড়তে চাইছে না। কন্দর্পের বাসনাই পূর্ণ হোক, শকুন্তলাকে পুড়িয়ে মারুক। কন্দর্পই ত এই সর্বনাশ ঘটাল। যে

মিথ্যাবাদী, যার প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই সেই প্রতারক দুষ্মন্তের জন্য আমাদের নির্মল ও সরলহৃদয়া কন্দর্পই ত পাগল করে তুলল। অথবা দুষ্মন্তের এই ভুলে থাকায় হয়ত কোন দোষ নেই, দুর্বাসার অভিশাপেই তার এমন বিস্মৃতি ঘটেছে। তা না হলে অতবড় রাজর্ষি অত কথা বলে, অমন প্রতিজ্ঞা করে এতদিনে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখল না—এ কি করে হয়? আচ্ছা, এখান থেকে সেই নামাঙ্কিত আংটিটি চিহ্নস্বরূপ পাঠাই না কেন? তা দেখে রাজার মনে পড়তে পারে সব কথা। কিন্তু কাকেই বা অনুরোধ করি? সকল তপস্বীর জীবনই ত অনন্ত কৃচ্ছ্রকষ্টময়। তাদের এসব কথা বলতে দ্বিধা হয়। পাছে সখীর উপর দোষ চাপে, সে অপরাধিনী হয়। এইজন্য প্রবাস থেকে ফিরে এলেও তাতঃ কন্বকে একথা বলতে পারছি না। কতবার বলি বলি করেও বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না। কোন মুখে তাঁর কাছে বলব যে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পরিণয় হয়ে গেছে এবং সে এখন গর্ভবতী? তিনি কি ভাববেন? এখন কি করি?

প্রিয়ংবদার প্রবেশ

প্রিয়ংবদা। (আনন্দের সঙ্গে) তাড়াতাড়ি চল, শকুন্তলা এখনি যাবে। তার যাত্রাকালের মঙ্গলাচারগুলি করতে হবে।

অনসূয়া। সে কি সখী! বলিস কি?

প্রিয়ংবদা। শোন তবে। রাত্রিতে ঘুম হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে এইমাত্র আমি শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।

অনসূয়া। তারপর?

প্রিয়ংবদা। গিয়ে দেখলাম, শকুন্তলা মাথা নিচু করে আর তাতঃ কণ্ব নিজে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলছেন, বাঃ, খুব ভাল হয়েছে। হোমানলের ধূমে যজমানের চোখ যতই আঁধার হোক না কেন, তার প্রদত্ত আহুতি ঠিক যজ্ঞাগ্নিতেই পড়েছে। আমি তোমার জন্য যতই উদ্বিগ্ন হই না কেন, যজ্ঞীয় আহুতির মত আমার পবিত্র কন্যা যে উপযুক্ত পাত্রেই মিলিত হয়েছে, এটা আনন্দের বিষয়। অধ্যাপনার উপযুক্ত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ শিষ্যকে বিদ্যাদান করলে যেমন সে

বিদ্যার অপব্যবহারের জন্য কোনদিন দুঃখ করতে হয় না, তেমনি তুমিও উপযুক্ত বরে সঙ্গত হওয়ায় তোমার জন্য আমাকে কখনো অনুতাপ করতে হবে না। আজই আমি তোমাকে কয়েকজন ঋষির সঙ্গে তোমার পতির কাছে পাঠাব।

অনসূয়া। তা ত বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তাত কণ্বকে বললে কে?

প্রিয়ংবদা। তিনি যখন হোমগৃহে প্রবেশ করলেন তখন কাব্যময় এক আকাশবাণী সব প্রকাশ করে দিল।

অনসূয়া। সে বাণী কি বলল?

প্রিয়ংবদা। হে ব্রাহ্মণ, তোমার এই কন্যা জগতের কল্যাণার্থে নানা গুণগরিমালঙ্কৃত দুষ্মন্তদ্বারা নিষিক্ত তেজ ধারণ করেছেন। অন্তর্জলিতানল শমীবৃক্ষের মত এই কন্যাকে তুমি অতীব পবিত্র ও জগৎপাবনী বলে জ্ঞান করবে।

অনসূয়া। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) সখী, বড়ই সুখের খবর। কিন্তু আজই শকুন্তলাকে পাঠানো হবে শুনে যেমন সুখ হচ্ছে তেমনি মনে কষ্টও হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা। সখী, আমরা যেমন করে হোক কোনমতে মনের দুঃখ নিবারণ করব, কিন্তু সেই দুঃখিনীর দুঃখ তো ঘুচবে।

অনসূয়া। তাহলে একটা কাজ কর। এই যে নারকেলপত্রের তৈরী ঝাঁপিটা দেখছিস তার মধ্যে শকুন্তলার যাবার দিনে সাজিয়ে দেব বলে একছড়া বকুল ফুলের মালা রেখে দিয়েছি। কেন না, এভাবে রাখলে মালা শুকিয়ে যায় না। সেই মালাগাছটা নিয়ে আয়। আমিও এদিকে গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূর্বার শিস্ প্রভৃতি মাঙ্গল্যজিনিসগুলি গুছিয়ে রাখি।

প্রিয়ংবদা। তাই কর।

অনসূয়া। (চলে গেল)

প্রিয়ংবদা। (পায়ের উপর ভর দিয়ে বকুলমালা পাড়তে লাগল) (নেপথ্যে) গৌতমী, শকুন্তলাকে নিয়ে আসার জন্য শাঙ্গরব প্রভৃতিকে

আদেশ কর।

প্রিয়ংবদা। (কান পেতে শুনে) অনসূয়া, তাড়াতাড়ি কর। ঐ শোন। হস্তিনাপুরে যাবার জন্য ঋষিদের ডাকাডাকি করা হচ্ছে।

অনসূয়া। চল, আমরাও যাই। দেখিগে। (উভয়ে অগ্রসর হলো)

প্রিয়ংবদা। (দেখে) এই যে সূর্যদেব উঠতে না উঠতে একমাথা চুলসুদ্ধ স্নান করে এসে শকুন্তলা বসে আছে আর প্রবীণ তপস্বিণীরা কেউ হাতে ধানদূর্বা নিয়ে, কেউ স্বস্তিপাঠ করতে করতে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করছে। চল, কাছে যাই। (নিকটে গেল)

(শকুন্তলা আসনে উপবিষ্টা। আশীর্বাদকারিণী তাপসীদেব মধ্যে)

প্রথমা। আশীর্বাদ করি, পতির অশেষ সম্মানজ্ঞাপক 'মহাদেবী' আখ্যায় ভূষিত হও।

দ্বিতীয়া। বৎস, বীরপুত্রের জননী হও।

তৃতীয়া। বৎস, স্বামীর অনন্ত সম্মান ও আদরের পাত্র হও।

(আশীর্বাদশেষে গৌতমী ছাড়া অন্যান্য তাপসীদের প্রস্থান)

সখীদ্বয়। (নিকটে গিয়ে) সখী, তোমার আজকের এই প্রাতঃকাল সারাজীবনের সুখের স্নানে পরিণত হোক। পতিগৃহে গিয়ে চিরকাল সুখে যাপন করো।

শকুন্তলা। আয় তোরা, এইখানে বস।

সখীদ্বয়। (মাঙ্গল্যদ্রব্যের পাত্র হাতে বসে) ঠিক হয়ে বস। সাজিয়ে দেব।

শকুন্তলা। তোরা আজ সাজিয়ে দিবি—এটা আমার পক্ষে কত আগ্রহের। কেন না, আজ হতে সখীদের হাতের সাজগোজ আমার পক্ষে কত দুর্লভ। আর কবে এমন দিন আসবে? (অশ্রু বিসর্জন)

সখীদ্বয়। সখী, এই শুভমুহূর্তে তোর কি কাঁদা উচিত? কাঁদিস না। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজাতে লাগল)

প্রিয়ংবদা। আহা, গয়না পরার মত তোর চেহারা। আশ্রমের লতাপাতা দিয়ে সাজানো মানে এ রূপের অপমান করা।

(অলঙ্কার হাতে নিয়ে দুজন ঋষিবালকের প্রবেশ)

ঋষিবালকদ্বয়। এই নাও অলঙ্কার। একে সাজিয়ে দাও।

(হঠাৎ অলঙ্কার দেখে সকলে বিস্মিত হলো)

গৌতমী। বাছা হারীত, কোথা হতে এসব পেলে ?

প্রথম বালক। পূজনীয় গুরুদেব কাশ্যপের মাহাত্ম্যে।

গৌতমী। ইচ্ছামাত্র তপোপ্রভাবে কি এই সব অলঙ্কার আবির্ভূত হয়েছে ?

দ্বিতীয়। না, তিনি আমাদের আদেশ করলেন, শকুন্তলার জন্য বনস্পতিসমূহ হতে কিছু ফল তুলে নিয়ে এস। আমরা গিয়ে দেখলাম, কোন বনস্পতি চন্দ্রের মত শুভ্র ও মঙ্গলকর্মের উপযুক্ত ক্ষৌমবসন দান করছে, কোন তরু হতে চরণ উপরঞ্জনের যোগ্য অলক্তরস নিঃসৃত হচ্ছে। আবার কোন কোন তরুর অচিরোদ্গত ও আলোহিত পল্লবস্তবকের মধ্য হতে বনদেবতার রক্তাভ করতলের অঙ্গুলিমূল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আর সেই ঈষৎ-কম্পিত অঙ্গুলিগুচ্ছ নানা আভরণ প্রদান করছে। সেই কম্পিত অঙ্গুলিমালার দিকে চাইলে মনে হয় তারা যেন সমীরচঞ্চল নব-পল্লবাবলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সৌন্দর্য বর্ষণ করছে।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার দিকে চেয়ে) সখী, বিনা প্রার্থনায় বন-দেবতার এই অনুগ্রহে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পতিগৃহে গিয়ে তুমি রাজ-রাণী হতে পারবে।

(শকুন্তলা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়ল)

প্রথম বালক। গৌতমী চল। এতক্ষণে গুরুদেব কাশ্যপ নিশ্চয় স্নান হতে ফিরে এসেছেন। চল, তাঁর কাছে গিয়ে তরুরাজির এই দানের কথা নিবেদন করি।

দ্বিতীয়। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

সখীদ্বয়। অলঙ্কার তো কখনো পরিনি, তাই কোথায় কি পরতে হয় তা জানি না। তবে ছবিতে অলঙ্কৃত মূর্তি দেখে থাকি এবং এঁকেও থাকি। তাই কিছুটা জ্ঞান আছে। সেইভাবে তোর অঙ্গে যেখানে যা লাগে তা পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি।

শকুন্তলা। তোরা কি জানিস না জানিস তা আমি বিলক্ষণ জানি।

(সখীদ্বয় শকুন্তলাকে অলঙ্কার পরাতে লাগল)

স্নানান্তে মহর্ষি কাশ্যপের প্রবেশ

কাশ্যপ। আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে বলে আমার মন উৎকণ্ঠিত হচ্ছে। বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার নয়নদ্বয়। কণ্ঠরোধ হয়ে বাক্‌শক্তিরহিত হচ্ছি। জড়তায় অভিভূত হয়ে পড়ছি। কি আশ্চর্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত এখন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করে থাকে। বুঝলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু। (শকুন্তলার কাছে ধীরে এসে দাঁড়ালেন)

সখীদ্বয়। শকুন্তলা, অলঙ্কার পরানো শেষ হয়েছে। এখন এই ক্ষৌমবসন দুটি পর।

(শকুন্তলা দাঁড়িয়ে পরতে লাগল)

গৌতমী। বাছা শকুন্তলা, ঐ দেখ, তোমার পিতা এসেছেন। তোমার দিকে কেমন তাকিয়ে আছেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন ঐ আনন্দজলধারাবর্ষী নয়নদ্বয় দিয়ে তোমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করছেন। প্রণাম করো।

শকুন্তলা। (সলজ্জভাবে) পিতা, প্রণাম করছি।

কাশ্যপ। মা, শর্মিষ্ঠা যেমন রাজা যযাতির অশেষ সম্মানভাজন এবং তাঁর হৃদয়ের অনুকূল ছিলেন, তুমিও সেইরূপ হও। আর শর্মিষ্ঠা যেমন সম্রাট পুরুকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, তুমিও তেমনি একটি সম্রাট-পুত্র লাভ করো।

গৌতমী। ভগবান, এ ত আশীর্বাদ নয়, এ বর। এর থেকে বড় কাম্যবস্তু মার পক্ষে আর নেই।

কাশ্যপ। বৎসে, এইমাত্র ঐ পুরোবর্তী অগ্নিতে হোম করা হয়েছে, তুমি প্রদক্ষিণ করো। (সকলে প্রদক্ষিণ করল এবং কাশ্যপ ঋগ্‌বেদীয় ছন্দে আশীর্বাদ করতে লাগলেন) মা, ঐ যে বেদীর চারদিকে মন্ত্রপূত স্থানে সমিধযুক্ত হোমানল সংস্থাপিত এবং তার প্রান্তভাগ কুশাস্তরণে

সমাবেষ্টিত। আহুত আজ্যের পবিত্র সৌরভে ঐ অনল সমস্ত কলুষ নাশ করছে। ঐ যজ্ঞাগ্নি তোমাকেও পবিত্র করুক, তার সৌরভসংস্পর্শে তোমার সমস্ত মালিন্য বিদূরিত হোক। এখন অগ্রসর হও। (চারদিকে তাকিয়ে) এখন শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায় ?

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। ভগবান, এই যে আমরা।

কাশ্যপ। তোমার ভগিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

শার্ঙ্গরব। এইদিকে এস ভদ্রে। (সকলের প্রস্থান)

কাশ্যপ। হে সন্নিহিত তরুগণ, তোমাদের জলসেচন না করে যিনি কখনো জলপান করতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হয়েও স্নেহবশতঃ কখনো তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় যাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, আজ সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন করো। (কোকিলকূজন শ্রবণ করে) একত্র বনে বাস করার জন্য শকুন্তলার পরম বন্ধু তরুগণ প্রসন্নচিত্তে শকুন্তলাকে গমনের অনুমতি দান করছে। আমি ওদের অনুমোদন প্রার্থনা করে-ছিলাম। তারা ঐ মধুর কোকিলকূজনের দ্বারা আমার প্রার্থনার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

(আকাশে দৈববাণী)

আজ শকুন্তলার গমনের পথ সর্বতোভাবে সুখকর ও মঙ্গলময় হোক। স্থানে স্থানে পথের ধারের সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত কমলদলে পরিপূর্ণ ও হরিদ্বর্ণ তৃণরাজিতে পরিশোভিত হোক। শকুন্তলার গমনপথ ছায়া-শীতল তরুরাজিতে আবৃত হয়ে প্রখর সৌরখরতাপ নিবারণ করুক। কমলের পরাগরাশির মত ঐ পথের ধূলিরাশি সুখস্পর্শ ও সুকোমল হোক। আজ ধীর সমীর অনুকূলভাবে প্রবাহিত হয়ে শকুন্তলার গমনপথ সর্বাংশে সুখময় করে তুলুক। (সকলে আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগল)

গৌতমী। বাছা শকুন্তলা, স্বজনের মত স্নেহময়ী তপোবন-দেবতারাও ঐ শোন, তোমাকে পতিগৃহে গমনের অনুমতি দান করছে।

মা, দেবীদের প্রণাম করো।

শকুন্তলা। (দুই এক পা এগিয়ে গিয়ে) সখী প্রিয়ংবদা, আর্য-পুত্রকে দেখবার জন্য যদিও আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে, তথাপি আশ্রম পরিত্যাগ করে যেতে আমার পা আর উঠছে না, চলতে চাইছে না।

প্রিয়ংবদা। সখী, তুমিই যে কেবল তপোবন পরিত্যাগের দুঃখে কাতর হয়েছ তা নয়, আজ তোমার বিরহ স্মরণে তপোবনের কি দশা হয়েছে—একবার চেয়ে দেখ। মৃগকুলের মুখ হতে অর্ধচর্বিত কুশগুলি আপনিই পড়ে যাচ্ছে, ময়ূরগণ চিরপরিচিত নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, লতারাজি হতে পাণ্ডুবর্ণের পাতাগুলি খসে পড়েছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন তারাও তোমার বিচ্ছেদদুঃখে অশ্রুবর্ষণ করছে।

শকুন্তলা। (হঠাৎ মনে পড়ায়) পিতা, আমার লতাভগিনী বন-জ্যোৎস্নাকে একবার অভিবাদন করে আসি।

কাশ্যপ। জানি মা, তাকে তুমি ভগিনীর মতই ভালবাস। এই দক্ষিণদিকে সেই লতা।

শকুন্তলা। (লতাটিকে তুলে ধরে) বনতোষিণী, তুমি তোমার অভীষ্ট সহকারতরুর সঙ্গে মিলিত হয়েছ বটে, তবু একবার ক্ষণিকের জন্য তোমার শাখারূপ বাহু এইদিকে প্রসারিত করে আমাকে আলিঙ্গন করো। আজ হতে আমি তোমাকে ছেড়ে চললাম।

কাশ্যপ। মা শকুন্তলা, আমি প্রথম হতে তোমার জন্য ভেবেছিলাম, নিজের পুণ্যবলে তুমি আমার সংকল্পানুরূপ পাত্রলাভ করেছ আর এই নবমালিকা লতাও সহকারতরুকে আশ্রয় করেছে। সুতরাং মা, এই লতা ও তুমি তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হলাম। এইদিকে পথ, অগ্রসর হও।

শকুন্তলা। (সখীদের প্রতি) সখী, তোমাদের দুজনের হাতে এই লতাকে দিয়ে গেলাম।

সখীদ্বয়। আমাদের কার হাতে দিয়ে যাচ্ছ? (অশ্রুবিসর্জন)

কাশ্যপ। অনসূয়া, কেঁদে লাভ কি? কেঁদো না। তোমরাই না শকুন্তলাকে স্থির করবে? (সকলের অগ্রগমন)

শকুন্তলা। পিতা, এই মৃগবধূটি গর্ভভারে এতই অলস হয়েছে যে পর্ণশাখার ধারে ধারেই ঘুরে বেড়ায়। দূরে যেতে পারে না। এ যখন একটি সুসন্তান প্রসব করবে, আমাকে খবর দিতে ভুলবেন না। কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।

কাশ্যপ। মা, একথা ভুলব না।

শকুন্তলা। (গমনে বাধা পেয়ে) আমার পরিধেয় বসনে এসে কি জড়িয়ে যাচ্ছে ? (ফিরে দাঁড়ালেন)

কাশ্যপ। বৎসে, যে মৃগশিশুর মুখ সুতীক্ষ্ম কুশাগ্রে ক্ষতবিক্ষত হলে তুমি নিজের হাতে ইঙ্গুদীফলের তেল লেপন করে তা প্রশমিত করতে এবং মুঠো মুঠো শ্যামা ধানের শীষ খাইয়ে যাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলে, যাকে তুমি পুত্রের মত স্নেহ করতে সেই মৃগশিশু এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই সরছে না।

শকুন্তলা। বাছা, আর কেন? আজ তোদের সংসর্গ চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি। আমার অনুসরণে লাভ কি? প্রসবের পরই তোর মা মরে যাওয়ায় মাতৃহীন তোকে আমিই মানুষ করেছিলাম। আজ আমিও চললাম। পিতৃদেব তোকে দেখবেন। (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

কাশ্যপ। শকুন্তলা, অশ্রুভারে তোমার চোখের পাতা আড়ষ্ট হয়েছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। অশ্রু সংবরণ করো। তা না হলে এই উঁচু নিচু পথে প্রতিপদেই তোমার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে। পথ বড়ই বিষম।

শার্ঙ্গরব। ভগবান, শাস্ত্রে আছে জল পর্যন্ত প্রিয়জনের অনুগমন করাই বিধেয়। এই ত সরোবরের তীর, এখানে দাঁড়িয়ে যা বলার বলে ফিরে গেলে ভাল হয় না?

কাশ্যপ। তাহলে এস, এই বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আমরা দাঁড়াই।

(সকলে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল)

কাশ্যপ। (আত্মগত) সেই রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের উপযুক্ত কি কথা বলা যেতে পারে ? (চিন্তা করতে লাগলেন)

শকুন্তলা। (জনান্তিকে অনসূয়াকে) একবার চেয়ে দেখ সখী, সহচর চক্রবাক একটু পদ্মপাতার আড়ালে যাওয়ায় তাকে দেখতে না পেয়ে কেমন কাতর হয়ে পড়েছে চক্রবাকী এবং কত আর্তনাদ করছে। উঃ, আমি কি অপরাধই না করছি, কতদিন প্রিয়তমকে ছেড়ে আছি।

অনসূয়া। ওকথা বলো না সখী, এই চক্রবাকীও ত প্রিয়তম চক্রবাককে ছেড়ে কত শত দীর্ঘ রজনী কাটিয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন মিলন ত এর ভাগ্যেও ঘটে না। বিরহের দুঃখ যত দুঃসহ হোক না কেন, মিলনের আশায় তা সহ্য করতে হয়।

কাশ্যপ। শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে দাঁড় করিয়ে আমার অভিপ্রায়-মতে এই কথাগুলি রাজাকে বলবে।

শার্ঙ্গরব। ভগবান, আদেশ করুন।

কাশ্যপ। বলবে আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি। তুমিও অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমার অনুরাগিনী হয়েছে। এই সমস্ত বিবেচনা করে অন্যান্য সহধর্মিণীর মত শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখবে। আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা। এর বেশী তার ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে, তা আমাদের বলে দেবার নয়।

শার্ঙ্গরব। এই কথাগুলি আমি মনে গেঁথে রাখলাম।

কাশ্যপ। বৎসে, এখন তোমাকেও দু একটি উপদেশ দেব। আমরা যতই বনবাসী হই না কেন সাংসারিক ব্যাপারেও নিতান্তই অজ্ঞ নই।

শার্ঙ্গরব। যারা ধী বা প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন তাঁদের বুদ্ধির অগোচর কি থাকতে পারে?

কাশ্যপ। তুমি পতিগৃহে গিয়ে গুরুজনদের শুশ্রূষা করবে, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করবে। পরিচারিকাদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশে কার্পণ্য করবে না, নিজের সৌভাগ্যগর্বে কখনো গর্বিত হবে না। স্বামী যতই কর্কশ ব্যবহার করুন না কেন, তুমি কখনো ক্রোধের বশীভূতা বা বিরুদ্ধাচারিণী হবে না। শকুন্তলা, রমণীরা এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে থাকে।

যারা এর বিপরীত ব্যবহার করে তারা কুলের পীড়াস্বরূপ। এ সম্বন্ধে গৌতমী কি মনে করেন?

গৌতমী। বধূদের পক্ষে এই ত ঠিক উপদেশ। কথাগুলি মনে গেঁথে রেখো। বৎসে, আমাকে ও তোমার সখীদের আলিঙ্গন করো।

শকুন্তলা। তাতঃ, প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা কি এখান হতেই ফিরে যাবে?

কাশ্যপ। বৎসে, এদের দুজনকেও ত সম্প্রদান করতে হবে। এদের সেখানে যাওয়া আজ হবে না। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাবেন।

শকুন্তলা। (পিতাকে জড়িয়ে ধরে) পিতা, মলয়তরু হতে উন্মূলিত চন্দনলতার মত আপনার অঙ্ক হতে স্খলিত হয়ে কিকরে আমি অপরিচিত দেশে প্রাণধারণ করব?

কাশ্যপ। মা, এত আকুল হচ্ছ কেন? তোমায় ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ স্বামীর বিরাট সংসারের গৌরবপূর্ণ গৃহিণীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যখন তুমি বড় বড় সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে নিশিদিন ব্যস্ত থাকবে এবং পূর্বদিক যেমন জগৎপাবন সূর্যকে প্রসব করে তেমনি তুমিও লোকপাবন পুত্র প্রসব করবে তখন আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ আর মনেও পড়বে না।

(শকুন্তলা পিতার পায়ের উপর পড়ল)

কাশ্যপ। যা ভাবছি তোমার তাই হোক।

শকুন্তলা। (সখীদ্বয়ের কাছে গিয়ে) তোরা দুজনে এখন আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করে) সখী, রাজার যদি তোকে চিনতে বিলম্ব হয় তাহলে এই আংটিটি দেখাস।

শকুন্তলা। তোদের এ কথায় বুক আমার কেঁপে উঠছে।

সখীদ্বয়। সখী ভয় পাস না। স্নেহের ধর্মই হলো মন্দটা আশঙ্কা করা।

শার্ঙ্গরব। বেলা দ্বিপ্রহর হলো। শকুন্তলা, একটু তাড়াতাড়ি করো।

শকুন্তলা। (আশ্রমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) পিতা, আবার কবে আশ্রম দেখতে পাব ?

কাশ্যপ। দেখবে বৎসে, সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হয়ে এবং অপ্রতিহতপ্রভাব নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে ও তার হাতে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখে পতির সঙ্গে পুনরায় শান্তরস-প্রধান এই তপোবনে আসবে।

গৌতমী। বাছা, আর কেন ? যাবার কাল বয়ে যায়, তোমার পিতাকে ফিরে যেতে বল। দাদা, আপনিই ফিরে যান, কারণ যত দেরীই হোক শকুন্তলা নিবৃত্ত হবে না, এমনি করে কান্নাকাটি করবে।

কাশ্যপ। বৎসে, তপস্যার কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

শকুন্তলা। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে) পিতা, কঠোর তপস্যায় আপনার শরীর অতিশয় ক্লিষ্ট, সুতরাং আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।

কাশ্যপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) পর্ণশালার দ্বারদেশে পূজার জন্য তুমি যেসব তৃণধান্য ছড়াতে আজ সেগুলি অংকুরিত হয়েছে। সেই শস্যশ্যামল কুটিরদ্বারের দিকে যখন চাইব তখন কি করে আমার শোক প্রশমিত হবে ? দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে। যাও মা, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। (শকুন্তলা ও সহযাত্রীদের প্রস্থান)

সখীদ্বয়। (শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে) হায় হায়, আর দেখা যাচ্ছে না। বনরাজি যেন শকুন্তলাকে ঢেকে ফেলল।

কাশ্যপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) অনসূয়া, তোমাদের সহধর্মচারিণী চলে গেছে। শোকাবেগ সংবরণ করে আমার সঙ্গে এস। (প্রস্থান)

সখীদ্বয়। তাতঃ, চেয়ে দেখুন, এক শকুন্তলার বিহনে তপোবন যেন শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

কাশ্যপ। বৎসে, স্নেহের মোহে এমনিই মনে হয়। (বিষণ্ণভাবে দু এক পা চলতে চলতে) শকুন্তলাকে পাঠিয়ে আজ আমার দেহমন যেন হালকা হয়ে উঠল, শীতল হয়ে উঠল। ধনস্বামীর নিকট গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করে লোকে যেমন একটা স্বস্তিবোধ করে, তার সকল উদ্বেগ

বিদূরিত হয়, তেমনি আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে আমিও নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হলাম। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

আসনে উপবিষ্ট রাজা দুষ্মন্ত। বিদূষকের আবির্ভাব

বিদূষক। (কান খাড়া করে শুনে) বয়স্য, সঙ্গীতগৃহের দিকে একবার কান দিয়ে শোন কেমন সুমধুর সঙ্গীতের স্বরালাপ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় রাণী হংসপদিকা স্বরলিপির আলাপ করছেন।

রাজা। একটু চুপ করো। ভাল করে শুনি। (গানের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনে)

ওহে মধুকর, অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীকে তখন প্রণয় প্রদর্শন করে এখন কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হয়ে তাকে বিস্মৃত হলে কেন?

রাজা। আহা, কি সুন্দর গান! রাগ যেন ঝরে পড়ছে।

বিদূষক। তুমি গানটার সব কথার মানে বুঝতে পারছ?

রাজা। আমি একবার মাত্র ঐ রাণীর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেছিলাম। শেষে পাটরাণী বসুমতীর সঙ্গে এখন দিন কাটাচ্ছি। তাই আজ রাণী হংসপদিকার নিকট এত শ্লেষোক্তির ভাজন হলাম। বন্ধু মাধব্য, তুমি একবার রাণী হংসপদিকার কাছে গিয়ে আমার কথা বল।

বিদূষক। ঠিক আছে চললাম। (উঠতে উঠতে) কিন্তু একটা কথা মনে করে শিউরে উঠছি ভয়ে। সংসারবিমুখ কোন লোক বনে গিয়ে যখন তপস্যা করতে শুরু করে তখন মায়াবিনী অপ্সরারা এসে তার পিছু লাগে আর অমনি সেই তপস্বী ধরা পড়েন। তাদের হাত হতে নিস্তারলাভ করতে পারে না। তেমনি হংসপদিকার কাছে যাওয়ার পর তিনি যখন তাঁর দুষ্ট পরিচারিকাদের আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন আর তারা যখন আমার শিখা ধরে টানাটানি করে চরম লাঞ্ছনা করবে আমার তখন তাদের হাত থেকে নিস্তারলাভ ঘটবে না।

রাজা। খুব হয়েছে, যাও। যেভাবে রসিক নাগরেরা অভিমানী

মেয়েদের ভোলায় তেমনি করে রাণীকে শান্ত করে আমার ঐ কথা বলগে।

বিদূষক। বেশ চললাম। (প্রস্থান)

রাজা। (মনে মনে) একি! এই গানটি শোনার পর হতেই আমার হৃদয় এত আকুল হলো কেন? প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ছাড়া মনের এমন অবস্থা ত ঘটে না, কিন্তু আমার ত তেমন কিছু নেই। তবে অবশ্য একটা কথা, মানুষ সকল রকম সুখে থেকেও হঠাৎ কোন রমণীয় বস্তু দর্শন করে অথবা কোন মনোহর গান শুনে তার চিত্ত যে আকুল হয়ে ওঠে তার কারণ বোধ হয়, জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল জন্মান্তরের কোন আকর্ষণীয় বস্তুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে জাগতে থাকে তার চিত্তে। (উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান)

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। হায়, শেষে আমার এই অবস্থা হলো? রাজার অন্তঃপুরে একদিন যে বেতগাছটা নিয়ে বেড়াতাম, এখন সেই বেতখানাই আমার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে ভর না করে এক পাও চলতে পারব না। যদিও জানি রাজ্যসংক্রান্ত কাজকর্ম করাই রাজার প্রধান ধর্ম, তবু রাজার কাছে যেতে আমার পা সরছে না। কারণ তিনি এই সবে সিংহাসন হতে উঠে বিশ্রাম করতে গেছেন। এখনই গিয়ে কি করে বলব যে কণ্বের শিষ্যরা এসেছেন। এঁদের অভ্যর্থনায় ও কথাবার্তায় পরিশ্রান্ত রাজার কত কষ্টই না হবে। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। অবশ্য পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণে যিনি নিযুক্ত, তাঁর আবার বিশ্রাম কি? ঐ যে সূর্যদেব কবে কোন যুগে রথে অশ্ব জুড়েছেন, সে অশ্ব আর খোলেননি রথ হতে। জগতের হিতার্থে ঘুরছেন ত ঘুরছেন। আর ঐ সারা জগতের প্রাণবায়ু কি দিন কি রাত্রি সমানভাবে বয়ে চলেছেন। আর অনন্তদেব চিরকাল ধরণীর গুরুভার মাথায় করে আছেন। এঁদের কারো তিলার্ধ বিশ্রাম নেই। যাঁরা প্রজাপালক তাঁদের সকলেরই এই ধর্ম।

যাক, আমার কর্ম আমি করিগে। (এগিয়ে একটু দূর হতে রাজাকে দেখে) এই যে রাজা সন্তানের মত প্রিয় তাঁর প্রজাদের সকল অভাব অভিযোগের পূরণ ও প্রতিবিধান করে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে নির্জনে একটু শান্তি উপভোগ করছেন। দেখলে মনে হয়, যেন কোন গজরাজ একদল গজকে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে চরিয়ে অতিশয় তেতে পুড়ে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা স্থানে দাঁড়িয়ে মাথাটা জুড়িয়ে নিচ্ছেন। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, হিমালয় পর্বতের উপত্যকায় যে গহন অরণ্য আছে সেই অরণ্যবাসী কয়েকজন ঋষি কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। শুনলাম মহর্ষি কাশ্যপ-প্রেরিত কি সংবাদ তাঁরা নিয়ে এসেছেন? কি কর্তব্য আদেশ করুন।

রাজা। কি বললে? কাশ্যপ-প্রেরিত সংবাদ নিয়ে এসেছেন?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজা। তাহলে তুমি আমার নাম করে উপাধ্যায় সোমরাত ঠাকুরকে বলগে, ঐ সব আশ্রমবাসীদের বৈদিক বিধানমতে অভ্যর্থনা করে তিনি নিজেই যেন সঙ্গে করে এখানে আনেন। এদিকে আমিও তপস্বীদের সন্দর্শনের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে প্রতীক্ষা করছি।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। (উঠে) বেত্রবতী, অগ্নিহোত্রগৃহের পথটা দেখিয়ে দাও ত।

প্রতিহারী। এই দিকে রাজন।

রাজা। (অগ্রগমন করতে করতে) সকল প্রাণীই অভিলষিত বস্তু লাভ করে সুখী হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে তার ফল বিপরীত। রাজার প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি সমস্ত দুঃখেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোন অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য যে একটা বিষম উৎকণ্ঠা জন্মে, ঐ বস্তুর প্রাপ্তিতে সে উৎকণ্ঠা দূর হয় মাত্র, কিন্তু সেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি ক্লেশই না ভোগ করতে হয়। এক বড় ছত্র নিজের হাতে ধারণ করলে যেমন তাপের কষ্টের চেয়ে ছত্রধারণের কষ্টটাই বেশী হয়, তেমনি রাজার রাজ্যলাভের উৎকণ্ঠার থেকে রাজ্যপালনের যন্ত্রণাই বেশী হয়ে থাকে।

বৈতালিকগণ। দেব, আপনার জয় হোক।

প্রথম বৈতালিক। মহারাজ, আপনি আত্মসুখে উদাসীন থেকে সর্বদা প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য কি কষ্টই না ভোগ করছেন। আপনার জন্মই যেন পরের হিতসাধনের জন্য। পাদপ বা বৃক্ষ যেমন নিজে মাথা পেতে সূর্যতাপ ধারণ করে তার তলে যারা আশ্রয় নেয় তাদের ছায়াদ্বারা ঢেকে রাখে, গায়ে তাপ লাগতে দেয় না, আপনিও ঠিক তেমনি।

দ্বিতীয়। রাজন, তুমি স্বহস্তে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করে কুপথগামীদের সুপথে পরিচালিত করছ, প্রজাপুঞ্জের যত সব আত্মকলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণ করছ এবং নিরলসভাবে সকলকে রক্ষা করছ। প্রজাদের আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিকুটম্বরা শুধু তাদের সুখ ও বিপুল বৈভবের বেলাতেই এসে দেখা দেয়, কিন্তু প্রজাদের যথার্থ হিতসাধন তুমিই করে থাক।

রাজা। জনসাধারণের এই সব উক্তিতেই আমাদের সার্থকতা। এই সব কথা আমাদের অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহ সঞ্চার করে দেয়।

প্রতিহারী। এই যে সামনেই অগ্নিহোত্রগৃহের সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জিত তোরণদ্বারে সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ। তার নিকটেই হোমধেনু বাঁধা আছে। দেব, আপনি ঐ স্থানে উঠুন।

রাজা। (উচ্চ অলিন্দে উঠে পরিজনদের স্কন্ধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) বেত্রবতী, কি উদ্দেশ্যে ভগবান কাশ্যপ ঋষিদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন? ব্রতপরায়ণ ঋষিদের তপস্যার কাজে কেউ কি বাধা-বিঘ্ন ঘটাচ্ছে? নাকি ধর্মারণ্যের মৃগাদি প্রাণীর হিংসায় কেউ কি প্রবৃত্ত হয়েছে? অথবা আমারই কোন অপকর্মের ফলে তপোবনের তরুলতায় ফুলফল হচ্ছে না? কিছুই বুঝতে পারছি না। বেত্রবতী, কেমন যেন একটা ঘোর সংশয়ে আমার মন বড়ই আকুল হচ্ছে।

প্রতিহারী। মহারাজ, আমার মনে হয়, ঋষিগণ, আপনার সৎকার্যে আনন্দিত হয়ে আপনাকে অভিনন্দিত করতে এসে থাকবেন।

শকুন্তলাকে পুরোভাগে নিয়ে গৌতমী ও ঋষিদের প্রবেশ। সর্বাগ্রে কঞ্চুকী ও পুরোহিত।

কঞ্চুকী। এইদিকে আসুন আপনারা।

শার্ঙ্গরব। শারদ্বত, এই নৃপতি দুষ্মন্ত যথার্থই একজন মহাপুরুষ। কেউ বলতে পারবে না, ইনি কোনদিন আপন মানমর্যাদাহানিকর কোন কর্ম করেছেন, উচ্চবর্ণের ত কথাই নেই, অতি নিম্নবর্ণের কোন ব্যক্তিও কখনো এঁর রাজ্যে কুপথে যায় না—এ সবই সত্য। কিন্তু ভাই, চিরদিন নির্জন তপোবনে বাস করে আমার মন এমনই হয়েছে যে জনকোলাহল-পূর্ণ এই রাজবাড়ি আমার কাছে অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের মত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে।

শারদ্বত। রাজপুরীতে ঢোকা থেকেই তোমার এ দশা আমি লক্ষ্য করেছি। আমারও এই রাজবাড়ির সুখসাগরমগ্ন লোকগুলিকে দেখে কি মনে হচ্ছে জান? স্নানান্তিক ব্যক্তির সর্বাঙ্গে তেল মাখা ব্যক্তিকে যেমন লাগে, অথবা অতি পবিত্র ব্যক্তির অপবিত্রকে যেমন লাগে, অথবা জাগ্রত ব্যক্তির নিদ্রিতকে যেমন লাগে কিংবা স্বাধীন ব্যক্তির শৃংখলিত বা পরাধীন ব্যক্তিকে যেমন লাগে আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা। (দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করে) একি! আমার ডান চোখ নাচছে কেন।

গৌতমী। যত অমঙ্গল দূর হোক। তোমার পতির কুলদেবতারা তোমাকে সুখসম্পদ দান করুন। (অগ্রসর হতে লাগলেন)

পুরোহিত। (রাজাকে দেখিয়ে) হে তপস্বীগণ, চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের রক্ষাকর্তা, পূর্ব হতেই আসন ছেড়ে উঠে মহারাজ আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। একবার তাঁর দিকে তাকান।

শার্ঙ্গরব। হে মহাব্রাহ্মণ, অতবড় রাজার পক্ষে আমরা দীন হীন, আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর উঠে দাঁড়ানো প্রশংসার কথা বটে, তাহলেও আমরা এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এতে তুমি যেমন গর্ববোধ করছ, আমরা তেমন গর্বের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না! কারণ ফল-সমাগমে বৃক্ষ-রাজি স্বতই নত হয়ে থাকে, নবজলদসমাগমে মেঘমালা আপনা থেকে কত নীচে নেমে আসে। যাঁরা প্রকৃত সাধুপুরুষ তাঁরা পতন অভ্যুদয়ে অতীব বিনীত হয়ে থাকেন। পরোপকারীদের এটাই হলো প্রকৃত স্বভাব।

তাই বলছি তুমি গর্ববোধ করলেও আমরা রাজার এ কাজে সজ্জনচরিত্রের অতিরিক্ত তেমন কিছু দেখছি না।

প্রতিহারী। দেব, ঋষিদের মুখচ্ছবি যেমন প্রসন্নতাপূর্ণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয় কোন আনন্দজনক কার্যের জন্য এসেছেন এখানে।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখে) এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? এখনো এর দেহলতার লাবণ্য সম্যকভাবে বিকশিত হয়নি, তবু ইনি সুন্দরী। সংসারত্যাগী তপস্বীদের মধ্যেই বা ইনি কেন? দেখে মনে হচ্ছে যেন পাণ্ডুবর্ণের একটি পাত্রের মধ্যে কচি সবুজ এক নধর পল্লব স্ফুটনোন্মুখ হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি?

প্রতিহারী। দেব, আমারও জানতে কৌতূহল হচ্ছে স্ত্রীলোকটি কে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। তবে বলতেই হবে যে ইনি খুবই সুন্দরী এবং এঁর চেহারাটা দেখার মত।

রাজা। যত সুন্দরীই হোক, পরস্ত্রীকে দেখতে নেই।

শকুন্তলা। (হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে) হৃদয়, এত কাঁপছ কেন? আর্যপুত্রের সেই মিলনকালের অবস্থা স্মরণ করে স্থির হও। অত ভালবাসা কি ভুলে গেলে?

পুরোহিত। (সামনে গিয়ে) এই তপস্বীদের যথাবিধি সৎকার করা হয়েছে। এঁদের উপাধ্যায় মহর্ষি কন্বের কাছ থেকে এঁরা কি সংবাদ বহন করে এনেছেন মহারাজ তা শ্রবণ করুন।

রাজা। বলুন শুনছি।

ঋষিগণ। রাজা, সর্বত্র বিজয়ী হোন।

রাজা। আপনারা সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ঋষিরা। অভিলষিত বস্তু লাভ করুন।

রাজা। মুনিদের তপস্যাকার্যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়নি ত?

ঋষিরা। রাজন, সূর্যদেব আকাশমন্ডলে উদিত থাকলে যেমন অন্ধকারের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি আপনি যেখানে সাধু-তপস্বীদের রক্ষাকর্তা সেখানে যাগযজ্ঞাদি ধর্মকার্যে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা। এতদিনে আমার 'রাজা' নাম সার্থক হলো। ভগবান কাশ্যপ ভাল আছেন ত? জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁদের শরীর ধারণ। সুতরাং তাঁদের ভাল থাকা মানে জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ।

ঋষিরা। যাঁদের আত্মিক সিদ্ধি আছে, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল তাঁদের নিজেদেরও হাতে। যতদিন প্রয়োজন সুস্থভাবে বিরাজ করে কার্য শেষ করা হলেই তাঁরা লীলাসংহার করেন। আমাদের সেই গুরুদেব আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসার পর এই কথা বলেছেন।

রাজা। কি আদেশ দিয়েছেন তিনি?

শার্ঙ্গরব। রাজা, মহর্ষি বলেছেন যে, 'অতি সংগোপনে শপথপূর্বক আমার কন্যাকে আপনি বিবাহ করেছেন, আপনাদের উভয়ের সেই পরিণয় আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করেছি। কেন না, আমরা আপনাকে সম্মানভাজন পূজার্হদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। আমার এই শকুন্তলাও যেন শরীরধারিণী সৎক্রিয়া। সুতরাং পূজ্য ব্যক্তিকে সৎকার সহযোগেই অর্চনা করা বিধেয়। আপনার মত গুণবানের সঙ্গে শকুন্তলার মত গুণবতীর মিলন ঘটিয়ে প্রজাপতি চিরকালের জন্য প্রশংসিত হলেন। অতএব আপনি ধর্মাচরণের জন্য আপনার সহধর্মিণী-কে গ্রহণ করুন। রাজা, ইনি এখন অন্তসত্ত্বা।'

গৌতমী। আর্য, আমারও দু একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু দেখছি বলার পথ নেই। কারণ এই শকুন্তলা আপনাকে আত্মদান করার সময় গুরুজনদের কোন অপেক্ষা রাখেনি এবং আপনিও এর স্বজনবর্গকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আপনারা দুজনেই যখন স্বেচ্ছায় এই-রূপ কাজ করে ফেলেছেন তখন একের জন্য অন্যকে কোন কথা বলা মানায় না তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে।

শকুন্তলা। (মনে মনে) দেখি, আর্যপুত্র কি জবাব দেন।

রাজা। একি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন একটা উপন্যাস।

শকুন্তলা। (মনে মনে) উঃ, এই কথাগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নি।

শার্ঙ্গরব। আপনারা না লৌকিক ব্যবহারজ্ঞান বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলে খ্যাত। আপনি কি জানেন না যে সধবা কামিনী যতবড় সতীই

হোক না কেন, সে যদি নিয়ত পিতৃগৃহে বাস করে তবে লোকে তার সম্বন্ধে নানা অকথা কুকথা বলে ? এইজন্যই কন্যার পিতামাতা চান, স্বামী ভালবাসুন বা নাই বাসুন কন্যা পতিগৃহেই বাস করুক।

রাজা। কি বললেন ? ইনি আমার পরিণীতা ?

শকুন্তলা। (বিষাদের সঙ্গে মনে মনে) হৃদয় যে আশঙ্কা করেছিলে, এতক্ষণে তা উপস্থিত হলো।

শার্ঙ্গরব। আত্মকৃত কার্যের অস্বীকার করে এই ধরনের ধর্মদ্রোহিতা কি আপনার মত রাজার কর্তব্য ?

রাজা। এইরকম একটা অলীক প্রশ্ন ত উঠতে পারে না।

শার্ঙ্গরব। তা বটে, ঐশ্চর্যমদে অন্ধ ব্যক্তিদের এইরূপ প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটে থাকে।

রাজা। আপনাদের এই সব তীব্রবাক্যে আমি আহত হচ্ছি।

গৌতমী। (শকুন্তলাকে) বাছা, নিমেষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করো। আমি তোমার অবগুণ্ঠন খুলে দেখাই। তাহলেই তোমার পতি তোমাকে চিনতে পারবেন। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

রাজা। (শকুন্তলাকে ভাল করে দেখে মনে মনে) আহা কি রূপ ! এমন অম্লান সৌন্দর্য আপনিই এসে উপস্থিত। অথচ আমি পূর্বে একে গ্রহণ করেছি কি না সেই সন্দেহে আকুল হয়ে একে উপভোগ করতে পারছি না, আবার প্রত্যাখ্যান করতেও মন সরছে না। তুষারবর্ষিণী রজনীর অবসানে হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন ভোগ করতে বা ছেড়ে যেতে পারে না, আজ এই গর্ভবতী মুনিকন্যা সম্বন্ধে আমারও সেই দশা ঘটেছে। (মনে মনে বিচার করতে লাগলেন)

প্রতিহারী। আহা, আমাদের রাজার কি ধর্মভয়। বিনা আয়াসে এসে উপস্থিত এমন রূপ দেখে অন্য কেউ হলে আর কি বিচারবিতর্ক করত ?

শার্ঙ্গরব। মহারাজ, চুপ করে রইলেন যে ?

রাজা। হে তপোধনগণ, বহু চিন্তা করেও এই রমণীর পরিণয়াদির কথা মনে করতে পারছি না। এক্ষেত্রে আপনারাই বলুন ত কি করে

আমি এই গর্ভবতী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি ? আপনারা জানেন যে অন্য সহযোগে যার পত্নী গর্ভবতী হন সেই ললনার পতিকে ক্ষেত্রী বলে। আমি জেনেশুনে কি করে এতবড় একটা কলঙ্কের ভার মাথায় নিই ?

শকুন্তলা। আর্যপুত্রের দেখছি, পরিণয়ে পর্যন্ত ঘোর সন্দেহ জন্মেছে। রাজমহিষী হয়ে কত সুখসম্পদের উপভোগে কালযাপন করব বলে যে আশা করেছিলাম, সে আশা বিনষ্ট হলো অঙ্কুরেই।

শার্ঙ্গরব। রাজন, নানা প্রলোভনে বশীভূত করে তুমি কণ্বদুহিতাকে উপভোগ করেছ, তবু দয়াময় মহর্ষি তোমার সে কার্য অনুমোদন করেছেন। এমন যে ক্ষমাশীল ঋষি, তাঁকে কোন কারণেই তুমি অপমানিত করতে পার না। করা উচিত নয়। ভেবে দেখ ত, যে মহর্ষির কন্যারূপ অনর্ঘ রত্ন তুমি অপহরণ করেছিলে, সেই মহর্ষির হৃতসর্বস্ব কন্যারত্নকে দস্যুরূপী তোমাকে অর্পণ করতে প্রস্তুত। আর তুমি এমন হীনোচিত ব্যবহার করছ ?

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব, তুমি এখন বিরত হও। শকুন্তলা, যা বলার আমরা বললাম। রাজা এইরূপ বলছেন। এখন ওঁর বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দাও।

শকুন্তলা। (মনে মনে) সেই অত অনুরাগ, অত ভালবাসারই যখন এই পরিণাম তখন স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আর লাভ কি ? তবে আমার আত্মাকে কলঙ্কমুক্ত করা প্রয়োজন বলেই দু একটা কথা বলব। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র, না যেখানে পরিণয়েই সংশয়, সেখানে এ সম্বোধন আর খাটে না। পৌরব, সেই নির্জন তপোবনে কত প্রতিজ্ঞা প্রলোভনের জাল পেতে এই আজন্ম সরলা হতভাগিনীকে প্রতারণা করে এখন এই সব উক্তিদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা আপনার মত পুরুষশ্রেষ্ঠের পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে।

রাজা। ছিঃ, এমন আচরণ যেন কোনদিন না করি। ভদ্রে, কুলভঙ্গকারিণী স্রোতস্বিনী যেমন তার জলকে পঙ্কিল করে এবং সেই সঙ্গে কূলস্থিত তরুবরকেও পাতিত করে থাকে, তুমিও তেমনি নিজের

ব্যবহারের দ্বারা তোমার পিতৃকুলকে কলঙ্কিত এবং আমাকেও অনন্ত কালিমায় লিপ্ত করে তুলছ।

শকুন্তলা। ভাল। যদি সত্য সত্য আপনি আমাকে পরস্ত্রী শঙ্কা করে এমন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আমি স্মৃতিচিহ্নের দ্বারা আপনার সব শঙ্কা দূর করে দিচ্ছি।

রাজা। খুব ভাল কথা।

শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থানে হাত দিয়ে) কি সর্বনাশ! আমার আঙ্গুলের আংটি কি হলো? (বিষণ্নভাবে গৌতমীর দিকে চাইল)

গৌতমী। নিশ্চয়ই শক্রাবতার নামক স্থানের শচীতীর্থ নামে জলাশয়ের জলে যখন তুমি বন্দনা করছিলে তখন আংটিটি আঙ্গুল হতে খসে পড়েছে।

রাজা। বাঃ খুব ভাল সমাধান। একেই বলে স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এটা স্ত্রীজাতিরই একচেটে ব্যাপার।

শকুন্তলা। কি আর বলব? বিধাতাই আপনাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন, বলুন। আচ্ছা, আর একটা নিদর্শনের কথা বলছি শুনুন।

রাজা। যত পার বল, এখন আমার শোনার পালা।

শকুন্তলা। মনে পড়ে? একদিন তুমি নবমল্লিকামণ্ডপের মধ্যে পদ্মপত্রে বিরচিত পাত্রে জল নিয়ে তুমি হাতে তুলে ধরেছিলে।

রাজা। বল, শুনে যাই।

শকুন্তলা। ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক মৃগশিশু যাকে আমি পুত্রের মত দেখতাম, এসে উপস্থিত হয়। তখন এই শিশুই আগে জলপান করুক বলে কত আদরে তাকে জলপান করাতে যাও। কিন্তু তোমাকে সে চিনত না, তাই তোমার কাছে গেল না সে। তখন আমি গিয়ে ঐ জলপাত্রটি যখন ধরলাম অমনি মৃগশিশু এসে জলটুকু সব খেয়ে নিল। তা দেখে তুমি ঠাট্টা করে বললে সকলেই নিজের জনকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই বনবাসী বলে তোমার সঙ্গে ওর অত ভাব।

রাজা। স্বকার্যসাধনের জন্য রমণীরা এইরকম বাগ্‌জাল বিস্তার করে বিমূঢ় লোকদের নিজের মতলব অনুসারে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

গৌতমী। মহাভাগ, এরূপ কথা বলা আপনার উচিত হচ্ছে না। এই শকুন্তলা তপোবনেই মানুষ হয়েছে, সুতরাং সংসারের ছলচাতুরীর লেশমাত্র জানে না। শেখেনি।

রাজা। ওগো তপস্বিনী, স্ত্রীলোকের শেখার দরকার হয় না। যাদের কোন জ্ঞান নেই সেই পশুপাখিদের স্ত্রীরাও না শিখেই ঢের চতুরতার পরিচয় দেয়। আর যাদের জ্ঞান আছে, সেই সব নারীজাতির ত কথাই নেই। তুমি কি দেখনি আকাশে উড়তে শেখার আগেই নিজের কচি কচি ছানাগুলোকে কোকিলারা অপর পাখির বাসায় রেখে মানুষ করে। সুতরাং শেখা না শেখার কথা তুলে লাভ নেই।

শকুন্তলা। (ক্রোধের সঙ্গে) অনার্য, তুমি নিজের হৃদয়ের মাপকাঠিতে জগতের সবাইকে বিচার করতে চাও। তোমার মত আর কে এমন আছে যে ধর্মের আবরণে গা ঢেকে তৃণাবৃতমুখ কূপের মত ছলনাময় হতে পারে?

রাজা। (মনে মনে) এই রমণীর যে অকৃত্রিম ক্রোধ দেখছি তাতে আমার সব বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বিষম সন্দেহ হচ্ছে—আমি ঠিক না ও ঠিক। সেই অতি নির্জনে আমাদের যে প্রণয় ঘটেছিল আজ সে সমস্তই আমি ভুলে গিয়েছি। সে প্রণয়ের কোন কথাই তাই আমি স্বীকার করতে পারছি না। আমি নিষ্ঠুর হৃদয় শুনে শকুন্তলা ক্রুদ্ধ হয়ে রোষারক্তনয়নে এমনই ভ্রূকুটি করছে যে মনে হচ্ছে যেন, যে কন্দর্পের ফুলধনুর অত্যাচারে এই বিপদ ঘটেছে সেই ধনুই ভ্রূভঙ্গের ছলে ভেঙ্গে ফেলছে।

পুরোহিত। ভদ্রে, দুষ্মন্তর চরিত্র বিশ্ববিশ্রুত, গোপনে কোন কাজ করবার পাত্র উনি নন।

শকুন্তলা। ভাল, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রমাণ করলে। পুরু-বংশীয়গণ উদার প্রকৃতির এবং সরলহৃদয় ভেবে মধুপূর্ণমুখ এবং বিষপূর্ণহৃদয় তোমাকে যেমন আত্মসমর্পণ করেছিলাম, আজ তেমনই হাতে হাতে ফল পেলাম। (আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল)

শার্ঙ্গরব। পূর্বাপশ্চাৎ না ভেবে কাজ করলে এইভাবেই শেষে পুড়ে

মরতে হয়। এইজন্য সকল কাজই বিশেষ করে যা নির্জনে করা হয় ভালভাবে পরীক্ষা না করে করা উচিত নয়। পরস্পরের মন না জেনে বন্ধুত্ব করলে সে বন্ধুত্ব পরিশেষে এইরূপ শত্রুতাতেই পর্যবসিত হয়।

রাজা। মহাশয়, কেবল এই রমণীর কথায় বিশ্বাস করে কেন আপনি উৎকট দোষারোপ করে আমার চরিত্র কলঙ্কিত করছেন।

শার্ঙ্গরব। (ক্রোধের সঙ্গে) যে জীবনে কখনো শঠতা জানে না বা শেখেনি তার কথা হলো বিশ্বাসের অযোগ্য আর যারা পরকে প্রতারিত করার কৌশলকে নীতিবিদ্যা বলে শিক্ষা করে তারা হলো সত্যবাদী? তাই না?

রাজা। আচ্ছা, স্বীকার করে নিলাম আমরা পরপ্রতারণা শিক্ষা করি, কিন্তু এই রমণীকে প্রতারণা করে আমার লাভ কি?

শার্ঙ্গরব। লাভটা বুঝতে পারলেন না? উৎসন্ন যাবেন, নির্মূল হবেন—এই লাভ।

রাজা। পুরুবংশীয়গণ উৎসন্ন হবে—কথাটা বলতে পারেন, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব, উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন কি? গুরুদেবের আদেশ আমরা পালন করেছি। শকুন্তলাকে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। চল, এখন ফিরে যাই। (রাজার দিকে ফিরে) শোন মহারাজ, এই তোমার পত্নী—রাখ বা তাড়িয়ে দাও—যা ইচ্ছা করো। কেন নয়, পত্নীর উপর পতির অসীম কর্তৃত্ব আছে। এখন সেই কর্তৃত্ব সার্থক করো। গৌতমী চল। (সকলের প্রস্থান)।

শকুন্তলা। একেই ত আমি এই কপটের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। আবার তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করে চললে? (অনুগমন)

গৌতমী। (দাঁড়িয়ে) বৎস শার্ঙ্গরব, আহা কি করুণ বিলাপ করতে করতে শকুন্তলা আমাদের অনুগমন করছে। যে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিল, সেই নির্মম পাষাণের কাছে থেকে বাছা আমার কিই বা করবে?

শার্ঙ্গরব। (ক্রোধের সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে শকুন্তলাকে) একবার

অন্যায়কার্যে তোমার শিক্ষা হয়নি, আবার স্বাধীনতা চাও ?

শকুন্তলা। (থর থর করে কাঁপতে লাগল)

শার্ঙ্গরব। শোন শকুন্তলা, রাজার কথামত সত্যই যদি তুমি ব্যভিচারিণী হও তাহলে তোমার মত কুলকলঙ্কিনী কন্যার দ্বারা পিতার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ? আর যদি জান, সত্য সত্যই তোমার দেহে কোন পাপ স্পর্শ করেনি, তুমি রাজার যথার্থই ধর্মপত্নী, তবে পতিগৃহে থেকে দাসীপনা করাও তোমার পক্ষে গৌরবের। সুতরাং এখানে থাক। আমরা চললাম।

রাজা। তপস্বী, কেন আপনারা এই ললনাকে বঞ্চিত করছেন ? আপনারা ত জানেন কুমুদনাথ চন্দ্র একমাত্র কুমুদিনীকেই বিকশিত করে থাকেন এবং সবিতৃদেবও একমাত্র কমলিনীকেই বিকশিত করেন, তেমনি আমার মত যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, তাঁদের চিত্ত পরস্ত্রীস্পর্শদোষে দূষিত হয় না।

শার্ঙ্গরব। আচ্ছা মহারাজ, অন্য নারী সংসর্গে আপনি যখন পূর্বের সব ঘটনাই বিস্মৃত হয়েছেন তখন আবার অধর্মের ভয় হচ্ছে কেন ?

রাজা। (রাজপুরোহিতকে) আচ্ছা গুরুদেব, আপনাকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমিই বিস্মৃত হয়েছি অথবা এই নারীই মিথ্যা বলছে—এক্ষেত্রে, এমন সংশয়িত স্থলে আমার কি করা উচিত ? স্ত্রী-ত্যাগের পাপ না পরস্ত্রীস্পর্শের পাপ—আমি কোনটাতে পড়ব ?

পুরোহিত। (চিন্তা করে) তাহলে একটা কাজ করা যাক।

রাজা। আমাকে পথ দেখিয়ে দিন গুরুদেব।

পুরোহিত। প্রসবকাল পর্যন্ত এই ভদ্রমহিলা আমার গৃহে থাকুক। একথা বলার কারণ এই যে, মহাপুরুষেরা অর্থাৎ জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা বলেছেন, আপনার একটি চক্রবর্তীচিহ্নযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করবে! মহর্ষি কাশ্যপের দৌহিত্র বা শকুন্তলার পুত্রে যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত হয় তাহলে এঁকে অভিনন্দিত করে ঘরে তুলবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে এঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

রাজা। আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।

পুরোহিত। বাছা, আমার অনুসরণ করো।

শকুন্তলা। ভগবতী বসুন্ধরা, বিদীর্ণ হও, তোমাতে প্রবেশ করি। (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

(দুর্বাসার অভিশাপে পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়ে ভাবতে লাগলেন রাজা দুষ্মন্ত)

(নেপথ্যে) আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য !

রাজা। (শুনতে পেয়ে) কি হয়েছে ?

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। মহারাজ, কণ্বশিষ্যগণ ফিরে গেলেই সেই রমণী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে হাত ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

রাজা। কি হলো ?

পুরোহিত। স্ত্রীলোকের মত আকৃতিবিশিষ্ট আগুনের মত এক জ্যোতিঃপুঞ্জ দূর আকাশ হতে নেমে এসে শকুন্তলাকে শূন্যে তুলে নিয়ে অপ্সরাবেষ্টিত গঙ্গার এক সোপানের দিকে নিয়ে গেল।

(সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল)

রাজা। ভগবন, আর এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে লাভ কি ? আগেই ত উপেক্ষা করেছি। আপনি যান, বিশ্রাম করুনগে।

পুরোহিত। (রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) জয় হোক ! (প্রস্থান)

রাজা। বেত্রবতী, প্রাণে কেমন একটা আকুলতা জন্মেছে। শয়নগৃহের পথটা কোন দিকে দেখিয়ে দাও।

প্রতিহারী। এইদিকে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। যতদূর সম্ভব কঠিন হয়ে কণ্বদুহিতাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বটে, এবং তাকে যে কোনদিন পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলাম কিছুতেই তা মনে পড়ছে না সত্য ; তবু মন আমার এতই পরিতাপগ্রস্ত ও আকুল হয়ে পড়েছে যে আমি চাইলেও মন আমায় জোর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, শকুন্তলাকে আমি সত্যই বিবাহ করেছিলাম। এ কি বিড়ম্বনা। (সকলে প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

শহর কোতোয়াল রাজশ্যালক ও একজন হাতকড়া দেওয়া লোককে নিয়ে দুজন নগররক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষীদ্বয়। (আঘাত করে) বেটা চোর, শীগ্‌গির খুলে বল, কোথায় তুই রাজার নাম লেখা রত্নাঙ্গুরীয় পেলি?

বন্ধব্যক্তি। (সভয়ে) হুজুরগণ, মারবেন না, আমি পরদ্রব্য অপহরণ করি নাই।

প্রথম রক্ষক। না তা করবে কেন? সদ্‌ব্রাহ্মণ জেনে রাজাই বুঝি তাঁর হাতের আংটিটা তোমাকে দান করেছেন।

বন্ধব্যক্তি। শুনুন তবে, জাতিতে আমি জেলে, শক্রাবতার নামে পল্লীতে আমি বাস করি।

দ্বিতীয় রক্ষক। বেটা চোর, আমরা তোর জাতি বা কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি কি?

রাজশ্যালক। যুবক, সবটা ওকে বলতে দাও। কথার মাঝখানে ওকে বাধা দিও না।

রক্ষীদ্বয়। হুজুর যা বলেন। বলরে, বল।

বন্ধব্যক্তি। আমি জাল এবং বঁড়শী প্রভৃতির দ্বারা মাছ ধরে কোনরকমে পরিবার প্রতিপালন করি।

শ্যালক। কি পরিশুদ্ধ জীবিকা!

ধীবর। প্রভু, যে কুলে যার জন্ম সে কুলের কাজ কখনো পরিত্যাজ্য নয়। বেদপারগ দয়ার্দ্রহৃদয়। কিন্তু তাঁদের কুলধর্ম বৈধ পশুহিংসা কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা কি নির্দয়তার পরিচয় দেন না?

শ্যালক। তারপর?

ধীবর। একদিন এক রোহিত মাছ পেয়ে তা খণ্ড খণ্ড করে কাটতে গিয়ে দেখি, সেই মাছটার পেটের ভিতরে এই আংটিটি ঝকঝক করছে আর তাতে খচিত এই রত্নটা জ্বলজ্বল করছে। তারপর এটাকে বিক্রি করার জন্য যখন দশজনকে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা এসে ধরলেন

আমাকে। এখন মারতে হয় মারুন, ছাড়তে হয় ছাড়ুন, যেভাবে আংটিটি পেয়েছি তা বললাম।

শ্যালক। জালুক, লোকটার গায়ে যেমন কাঁচা মাংসের গন্ধ বার হচ্ছে তাতে মনে হয় এ নিশ্চয়ই গোসাপখেকো জেলে। তবে আংটিটি কি করে পেল এটাই দেখতে হবে। এখন রাজবাড়ি যাওয়া যাক।

রক্ষীদ্বয়। তাই হবে।

শ্যালক। চলরে গাঁটকাটা চল। (সকলেই যেতে লাগল) সূচক, এই সদর দরজায় তোমরা সাবধানে লোকটাকে আটকে রাখ, আমি রাজবাড়ি গিয়ে আংটিটা কিভাবে পেয়েছে তা বলে মহারাজের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে আসি।

রক্ষীদ্বয়। যান হুজুর, রাজবাড়িতে এ খবর দিলে বক্‌শিস পাবেন। (শ্যালকের প্রস্থান)

প্রথম রক্ষী। জালুক আমাদের বড় কর্তা বড়ই দেরী করছেন।

দ্বিতীয় রক্ষী। রাজারাজড়াদের কাছে ত আর যখন তখন গিয়ে হাজির হওয়া যায় না। রাজার অবকাশ বুঝে যেতে হয়।

প্রথম রক্ষী। ভাই জালুক, আমার কিন্তু লোকটাকে শূলে চড়ানোর জন্য মনটা অস্থির হয়েছে। কতক্ষণে এর গলায় বধ করার সময়ের মালা গাঁথতে পারব তা ভেবে হাতটা আমার সুড় সুড় করছে।

ধীবর। মশায়, শুধু শুধু আমাকে হত্যা করাটা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় রক্ষক। (দূরে দেখে) ঐ যে আমাদের বড়কর্তা রাজার হুকুমনামা নিয়ে এইদিকে আসছেন।

শ্যালকের প্রবেশ

শ্যালক। যুবক, এই জেলেকে শীগ্‌গির ছেড়ে দাও। এই আংটির একটা হদিশ পাওয়া গেছে।

যুবক। যেমন প্রভুর আদেশ।

দ্বিতীয় রক্ষক। লোকটার কি কপালজোর! যমের বাড়ি থেকে ফিরে এল। (ধীবরের বন্ধনমোচন)

ধীবর। (রাজশ্যালককে প্রণাম করে) প্রভু, আমার সবই ত

আপনারা নিলেন, এখন বলুন, কেমন করে আমার দিন গুজরাণ হবে।

শ্যালক। মহারাজ সে দাম হিসেব করে এই অর্থ খুশী হয়ে তোমাকে দিয়েছেন। (ধীবরকে অজস্র অর্থ দান)

ধীবর। প্রভু, যথেষ্ট অনুগৃহীত হলাম।

সূচক। অনুগ্রহ বলতে? শূলে থেকে নামিয়ে হাতির পিঠে উঠিয়ে দেওয়া।

জালুক। হুজুর, মহারাজের পরিতোষ হয়েছে? শুনে মনে হচ্ছে আংটিটা তাঁর পছন্দসই হয়ে থাকবে।

শ্যালক। সেই আংটিতে যে বহুমূল্য রত্ন আছে তার জন্য মহারাজের বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। সেই আংটি দেখে মহারাজের কোন মনের মানুষের কথা স্মরণ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। কেন না, মহারাজ আমাদের স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তবু কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁর চোখে জল এসেছিল।

সূচক। মহারাজের সন্তোষ জন্মিয়ে হুজুর আপনি তাঁর মস্ত সেবা করেছেন বলতে হবে।

জালুক। না না, শুধু তাঁর সেবা নয়, আমাদের এই ধীবররাজের জন্যই এই সেবা। কারণ সেবা করার ফলস্বরূপ পারিতোষিকটা পেলেন এই জেলে মহাশয়, আর সেবা করলেন আপনি। (ধীবরের উপর সরোষে দৃষ্টিনিক্ষেপ)

ধীবর। কর্তামশায়রা, আংটির মূল্যবাবদ আমি যা পেয়েছি এর অর্ধেক আপনাদের পূজার ফুলের দামস্বরূপ আপনারা নিন। আমি ছোট জাত, আপনাদের দয়াতেই এত ধন দৌলত পেলাম। সুতরাং আপনাদের পূজা করা আমার উচিত।

জালুক। এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বললে বটে। ঠিকই বলেছ।

শ্যালক। ধীবর, তুমি একজন বড় লোক, উদারপ্রাণ ব্যক্তি। এখন হতে তুমি আমার বন্ধু হলে। আমার সাধ, আজ সুরাদেবীকে সাক্ষী করে আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপিত হোক। অতএব শুঁড়ির দোকানে

চল। (সকলের প্রস্থান)

আকাশগামী রথযোগে সানুমতী নাম্নী অপ্সরার প্রবেশ

সানুমতী। সাধুসজ্জনের অভিষেক যতক্ষণ হতে থাকে ততক্ষণ আমাদের এক একজন পালা করে সেখানে থাকার নিয়ম। আমার থাকার পালায় আমি ঠিক থেকেছি। এখন একটু সময় যখন আছে তখন রাজর্ষি দুষ্মন্তের ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখে নিই। মেনকার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাতে শকুন্তলা আমার দেহের এক অংশ বললেও হয়। মেনকাও তার মেয়ে শকুন্তলার সম্বন্ধে আমাকে খোঁজখবর নিতে বলেছে।

একি! এমন এক বসন্তের সমাগমে রাজবাড়ির আদ্যন্ত আমোদ আহ্লাদে ও উৎসাবাদিতে দিনরাত মুখবিত থাকার কথা, তা না হয়ে দেখছি সব চুপচাপ। আমোদ প্রমোদ ত দূরের কথা, কোথাও কোন শব্দই নেই। অবশ্য দৈবশক্তিবলে আমি সবই জানতে পারি, কিন্তু সখী মেনকার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতেই হবে। আমাকে কেউ দেখতে পায় না। অথচ আমি সবাইকে দেখতে পাব—এই যে তিরস্করণী বিদ্যা আমি জানি তাই দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এই উদ্যানপালিকার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ির এই বিষণ্ণতার কারণটা জানতে চেষ্টা করি।

আমের মুকুল দেখতে দেখতে সহচরীর সঙ্গে দুটি উদ্যানপালিকা বালিকার প্রবেশ

প্রথমা বালিকা। ঈষৎ তাম্র, হরিৎ ও পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট হে মধু-মাসের জীবনসর্বস্ব, হে বসন্তঋতুর মঙ্গলস্বরূপ রসাল মুকুল। তোমায় অর্চনা করি, তুমি প্রসন্ন হও।

দ্বিতীয়া। পরভৃতিকে, একা একা কি বিড়বিড় করে বকছিস?

প্রথমা। মধুকরিকে, নূতন আমের মুকুল দেখলে পরভৃতিকে ত পাগল হয়েই থাকে।

দ্বিতীয়া। সেকি! বসন্তকাল এসেছে নাকি?

প্রথমা। মধুকরিকে, মদমত্ত হয়ে গান গেয়ে বেড়াবার এই তোর ঠিক সময় উপস্থিত।

দ্বিতীয়া। আমাকে একটু ধর দেখি, আমি পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গোটাকতক মুকুল তুলি এবং তাই দিয়ে কন্দর্পের পূজা করি।

প্রথমা। রাজী আছি, যদি তোর পূজার অর্ধেক পুণ্য আমাতে বর্তায়।

দ্বিতীয়া। তুই না বললেও এটা হত। কারণ আমাদের দেহ আলাদা হলেও দুজনের প্রাণ এক। (সখীকে ভর করে মুকুল তুলতে লাগল) আহা, এখনো ভাল করে ফোটেনি, তবু বোঁটা ভাঙ্গার কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। (প্রণাম করার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে) হে চূতমুকুল, বসন্তঋতুতে যুদ্ধাক্রিয় ধনুর্ধর কামদেবের উদ্দেশ্যে তোমাকে আমি দান করছি। যাও, তুমি সেই পঞ্চবাণের বাণ পাঁচটির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হও। এই উন্মাদকর বসন্তকালে যারা ঘর ছেড়ে পথে পথে বেড়ায়, তাদের বিরহিনী পত্নীরা যেন তোমার লক্ষ্য হয়। এই বলে মুকুল ছড়িয়ে দিল।

একই দৃশ্যে কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। নিজের ওজন বোঝ না? থাম। মহারাজের হুকুমে রাজ্যের সর্বত্র বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি আমের মুকুল ভাঙ্গছ?

উভয়ে। (ভয় পেয়ে) ক্ষমা করুন মহাশয়, চটবেন না। আমরা এ সংবাদের কিছুই জানি না।

কঞ্চুকী। বটে! তোমরা কি শোনোনি যে বসন্তকালে যাদের ফুল ফোটে, সেই সমস্ত তরু এবং তাদের উপরে যাদের বসবাস, সেই সমস্ত পাখিরা পর্যন্ত মহারাজের শাসন মেনে চলে। কেন না, আমের মুকুল কবে বেরিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পরাগ বাঁধল না। কুরুবকের ফুল ফোটা-ফোটা হয়েও ফুটল না, কুঁড়িতেই থেকে গেল। সেই কবে হিমকাল চলে গেছে, তবু আজ পর্যন্ত কোকিলগুলি কুহুরব করতে সাহস করল না, তাদের স্বর তাদের কণ্ঠেই থেকে গেল। এমন কি ত্রিভুবনবিজয়ী কন্দর্পদেব রাজ-আদেশ শ্রবণের পূর্বে তূণ হতে যে বাণ নিষ্কাশিত করেছিলেন আদেশ শ্রবণমাত্র চমকিত হয়ে শশব্যস্তভাবে

সে বাণ আবার তূণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

উভয়ে। সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? রাজা দুষ্মন্তের অসীম প্রভাব।

প্রথমা। আর্য, অল্পকয়েকদিন হলো রাজশ্যালক মহাশয় কর্তৃক আমরা উভয়ে রাজার চরণপ্রান্তে প্রেরিত হয়েছি। এই উপবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই নবাগত বলে এসব কথা আগে শুনতে পাইনি।

কঞ্চুকী। আচ্ছা বেশ, কিন্তু পুনরায় যেন একাজ করো না।

উভয়ে। আর্য, বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, যদি আমাদের শোনবার মত হয়, তাহলে কৃপা করে বলুন, কি কারণে মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

সানুমতী। মানুষমাত্রই উৎসবপ্রিয়। সেই মানুষই যখন উৎসব বন্ধ করেছে তখন নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

কঞ্চুকী। সবাই যখন জানতে পেরেছে তখন বলার আর বাধা কি? আচ্ছা, তোমরা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কোন কথা কি শোননি?

উভয়ে। রাজশ্যালকের মুখে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং অঙ্গুরীয়-দর্শনে মহারাজের বিমনা হওয়া পর্যন্ত শুনেছি।

কঞ্চুকী। তাহলে আর সামান্যই বলতে হবে। নিজের অঙ্গুরীয়-দর্শনে রাজার মনে পড়ল, সত্যই শকুন্তলাকে তিনি নির্জনে বিবাহ করেছিলেন এবং মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই থেকে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন। কারণ মহারাজ এখন সকল প্রিয় পদার্থই বিষের মত দেখেন। আগের মত প্রতিদিন প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে আর মেলামেশা করেন না। বিছানার একপাশে পড়ে ছটফট করতে করতে সারারাত্রি কাটান। উদার এবং সরলভাবে অন্তঃপুরসুন্দরীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ কারো নাম ধরে ডাকার সময় 'শকুন্তলা' বলে ডেকে বসেন এবং তাতে লজ্জায় মরে যান।

সানুমতী। বাঃ কি আনন্দ আমার!

কঞ্চুকী। এই ভয়ঙ্কর চিত্তবৈকল্যের জন্যই উৎসব-আনন্দ সব বন্ধ

করে দিয়েছেন।

উভয়ে। ঠিকই বটে।

(নেপথ্যে) এইদিকে আসুন মহারাজ।

কঞ্চুকী। (কান পেতে শুনে) মহারাজ এই দিকেই আসছেন। নিজের কাজে চলে যাই।

অনুতাপের উপযুক্ত পরিচ্ছদে প্রতিহারী ও বিদূষকের সঙ্গে রাজার প্রবেশ

কঞ্চুকী। (রাজাকে দেখে) আহা, সুন্দর আকৃতির কি মাহাত্ম্য! সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই তা সুন্দর। অসীম রমণীয়। এত জ্বালা যন্ত্রণা সত্ত্বেও মহারাজের আকৃতি কত সুন্দর, কত মধুর! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মহারাজের সেই আগেকার সাজগোজ পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই নেই, সব ছেড়েছেন। বাঁ হাতের মনিবন্ধে একগাছি সোনার বালা নড়বড় করছে, ডান হাতের বালাগাছাটা কখন কোথায় খুলে পড়ে গেছে। কারণ আগের সেই হৃষ্টপুষ্ট দেহ আর নেই। নিরন্তর উষ্ণ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে অধর লাল হয়ে উঠেছে। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ও জাগরণে চোখদুটি কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক কথায় আগেকার কিছুই আর ও চেহারায় নেই, তবু পরিমার্জিত ও পরিষ্কৃত শাণযন্ত্রে খচিত মহামুনির মত নিজের প্রভাবের মহিমায় মহারাজ এত কৃশ হওয়া সত্ত্বেও তা বোঝা যাচ্ছে না।

সানুমতী। (কৃশকায় রাজাকে দেখে) ওই রাজার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হয়েও যে শকুন্তলা এর জন্য প্রাণ দিতে বসেছে তা ঠিকই বটে।

রাজা। (চিন্তিতভাবে মন্থর গতিতে চলতে) সেই চকিতমৃগনয়না প্রিয়া শকুন্তলা বারবার কতভাবে আমাকে মনে পড়িয়ে দিলেও আমার হৃদয় যেন কালনিদ্রায় অভিভূত ছিল। কিছুই স্মরণ করতে পারিনি। এখন অনুতাপের আগুনে পুড়বার জন্যই যেন সেই দগ্ধ হৃদয়ে একে একে সেই সব স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে।

সানুমতী। তপস্বিনীর ভাগ্যই এমনি।

বিদূষক। (স্বগত) সেই দুরারোগ্য শকুন্তলারোগে আবার ইনি আক্রান্ত হলেন। জানি না কি উপায়ে আবার চিকিৎসা হবে।

কঞ্চুকী। মহারাজ, উপবন বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। ইচ্ছানুসারে প্রীতিকর স্থানে উপবেশন করুন।

রাজা। বেত্রবতী, আমার নাম করে মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বলবে, রাত্রিতে অনিদ্রার জন্য আজ আমি সিংহাসনে বসে রাজকার্য করতে পারব না। তিনি যে সব রাজকার্য করেছেন তা পত্রদ্বারা আমাকে যেন জানান।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। বাতায়ন, (কঞ্চুকী) তুমিও নিজের কাজে যাও।

কঞ্চুকী। যেমন আদেশ মহারাজের। (প্রস্থান)

বিদূষক। বাঃ, মাছিটি পর্যন্ত তাড়ালে। শীতের দাপট বা রোদের তাপ না থাকায় দেখ ত বসন্তকালে প্রমোদবনের কি অপূর্ব রমণীয়তা হয়েছে। এ বনের যেখানে ইচ্ছা বসে সুখ উপভোগ করো।

রাজা। সখা, বিপদের সময়েই বিপদ আসে, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ এই দেখ, যে মোহে আমি কণ্বদুহিতার প্রণয় বিস্মৃত হয়েছিলাম সেই মোহ কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আঘাত করার জন্যই যেন পঞ্চবাণ তাঁর ধনুকে চূতমুকুলের শর যোজনা করলেন।

বিদূষক। তুমি দাঁড়াও একটু। আমি আমার এই ত্রিভঙ্গ লাঠিটা দিয়ে কন্দর্পের বাণের দফা রফা করছি। (লাঠি উঁচিয়ে মুকুল ঠেকাতে উদ্যত হলো)

রাজা। (সহাস্যে) খুব হয়েছে। ব্রহ্মতেজ দেখা গেছে। আচ্ছা বলত, কোথায় একটু বসে প্রিয়তমা শকুন্তলার কিছুটা অনুরূপ লতা-সমূহের দিকে চেয়ে চোখ জুড়াই।

বিদূষক। কেন সখা, চতুরিকা নাম্নী যে পরিচারিকাটি নিয়ত তোমার কাছে কাছে থাকে, তাকে তুমিই ত বলে দিয়েছ মাধবীমণ্ডপে এই সময়ে তুমি থাকবে আর সে যেন তোমার নিজের হাতে আঁকা শকুন্তলার ছবিখানা নিয়ে আসে।

রাজা। হ্যাঁ, এখন এই রকম বস্তুতেই বুক জুড়োতে হবে। বেশ,

সেই মাধবীমণ্ডপের পথটা দেখিয়ে দাও।

বিদূষক। এই দিকে ভাই। (দুজনের গমন ও ছায়াময়ী সানুমতীর অনুসরণ)

বিদূষক। এই যে সামনেই মাধবীলতার কুঞ্জ, তার মধ্যে মণিময় প্রস্তরের সুখকর আসন রয়েছে। ঐ দেখ, কত মনোহর কুসুমসম্ভারে লতাকুঞ্জের কি অপূর্ব শোভা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কুসুমোপহারে আমাদেব উভয়কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। অতএব ভিতরে গিয়ে উপবেশন করো। (উভয়ের প্রবেশ ও উপবেশন)

সানুমতী। লতার আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে সখী শকুন্তলার ছবিখানা ভাল করে একটু দেখি। পরে গিয়ে তার প্রিয়তমের এই সব অনুরাগের কথা তাকে বলব। (লতাময়ী হয়ে দাঁড়াল)

রাজা। সখা, আজ একে একে শকুন্তলার কথা সব মনে পড়ছে। প্রথমকার ঘটনাবলীর অনেক কিছু তোমাকে আগেই বলেছি। প্রত্যাখ্যানের সময় তুমি ছিলে না। কিন্তু তার আগেও কখনো তার নাম পর্যন্ত তোমার মুখে শুনিনি। আমার মত তুমিও তাকে ভুলে গেলে নাকি?

বিদূষক। না ভাই, কিছু ভুলিনি। কিন্তু তুমিই ত নিষেধ করেছিলে। সমস্ত বৃত্তান্ত একদিন আমাকে বলার পর শেষকালে বলেছিলে, এ কথাগুলো সত্য নয়, পরিহাসপূর্বক একটা গল্প বানিয়ে বললাম তোমাকে। আমারও এমন মাটির ঢিপির মত বুদ্ধি যে তাই বিশ্বাস করলাম। অথবা দোষ নেই। যা হবার তা হবেই।

সানুমতী। ঠিক বটে। ভবিতব্যকে খণ্ডন করা সাধ্য কার?

রাজা। (কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত থেকে) সখা, আমায় রক্ষা করো।

বিদূষক। ছিঃ, তোমাকে ত এসব শোভা পায় না। সাধু-সজ্জনরা কখনো শোকের অধীন হয় না। হাজার ঝড়ঝঞ্ঝাতেও পর্বত কখনো কম্পিত হয় না।

রাজা। সখা, পরিত্যাগকাতরা প্রিয়ার তখনকার অবস্থা মনে করে

কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারছি না। চারদিক যেন অন্ধকার দেখছি। সেই যে যখন আমি তাকে তাড়িয়ে দিই তখন শকুন্তলা তার আত্মীয়-স্বজনদের অনুগমন করতে যাচ্ছিল আর গুরুর শিষ্যরা বারবার তাড়না করছিল। তখন নিরুপায় হয়ে শকুন্তলা সজলনয়নে বারবার এই নৃশংস দুষ্মন্তের দিকে তাকাচ্ছিল—সেই সব এখন বিষমাখা বাণের মত আমাকে দগ্ধ করছে।

সানুমতী। হায় রে স্বার্থপরতা! রাজার এত দুঃখেও আমার সুখ হচ্ছে।

বিদূষক। ভাই, আমার মনে একটা খটকা লাগছে। আচ্ছা, হঠাৎ আকাশ থেকে কে এসে তাকে নিয়ে গেল বলত?

রাজা। তার মত পতিব্রতাকে অপর কেউ স্পর্শ করতে ভয় পায়। তোমার সেই সখীর মা হলো মেনকা। অপ্সরা মেনকা থাকে আকাশে। সুতরাং নিশ্চয় মেনকারই আকাশবিহারিণী সহচরীরা তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এটাই হলো আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

সানুমতী। বাঃ কি চমৎকার অনুভবশক্তি! এরকম ব্যক্তির বিস্মৃতিটাই বিস্ময়ের বিষয়, মনে পড়াটা বিস্ময়জনক নয়।

বিদূষক। তা যদি হয় তাহলে তার সঙ্গে তোমার মিলন হবেই হবে।

রাজা। কি করে বুঝলে?

বিদূষক। মাতাপিতা কখনো পতিবিচ্ছেদকাতরা কন্যাকে দেখে স্থির থাকতে পারে না।

রাজা। বয়স্য, সেই যে শকুন্তলার সঙ্গে আমার কয়েকদিনের জন্য মিলন ঘটেছিল, এখন মনে হচ্ছে সে কি সত্য না স্বপ্ন, না কি কোন ইন্দ্রজালের প্রভাব, অথবা আমারই কোন আকস্মিক উন্মত্ততার ফলে ঐরকম একটি ধারণা জন্মেছিল। সে মিলন কখনো বাস্তব হতেই পারে না। যদি হত, তাহলে কি তা এমনভাবে মুছে যেত নিশ্চিহ্ন হয়ে? অথবা হয়ত কোন জন্মান্তরীণ পুণ্যের ফলে তার সঙ্গে আমার সমাগম ঘটেছিল আর সে পুণ্যের ফল ঐ সমাগমমাত্রই ক্ষয় হয়ে গেছে। তাই

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটাই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তা না হলে অত অল্পকালের মধ্যেই সে সমাগমসুখ হতে বঞ্চিত হব কেন আমি ? হায়, সেই শকুন্তলা আর ফিরবে না। চিরদিনের মত ঘুচে গেছে তার আশা। এখন আমার যত কিছু আশা, তাকে ফিরে পাবার যত কিছু অভিলাষ খরস্রোতা নদীর তটপতনের মত একের পর এক করে বিলীন হয়ে যাবে।

বিদূষক। এমন কথা বলো না। এই আংটি তোমাদের মিলনের পূর্বলক্ষণ। এই আংটির মত সেও একদিন এসে হস্তগত হবে তোমার। সে কিভাবে এসে পড়বে তা বলা যায় না।

রাজা। (আংটির দিকে চেয়ে) অতি দুর্লভ স্থান হতে স্খলিত হওয়ায় এই আংটি যথার্থই অতি শোকের ভাজন হয়েছে। হে অঙ্গুরীয়ক, আমার পুণ্যের মত তোমার পুণ্যও হয়ত ক্ষয় হয়ে গেছে। যতদিন পুণ্য ছিল ততদিন তারই ফলে শকুন্তলার দুর্লভ অঙ্গুলিতে স্থান পেয়েছিলে। যেমন তোমার পুণ্য ক্ষয় হয়েছে অমনি তুমিও তার সেই আরক্ত নখরাজিবিরাজিত মনোহর অঙ্গুলি হতে স্খলিত হয়ে পড়েছ।

সানুমতী। তা বটে, যদি তোমার হাতে না পড়ে অন্য কারো হাতে পড়ত তাহলে নিশ্চয়ই পরম পরিতাপের বিষয় হত সন্দেহ নেই।

বিদূষক। সখা, তোমার হাতের আংটি তার হাতে কি করে গেল ?

সানুমতী। লোকটা দেখছি আমারই অভিলষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে।

রাজা। যখন আমি আমার রাজধানীতে ফিরে আসি তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রেয়সী আমায় জিজ্ঞাসা করল, কতদিনে তোমার সংবাদ পাব ?

বিদূষক। তারপর ?

রাজা। তখন আমি এই আংটি প্রেয়সীর আঙ্গুলে পরাতে পরাতে বললাম, এতে আমার নামের অক্ষরগুলি প্রতিদিন একটি একটি করে গুণে যেও। যেদিন দেখবে অক্ষরগোণা শেষ হয়েছে সেইদিনই তোমাকে আমার অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবার জন্য কোন্ বিশ্বস্ত ব্যক্তি এসে

উপস্থিত হবে। হায় রে, মোহবশতঃ তা আর করে উঠতে পারিনি।

সানুমতী। আহা কি সুন্দর! শেষকালটা হর্তাবিধি বিগড়ে দিয়েছেন।

বিদূষক। জেলের ধরা রোহিত মাছের পেটে এই আংটি ঢুকল কি করে?

রাজা। শচীতীর্থে যখন তোমার সখী জলে নেমে পূজা অর্চনা করছিল তখন তার হাত থেকে খসে পড়ে থাকবে।

বিদূষক। তা হতে পারে।

সানুমতী। তাই বল? এই কারণেই পাপভয়ে ভীত হয়ে রাজর্ষি দুষ্মন্ত হতভাগিনী শকুন্তলার পরিচয় সম্বন্ধে অত সন্দিহান হয়েছিলেন। তা না হলে এমন অকপট অকৃত্রিম অনুরাগ আবার একটা প্রমাণ বা স্মারকচিহ্ন ছাড়া মনে পড়বে না এটা কি হতে পারে?

রাজা। আজ এই অঙ্গুরীকে আমি খুব তিরস্কার করব।

বিদূষক। (মনে মনে) আবার দেখছি রাজা বেচারা পাগলের পথ ধরল।

রাজা। হে অঙ্গুরীয়ক, সেই চিরসুন্দর, ঈষদুন্নত ও আনত, অঙ্গুলিশোভিত প্রিয়তমার হস্ত পরিত্যাগ করে কিভাবে তুমি জলে নিমগ্ন হলে? অথবা তুমি অচেতন কোন বস্তু। কারো কোন গুণে বা মাহাত্ম্য জানার কথা তোমার নয়। কিন্তু আমি একজন চৈতন্যসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে কিকরে প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করলাম?

বিদূষক। এদিকে ক্ষুধায় যে আমাকে খেয়ে ফেললে দেখছি।

রাজা। শকুন্তলা, বিনা কারণে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি। আজ অনুতাপে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। দয়া করো, একবার দেখা দিয়ে বাঁচাও।

একই দৃশ্যে আলেখ্য হাতে পরিচারিকা চতুরিকার প্রবেশ

চতুরিকা। এই নিন মহারাজ, আলেখ্যপট। (চিত্রফলক প্রদর্শন)

রাজা। বাঃ, বেশ উত্তম এঁকেছ বন্ধু। অঙ্গ এমনই সমাবেশ করেছ যে হৃদয়ের ভাব শকুন্তলার যেন ফুটে বার হচ্ছে।

সানুমতি। বাঃ রাজর্ষির চিত্রবিদ্যায় কি অদ্ভুত নিপুণতা! আমার মনে হচ্ছে শকুন্তলা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজা। চিত্রে যে যে বিষয় ঠিক আঁকা যায় না, তার একটু আধটু এদিক ওদিক আমাকে করতে হয়েছে বটে, তবু এই অংকনের দ্বারা প্রিয়ার সৌন্দর্য কতকটা ফলাতে পেরেছি বলে বোধ হয়।

সানুমতী। এরকম অনুতাপ বর্ধনশীল স্নেহের মতই বটে।

বিদূষক। এখানে যে তিনটি শ্রীমতী দেখছি তারা প্রত্যেকেই খুব সুন্দরী। এদের মধ্যে তোমার সেই শকুন্তলাটি কে?

সানুমতী। এ লোকটা দেখছি চোখ থাকতে অন্ধ। এমন রূপের মাহাত্ম্যই বোঝে না।

রাজা। তোমার কোনটিকে মনে হয়?

বিদূষক। আমার মনে হয়, ঐ যে জলসেচনপুষ্ট নধর কচি কচি পল্লবমণ্ডিত আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে যেন পরিশ্রান্তা, বাহুদুটি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, সারা মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠেছে, কবরী খুলে চুলগুলি মুখের উপর এসে এলিয়ে পড়েছে, আর কবরীর ফুলের মালা খসে পড়ে গেছে—ঐ চিত্রটিই হচ্ছে শকুন্তলার, আর বাকি দুটি তার দুই সখীর।

রাজা। খুব নিপুণভাবে আঁকা। এই ছবিখানিতে আমার মনের অবস্থাটা প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দেখ, ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঘর্মাক্ত অঙ্গুলির স্পর্শ হওয়ায় কেমন যেন একটা চিহ্ন থেকে গেছে। আমি যখন ছবিটি আঁকি তখন আমার চোখ হতে চিত্রিত শকুন্তলার গণ্ডস্থলে টপ টপ করে যে অশ্রুবিন্দু পড়েছিল তাতে চিত্রপটের উপরিভাগে চিত্রকর্মের সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য যে প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল তা কেমন ফেঁপে উঠেছে।

চতুরিকা। আর্য মাধব্য, ছবিখানি একবার ধরুন, আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।

রাজা। আমি ধরছি। (ধারণ ও চতুরিকার প্রস্থান)

রাজা। যখন প্রিয়তমা আপনি এসে সামনে উপস্থিত হয়েছিল

তখন তাকে পরিত্যাগ করেছি, আর এখন সেই প্রিয়তমাকে ছবিতে একটিবার দেখার জন্য পাগলের মত কত কিই না করছি। আমি যেন এমনই এক তৃষিত পথিক যে পথিমধ্যে স্বচ্ছসলিলা এক স্রোতস্বিনীকে এড়িয়ে গিয়ে শেষে প্রাণনাশিনী মরীচিকায় প্রলুব্ধ হয়ে ঘুরে মরছি।

বিদূষক। (মনে মনে) সত্যই রাজা দেখছি নদী ছেড়ে গিয়ে মৃগতৃষ্ণিকার আবর্তে ঘুরছেন। (প্রকাশ্যে) ভাই, আর কি এই পর্বে লিখবে বলে ভেবেছ?

সানুমতী। যে যে স্থান আমার শকুন্তলা ভালবাসত বোধ হয় সেই সেই স্থান আঁকার সাধ হয়েছে!

রাজা। তবে শোন, স্রোতস্বিনী মালিনী নদীকে আঁকতে হবে। তার বালির চড়ায় এমনভাবে জোড়ায় জোড়ায় শায়িত হাঁস আঁকতে হবে যেন মনে হবে বালির সঙ্গে তারা মিশে গেছে। সেই মালিনীর দুই তীরে হিমালয়ের ছোট ছোট প্রত্যন্ত পর্বতগুলি আঁকতে হবে এবং সেই সব পাহাড়ের এখানে সেখানে হরিণের পাল শুয়ে আছে বসাতে হবে। ঐ মালিনীর তীরে একটি গাছের ডালে স্নানোত্তীর্ণ ঋষিদের পরিধেয় সিক্ত বাকলগুলি শুকোতে দেওয়া দেখাতে হবে আর তার আর এক কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে বামনয়ন চুলকাচ্ছে এমন এক মৃগীকে আঁকতে হবে।

বিদূষক। (মনে মনে) দেখতে পাচ্ছি এমন ছবিখানা লম্বা লম্বা চুল দাড়িওয়ালা ঋষিদের পালে ভরে যাবে।

রাজা। বন্ধু আর যে অলঙ্কার আমার শকুন্তলার বড়ই আদরের সেটা একেবারে ভুলে গেছি।

বিদূষক। সেটা কি?

সানুমতী। বনবাস এবং সখী শকুন্তলার সৌন্দর্য এই দুইএর পক্ষে যেটা শোভা পায় তেমন একটা কিছু।

রাজা। সখা, প্রিয়ার কানে গোঁজা আছে আর কেশরগুলি এসে স্বচ্ছ গণ্ডস্থলে লুটোপুটি খাচ্ছে এমনভাবে একটি শিরীষ ফুল আঁকা হয়নি। আর শরতের জ্যোৎস্নার মত কোমল ভগ্ন মৃণালের সূত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়নি। পলার মত ছোট ছোট খণ্ডে মৃণাল ভেঙ্গে হার

করে গলায় পরেছে আর সেই ভগ্ন মৃণালের সুতো এসে প্রিয়ার পীনোন্নত স্তনযুগলের মধ্যে পড়েছে—এই সুন্দর দৃশ্যটাও আঁকতে ভুল হয়েছে।

বিদূষক। ও কি মহারাজ! বকুলের লাল পল্লবের মত হাতের ডগা দিয়ে মুখ ঢেকে অমন চমকিতভাবে শকুন্তলা ঠাকুরাণী দাঁড়িয়ে কেন? একটা ভ্রমর ফুলের মধু চুরি করে খাওয়া যার ব্যবসা সে দেখছি ঠাকুরাণীর মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

রাজা। সখা, এই বর্বরকে থামাও।

বিদূষক। ভাই, যারা ও রকম দুর্বিনীত, তুমিই ত তাদের শাসনকর্তা। সুতরাং ও কাজটা তুমিই করো।

রাজা। ঠিক, বলি ওহে কুসুমিত লতাবলীর অন্তরঙ্গ। খেয়ালমত যারা কুসুমিতা তাদের কাছে গিয়ে অতিথি হও। তবে এখানে আমার সখীর গায়ে পড়বার জন্য বৃথা শ্রম করছ কেন? এই যে অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে তোমার অনুরাগিণী ভ্রমরী গিয়ে ফুলের উপর পড়ে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে, কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে মধুপান করছে না, তার কাছে যাও না।

সানুমতী। আর্য, খুব সুন্দরভাবে নিষেধ করলে ত।

বিদূষক। দেখ বন্ধু, এই যে ভ্রমর জাতিটা, ওরা কখনো কারো বারণ মানে না। ওদের প্রকৃতিই আলাদা।

রাজা। সত্য নাকি ভ্রমর, আমার আদেশ মানবে না? যদি না মানো তবে শোন, ফের যদি তুমি আমার প্রিয়তমার বিম্বাধর স্পর্শ করো তাহলে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখব। তখন টের পাবে। তুমি কি জান, প্রেয়সীর ঐ অধর আমার কত আদরের, কত সুখ-স্মৃতির। তরুণ তরুর নবোদ্গত নধর পল্লব যা কেউ কখনো স্পর্শ করেনি, তারই মত স্পৃহনীয় ঐ অধর। আমাদের মিলনকালেও কত সন্তর্পণে কত সাবধানে আমি ঐ অধরসুধা পান করেছি। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও প্রাণ ভরে সে তৃষ্ণা মিটাইনি। আর আজ তুমি চাও তা উপভোগ করতে?

বিদূষক। উঃ এত ভীষণ কঠিন দণ্ড দেবে? তবে তোমাকে ভয় না করবে কেন? (হেসে মনে মনে) রাজা ত দেখছি পাগল হলো, কারণ পাগলের মতই বকছে। আমিও এর সঙ্গে প্রলাপ বকতে শুরু করলাম। সুতরাং পাগল হতে আমারও বেশী দেরী নেই। (প্রকাশ্যে) ওগো মশাই, তোমার হলো কি? এ যে ছবি, সত্য নয়।

রাজা। কি বললে, ছবি?

সানুমতী। আমিও ত ভাবছিলাম এ বুঝি সত্যই শকুন্তলা। আমারই যখন এই দশা তখন শকুন্তলাসর্বস্ব রাজার যে অমন বাস্তব জ্ঞান হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি?

রাজা। বয়স্য, কি সর্বনাশ করলে আমার? একেবারে তদ্গতচিত্ত হয়ে এতক্ষণ চিত্রগতা শকুন্তলাকে সত্য শকুন্তলা জ্ঞানে দেখে কত সুখ পাচ্ছিলাম। আর তুমি কি না সত্য নয়, ছবি বলে মনে করিয়ে দিয়ে আমার প্রিয়তমাকে সত্যই ছবি বানিয়ে দিলে? আমি মিথ্যাকে সত্য ভেবে আনন্দসাগরে ডুবেছিলাম আর তুমি সেই সত্যকে মিথ্যা বলে বুঝিয়ে আমার মোহ ভেঙ্গে দিলে? মোহই যে আমার সুখের ছিল। (কাঁদতে লাগলেন)

সানুমতী। বাঃ, এই বিরহব্যাপারটা কি অপূর্ব! প্রথমতঃ চিত্রকে চিত্রজ্ঞানে কত কথা, পরে দেখতে দেখতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়ে সেই চিত্রকেই সত্য জ্ঞানে কত কথা, পরে ভুল ভাঙ্গার পর সেই চিত্রকেই চিত্র-জ্ঞানে কত দুঃখ। এ বিরহের আদি হতে অন্ত—সবই মনোহর।

রাজা। ভাই, কিকরে বল ত অনবরত এত দুঃখ সহ্য করি? অনিদ্রার জন্য রাত্রিতে স্বপ্নে যে একটু দেখব তার উপায় নেই। ছবি দেখার পথও বন্ধ। ছবির দিকে চাইবার আগেই জলে ভরে যায় চোখ। এখন কি করি?

সানুমতী। রাজা, শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করে যত দুঃখ দিয়েছিলে, আজ সে সমস্ত দুঃখই তুমি দূর করলে।

চতুরিকা। মহারাজের জয় হোক। রং, তুলি প্রভৃতির ঝাঁপি নিয়ে এইদিকে আসছিলাম।

রাজা। কি ব্যাপার? তারপর?

চতুরিকা। আসতে আসতে পথের মাঝখানে তরলিকাকে নিয়ে দেবী বসুমতী এসে উপস্থিত। তিনি 'আর্যপুত্রকে দেব এখন' বলে সবলে আমার হাত থেকে ঝাঁপিটা ছিনিয়ে নিলেন।

বিদূষক। যা হোক, তুমি ত বেঁচে গেছ।

চতুরিকা। এর মধ্যে দেবীর গায়ের চাদরখানা একটা গাছের ডালে জড়িয়ে গেল এবং তরলিকা যেমন সেটা ছাড়াতে লাগল, আমিও অমনি চলে এলাম।

রাজা। বয়স্য, পাটরাণী এসে উপস্থিতপ্রায়। আমার কিন্তু বড় ভয় করছে, কারণ তিনি বড় অভিমানিনী। তুমি এই ছবিখানা রাখ। দেখলে আর নিস্তার নেই।

বিদূষক। শুধু ছবিখানা? তোমাকেও রাখতে হবে বল। (ছবি নিয়ে উঠে পড়ল) অন্তঃপুরবাসিনীদের হাতে পড়া মানে ফণিটির মুখে পড়া। যদি তার হাত থেকে রক্ষা পাই ত ঐ আকাশভেদী 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' নামক প্রাসাদে আমাকে ডেকো। আমি সেখানেই থাকব।

সানুমতী। প্রথম বয়সের প্রেম কি না, তাই হাজার অন্যের প্রতি আসক্ত হলেও পাটরাণীর উপর প্রথম প্রেমের কতকটা মেনে চলতে হয়। তবু কিন্তু পূর্বের সেই টান যে এখন খানিকটা কমেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

পত্রহাতে প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। বেত্রবতী, তুমি আসতে আসতে পথে মহারাণীকে দেখলে কি?

প্রতিহারী। হ্যাঁ মহারাজ, আমি পত্র নিয়ে আসছি দেখে ফিরে গেলেন।

রাজা। তা বটে। রাণী নিজে কাজের মূল্য বোঝেন, তাই আমার কাজেও বাধা সৃষ্টি করেন না।

প্রতিহারী। দেব, মন্ত্রীমহাশয় বলে পাঠিয়েছেন, অনেক রাজস্ব

এসে জমা পড়েছে, তাই হিসাব করে নিতেই দিনটা প্রায় কেটে গেল সুতরাং একটিমাত্র রাজকার্য অর্থাৎ প্রজাসংক্রান্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করে পত্রে লিখে মহারাজের নিকট পাঠিয়েছেন। দেখে কর্তব্য নির্দেশ করুন।

রাজা। দেখি, পত্রখানা দাও ত। (প্রতিহারীর পত্র দান)

রাজা। (পত্র পড়ে) কি ? বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে গমনাগমনকারী ধনমিত্র নামক বণিক নৌকাডুবিতে মারা গেছেন ? ছেলেপুলে নেই হতভাগ্যের। তাঁর ধনদৌলত রাজার প্রাপ্য ? এই কথা মন্ত্রী লিখেছেন ? আহা, নিঃসন্তান হওয়া কি পরিতাপের বিষয় ! বেত্রবতী, ধনমিত্র যখন অত অর্থের মালিক তখন তাঁর নিশ্চয় আরও অনেক পত্নী আছে। দেখতে হবে তাদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছে কিনা।

প্রতিহারী। দেব, এই সম্প্রতি অযোধ্যানগরনিবাসী একজন বণিক-শ্রেষ্ঠের কন্যা এক পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন এবং পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। তিনি নাকি ধনমিত্রেরই পত্নী।

রাজা। তাহলে ত সে-ই সব ধন পাবে। গর্ভস্থ সন্তানই ত পিতার সম্পত্তি পায়। একথা তুমি অমাত্যকে গিয়ে বল।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। যেও না, এইদিকে এস।

প্রতিহারী। এই এসেছি মহারাজ।

রাজা। সন্তান থাক বা নাই থাক, কি প্রয়োজন ও কথায় ! তুমি নগরে গিয়ে ঘোষণা করে দাও যে আমার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কেউ যে-কোন অন্তরঙ্গহারা হয়, এবং সে যদি পাপী না হয় তাহলে রাজা দুষ্মন্ত সেই অন্তরঙ্গের অভাব পূরণ করবেন।

প্রতিহারী। এই সংবাদ প্রচার করতে হবে ? বড়ই সুখের বিষয়। (প্রস্থান ও পরে পুনঃপ্রবেশ) বর্ষাকালে বর্ষণের মত এই ঘোষণায় নগর-বাসীরা সকলেই একান্ত আনন্দিত হয়েছে।

রাজা। (উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) হায়রে কুলের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর বংশলোপ হলে এইভাবেই সে বংশের ধনসম্পত্তি অপরের

হস্তগত হয়। আমার মৃত্যুর পর কুরুবংশের রাজলক্ষ্মী অসময়ে বীজবপনে নিষ্ফলা ভূমির মত বিফল এবং নিরাশ্রয় হয়ে অপরের হাতে গিয়ে পড়বে।

প্রতিহারী। ওকি কথা! আপদ বালাই সব দূর হোক।

রাজা। হায়, লক্ষ্মী স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, অথচ সেই হাতের লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়েছি। ধিক আমাকে, শত ধিক!

সানুমতী। নিশ্চয় আমার সখীকে লক্ষ্য করেই রাজা এখন আত্মনিন্দা করছেন।

রাজা। যথাসময়ে বীজ বপন করলে পৃথিবী যেমন প্রচুর শস্যশালিনী হয় তেমনি আমার নিজের আত্মা আমার যে সহধর্মিণীর মধ্যে গর্ভরূপে প্রবৃষ্ট হয়েছিল, আমার সেই সহধর্মচারিণী শকুন্তলাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ধিক আমাকে! আমার কুলের নাম যে রাখত, তাকে হতভাগ্য আমি হেলায় হারিয়েছি।

সানুমতী। তা কেন হবে? তোমার সন্তানবিচ্ছেদ কখনই ঘটবে না।

চতুরিকা। (মনে মনে) তাই ত। এই নিঃসন্তান বণিকের বৃত্তান্তে মহারাজের উদ্বেগ দেখছি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যাও, মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ হতে বিদূষককে ডেকে নিয়ে এস। তিনি এলে রাজাকে কিছুটা আনমনা করতে পারবেন।

প্রতিহারী। ভাল কথা বলেছ, তাই যাই।

রাজা। হায় হায়, দুষ্মন্তের প্রদেয় পিণ্ডার্থী পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডপ্রাপ্তিবিষয়ে ঘোর সন্দিহান হয়েছেন নিশ্চয়। এই নিঃসন্তান দুষ্মন্তের তিরোধানের পর আমাদের উদ্দেশে আমাদের বংশের কে আর বৈদিক বিধি অনুসারে পিন্ড, উদক প্রভৃতি দান করবে? কেউই ত থাকবে না, নিশ্চয় এই সংশয়বিষে জর্জর হয়ে আমার পিতৃপুরুষগণ অপুত্রক আমার প্রদত্ত তর্পণ সজলনয়নে গ্রহণ করবেন। নিরন্তর অশ্রু-বর্ষণে তাঁদের করও অশ্রুময় হয়ে উঠবে আর তাঁরা আমার প্রদত্ত তর্পণজলের কিছু অংশের দ্বারা সেই অশ্রুসিক্ত করপ্রক্ষালন করে অবশিষ্ট

যেটুকু থাকবে সেইটুকুই পান করবেন। উঃ। (মূর্চ্ছা)

চতুরিকা। (তাড়াতাড়ি রাজাকে ধরে) আশ্বস্ত হোন প্রভু।

সানুমতী। হায়, হায়। প্রদীপ জ্বলছে, তবু শুধু একটা আবরণের দোষে রাজা কষ্ট পাচ্ছেন অন্ধকারে। আমি এখনই এঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। অথবা থাক। বিচ্ছেদকাতরা শকুন্তলাকে যেদিন মহেন্দ্রজননী প্রবোধ দিচ্ছিলেন, সেদিন তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম যে রাজা দুষ্মন্ত যাগযজ্ঞ বন্ধ করে দিনরাত শকুন্তলার শোকে মগ্ন হয়ে আছেন। তাই যজ্ঞভাগেব জন্য উৎসুক দেবগণ শীঘ্রই এমন একটা ব্যবস্থা করবেন যাতে রাজা তাঁর ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে আদর করে ঘরে তুলে নেবেন। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে যাই। রাজার এই বিরহকাতর অবস্থার কথা জানিয়ে প্রিয়সখীকে সান্ত্বনা দিই গে। (নৃত্য করতে করতে আকাশপথে প্রস্থান)

(নেপথ্যে)—আমি বলবধ্য ব্রাহ্মণ। আমাকে বাঁচাও।

রাজা। (সংজ্ঞালাভ করে কান পেতে শুনে) একি, বয়স্য বিদূষকের কাতর কণ্ঠ যেন। কে আছ এখানে ?

প্রতিহারী। দেব, বয়স্যের প্রাণ মৃতপ্রায়, রক্ষা করুন।

বাজা। আহা, গরীব ব্রাহ্মণকে কে আক্রমণ করল ?

প্রতিহারী। কিরকম একটা অদৃশ্য দানব এসে বিদূষককে তুলে নিয়ে 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' প্রাসাদের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে।

রাজা। সেকি, তা হতে দেব না। আমার গৃহেও ভূতের উপদ্রব। অথবা প্রতি মুহূর্তে অজ্ঞাতসারে নিজেই হয়ত কত অকার্য করছি, কিছুই বুঝছি না। আর আমার প্রজাদের মধ্যে কখন কে কোন গর্হিত পথে যাচ্ছে তা কে জানবে বল। প্রজার পাপও ত রাজাকে অর্শায়।

(নেপথ্যে) ওগো বন্ধু গেলাম, গেলাম।

রাজা। (উদ্ধত ত্বরিতচরণে চলতে চলতে) সখা, ভয় নেই, ভয় নেই।

(নেপথ্যে) কেন ভয় করব না ? এই যে কে যেন আমার ঘাড়টা নিচের দিকে মুচড়ে ধরে মড়মড় করে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

রাজা। আমার ধনুক কই ?

যবনী বালিকা। (ধনুক হাতে প্রবেশ করে) প্রভু, হস্তাবরণ ও ধনুক নিন। (রাজার ধনুক গ্রহণ)

(নেপথ্যে) তাজা গরম রক্তপানের জন্য উন্মত্ত হয়ে ব্যাঘ্ররাজ যেমন প্রাণভয়ে ভীত পশুকে বধ করে, তেমনিভাবে এই আমি তোর প্রাণনাশ করছি। বিপন্নদের ভয় নিবারণের জন্য যিনি ধনুক ধারণ করেন বলে আস্ফালন করে থাকেন সেই দুষ্মন্ত এসে তোকে রক্ষা করুক।

রাজা। (সরোষে) কি ? আমাকে উদ্দেশ্য করে গর্ব করা হচ্ছে ? দাঁড়া তুই পিশাচ, তোর জীবনের শেষ হলো বলে। (বাণ যোজনা করে) বেত্রবতী, কোন দিকে সিঁড়ি ?

প্রতিহারী। এই দিকে দেব। (সকলের দ্রুতগমন)

(নেপথ্যে) গেলাম, গেলাম। আমি তোমাকে দেখছি, আর তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না ? বিড়ালের মুখে পতিত ইঁদুরের মত আমার জীবনের আর একতিলও আশা নেই।

রাজা। তবে শোন ওরে, অন্যের অদৃশ্যতাবিদ্যায় মদমত্ত পামর! হাঁস যেমন জল ফেলে শুধু দুধটুকু খায় তেমনি রক্ষণীয় ব্রাহ্মণকে ছেড়ে বধ্য তোকে যে বধ করবে সেই বাণ আমি যোজনা করলাম। (রাজা বাণ যোজনা করতেই বিদূষককে ছেড়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলির আবির্ভাব)

মাতলি। হে রাজন, দেবরাজ ইন্দ্র ত অসুরকুলকেই আপনার বধ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব আপনার অমোঘ বাণ তাদের উপরেই নিক্ষেপ করুন। বন্ধুবান্ধবের উপর সুহৃদজনের মধুর দৃষ্টিই পতিত হয়, দারুণ বাণ কখনো নিক্ষিপ্ত হয় না।

রাজা। (অস্ত্র সংবরণ করে) একি, দেবরাজ-সারথি মাতলি আপনি! আসুন আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক।

বিদূষক। যজ্ঞের বধ্য পশুর মত যে আমাকে মারছিল তাকে আবার ইনি 'আসুন-আসুন' করছেন।

মাতলি। হে দীর্ঘজীবী, যেজন্য দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, তা শ্রবণ করুন।

রাজা। বলুন, শুনছি।

মাতলি। কালনেমির কতকগুলি অতি দুর্ধর্ষ সন্তান আছে। সেই দানবগুলির সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

রাজা। তাদের বিষয় আগেই শুনেছি নারদের মুখে।

মাতলি। সেই দুর্জয় দানবরা আপনার বন্ধু দেবরাজের পক্ষে অপরাজেয়। তাই সমরভূমিতে আপনিই তাদের বধ করবেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বয়ং সূর্যদেব যে নৈশ অন্ধকার দূর করতে অসমর্থ, তা কিন্তু চন্দ্রদেবই নাশ করেন। অতএব শস্ত্র গ্রহণ করে ইন্দ্র-প্রেরিত রথে আরোহণ করে এখনই যাত্রা করুন।

রাজা। দেবরাজের এই গৌরবসূচক অনুরোধে আমি কৃতার্থ। কিন্তু আমার বিদূষককে আপনি এ শাস্তি কেন দিলেন?

মাতলি। বলছি। দেখলাম, কি কারণে আপনি বড়ই বিষণ্ণ। তাই আপনাকে একটু ক্রোধোদ্দীপ্ত করতেই ঐরূপ করেছি। কারণ নির্বাপিত-প্রায় কাষ্ঠখণ্ডকে যদি নাড়াচাড়া করা যায়, তাহলে তা জ্বলে ওঠে। ফণীর উপরে আঘাত করলেই সে ফণা ধরে, তেমনি সবাই ক্রুদ্ধ হলেই প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়।

রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য, স্বর্গাধিপতির আদেশ অপরিহার্য। অতএব এই ঘটনা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে অমাত্য পিশুনকে বলবে, আপনি এখন কয়েকদিন একান্ত হৃদয়ে প্রজাপালন করুন। আমার এই আরোপিতগুণ ধনু এক বিশেষ কাজে ব্যাপৃত থাক।

বিদূষক। যেমন আজ্ঞা। (প্রস্থান)

মাতলি। রথে আরোহণ করুন মহারাজ। (রাজার রথে আরোহণ ও সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক

আকাশপথে রথারূঢ় রাজা দুষ্মন্ত ও ইন্দ্র-সারথি মাতলির প্রবেশ

রাজা। মাতলি, যদিও দেবরাজের আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন

করেছি তথাপি তিনি আমাকে যে আদরযত্ন করেছেন, আমার বিশ্বাস, আমি তার উপযুক্ত নই।

মাতলি। (সহাস্যে) দীর্ঘজীবী, আপন আপন কার্যে আপনারা উভয়েই অপরিতৃপ্ত বলেই আমার ধারণা। কারণ দেবরাজের আদরযত্ন দেখে আপনি দানববিজয়ের দ্বারা যে মহান উপকার করেছেন, তা অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবছেন। আবার আপনার অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে চমৎকৃত হয়ে দেবরাজও ভাবছেন, তিনি আপনাকে যে আদরযত্ন করেছেন তা কিছুই নয়।

রাজা। না না, মাতলি তা নয়। বিদায়কালে তিনি আমাকে যে সম্মান দান করেছেন তা আমি চিন্তাও করতে পারি না। সমস্ত দেবতার সামনে তিনি আমাকে তার সিংহাসনের পাশে বসিয়ে তাঁর কণ্ঠের মন্দার-কুসুমের মালা নিজের হাতে আমার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন। নিকটেই তাঁর পুত্র জয়ন্ত দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে সেই মালাগাছাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার বাসনা পিতা মালাটি তাকেই দেবেন। কিন্তু দেবরাজ সস্মিত নয়নে একবার পুত্রের দিকে তাকালেন মাত্র। মালা দিলেন না। তাঁর সেই সস্মিত দৃষ্টির অর্থ হলো, তুমি পুত্র হতে পার, কিন্তু এ মালা রাজা দুষ্মন্তের প্রাপ্য, তোমার নয়। দেবরাজের বক্ষস্থল যে দুর্লভ হরিচন্দনে লিপ্ত ছিল সে চন্দন ঐ মালায় বিলিপ্ত হওয়ায় তার শোভা বেড়ে গিয়েছিল। এমন নগণ্য মালা আমাকে তিনি পরালেন।

মাতলি। আয়ুষ্মান, এমন কি বস্তু আছে যা অমরনাথ ইন্দ্রের আপনাকে অদেয় থাকতে পারে? এই দেখুন, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র চিরকাল নিশ্চিন্ত মনে বিষয়সম্ভোগসুখে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন, এরও দুটি কারণ আছে। একটি কারণ হলো, আপনি একবার নরসিংহরূপে খর নখররাজির দ্বারা স্বর্গলোকের বক্ষ হতে দানবরূপ তীক্ষ্ণ কণ্টককুল উৎপাটিত করেছিলেন, আর এখন সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা আপনি আবার অপর দানবকুল নির্মূল করলেন। তাই ত ইন্দ্র নিরুদ্বেগে ভোগসুখে রত আছেন।

রাজা। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এটা অমরনাথেরই মাহাত্ম্য।

কারণ অতি দুঃসাধ্য যে কর্মে অধীনস্থ ব্যক্তিরা সাফল্য লাভ করে, তাতে তাদের প্রভুরই মাহাত্ম্য সূচিত হয়। প্রভু যদি যে যে ভৃত্যের দ্বারা কোন কোন কার্য সাধিত হবে তা না বুঝতেন তাহলে তাদের সেই সেই কার্যে নিযুক্ত করতেন না। সুতরাং প্রভুর নিয়োগবলেই তারা সেই সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়। এই দেখুন, সূর্যদেব অরুণকে তাঁর রথের সারথিপদে নিয়োগ করেছিলেন বলেই ত অরুণ সূর্যোদয়ের পূর্বেই অন্ধকাররাশি দূর করতে সমর্থ হন। তা না হলে কি পারতেন?

মাতলি। এ আপনার উপযুক্ত উক্তিই বটে। এ উক্তি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। আয়ুষ্মান, একবার এদিকে চেয়ে দেখুন, স্বর্গেও আপনার কি অতুল যশ! ঐ দেখুন, দেবগণ আপনার উদার হৃদয়হরণকারী বিষয়গুলি নিয়ে গান বাঁধছেন আর সুরকামিনীরা তাদের অঙ্গরাগের পর শুক্ল, পীত, লোহিত প্রভৃতি যে সব রং অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে কোমল করলতাপল্লবে সেই গান লিখছেন। ক্ষিতীশ্বর, আপনি কতবড় ভাগ্যবান পুরুষ

রাজা। মাতলি, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে বলে মন বড়ই উৎসুক ছিল। তাই কাল যখন স্বর্গে আরোহণ করি তখন বিচিত্র স্বর্গপথ ভাল করে দেখতে পারিনি। বলুন ত, আবহ, প্রবাহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ ও পরাবহ—এই সাতটি বায়ুর মধ্যে কোন বায়ুর অধিকারবর্তী পথে আমরা এখন যাচ্ছি।

মাতলি। শুনুন মহারাজ, বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠমূল হতে নিঃসৃত হয়ে মন্দাকিনী, অলকানন্দা ও ভোগবতী নামে যে ত্রিপথা গঙ্গা আছেন, তার মধ্যে আকাশবর্তিনী মন্দাকিনী যে বায়ুর অধিকারে প্রবাহিতা, নক্ষত্র-রাজির কিরণমালাকে সম্যকরূপে বিভক্ত করে যে বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলকে আবর্তিত করে থাকে, আমরা সেই পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ুর পথে যাচ্ছি। বলিকে ছলনা করার সময় বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পদন্যাসের মাহাত্ম্যে এ পথ সর্ববিধ পাপ হতে বিমুক্ত ও পুণ্যাত্মক।

রাজা। মাতলি, এইজন্যই আবার বহিরিন্দ্রিয়রাজি, মন এবং দেহান্তবর্তী চেতন পুরুষ সমস্তই যেন কেমন একটা অনির্বচনীয়

আনন্দরসে আপ্লুত হচ্ছে! (রথের চাকার দিকে চেয়ে) এখন আমরা বোধ হয় মেঘসঞ্চরণের পথে এসে নামলাম।

মাতলি। কি করে বুঝলেন?

রাজা। এই দেখুন, মেঘনিঃসৃত জলকণায় আপনার এই রথের চক্রপ্রান্তগুলি কেমন সিক্ত হয়ে গেছে। আর চক্রশলাকাবলীর ফাঁক দিয়ে চাতকগুলি কেমন বার হয়ে আসছে। সৌদামিনীর চঞ্চল দীপ্তি-মালায় রথেব অশ্বসমূহেব কলেবব কেমন যেন মাঝে মাঝে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সব দেখে মনে হয় নিশ্চয়ই জলপূর্ণ জলদমালার উপর দিয়ে আমাদের রথ চলছে।

মাতলি। আব অতি অল্পকালের মধ্যেই মহারাজ, আপনি আপনার নিজের রাজ্যে পেঁছিতে পারবেন।

রাজা। (নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করে) মাতলি, সবেগে অবতরণ করার জন্য নরলোকের কি বিস্ময়াবহ চিত্র দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখুন, পৃথিবী যেন পর্বতের শিখরদেশ হতে ক্রমে অধঃপতিত হচ্ছে। পূর্বে যখন আমরা অতি উচ্চে ছিলাম তখন কিন্তু পর্বতশীর্ষ ও পৃথিবী একাকার বলে মনে হচ্ছিল। এখন পর্বতের মাথাগুলি ক্রমে যতই জেগে উঠছে পৃথিবী ততই যেন পর্বতশীর্ষ হতে নেমে পড়ছে। বৃক্ষাবলীর কাণ্ড-প্রকাণ্ডভাগগুলিও ক্রমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বলে পত্ররাশির মধ্য হতে বৃক্ষসমূহ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আগে অতি দূরত্বের জন্য নদনদী সমূহের জল দেখাই যাচ্ছিল না। এখন যত নীচে নামছি তাদের জল-রাশিও ততই স্পষ্টকররূপে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন পৃথিবী-টাকে সহসা উঁচু করে আমাদের পাশে তুলে ধরছে।

মাতলি। বাঃ, মহারাজের কি নিপুণ দৃষ্টিশক্তি! (সগৌরবে ও সম্মান প্রদর্শন করে) আহা, পৃথিবীর আকার কি মহান আর রমণীয়!

রাজা। মাতলি, সায়ংকালীন মেঘপঙ্ক্তির মত সুবর্ণরসস্রাবী পূর্বসমুদ্র হতে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ যে বিরাট পর্বত দেখা যাচ্ছে তার নাম কি?

মাতলি। আয়ুষ্মান, ঐ পর্বতের নাম হেমকূট। হরিবর্ষ হতে

কিম্পুরুষবর্ষকে ঐ পর্বতই পৃথক করে দিচ্ছে অর্থাৎ কিম্পুরুষবর্ষের সীমানাই এই পর্বত। তপস্যার অমন সিদ্ধিক্ষেত্র আর নেই। ও পর্বতে তপস্যা করলে সিদ্ধি অনিবার্য ও সুনিশ্চিত। ব্রহ্মার মানসপুত্র মারীচি হতে যে প্রজাপতি উদ্ভূত হয়েছিলেন, যিনি সুর ও অসুরদের পিতা, সেই প্রজাসৃষ্টিকর্তা কশ্যপ এই পর্বতে সস্ত্রীক তপস্যা করছেন।

রাজা। তাহলে এতবড় একটা শুভ সুযোগ উপেক্ষা করতে নেই। চলুন ভগবান কশ্যপকে প্রদক্ষিণ করে যাই।

মাতলি। খুব ভাল প্রস্তাব, চলুন। (অবতরণ)

রাজা। (সবিস্ময়ে) মাতলি, কি আশ্চর্য! আপনার রথ চলছে, অথচ কোনরূপ শব্দ নেই। চাকার ঘর্ষণে বা অশ্বক্ষুরের আঘাতে ধূলি দেখা যাচ্ছে না, আপনি রথ থামালেও ভূতলে স্পর্শ না হওয়ায় থেমেছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না।

মাতলি। দেবরাজ ইন্দ্রের এবং আপনার রথের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ।

রাজা। মাতলি, কোন দিকে মারীচের আশ্রম ?

মাতলি। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) রাজন, ঐ যেখানে পত্রপল্লবহীন, শাখাপ্রশাখা বিরহিত বৃক্ষের মত নিশ্চল মুনি প্রখর সূর্যমণ্ডলের দিকে চেয়ে আছেন, ঐ স্থানই মারীচের আশ্রম। একবার ঐ তপস্বীর অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। সেই কতকাল যুগযুগান্ত ধরে তপস্যায় রত আছেন, তাই উই-এর মাটির ঢিপিতে মূর্তির অনেকটা একেবারে ডুবে গেছে। ঐ দেখুন, মাংসহীন বক্ষের উপর কতবড় সাপের খোলস জড়িয়ে আছে। সাপের খোলস ছাড়িয়ে গেছে, অথচ মুনির জ্ঞান নেই। সাপও ভেবেছে ওটা একটা জড়পদার্থ। আর কণ্ঠদেশে বহুকালের কঠিন কঠিন লতায় কেমন গাঢ়ভাবে বেষ্টন করে আছে। যেন শ্বাস ফেলতেও পারছেন না। দুই স্কন্ধে এসে জটা ঝুলে পড়েছে এবং তাতে কত পাখি এসে বাসা বেঁধেছে। একটুও নড়াচড়া নেই, কি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাতেই ডুবে আছেন ঐ মুনি!

রাজা। হে কঠোরতপা ঋষি, তোমাকে নমস্কার।

মাতলি। (অশ্বের রাশ টেনে ধরে) মহারাজ, এই আমরা প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করলাম। ঐ যে মন্দারবৃক্ষসকল দেখছেন, দেবমাতা অদিতি নিজের হাতে আদরযত্ন করে অতবড় করে তুলেছেন।

রাজা। এ যেন স্বর্গ হতেও অধিকতর শান্তিময় স্থান। মনে হচ্ছে, অমৃতের হ্রদে অবগাহন করছি।

মাতলি। (রথ থামিয়ে) এইবার নামুন রাজা।

রাজা। (রথ হতে নেমে) মাতলি, তুমি কোথায় থাকবে ?

মাতলি। রথ ঠিক করে রেখেছি, এখন আমিও নামছি। আপনি এই দিকে আসুন। (একটু এগিয়ে) মহারাজ, জগৎপূজ্য ঋষিদের তপোবনভূমির অনির্বচনীয় শোভা একবার নিরীক্ষণ করুন।

রাজা। আমি যতই দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি, অন্যান্য মুনি-ঋষিরা যে স্থানলাভের জন্য প্রাণপাতিনী তপস্যা করেন, এঁরা সেই স্পৃহনীয়তম স্থান লাভ করেও তপস্যা করছেন। মাতলি, কল্পতরুর বনে থেকেও এঁরা কেবল বায়ুভক্ষণ করে জীবনরক্ষা করছেন! এখানে যিনি যা চান তিনি ত তা-ই পেতে পারেন। ঐ দেখুন, বাপীদীর্ঘিকার জলে কত সোনার পদ্ম বিকশিত আর তার পরাগে জল কেমন পিঙ্গলবর্ণ। ঐ জলেই তাঁরা স্নান আহ্নিক করে থাকেন। মণিশিলার উপর বসে এঁরা সমাধিতে মগ্ন হন। অপ্সরামণ্ডলীর মধ্যে থেকেও এঁরা দুর্দম ইন্দ্রিয়-সমূহ নিগ্রহ করেন। জন্মজন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে কেউ এমন স্থানে কদাচিৎ আসতে পারে, আর এঁরা এ স্থানের অধিবাসী হয়েও কি কামনায় তপস্যা করছেন ?

মাতলি। মহারাজ, যাঁরা মহান তাঁদের আকাঙ্খাও উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগামিনী হয়। তাঁরা আরও বড় হতে চান। (একটু এগিয়ে শূন্যে লক্ষ্য করে) হে বৃদ্ধ শাকল্য, (মারীচের পরিচায়ক), ভগবান মারীচ কি করছেন ? কি বললে ? তাঁর পত্নী দেবমাতার প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে পতিব্রতার ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। আর অন্যান্য অনেক মহর্ষি-পত্নীর সঙ্গে দেবমাতা তা শুনছেন।

রাজা। (কান দিয়ে) এই প্রসঙ্গে বাধা দেওয়া উচিত নয়। একটু

পরে যাওয়া যাক।

মাতলি। আপনি একটু দাঁড়ান অশোকতরুর মূলে। আমি তত-ক্ষণে গিয়ে ইন্দ্রের পিতার নিকট আপনার আগমনবার্তা সুযোগ বুঝে নিবেদন করি।

রাজা। যেমন আপনার ইচ্ছা। (দাঁড়ালেন)

মাতলি। চললাম। (প্রস্থান)

রাজা। (বাহুকম্পন লক্ষ্য করে) বাহু কেন বৃথা কাঁপছ ? তোমার কম্পনের যে ফল তার কোন সম্ভাবনা আমার ভাগ্যে আর নেই। সে সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে চিরদিনের মত। কারণ পূর্বে উপনত সুখকে যে উপেক্ষা করে সেই সুখ দুঃখরূপে পরিণত হয়ে সেই হতভাগ্যের সামনে উপস্থিত হয়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে তার পরিণাম অনন্ত দুঃখ।

(অন্তরাল হতে হঠাৎ শোনা গেল) ছিঃ চপলতা করো না, এখানেও নিজের স্বভাব পেয়ে বসলে !

রাজা। (কান পেতে শুনে) কাকে এভাবে নিষেধ করা হচ্ছে ? (শব্দ লক্ষ্য করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য ! যুবকের মত বলশালী এ বালকটি কে ? দুজন তাপসীও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। দুর্ধর্ষ সিংহশাবক তার মাতার স্তন্যপান করছিল, আর ঐ বালক সেই শাবকের কেশরগুলি খেলা করার জন্য টানছিল। কি অদ্ভুত বালক ? কে এ ?

সিংহশাবক আকর্ষণকারী বালক ও দুই তাপসীর প্রবেশ

বালক। সিংহ, হাত তোল ত, তোর দাঁতগুলি গুণে দেখি।

প্রথমা তাপসী। অসভ্য শিশু, কেন আমাদের সন্তানতুল্য জন্তু-গুলিকে জ্বালাতন করছ ? বটে, আমার কথায় আবার রাগ আরও বাড়ল দেখছি। ঋষিরা যে তোমার সর্বদমন নাম রেখেছেন, তা ঠিকই হয়েছে। নামটা বর্ণে বর্ণে ফলেছে।

রাজা। একি, ও বালককে দেখা থেকে এর উপর পুত্রস্নেহ জন্মাচ্ছে কেন ? আমি নিঃসন্তান। তাই বোধহয় একে দেখে মন আমার

বিগলিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়া। শোন সর্বদমন, এই সিংহীর পুত্রকে যদি না ছাড় তবে এই সিংহী গিয়ে এক্ষুণি ধরবে তোমাকে।

বালক। (হেসে) ও বাবা! আমার বড় ভয় করছে। (বলে ঠোঁট দেখাল)

রাজা। কি ভয়ানক বালক। একটা স্ফুলিঙ্গ যেন কাষ্ঠের অপেক্ষায় রয়েছে। কাষ্ঠখণ্ড পেলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে। এখন শিশুকাল, তাই এখন এইরকম আছে। যখন যৌবনকাল আসবে তখন এ শিশু এক দুর্দমনীয় তেজে জগতের অসহ্য হয়ে উঠবে। আমার মনে হয় এক অপ্রথিত তেজ লুকিয়ে আছে এই বালকের মধ্যে, সময় এলেই জ্বলে উঠবে।

প্রথমা। বৎস, এই শিংহশিশুকে ছাড়, তোমাকে অন্য খেলনা দেব।

বালক। আগে দাও। (হস্তপ্রসারণ)

রাজা। একি, এ শিশুর হাতে দেখছি চক্রবর্তীর লক্ষণ রয়েছে। খেলনার জন্য হাত বাড়াতেই তার হাতে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন দেখা গেল। অঙ্গুলিগুলি কেমন পরস্পর সংশিলষ্ট থেকে শোভা পাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, অতি প্রত্যুষে যেন একটি পদ্ম স্ফুটনোন্মুখ হয়ে উঠেছে এবং ঊষার অরুণিমায় তার কোমল কোরকও লাল হয়ে উঠেছে। তার পাপড়িগুলি এখনো ভাল করে খোলেনি। তবু শোভায় ভরে গেছে।

দ্বিতীয়া। সুব্রতা, শুধু কথায় একে থামানো যাবে না। তুমি আমার কুটিরে গিয়ে দেখ, ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের শুক্লপীতাদি নানা বর্ণের একটি মাটির ময়ূর আছে। তা একে এনে দাও।

প্রথমা। আচ্ছা যাচ্ছি। (প্রস্থান)

বালক। যতক্ষণ সেটা না পাই, ততক্ষণ এই সিংহশিশুকে নিয়েই খেলি। (বলে তাপসীর দিকে চেয়ে হাসল)

রাজা। আহা, এই দুরন্ত ছেলেটিকে আমার ভাল লাগছে। বিনা কারণে যখন হাসছে তখন কচি কচি ফুলের কুঁড়ির মতন দাঁতগুলো ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। একে আধো-আধো কথা, তাতে অস্ফুট উচ্চারণ,

শুনতে কি মধুর। কান জুড়িয়ে যায়। কোলে আসবার জন্য কত উৎসুক, সমস্ত পায়ে ধূলি এ শিশুর সবটুকুই মধুর। কত তপস্যা করলে এমন শিশুকে কোলে করা যায়, কত পুণ্য থাকলে এমন শিশুর গায়ের ধূলিতে নিজের দেহ ধূসর করা যায়।

তাপসী। এ দুরন্ত শিশু আমাকে মানছে না। (আশেপাশে চেয়ে) ঋষিকুমারদের মধ্যে কে আছে এখানে? (রাজাকে দেখে) হে মহাশয়, এইদিকে একবার আসুন ত। এই নাছোড়বান্দা শিশুর হাত থেকে এই সিংহশাবকটিকে বাঁচান। আমরা ছাড়াতে পারলাম না। সিংহশিশুটি এর হাতে মারা যেতে বসেছে।

রাজা। (কাছে গিয়ে) বলি ও মহর্ষিপুত্র, তোমার এমন আশ্রম-বিরুদ্ধ ব্যবহার কেন? এখানে ত কেউ কাউকে হিংসাদ্বেষ করে না। জীবজন্তুকে আশ্রয় দেওয়ায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করায় তপোবনবাসীদের আচার ব্যবহার কত সুখের। সেই সর্বহিংসানিবৃত্তিরূপ সংযমকে তুমি শিশুকাল হতেই কলঙ্কিত করতে বসেছ। কালসর্পের শাবক যেমন চন্দনতরুকে বিষাক্ত করে তোলে, সুখশান্তির আকর সংযমকে তুমি তেমনি পঙ্কিল করে তুলছ কেন?

তাপসী। মহাশয়, এ বালক ঋষিকুমার নয়।

রাজা। এর আকৃতির অনুরূপ দুঃসাহসের কাজ দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে এই স্থানটা আশ্রম, তাই আমার ঐরূপ সন্দেহ হচ্ছিল। (তাপসীর অনুরোধে সিংহশাবককে মুক্ত করে বালকের অঙ্গস্পর্শ করে মনে মনে বললেন) জানি না, এ শিশু কার বংশের অংকুর, তবু এর অঙ্গস্পর্শ করে আমার এত সুখ, এক তৃপ্তি হচ্ছে। আর যে ভাগ্যবানের এ পুত্র, এর স্পর্শে তার ত না জানি কি অনির্বচনীয় সুখই জন্মায়।

তাপসী। (উভয়কে দেখে) কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

রাজা। আর্যে, কি ব্যাপার?

তাপসী। মহাশয়, আপনার আকৃতি দেখছি, এই বালকের আকৃতির মত, তাই বড় বিস্মিত হয়েছি। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত,

তবু আপনার কাছে গিয়ে এই দুরন্ত ছেলে শান্ত হয়ে আছে। যেন কত ভাল মানুষ।

রাজা। (বালকের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে) এ যদি ঋষি-কুমার না হয়, তবে এ শিশু কোন বংশের সন্তান?

তাপসী। পুরুবংশের।

রাজা। (আত্মগত) একি, এ যে আমার বংশ। এই জন্যই তাপসী এই শিশুকে আমার অনুরূপ বলে মনে করছিলেন। তা হবে। পুরু-বংশীয় রাজাদের শেষ বেলাটা এমনিই ছিল। প্রথম জীবনে তাঁরা পৃথিবী পালনের জন্য সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে বাস করতেন সত্য, কিন্তু শেষ জীবনে তাঁরা বনে তরুমূল আশ্রয় করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হতেন। (প্রকাশ্যে) কিন্তু মানুষ স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না।

তাপসী। মহাশয়, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই বালকের মাতা অপ্সরার সম্পর্কে দেবগুরু মারীচের তপোবনে এসে এই শিশুকে প্রসব করেছেন।

রাজা। (আত্মগত) তাই ত, এতে যে আর একটি আশার সূত্র দেখছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বলুন ত, সেই মহিলা কোন রাজর্ষির পত্নী? তাঁর নাম কি?

তাপসী। ছিঃ, সেই ধর্মপত্নীর পরিত্যাগকারী অকার্যকর রাজার নাম উচ্চারণ ত দূরের কথা, উচ্চারণের চিন্তা পর্যন্ত কেউ করে না।

রাজা (স্বগত) 'ধর্মপত্নী পরিত্যাগকারীর নাম?'—এ যে দেখছি আমারই সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই শিশুটির মার নাম জিজ্ঞাসা করি না কেন, অথবা কাজ নেই, পরের স্ত্রীর সম্বন্ধে অতটা কৌতূহল ঠিক নয়।

মাটির ময়ূর হাতে তাপসীর প্রবেশ

তাপসী। সর্বদমন, শকুন্ত লাবণ্য অর্থাৎ সুন্দর এই পাখিটি দর্শন করো।

বালক। (তাড়াতাড়ি চেয়ে) কই, আমার মা কই?

উভয় তাপসী। এরকম নাম শুনেই মাগতপ্রাণ বালক প্রতারিত

হয়েছে।

রাজা। (আত্মগত) একি, এর মার নামও দেখছি শকুন্তলা। তা হতেও পারে, এক নামের দুজন কি থাকতে পারে না ? হায়, মরীচিকার মত অক্ষরে অক্ষরে এই নামের মিল কি শেষে আমার দুঃখের কারণ হবে ?

বালক। বাঃ, এই সুন্দর ময়ূরটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। (খেলনাটি গ্রহণ)

১ম তাপসী। (দেখে উদ্বিগ্নভাবে) কি সর্বনাশ ! এর হাতের কব্জিতে ত রাখী দেখছি না। খুলে পড়ল কোথায়।

রাজা। ব্যস্ত হবেন না। সিংহশাবকের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তির সময় বালকের হাত থেকে এই যে খুলে পড়েছে। (তুলতে গেলেন)

উভয় তাপসী। (সমস্বরে) ধরবেন না ধরবেন না। একি, রাখীটা ধরে ফেলেছেন ? (সবিস্ময়ে বুকে হাত দিয়ে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাইল)

রাজা। রাখী তুলতে আমাকে নিষেধ করছিলেন কেন ?

প্রথমা। শুনুন মহাশয়। এই লতার নাম অপরাজিতা। এই বালকের জাতকর্মের সময় ভগবান মারীচ নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন। নিজে এবং মা বাপ ছাড়া অন্য কেউ ভূমিতে পতিত এই লতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

রাজা। যদি করে ?

প্রথমা। তাহলে এই লতা সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারবে।

রাজা। আপনারা স্বচক্ষে কাউকে এমন ছোবল মারতে দেখেছেন ?

উভয়ে। অনেক দেখেছি।

রাজা ! (আনন্দে মনে মনে) তাহলে দেখছি, আমার কামনা পূর্ণপ্রায়। সুতরাং আর বিলম্ব কেন ? (বালককে আলিঙ্গন)

দ্বিতীয়। সুব্রতা, চল, ব্রহ্মচর্যাপরায়ণা শকুন্তলাকে এই ব্যাপারটা বলিগে।

বালক। ছাড় আমাকে, মার কাছে যাই।

রাজা। পুত্র, আমার সঙ্গেই মার কাছে যেও এখন।

বালক। আমার বাবা দুষ্মন্ত, তুমি নও।

রাজা। (সহাস্যে) এই ঝগড়াতেই সমস্যার জট আরো বেশী খুলে যাচ্ছে।

একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ

শকুন্তলা। যে সময়ে সাপ হয়ে দংশন করার কথা, রাখীর লতা লতাই রয়ে গেছে। একথা শুনে আমার কোন আশা হচ্ছে না। অথবা হয়ত বা সানুমতীর কথাই বুঝি ফলতে চলেছে।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখে) আহা, এই সেই শকুন্তলা। পরিধানে ধূলিধূসর বসনযুগল, নিয়ত কঠোর নিয়ম পালনে মুখখানি একেবারে বিশুষ্ক, মাথায় সেই কবে নিবদ্ধ একটিমাত্র বেণী। দেখলে মনে হয়, পবিত্র চরিত্রসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হায় রে, নির্দয় পাষাণ আমি। এইভাবে আমার শকুন্তলা সুদীর্ঘ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বিরহব্রত পালন করছে।

শকুন্তলা। (অনুতাপদাহে ম্লানমূর্তি রাজাকে দেখে) কে? আর্যপুত্র না? তা যদি না হয় তবে কে এই ব্যক্তি রক্ষাকবচে সুরক্ষিত আমার শিশুকে স্পর্শ করছে?

বালক। (মার কাছে গিয়ে) মা, দেখ না, কোথাকার একটা লোক আমায় পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার উপর কি দুর্ব্যবহারই না করেছি। কিন্তু এখন দেখছি যে সবই আমার পরম সুখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এতদিন পরেও তুমি আমাকে চিনতে পারলে।

শকুন্তলা। (মনে মনে) হৃদয় আশ্বস্ত হও। এতদিন পরে অদৃষ্ট আমার প্রসন্ন হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে! এই ত আমার আর্যপুত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আজ বড়ই আনন্দের দিন। যে বিস্মৃতির মোহে আমার অন্তর আচ্ছন্ন ছিল সে মোহ কেটে গেছে। প্রসন্নবদনী তুমি এসে উপস্থিত হয়েছ আমার সামনে। একি কম ভাগ্যের কথা! রোহিণী আজ যেন গ্রহণ শেষে চন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় এসে মিলিত

হয়েছেন।

শকুন্তলা। আর্যপুত্রের জয় হোক। (বলতে বলতে কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হলো)

রাজা। সুন্দরী, তোমার উচ্চারিত জয়শব্দ বাষ্পভরে স্তব্ধ হলেও আমার কিন্তু সত্যই জয়জয়কার। কারণ এতদিন পরেও সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও তোমার রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দেখতে পেলাম। এই ওষ্ঠ দর্শনেই বুঝছি এতকাল কি কঠোর সংযমই না তুমি পালন করে এসেছ।

বালক। মা, কে এই লোকটা?

রাজা। (শকুন্তলার পদতলে পড়ে) হে শোভনাঙ্গী, আমার অনুরোধ, আমার দ্বারা পরিত্যাগজনিত দুঃখ দূর হোক তোমার হৃদয় হতে। তখন যেন কেমন একটা ভয়ানক মোহ জন্মেছিল আমার মনে। লক্ষ্মী, কল্যাণকর বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হতভাগ্য ব্যক্তির এমনি ব্যাপারই ঘটে থাকে। অন্ধের মাথায় যদি সুরভিত একছড়া ফুলের মালাও ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে তখনি সাপ ভেবে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে।

শকুন্তলা। আর্যপুত্র, ওঠ। তোমার দোষ কি? প্রত্যাখ্যান-কালে আমার পূর্বজন্মকৃত পাপ নিশ্চয় ফলবতী হয়েছিল এবং আমার সব পুণ্যকে রোধ করে এমন বিপদে ফেলেছিল। তা না হলে তোমার মত দয়াময় তেমন নির্দয় হবে কেন? সবই আমার কপালের লিখন। তুমি ওঠ।

রাজা। (উঠলেন)

শকুন্তলা। এই দুঃখিনীকে আর্যপুত্রের মনে পড়ল কেমন করে?

রাজা। শকুন্তলা, আমার বুকে যে বিষাদের শেল বিদ্ধ হয়েছে তা তুলে ফেলি। তারপর সেই বৃত্তান্ত বলছি। মনে পড়ে প্রিয়, একদিন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কতই না কেঁদেছিলে। দরবিগলিত অশ্রুর ধারা তোমার অধরপল্লবকে আপ্লুত করেছিল। হায়, মোহবশতঃ সেদিন আমি সেদিকে তাকাইনি। উপেক্ষা করেছিলাম। আবার তেমনি-ভাবে তোমার কুঞ্চিত রোমশোভিত নয়নপত্রে অশ্রুবিন্দু উদ্‌গত হয়েছে। সেদিন যা করিনি, আজ সর্বাগ্রে তা করে তোমার নয়নজল মুছিয়ে দিয়ে

আমার হৃদয়ের অনুতাপানল নির্বাপিত করি। পরে সমস্তই খুলে বলব। (অশ্রু মুছিয়ে দিলেন)

শকুন্তলা। (নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখে) আর্যপুত্র, এই কি সেই অঙ্গুরীয় ?

রাজা। এই অঙ্গুরীপ্রাপ্তির পর হতেই আমার সব মনে পড়ে যায়।

শকুন্তলা। কি ভয়ানক বিপদই না এই অঙ্গুরী ঘটিয়েছিল। তোমার প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মাবার সময় একে আর পেলাম না।

রাজা। তবে আর কেন ? লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। অর্থাৎ লতারূপিণী শকুন্তলা আজ ঋতুরাজ বসন্তরূপী দুষ্মন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় শকুন্তলার করকিশলয়ে অঙ্গুরীরূপী পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক।

শকুন্তলা। এ অঙ্গুরীকে আর আমি বিশ্বাস করি না। তুমিই ধারণ করো।

মাতলির প্রবেশ

মাতলি। কি আনন্দ ! সহধর্মচারিণীর সঙ্গে মিলনে ও পুত্রমুখ সন্দর্শনে আজ আপনার জয়জয়কার।

র‍্যজা। সত্যই তাই। আমার আশালতা কি সুস্বাদু ফলেই না পরিণত হয়েছে। মাতলি, দেবরাজ ইন্দ্র কি এ ব্যাপারে জানতে পেরেছেন ?

মাতলি। সর্বজ্ঞদের কিছু অবিদিত থাকে ? চলুন রাজা, ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শনদান করবেন।

রাজা। শকুন্তলা, পুত্রকে কোলে নাও। তোমাকে সঙ্গে করে ভগবানকে দেখতে যাব।

শকুন্তলা। তোমার সঙ্গে গুরুজনের কাছে যেতে লজ্জা করছে।

রাজা। প্রিয়ে, সুখের সময় এ সব করা দরকার। চল, চল। (সকলের প্রস্থান)

মারীচ। (রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণী, এঁকে জান ? ইনি পৃথিবীর শাসনকর্তা, নাম দুষ্মন্ত। তোমার পুত্র ইন্দ্রের যত বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ

বাধে, ইনি সর্বাগ্রে ছুটে সেই যুদ্ধে গিয়ে তোমার পুত্রকে বিজয়ী করে দেন। এঁর ধনুকের মাহাত্ম্যে ইন্দ্রের বজ্রকে আর কিছুই করতে হয় না। সেই তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত ভীষণ বজ্র কেবল ইন্দ্রের শোভাই জন্মায়, অন্য কোন কাজে লাগে না।

অদিতি। কি গুরুগম্ভীর আকৃতি! এর দ্বারা এঁর কি অসীম ক্ষমতা তা কতকটা অনুমান করা যায়।

মাতলি। রাজা, ঐ দেখুন, স্বর্গবাসী দেবগণের জনকজননী অপত্যস্নেহবর্ষী নয়নে আপনার দিকে চেয়ে আছেন।

রাজা। মাতলি, এই কি সেই মিথুন? সৃষ্টির আদিভূত পুরুষ এবং প্রকৃতি? মুনিগণ এই মিথুনকেই না ধাতু, অর্যমা, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান পুষা, পর্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপাদক বলে কীর্তন করে থাকেন? স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই ত্রিভুবনের শাসনকর্তা দেবরাজ ইন্দ্র এঁদেরই সন্তান। সেই পরম পুরুষ জন্মমৃত্যুরহিত বিষ্ণু স্বয়ং বামনরূপে যে মিথুনের আশ্রয়ে ভুবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ব্রহ্মার পৌত্র পৌত্রীরূপী এই সেই পুরুষ প্রকৃতি। এই সেই প্রজাপতি দক্ষ ও মারীচি হতে উৎপন্ন জগতের আদি জনক জননী। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মারীচির পুত্র এই কশ্যপ।

মাতলি। ঠিকই বলেছেন।

রাজা। (নিকটে গিয়ে) বাসবের আজ্ঞাবহ দুষ্মন্ত আপনাদের উভয়কে প্রণাম করছে।

মারীচ। বৎস, দীর্ঘজীবী হও এবং পৃথিবী পালন করো।

অদিতি। বাছা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও।

শকুন্তলা। পুত্রের সঙ্গে শকুন্তলা আপনাদের উভয়ের চরণ বন্দনা করছে।

মারীচ। বৎসে, কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করি? তোমার স্বামী ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী, আর পুত্র তোমার ইন্দ্রতনয় জয়ন্তের মত। সুতরাং অন্য কি আর আশীর্বাদ করি? তবে আশীর্বাদ করি ইন্দ্রপত্নী

শচীর মত তোমার সীঁথির সিন্দুর চিরদিন বজায় থাকুক।

অদিতি। জাদু আমার, পতির মনের মতন হও আর তোমার পুত্র পিতামাতার বংশ উজ্জ্বল করুক। বস তোমরা। (সকলের উপবেশন)

মারীচ। আজ কি আনন্দের দিন। (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এই সাধ্বী শকুন্তলা, এই বিশুদ্ধজন্মা সন্তান সর্বদমন এবং রাজা স্বয়ং —তোমাদের এই তিনজনের মিলন আজ শ্রদ্ধা, চিত্ত ও বিধির একত্র মিলনের মত বড়ই স্পৃহনীয় হয়েছে। তাই বলছি আজ বড়ই আনন্দের দিন।

রাজা। ভগবান, দেবদর্শনের পর অভিলাষ পূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু আজ পূর্বেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হলো। পরে আপনার দর্শনলাভ হলো। সুতরাং আপনার এই অনুগ্রহ সত্যই এক অপূর্ব বস্তু। সাধারণতঃ ফুলের পর ফল দেখা যায়, মেঘোদয়ের পর জল। একেই বলে কারণকার্যপারম্পর্য। কিন্তু আপনার দর্শনদানরূপ ফুল ফোটার আগেই শকুন্তলালাভ ফল সিদ্ধ হলো।

মাতলি। বিধাতারা যখন প্রসন্ন হন তখন এমনিই হয়ে থাকে।

রাজা। ভগবান, আপনার দাসী শকুন্তলাকে আমি গান্ধর্ববিধি অনুসারে বিবাহ করি। কিছুকাল পরে এর আত্মীয়েরা যখন একে নিয়ে আসেন তখন বিস্মৃতিমোহের জন্য একে প্রত্যাখ্যান করি। সেজন্য আপনার গোত্রসম্ভূত কণ্বের নিকটে আমি বড়ই অপরাধী আছি। শেষে আমার অঙ্গুরীদর্শনে আমার স্মৃতি ফিরে আসে এবং তখন মনে পড়ে আমি সত্যই শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলাম। দেব, এ সবই এক বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। হস্তীকে সামনে দেখে চিনতে না পেরে শেষে তার পদচিহ্ন দেখে তাকে যেন চিনতে পারা। একি অদ্ভুত এক বিপর্যয়ভাব ঘটে আমার মনে।

মারীচ। বৎস, এতে তোমার নিজের কোন দোষ নেই। তখন এক বিষম মোহ জন্মেছিল তোমার মনে। খুলে বলছি সব শোন।

রাজা। বলুন, শুনছি।

মারীচ। যখনই মেনকা অপ্সরাস্তীর্থের সোপান হতে রোরুদ্যমানা

শকুন্তলাকে নিয়ে অদিতির নিকটে উপস্থিত হলো তখনই ধ্যানযোগে আমি জানতে পারলাম, দুর্বাসার অভিশাপবশেই তুমি তোমার দুঃখিনী ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছ। তা না হলে এমন হত না। সে অভিশাপ অঙ্গুরীদর্শন মাত্রেই কেটে গেছে।

রাজা (উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) যা হোক, একটা বিষম বিপদ হতে পরিত্রাণ পেলাম।

শকুন্তলা। (মনে মনে) আহা, আর্যপুত্র আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেননি। একথা ভাবতেও আমার কত সুখ। কিন্তু কখন আমি অভিশপ্ত হলাম তা কিছুই মনে পড়ছে না। অথবা হয়ত ঠিকই শাপগ্রস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনায় এমনই চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল যে কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারিনি। এইজন্যই বোধ হয় বিদায়কালে সখীরা বলে দিয়েছিল, এই আংটিটা তোর স্বামীকে দেখাস।

মারীচ। বৎসে, এতক্ষণে সমস্তই বুঝতে পারলে। অতএব তোমার পতির প্রতি আর রাগ অভিমান করো না। দেখ মা, অভিশাপবশতঃই তোমার স্বামীর স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়াতে তিনি অত কঠোর হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তোমাকে। এখন সে মোহ কেটে যাওয়ায় তোমার স্বামীর উপর তোমার পূর্ণ প্রভুত্ব। দর্পণে মালিন্য থাকলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, দর্পণ মালিন্যমুক্ত হলেই তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। সুতরাং দুষ্মন্তের হৃদয়দর্পণ এখন মালিন্যমুক্ত হওয়ায় তোমার প্রতিবিম্ব বিকাশে তা এখন পরিপূর্ণ।

রাজা। ভগবান, ঠিকই বলেছেন।

মারীচ। বৎস দুষ্মন্ত, এই শকুন্তলা-তনয়ের জাতকর্মাদি আমাদের দ্বারা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন তুমি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ ত ?

রাজা। দেব, আমি মনে করি, এই শিশুই আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মারীচ। তবে শোন, একদিন অপ্রতিহতগতি রথের দ্বারা দুস্তর জলধি পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে তোমার এই পুত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয়

করবে। এই বনের সিংহাদি সব জন্তুকে ও দমন করত বলে ওর নাম সর্বদমন দিয়েছিলাম। পরে এই বিশাল পৃথিবীর ভরণপোষণ করবে বলে এর নাম হবে ভরত।

রাজা। ভগবান, আপনি যে বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করেছেন তার পক্ষে এ সবই সম্ভব।

অদিতি। ভগবান, কন্যার এই মনোরম চরিতার্থতার সংবাদ কণ্ব যাতে সব জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। শকুন্তলার দয়াময়ী জননী মেনকা আমাদের পরিচর্যার জন্য এখানেই উপস্থিত আছে, অনুমতি হলে সেই গিয়ে বলতে পারে।

শকুন্তলা। (মনে মনে) ভগবতী আমার প্রাণের কথাটাই বলেছেন।

মারীচ। তপোবনে তিনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছেন।

রাজা। সেইজন্যই বুঝি মহর্ষি কণ্ব আমার উপর তত ক্রুদ্ধ হননি।

মারীচ। তাহলেও এই সুখবরটা তাঁকে আমাদের দেওয়া উচিত। কে আছ এখানে?

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। ভগবান, আমি আছি এখানে।

মারীচ। গালব, এখনি তুমি আকাশপথে মহর্ষি কণ্বের কাছে গিয়ে এই সুখবরটা বল যে দুর্বাসার শাপমোচন হওয়ায় দুষ্মন্তের সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত মনে পড়েছে এবং তিনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা ভগবান।

মারীচ। বৎস দুষ্মন্ত, তুমিও পুত্র ও পত্নীকে নিয়ে তোমার সখা ইন্দ্রের রথে করে তোমার রাজধানীতে প্রস্থান করো।

রাজা। ভগবানের যেমন আদেশ।

মারীচ। অনন্ত তেজসম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র যেন তোমার প্রজাপুঞ্জকে যথাকালে প্রচুর বর্ষণের দ্বারা শস্যশালী করেন। অনাবৃষ্টি বা অতি-বৃষ্টিতে যেন প্রজাকুলের কোন ক্ষতি না হয়। আর তুমিও বৎস,

নিরন্তর যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গবাসীদের পরিতৃপ্ত করো। তোমরা উভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের ঐ প্রকার উপকারের দ্বারা গর্বজনক কার্যের অনুষ্ঠান করে শত সতস্র যুগ আপন আপন রাজ্য পালন করতে থাক। তুমি স্বর্গের উপকার করো এবং ইন্দ্র মর্ত্যের উপকারে আত্মনিয়োগ করুক।

রাজা। ভগবান, আমি যথাসাধ্য মঙ্গলসাধনে যত্নবান হব।

মারীচ। রাজন, আর কি প্রিয়পদার্থ উপহার দেব বল।

রাজা। এর পরেও আর কি আমার প্রিয় পদার্থ থাকতে পারে? তবে আপনি শক্তিধর, আপনি প্রসন্ন হয়ে যদি অন্য কোন প্রিয় কার্য-সাধনে ইচ্ছা করেন তাহলে সেই কার্যভার আমাকে যেন অর্পণ করেন।

(ভরতবাক্য)

'রাজা প্রজাবৃন্দের মঙ্গল-অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হোন।' বেদপ্রসিদ্ধ সরস্বতী সর্বত্র পূজিত হোন। আর শক্তিসম্পন্ন আত্মভূ নীললোহিত শঙ্কর আমার ভবযন্ত্রণা দূর করুন। (সকলের প্রস্থান)

বিক্রমোর্বশী

প্রথম অঙ্ক

চিৎস্বরূপ যে শিব স্বর্গমর্ত্য ব্যাপ্ত করে বিরাজমান, যিনি অদ্বিতীয় পুরুষ বলে তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা বেদবেদান্তাদিতে উক্ত হয়ে থাকেন, ঈশ্বর বলতে যাঁকে একমাত্র বোঝায়, প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু সংরোধ করে মুক্তিকাম সাধকগণ হৃদয়ে যাঁকে অন্বেষণ করেন, একমাত্র অচলা ভক্তি দ্বারা লভ্য সেই নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত নিশ্চল ভগবান স্থাণু মহাদেব আপনাদের মঙ্গল করুন।

নান্দীশেষে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। (সাজঘরের দিকে চেয়ে) মারিষ,

এইদিকে এস।

পারিপার্শ্বিক। (প্রবেশ করে) ভাব, এই ত আমি।

সূত্রধার। মারিষ, এই সভা পূর্বতন কবিদের অনেক রসময় রচনা দর্শন করেছেন। আমি আজ কালিদাসের দ্বারা রচিত একখানি নূতন ত্রোটক-লক্ষণাক্রান্ত নাটকের অভিনয়দ্বারা এই সভাকে পরিতুষ্ট বা সেবা করতে চাই। অতএব অভিনেতাদের গিয়ে বল তারা যেন নিজের অভিনেয় পাঠে অবহিত থাকে।

পারিপার্শ্বিক। যে আজ্ঞা (প্রস্থান)

সূত্রধার। সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে এখন একটা কথা বলি। (প্রণাম করে) প্রণয়ীর উপর কৃপাবশতঃই হোক অথবা উত্তম অভিনেয় বস্তু এবং তার থেকেও উত্তম কবির প্রতি সম্মানবোধের খাতিরেই হোক, হে সমবেত ভদ্রগণ, আপনারা অভিনিবেশসহকারে কালিদাসের এই নাটক দর্শন করুন।

(নেপথ্যে)। আর্য, যদি কেউ দেবতাদের পক্ষপাতী বা ভক্ত থাকেন, আকাশপথে গমনাগমনে যদি তাঁর সামর্থ্য থাকে তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা করুন।

সূত্রধার। (কান দিয়ে শুনে) অহো, আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই বাণবিদ্ধ উৎক্রোশী (কাঠঠোকরা) পক্ষিনীর আর্তস্বরের মত এ স্বর আকাশে শোনা যাচ্ছে কে ব্যপার কি? (চিন্তা করে) হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

অর্জুনের সখা নারায়ণের ঊরুদেশ হতে উৎপন্ন উর্বশী নাম্নী সুরকামিনী কৈলাসপতি কুবেরের সামনে নৃত্যাদি করে ফিরছিল। এমন সময় দেববিদ্বেষী দৈত্যগণ দ্বারা আকাশে অর্ধপথে উর্বশী আক্রান্ত ও বন্দিনী হয়। তাই তার সহচরী অপর অপ্সরারা ক্রন্দন করছে।

অপ্সরাদের প্রবেশ

অপ্সরাগণ। যদি কেউ দেবতাদের পক্ষাবলম্বনকারী থাকেন এবং তাঁর আকাশপথে গমনাগমনের সামর্থ্য থাকে তাহলে আমাদের রক্ষা করুন।

রাজা ও তাঁর দূতের প্রবেশ

রাজা। কাঁদবেন না। আমি পুরূরবা সূর্যের পূজা করে ফিরছি। আমার কাছে এসে আপনারা বলুন, কোথা হতে আপনাদের পরিত্রাণ করতে হবে।

রম্ভা। অত্যাচারী অসুরদের হাত হতে।

রাজা। অত্যাচারী অসুরেরা কি অপরাধ করেছে আপনাদের কাছে?

রম্ভা। তবে শুনুন মহারাজ, কোন এক তপস্বীর কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ তাঁর সম্মোহন অস্ত্র উর্বশীর দ্বারা সেই তপস্বীর তপস্যা বিনষ্ট করেন। রূপগর্বিতা লক্ষ্মী ও গৌরীর যিনি দর্পহারিণী, স্বর্গের যিনি অলঙ্কাররূপিণী, আমাদের সেই প্রিয়সখী উর্বশী কুবেরের বাড়ি হতে ফেরার পথে এক দানবের দ্বারা ধৃত ও বন্দিনী হয়। চিত্রলেখাও তাঁর সঙ্গে ছিল। সেও ধরা পড়েছে।

রাজা। সেই অপহরণকারী কোন দিকে গেল বলতে পারেন?

অপ্সরা। ঈশান কোণের দিকে।

রাজা। তবে আর বিষণ্ণ হবেন না। আপনাদের সখীকে ফিরিয়ে আনতে যত্নবান হব।

অপ্সরা। চন্দ্রবংশপ্রদীপের উপযুক্ত কাজই বটে।

রাজা। আপনারা কোথায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন?

অপ্সরা। এই হেমকূট পর্বতের চূড়ায়।

রাজা। সারথি, তাড়াতাড়ি ঈশান দিকে অশ্বচালনা করো।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ! (তাড়াতাড়ি অশ্বচালনা) বাঃ, যেভাবে রথ ছুটে চলেছে, তাতে মনে হয় গরুড়ও যদি আগে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁকেও ধরতে পারব। আমার সখা ইন্দ্রের অপকারী দানবকে ত ধরলাম বলে। যেহেতু আমার রথের আগে আগে মেঘরাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলির মত হয়েছে এবং চাকাগুলি এত জোরে ঘুরছে যে চাকার শলাকাগুলির মধ্যে আর একসারি চক্রশলাকার মত দেখা যাচ্ছে। অশ্বগুলির ঘাড়ের কেশরগুলি তারের মত সোজা ও লম্বা হয়ে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল হয়ে রয়েছে এবং নিশানগুলির ধারে ও

মধ্যে বাতাস লাগায় তারাও যেন স্থির হয়ে আছে, একটু কাঁপবারও অবকাশ পাচ্ছে না। (রাজা ও সারথির রথযোগে প্রস্থান)

অপ্সরা সহজন্যা। রাজা ত চলে গেলেন। চল, আমরাও যথাস্থানে যাই।

মেনকা। হ্যাঁ সখী, তাই যাওয়া যাক। (সকলের হেমকূট-শিখরে অবতরণ)

রম্ভা। আচ্ছা ভাই, সেই রাজর্ষি আমাদের হৃদয়ের শল্য উৎপাটিত করতে পারবেন ত ?

মেনকা। সখী, তোর কোন ভয় নেই, ঠিক পারবেন।

রম্ভা। তা অবশ্য বটে, কিন্তু দানবগুলো বড়ই ভয়ঙ্কর। সহজে জয় করা যায় না।

মেনকা। তুই কি জানিস না যে, যখন দেবগণের দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তখন দেবরাজ কত আদরযত্ন করে মর্ত্যলোক হতে নিয়ে আসেন এই রাজাকে। দেবগণের পক্ষে বিজয়ের জন্য এঁকেই সেনাপতির পদে বরণ করেন।

রম্ভা। বেশ, সর্বপ্রকারে ইনি জয়লাভ করুন, এই আমার বাসনা।

মেনকা। (ক্ষণকাল পরে) সখি, আশ্বস্ত হ। ঐ যে রথখানা দেখা যাচ্ছে। রথের পতাকায় হরিণ আঁকা এবং বায়ুবশে পতাকাটি পতপত্‌ করে উড়ছে। ঐ সেই চন্দ্রপ্রদত্ত রাজার সোমদত্ত নামক রথ। তুই ঠিক জানিস, এই রাজর্ষি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসবার পাত্র নন। নিশ্চয় আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে, এই আমার ধ্রুব ধারণা।

(শুভলক্ষণ হিসাবে সকলেরই বাম নেত্র বা বাম অঙ্গ কেঁপে উঠল। রাজার আগমনের জন্য নিশানের দিকে সকলে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।)

রথস্থ রাজা, সারথি ও ভয়ে মুদ্রিতনয়না উর্বশীর প্রবেশ

উর্বশী চিত্রলেখার দক্ষিণ হস্তে ভর দিয়ে ছিলেন।

চিত্রলেখা। সখি, আশ্বস্ত হ।

রাজা। সুন্দরী, আশ্বস্ত হও, অয়ি ভয়শীলে, অসুরজনিত ভয় তিরোহিত হয়েছে। বজ্রধর পুরন্দরের সামর্থ্যই ত্রিভুবনকে রক্ষা করতে

থাকে, আজও করল। সুতরাং প্রভাতে পদ্মিনী যেমন তার পদ্মটিকে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি তোমার এই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন উন্মীলন করো। ভয়ের কারণ যখন বিলুপ্ত তখন কি আর তোমার এমন মনোহর নয়নকমল মুদিত থাকা ভাল দেখায়? চোখ মেলে তাকাও একবার।

চিত্রলেখা। হায় হায়, শুধু বুকটা যেন অল্প অল্প কাঁপছে এবং তাতেই মনে হচ্ছে এখনো বুঝি প্রাণটা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এখনো ত সাড়া দিল না।

রাজা। তোমাদের সখী বড়ই ভয় পেয়েছেন। এই দেখ, পীন-পয়োধরযুগলের মধ্যস্থিত মন্দারমালা কেমন মাঝে মাঝে কাঁপছে। এর থেকেই অনুমান হয়, এঁর প্রাণ খুব জোরেই স্পন্দিত হচ্ছে।

চিত্রলেখা। ও উর্বশী, প্রকৃতিস্থ হ। তুই দেখছি অপ্সরাদের মুখ হাসালি। কে একটু ধরেছিল, আর তাতেই অমন কাতর হয়ে পড়লি।

রাজা। এঁর ভয়জনিত কাঁপুনি দেখছি কিছুতেই যেন এঁর ফুলের মত কোমল হৃদয়টিকে ছাড়তে চাইছে না। আহা, এঁর কুচদ্বয়ের মধ্যস্থিত আঁচলের ধারটার কম্পনেই বেশ বুঝতে পারছি। (উর্বশীর সংজ্ঞালাভ)

রাজা। (সানন্দে) চিত্রলেখা, তোমাদের জয়জয়কার। তোমাদের প্রিয়সখীর মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে। ঐ দেখ, চন্দ্রের আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন রাত্রিকে ছেড়ে যায়, নিশাকালের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ধূমরাশি যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি এই সর্বাঙ্গসুন্দরীর মোহজাল ছিন্ন হয়েছে, এতক্ষণে বুঝি তটপতনপঙ্কিলা জাহ্নবী আবার নির্মলকান্তি ধারণ করেছে।

চিত্রলেখা। সখী উর্বশী, সুস্থ হ। বিপন্নের প্রতি যিনি সতত সদয়, তাঁর দ্বারা সেই দেববৈরী দানবগণ প্রতিহত হয়েছে।

উর্বশী। (চোখ মেলে) চিরদিন যিনি কৃপা করে থাকেন সেই দেবরাজই কি বীর্যবলে আমাকে উদ্ধার করলেন অনুগ্রহ করে?

চিত্রলেখা। না, মহেন্দ্র নন। মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজর্ষি

পুরুরবা তোমায় উদ্ধার করেছেন।

উর্বশী। (রাজাকে দেখে মনে মনে) দানবরা বড় উপকারই করেছে।

রাজা। (উর্বশীকে দেখে মনে মনে) নারায়ণ ঋষিকে বিমোহিত করে অপ্সরারা যখন বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, তখন তিনি তাঁর উরু থেকে এঁকে উৎপন্ন করলে অপ্সরারা এঁর রূপ দেখে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। এটা যুক্তিযুক্তই হয়েছিল বলতে হবে। অথবা আমার মনে হয় তপস্বীসৃষ্টি কখনো এত রূপের আধার হতে পারে না। কেন না, এই উর্বশীর সমুৎপাদনে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি নিজেই কি যেখানে যেটি মানায় সেইরকম সৌন্দর্য এঁকে দিয়েছিলেন? অথবা আদিরসের একমাত্র পারাবার মদন কি স্বহস্তে এঁকে দান করেছিলেন? অথবা জগৎপ্রিয় মধুমাস কি তার সমস্ত সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে এঁকে? তা না হলে সংসারবিমুখ, কঠোর বেদপাঠে ব্যস্ত অতি পুরাতন নারায়ণ ঋষি যে এমন অনিন্দ্যকান্তি নির্মাণ করেছিলেন তা ত মনে হয় না।

উর্বশী। ও চিত্রলেখা, সখীরা সকলে কোথায়?

চিত্রলেখা। সখী, যিনি অভয় দিয়েছেন সেই মহারাজ জানেন তারা কোথায়।

রাজা। (উর্বশীকে দেখে) তোমার সখীরা বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। এস, চেয়ে দেখ সুন্দরী, আর তা হবে নাই বা কেন? তুমি হঠাৎ যদি একবার কারো চোখে পড় তবে তার চোখ সার্থক হয় এবং আর তোমাকে ভুলতে পারে না। আর যে সব সখী তোমার চিরবন্ধু, চিরপ্রিয় তারা যে আকুল হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

উর্বশী। (মনে মনে) আহা, তোমার কথাগুলি কি মধুমাখা। চাঁদ হতে অমৃত নিঃসৃত হয়, তাই ঐ মুখচন্দ্র হতে এমন মধুমাখা কথা ছাড়া আর কি সম্ভূত হবে? (প্রকাশ্যে) এইজন্যই তাদের দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়।

রাজা। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) অয়ি শোভনাঙ্গী, ঐ দেখ ঐ হেমকূট পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে তোমার সখীরা উৎসুক নেত্রে তোমার মুখ

দেখছে, যেন রাহুমুক্ত চাঁদের দিকে প্রজাগণ তাকিয়ে আছে। (উর্বশী দেখল)

চিত্রলেখা। কি দেখছিস ?

উর্বশী। আমার ব্যথায় যে ব্যথিত তাকে নয়নের দ্বারা পান করছি।

চিত্রলেখা। (সহাস্যে) কে তোর নয়নের দ্বারা প্রীত হচ্ছে ? (সখীরা না রাজা ?)

উর্বশী। যে প্রণয়ী সে।

রম্ভা। (আনন্দে দেখে) ও সখী, চিত্রলেখার সঙ্গে প্রিয়সখী উর্বশীকে নিয়ে রাজা আসছেন। দেখতে কেমন হয়েছে জানিস ? যেমন বিশাখা তারাদ্বয়ের সঙ্গে ভগবান চন্দ্র উপস্থিত হলেন।

মেনকা। (দেখে) আমাদের দুটিই অতিপ্রিয়—একটি আমাদের প্রিয়সখী উর্বশীর উদ্ধার আর একটি রাজর্ষি পুরুরবার অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন। এ দুটিই আমাদের অতিপ্রিয়।

সহজন্যা। সখী, ঠিক বলেছিস, দানবরা সত্যই অতি ভয়ঙ্কর, অপরাজেয়।

রাজা। সারথি, এই সেই শৈলশিখর। রথ নামাও।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ। (রথের অবতরণ, রথ নামার সময় পাহাড়ে ধাক্কা লাগায় উর্বশী সভয়ে রাজাকে জড়িয়ে ধরল। দানবদের ভয়ে ভীত উর্বশী সামান্যতেই চমকে উঠল)

রাজা। (মনে মনে) এই ধাক্কা খাওয়াটা সার্থক হলো। কারণ রথসংক্ষোভে আয়তলোচনা উর্বশীর রোমাঞ্চিত অঙ্গের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন মদনতরুর অংকুর উদ্গত হয়েছে।

উর্বশী। ও সখী, একটু ওদিকে সর।

চিত্রলেখা। পারব না।

রম্ভা। চল, আমরা সকলে গিয়ে উপকারী রাজর্ষিকে অভিনন্দিত করি। (সকলের রাজার নিকট গমন)

রাজা। সারথি, রথ স্থির করো। ঋতুকালীন শোভা যেমন ফুল্লতারারাজির সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি এই উৎকণ্ঠিত সুনয়না উর্বশী

যতক্ষণ এঁর উৎকণ্ঠিত সখীদের সঙ্গে মিলিত না হচ্ছেন, ততক্ষণ সাবধানে রথ স্হির করে রাখ। (সারথি তাই করল)

অপ্সরারা। কি আনন্দ! মহারাজ এই দানবজয়ের দ্বারা কি গৌরবযুক্তই না হলেন।

রাজা। আপনারাও আপনাদের সখীসমাগমের দ্বারা বিজয়বতী হলেন।

উর্বশী। (চিত্রলেখার হাতে ভর দিয়ে রথ হতে নেমে) তোরা আমায় গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর, কারণ আশা ছিল না আবার তোদের সঙ্গে মিলতে পারব। (সখীরা তাই করল)

মেনকা। (রাজাকে আশীর্বাদ) শত শত কাল ধরে মহারাজ পৃথিবী পালন করুন।

সারথি। মহারাজ, পূর্বদিকে বড় রকমের একটা রথের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উজ্জ্বল স্বর্গের অঙ্গদ পরে কে যেন আকাশ হতে পর্বতশীর্ষে অবতরণ করছে। দেখে মনে হয়, যেন বিদ্যৎবিলসিত এক মেঘ নেমে আসছে পর্বতশিখরে।

অপ্সরারা। (দেখে) তাই ত, এ যে চিত্ররথ।

চিত্ররথের প্রবেশ

চিত্ররথ। (রাজাকে দেখে সসম্মানে) কি আনন্দ! মহেন্দ্রের এই উপকারের দ্বারা আপনার এই পরাক্রম যেন শতগুণ বর্ধিতাকারে অনুমিত হচ্ছে। মহারাজ, আপনার জয়জয়কার।

রাজা। তাই ত। এ যে গন্ধর্বরাজ (রথ হতে নেমে) আসুন, আসুন প্রিয়সুহৃদ। (পরস্পরের হাত ধরাধরি)

চিত্ররথ। বন্ধু, কেশি দৈত্যের দ্বারা উর্বশী অপহৃতা হয়েছে, এই কথা নারদের মুখে শুনেই তার উদ্ধারের জন্য দেবরাজ গন্ধর্বসেনা পাঠিয়েছিলেন। আমরা পথের মাঝামাঝি এসেই শুনি চারদিকে আপনার বিজয়গৌরব গীত হচ্ছে। তাই আপনাকে দেখার জন্য এখানে এসেছি। আমার ইচ্ছা, দানবকবলমুক্ত এই উর্বশীকে নিয়ে আপনি একবার দেবরাজকে দর্শনদান করুন। আপনি তাঁর একটা মহা উপকার

করেছেন। ভেবে দেখুন, বহু পূর্বে স্বয়ং নারায়ণ এঁকে উৎপন্ন করে দেবরাজকে অর্পণ করেছিলেন, আর আজ আপনি আবার দানবের হাত হতে এঁকে উদ্ধার করে দেবরাজের হাতে পুনরায় অর্পণ করলেন। এ কি কম কথা ?

রাজা। সখা, না না, একথা বলবেন না। দেবরাজের পক্ষ হতে যারা শত্রুদের পরাজিত করতে সমর্থ হয় তাদের সে সামর্থ্য সেই বজ্রধারী দেবরাজেরই বীর্যের ফল। আপনি ত দেখেছেন, সিংহের গর্জন যখন পর্বতগুহায় গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয় তখন সেই প্রতিধ্বনিতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভয়ে মাতঙ্গরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়।

চিত্ররথ। ঠিকই বলেছেন। অহঙ্কারশূন্যতাই হলো বিক্রমের প্রধান অলঙ্কার।

রাজা। সখা, দেবরাজকে দর্শন করবার এ অবসর নয়। অন্য সময় করব। আপনিই উর্বশীকে নিয়ে প্রভুর নিকট গমন করলে ভাল হয়।

চিত্ররথ। আপনার যেমন অভিপ্রায়। তাহলে তোমরা সকলে এইদিকে এস। (সকলের প্রস্থান)

উর্বশী। (জনান্তিকে) ও চিত্রলেখা, আমি নিজে আমার পরম উপকারী এই রাজর্ষিকে বলতে পারছি না, তুই আমার হয়ে তাঁকে দুকথা বলবি।

চিত্রলেখা। (রাজার খুব কাছে এসে) মহারাজ, উর্বশী বলছে, মহারাজ যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি প্রিয়সখীর মত মহারাজের এই কীর্তিকাহিনীকে স্বর্গলোকে প্রচার করতে চাই।

রাজা। যাও তোমরা, আবার যেন দেখা হয়। (সকলের আকাশ-পথে গমন)

উর্বশী। (আকাশে ওঠার সময় বাধা পেয়ে) লতার ডালে আমার গলার একাবলী বৈজয়ন্তী হার যে জড়িয়ে গেল। (ঘাড় বাঁকিয়ে রাজাকে দেখতে দেখতে) সখী চিত্রলেখা, তুই ছাড়িয়ে দে না।

চিত্রলেখা। (দেখে সহাস্যে) তাই ত, বড় জড়িয়েছে ? ছাড়ানো শক্ত।

উর্বশী। ঠাট্টা ছাড়, কোনমতে ছাড়িয়ে দে।

চিত্রলেখা। যা দেখছি, তাতে আর ছাড়ানো যাবে কি না সন্দেহ আছে? তবু একবার যত্ন করে দেখব।

উর্বশী। (মৃদু হেসে) প্রিয়সখী, এখন যা বললি, ছাড়াতে যত্ন করবি—একথা যেন মনে রাখিস।

রাজা। (মনে মনে) হে লতা, যাবার সময় তুমি উর্বশীর গমনে বাধা দিয়ে বড়ই প্রিয় কার্য করেছ। কেন না, উর্বশী যখন ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে আমাকে দেখছিল, তখন তাকে আমি আর একবার দেখে নিয়েছি।

(চিত্রলেখা লতা হতে হার ছাড়াতে লাগল আর সেই অবসরে উর্বশী রাজাকে দেখতে দেখতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল)

সারথি। দীর্ঘজীবিন, ঐ দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অপরাধী দৈত্যদের বিনাশ করে লবণ সাগরে নিক্ষেপ করে আপনার বায়বীয় অস্ত্র বিবরমধ্যে কাল অজগর সর্পের মত আপনার তূণীর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করেছে।

রাজা। তাহলে রথ কাছে আন, আমি উঠি। (সারথি তাই করলে রাজা রথে উঠলেন)

উর্বশী। (রাজাকে দেখতে দেখতে) আবার কি কখনো এমন উপকারী মিত্রকে দেখতে পাব না? (বলতে বলতে গন্ধর্ব ও সখীদের সঙ্গে চলে গেল)

রাজা। (উর্বশীর পথের দিকে আকাশপানে মুখ উঁচু করে) উঃ, যা পাবার নয়, তাতেই মদন মানুষকে মজায় কেন? এই সুরকামিনী উর্বশী আকাশে আরোহণ করার সময় আমার মনটাকে যেন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঠিক যেন একটি রাজহংসী একটি মৃণাল ভেঙ্গে তা হতে মৃণালের সুতোগুলি কর্ষণ করে নিল। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। বাপরে বাপ! নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যেমন পায়েসের অপেক্ষায় জিহ্বাকে আর সংযত রাখতে পারে না, তেমনি এক জনাকীর্ণ স্থানে রাজার গুপ্ত কথাটি আর আমি চেপে রাখতে পারছি না। কথাটা বার করার জন্য জিহ্বা ছটফট করছে। অতএব মহারাজ যতক্ষণ এইদিকে না আসছেন আমি ততক্ষণ ঐ জনপ্রচারশূন্য দেবচ্ছন্দক প্রাসাদে গিয়ে থাকি। না হলে পেটে কথা রাখতে পারব না।

চেটীর প্রবেশ

চেটী। পাটরাণী কাশীরাজকন্যা আমাকে আদেশ করেছেন, নিপুনিকে, ভগবান সূর্যদেবের আধার হতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার দিন থেকেই মহারাজকে কেমন যেন শূন্যহৃদয় মনে হচ্ছে। তাই তুই বিদূষকের কাছে গিয়ে কার জন্য বা কি কারণে মহারাজের এই উৎকণ্ঠা তা কোন কৌশলে জানতে পারিস কি না দেখ। এখন কিকরে সেই বামুনটাকে ঠকিয়ে তার পেটের কথাগুলো বার করতে পারা যায় তা দেখতে হবে। আচ্ছা, আগে খুঁজে দেখি, কোথায় আছে সে। বাঃ এই যে ছবিতে আঁকা বাঁদরের মত এককোণে বসে কি একটা মতলব আঁটছে। ওর পেটে কি রাজার কোন কথা থাকতে পারে? শিশিরবিন্দুর মত তা আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল বলে। যাক, ওর কাছে যাই এখন। (গিয়ে) আর্য, প্রণাম।

বিদূষক। এস, এস। (মনে মনে) এই দুষ্ট মেয়েটাকে দেখে রাজার গুপ্তকথাটা বুক ফেড়ে বার হতে চাইছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা নিপুনিকে, গানের সময় গান ছেড়ে কোথায় চলেছ?

চেটী। দেবীর অনুরোধে আপনাকে দর্শন করতে।

বিদূষক। দেবী কি আদেশ করেছেন?

চেটী। দেবী বললেন, আর্য মানবকের আমার উপর আগের মত আর দয়া নেই। বৃথা আমি যে বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি তা কি তিনি দেখছেন না?

বিদূষক। নিপুনিকে, প্রিয়বয়স্য কি পাটরাণীর মনে ব্যথা পাওয়ার

মত কোন অপ্রিয় অব্যবহার করেছেন ?

চেটী। করেছেন বৈকি। যার জন্য মহারাজের এত উৎকণ্ঠা, সেই স্ত্রীলোকের নাম করে মহারাণীকে ডেকে ফেলেছেন।

বিদূষক। (মনে মনে) রাজা নিজেই গোপন কথা ব্যক্ত করে ফেললেন ? তবে আর ব্রাহ্মণ হয়ে আমি কেন জিহ্বাকে আড়ষ্ট করে রেখে কষ্ট দিই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ কি উর্বশী এই নাম করে ফেলেছেন ?

চেটী। আর্য, কে সে উর্বশী ?

বিদূষক। উর্বশী নামে এক অপ্সরা আছে। তাকে দেখা অবধি মহারাজ পাগল হয়ে শুধু তাঁকেই নয়, ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে পর্যন্ত খাবারদাবার বিষয়ে বিনাশ করে কত কষ্টই না দিচ্ছেন।

চেটী। নিপুনিকে, তুমি কাশীরাজনন্দিনীকে আমার নাম করে বলো, বয়স্যকে এই মৃগতৃষ্ণিকা হতে নিবৃত্ত করতে আমি হিমসিম খেয়ে গেলাম। আমার মনে হয়, রাজা তোমার মুখপদ্মখানি যদি একবার দেখতে পান এ সময়ে তবে ফিরলেও ফিরতে পারেন।

চেটী। বেশ, বলব। (প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে বৈতালিকের গান

মহারাজের মঙ্গল হোক। ভগবান সবিতৃদেব এবং আপনি আপনাদের উভয়েরই অধিকার এবং অধিকৃত রাজ্যরক্ষণে অধ্যবসায় সমান বলেই আমাদের ধারণা। কারণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধিপতি সূর্যদেব আকাশ-তলে ক্ষণকাল অবস্থান করেন আর আপনিও দিবসের ষষ্ঠভাগে সামান্য একটু বিশ্রাম করেন।

বিদূষক। (কান দিয়ে) এই বুঝি প্রিয়বয়স্য ধর্মাসন হতে উঠে এইদিকেই আসছেন। যাক, আমিও যাই। (প্রস্থান)

বিদূষকের সঙ্গে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় রাজার প্রবেশ

রাজা। সেই স্বর্গরাজ্যের সুন্দরী তথা উর্বশীকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন হতেই সে আমার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করেছে। কন্দর্প বাণের আঘাতে আমার হৃদয়ে যে আঘাত করেছিল সেই ছিদ্রপথেই উর্বশী

প্রবেশ করতে পেরেছে আমার অন্তরে।

বিদূষক। কাশীরাজদুহিতা বড়ই ব্যথিত হয়েছেন।

রাজা। সখা, গোপন কথাটা কোথাও বলনি ত?

বিদূষক। (মনে মনে) ঐ দাসীটা দেখছি আমাকে ঠকিয়ে কথাটা জেনে গেছে। তা না হলে বয়স্য এমনভাবে জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

রাজা। চুপ করে রইলে যে? সর্বনাশ করেছ নাকি?

বিদূষক। সখা, এমনভাবে জিহ্বাটাকে সংযত ও রুদ্ধ করে রেখেছি যে, তোমার কথারও প্রতিকথন বা প্রত্যুত্তর দিচ্ছি না।

রাজা। ঠিক করেছ। আচ্ছা, এখন কোথায় গিয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি বলত?

বিদূষক। কেন? রন্ধনশালায় যাই চল।

রাজা। সেখানে কেন?

বিদূষক। সেখানে পাঁচরকম ভোজনের জিনিসপত্র দেখলেও প্রাণের উৎকণ্ঠা কিছুটা কমবে।

রাজা। সেখানে তুমি যা চাও পেয়ে সুখী হতে পার। কিন্তু আমার যে দুর্লভ বস্তুর ক্ষুধা, তা কিসে মিটবে?

বিদূষক। আচ্ছা, উর্বশী কি তোমায় দেখেছিল?

রাজা। নিশ্চয়।

বিদূষক। তবে সে আর যায় কোথায়? ঠিক ধরা দেবে।

রাজা। প্রকৃত সৌন্দর্যের অপূর্ব পক্ষপাত উর্বশীর উপর। সৌন্দর্য যদি কোথাও থাকে ত তা একমাত্র উর্বশীর মধ্যেই আছে।

বিদূষক। তোমার এই কথাবার্তায় আমার ক্রমেই জানতে ইচ্ছা করছে আমি যেমন কুরূপের চরম সেও তেমনি সুরূপের চরম।

রাজা। আরে তুমি ছেলেমানুষ। তার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা অসাধ্য, তবে সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে, শোন।

বিদূষক। কান খাড়া করে আছি।

রাজা। সে হচ্ছে অলঙ্কারের অলঙ্কার। তার কলেবর উপমান

পদার্থের উপমান স্থানীয় অর্থাৎ চাঁদ তার মুখের মত, পদ্ম তার চোখের মত।

বিদূষক। এতক্ষণে বুঝলাম যে এইজন্যই তুমি স্বর্গ-অমৃতের লোভে দিব্যরসলোলুপ চাতকের ব্রত গ্রহণ করেছ। আচ্ছা, এখন কোথায় যাবে বলত?

রাজা। নির্জন ছাড়া বিরহপীড়িত ব্যক্তির আর কি আশ্রয় থাকতে পারে? অতএব প্রমোদবনের পথটা আমাকে দেখিয়ে দাও।

বিদূষক। (মনে মনে) কি উপায়? (প্রকাশ্যে) এই দিকে, এই দিকে ভাই। (অগ্রসর)

বিদূষক। এই ত প্রমোদবনের কাছে এসে পড়লাম। দক্ষিণসমীর তোমায় আগন্তুক মনে করে যেন লতাবিটপ আনত করে অভ্যর্থনা করছে তোমায়।

রাজা। (দেখে) বসন্ত সমীরণের দক্ষিণ এই বিশেষণটা সর্বাংশে সার্থক বটে! কেন না, এই বাসন্তী শোভাকে একদিকে কত আদরে সমীরণ লালিত করছে, অন্যদিকে আবার ঐ কুন্দলতাকে যেমন নাচাচ্ছে, সুতরাং স্নেহ ও সমদর্শিতার দ্বারা বসন্তবায়ু আমার নিকট দক্ষিণ নায়কের পরিচয় দিচ্ছে।

বিদূষক। রাজার দেখবার নৈপুণ্য কি সুন্দর, যেটি যেমন তাকে ঠিক রূপেই দেখতে পায়। উদ্যানপ্রবেশ আমার অস্থির হৃদয়ের শান্তির কারণ হবে বলে স্থির করেছিলাম। এখন দেখছি তা একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াল। খরস্রোতে ভেসে যাওয়া ব্যক্তির ঐ স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া বৃথা চেষ্টার মত আমার এই উদ্যানপ্রবেশ নিরর্থক হলো একেবারে।

বিদূষক। কেমন?

রাজা। যাকে পাব না, তাকে পাবার জন্য পাগল আমার মনটাকে মদন তাঁর পাঁচটি বাণ দিয়ে সেই প্রথম দেখা অবধি বিদ্ধ করছেন। এখন আমার হৃদয়োন্মাদক আমের গাছগুলিতে মুকুল দেখা দিয়েছে এবং তা আবার দক্ষিণা হাওয়ায় দুলছে। তার পাকা পাতাগুলি ঝরে পড়ছে।

এসব দেখে মনের একগুণ আগুন শতগুণ জ্বলে উঠল।

বিদূষক। ভাই, বিলাপ করো না। শীঘ্র মদন তোমার মনের মানুষকে মিলিয়ে দেবেন, তোমার সহায় হবেন।

রাজা। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোধার্য। (ভ্রমণ)

বিদূষক। ভাই, দেখ, দেখ, বসন্তের নবসমাগমের চিহ্নস্বরূপ উদ্যানের কি অপূর্ব শোভা হয়েছে।

রাজা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল করেই দেখছি, সুন্দরীদের নখের ডগার মত লাল টুকটুকে ডগাগুলি নিয়ে কুরুবক ফুলগুলি দুদিকে কেমন শ্যামবর্ণ হয়েছে। আবার ঐ সহকারতরুতে দেখ, কেমন নূতন মুকুল বেরিয়েছে। তাতে কি সুন্দর পরাগ বেঁধেছে এবং তার যোগে ডগাগুলি লাল হয়ে উঠেছে। আর ঐ তরুণ অশোকতরুর সুন্দর রক্তবর্ণে সজ্জিত হয়ে কেমন ফোটা ফোটা ভাব ধারণ করে চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। আজ এই বসন্তের শোভা যেন মুগ্ধতা ও যৌবন—এই উভয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিদূষক। ভাই এই দেখ, কেমন সুন্দর অতিমুক্তলতার কুঞ্জ। তার মধ্যে কত সুন্দর একখানি কালো পাথর পাতা। ভ্রমরের তাড়নায় লতা হতে পতিত ফুলভারে যেন ফুলশয্যা পাতা হয়েছে আর ঝর ঝর করে ফুল পড়ে যেন তোমায় অভ্যর্থনা করছে। এখানে দয়া করে একটু বস ভাই।

রাজা। তোমার যেমন অভিরুচি, তাই হোক। (উপবেশন)

বিদূষক। এখানে একটু বসে ঐ চোখ জুড়ানো লতাগুলির দিকে চেয়ে উর্বশীর বিরহ কতকটা দূর করো ভাই।

রাজা। (নিঃশ্বাস ছেড়ে) সখা, কিন্তু সত্য বলতে কি, উর্বশীকে দেখা অবধি চোখের এমনই দুর্দশা ঘটেছে যে উপবনের কুসুমভারানত লতা, তাতে পর্যন্ত মন বসতে চাইছে না। সুতরাং যাতে আমার আশাটা মেটে এমন একটা কিছু পথ ঠিক করো।

বিদূষক। ভাই, তার জন্য ভাবনা কি? অহল্যাকে পাবার জন্য ইন্দ্র যখন পাগল হয়েছিলেন, তখন তার সচিব হয়েছিল বজ্র, আর

উর্বশীর জন্য পাগল হয়েছ তুমি, তোমার সচিব হব আমি। কেন না, এক্ষেত্রে তোমরা দুজনেই পাগল।

রাজা। কই, একটু ভাবলে না তুমি ?

বিদূষক। (চিন্তার ভান করে) এই বসলাম ভাবতে, তুমি কিন্তু প্রলাপ বকে আমার সমাধি ভঙ্গ করো না ভাই। (হঠাৎ সুলক্ষণ পেয়ে মনে মনে) তাই ত আমি দেখছি সত্যি সত্যিই একটা মস্ত জ্যোতিষী হয়ে উঠেছি।

রাজা। সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা উর্বশী অতি দুর্লভ জেনেছি, তবুও আমার উপর কন্দর্পদেবের কি অত্যাচার। অথচ বাসনা পূর্ণ হয় এমন সময়ে মনের যে অবস্হা ঘটে, আমার মনও তেমনি হঠাৎ মিলনসুখের শান্তিসাগরে ডুবে যাচ্ছে। কি ব্যাপার ? (মদনাতুর অবস্হায় রইলেন)

আকাশযানে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ

চিত্রলেখা। সখী উর্বশী, বিনা কারণে কোথায় চললি বল ত ?

উর্বশী। (মদনাতুরভাবে সলজ্জ হৃদয়ে) হেমকূটশিখরে লতার শাখায় যখন আমার হার জড়িয়ে গিয়েছিল, তখন তোমায় ছাড়িয়ে দিতে বললে, বড় বেশী জড়িয়েছে একে ছাড়ানো যায় না। বলে তুমি ঠাট্টা করেছিলে। আর এখন জিজ্ঞাসা করছ, কোথায় শুধু শুধু যাচ্ছি।

চিত্রলেখা। সেকি, সেই রাজর্ষি পুরূরবার কাছে যাচ্ছিস নাকি ?

উর্বশী। সখী লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরই খোঁজে বেরিয়েছি।

চিত্রলেখা। তা হলেও একটু ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত। আগে সেখানে কাউকে পাঠিয়েছিলি ?

উর্বশী। হৃদয়কে।

চিত্রলেখা। আচ্ছা তা না হয় হলো। কিন্তু তোকে পাঠাল কে ?

উর্বশী। মদন আমাকে পাঠাচ্ছেন।

চিত্রলেখা। এর উপর আর আমার কোন কথা নেই।

উর্বশী। সখী, এখন সেই পথটা দেখিয়ে দে, যে পথে গেলে কোন বাধাবিপত্তি ঘটবে না। কেউ দেখতে পাবে না।

চিত্রলেখা। সখী, নিশ্চিন্ত হ। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের

দুজনকে যে অপরাজিতা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন, সেই বিদ্যাবলে একথার শিখা বাঁধলে পরে কোন দৈত্যদানব আর আমাদের দেখতে পাবে না।

উর্বশী। কিভাবে সে বিদ্যা প্রয়োগ করতে হয় তা তোমার জানা আছে ?

চিত্রলেখা। সখী, সব আমার মনে গাঁথা আছে। (উভয়ের ভ্রমণ)

চিত্রলেখা। সখী, দেখ দেখ, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে ঐ প্রতিষ্ঠান-নগর-জগৎপাবন স্বচ্ছ সলিলরূপ দর্পণে যেন নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করছে। ঐ তার শিরোভূষণরূপ রাজপ্রাসাদে রাজর্ষি বাস করেন। এই আমরা পেঁছিলাম বলে।

উর্বশী। (স্পৃহাপূর্ণ নয়নে) এ যে মর্ত্যলোকে আগত স্বর্গ। সখী, সেই বিপন্নের রক্ষাকর্তা মহানুভব রাজা কোথায় ?

চিত্রলেখা। স্বর্গের নন্দনবনের মত এই প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নেমে দেখছি কোথায় সেই রাজর্ষি। (উভয়ের অবতরণ এবং রাজাকে দেখে চিত্রলেখা আনন্দিত হয়ে) সখী, দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষের পর নবোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষা করেন, এই রাজাও তেমনি তোমাকে পাবার জন্য কত আকুল হয়ে রয়েছেন।

উর্বশী। (রাজাকে দেখে) সখী, প্রথম যখন রাজাকে দেখেছিলাম, তার চেয়ে এখন দেখছি, মহারাজের চেহারা আরও মধুর হয়েছে, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

চিত্রলেখা। ঠিক বলেছিস, এখন চল, কাছে যাই।

উর্বশী। না, হঠাৎ কাছে যাব না। তিরস্করণী বিদ্যাবলে অন্যের অদৃশ্য থেকে আগে তাঁর কাছে গিয়ে শুনি নিকটবর্তী বয়স্যের সঙ্গে নিভৃতে তাঁর কি কথাবার্তা হচ্ছে, তারপর দেখা দেন।

চিত্রলেখা। যেমন ইচ্ছা করো। (উভয়ে তাই করল)

বিদূষক। সখা, দুর্লভ জনের সঙ্গে মিলনের একটি উপায় এতক্ষণে পেয়ে গেছি। (রাজা চুপ করে রইলেন)

উর্বশী। এমন কোন ভাগ্যবতী রমণী আছে যাকে ইনি খুঁজছেন। আত্মনিবেদনের এমন বস্তু কোন নারীর ভাগ্যে ঘটেছে ?

চিত্রলেখা। একটু ধ্যান করলেই ত জানতে পারিস। দেখ না চেষ্টা করে।

উর্বশী। সখী, সহসা ধ্যানযোগে রাজার মনের মানুষকে জানতে ভরসা হচ্ছে না।

বিদূষক। সখা, আমি বললাম ত দুর্লভ প্রণয়ী জনের সঙ্গে মিলনের একটা চমৎকার উপায় বার করেছি।

রাজা। বল না ভাই।

বিদূষক। একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো, তাহলে ঘুমের ঘোরে হয়ত স্বপ্নে তাকে পেয়ে যাবে। অথবা উর্বশীর একখানা ছবি এঁকে সেই-দিকে চেয়ে বসে থাক। হৃদয় জুড়িয়ে যাবে।

উর্বশী। ছিঃ হৃদয়, তুমি কত ছোট, কত তুচ্ছ যে এমন লোকের প্রণয়ে সন্দেহ করছিলে ত, এখন আশ্বস্ত হত।

রাজা। সখা, তোমার ঐ দুই উপায়ই অসম্ভব। পঞ্চবাণের বাণ-গুলির দ্বারা আমার হৃদয় যেন শেলবদ্ধ হয়ে আছে সর্বদা। এমন অবস্থায় ঘুমই বা হবে কিকরে আর স্বপ্নই বা দেখব কি উপায়ে ঘুমের ঘোরে? তারপর ছবি আঁকা? সেও ত অসম্ভব। সেই সুবদনা উর্বশীকে যদি পটে আঁকতে বসি অমনি দুই চোখ ভরে কি জল আসবে না? নিশ্চয় আসবে। ছবি আর আঁকা হবে না।

চিত্রলেখা। সখী, শুনলি ত রাজার কথা?

উর্বশী। শুনেছি, কিন্তু তাতেও বুক জুড়োচ্ছে না।

বিদূষক। এই পর্যন্তই আমার বুদ্ধিতে কুলিয়েছে।

রাজা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) ভাই আমার মনে যে কি ব্যথা তা সে জানল না, অথবা তার প্রতি আমার অনুরাগ কতখানি তাও সে বুঝতে পারল না। সেই দুর্লভ অতিদুষ্প্রাপ্য উর্বশীরূপবস্তুতে আমাকে বৃথা অনুরক্ত করে পঞ্চবাণের কি লাভ হলো? এমন করে প্রাপ্তির আশায় আমাকে পাগল করে কন্দর্প যদি সুখী হয় হোক।

চিত্রলেখা। শুনলি ত?

উর্বশী। হাঁ ঠিক, ঠিক, আমাকেই উনি এমনভাবে ভাবছেন?

সখী, হঠাৎ ওঁর সামনে যেতে আমার পা সরছে না। তাই ভাবছি দৈবক্ষমতা বলে একটুকরো ভূর্জপত্র তৈরী করে তাতে একখানা চিঠি লিখে ওঁর ও আমাদের মাঝখানে ছুঁড়ে দিই। দেখি কি হয়।

চিত্রলেখা। আমারও তাই মত। (উর্বশীর পত্রলেখন ও ক্ষেপন)

বিদূষক। ও বাবা, একি একি? একটা সাপের খোলস আমায় খাবার জন্য হঠাৎ এসে পড়ল কোথা থেকে?

রাজা। (দেখে) না না, এ ত সাপের খোলস নয়। এ যে ভূর্জপত্রে লেখা কতকগুলি অক্ষর।

বিদূষক। তাই নাকি? তাহলে তোমার বিলাপ শুনে নিশ্চয় অদৃশ্যা উর্বশী একখানা প্রণয়পত্র লিখে তোমার সামনে ফেলে দিয়ে থাকবেন।

রাজা। মানুষের বাসনার কি কোন অগম্য বিষয় আছে? হতেও পারে, তুমি যা বললে। (চিঠি পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে) ঠিক ধরেছ বন্ধু, সত্যই এটা উর্বশীর চিঠি।

বিদূষক। চিঠিতে যা লেখা আছে, তা শুনতে চাই।

উর্বশী। বাঃ, বাঃ আর্য। সত্যই তুমি মনের মানুষ হবার যোগ্য বটে।

রাজা। শোন সখা। (চিঠি পড়তে লাগলেন) হে স্বামীন, হে আমার সর্বস্ব, তুমি যেমন ভেবেছ আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি, আমিও তেমনি ভেবেছি যে আমার মনের কথা তুমিও বুঝতে পারনি। তাই এখন পারিজাত কুসুমের শয্যা এবং নন্দনকাননের সুরভিমেদুর বাতাস আমার নিকট জ্বলন্ত আগুনের মত তাপদায়ক হয়েছিল। এখন সে সংশয় ঘটেছে। আর সে নন্দনকাননের পারিজাত-শয্যায় তাপ নেই, এখন হতে তাতে প্রাণ জুড়োবে।

উর্বশী। বাঃ বাঃ, ক্ষুধার সময় আমার পিঠে পাওয়ার মত তুমি তোমার মন জুড়োবার জিনিস পেয়েছ রাজন। এখন এই নিয়েই ঠাণ্ডা হয়ে থাক।

রাজা। কি বলছ সখা, মনস্হির করার কথা? প্রিয়তমার এই

চিঠিখানা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে মত্ত খঞ্জনাক্ষী উর্বশীর সেই কমল-নিন্দী মুখখানির সঙ্গে যেন আমার মুখ মিলিত হলো। কেন না, এ চিঠিতে সবই আছে, আমি যেমন তার জন্য, সেও তেমনি আমার জন্য কাতর। আমার মনে যেমন ভাবের উদয় হয়, তার মনেও ঠিক তেমনি ভাববাসনার উদয় হয়ে থাকে। সে যে কি অবস্থায় আছে, তা সমস্তই সুন্দর করে লিখে দিয়েছে এ চিঠিতে। তাই মনে হচ্ছে এ ত চিঠি নয়, এ যেন তারই মুখখানি। তৃষিত আমি, আমার মুখের সঙ্গে এসে মিলিত হলো।

উর্বশী। এ বিষয়ে আমার মনের ভাব একই রকম।

রাজা। সখা, আমার সর্বাঙ্গ ঘামছে। আঙ্গুলের ঘামে হয়ত চিঠিখানির অক্ষরগুলি লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তুমি তোমার নিজের হাতে আমাব প্রিয়ার এই অমূল্য রত্ন গচ্ছিত রাখ।

বিদূষক। (চিঠি হাতে নিয়ে) তাহলে কি উর্বশী তোমার মনোহররূপ তরুতে ফুল দেখিয়ে ফলের বেলায় নিরাশ করবে? চিঠি দিয়েই সারবে, ধরা দেবে না?

উর্বশী। ও চিত্রলেখা, প্রাণাধিকের কাছে যাবার জন্য প্রাণ উতলা, অথচ হঠাৎ যেয়ে উঠতে পারছি না। প্রাণটা কেমন যেন হয়ে উঠছে। দেহ মনে কিছুতেই বল পাচ্ছি না। পা জড়িয়ে আসছে। আমার এই অবস্থাটা একটু সামলে নিই। তুই ততক্ষণে তাঁর সামনে যা ও যা বললে শোভা পায় তাই বলগে।

চিত্রলেখা। বেশ। (রাজার সামনে স্বাভাবিকভাবে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। (সম্ভ্রমে ও সমাদরে) এস লক্ষ্মী। (আশেপাশে তাকিয়ে উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে) দেখ সুমুখী, ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত যমুনাকে যে একবার আগে দেখেছে, সে যদি পরে সেই গঙ্গা-বিরহিত যমুনাকে দেখে, তবে তখন তার যেমন আগের মত আনন্দ থাকে না, তেমনি আজ সখী উর্বশীকে ছেড়ে একাকিনী তোমাকে উপস্থিত দেখে আমার আর তেমন আগের মত আনন্দ হচ্ছে না।

চিত্রলেখা। কিন্তু রাজন, প্রথমে জলদমালাকেই দেখা যায়, বিদ্যুৎ ত তারপর ঝলকায়।

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) তাই ত, এ উর্বশী নয়, তার সহচরী।

রাজা। এই যে আসন। একটু উপবেশন করো।

চিত্রলেখা। উর্বশী আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে দুই একটি কথা জানিয়েছে।

রাজা। কি আজ্ঞা করেছেন তিনি ?

চিত্রলেখা। সে বলেছে, কেশীদানবজনিত বিপদের সময়ে মহারাজই আমার একমাত্র আশ্রয় হয়েছিলেন। সেই সময় আপনাকে দেখার পর থেকে দুরন্ত দানবরূপী মদন আমাকে বড়ই পীড়িত করছে। সুতরাং আগের বারের মত এবারেও মহারাজের দয়া ভিক্ষা চাই।

রাজা। সখী চিত্রলেখা, তুমি শুধু সেই উর্বশীকেই মদনকাতরা মনে করছ, কিন্তু তার জন্য এই অভাগা পুরূরবার যে কষ্ট, কত ব্যথা তা একবারও দেখছ না। আমাদের এ প্রণয় ত দুজনারই সমান। আমি তার জন্য পাগল, সে আমার জন্য পাগল। সুতরাং আর দেরী করো না, যত সত্বর সম্ভব, চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনের মত আমার সঙ্গে আমার জীবনের জ্যোৎস্নারূপিণী উর্বশীর মিলন করিয়ে দাও। কৌমুদীকে ছেড়ে চন্দ্র কি ক্ষণকালও থাকতে পারে ?

চিত্রলেখা। (উর্বশীর কাছে গিয়ে) ও সখী, শীগগির আয়। তোর প্রিয়তমের অবস্থা শোচনীয়। মদনের প্রচণ্ড তাড়না দেখে তাঁরই দূতী হয়ে এলাম তোর কাছে। শীগগির চল।

উর্বশী। (অপরের দৃশ্য অবস্থায়) তুই বড় চঞ্চল, এরই মধ্যে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেলি ?

চিত্রলেখা। (হেসে) এখনি জানা যাবে, কে কাকে ছেড়ে দূরে যায়। যা হোক, এখন রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন কর।

উর্বশী। (সঙ্কোচের সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে সলজ্জভাবে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। (পরম আনন্দের সঙ্গে একমুখ হেসে) সুন্দরী, তোমার মুখ দিয়ে যখন আমার জয় হোক কথাটা বেরিয়েছে তখন আমার জয় শতবার লক্ষবার। প্রিয়ে, আজই বোধহয় তোমার মুখে ইন্দ্র ছাড়া অপর পুরুষের জয়শব্দ উচ্চারিত হলো। একি আমার কম সৌভাগ্যের কথা? (হাতে ধরে উর্বশীকে বসালেন)

বিদূষক। (উর্বশীকে) বলি, তোমাদের রাজ্যের নিয়মকানুন ত মন্দ নয়? আমি হলাম রাজার প্রিয়বয়স্য, তাতে আবার ব্রাহ্মণ, আমাকে কি একটা নমস্কার করতেও নেই?

(উর্বশী হাসতে হাসতে প্রণাম করল)

বিদূষক। মঙ্গল হোক তোমার লক্ষ্মী।

দেবদূত। চিত্রলেখা, উর্বশীকে সত্বর হতে বল। কেন না, ভরতমুনি আটটি রসে ভরপুর করে যে নাটক রচনা করেছেন, আজ দেবরাজ ইন্দ্র লোকপালগণের সঙ্গে একত্র হয়ে সেই নাটক দর্শন করবেন। (সকলে শুনতে লাগল কথাটা, উর্বশী বিষণ্ণ হলো)

চিত্রলেখা। উর্বশী, শুনলি ত দেবদূতের কথা? এখন মহারাজের অনুমতি নিয়ে চল।

উর্বশী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) আমি আর কি বলব? কথা সরছে না মুখে।

চিত্রলেখা। মহারাজ, উর্বশী বলছে, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি দেবরাজের সকাশে নিজেকে নিরপরাধ করতে চাই। তা না হলে তিনি আমায় ঘোর অপরাধিনী করবেন।

রাজা। (কোনমতে আত্মসংবরণ করে) আমি তোমাদের প্রভুর আদেশে বাধা দিতে চাই না। কিন্তু এই হতভাগ্যকে মনে রেখো।

(উর্বশী বিরহদুঃখে অবসন্ন হয়ে রাজাকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে দেখতে সখী চিত্রলেখার সঙ্গে চলে গেলেন)

রাজা। (দীর্ঘনিঃশ্বাসে) দেখার জিনিস অন্তর্হিত হলো। এখন চোখ থাকা না থাকা সমান।

বিদূষক। (উর্বশীর পত্রখানা রাজাকে দেখাতে গিয়ে) চক্ষু বিফল হবে কেন, এই যে তার ভূর্জ (অর্ধেক বলেই) কি সর্বনাশ! উর্বশীকে দেখে এমন বিস্মিত হয়েছিলাম যে হাত থেকে কখন ভূর্জপত্রখানা খসে পড়ল তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলাম না।

রাজা। সখা, কি যেন বলতে যাচ্ছিলে?

বিদূষক। (কথাটা ঘুরিয়ে) সখা, বলতে যাচ্ছিলাম যে তুমি এমন করে দেহটা মাটি করো না। উর্বশী গভীরভাবে অনুরক্তা হয়েছে তোমার প্রতি। সে যেখানেই যাক বা যেখানেই থাক, এখানকার এই ব্যাপার, তোমার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না।

রাজা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। কেন না, তার যাবার বেলায় দেখলাম, তার দেহের উপর ইন্দ্রের কর্তৃত্ব, তাই দেহটা ইন্দ্রের সভায় গেল, কিন্তু তার হৃদয়ের প্রভু সে নিজেই বলে সে হৃদয় গচ্ছিত রেখে গেল আমার কাছে। কারণ সে যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছিল তখন তার হৃদয়ের উপরিস্থিত পীনস্তন মুহুর্মুহু কাঁপছিল। যেন হৃদয়খানি তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

বিদূষক। (মনে মনে) বুকটা আমার কাঁপছে। কখন যেন রাজা সেই ভূর্জপত্রের চিঠিখানা চেয়ে বসেন।

রাজা। বয়স্য, কি দিয়ে এখন এই অস্থির আত্মাকে শান্ত করি বল ত? (মনে করে) আচ্ছা ভাই, সেই ভূর্জপত্রের চিঠিখানা দাও ত, তাই বসে বসে দেখি।

বিদূষক। (চারদিকে বোকার মত চেয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে) একি? কোথায় গেল সে চিঠি? নিশ্চয় তা উর্বশীর সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে থাকবে।

রাজা। (বিরক্তির সঙ্গে) সব কাজেই দেখছি এই আহাম্মকটার গুণের শেষ নেই। একটা না একটা কিছু করে বসবেই।

বিদূষক। খোঁজ না। আমিও খুঁজছি। (খুঁজতে লাগল) কৈ, এখানে ত নেই।

পরিচারিকা ও অন্তঃপুরের দাসীদের সঙ্গে পাটরাণী ঔশীনরীর প্রবেশ

পাটরাণী। ও নিপুনিকে, সত্যিই কি আর্যবিদূষকের সঙ্গে মহারাজকে তুই এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করতে দেখেছিস ?

চেটী। কোনদিন আমি কি কোন মিথ্যাকথা আপনাকে বলেছি ?

দেবী। তাহলে চল, আমরা ঐ লতার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনি, গোপনে কি কথাবার্তা চলছে, আর তুই যা বলেছিলি তা সত্যি কিনা।

চেটী। আপনার যেমন ইচ্ছা।

দেবী। (একটু এগিয়ে সামনের দিকে চেয়ে) নিপুনিকা, নূতন চীবরের মত (গাছের ছালের মত) একখানা পত্র দক্ষিণ বাতাসে উড়ে আসছে। এটা কি।

চেটী। (দেখে) রাণীমা, বেশ দেখা যাচ্ছে ভূর্জপত্রের উপর কি লেখা। উড়তে উড়তে এসে আপনারই নূপুরের ডগায় পড়ল। পড়েই দেখা যাক।

দেবী। তুই আগে পড়ে দেখ, যদি আমার শোনবার মত হয় তাহলে শুনব।

চেটী। (পড়ে) দেবী, চারদিকে যে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, সেই গুপ্তকথাই ব্যক্ত হয়েছে এই চিঠিতে। আমার মনে হচ্ছে মহারাজের উদ্দেশ্যে উর্বশীর প্রণয়পত্র। বিদূষক মহাশয়ের অসতর্কতায় আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

দেবী। ভাল করে মানেটা মনে মনে গেঁথে রাখ। (চেটী আবার পড়তে লাগল)

দেবী। রাজার কাছে যেতে হলে রাজার উপযুক্ত উপচার আবশ্যক। আজ এই চিঠিখানা দিয়েই সেই স্বর্গবেশ্যার প্রণয়ীর পূজা করব। চল দেখি, কোথায় তিনি।

চেটী। দেবীর যেমন আজ্ঞা। (উভয়ের সভাগৃহের দিকে গমন)

বিদূষক। সখা, প্রমোদবনের নিকটবর্তী ক্রীড়াপর্বতের মূলে ওটা কি দেখা যাচ্ছে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

রাজা। হে বসন্তসমীরণ, যদি তোমার নেহাৎ সৌরভের দরকার হয়ে থাকে তাহলে লতাবলীর সুগন্ধী কুসুমরেণু হরণ করো না কেন ?

আমার প্রিয়তমা উর্বশীর স্নেহমাখা হস্তের তুল্য তার চিঠিখানা হরণ করে কি লাভ ? তুমি ত ভালভাবেই জান, কামী ব্যক্তিরা এইভাবে তাদের প্রিয়বিচ্ছেদবেদনা কতকটা নিবারণ করে। কিন্তু পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যারা জীবনধারণ করে আছে তাদের এভাবে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তুমি যে জগতের প্রাণ।

নিপুণিকা (চেটী)। দেবী, এখন এই চিঠিখানারই খোঁজ হচ্ছে।

দেবী। দেখছি।

বিদূষক। সখা, ম্লান কেশরের মত ময়ূরের পালক দ্বারা আমি প্রতারিত হয়েছি। ওটা পত্র নয়।

রাজা। আর কিছু না, এবার আমার দফা রফা হলো। হা আমার পোড়াকপাল।

দেবী। (কাছে গিয়ে) আর্যপুত্র, অত ব্যস্ত হয়ো না। এই সেই ভূর্জপত্র।

রাজা। (হঠাৎ বেকুব হয়ে মনে মনে) কি সর্বনাশ! এযে পাটরাণী। (প্রকাশ্যে) এস, এস রাণী।

দেবী। শুভাগমন নয়, আমার এখন এখানে আসাটা নিতান্ত অশুভাগমন বলতে হবে।

রাজা। (অন্যের অগোচরে) সখা, এখন কর্তব্য কি ?

বিদূষক। (অন্যের অগোচরে) বামাল বা অপহৃত দ্রব্য ধরা পড়লে চোরের আর কিই বা বলার থাকতে পারে ?

রাজা। (অন্যের অগোচরে) মূঢ়, এই কি ঠাট্টা বিদ্রূপের সময় ? (প্রকাশ্যে) রাণী, এখন এই চিঠিখানা খুঁজছি না, রাজকার্যের একখানা চিঠির খোঁজেই এত কাণ্ড।

দেবী। হ্যাঁ, নিজের সৌভাগ্য এইভাবেই ঢাকতে হয়।

বিদূষক। রাণী, এখন তাড়াতাড়ি মহারাজের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন ত। পিত্তটা ঠাণ্ডা হলেই সুস্থ হবেন উনি।

দেবী। নিপুণিকা, বিদূষক কত সুন্দরভাবে না রাজাকে আশ্বাস দান করছে।

বিদূষক। আপনিই দেখুন না দেবী, ভাল খাদ্যের কথায় সখা আমার কেমন আশ্বাসিত হচ্ছেন।

রাজা। মূর্খ, তুমি যে দেখছি, জোর করে আমাকেই অপরাধী বানাচ্ছ।

দেবী। আপনার কি অপরাধ মহারাজ, এক্ষেত্রে আমিই ঘোর অপরাধিনী। কেন না, এখন আপনার চোখের বালির মত আপনার শত্রু হয়েও আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আর না, চললাম। (বলেই সরোষে প্রস্থান)

রাজা। অয়ি সুন্দরী, তুমি কেন, আমিই ত অপরাধী, প্রসন্ন হও। ক্রোধ পরিত্যাগ করো। প্রভু রুষ্ট হলেন, অথচ ভৃত্য হয়ে আমি নিরপরাধ—এটা কি সম্ভব ? (রাণীর পায়ের উপর পড়ল)

দেবী। (মনে মনে) হৃদয়ের দুর্বলতাবশতঃ এঁর অনুনয়বিনয়ে গললে চলবে না। কঠিন হব। কিন্তু ভয় হচ্ছে, পরে বিষম অনুতাপে না ভুগতে হয়।

বিদূষক। তাই ত, বর্ষার নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়েই চলে গেলেন। পড়ে থেকে আর লাভ কি ? উঠে পড় রাজা বাহাদুর।

রাজা। (উঠে) রাণীর এই রাগ করে চলে যাওয়াটা মোটেই অন্যায় হয়নি। কারণ সত্য সত্য যদি প্রাণের টান না থাকে তবে প্রিয়তমরা যতই অনুনয়-বিনয় করুক না কেন, তাতে নারীদের হৃদয় গলে না। একটা বাজে পাথরে রং ফলিয়ে মহামূল্য মণির মত সাজিয়ে তুললেও যারা জহুরী, তাদের মন ভেজে না। দেখামাত্রই ধরে ফেলে এটা নকল মণি।

বিদূষক। রাণীর এই সরে পড়াটা তোমার অনুকূলই হলো। যাদের চোখের অসুখ তাদের সামনে কি দীপের শিখা সহ্য হয় ?

রাজা। একথা বলো না। আমি উর্বশীর প্রতি যতই আসক্ত হই না কেন, দেবীর উপর আমার অনুরাগ সেই আগের মতই রয়ে গেছে। তেমনই সম্মানের চোখে দেখি তাকে। কিন্তু ভাই, আজ অত করে পায়ে পড়লাম, তবু থামল না। এইটাতেই আজ প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে।

ঠিক আছে, আমিও কিছুদিন উদাসীন থাকছি, দেবীর কোন কথাতেই থাকব না।

বিদূষক। রেখে দাও তোমার ওসব কথা। যখন উদাসীন থাকতে হয় থেকো। এখন আমার ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নান-আহারের বেলা বয়ে যাচ্ছে।

রাজা। (উপরের দিকে চেয়ে) একি, দিনের অর্ধেক প্রায় অতীত হয়েছে। এইজন্যই দেখছি, নিদাঘতাপে ময়ূর বৃক্ষের জলসিক্ত শীতল আলবালে অর্থাৎ মূলদেশের জলপূর্ণ মাটির বেড়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কর্ণিকাফুলের কুঁড়িগুলি ফুটিয়ে নিয়ে ভ্রমরেরা তার উপর শুয়ে আছে। জলচর হাঁসগুলি ত্রস্ত জল ছেড়ে তীরের কমলদলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রমোদকক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপাখি পিপাসার্ত হয়ে 'জল জল' বলে কূজন করছে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

দুজন ভরতশিষ্যের প্রবেশ

প্রথম শিষ্য। সখা পেলব, অগ্নিগৃহ হতে গুরুদেব যখন দেবরাজের মন্দিরে গমন করেন, তখন তিনি তোমাকে আসনে বসিয়ে রাখলেন আর আমি অগ্নিরক্ষার জন্য সেই হোমগৃহেই রইলাম। তাই জিজ্ঞাসা করছি, গুরুদেবের প্রদর্শিত অভিনয়ে দেবসভার খুব আনন্দ হয়েছিল ত? সকলেই সুখী হয়েছিলেন ত?

দ্বিতীয়। গালব, জানি না, কি করে সুখী হবেন? লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামক একখানি উপাদেয় নাটক সরস্বতী দেবী রচনা করেছিলেন। তার অভিনয়ের সময় যেখানে যেখানে প্রণয়ব্যাপারের উচ্ছ্বাস আছে, সেখানে সেখানে অভিনয় করতে গিয়ে উর্বশী একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল।

প্রথম। তাতে অনেক দোষ প্রকাশ পেয়েছে এই ত?

দ্বিতীয়। ঠিক ধরেছ। উর্বশী অন্যমনস্কা হয়ে অনেক মারাত্মক ভুল করে বসেছে।

প্রথম। কি রকম?

দ্বিতীয়। উর্বশী লক্ষ্মী সেজেছিল আর মেনকা সেজেছিল বারুণী। বারুণী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করল, স্বয়ং কেশব এবং ত্রিলোকের অন্যান্য লোকপালগণ সবাই সভাস্থলে উপস্থিত। এঁদের মধ্যে কার উপর তোমার হৃদয়ের টান, খুলে বল ত লক্ষ্মী।

প্রথম। তারপর?

দ্বিতীয়। তখন 'পুরুষোত্তমের উপর' বলতে গিয়ে উর্বশী বলে ফেলল, পুরূরবার উপর।

প্রথম। যা ঘটবে, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নিচয় তার অনুকূলভাবেই কাজ করে। তাতে উর্বশীর উপর মুনি খুব রেগে গেলেন।

দ্বিতীয়। ঐরকম ভুল হওয়ায় উপাধ্যায় অভিশাপ দিয়েছিলেন, পরে মহেন্দ্র অনুগ্রহ করলেন।

প্রথম। কেমন?

দ্বিতীয়। তিনি শাপ দিলেন, যেহেতু তুমি আমার উপদেশ বিস্মৃত হয়েছ তুমি আর স্বর্গে থাকতে পারবে না। উর্বশী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন দেবরাজ বললেন, তুমি যাঁর উপর অনুরক্ত হয়েছ সেই রাজর্ষি পুরূরবা আমার সকল যুদ্ধেই প্রধান সহায়। তাই তাঁর প্রিয় কার্য করা আমার কর্তব্য। অতএব তুমি যেভাবে ইচ্ছা করো পুরূরবাকে গিয়ে সেবা করো। কিন্তু তিনি যখন তোমার গর্ভস্থ সন্তানের মুখ দেখবেন তখন তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

প্রথম। মহেন্দ্র ত লোকের মনের কথা বোঝেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এটা উচিত কাজই হয়েছে।

দ্বিতীয়া। (সূর্যের দিকে চেয়ে) কথায় কথায় গুরুদেবের স্নানের সময় প্রায় অতীত হলো। অতএব চল, গুরুদেবের কাছে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। যাদের দশজন আত্মীয় পোষ্য আছে, তারা সবাই সামর্থ্য থাকতে থাকতে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। পরে শেষ বয়সে পুত্রাদির উপর সংসারভার ন্যস্ত করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে থাকে। কিন্তু

চাকরি কারাবাসে পরিণত হয়। পার-না পার শরীরপাত করে সেবা করে যেতেই হবে। কিছুতেই রেহাই নেই। নারীদের মধ্যে থেকে চাকরি করা কি কষ্টের কাজ! কি বিড়ম্বনা। (একটু এগিয়ে গিয়ে) নিয়মনিষ্ঠাবতী অর্থাৎ ব্রতাবলম্বিনী কাশীরাজকন্যা দেবী ঔশীনরী আমাকে আদেশ করেছেন। ব্রত সমাপনের জন্য অভিমান পরিত্যাগ করে তিনি নিপুণিকার দ্বারা মহারাজকে পূর্বেই যে প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই প্রার্থনার কথাটা মহারাজকে মনে করিয়ে দিতে হবে। যাই এতক্ষণে হয়ত মহারাজের সায়ংকৃত্য সম্পন্ন হয়ে থাকবে। (একটু এগিয়ে দেখে) আচ্ছা, রাজবাড়িতে সন্ধ্যাকালে কি সুন্দর শোভা হয়। দাঁড়ের উপর ময়ূরগুলি রাত্রির নিদ্রায় অলস হয়ে এমন নিশ্চলভাবে আছে যে মনে হয় বুঝি বা কেউ ঐ বাসযষ্ঠির মাথায় তাদের ক্ষোদিত করে রেখেছে। প্রতিটি কক্ষে ধূপ ধুনো জ্বালানো হচ্ছে এবং জানালা দিয়ে ধূম বার হয়ে কার্নিশে গিয়ে জমছে। মনে হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে কপোত এসে কার্নিশগুলি ছেয়ে ফেলেছে। শুদ্ধাচারসম্পন্ন ও সংযত অন্তঃপুরবাসিনী বৃদ্ধারা নানা কুসুম ও পূজার বস্তুতে পরিশোভিত স্থানসমূহে অর্থাৎ চতুষ্পথাদিতে উজ্জ্বল শিখাসমন্বিত সায়ংকালীন মঙ্গলপ্রদীপ কেমন ভাগে ভাগে সাজিয়ে রাখছেন (সাজঘরের দিকে চেয়ে) তাই ত, রাজা যে এই দিকেই আসছেন। চারদিকে পরিজনরা প্রদীপ ধরে বেষ্টন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে আর দীপখানার সম্মিলিত শিখায় রাজদেহ কি চমৎকার আলোকিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে পক্ষচ্ছেদের পূর্ববর্তী সময়ের কোন পর্বত মন্থরভাবে অগ্রসর হচ্ছে আর তার তটদেশ স্বর্ণবর্ণ কর্ণিকার কুসুমের তরু ফুলভারে হাসছে।

পরিজনবর্গ ও বিদূষকের সঙ্গে রাজার প্রবেশ

রাজা। নানাকার্যে আনমনা থাকি বলে দিনের বেলাটা একরকম কেটে যায়। কিন্তু রাত্রিকালে চিত্তবিনোদনের কিছুই নেই। এক একটা বছরের মত দীর্ঘ বলে মনে হয়। কি করে কাটাব?

কঞ্চুকী। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক, দেব। দেবী বলেছেন, মণিহর্ম্য প্রাসাদ হতে চন্দ্রকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। আপনি

সেখানে যতক্ষণ রোহিণীর সঙ্গে চন্দ্রের যোগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করবেন।

রাজা। দেবীকে বল গিয়ে তাঁর যেমন ইচ্ছা আমি তাই করব।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। বয়স্য, সত্যি কি কোন ব্রতের জন্য আজ দেবীর এই আয়োজন?

বিদূষক। না মহারাজ, আমার মনে হয় সেদিন আপনি অত সাধ্য-সাধনা ও পায়ে পড়া সত্ত্বেও সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি চলে গিয়েছিলেন। তাই হয়ত হুঁস হয়েছে। তাই আজ হয়ত ব্রতের ছলে তোমার কাছে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেদিন-কার দোষক্ষালনের জন্যই এই প্রয়াস।

রাজা। সখা, তুমি ঠিকই বলেছ। হৃদয়বতী রমণীরা প্রথমতঃ প্রিয়তমের প্রণিপাত উপেক্ষা করে পরে মনের আগুনে পুড়তে থাকে। তখন নির্জনে যতই প্রিয়কৃত পূর্বমিনতির কথা স্মরণ করে ততই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। এমন কি গোপনে প্রিয়সান্নিধানে শতবার আত্মসমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব মণিহর্ম্যতলের পথটা দেখাও ত, সেইখানেই যাই।

বিদূষক। এইদিকে এস সখা। গঙ্গাতরঙ্গস্পর্শে সুশীতল ঐ স্ফাটিকশিলাগ্রথিত সোপান বেয়ে চিরসুন্দর মণিহর্ম্যতলে আরোহণ করো। (সকলের আরোহণ)

বিদূষক। (দেখে) চন্দ্রোদয়ের আর দেরী নেই। কেন না, পূর্ব-দিক ক্রমেই তিমিরশূন্য এবং রক্তাভ হয়ে উঠছে।

রাজা। ঠিক ধরেছ ভাই। কারণ উদয়ের পূর্বক্ষণে চন্দ্র সম্যক প্রকাশিত হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর কিরণমালার অন্ধকার এ স্থান হতে দূরে সরে গেছে এবং পূর্বদিকরূপ বধূর মুখ হেসে উঠেছে। মনে হচ্ছে মুখের উপর পতিত কেশভার সরিয়ে রাখার একখানা চাঁদের মত মুখ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।

বিদূষক। বাঃ বাঃ, খণ্ডগুড়ের মোয়ার মত এই যে ওষধিপতি চন্দ্র

উদিত হলেন।

রাজা। (সহাস্যে) পেটুকদের সব জায়গাতেই কেবল ভোজনের আলোচনা। (অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম) হে তারানাথ, সাধুদের দর্শপৌর্ণমাস ও পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্য তুমি রবির সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণপক্ষের সৃজন করো এবং প্রতি তিথিতে অমৃতের দ্বারা পিতৃগণ এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর। ক্রমে ক্ষীণ হয়ে অমাবস্যায় লীন হয়ে যাও। আবার নিশাকালের প্রগাঢ় অন্ধকাররাশির বিনাশ করো। চন্দ্র-শেখরের চূড়ায় তোমার স্থান—এমনই মহান তুমি। তোমাকে নমস্কার।

বিদূষক। দেখ রাজন, আমি দ্বিজ, তোমার পিতামহ চন্দ্র হলেন দ্বিজকুলের অধিনায়ক। সুতরাং আমার সঙ্গে তোমার ঠাকুরদাদার একটা সম্পর্ক আছে। আমার মুখ দিয়ে তোমার পিতামহ তোমাকে বসতে অনুমতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ আমি বলছি তুমি বস, তাহলে আমিও একটু ভালভাবে বসতে পারব।

রাজা। (বিদূষকের কথায় বসে পরিজনদের দিকে চেয়ে) এমন ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না থাকতে আর প্রদীপের প্রয়োজন কি? তোমরা বিশ্রাম করগে। (পরিজনদের প্রস্থান)

রাজা। সখা, আর মুহূর্তমধ্যে দেবী হয়ত এসে পড়বেন। সুতরাং এই সময় তোমাকে আমার মনের অবস্থাটা জানাই।

বিদূষক। দেবীকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। আমি বলি, উর্বশীর তেমন অনুরাগ কখনো বৃথা যাবে না। সে আসবেই আসবে। সুতরাং এখন কিছুকাল তার আশাতেই প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখ।

রাজা। তা ঠিকই বটে। তবে আমার মনের জ্বালা এখন খুবই বেড়ে উঠেছে। নদীর স্রোত যেমন শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেক বেশী বেগবান হয়, তেমনি প্রিয়ার সঙ্গে আমার মিলন যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ততই প্রচণ্ড হয়ে উঠছে মন্মথ।

বিদূষক। দিন দিন ভেবে ভেবে যেমন তালপাতার সেপাই হয়ে উঠছ, তাতে মনে হয় যার জন্য শুকিয়ে যাচ্ছ সেই অপ্সরারা এল বলে অর্থাৎ অতি সত্বরই এসে পড়বে।

রাজা। (হঠাৎ দক্ষিণবাহু কেঁপে উঠল) সখা, তুমি যেমন এইসব আশার কথা বলে আমার অন্তরের ব্যথা কতকটা লঘু করলে, ঠিক তেমনি এই দক্ষিণবাহু কেঁপে উঠে আমার ব্যথিত হৃদয়কে অনেকটা আশ্বাস দিচ্ছে।

বিদূষক। কি বলছ, ব্রাহ্মণের কথা কখনো মিথ্যা হয় ?

অভিসারিকার বেশে আকাশপথে চিত্রলেখা ও উর্বশীর প্রবেশ

উর্বশী। (নিজের সুসজ্জিত দেহের দিকে চেয়ে) সখী, এই মুক্তালঙ্কারে ভূষিত ও নীলবসনে সজ্জিত অভিসারিকার বেশ পরেছি। দেখ দেখি, এটা তোর মনের মত হয়েছে কিনা ?

চিত্রলেখা। তোর আজকের বেশভূষার প্রশংসা আর মুখে কত করব ? তোর এই সাজগোজ দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি যদি পুরূরবা হতাম।

উর্বশী। সখী, আমি আর দেরী করতে পারছি না। হয় তুই সত্বর সেই রাজাকে আমার কাছে নিয়ে আয় না হয়ত আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

চিত্রলেখা। সখী, চন্দ্রিকাবিধৌত যমুনার কূলে প্রতিবিম্বিতকান্তি তুষারধবল কৈলাসগিরির মত নয়নতর্পণ ঐ তোর প্রিয়তমের ভবন। এই আমরা এসে পেঁছিলাম বলে।

উর্বশী। তাহলে ধ্যানযোগে জান ত দেখি, আমার সেই হৃদয়চোর এখন কোথায় এবং কি করছে।

চিত্রলেখা। সখী, জানলাম তোব সেই মনোচোর একটা সুন্দর উপভোগক্ষমস্থানে তার হৃদয়ের ধনকে আশার সাজে সাজিয়ে তার মিলন-সুখে মেতে আছেন।

উর্বশী। বিশ্বাস হয় না। চিত্রলেখা, মনে তুই নিশ্চয় একটা মতলব এঁটে একথা বলছিস। সে যে সমাগমের আগেই আমার মন হরণ করেছে।

চিত্রলেখা। এই যে বয়স্যের সঙ্গে মহারাজ মণিহর্ম্য প্রাসাদে উপস্থিত আছেন। তবে চল, দুজনে যাই সেখানে। (আকাশযান হতে

দুজনের অবতরণ)

রাজা। সখা, রাত্রি যতই বাড়ছে, আমার বিরহাগ্নিও ততই দাউ দাউ করে জ্বলছে।

উর্বশী। কার বিরহ ? কথাটা ঠিক স্পষ্ট নয় বলে বুকটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখন একটু গা ঢাকা দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনে দেখি সংশয় ঘোচে কিনা।

চিত্রলেখা। তোর যেমন অভিরুচি।

বিদূষক। এমন সুন্দর অমৃতবর্ষিণী জ্যোৎস্না ! একটু উপভোগ করো না ভাই।

রাজা। সখা, এইসব জিনিসের দ্বারা আমার মনের এ জ্বালা কমছে না। ভেবে দেখ, টাটকা ফুলের বিছানা, বিমল জ্যোৎস্না, সদ্য মলয়জ চন্দনদ্বারা অঙ্গ বিলেপন, আর মণিমুক্তার হার—এ সমস্তই আমার মনের জ্বালা বাড়ায় ছাড়া কমায় না। শুধু সেই অনুপম ললনা বা তার বিষয়ে আলাপ আমার এ যাতনা কতকটা কমাতে পারে। অন্য উপায় নেই।

উর্বশী। হায় রে, হৃদয়, আমাকে ছেড়ে যেমন এই রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ, এখন তার ফল ভোগ করো।

বিদূষক। ঠিক বলেছ। আমিও যখন এলাচলবঙ্গকর্পূরাদি-সুরভিত, শর্করামিশ্রিত ঘন আবর্তিত দুগ্ধবিনির্মিত দধি ও দুএকটি আম না পাই তখন তার চিন্তা করেও কত সুখ পাই। তা তোমার যে এমন হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি ?

রাজা। তোমার এখনই সুখাদ্য জুটল বলে।

বিদূষক। তুমিও তোমার সেই হৃদয়েশ্বরীকে অচিরেই লাভ করবে।

রাজা। সখা, আমারও তাই মনে হয়।

চিত্রলেখা। শোন সখী শোন, তোর ত কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

বিদূষক। কি করে ?

রাজা। দানবভয়ে অচৈতন্য অবস্থায় প্রথম যখন তাকে রথে তুলে আনি, তখন রথের ঝাঁকুনিতে এক একবার সে আমার গায়ের উপর এসে পড়ছিল। সত্য কথা বলতে কি, তার সেই অঙ্গস্পর্শে আমার সেই সেই

অংশ সার্থক হয়েছে। বাকি অঙ্গগুলো অর্থাৎ যাতে যাতে তার অঙ্গের নিবিড় স্পর্শ হয়নি সে অঙ্গগুলো বৃথা।

উর্বশী। এত শুনেও কি আর দেখা না দিয়ে থাকা যায়? (সহসা রাজার সামনে গিয়ে) একি সই, সামনে এসে দাঁড়ালাম, অথচ রাজা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

চিত্রলেখা। (সহাস্যে) তুই যে তাড়াতাড়িতে তিরস্করিণী অর্থাৎ অন্যের অদৃশ্যতাবিদ্যা সরাতে ভুলে গিয়েছিস।

(নেপথ্যে) এইদিকে এইদিকে মহারাণী।

(উর্বশী ও চিত্রলেখা মহারাণীর নামে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল)

বিদূষক। ও মশাই, এ যে পাটরাণী এসে হাজির। একেবারে চুপ করে যাও, তা না হলে আর রক্ষা নেই।

রাজা। তুমিও আকার ইঙ্গিত সামলে চলো। যেন কিছুই হয়নি। না হলে ধরা পড়ব।

উর্বশী। সখী, এখন কি করা যায় বল দেখি।

চিত্রলেখা। ব্যস্ত হোস না। তুই ত তিরস্করিণী দিয়ে ঢাকা আছিস। সুতরাং ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই। আর মহারাণীও দেখছি ব্রতনিয়মের বেশে এসেছেন। সুতরাং বেশীক্ষণ থাকবেন বলে মনে হয় না।

দেবী ও ব্রতের দ্রব্যহাতে পরিজনদের প্রবেশ

দেবী। (চন্দ্রের দিকে চেয়ে) আহা, রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আজ চন্দ্রের কি শোভাই না হয়েছে।

নিপুণিকা। আজ আপনার সঙ্গে মহারাজের মিলনেও এমনই শোভা হবে। (বলতে বলতে সকলে অগ্রসর হলো)

বিদূষক। সখা, আমার ধারণা, দেবী স্বস্তিবচনের উপকরণরূপে কিছু খাবার জিনিসও দেবেন। না হলে তোমারই জন্য আজ চন্দ্রব্রতের ছলে দেবী তাঁর সব মান অভিমান ক্রোধ ছেড়ে এসেছেন কেন? আর আমার চোখেই বা দেবীকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?

রাজা। (সহাস্যে) দুটোই হতে পারে। তা হলেও তুমি শেষে

যা বললে অর্থাৎ 'সুন্দর দেখাচ্ছে' কথাটা আমার বর্ণে বর্ণে সত্য মনে হচ্ছে। কেন না, শ্বেতবসন, দু একটা মঙ্গল-উপচার, যেমন কপালে সিঁদুর, মাথায় দু একটা ফুলগোঁজা, নামমাত্র ভূষণ, কপালের উপর চুলের মধ্যে পবিত্র দূর্বাদল—এইসবে দেবীর সৌন্দর্য শতগুণে বেড়েছে। আমার মনে হচ্ছে ব্রতের নাম করে দেবী মনের সমস্ত গর্ব, সমস্ত মান, রোষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করেছেন, এতদিনে আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন। কি বল?

দেবী। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

পরিজনগণ। মহারাজের জয় হোক।

বিদূষক। দেবীর মঙ্গল হোক, আসতে আজ্ঞা হয়।

রাজা। এস, এস দেবী। (হাত ধরে বসালেন)

উর্বশী। দেবী বলে সম্বোধন করার মতই বটে ত, আকৃতির গাম্ভীর্যে এবং অনুভবে মনে হয়, শচীর চেয়ে ইনি কোন অংশেই কম নন।

চিত্রলেখা। আর কোন মুখে না বলবি, বলবার কি মুখ আছে?

দেবী। আর্যপুত্রকে সামনে রেখে একটি বিশেষ ব্রত আমায় করতে হবে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য একটু সময় দিতে হবে। এই অনুরোধ।

রাজা। বলছ কি দেবী? অনুরোধ নয়, অনুগ্রহ।

বিদূষক। ভাল ভাল স্বস্তিবাচনিক খাদ্যাদি দিয়ে এই অনুরোধ তুমি রাণী জন্ম জন্ম ধরে ক'রো—এই আশীর্বাদ করি।

রাজা। দেবীর এ ব্রতের নাম কি?

(দেবী নিপুণিকার দিকে চাইতে লাগলেন)

নিপুণিকা। রাজন, এই ব্রতের নাম প্রিয়প্রসাদন অর্থাৎ প্রিয়ব্যক্তির প্রীতিসাধন।

রাজা। (দেবীর মুখপানে চেয়ে) তাই যদি হয়, কেন তবে তোমার মৃণালের মত সুকোমল দেহলতিকাকে ব্রতনিয়মের কঠোরতার দ্বারা দিনরাত বৃথা কষ্ট দিচ্ছ? যে ব্যক্তি দিনরাত তোমার কৃপালাভের জন্য

সতত উৎসুক, সেই ভৃত্যাধমকে তুমি কি দিয়ে প্রসন্ন করবে? সে ত আপনিই তোমার শ্রীচরণের গোলাম হবার জন্য পাগল।

উর্বশী। (একটু সলজ্জভাবে ও সস্মিতমুখে) এই রাণীর সঙ্গে রাজার যথেষ্ট খাতির দেখছি।

চিত্রলেখা। ওলো উর্বশী, যে সকল নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি অনুরক্ত তারা নিজের স্ত্রীর বেলায় ভালবাসার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়ে থাকে।

দেবী। এই ব্রতের মাহাত্ম্য এই যে, শুরুতেই আর্যপুত্র একটা সদয়ভাব দেখাচ্ছেন।

বিদূষক। কথা কয়ো না মহারাজ। দেবীর প্রাণের কথাগুলি তোমার উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

দেবী। মেয়েরা, পূজার উপকরণগুলি এইদিকে নিয়ে এস। মণিহর্ম্যের মধ্যবর্তী চন্দ্রকিরণের সর্বাগ্রে অর্চনা করি।

পরিজন। দেবীর যেমন আজ্ঞা। এই যে উপকরণ মহারাণী।

দেবী। নিয়ে এস। (কুসুমাদির দ্বারা চন্দ্রকিরণের অর্চনা করে) দাসী, এই নৈবেদ্যের মোদক বা মোয়াগুলি দিয়ে বিদূষকের ও কঞ্চুকীর অর্চনা করে এস।

পরিজন। দেবীর যেমন অনুমতি। আর্য মানবক, আপনার অর্চনার জন্য দেবী এই মোদক পাঠিয়েছেন।

বিদূষক। (শরাভরা মোয়া নিয়ে) দেবী, তোমার মঙ্গল হোক। এই ব্রতের ফল আঠারো আনা হোক।

নিপুণিকা। আর্য কঞ্চুকী, এই আপনার ভাগ।

কঞ্চুকী। (গ্রহণ করে) দেবীর মঙ্গল হোক।

দেবী। আর্যপুত্র, এইদিকে একবার।

রাজা। এই যে আমি।

দেবী। (রাজাকে পূজা করার পর যুক্তকরে প্রণাম) ঐ আকাশ-বিহারিণী রোহিণী এবং রোহিণীপতি শশাঙ্ক—এই দেবদম্পতিকে সাক্ষী রেখে আমি আর্যপুত্রের প্রসন্নতাবিধানের উদ্দেশ্যে শপথ করছি,

আজ হতে আমার পতি যে রমণীকেই কামনা করুন এবং যিনি আর্য-পুত্রের সমাগম প্রার্থনা করুন, তাঁর সঙ্গে নির্বিরোধে ও নিষ্প্রতিবন্ধে কালযাপন করব।

উর্বশী। জানি না, রাণী কাকে লক্ষ্য করে একথা বলছেন। তবু আমার সংশয়ের মেঘ কেটে গেল। হৃদয় সংশয়হীন হলো।

চিত্রলেখা। সখী, মহানুভবা ও পতিব্রতা রাণী তোর বাঞ্ছিত-সমাগমের সকল অন্তরায় বিদূরিত করলেন। এবার নিশ্চিন্ত হলি।

বিদূষক। (গোপনে) খুব ব্রত বটে। রাজা এখন অনুমতি দিচ্ছেন। এ যেন হাত থেকে চোর ছুটে পালালে বলা হচ্ছে যা বেটা, আমার ধর্ম হবে। (প্রকাশ্যে) রাণী, তোমার এতবড় কথাতেও মহারাজ নীরব। কেমন যেন উদাসীন রইলেন।

দেবী। মূর্খ, নিজের সুখে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়ে আর্য-পুত্রের প্রীতিসাধনে অভিলাষিণী হলাম। এতেই ভেবে দেখ না, ইনি আমার প্রিয় নন কি না।

রাজা। অয়ি অসহিষ্ণু, ইচ্ছা হয় তোমার এই অধীনকে কাউকে বিলিয়ে দিতে পার, না হয় তোমার দাসানুদাস করে রাখতে পার। সব কিছুতেই তোমার প্রভুত্ব আছে। তোমার কোন আশাই অমান্য করব না আমি। কিন্তু একটা কথা, তুমি তোমার সম্বন্ধে আমাকে যেমন মনে করছ, কিন্তু তোমাব পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি তেমন নই আমি।

দেবী। তা হোক, না হোক, আমার দেখার দরকার নেই। প্রিয়-প্রসাদনব্রত যেভাবে করার দরকার তা করেছি। পরিজনবর্গ, আর বিলম্ব কেন? চল।

রাজা। প্রেয়সী, যদি এখন আমাকে ফেলে চলে যাও তাহলে জেনো আমি তোমার ব্রতে প্রসন্ন হইনি।

দেবী। আর্যপুত্র, আপনি ত জানেন, অনেকদিন এ ব্রতের জন্য সংযম পালন করে আসছি। কোনদিন কি কোন নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখেছেন? মাপ করুন। (সকলের সঙ্গে প্রস্থান)

উর্বশী। সখী, রাণীর উপর রাজার খুব টান আর রাণীও তেমনি

পতিব্রতা। কি করব এখন? অনেকদূর এগিয়েছি, এখন ত আর ফেরার সময় নেই। আমার হৃদয়কে ফেরাতে পারব না আমি।

চিত্রলেখা। রাজার আশা আর এখন রাণীতে নেই, তোরই উপর নিবদ্ধ দৃঢ়ভাবে। রাণীর সাধ্য কি রাজাকে ফেরায়।

রাজা। (বিদূষকের আসনের কাছে ঘেঁষে বসে) বয়স্য, রাণী বোধহয় এখনো বেশীদূর যাননি।

বিদূষক। বিশ্বস্ত হৃদয়ে বলে যাও যা বলতে প্রাণ চায়। বৈদ্য যেমন এ রোগ অসাধ্য বলে রোগীকে ছেড়ে দেয়, দেবীও তেমনি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। আর ভয় কার?

রাজা। এখন যদি উর্বশী একবার—।

উর্বশী। (মনে মনে) কৃতার্থ হও, যা ভাবছ তা যদি সত্য হয়।

রাজা। তবে গুড়ি গুড়ি করে ধীরে ধীরে যদি আসার সময় পায়ের মধুর নূপুরের ধ্বনি আমার কানে আসে, অথবা পিছন থেকে এসে তার করকমলের দ্বারা আমার নয়ন চেপে ধরে অথবা এই মন্দিরের মধ্যে জোর করে তার কোন সখী তাকে ধরে নিয়ে আসে তাহলে বড় ভাল হয়।

চিত্রলেখা। ও উর্বশী, তোর প্রিয়তমার এই মনোবাসনাটা পূরণ কর না।

উর্বশী। (একটু সঙ্কোচ করে) দাঁড়া, একটু মজা করি। (পিছন দিক থেকে এসে রাজার চোখ চেপে ধরল)

(চিত্রলেখা ইশারায় বিদূষককে প্রকাশ করতে নিষেধ করল)

রাজা। (স্পর্শসুখ অনুভব করে) সখা, সেই নারায়ণের উরুসম্ভবা সুন্দরী না?

বিদূষক। কি করে বুঝলে?

রাজা। এ আর বোঝার কি আছে? যদি সে না হবে তবে স্পর্শমাত্রই আমার সারা দেহে এমন রোমাঞ্চ হবে কেন? কুমুদ চন্দ্রকিরণেই শিউরে ওঠে, সূর্যকিরণে ওঠে না।

উর্বশী। ও বাবা! হাত যে তুলতে পারছি না, যেন বজ্রের প্রলেপ দিয়ে কে জুড়ে দিয়েছে। এখন উপায়? (অতি কষ্টে রাজার চোখ

থেকে হাত সরিয়ে উর্বশী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর রাজাও দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে নিজের দিকে ফেরালেন)

উর্বশী। (সলজ্জভাবে কাছে ঘেঁষে) মহারাজের জয় হোক।

চিত্রলেখা। ভাই, ভাল ত ?

রাজা। হ্যাঁ, এখন ত ভাল হবারই কথা।

উর্বশী। মহারাজকে ত দেবী আমায় দিয়ে দিয়েছেন। অতএব এখন আমি ওঁর প্রণয়িণীর মত এঁর দেহের মধ্যে মিশে যাই, আর আলাদা থাকি কেন ? তাই বলে তুই যেন আমায় বেহায়া মনে করিসনি কিন্তু।

বিদূষক। তোমাদের দুজনের দেখছি দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে এল ?

রাজা। (উর্বশীকে দেখে) দেবী দান করেছেন বলেই যদি আমার দেহে আধিপত্য কবতে চাও, তাহলে বল দেখি সুন্দরী, প্রথমে কার অনুমতিতে আমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করেছিলে, মনটা আমার হরণ করেছিলে ?

চিত্রলেখা। বন্ধু, এ কথার ত জবাব নেই, তাই সখী আমার চুপ করে আছে। এখন আমার একটা কথা বলার আছে।

রাজা। শুনছি বল।

চিত্রলেখা। এই বসন্তের পর গ্রীষ্মকালে সূর্যদেবকে আমার সেবা করার পালা। যাতে আমার হৃদয় প্রিয়সখী উর্বশীর কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত না হয় সেদিকে একটু নজর দিও ভাই।

বিদূষক। দেখ ঠাকরুণ, তোমাদের স্বর্গে ভাববার মত কিই বা আছে ? না আছে খাবার, না আছে পান করবার। দিনরাত্রি কেবল মাছের মত পলকহীন চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কি আছে ?

রাজা। সখী, স্বর্গের সুখের কি সীমা আছে ? না তা বলে শেষ করা যায় ? উর্বশীর মনে অপূর্ব স্বর্গের যে স্মৃতি আছে তা কি করে রোধ করব ? তবে একটা কথা জোর করে বলতে পারি, অপর কোন নারী যাকে ধ্যানেও পায় না, সেই পুরুরবা চিরদিন এর দাস হয়ে থাকবে।

উর্বশী। (আলিঙ্গন করে কাতরস্বরে) সখী, আমায় ভুলিস না।

চিত্রলেখা। সখী, মহারাজের সঙ্গে মিশলে পরে তুই-ই আমাকে ভুলে যাবি। তখন আমিই বলব, উর্বশী, তুই আমাকে ভুলে গেলি ? (রাজাকে প্রণাম করে প্রস্থান)

বিদূষক। কি আনন্দ! সখা, যা চাইছিলে তা পেয়েছ, আশা পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমার জয়জয়কার।

রাজা। কি বলছ বয়স্য ? আমার মনোরথ যে কতখানি পূরণ হলো তা কে বুঝতে পেরেছে ? শোন, সামন্ত ও নৃপতিগণ যখন আমার পাদপীঠে এসে প্রণত হন, তখন তাঁদের মাথার মুকুটের মণির আভায় সেই পাদপীঠ কত রঙে রঞ্জিত হয়—জগতে এতবড় একচ্ছত্র আধিপত্য আমার। তাতেও কিন্তু আমি আমার জীবনকে এত সার্থক বলে মনে করি না, আজ এই উর্বশীর পদসেবা করবার অধিকার পেয়ে জীবনকে যতটা ধন্য বলে মনে করছি। আজ এতদিনে আমার জীবন সত্যসত্যই সার্থক ও কৃতার্থ হলো।

উর্বশী। এ কথার পর আর আমি কি বলব ? এত অনুগ্রহের প্রত্যুত্তরের শক্তি আমার নেই।

রাজা। (উর্বশীর হাত ধরে) আহা, আমার এতদিনের আশার ধন পেয়েছি, আজ যেভাবে যত রকমে আদর করি না কেন তা বেমানান হবে না। কেন না, সেই চন্দ্রাকিরণ এর বিরহকালে যা আমার গায়ে আগুন বৃষ্টি করত, সেই কৌমুদী আজ শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। মদনের সেই বিরহকালের দুঃসহ বাণ আজ সত্যই ফুলের আঘাতের মত মনোরম মনে হচ্ছে। সুন্দরী, যে জিনিসগুলি আগে কত প্রতিকূল ছিল, আজ তোমাকে পেয়ে সে সমস্তই আমার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে।

উর্বশী। এতদিন দেখা না দিয়ে, আসতে না পেয়ে মহারাজের কাছে বড়ই অপরাধিনী হয়েছি।

রাজা। সুন্দরী, না না, ওকথা বলো না। তোমার অদর্শনে যে মহাদুঃখ ছিল, আজ তা পরম সুখের কারণ হয়েছে, তখনকার সেই নীরস জগৎ আজ রসে ভরপুর বলে মনে হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে যারা তপ্ত

তাদের পক্ষেই তরুর শীতল ছায়া অধিকতর তৃপ্তির কারণ হয়।

বিদূষক। ওগো ঠাকরুণ, সায়ংকালের রমণীয় চন্দ্রকিরণ ত অনেক ভোগ করলে, এখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে হত না ?

রাজা। ঠিক বলেছ ভাই। তোমার সখীকে ঘরে ঢোকবার পথটা দেখিয়ে দাও।

বিদূষক। এইদিকে, এইদিকে সখী। (সকলের ঘরের মধ্যে প্রবেশ)

রাজা। সুন্দরী, এখন আমার এই একটি প্রার্থনা।

উর্বশী। কি অভিলাষ প্রিয়তম ?

রাজা। শোন প্রিয়ে, যখন তোমাকে না পেয়ে সাধ মেটাতে পারিনি, তখন তিনটি প্রহর নিয়ে যে রাত্রি, তা তিনশত প্রহরের রাত্রি বলে মনে হত। সেই বিরহের রাত্রি কিছুতেই পোহাতে চাইত না। আজ তোমাকে পেয়েছি, আজ এই মিলনের রাত্রিটা যদি তাড়াতাড়ি প্রভাত না হয়ে সেই বিরহকালের রাত্রির মত দীর্ঘতম হয় তাহলে কিন্তু আমি কৃত-কৃতার্থ হই।

চতুর্থ অঙ্ক

(সহকন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচিকা আক্ষিপ্তনামিকা গীত নেপথ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। উর্বশীর বিরহে ব্যথিতহৃদয়া সহকন্যা চিত্রলেখাকে নিয়ে স্বর্গের এক সরোবরতীরে উপস্থিত হয়ে বিলাপ করছে। সেই সরোবরে সৌরকরস্পর্শে শতসহস্র কমল বিকশিত, আর তারই সম্মুখভাগে বিষাদগ্রস্তা চিত্রলেখা উপস্থিত। আলো অন্ধকারের মিশ্রণ)

চিত্রলেখা ও সহকন্যার প্রবেশ

চিত্রলেখা। দ্বিপাদিকা নামক তাললয়যুক্ত গানবিশেষ গাইতে গাইতে সরোবরবক্ষে হংসীযুগলের কি দুঃখের অবস্থা। সহচরীর দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে তাদের বুক। নয়নে অশ্রুধারা। দুই হংসীর মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রণয় আজ দুঃখভারে ক্লিষ্ট।

সহকন্যা। (খেদের সঙ্গে) সখী চিত্রলেখা, মলিন পদ্মজলের মত

তোর মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। হৃদয়ের দুঃখ ফেটে বার হচ্ছে। তোর দুঃখের কথাটা খুলে বল ত, যদি তার একটু অংশ নিতে পারি।

চিত্রলেখা। সখী জান ত, অপ্সরাদের পালাক্রমে সূর্যদেবের সেবা করতে হয়, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তবে উর্বশীর কোন সংবাদ না পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন আছি।

সহকন্যা। জানি সখী জানি—তোমাদের হৃদয়ের গাঢ়তা কতখানি। তারপর ?

চিত্রলেখা। তারপর ভাবলাম, এতদিনে আবার নতুন কিছু ঘটল নাকি ? তাই বসে ধ্যানযোগে যা বুঝলাম, তাতে আত্মা উড়ে যায়। ঘোর বিপদ ঘটেছে।

সহকন্যা। ব্যাপার কি, খুলেই বল না।

চিত্রলেখা। (অতি কাতরভাবে) উর্বশী রাজাকে দিয়ে মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দেওয়ানোর পর রাজাকে নিয়ে কৈলাসপর্বতের গন্ধমাদন-বনে বিহার করতে গিয়েছিল।

সহকন্যা। সখী, সে বনের তুলনা নেই। সম্ভোগ যদি বল, সব আছে সেইখানে। বিহারের যোগ্য অমন উদ্যান আর হয় না। তারপর ?

চিত্রলেখা। সেখানে মন্দাকিনীর তীরে বালি দিয়ে পাহাড় তৈরী করে উদয়বতী নামে এক বিদ্যাধর কন্যা খেলা করছিল। রাজা পুরূরবা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তা দেখে দারুণ রেগে যায় উর্বশী।

সহকন্যা। উর্বশী বড়ই অসহিষ্ণু, আবার রাজার উপর তার টানও অপরিসীম। সবই ভাগ্য। তারপর ?

চিত্রলেখা। তারপর রাজা কত হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু কিছুই না মেনে সে কুমারবনে ঢুকল। সুসম্পর্ক-বর্জনকারী কুমার কার্তিকেয়ের বনে যে ঢুকতে নেই তা উর্বশীও জানত। কিন্তু গুরুদেব ভরতমুনির অভিশাপে ত তার দেবত্ব ছিল না, একেবারে মর্ত্যমানবীর মত হয়ে গিয়েছিল। তাই এই সর্বনাশ ঘটল। বনে

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে একটি সামান্য বনলতায় পরিণত হয়ে সেখানেই রয়ে গেল। কোথায় গেল তার অত রূপ।

সহকন্যা। বিধির বিধান কে এড়াতে পারে? তা না হলে ঐরূপ প্রণয়ের কিনা এই পরিণাম হয়? তারপর?

চিত্রলেখা। তারপর সেই রাজাও 'কোথায় প্রিয়া, কোথায় প্রিয়া' বলে উর্বশীকে এখানে সেখানে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। দিনরাত সেই জনহীন বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। তার উপর আবার নবমেঘ দেখা দিল। এসময় হৃদয়ে যার কোন অভাব নেই, সেও যেন কেমন হয়ে ওঠে আর যার হৃদয় বিরহানলে পুড়ছে তার যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটবে তা ভাবতেও প্রাণ কাঁপে। অথচ প্রতিকারের কোন পথই দেখছি না।

(জম্ভালিকা গান)

প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হংসীযুগল আজ সঙ্গিনীর দুঃখে কাতরা হয়ে সরোবরে অবিরাম অশ্রুবিসর্জন করছে। তাদের দুঃখে কোন সান্ত্বনা নেই।

সহকন্যা। সখী, মিলনের কি কোন উপায় নেই?

চিত্রলেখা। গৌরীদেবীর চরণরঞ্জনকালে সঙ্গমমণি নামে একটা মণি চরণগলিত অলক্তবিম্ব হতে উৎপন্ন হয়েছিল। সেই মণি ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নেই।

সহকন্যা। তেমন অপাপসুন্দর যাঁদের আকৃতি, তারা বেশীদিন কষ্টভোগ করেন না। সুতরাং নিশ্চয়ই বিধাতার অনুগ্রহে সমাগমের একটা উপায় হবেই হবে। চল, উদয়াচলগতি সূর্যদেবের পরিচর্যা করিগে।

(খণ্ডধারা গান)

সতত চিন্তায় ব্যাকুলা হংসী সহচরীর দর্শনলাভের আশায় উৎসুক হয়ে প্রস্ফুটিত কমলশোভিত সরোবরে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। (প্রস্থান)

(নেপথ্য হতে পুরূরবার প্রবেশসূচিকা আক্ষিপ্তকাগীতি)

আজ যূথপতি মাতঙ্গরাজ প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত হয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করছেন। তরুলতার ফুল ও পল্লবে দেহ আচ্ছাদিত করে মাথায় এক-রাশি লতা, ফুল, পল্লব নিয়ে ঐ তিনি আসছেন।

আকাশের দিকে উদাসভাবে চাইতে চাইতে উন্মত্ত রাজার প্রবেশ

রাজা। (ক্রোধভরে) অরে পাপিষ্ঠ রাক্ষস, দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় যাবি আমার প্রেয়সীকে নিয়ে? (দেখে) পর্বতশীর্ষ হতে আকাশে উঠে আমাকে বাণাঘাত করা হচ্ছে? (ঢিল নিয়ে মারতে ছুটলেন। পরে আবার দ্বিপাদিকা গানের সঙ্গে দশদিক দেখতে লাগলেন)

রাজা। (প্রিয়ার দুঃখে কাতর হয়ে ব্যাধের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে দেখতে হতভাগ্য হংস যুবা রাজা স্বয়ং সরোবরে ডানা নাড়ছে। (একটু বুঝতে পেরে কাতরভাবে) ছিঃ কি পাগল আমি—এই যে নবীন মেঘ সাজগোজ করে আকাশে দেখা দিয়েছে, এ ত গর্বিত রাক্ষস নয়। আর এই যে ধনু তাও ত রাক্ষসদের শরাসন বা বাণ নয়, তা ইন্দ্রধনু। যাকে ব্যাধ ভেবেছিলাম, সে ত ব্যাধ নয়, নবজলধারাপাত। আর ঐ যে চঞ্চলরূপ আমার প্রিয়া উর্বশী বলে যা ভেবেছিলাম সে ত বিদ্যুৎ, আমার প্রিয়া নয়। (মূর্চ্ছা ও পতন। পুনরায় দ্বিপাদিকা গান ধরে উঠলেন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন) আমি ভেবেছিলাম, আমার মৃগাক্ষীকে কোন দৈত্য বুঝি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি তা নয়, নবীন বিদ্যুতে শোভিত হয়ে শ্যাম জলধর ধারা বর্ষণ করছে।

(একটু কাতরভাবে চিন্তা করে) কোথায় গেল আমার প্রাণপ্রতিমা? সে কি ক্রোধভরে দৈবশক্তিকে আত্মগোপন করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে? না, সে বেশীক্ষণ রাগ করে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবে কি স্বর্গে ফিরে গেল? না, সে ত সম্ভব নয়। তার হৃদয়খানি আমাকেই সঁপে দিয়েছে। সে যে আমাকে বড় ভালবাসে। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ দেবশত্রু দানবরা আমার সামনে থেকে তাকে হরণ করা ত দূরের কথা, হরণের চিন্তাও করতে পারে না। হায়, আমার প্রিয়তমা কোথায় গেল? চোখের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়েছে যে তার ছায়াও দেখতে পাচ্ছি না। কি ব্যাপার! (আবার গান এবং চারদিকে চেয়ে সজলনয়নে)

হায়, কপাল যাদের মন্দ, তাদের একটা দুঃখ যায় আর দশটা দুঃখকে তারা টেনে আনে। আজ একসময়ে দুটো দুঃখের উদয় হলো—প্রিয়তমা উর্বশীর বিরহ যা সহ্য করার মত শক্তি আমার নেই, আবার এই নব জলধরের আবির্ভাব যার ফলে দিনের অসহ্য তাপ দূর হয়েছে। দিবস-ভাগ পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অথচ তা অতিশয় অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

(পরে গুর্জরীসংজ্ঞক গান ও নৃত্যের সঙ্গে) নিরন্তর জলধারা-বর্ষণকালে দশদিক যেন রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সেই রসে তোমারও মনোহারিতা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আজ্ঞা করছি, কেন এত বাড়াবাড়ি ? রাগ যদি করেই থাক তবে ক্রোধ সংবরণ কবো। আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেও যদি আমার প্রিয়াকে পাই তাহলে তখন যা চাও ক'রো। এখন কিছুদিনের জন্য থাম। (একটু হেসে) আমার মনের যাতনা বৃদ্ধির কারণ এই জলধরকে আমি বৃথাই উপেক্ষা করছি। কারণ মুনিরা বলেন, রাজার কালের কারণ নেই। তা যদি হয় তবে কেন এই বর্ষাকালকে অন্য কালে পরিণত করব না ? (চর্চরীগান ও নৃত্য) বাঃ, বাঃ, কল্পতরু কি সুন্দর নৃত্যই না করছে। কুসুমগন্ধে উন্মত্ত হয়ে ভ্রমরপঙক্তি গান ধরেছে। কোকিলরা যেন তৌর্যত্রিক বাসনে নিযুক্ত হয়েছে। পল্লবগুলি বর্ষার অগ্রসরবায়ুভরে নৃত্য করছে। মনে হচ্ছে কল্পতরু কত রঙ্গেই নর্তনমত্ত হয়ে উঠেছে। তবে আমিও একটু নাচি। (নৃত্য) বাঃ এমন সুন্দর বর্ষাকালকে তাড়ানো যাবে না। কারণ আমি হলাম রাজা আর এই বর্ষাকালের বস্তুগুলিই হলো আমার রাজোচিত আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ও আভরণ।

কি করে ? তবে শোন। (হেসে আবার গান) বিদ্যুতের রশ্মিরূপ কনকসূত্রের দ্বারা গ্রথিত মেঘের চন্দ্রাতপ আমার মাথার উপর শোভা পাচ্ছে। আর বর্ষাগমে বেতসলতার মঞ্জরীগুলি চামরের কাজ করছে। নিদাঘের অবসানে ময়ূরগণ স্তুতিপাঠকের মত আমার বন্দনাগান গাইছে। আর ঐ নবজলধরমণ্ডলী অজস্রধারাপাতরূপ দ্রব্য সম্ভারের আমদানী করে ণিকের কাজ করছে। (আবার চর্চরীগান ও নৃত্য)

অবস্থা যাই হোক না, এই বৃথা রাজপরিচ্ছদের গর্বে লাভ কি? এখন বনমধ্যে প্রিয়তমাকে খোঁজা যাক। (মুখে মুখে বাজনা বাজাতে বাজাতে 'ভিন্নক' রাগে আলাপ করতে লাগলেন)

(দয়িতার বিরহে অতিশয় দুঃখিত, বিষণ্ণচিত্ত ও অত্যন্ত মন্থরগতি গজযূথপতি আজ কুসুমশোভিত পর্বতবনমধ্যে চলাফেরা করতে পারছেন না। (পরে দ্বিপাদিকা নৃত্যের সঙ্গে ও গানের সঙ্গে একটু এগিয়ে আনন্দের সঙ্গে) বাঃ বাঃ, আজ যেমন খুঁজতে আরম্ভ করলাম, অমনিই সমস্ত কিছু আমার উৎসাহবৃদ্ধির হেতু হয়ে দাঁড়াল। কারণ এই যে বর্ষার নববারিপাতে ভূগর্ভ হতে রক্তবর্ণ নবকন্দলী কুসুম উদ্‌গত হয়েছে আর তার মধ্যে জলবিন্দু শোভা পাচ্ছে তা দেখে আমার প্রিয়ার সেই ক্রোধারক্ত সজলনয়নের ছবি মনে পড়ছে।

এই দিকে কি প্রিয়া গেছে? কি করেই বা ঠিক করি? সেই শোভ-নাঙ্গী উর্বশীর পাদস্পর্শ যদি বসুমতী লাভ করত তাহলে নিশ্চয় বনস্থলীর ঐ বালুকারাশির উপর তার পায়ের চিহ্ন অবশ্যই পড়ত। কারণ একে নববারিসম্পাতে ঐ বালুকারাশি সিক্ত, তাতে আবার আমার প্রিয়া গুরু নিতম্ববতী। তাই মনে হয়, তার পদচিহ্ন নিশ্চয় দেখা যেত। (দ্বিপাদিকার গান করতে দেখে আনন্দের সঙ্গে) এইবার ধরেছি, ক্রোধে অন্ধ হয়ে পালাবার পথ এতক্ষণে পেয়েছি। রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রিয়া যখন চলে গিয়েছিল তখন নিশ্চয় তার স্তনের এই কাঞ্চীদাম বা কাঁচুলি খসে পড়ে থাকবে। কারণ সেই নতনাভি সুন্দরীর অশ্রুবিন্দু অধরে পড়ায় অধরের রাগে তাও নীল হয়ে গিয়েছিল আর সেইজন্যই এই স্তনাংশকে নীল লাল বিন্দু বিন্দু চিহ্ন এবং শুকপাখির উদর রোমাবলীর মত সুকোমল। এ নিশ্চয় তার স্তনাবরণবস্ত্র। আচ্ছা এইটাই গ্রহণ করি (একটু এগিয়ে দেখে সজল নয়নে) দূর ছাই, ভাবলাম এক আর হলো আর এক। এ যে ইন্দ্রতৃণের সঙ্গে অচিরোদ্‌গত দূর্বারাজি। তবে উপায়? কি করে এই গহনবনে প্রিয়ার সন্ধান পাই? (দেখে) ঐ যে নবজলসম্পাতে মার্জিত ও স্নাত পর্বততটে আরোহণ করে নীলকণ্ঠ ময়ূর জলধরের দিকে

তাকিয়ে আছে আর প্রবল প্রতিকূল বাতাসে তার শিখন্ডী কেমন নাচছে। (কাছে গিয়ে) আচ্ছা একে জিজ্ঞাসা করা যাক্। (পরে খন্ডক নামক নৃত্যের সঙ্গে গান)

হায়, প্রিয়তমার দর্শনলালসায় অতিকাতর মাতঙ্গরাজ বিষাদখিন্ন ও বিস্মিত হৃদয়ে উপস্থিত হয়েছে। (আবার খণ্ডক ও চর্চরী) হে ময়ূররাজ, সাদরে ও সসম্মানে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করছি, বল, এই বনে ভ্রমণ করার সময় আমার সেই হৃদয়হারিণীকে কি দেখেছ? সে দেখতে কেমন তা শোন। রাজহংসের মত তার গমন, চাঁদের মত তার মুখ—এই দেখলেই বুঝবে যে সে-ই আমার প্রিয়তমা। (চর্চরিকা-সহযোগে উপবেশন ও অঞ্জলিবন্ধ হাতে) হে নীলকন্ঠ, হে শুক্লাপাঙ্গ, আমার হৃদয়ের উৎকণ্ঠারূপিণী সেই উর্বশী তোমারই মত দীর্ঘ অপাঙ্গ-যুক্তা। একবার সে রূপ দেখলে আর কিছু দেখতে সাধ যায় না। তাকে তুমি দেখেছ ভাই? (দেখে) কি? আমার কথার জবাব না দিয়েই নাচতে শুরু করল? এতে এত আনন্দের কারণ কি? (একটু চিন্তা করে) ও, বুঝেছি, আমার প্রিয়তমার ঘনচারু কেশপাশ যখন মৃদু বাতাসে এদিকে ওদিক পড়ত তখন কি শোভাই না হত। আজ সেই চাঁচর চিকুর নেই, তাই ঐ ময়ূর চিরদিনের মত তার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে হারিয়েছে বলেই তার এত আনন্দ। আমার প্রিয়তমা যখন রতিক্লান্ত হয়ে পড়ত আর তার শিথিল কবরীর কুসুমমণ্ডিত কেশপাশ চারদিকে এলিয়ে পড়ত, তখন তার সেই কেশকলাপের ত্রিসীমানাতেও কি এই হতভাগ্য ময়ূর আসতে পারত? কখনই পারত না।

যাক পরের দুঃখে যে সুখ পায় তেমন পাষণ্ডকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করব না। (দ্বিপাদিকাযোগে দেখে) আতপতাপে মত্ততা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কোকিলবধূ জামগাছের ডালে বসে আছে। পাখিদের মধ্যে এই কোকিলজাতি বড়ই নাকি পণ্ডিত। আচ্ছা একেই জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক। (খুরক নৃত্য ও গান)

গজরাজ আকাশচুম্বী কলেবরে বিদ্যাধরগণের বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হৃদয়নিহিত দুঃখে তার নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ এবং

তার হৃদয়ের আনন্দ আজ কোথায় অন্তর্হিত।

হে পরভৃতে, মধুরভাষিণী, ও আমার হৃদয়হারিণী, নন্দনবনে ভ্রমণরতা আমার প্রিয়তমা উর্বশীকে যদি দেখে থাক তবে বল। আমি আর তার বিরহ সহ্য করতে পারছি না।

(নেচে নেচে বলান্তিযোগে একটু এগিয়ে দুই জানুতে ভর করে) ওগো কোকিলবধূ, কামীরা তোমাকে মদনের দূতী বলে থাকেন। অভিমানভঙ্গে তোমার মত অব্যর্থ অস্ত্র আর নেই। তাই আমার নিবেদন, আমার সেই অভিমানিনী প্রিয়াকে আমার কাছে নিয়ে এস, না হয়, হে মঞ্জুভাষিণী, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। (বাঁদিক শূন্যে একটু ঝুঁকে) ওগো, কি বলছ ? যদি আমি এত অনুরক্ত তাহলে সে আমাকে ফেলে চলে গেল কেন ? তাহলে শোন। সে অনেক রাগ রঙ্গ করত, কিন্তু জীবনে আমি তার উপর রাগ করেছি বলে মনে পড়ে না। দয়িতদের উপর দয়িতাদের এতই অপরিসীম প্রভূত্ব যে এক আধটু ত্রুটিবিচ্যুতিও সহ্য করে না তারা। তখনই সব প্রেম খসে পড়ে তাদের হৃদয় হতে।

(সম্ভ্রমের সঙ্গে উপবেশন করে দুই জানুতে ভর দিয়ে চারদিকে চেয়ে) আমার কথাটা শেষ হবার আগেই কোকিলা নিজের কাজে লেগে গেল ! হায়রে, পরের তাপ যত বেশীই হোক না, অন্যের কাছে তা শীতল—ও কথাটা খাঁটি সত্য। আমি ঘোর বিপন্ন, কত ভাল করে তোষামোদ করলাম। কিন্তু সে কিছুই শুনল না। তাতে কোন গুরুত্ব না দিয়ে এই কোকিলা প্রিয়তমের অধরের মত অচিরপক্ক জম্বুফল খেতে শুরু করল। তা করুক, আমার প্রিয়তমা উর্বশীর মতই ও মধুর-ভাষিণী, তাই ওর শত অপরাধেও রাগ করব না ওর উপর। ও সুখে থাক, আমি নিজের কাজে যাই (দ্বিপাদিকাসহযোগে এগিয়ে গিয়ে উক্তি) বনের দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণক্ষেপসূচক নূপুরের ধ্বনি হচ্ছে না ? ঐ দিকেই যাওয়া যাক।

প্রিয়তমার বিরহে ম্লানমুখ, অশ্রুপ্লুতনয়ন, দুঃসহ দুঃখভারে ধীরগতিসম্পন্ন, বিরহের প্রবলতাপে জর্জরিতকলেবর গজরাজ আজ

একাকী অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে গিরিকন্দরের কাননমধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(একটু এগিয়ে গিয়ে দ্বিপাদিকাসহযোগে চারদিকে চেয়ে) আজ করিরাজ তার প্রিয়তমা করিণীকে হারিয়ে দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ হচ্ছে। নয়ন তার সতত জলপূর্ণ। মন তার ব্যথায় ক্লান্ত, হতভাগ্য আজ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। (অতিদুঃখে) হায় রে কষ্ট! দিকমন্ডল মেঘমেদুর দেখে রাজহংসগুলি মানসসরোবর গমনে উৎসুক হয়ে কূজন করছে। তা ত প্রিয়ার নূপুরশিঞ্জা নয়।

(উঠে) তা হোক। যতক্ষণ ঐ রাজহংসকুল সরোবরে যাবার জন্য সরসীবক্ষ হতে উড্ডীন না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রিয়ার সংবাদ ওদের কাছ থেকে জেনে নিই। (বলন্তিকানামক নৃত্যসহযোগে নিকটে গিয়ে) হে জলপক্ষীদের সম্রাট, একটু পরেই না হয় মানসসরোবরে গমন করো এবং মুখের ঐ মৃণালপাথেয় তুলে নিও। এখন ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করো। আমাকে রক্ষা করো। আমার দয়িতার সংবাদ দানে অপার শোকসাগর হতে উদ্ধার করো আমাকে। জান ত নিজের কাজের চেয়ে সজ্জনবৃন্দের বন্ধুবান্ধবদের কাজ গুরুতর।

(মাথা উঁচু করে চেয়ে) ও! যখন উঁচু দিকে তাকাচ্ছে, তখন বুঝেছি মানসে যাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত, তাই লক্ষ্য করিনি, ও এই বলছে।

(বসে বসে নৃত্য ও গান) ওরে হাঁস, গোপন করিস কেন? (নাচতে নাচতে উঠে) ওহে হংসরাজ, চালাকির জায়গা নয়, আমার সেই নতভ্রূ প্রিয়তমা যদি এই সরোবরে তোমার চোখে না পড়ে থাকবে তবে সেই মন্হরগমনার গতিভঙ্গি তুই পেলি কিকরে? গতি দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। (চর্চরীগীতসহযোগে নিকটে গিয়ে হাতজোড় করে) ভাই হংস, আমার প্রিয়াকে আর গোপন রাখ কেন? ফিরিয়ে দাও। তার গতিভঙ্গি যখন চুরি করেছ তখন আইন অনুসারে প্রিয়াকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। হে গতিলালস হংস, সেই জঘনভারে মন্হরগমনা প্রিয়াকে তোমার দেখবার একটা লক্ষণ এই যে—তুমি এই গমনভঙ্গি কোথায় শিখলে? তাই বলি তাকে ফিরিয়ে দাও। (দ্বিপাদিকাগীতসহযোগে দেখে হেসে)

চোরের শাস্তিদাতা রাজা এই ভেবেই উড়ে পালাল। যাক, অন্য একটা উপায় দেখা যাক। (একটু এগিয়ে দেখে) বাঃ, প্রিয়ার সঙ্গে চক্রবাক দাঁড়িয়ে আছে। একেই জিজ্ঞাসা করা যাক। (কুটিলিকা নৃত্যগীত)

মর্মর শব্দে অনুরণিত, মনোহর, কুসুমমণ্ডিত তরুরাজির পল্লবে শোভিত, বনমধ্যে প্রিয়া বিরহে উন্মত্ত গজরাজ ভ্রমণ করছে।

হে গোরোচনাসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ চক্রবাক, বসন্তবাসরে প্রিয়তমা আমার খেলা করছিল। সেই নারীকুলধন্যা প্রিয়তমাকে কি দেখবি? (চর্চরিকা-যোগে এগিয়ে দুই জানুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) হে চক্রবাক, রথচক্রতুল্য বর্তুলনিতম্বা উর্বশী আমায় ছেড়ে গেছে। শত সহস্র আশা আকাঙ্খায় উদ্বেলিত হয়ে আমি তোমাকে তার সন্ধান জিজ্ঞাসা করছি। আমি রথী। আমাকে আবার কে? 'কে' বলে জিজ্ঞাসা করছে? আমাকে চেনে না কে এমন আছে? তবে শোন, সূর্য এবং চন্দ্র যথাক্রমে যার মাতামহ ও পিতামহ, উর্বশী এবং পৃথিবী যাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেছে, আমি সেই পুরুরবা। এখন যে আর কথা নেই। চুপ একেবারে (জানুতে ভর দিয়ে) নিজের মত সকলকেই ভাবা উচিত। কেন না, হে চক্রবাক, যখন সরোবরে পদ্মপত্রে তোমার প্রিয়া পা ঢাকা দেয় তখন কোথায় গেল ভেবে কি কান্নাই কেঁদে থাক। প্রেমবশতঃ প্রিয়ার সঙ্গে তিলার্ধকালও পৃথক থাকতে চাও না কিন্তু আমার এই শোচনীয় দশায় তোমার কি এমন নির্দয়তা শোভা পায়?

(বসে) এ সমস্তই দেখছি আমার দুরদৃষ্টের ফল। (দ্বিপাদিকার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে) আহা, ঐ পদ্মের মধ্যে একটা ভ্রমর আটকা পড়ে গুঞ্জন করছে। শুনতে কি মধুর যখন আমি তার অধরসুধা পান করতাম তখন তার মুখের মধ্যেও এমনি শীৎকারধ্বনি উত্থিত হয়ে আকুল করত আমাকে। এই কমলসেবাপরায়ণ ভ্রমরের সঙ্গে একটু ভাব করে দেখা যাক। তাতে হয়ত পরে অনুতাপ করতে নাও হতে পারে! (এর পর অর্ধচতুরশ্রক গান)

একক্রমে যার প্রেমরস কেবল বেড়েই গেছে, এখন প্রিয়ার বিরহে *অধীর হয়ে কামাতুর সেই হংসযুবা সরোবরে ক্রীড়া করছে।*

(গান শেষে বসে যুক্ত করে) হে মধুকর। সেই মত্ত খঞ্জনয়নার কোন খবর রাখ কি ? সেই বরাঙ্গী উর্বশীকে কি দেখলে ? যদি তার মুখের সৌরভের একটি ভগ্নাংশও তুমি ভোগ করতে পেতে তাহলে কি এই পদ্মের গন্ধে মন বসত ? কখনই নয়।

(এগিয়ে গিয়ে দেখে) ঐ যে নাগাধিরাজ প্রিয়তমা করিণীকে নিয়ে কদম্বতরুর স্কন্ধে মাথা ঠেকিয়ে সুখে ঝিমোচ্ছেন। একেই জিজ্ঞাসা করা যাক। (কুটিলিকা গান) প্রিয়া হস্তিনীর বিরহে সন্তপ্ত করী মদগন্ধে মধুকরকুলকে উন্মত্ত করে কাননে কাননে বিচরণ করছে।

(দেখে) না, এটা ঠিক দেখা করার সময় নয়। কারণ তার প্রিয়তমা শুণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে একটি শল্লহীতরুর পল্লবযুক্ত শাখা ভেঙ্গে তার মুখের কাছে তুলে ধরেছে। কি সুন্দর মদ্যগন্ধ বার হচ্ছে। তা একটু লেহন করুক, পরে কাছে যাব। (দেখে) এই আহার হয়ে গেছে। তবে কাছে গিয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করি। (চর্চরী গান) হে গজরাজ, তুমি ললিত প্রহারে তরুবরকে ধ্বংস করেছ। এখন জিজ্ঞাসা করি, যিনি নিজকান্তিতে চন্দ্রকেও মলিন করেছেন, সেই আমার মোহিনী প্রিয়তমার সন্ধান জান কি ? (পা দুখানি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে) হে গজদলপতি, মদমত্ত যুবতীদের মধ্যে যিনি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, যূথিকাকুসুমদামে যাঁর কেশকলাপ শোভিত, সেই স্থিরযৌবনশালিনী, প্রিয়দর্শিনী আমার প্রিয়তমাকে দেখেছ কি ?

(সানন্দে শ্রবণ করে) বাঃ, আমার প্রিয়ার সংবাদ এই গজরাজ জানেন, তাই জলদগম্ভীর কণ্ঠগর্জনের দ্বারা আমাকে আশ্বাসিত করছেন। হে গজরাজ, তুমি ও আমি উভয়ের অবস্থা একই রকম, তাই তোমার উপর আমার এত ভালবাসা। কারণ সবাই আমাকে রাজকুলের রাজা বলে, আর তুমিও নাগকুলের অধিরাজ। তোমার দানবারি সতত অব্যাহত-ভাবে ক্ষরিত হয় আর আমারও দানধ্যান সতত অব্যাহত। নারীকুলের রত্নরাজির মধ্যে আমার প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা আর এই দলের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়া করিণী তোমার প্রিয়তমা। হে মাতঙ্গরাজ, তোমার সমস্তই আমার মত। কিন্তু ভাই, আমার মত প্রিয়াবিরহবেদনায় তোমাকে যেন

কখনো ভুগতে না হয়। তোমরা সুখে থাক।

(দ্বিপাদিকাযোগে এগিয়ে দেখে) আহা, এই সেই পর্বত যার গুহাগুলি সতত সৌরভপূর্ণ বলে তার নাম সুরভিকন্দর। এই পর্বত অপ্সরাদের বড়ই প্রিয়। এই পর্বতের উপত্যকায় কি তাকে পাব? (একটু এগিয়ে) ওঃ, কি ভীষণ অন্ধকার। বিদ্যুৎ ঝলসালে দেখে নেব এখন। কিন্তু কি অদৃষ্ট। আমার কপালদোষে আজ মেঘেও বিদ্যুৎ নেই। তা হোক, তবু এই পর্বতকে জিজ্ঞাসা না করে কিছুতেই আমি ফিরে যাব না।

নিবিড় বনমধ্যে বরাহরাজ (পুরুরবা) তীক্ষ্ম ক্ষুরদ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করে অবিচলিতভাবে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে উদ্যত হয়ে বিচরণ করছে।

হে বিপুলনিতম্বশালী পর্বত, সেই পীনস্তনী, সন্নতাক্ষী, নবযৌবনশালিনী ও নিতম্বিনী উর্বশী কি তোমার কোন বনে আশ্রয় নিয়েছেন? কি চুপ করে রইলে কেন? বোধহয় দূর থেকে শুনতে পায়নি। বেশ কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করা যাক।

(চর্চরীসহযোগে) হে স্ফটিকশিলাতলনির্মলনির্ঝরশালী, কুসুমালঙ্কৃতশীর্ষ, কিন্নরসঙ্গীত মনোহর মহীধর, আমার প্রিয়তমাকে দেখাও। (কাছে গিয়ে যুক্ত করে) হে সর্বপর্বতকুলনাথ, তুমি কি এই রমণীয় বনমধ্যে আমার দ্বারা বিরহিতা সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখেছ? (নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনে সানন্দে) ঠিক আমারই উক্তির অনুরূপ 'দেখেছি' বলল। ভাল, একবার দেখাই যাক না। (চারদিকে দেখে দুঃখের সঙ্গে) এ যে দেখছি আমারই স্বর গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত। (বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে উঠে বিষণ্ন হয়ে) আর ত পারি না। শরীর বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। যাই, ঐ গিরিনির্ঝরিণীর তীরে গিয়ে একটু তরঙ্গশীতল বায়ু সেবন করি।

(এগিয়ে ও দেখে) অহো, আজ এই নবজলকলুষা স্রোতস্বিনীকে দেখে আমার কত কি ভাবের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বুঝি আমার প্রিয়তমা রোষবশে এই নদীর রূপ ধরে বয়ে যাচ্ছে। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি তার ভ্রূকম্পনতুল্য, আর নদীবক্ষের ঐ চঞ্চল বিহগশ্রেণী যে

মধুর শব্দ করছে তা যেন প্রিয়ার রুনুঝুনু শিঞ্জাশালিনী মেখলা। আর ঐ যে ফেণপুঞ্জ এদিক ওদিক সরে সরে যাচ্ছে, তা যেন তার শ্বেতবস্ত্র যা তার ক্রোধকম্পিত অঙ্গ থেকে স্খলিত হচ্ছে আর সে টেনে টেনে ধরছে। উপলখণ্ডে প্রতিহত হতে হতে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মনে হয় আমার সেই প্রিয়াই যেন রাগে যেতে যেতে পায়ে ঠক্কর খাচ্ছে। নিশ্চয় সেই অসহিষ্ণু উর্বশী আজ এই নদীরূপে পরিণত হয়েছে।

হে ক্ষুব্ধকরুণকূজিত বিহঙ্গমে, সুরসরিৎ-তীরসমুৎসুক হরিণী, সুরনদীরূপিণী প্রিয়তমে উর্বশী, অভিমান ত্যাগ করো। (কুটিলিকার পর চর্চরগান)

জলনিধিনাথ বরুণ (পুরূরবা) পূর্বদিক হতে প্রবাহিত পবনাঘাতে উদ্‌গত তরঙ্গরূপে বাহু উত্তোলন করে ললিতভাবে মেঘরূপে নৃত্য করছেন। হংস, চক্রবাক, শঙ্খ, কুসুম প্রভৃতি আভরণে শোভিত জলনিধিনাথ হস্তী মকর প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত কৃষ্ণকমলরূপ উত্তরীয় নিয়ে নবীন মেঘমালা করে যেন দশদিক আচ্ছন্ন করে গগনতটে উদিত হয়েছেন। বেলাভূমিতে জলরাশির আঘাতশব্দে মনে হয় যেন করতালি দিচ্ছেন।

(চর্চরগান শেষে) ভাল, একটু যোগাযোগ করে দেখি। (কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে) অয়ি মালিনী, আমি ত তোমা ছাড়া জানি না। কোনদিন স্বপ্নেও তোমার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিনি, তবে আর কোন অপরাধে তুমি তোমার এই দাসানুদাসকে ত্যাগ করে ছুটে চলেছ।

কি, চুপ করে রইলে কেন? না ভুল হয়েছে, সত্যই এ একটা নদী, আমার উর্বশী নয়। তা না হলে পুরূরবাকে উপেক্ষা করে সমুদ্রের নিকট অভিসারিণী হবে কেন? বিনা লাঞ্ছনায়, শতসহস্র যন্ত্রণা ছাড়া কে কোথায় অভিপ্রেত মঙ্গল লাভ করতে পারে? আচ্ছা, যেখানেই যাই সেখানে প্রেয়সী আমার চোখের আড়াল হয়ে লুকিয়েছে। (এগিয়ে গিয়ে) আচ্ছা, ঐ যে হরিণটা শুয়ে আছে, ওকেই প্রিয়তমার খবরটা জিজ্ঞাসা করি।

আজ নন্দনবনের পারিজাত কেমন নবপ্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক ধারণ করেছে, তার তলদেশ মদমত্ত কোকিলের কুহুরব ও মধুকরের গুঞ্জনে

মুখরিত। সেখানে ঐরাবত গজপতি (পুরূরবা) নিজপ্রিয়া করিণীর বিরহানলে সন্তপ্ত হয়ে বিষণ্নমনে বিচরণ করছে।

(ললিতনামক অভিনয় শেষে নতজানু হয়ে বসে) বাঃ, এই যে নয়নরঞ্জিনী কৃষ্ণসারের ছবি। তা দেখে মনে হচ্ছে, কাননের অধিষ্ঠাত্রী শোভাদেবী, নবীন ঘাসসমূহের স্নিগ্ধমূর্তি দর্শনের জন্য যেন কটাক্ষপাত করছেন।

(দেখে) এই হরিণ নিজ প্রিয়া হরিণীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, দেখছে যে এখন আর মিলনের আশা নেই। হরিণী তার দিকে আসছিল, কিন্তু শাবককে স্তন্যদান করতে গিয়ে আটকে পড়েছে।

(চর্চরীগান শেষে) ভাই মৃগ, একবার আমার দিকে তাকাও, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখেছ ? যদি দেখে থাক তাহলে তার সংবাদ দান করে আমাকে অগাধ বিরহসমুদ্র হতে উদ্ধার করো। তাকে তুমি অবশ্যই চিনতে পারবে, কারণ সে সাধারণ রমণীর মত নয়। সে স্বর্গের অপ্সরা, জঘনভারে মন্থরগমনা, পীনোন্নত পয়োধরা। এখনো তার যৌবন চলে যায়নি, শরীর ক্ষীণ, হংসের মত অলসগতি, তোমার প্রিয়ার মতই তার চোখ, এই গগনশ্যামল কাননভূমিতে বিচরণ করছিল। হঠাৎ আর দেখতে পেলাম না।

(কাছে গিয়ে করযোড়ে) হে হরিণীবল্লভ, তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে এই বনের মধ্যে কোথাও দেখেছ ? শোন তার লক্ষণ, তোমার ঐ হরিণীর নয়ন যেমন আকর্ণবিস্তৃত, আমার সেই সুন্দরীর নয়নও ঠিক তেমনি কর্ণান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কি, আমার কথায় কান না দিয়ে তার প্রিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল ! বিধাতা নির্দয় হলে সকলেই ঘৃণা করে—কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। যাক, অন্যত্র যাই।

(ঘুরে ঘুরে) হায়রে, এতক্ষণে হয়ত প্রিয়তমার অন্তর্ধানের পথের চিহ্ন মিলল। এই সেই লোহিত কদম্বতরু প্রিয়া আমার নিদাঘশেষে যার অপ্রস্ফুটিতকেশর কদমফুল মাথায় অলঙ্কার হিসাবে পরত।

(ঘুরে ফিরে দেখে) ওকি ? পাথরের ফাটলের মধ্যে ঘোর লালরঙের কি জিনিস ওটা ? ওটা কি সিংহদ্বারা বিতাড়িত করিকুম্ভ বা

হাতির পেট হতে পতিত কোন মাংসখণ্ড ? না, তা ত নয়, তাহলে অত আভা বার হবে কেন? তবে কি এ এক অগ্নিপিন্ড যা কিছুপরেই পরিণত হবে দাবানলে ? তাই বা কি করে সম্ভব ? এ অরণ্য ত বৃষ্টির জলে সিক্ত। বুঝেছি, এ হচ্ছে রক্তবর্ণ অশোকের কুসুমগুচ্ছের মত রাগরঞ্জিত একটা মণি যা হতে ঐ অপূর্ব প্রভাজাল বিকীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি সূর্যদেব ঐ মণিটিকে ধরার জন্য তাঁর কিরণরূপ হস্ত বাড়িয়েছেন। আচ্ছা তাই নেওয়া যাক। (গ্রহণ করলেন)

প্রণয়িণীলাভের আশায় আশান্বিত হয়ে বাষ্পাকুলনয়ন, ক্লান্তপ্রাণ গজপতি কাননে কাননে অতি দুঃখিতভাবে ভ্রমণ করছেন।

(দ্বিপাদিকাযোগে নিকটে গিয়ে মণি নিয়ে আপন মনে) হায় রে, আমার যে প্রিয়তমাব মন্দারকুসুমদ্বারা সুরঞ্জিত সিঁথিতে এ মণি পরাতে পারলে আমি সুখী হতাম, সে আজ কোথায় ? আর ত তাকে পাব না। তবে শুধু শুধু একে আর কলঙ্কিত করি কেন ? (বলেই ফেলে দিতে উদ্যত হতেই নেপথ্যে এক বাণী শোনা গেল) বৎস্য, গ্রহণ করো মণিটিকে, ফেলো না। গিরিরাজনন্দিনীর চরণে যখন অলক্ত বা আলতা পরানো হত তখন সেই আলতা হতে এই মণির উৎপত্তি হয়। এর নাম সঙ্গমনীয় মণি। এই মণি যিনি ধারণ করেন তাঁর অতিদুর্লভ প্রিয়জনের সঙ্গে অচিরে মিলন ঘটে থাকে।

রাজা। (ঊর্ধ্বে চেয়ে) কে আমাকে উপদেশ দান করছে ? (দেখে) ভগবান চন্দ্রদেব স্বয়ং আদেশ করছেন। ভগবান, আপনার উপদেশে বড়ই অনুগৃহীত হলাম। (মণিটিকে নিয়ে) হে সঙ্গমমণি, সেই ক্ষীণকটি প্রিয়তমা আমাকে ছেড়ে গেছে। তুমি যদি তাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পার, তাহলে চন্দ্রশেখর যেমন বালচন্দ্রমাকে মাথায় রেখেছেন, আমিও তেমনি তোমাকে আমার মস্তকে ভূষণ করে রাখব।

(এগিয়ে দেখে) একি ? এই লতাটিকে দেখে আমার মনে সেই শুষ্ক প্রেমরসের উদ্রেক হচ্ছে কেন ? এতে ত একটিও ফুল নেই যে মন গলবে। তবে কেন এমন হচ্ছে ? নবমেঘের জলসম্পাতে এই ক্ষীণাঙ্গী লতা যেন কেঁদে কেঁদে নয়নজলে অধরপল্লবটিকে বিধৌত করছে। এখন

অসময় বলে ফুল ফোটে না। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত আভরণ খুলে ফেলেছে। ফুল নেই বলে ভ্রমরের গুঞ্জনও নেই, তাই মনে হয় চিন্তাবশে চুপ করে আছে। মনে হচ্ছে যেন আমার সেই ক্রোধরক্তবর্ণ, সততকোপিনী প্রেয়সী পাদপতিত আঘাতে উপেক্ষা করেছে বলে এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে।

আচ্ছা, আমার প্রিয়ার অনুরূপিণী এই লতাকে কিছুক্ষণ আলিঙ্গন করে থাকি। হে লতিকা, যদি তাকে দৈবযোগে পাই, তাহলে আমি সুস্থ হই, আর আমায় তাহলে অরণ্যে খুঁজে বেড়াতে হবে না। এবার তাকে পেলে অরণ্যে আর কখনো আসব না।

(চর্চরীগানযোগে) নিকটে গিয়ে লতাকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে লতার সেই আলিঙ্গিত অংশ হতে উর্বশীর আবির্ভাব। (প্রিয়াস্পর্শ অনুভব করে মুদ্রিত নয়নে) আহা, উর্বশীর গাত্রস্পর্শে আগের মত বুক আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস নেই। কারণ এর আগে যখন যখন যাকে যাকে প্রিয়া বলে ভেবেছি তখনি তা ক্ষণকাল পরেই অন্যরূপ হয়ে গেছে। সুতরাং এবার আর চোখ মেলছি না। চোখ বন্ধ করে প্রিয়ার স্পর্শসুখ অনুভব করি। (চোখ মেলে) একি, সত্যই যে আমার উর্বশী। (মূর্চ্ছা ও পতন)

উর্বশী। মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

রাজা। প্রিয়ে, সত্যই আজ নবজীবন লাভ করলাম। কারণ তোমার বিরহরূপ গাঢ় অন্ধকারে এতদিন মগ্ন ছিলাম। কি আনন্দ! আজ মৃত ব্যক্তির চেতনা প্রাপ্তির মত তোমাকে পেলাম।

উর্বশী। আমার অপরাধ ক্ষমা করো মহারাজ। ক্রোধের বশীভূত হয়ে তোমাকে আমি কি দুঃখজনক অবস্থাতেই না ফেলেছিলাম।

রাজা। প্রিয়ে, তোমাকে আমায় প্রসন্ন করতে হবে না। তোমার শুভ-দর্শনলাভে আমার অন্তর-বার সমস্তই আনন্দপূর্ণ হয়েছে। এখন একটি কথা খুলে বল ত, আমায় ছেড়ে এতদিন কি করে ছিলে পাষাণী? আমি কিন্তু তোমার জন্য সারা অরণ্যমধ্যে মৃগ, কোকিল, হংস, চক্রবাক, হস্তী, পর্বত, নদী—কার না হাতেপায়ে ধরেছি। তবু তুমি সাড়া দাওনি।

উর্বশী। মহারাজ, আমি আপনার সমস্ত কষ্টই অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ করেছি।

রাজা। প্রিয়ে, বুঝতে পারলাম না। তুমি অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ করেছ, অথচ দেখা দিতে পারনি। এ কথার মানে কি?

উর্বশী। তবে শোন মহারাজ, পূর্বে ভগবান কার্তিকেয় চিরকৌমার-ব্রত গ্রহণ করে গন্ধমাদন পর্বতের এই জলশীতল অংশে বাস করেছিলেন এবং এই নিয়ম করে দিয়েছিলেন।

রাজা। কি নিয়ম?

উর্বশী। এই বনে যে কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করলেই লতা হয়ে যাবে। গৌরীচরণরাগোদ্ভব মণি ছাড়া তাব মুক্তি হবে না। গুরুদেব ভরতমুনিব অভিশাপে আমি বিমূঢ়হৃদয়া। তাই দেবতার শক্তি আমার লোপ পেয়েছিল, তাই সমস্ত ভুলে এই কুমারবনে প্রবেশ করেছিলাম আমি। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এ বনের প্রান্তবর্তিনী এক লতা রূপে পরিণত হয়েছিলাম। আমার যত কিছু রূপ সব লতা হয়ে যায়।

রাজা। প্রিয়ে, এতক্ষণে সব বুঝতে পারলাম। তা না হলে যে তুমি আমি রতিশ্রান্ত হয়ে শয্যার উপর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লে আমাকে দূর দূরান্তের প্রবাসী বলে মনে করতে, সেই তুমি আমাকে এখানে এই শোচনীয় অবস্থায় চিরবিরহীর দুঃখে নিমগ্ন দেখে কেমন করে সহ্য করতে? এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। এই সেই সঙ্গমমণি। (মণি দর্শন)

উর্বশী। এই সেই সঙ্গমনীয় মণি? তাই বল। তুমি যেমন লতাকে স্পর্শ করলে অমনি আমি নিজের রূপ ফিরে পেলাম।

রাজা। (উর্বশীর সিঁথিতে মণিটি পরিয়ে দিয়ে) প্রিয়ে, তোমার ললাটমধ্যে এই মণিটি পরিয়ে দেওয়ায় এর আভায় ঐ সুন্দর মুখখানি আরো কত বেশী সুন্দর হয়েছে। যেন প্রভাতসূর্যের কিরণমালায় লাল হয়ে উঠেছে কমল।

উর্বশী। প্রিয়ংবদ, অনেকদিন আমরা রাজধানী প্রতিষ্ঠাননগরী

হতে বেরিয়েছি। প্রজাপুঞ্জ আমাদের উপর না জানি কত বিরক্তই হবে। অতএব চল সখা, রাজধানীতে ফেরা যাক। (উর্বশী উঠে পড়লেন)

রাজা। যেমন তোমার অভিপ্রায়।

উর্বশী। মহারাজ কিভাবে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার অভিলাষ করেন ?

রাজা। তুমি কত বিদ্যা জান, কতরকমে চলাফেরার অভ্যাস তোমার আছে। যদি দয়াই করলে তবে মেঘের একখানি আকাশযান তৈরী করো। তাতে চিরচঞ্চল সৌদামিনীর পতাকা শোভা পাবে। নানা বর্ণসুচিত্ত ইন্দ্রধনুতে শোভিত হবে বিমানের চারদিক। সেই নবজলধরের ব্যোমযানে চড়ে আকাশপথে চল আমরা নগরে ফিরে যাই।

এইবার হংসযুবা (পুরুরবা) প্রণয়িণীর সঙ্গলাভ করেছেন। আনন্দে তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত। তিনি এখন ইচ্ছামত বিমানযানে আরোহণ করে নিজনগরে প্রস্হান করছেন। (তৎক্ষণাৎ নির্মিত মেঘের বিমান-যোগে উভয়ের প্রস্হান)

পঞ্চম অঙ্ক

হর্ষিত বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। কি মজা ! রাজামশাই দীর্ঘকাল উর্বশীকে নিয়ে নন্দনবন প্রভৃতিতে চূড়ান্ত আমোদ প্রমোদ করে বাড়ি ফিরেছেন। রাজকার্যে মনোযোগ দিয়েছেন। ছেলেপুলে নেই—এই যা দুঃখ। তা না হলে আর কোন দুঃখ নেই। আজ বড় একটা পর্ব ছিল, তাই দেবীর সঙ্গে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্হলে পটমণ্ডপে অবস্হান করছেন। এখন তিনি সাজগোজ করছেন। এই সময় রাজভ্রাতার মত কাছে গিয়ে অঙ্গবাস ও মালাচন্দনাদিতে ভাগ বসাই।

(নেপথ্য হতে ধ্বনি) সর্বনাশ, কি সর্বনাশ ! রাজার মাথায় রত্নরূপে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ তালপাতায় ঢাকা উজ্জ্বল মণিটি মাংসভ্রমে একটা শকুন ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূষক। কি সর্বনাশ! সখা আমার ঐ মণিটিকে কত আদরে মাথার চূড়ায় পরে থাকেন। তাহলে আজকের মত সাজগোজের সব শেষ। সখা আসন ছেড়ে বেরিয়েছেন। কাছে যাই। (প্রস্থান)

রাজা, সারথি, কঞ্চুকী, রেচক ও পরিজনবর্গের প্রবেশ

রাজা। রেচক, রেচক, আমি রক্ষক, সেই আমারই ঘরে যে পাপিষ্ঠ আজ প্রথম চুরি করল; নিজের মৃত্যুকে সে ডেকে আনছে, চোরের সর্দার সেই পাখিটা কোথায়?

কিরাত। মণিতে গাঁথা সোনার সূত্রদ্বারা আকাশকে রঞ্জিত করতে করতে ঐ যে পাখিটা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজা। দেখতে পাচ্ছি, ঐ যে পাখিটা মণির স্বর্ণসূত্রটি ঠোঁট দিয়ে ধরে কেমন মণ্ডলাকারে ঘুরছে। মনে হচ্ছে যেন ঐ সুতোর প্রভায় একটি বৃহৎ বলয় তৈরী করে আকাশকে উপহার দিচ্ছে। ঠিক যেন অগ্নিরেখার একটি চক্র। বল ত এখন আমার কর্তব্য কি?

বিদূষক। (কাছে এগিয়ে) পাখি বলে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। অপরাধীর শাসন হওয়া দরকার।

রাজা। ঠিক বলেছ ভাই। ধনুক কৈ?

পরিজন। যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা। পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না ত?

বিদূষক। পাপিষ্ঠ পাখিটা এইদিক দিয়ে দক্ষিণভাগে উড়ে গেল।

রাজা। (দেখে) তাই ত। ঐ যে মণির প্রভায় ঐ দিকটা কেমন উজ্জ্বল করে তুলেছে। যেন অশোককুসুমের স্তবকে দিকবধূর মুখ উজ্জ্বল করছে।

যবনী। (ধনুক নিয়ে প্রবেশ করে) প্রভু, এই যে ধনুক এবং বাণ।

রাজা। আর ধনুক নিয়ে কি করব? পচামাংসখোর পাখিটা বাণের পথ ছাড়িয়ে চলে গেছে। ঐ যে পাখিটার দ্বারা অনেক ঊর্ধ্বে নীত অমূল্য মণিটি রাত্রিকালে প্রগাঢ় মেঘখণ্ডে সংযুক্ত লোহিতবর্ণ মঙ্গলগ্রহের মত দীপ্তি পাচেছ। আর্য কঞ্চুকী!

কঞ্চুকী। বলুন মহারাজ।

রাজা। আমার আদেশ জানিয়ে নগরবাসীদের বলুন, সায়ংকালে যে সব গাছে পাখির বাসা আছে, সেখানে যেন ঐ পাখিটার সবাই খোঁজ করে।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

বিদূষক। একটু বিশ্রাম করো ভাই। সেই রত্ন অপহরণকারী তোমার শাসন হতে কোথায় গিয়ে নিস্তার পাবে? (উভয়ের উপবেশন)

রাজা। বয়স্য, পাখি যে মণিটিকে নিয়ে গেল, মণি হিসাবে তার উপর আমার কোন আগ্রহ নেই। তবে ঐ সঙ্গমনীয় মণিই প্রিয়তমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়েছিল, তাই এত টান।

বাণ ও মণি নিয়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, আপনার ক্রোধই বাণ-রূপে পরিণত হয়ে পাখিটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এই দেখুন সেই মণি। পাখি তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে এই মণি আর বাণসহ ভূতলে পতিত হয়েছে। (সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল)

কঞ্চুকী। মণিটিকে ধুয়ে মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। কাকে দিতে হবে?

রাজা। রেচক, যাও। একটি ভাল কৌটোয় মণিটিকে ভরে ভাণ্ডারে জমা করে দাও।

কিরাত। যেমন প্রভুর আদেশ। (মণি নিয়ে প্রস্থান)

রাজা। (কঞ্চুকীকে) আর্য কঞ্চুকী, আপনি জানেন এ বাণ কার?

কঞ্চুকী। নাম খোদাই করা আছে। তবে আমার দৃষ্টিতে তা পড়া সম্ভব নয়।

বিদূষক। সখা, তুমি কি দেখছ বলত।

রাজা। কালক্ষেপণকারীর নামের অক্ষরগুলি শোন তবে।

বিদূষক। বল, শুনছি।

রাজা। (পড়তে লাগলেন) শত্রুকুলের আয়ুঃক্ষয়কারী এই বাণ উর্বশীর গর্ভজাত ধনুর্ধর বীর কুমার আয়ুর বলে জানবে।

বিদূষক। বাঃ, মহারাজের সন্তান হওয়ায় চরম শ্রীবৃদ্ধি হলো।

রাজা। কি করে এ সম্ভব ? এক নিমেষের জন্যও উর্বশীকে ছেড়ে আমি থাকিনি। কখনো ত তাকে গর্ভলক্ষণসমন্বিতা বলে বুঝতে পারিনি ! প্রসূতি ত পরের কথা। তবে কয়েকদিনের জন্য তার শরীরের একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলাম। তার স্তনযুগলের অগ্রভাগ কেমন যেন অল্পনীল বলে মনে হচ্ছিল। তার মুখের কান্তিও লবনী ফলের মত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং হাতের বালা একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল।

বিদূষক। এই যথেষ্ট। তুমি কি তাকে মানবীদের মত পুরোপুরি গর্ভলক্ষণ দেখতে চাও নাকি ? তাদের সবটাই যে লুকোচুরির ব্যাপার। এটা ভুলে যাও কেন ?

রাজা। বেশ, তোমার কথাই মানলাম। কিন্তু সন্তান গোপন করার কি কারণ তার ?

বিদূষক। সোজা কথাটা বুঝতে এত দেরী ? সন্তান হলে বুড়ি বলে রাজা ত্যাগ না করেন এইজন্যই গোপনতা।

রাজা। ঠাট্টা রাখ। ভাব, ব্যাপারটা গুরুতর।

বিদূষক। দেবতাদের গূঢ় উদ্দেশ্য কে বুঝবে বল।

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। দেব, চ্যবনঋষির আশ্রম হতে একটি কুমারকে নিয়ে এক তাপসী আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন।

রাজা। উভয়কেই সত্তর নিকটে নিয়ে আসুন।

কঞ্চুকী। যেমন আদেশ (প্রস্থান ও তাপসীর সঙ্গে কুমারকে নিয়ে পুনরায় প্রবেশ)

বিদূষক। এই বাণে যে কুমারের নাম অঙ্কিত আছে, শকুনঘাতক নিক্ষেপকর্তা ক্ষাত্রিয়কুমার নিশ্চয় মহারাজের আকৃতির অনেকটা অনুরূপ।

রাজা। ঠিক বলেছ ভাই। এই কুমারের দিকে চাইলেই নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে। হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মনে জাগছে অপূর্ব আনন্দ। সখা, এর দর্শনে দেহ কম্পিত হচ্ছে। ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন করে একে গাঢ়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে।

কঞ্চুকী। ভগবতী, এইখানে আপনারা অবস্থান করুন। (তাপসী ও কুমারের অবস্থান)

রাজা। ভগবতী, প্রণাম করি।

তাপসী। মহারাজ, চন্দ্রবংশের অবতংসরূপে চিরকাল বিরাজ করুন! (মনে মনে) কি আশ্চর্য! কেউ বলে না দিলেও এই রাজর্ষি ও কুমারের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ কেমন যেন আপনিই বোঝা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে। যাচ্ছ, গুরুকে প্রণাম করো। (কুমারের সজল নয়নে ও যুক্ত করে)

রাজা। বৎস, দীর্ঘজীবী হও।

কুমার। (রাজার স্পর্শানুভব করে মনে মনে) ইনি আমার পিতা, আর আমি এঁর পুত্র—এইটুকু শুনে আমার যদি এতটা আনন্দ জন্মে, তবে যারা পিতার কোলে সংবর্ধিত না জানি গুরুজনদের উপর তাদের কতই স্নেহ জন্মে থাকে।

রাজা। ভগবতী, আগমনের প্রয়োজন কি?

তাপসী। তবে শুনুন মহারাজ। এই দীর্ঘজীবী যেমন ভূমিষ্ঠ হলো, অমনি কেন জানি না, উর্বশী আমার কাছে একে গচ্ছিত রেখেছিল। উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়কুমারের যে সকল জাতকর্ম প্রভৃতি শুভকার্য তা সমস্তই ভগবান চ্যবন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুমার সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও ধনুর্বেদেও বিশেষ শিক্ষিত হয়েছে।

রাজা। এর আর কথা কি? সর্বোত্তম অভিভাবকের সংসর্গে কৃতার্থ।

তাপসী। আজ ফুল, ফল, সমিধ এবং কুশাদি আহরণের জন্য ঋষিকুমারদের সঙ্গে গিয়ে এই কুমার এক আশ্রমবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান করে বসেছে।

বিদূষক। কেমন?

তাপসী। একখণ্ড মাংস নিয়ে এক শকুন আশ্রমের একটা গাছের মাথায় লুকিয়েছিল, কুমার তাকে বাণাঘাতে সংহার করেছে।

রাজা। তারপর?

তাপসী। সেই কথা শুনে ভগবান চ্যবন আমাকে আদেশ করলেন, উর্বশীর হাতে তার গচ্ছিত বস্তু একে দিয়ে এস। তাই আমি উর্বশীকে দেখতে চাই।

রাজা। আসন পরিগ্রহ করুন। (আসনে উপবেশন) তালব্য, উর্বশীকে ডাকুন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। এস বাবা, পুত্রের স্পর্শ সমস্ত দেহব্যাপী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং চন্দ্রকান্তমণিকে চন্দ্রকরের মত তুমি সেই অঙ্গস্পর্শের দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করো।

তাপসী। যাদু, পিতাকে তৃপ্ত করো। (কুমার রাজার কাছে গেল)

রাজা। (আলিঙ্গন) বৎস, পরম বন্ধু এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা করো, ভয় পেও না।

বিদূষক। ভয় পাবার কি আছে? আশ্রমবাসী শাখামৃগ, বানর, হনুমান প্রভৃতি এদের অনেক দেখেছে।

কুমার। (সহাস্যে) তাত, বন্দনা করি।

বিদূষক। তোমার মঙ্গল হোক। জয়যুক্ত হও।

উর্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। এই দিকে দেবী।

উর্বশী। (দেখে) ও কে? স্বর্ণাসনে উপবেশন করে কে ওখানে? কে ঐ বালক? সখারাজ নিজ হস্তে চূড়া সাজিয়ে দিচ্ছেন! কেমন ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে। ও বুঝেছি, সত্যবতীর সঙ্গে আমার পুত্র আয়ু এসেছে! আহা এত বড় হয়েছে?

রাজা। (দেখে) বাবা, এই তোমার গর্ভধারিণী উপস্থিত। ঐ দেখ, তোমার দর্শনে ওর হৃদয়নিহিত স্নেহসমুদ্র উথলে ওঠায় স্তনাবরণ ভিজে গেছে।

তাপসী। যাদু এস, মার ধন মার কাছে ফিরে যাও। (কুমারের সঙ্গে উর্বশীর নিকটে গমন)

উর্বশী। আর্যে, চরণ বন্দনা করি।

তাপসী। বাছা, পতির আদরিণী হও।

কুমার। মা, অভিবাদন করি।

উর্বশী। বাছা, বাপের বুক জুড়িয়ে বেঁচে থাক। (রাজার দিকে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। এস, এস পুত্রবতী, এইখানে বস।

উর্বশী। পূজনীয়বৃন্দ, আগে আপনারা উপবেশন করুন। (সকলের উপবেশন)

তাপসী। বাছা উর্বশী, আয়ু কৃতবিদ্য হয়েছে। এখন যুদ্ধাদির জন্য কবচ পরিধানের কাল। অর্থাৎ যৌবন উপস্থিত, তাই আজ স্বামীর সমক্ষে সখীর স্বহস্তকৃত গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করছি। এখন তোমরা বিদায় দাও। আমার আশ্রমধর্মের বাধা ঘটছে।

উর্বশী। আর্যে, যদিও বহুদিনের পর দেখা পেয়ে ছাড়তে মন চায় না, তবু ধর্মে বাধা দিতে চাই না, আজ যান, আবার যেন দেখা পাই।

রাজা। আর্যে, পূজনীয় চ্যবনমুনিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

তাপসী। আচ্ছা।

কুমার। আর্যে, সত্যিই যাবেন? আমাকে এখানে রেখে যাবেন না, সঙ্গে নিয়ে চলুন।

রাজা। আর্যপুত্র, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ত পূর্বেই বাস করার সময়।

তাপসী। যাদু, পিতার আদেশ পালন করো।

কুমার। তাই যদি করতে হয়, তবে যে ময়ূরশিশুর অচিরোদ্‌গত শিখণ্ডটিকে একটু একটু করে চুলকিয়ে দিতাম বলে সে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ত তার যখন নতুন পুচ্ছ উঠবে তখন তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

তাপসী। তাই দেব।

উর্বশী। ভগবতী, চরণ বন্দনা করি।

রাজা। ভগবতী, প্রণাম করি।

তাপসী। তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হোক। (প্রস্থান)

রাজা। সুন্দরী, আজ আমার তুল্য ভাগ্যবান কে আছে? ইন্দ্র

যেমন ইন্দ্রাণীর গর্ভজাত সন্তান জয়ন্তকে নিয়ে ধন্য, আমিও তেমনি তোমার এই সুপুত্রের পিতা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। (কি যেন মনে পড়ায় উর্বশী কাঁদতে লাগলেন)

বিদূষক। একি ? হঠাৎ ইনি আবার কাঁদছেন কেন ?

রাজা। (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) সুন্দরী, বংশরক্ষার কারণ উপস্থিত হওয়ায় আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হয়েছে। এমন সুখের সময়ে তুমি অমন করে কাঁদছ কেন ? তোমার কণ্ঠে একছড়া মুক্তোর মালা শোভা পাচ্ছে, তবে আবার পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের উপর নিরন্তর অশ্রুবিন্দুপাত করে আর একছড়া মালা গাঁথছ কেন ?

উর্বশী। তবে শুনুন মহারাজ। পুত্রদর্শনজনিত সুখের আতিশয্যে প্রথম আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মহেন্দ্রের নামোচ্চারণে আমার পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা মনে পড়েছে।

রাজা। কি সে প্রতিজ্ঞা ?

উর্বশী। পূর্বে আপনার রূপে পাগল হয়ে আমি গুরুদেব ভরতের নিকট ঘোর অপরাধী হয়ে অভিশপ্ত হয়েছিলাম। পরে দেবরাজ সেই অভিশাপ মোচনের একটা সীমা নির্দেশ করে দেন।

রাজা। কেমন করে ?

উর্বশী। দেবরাজ বলেন, আমার প্রিয়বন্ধু রাজর্ষি পুরূরবা যখন তোমার গর্ভে উৎপন্ন তাঁর ঔরসজাত পুত্রের মুখদর্শন করবেন তখন তুমি আমার নিকট চলে আসবে। সেইজন্যই আপনার বিরহ এবং প্রিয়বিচ্ছেদভয়ে এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার অজুহাতে ভগবান চ্যবনের আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর হাতে আমি তাকে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন পুত্র আমার বড় হয়েছে এবং পিতার পরিচর্যার যোগ্যতা লাভ করেছে। এইজন্যই সত্যবতী এই দীর্ঘজীবী আয়ুকে প্রত্যর্পণ করলেন। এই পর্যন্তই আমার আপনার সঙ্গে একত্র বাস। মহারাজ, আজ বিদায় দিন। (সকলেই বিষণ্ণ হলেন এবং রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন)

সকলে। মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

কণ্চুকী। মহারাজ, ধৈর্য ধরুন।

বিদূষক। সর্বনাশ হলো।

রাজা। (জ্ঞান ফিরে পেয়ে) হায়, সুখের পথে কাঁটা দেওয়াই কি বিধাতার কাজ? প্রিয়তমে, আমি নিঃসন্তান, সন্তানলাভে যেমন কৃতার্থ হয়েছি, অমনি তোমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হলো। নিদাঘশেষে মেঘবারি-সম্পাতে বৃক্ষের আতপতাপজনিত পীড়ার যেমন উপশম হলো, অমনি তাব মাথায় বজ্রপাত ঘটল।

বিদূষক। দেখ সখা, অর্থ বা কোনরকম লাভই হলো যত অনর্থের মূল। অতএব এক কাজ করো, দেবরাজের শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে সবদিক রক্ষা হতে পারে।

উর্বশী। হায়, কি পোড়া কপাল আমার! সমাপ্তবিদ্য পুত্রের প্রাপ্তির পর এখানকার সব কাজ ফুরিয়ে গেল আমার। মহারাজ হয়ত ভাববেন, উর্বশী নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে অর্থাৎ ছেলেকে রাজ-সিংহাসনে বসাবার ব্যবস্হা করেই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে।

রাজা। সুন্দরী, তা মনে করব কেন? কারণ আমি জানি, পরাধীনতা অতি বিষম বস্তু, তা সহজেই বিচ্ছেদ ঘটায়। পরাধীন ব্যক্তি স্বেচ্ছামত কাজ করতে পারে না। তুমি দেবরাজের পরাধীনা। সুতরাং তাঁর আদেশ তোমার প্রতিপালনীয়। তুমি দেবরাজসভায় যাও। আমিও আজই তোমার পুত্র আয়ুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে বন্যমৃগ-সমাকুল অরণ্যে গমন করব। রাজ-ঐশ্বর্যে আমার আর দরকার নেই।

কুমার। মহাবৃষভের ভার তরুণ বৎসের উপর অর্পণ করা আপনার মত সুবিবেচকের উচিত নয়।

রাজা। একথা বলো না বাবা। গন্ধপ্রধান মাতঙ্গরাজপুত্র যত শিশুই হোক সে কিন্তু অন্যান্য করিকুলকে শাসন করে পরিচালিত করে। সর্পশিশু যত ক্ষুদ্র হয়, তার বিষ ততই উগ্র হয়। তুমি যতই বালক হও না কেন, পৃথিবী শাসনে ও রাজ্য পরিরক্ষণে তুমি পর্যাপ্ত। মানুষ বয়সের দ্বারা আর কতটুকু সামর্থ্য প্রকাশ করতে পারে? জাতির মাহাত্ম্যেই তার সকল কাজে পারদর্শিতা জন্মে। কণ্চুকী?

কঞ্চুকী। কি আদেশ মহারাজ?

রাজা। আপনি আমার আদেশ জানিয়ে অমাত্য পর্বতকে বলুন যে, এখনই কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেক হবে। (কঞ্চুকীর প্রস্থান। সহসা সকলের চোখ ঝলসে গেল)

রাজা। (আকাশের দিকে চেয়ে) একি, সহসা অসময়ে বিদ্যুৎ দেখা দিচ্ছে কেন? (ভাল করে দেখে) ও, ভগবান নারদ আসছেন। গোরোচনাচূর্ণের মত পিঙ্গল জটাজুটশোভিত, চন্দ্রকলার মত অমলধবল যজ্ঞোপবীতসমন্বিত, মুক্তাহারধারণে বর্ধিতকান্তি ও স্বর্ণপল্লবমণ্ডিত গতিশীল কল্পতরু যেন আকাশ হতে অবতরণ করছেন। ওরে, অর্ঘ্য নিয়ে আয়। অতি সত্বর অর্ঘ্য নিয়ে আয়।

উর্বশী। এই ভগবানের অর্ঘ্য।

নারদের প্রবেশ

নারদ। মধ্যমলোকের অধিপতির জয় হোক।

রাজা। ভগবন, অভিবাদন করি।

উর্বশী। ভগবন, প্রণাম করি।

নারদ। তোমরা পতিপত্নী অবিচ্ছেদে কালাতিপাত করো।

রাজা। (মনে মনে) তেমন দিন কি হবে? আমরা অবিচ্ছেদে থাকতে পাব? ভগবন, উর্বশীর পুত্র আয়ুর প্রণাম গ্রহণ করুন।

নারদ। দীর্ঘজীবী হোক।

রাজা। এই আসন, অনুগ্রহ করে উপবেশন করুন।

(নারদের উপবেশন ও পরে সকলের উপবেশন)

রাজা। ভগবন, আগমনের কারণটি জানতে পারি কি?

নারদ। রাজন, দেবরাজ মহেন্দ্রের প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করো। এখন তিনি তোমাকে বনগমনোদ্যত দেখে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। নিজ প্রভাবে তিনি সবই অবগত হয়েছেন।

রাজা। বলুন, শুনছি। কি আদেশ তাঁর?

নারদ। ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলেছেন, দেবাসুরের একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই সব যুদ্ধে আপনিই প্রধান সহায় এবং

সকলের অগ্রগামী হয়ে থাকেন। অতএব এখন আপনার অস্ত্রত্যাগ করে বনগমন কর্তব্য নয়। যাতে আপনাকে বনগমন করতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উর্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মচারিণীরূপে এখানেই থাকবে।

উর্বশী। (স্বগতঃ) উঃ, বুকের ভেতর থেকে যেন একটা শেল উঠে গেল।

রাজা। পরমেশ্বর দেবরাজের দ্বারা অতিশয় অনুগৃহীত হলাম।

নারদ। এইরকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনার হিতকর কার্য বাসব করবেন, আপনিও বাসবের হিতানুষ্ঠানে রত থাকবেন। সূর্য নিশাকালে অগ্নিকে তেজস্বী করেন, আবার দিবাভাগে অগ্নিও নিজের তেজের দ্বারা সূর্যকে অধিকতর তেজস্বী করে থাকেন। (আকাশের দিকে চেয়ে) রম্ভা, কুমারের জন্য মন্ত্রপূতঃ অভিষেকবারি নিয়ে এস।

রম্ভার প্রবেশ

রম্ভা। এই যে অভিষেকের দ্রব্যাদি।

নারদ। কুমারকে ভদ্রপীঠে অর্থাৎ সিংহাসনে বসাও। (রম্ভা কুমারকে বসালেন)

নারদ। (কুমারের মাথায় মঙ্গলকলসের জল ঢেলে দিলেন) রম্ভা, কাজগুলি তুমিই করো।

রম্ভা। (অভিষেক সম্পূর্ণ করে) বৎস, ভগবান নারদকে ও মাতা-পিতাকে প্রণাম করো। (কুমার সকলকে প্রণাম করলেন)

নারদ। মঙ্গল হোক।

রাজা। বংশ উজ্জ্বল করো।

উর্বশী। তোমার পিতার বাক্য সত্য হোক।

(নেপথ্যে দুজন বৈতালিকের গান)

প্রথম। যুবরাজ জয়যুক্ত হোন। সৃষ্টিকর্তা হতে উৎপন্ন সুরমুনি অত্রির মত আর অত্রি হতে উৎপন্ন চন্দ্রের মত, চন্দ্র হতে উৎপন্ন বুধের মত এবং বুধ হতে উৎপন্ন তোমার পিতার মত এবং তোমার পিতা পুরূরবা হতে উৎপন্ন তুমি যুবরাজ। সর্বলোকরঞ্জন গুণাবলীতে পিতার

সর্বাংশে অনুরূপ হয়েছে। তোমার মহান কুলে সবরকমের আশীর্বাদ যুক্ত হোক।

দ্বিতীয়। জগতে যারা উন্নত, তাঁদের সকলের শীর্ষস্থানীয়, স্থির মর্যাদাসম্পন্ন, ধীরতা ও দৃঢ়তায় অবিচলিত, তোমার পিতৃদেব ও তোমার মধ্যে রাজলক্ষ্মী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হিমালয়ে ও সাগরে বিভক্তসলিলা গঙ্গার মত অধিকতর শোভা পাচ্ছেন।

রম্ভা। কি আনন্দ, প্রিয়সখী উর্বশী আজ পুত্রকে যুবরাজরূপে দেখে এবং পতির সঙ্গে অবিচ্ছেদে থাকতে পেয়ে কতবড় অভ্যুদয়ের ভাগিনী হলো ?

উর্বশী। সখী, এই অভ্যুদয় ত আমার একার নয়। তুমিও ত এর অংশীদার। (কুমারের হাত ধরে) বাছা, তোমার জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করো।

রাজা। একটু থাম প্রিয়ে, সবাই মিলে ওর কাছে যাই চল।

নারদ। মহারাজ, আজ তোমার পুত্র কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যাভিষেকে আমার মনে পড়ছে সেই দিনের কথা যেদিন দেবরাজ ইন্দ্র কুমার কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

রাজা। দেবরাজ আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন।

নারদ। বল রাজন, ইন্দ্র তোমার আর কি প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করবেন ?

রাজা। এর পরও কি আমার প্রিয় থাকতে পারে ? তবে যদি সত্যই তিনি দয়া করেন তবে সজ্জনদের সর্ববিধ অভ্যুদয়ের জন্য লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বিরোধ মিটে যাক। একজনের উপর উভয়ের কৃপা বড় একটা দেখা যায় না। এখন হতে সেটা হোক। হায় মা ভারতী, 'যে তোর যত চরণসেবা করবে সে তত দরিদ্র হবে'—এই বলে যেন আর কোন বাণীর সেবককে কাঁদতে হয় না। সকলের সকল বিপদ কেটে যাক। সকলের নয়নেই মঙ্গলের মধুর মূর্তি প্রতিভাসিত হোক। সকলের সব বাসনা পূর্ণতা লাভ করুক এবং সকলেই সর্বত্র সদানন্দে কালযাপন করুক।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা

মঙ্গলাচরণ

চতুর্মুখের মুখরূপ কমলবনবিহারিণী হংসী সর্বাঙ্গশুভ্রা দেবী সরস্বতী আমার মানসসরোবরে নিয়তই বিরাজ করতে থাকুন।

আমি আদিপুরুষ বাসুদেব, চিরন্তনপুরুষ মহাদেব, কমলজাত ব্রহ্মা, উমাপুত্র গণেশ ও শুভদায়িনী সরস্বতীকে প্রণাম করে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র বর্ণনা করছি।

একদিন দেবী জগদম্বিকা পরমশোভাসম্পন্ন কৈলাস পর্বতের শিখরদেশে সমাসীন পরমেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবকে বললেন, দেব, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বেদশাস্ত্র আলোচনার বিবাদ নিয়ে কালযাপন করে থাকেন এবং মূর্খগণ নিদ্রা ও কলহদ্বারাই কালক্ষেপণ করে থাকে। অতএব সদ্ভাবে কালযাপনের জন্য সকল লোকের চিত্তচমৎকারজনক কোন আখ্যায়িকা বলাই কর্তব্য।

তখন মহাদেব পার্বতীকে বললেন, হে প্রাণেশ্বরী, তবে শ্রবণ করো, আমি সকল লোকের হৃদয়হারিণী কথা বলছি।

ভূমণ্ডলে উজ্জয়িনী নামে এক নগরী আছে যার ঐশ্বর্যে দেবগণও বিস্মিত হয়েছিলেন, যার সৌন্দর্যে পুরন্দরপুরী অমরাবতীও পরাভূত হয়েছিল। সেখানে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাদপদ্মদ্বয় সততই সামন্তরাজপত্নীদের মস্তকস্থিত সিঁদুরদ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করত। তিনি সকল শাস্ত্রেই সুনিপুণ ছিলেন। বিক্রমাদিত্য নামে তাঁর এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি নিজ বিক্রমে শত্রুগণের পরাক্রম বিধ্বস্ত করেছিলেন।

ভর্তৃহরির অনঙ্গসেনা নামে এক বণিতা ছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যের গুণে সুরাঙ্গনাগণ লজ্জিত হত। সেই নগরে সকল কলাশাস্ত্রে নিপুণ, মন্ত্রবিশারদ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্ত্রসাধনাদ্বারা ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে

সন্তোষিত করেন। দেবী পরিতুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, হে প্রিয়বর, তোমার মন্ত্রসাধনায় ও ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো।

ব্রাহ্মণ বললেন, যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমাকে জরা-বিহীন ও অমর করুন। তখন দেবী তাঁকে একটি দিব্য ফল দান করে বললেন, পুত্র, তুমি এই ফল ভক্ষণ করো, তাহলেই জরামৃত্যুবর্জিত হবে।

তখন সেই ব্রাহ্মণ সেই ফল গ্রহণ করে নিজভবনে এসে দেবার্চনাদি করে যেমন ফল ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন, অমনি তাঁর মনের মধ্যে এই বুদ্ধির উদয় হলো যে, আমি ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অমর হয়ে কারই বা উপকার করব ? আবার বহুকাল জীবিত থাকলেও ভিক্ষা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে। অতএব পরোপকারী কোন পুরুষ এই ফল ভক্ষণ করলেই তাতে মঙ্গল লাভ হতে পারে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ ও ঐশ্বর্য গুণযুক্ত সে যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকে, তার জীবনই সফল হয়।

শাস্ত্রে বলে, যে বিজ্ঞান, শৌর্য ও ঐশ্বর্যগুণান্বিত বিখ্যাত মানব সে যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকে তবে তাই তার জীবনের ফল। সাধুগণও একথা বলে থাকেন। কাক পূজাদির দ্রব্য ভক্ষণ করে বহুকাল বেঁচে থাকে বটে, কিন্তু তার জীবনের সার্থকতা কি ? আর যশ গুণ ও ধর্মের সঙ্গে যে জীবন তাকেই যথার্থ জীবন বলা যায় না। যে ব্যক্তি বেঁচে থাকলে বহুলোক বেঁচে থাকে সেই ব্যক্তির জীবন সার্থক। দেখ, পাখিরাও চঞ্চুদ্বারা নিজ উদর পূরণ করে থাকে। তবে মানুষের কেবল নিজ উদরপূরণে লাভ কি ? যারা আপন ভরণপোষণ ব্যাপারে ব্যাপৃত থেকে কেবল নিজের উদরমাত্র পূরণ করে তারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয়। এমন হাজার হাজার ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। আর যার পরার্থই স্বার্থ এমন সজ্জনশ্রেষ্ঠ পুরুষ অতি বিরল। দেখ, দাবানল আপন দুষ্পূরণীয় উদর পূরণের জন্য সমুদ্রপান করেও তৃপ্ত হয় না। আবার মেঘ নিদাঘ-তাপে বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপশান্তির নিমিত্ত সমুদ্রবারি পান করে থাকে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করে ভাবলেন, যদি এই ফল রাজাকে

দান করা হয় তাহলে রাজা জরামরণবর্জিত হয়ে সকলেরই উপকার সাধন করতে পারেন। এই কথা চিন্তা করে সেই ফল নিয়ে রাজার কাছে এসে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, ভুজঙ্গমালাধারী ত্রিলোচন ও পীতাম্বরধারী নারায়ণ আপনার মঙ্গলবিধান করুন।

এই আশীর্বাদ করে রাজার হাতে ফল দান করে বললেন, রাজন, এই অপূর্ব ফল আমি দেবতার বরপ্রসাদে লাভ করেছি। আপনি এটি ভক্ষণ করুন, তাহলে জরামরণবর্জিত হবেন।

রাজা সেই ফল গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকে বহুতর পুরস্কার প্রদান করে বিদায় দিয়ে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, এই ফল ভক্ষণ করলে আমি অমরত্ব লাভ করব। অনঙ্গসেনা আমার অতিশয় প্রিয়পাত্রী। আমি বেঁচে থাকতে সে মরে গেলে আমি তার বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারব না। অতএব এই ফল আমি অনঙ্গসেনাকে দান করব।

এই ভেবে রাজা অনঙ্গসেনাকে সেই ফল দান করলেন। মথুরাদেশের এক দাস অনঙ্গসেনার প্রিয়পাত্র ছিল। অনঙ্গসেনা সেই দাসকে ফলটি দান করল। সে নিজে ভক্ষণ করল না। তাতে যে সে ফলের সার্থকতা বোধ করল।

সেই দাসটি আবার এক দাসীকে ভালবাসত। সে তাই ফলটি নিজে না খেয়ে সেই দাসীকে তা দিল। সেই দাসী আবার তার প্রণয়পাত্র কোন এক গোপালককে দিল। সেই গোপালকের আবার কোন এক গোময়-ধারিণীর সঙ্গে প্রণয় ছিল। সে তাই সেই গোময়ধারিণীকে ফলটি দান করল।

এইভাবে রাজা হতে ক্রমে গোময়ধারিণীর হাতে সেই ফল এসে পড়ল। একদিন সেই গোময়ধারিণী গ্রামের বাইরে গোময়পাত্র মাথায় নিয়ে ফলটি সেই পাত্রের উপর রেখে রাজপথে আসছিল। তখন রাজা ভর্তৃহরি রাজকুমারদের সঙ্গে বিহার করতে বেরিয়েছিলেন। রাজা সেই গোময়পাত্রের উপর ফলটিকে দেখে তা নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

এরপর রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, হে দ্বিজবর, আপনি যে ফল আমাকে দান করেছিলেন সেইরকম ফল আর আছে কি?

ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, সেই ফল দিব্য ও দেবপ্রসাদলব্ধ। তেমন তেমন ফল ত আর নেই। রাজা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁর সামনে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। সুতরাং রাজাকে দেবতার মত জ্ঞান করে সুধী ব্যক্তিরা তাঁর কাছে কখনই মিথ্যা কথা বলবেন না।

রাজা তখন বললেন, কোন স্ত্রীলোকের কাছে সেই ফল কি করে দেখা গেল? কি করে এটা সম্ভব?

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি সেই ফল ভক্ষণ করেছিলেন কি?

রাজা বললেন, আমি ভক্ষণ করিনি, আমার প্রাণবল্লভা অনঙ্গসেনাকে তা দিয়েছি।

ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ফল নিয়ে তিনি কি করেছেন?

তারপর রাজা অনঙ্গসেনাকে ডেকে শপথ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে ফল নিয়ে তুমি কি করেছ?

অনঙ্গসেনা বলল, আমি সে ফল মাথুরিক নামে এক দাসকে দিয়েছি।

মাথুরিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, সে এক দাসীকে তা দিয়েছে। দাসী বলল, সে ফল সে এক গোপালককে দিয়েছে। গোপালক আবার বলল, সে তা এক গোময়ধারিণীকে দিয়েছে।

এই সব কথা শুনে রাজা বহুবিলাপ করে বিষম বিষাদে মগ্ন হয়ে উঠলেন। পরে এই শ্লোক পাঠ করলেন। মনোহর রূপ ও যৌবনের জন্য পুরুষদের অহঙ্কার করা বৃথা। যেহেতু রমণীগণের মনে মদন প্রভু সকল প্রকার দুষ্কর্ম সংঘটিত করে থাকে।

কি আশ্চর্য! স্ত্রীগণের মনোহরণ করতে কারো সামর্থ্য নেই। শাস্ত্রে আছে, অশ্বগণের প্লুতগতি, বৈশাখমাসের মেঘগর্জন, স্ত্রীগণের চরিত্র, পুরুষদের ভাগ্য, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির সন্ধান দেবতারাও জানেন না, মানুষেরা কি করে জানতে পারবে?

ব্যাধগণ বনমধ্যে চপল বিহঙ্গদেরও ধরতে পারে, স্রোতস্বতী নদীমধ্যে নৌকা ধারণ করতেও পারা যায়, কিন্তু নারীগণের চঞ্চলমানসের গতি-প্রকৃতি স্থির করতে কেউ পারে না।

বন্ধ্যাপুত্রের রাজলক্ষ্মী এবং আকাশের পুষ্পশোভা কখনো দৈবাৎ হলেও হতে পারে, কিন্তু নারীদের অল্পমাত্র মনঃশুদ্ধিও কিছুতেই সাধিত হয় না।

যে যোগীগণ সতত জীবনের সুখদুঃখ জয় করে জীবনধারণ করেন, তাঁরাও মোহিত হয়ে স্ত্রীগণের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারেন না।

নির্মলাশয় সাধুগণ বলে থাকেন, নারীগণ কামকেলি সম্পাদন করার পর তৎক্ষণাৎ আবার পুরুষান্তর আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। এটা সমস্ত নারীগণেরই স্বভাব।

আর রমণীগণ অজ্ঞান। মন্ত্র, তন্ত্র ও বিনয় ছাড়াই জ্ঞানবান পণ্ডিতদের ক্ষণকালমধ্যেই বঞ্চনা করে থাকে।

আর তাদের ভালমন্দের বিচার নেই। কুল ও জাতিহীন, নিকৃষ্ট, দুষ্কর্মপরায়ণ, অস্পৃশ্য ও মরণাপন্ন ব্যক্তিকেও তারা প্রিয়তম বলে বিবেচনা করে থাকে।

নারীগণকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করে রাখলেও এবং বহুলোকের তত্ত্বাবধানে কিংবা সজ্জনদের সংসর্গে রেখে দিয়ে কোলে ধারণ করলেও গুণবতী রমণীও নিজ স্বভাববশে দূষিত কার্য করে থাকে।

নারীদের অর্থলোভ অত্যন্ত বেশী। তারা ধনলোভে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে এবং পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে, কিন্তু নিজেরা তাদের বিশ্বাস করে না। এইজন্য সদ্বংশজাত ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্বদাই নারীগণকে শ্মশানপুষ্পের মত বর্জন করেন।

বুঝলাম বৈরাগ্যের তুল্য ভাগ্য নেই, বোধের তুল্য বন্ধু নেই, হরির তুল্য পরিত্রাতা নেই এবং সংসারের মত রিপু নেই।

এই কথা বলে ভর্তৃহরি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বনগমন করলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন প্রাপ্তির কথা

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত, কুব্জ প্রভৃতি জনগণের মনস্তুষ্টি করে সম্যকরূপে প্রজাপালন করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পরিচারক প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করে এবং মন্ত্রী ও সামন্তদের মন্ত্রণামত কার্য করে সকলের প্রীতিপাত্র হলেন। এইভাবে সকলের মনোরঞ্জন করে তাঁর রাজ্যকাল অতিবাহিত হতে থাকল।

তারপর একদিন এক দিগম্বর সন্ন্যাসী রাজার নিকট এসে বললেন, মহারাজ, যিনি অবলীলায় ভুজঙ্গনাগকে মালার আকারে ধারণ করেন সেই ভগবান হর এবং বরাহরূপী হরি আপনাকে অধিকতর ঐশ্বর্য প্রদান করুন।

এই আশীর্বাদের পর রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, হে রাজন, আমি কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্র দ্বারা হোম করব, সেখানে আপনি উত্তরসাধক হয়ে থাকবেন।

রাজাও অঙ্গীকার করলেন। বিক্রমাদিত্যের সেই প্রসঙ্গে বেতাল প্রসন্ন হয়েছিল। তখন ভূমিতলে বিক্রমাদিত্যের মত কেউই রাজা ছিলেন না। তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনমধ্যে গঙ্গার মত অনর্গলভাবে প্রবাহিত হতে লাগল।

এই সময় স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গের জন্য রম্ভা ও উর্বশীকে আহ্বান করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নৃত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে অধিকতর প্রবীণা, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে গমন করো। যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে পারবে আমি তাকে পুরস্কার দান করব।

তা শুনে রম্ভা বলল, আমি নৃত্যে অতিশয় নিপুণা।

উর্বশী বলল, দেব, আমি শাস্ত্রোক্ত মতে নৃত্য করতে জানি।

এইভাবে উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হলে নৃত্যে তাদের পারদর্শিতা নির্ণয়ের জন্য দেবরাজ দেবতাদের এক সভা আহ্বান করলেন। প্রথমে রম্ভার নৃত্য আরম্ভ হলো। দ্বিতীয় দিনে উর্বশীর নৃত্য হলো।

তারপর দেবতারা উভয়ের নৃত্য দেখে প্রীত হলেন, কিন্তু কে নৃত্যে বেশী নিপুণা তা নির্ণয় করতে পারলেন না তাঁরা।

তখন নারদ বললেন, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সমস্ত কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নৃত্যশাস্ত্রে নিপুণ। তিনিই এদের বিবাদ ভঞ্জন করতে পারবেন।

এরপর দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করার জন্য রথসহ মাতলিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের দ্বারা আহূত হয়ে তাঁকে নমস্কার করলে দেবরাজ তাঁকে সম্মান করে উত্তম আসনে বসালেন। পরে আবার নৃত্যের সভা অনুষ্ঠিত হলো।

প্রথমে রম্ভা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে নৃত্য করল। দ্বিতীয় দিন রঙ্গমঞ্চে উর্বশী শাস্ত্রানুসারে নৃত্য প্রদর্শন করল। বিক্রমাদিত্য উর্বশীকেই প্রশংসা করলেন এবং তার জয়কীর্তন করলেন।

ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, উর্বশীর জয় হলো কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, নৃত্যকার্যে অঙ্গ সৌষ্ঠবই প্রধান, তা নৃত্যশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অনুচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গসকলের সঞ্চালনা ও পদচালনা এবং কটি, মস্তক, চক্ষু ও কর্ণের সমানরূপ অবস্থিতি, যে যে স্থানে বিশ্রাম চিত্তাকর্ষক সেই সেই স্থানে বিশ্রাম, বক্ষস্থলের উন্নয়ন, বিশেষরূপে অভ্যাস, অস্খলন অর্থাৎ কোন ভুল না হওয়া এবং পাদসৌষ্ঠব—এই সবই নৃত্যকুশলী ব্যক্তিদের প্রধান লক্ষ্য বিষয়।

আর নর্তকীর রঙ্গযোগ্যরূপ অবস্থান একটি দেখাবার জিনিস। সে অবস্থানের কথা নৃত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যেমন চতুষ্কোণভাবে সমান পাদক্ষেপ এবং লতার আকারে হস্ত সঞ্চালন সকলরকম নৃত্যের প্রারম্ভে সাধারণ কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। আর দেহ যাতে অন্যের দ্বারা দৃষ্ট না হয় সেইরূপ দেহ হওয়া উচিত।

মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের মত কান্তিবিশিষ্ট, বাহুদ্বয় লতার মত আন্দোলিত, স্কন্ধদ্বয় সংক্ষিপ্ত, বক্ষস্থলে স্তনদ্বয় নিবিড় ও উন্নত, বাহুদ্বয় যেন প্রবিষ্ট, মধ্যস্থল হস্তপরিমিত, নিতম্ব ও জঘনের স্থান আন্দোলিত, অঙ্গুলি সুগঠিত এবং নৃত্যকালে নর্তকীর মনের অভিপ্রায়

যাতে অঙ্গভঙ্গে প্রকাশ পায়, এমনভাবে দেহ ব্যবহৃত হবে।

সমস্ত নর্তকীর এইরূপ হওয়া আবশ্যক। এই সব বিশেষ বিশেষ নৃত্যাবস্থান নর্তকীকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে। এছাড়া তাকে এও স্মরণ রাখতে হবে যে তার সন্ধিস্থলে বাম হস্ত নিতম্বের উপর বিন্যস্ত থাকবে। শ্যামাশাখার মত দ্বিতীয় হস্ত স্রস্ত রাখবে এবং কুসুম-শোভিত কুট্টিমের উপর দৃষ্টি রেখে নৃত্য করবে। কিন্তু কান্তিবিশিষ্ট পা দুটি একেবারেই স্থির রাখতে হবে যাতে স্খলন না ঘটে।

আর বেশী বলার প্রয়োজন কি? অঙ্গসমূহের মধ্যেই যেন সমস্ত কথা নিহিত আছে, এমনভাবে অঙ্গসঞ্চালন করে সমস্ত অর্থ প্রকাশ করবে। পাদদ্বয় লয়ের অনুগত হবে। রসসমূহে তন্ময়তাভাব প্রকাশ আবশ্যক। হস্তদ্বয়ের এমন মৃদুভাবে অভিনয় করতে হবে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি প্রকাশ করতে যে ভাব ব্যক্ত হবে তা যেন বিষয়ান্তরের আকর্ষণ করে। এটাই হলো প্রকৃত রাগাভিনয়।

এইভাবে নৃত্যশাস্ত্রোক্ত নিয়মে উর্বশী নৃত্য করায় আমি তাকে প্রশংসা করেছি। তখন মহেন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে বিক্রমাদিত্যকে সম্মানিত করে উৎকৃষ্ট রত্নখচিত মহামূল্য এক সিংহাসন দান করলেন।

সেই সিংহাসনে দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা খচিত ছিল। ঐ পুত্তলিকা-গুলির মস্তকে পা দিয়ে সেই সিংহাসনে আরোহণ করতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই অতি মনোহর সিংহাসন নিয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করে নিজ পুরীতে আগমন করলেন। তারপর শুভমুহূর্তে ও শুভ-লগ্নে সেই সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এইভাবে বহু বৎসর বিগত হলে প্রতিষ্ঠাননগরে আড়াই বছর বয়স্কা কন্যার গর্ভে শেষনাগের ঔরসে শালিবাহন উৎপন্ন হলো। তখন উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, দিকদাহ, ধূমকেতু প্রভৃতি উৎপাতসকল রাজা ও প্রজাগণ দর্শন করতে লাগল।

বিক্রমাদিত্য তখন বিচলিত হয়ে দৈবজ্ঞদের আহ্বান করে বললেন, হে দৈবজ্ঞগণ, রাজা ও প্রজারা কি কারণে এই উৎপাতসকল দেখতে পাচ্ছে? এই সবের ফল কি? এতে কার অনিষ্ট হবে?

দৈবজ্ঞরা বললেন, দেব, এই ভূমিকম্প সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সুতরাং তা রাজার অনিষ্টসূচনা করছে। নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে, সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প রাজার অনিষ্টপ্রদ এবং ধূমকেতু রাজার বিনাশ-সূচক। দিগ্দাহ পীতবর্ণ হলে ক্ষিতিপতিদের ভয়প্রদ হয়ে থাকে।

দৈবজ্ঞদের এই কথা শুনে রাজা আবার বললেন, হে দৈবজ্ঞ, আমি কোন এক সময় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি পর্যায়ক্রমে অমরত্ব যাচঞা করো।

এতে আমি বললাম, হে প্রভু, আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে তা হতেই আমার মৃত্যু হবে, অন্যের দ্বারা হবে না। ঈশ্বর তথাস্তু বলে সেই বর দিলেন। এখন আপনারা বলুন, তেমন ব্যক্তি কিভাবে জন্মাবে?

দৈবজ্ঞগণ বললেন, মহারাজ, দৈবসৃষ্টি অচিন্ত্যনীয়, সেইরূপ ব্যক্তি যে কোন দেশে জন্মাতে পারে এবং তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তারপর রাজা বেতালকে আহ্বান করে এই সব বৃত্তান্ত বলে পরে বললেন, হে যক্ষ, তুমি পৃথিবী মধ্যে সকল স্হানে পরিভ্রমণ করে থাক, এইরূপ সন্তান কোথায় কোন নগরে জন্মেছে তা স্হির জেনে শীঘ্র ফিরে এস।

তারপর বেতাল 'মহাপ্রসাদ' এই বলে পানের বটিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে কুশদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে শেষে প্রতিষ্ঠাননগরে এসে উপস্হিত হলো। সেই নগরে এক কুম্ভকারের বাড়িতে একটি বালক ও একটি বালিকাকে খেলা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

কন্যাটি তখন বলল, এটি আমার পুত্র।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিতা কে?

তখন কন্যাটি এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দিল। বেতাল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল, এই কন্যাটি কে?

ব্রাহ্মণ বলল, এইটি আমার কন্যা এবং এই পুত্রটি আমার গর্ভজাত।

তা শুনে বেতাল বিস্মিত হয়ে ব্রাহ্মণকে আবার বলল, হে দ্বিজবর, এ কিকরে সম্ভব ?

ব্রাহ্মণ বললেন, দেবতাদের কার্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। শেষ নাগরাজ এর সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন, সেই হেতু এর গর্ভে এই পুত্র উৎপন্ন হয়েছে। এর নাম শালিবাহন।

তা শুনে বেতাল সত্বর উজ্জয়িনীতে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সব কথা জানাল।

রাজা তাকে পারিতোষিক দিয়ে নিজে খড়্গ নিয়ে প্রতিষ্ঠাননগরে গমন করলেন। তারপর তিনি খড়্গ দ্বারা শালিবাহনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে শালিবাহন দণ্ড দ্বারা তাঁকে আঘাত করল। সেই আঘাতে বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠাননগর হতে উজ্জয়িনীতে পতিত হলেন এবং বেদনা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন।

রাজার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। মন্ত্রীবর্গ তখন বিচার করে দেখলেন রাজা অপুত্রক। এখন কর্তব্য কি ?

সভাপণ্ডিত বললেন, রাজার স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ গর্ভবতী থাকেন তাহলে তা বিচার করে দেখুন।

এবপর বিচার কবে দেখা গেল, তাঁদের মধ্যে একজন স্ত্রী সপ্তমাস গর্ভবতী আছেন। তখন অমাত্যগণ সমবেত হয়ে সেই গর্ভ অভিষেক করে তাঁরাই রাজ্যপালন করতে লাগলেন।

সেই ইন্দ্রদত্ত সিংহাসন সেইরূপ শূন্যই রইল। একদিন সভামধ্যে আকাশবাণী হলো, যে মন্ত্রীগণ, স্বয়ং রাজ্যপালন করতে এবং সিংহাসনে উপবেশন করতে উপযুক্ত এমন রাজা নেই। অতএব এই সিংহাসন কোন পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করো।

তা শুনে সমস্ত মন্ত্রীবর্গ অতি পবিত্র ক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষেপ করলেন। তারপর বহুকাল অতীত হলে ভোজরাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন।

একদিন কোন এক ব্রাহ্মণ যেখানে সিংহাসনটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল

সেইখানে শস্যক্ষেত্র করে প্রচুর শস্যের বীজ বপন করলেন। তাতে ফসলও প্রচুর হলো। যেখানে সিংহাসনটি ছিল তার উপর এক মাটির ঢিবি গড়ে ওঠে। পাখীরা মাঠের ফসল যাতে নষ্ট করতে না পারে তার জন্য সেই মাটির ঢিবির উপর একটি মঞ্চ নির্মাণ করে তার উপর বসে পাখী তাড়াতেন।

একদিন ভোজরাজ বিহার করার জন্য সমস্ত রাজকুমারদের সঙ্গে সেই মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলে মঞ্চের উপর থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, এই মাঠে ভালই ফসল ফলেছে। আপনি সৈন্যগণসহ এসে ইচ্ছামত উপভোগ করুন এবং অশ্বগণকে চনক খেতে দিন। আজ আমার জন্ম সফল হলো, যেহেতু আপনি আমার অতিথি হলেন। এমন ঘটনা কি সৌভাগ্য ছাড়া ঘটতে পারে?

তা শুনে সসৈন্যে মাঠে প্রবেশ করলেন ভোজরাজ। ব্রাহ্মণ তখন মঞ্চ থেকে নেমে এসে রাজাকে বললেন, হে রাজন, আপনি কেন এমন অকর্ম করছেন? এটি ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কেন তা বিনষ্ট করছেন? যদি অন্য কেউ অন্যায় করে আপনাকেই তা নিবেদন করে, অথচ আপনিই স্বয়ং অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এখন কে আপনাকে নিবেদন করবে? শাস্ত্রে বলে, কণ্ডুপীড়ায় গজ, প্রজাব্যভিচারী রাজা, পাপকারী বিদ্বান—এদেরকে কে নিবারণ করতে পারে?

আপনি ধর্মশাস্ত্র জানেন, ব্রাহ্মণের দ্রব্য কেন বিনষ্ট করছেন? এই ব্রাহ্মণের সম্পদ বড় বিষয়বস্তু। শাস্ত্রে বলে সাধারণ বিষ বিষই নয়, ব্রহ্মস্বই বিষপদবাচ্য। কেন না, বিষ পানকারীকেই বিনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বিষ পুত্র পৌত্রকেও বিনাশ করে থাকে।

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা স্বপরিজন ক্ষেত্র হতে বাইরে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ তখন আবার পাখী তাড়ানোর জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করে বললেন, হে রাজন, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? এই ক্ষেত্রে উত্তম ফসল ফলেছে। আপনার অশ্বগণ যাবনাল দণ্ডসমূহ ভক্ষণ করুক। আর আপনিও কর্কটিকা ফলসমূহ ভক্ষণ করুন।

এই কথা শুনে রাজা সসৈন্যে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করতেই পাখী

ওড়াবার জন্য ব্রাহ্মণ আবার মঞ্চ থেকে নেমে এসে সেইরকম তিরস্কার করতে লাগলেন।

রাজা তখন মনে মনে বিচার করলেন, কি আশ্চর্য! যখন এই ব্রাহ্মণ মঞ্চের উপর আরোহণ করেন তখন তাঁর মনের মধ্যে উদার ও দাতব্য ভাব জাগে, কিন্তু তিনি আবার যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসেন তখন বিপরীত ভাব মনে জাগে তাঁর। এর কারণ কি? ভাল, আমি একবার মঞ্চে আরোহণ করে দেখি।

এই ভেবে মঞ্চের উপর আরোহণ করলেন ভোজরাজ। তখন তাঁর মনে এইরকম ভাব জাগল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ দূর করা তাঁর কর্তব্য। সমস্ত লোকের দারিদ্র্য নিবারণ করা উচিত। এমন কি তখন কেউ যদি তাঁর দেহটি প্রার্থনা করত তাহলে তাও তিনি দান করতে পারতেন।

এই ভেবে রাজা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বিচার করলেন, এই ক্ষেত্রই এইরকম ভাব বা বুদ্ধির উদ্রেক করছে। শাস্ত্রে নিহিত আছে, জলে তৈল, খলে গুহ্যবিষয়, সৎপাত্রে অন্নদান, প্রাজ্ঞে শাস্ত্র—এই সকল বিষয় বস্তুশক্তিপ্রভাবে আপনা আপনিই বিস্তারলাভ করে থাকে।

রাজা তখন ভাবলেন, কিভাবে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায়? এই ভেবে তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, হে দ্বিজবর, আপনার এই ক্ষেত্র হতে কি পরিমাণ উপার্জিত হয়?

ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, আপনার অবিদিত কিছুই নেই। যা উপযুক্ত হয় তাই করুন। রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ। যার উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হয় তারই দৈন্য দুর্ভিক্ষাদি দূর হয়। রাজা সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপ। সেই রাজা আপনি যখন আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, তখন আমার সকল দৈন্যদারিদ্র্যের অবসান হবে। ক্ষেত্র আর কত মূল্যবান হবে?

এরপর রাজা ব্রাহ্মণকে বহু ধনধান্য দান করে পরিতুষ্ট করে সেই ক্ষেত্র খনন করাতে লাগলেন। সেখানে পুরুষপ্রমাণ গর্ত হলে তার মধ্যে এক মনোহর শিলা দেখা গেল। সেই শিলার নীচের দিকে চন্দ্রকান্ত শিলানির্মিত ও নানা রত্নখচিত দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাযুক্ত এক

সিংহাসন দেখা গেল।

সেই সিংহাসন দেখে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ভোজরাজের হৃদয়। তিনি সিংহাসনটিকে উঠিয়ে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সিংহাসনটি তুলতে গিয়ে দেখা গেল সেটি এত ভারী যে তা কিছুতেই উঠল না।

রাজা তখন তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে এ সিংহাসন উঠছে না?

মন্ত্রী বললেন, এই সিংহাসন দিব্য ও অপূর্ব। বলি, হোম ও পূজাদির অনুষ্ঠান না করলে এ সিংহাসন নড়বে না এবং আপনি তুলতেও পারবেন না।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে তাঁদের দ্বারা সমস্ত বিধান সম্পন্ন করালেন। তখন সেই সিংহাসন আপনা থেকেই লঘু হয়ে উঠে পড়ল।

রাজা তা দেখে মন্ত্রীকে বললেন, হে অমাত্যপ্রবর, প্রথমে এ সিংহাসন তুলতে পারিনি, কিন্তু এখন আপনারই বুদ্ধিপ্রভাবে এটি আমার হস্তগত হলো। বুদ্ধিমানদের সংসর্গলাভ সর্বদা সুখের কারণ হয়ে থাকে।

মন্ত্রী বললেন, রাজন, যে নিজে বুদ্ধিমান নয় এবং পরের বুদ্ধিও গ্রহণ করে না সে সর্বপ্রকারে বিনাশ পায়। কিন্তু আপনি নিজে বুদ্ধিমান হয়েও বিশ্বস্তজনের বুদ্ধি গ্রহণ করেন এবং তাদের বাক্য শ্রবণ করেন, এইজন্য আপনার কোন কার্যেই ব্যাঘাত ঘটে না।

রাজা বললেন, যিনি অনর্থকার্য নিবারণ করেন এবং আগামী বিষয় সাধন করেন তিনিই ত যথার্থ মন্ত্রী। শাস্ত্রে উক্ত আছে, উপস্থিত কার্যের পরিচালনার জন্য, ভবিষ্যৎকার্যকে সম্ভব করে তোলার জন্য ও অনর্থকার্যকে প্রতিহত করার যে ব্যক্তি মনন বা চিন্তা করে উপায় স্থির করতে পারেন সেই ব্যক্তিই উত্তম মন্ত্রী বলে কথিত হয়।

মন্ত্রী বললেন, প্রভুর হিতকার্য সাধন করা মন্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। যাঁদের মন্ত্রণা কার্যের অনুশালিনী হয় এবং কার্য প্রভুর হিতানুযায়ী হয়

তাঁরাই রাজমন্ত্রী হবার যোগ্য। অন্য মন্ত্রীগণ কপোলদেশজাত মাংসের মত ক্লেশদায়ক। তারা রাজমন্ত্রীর যোগ্য নয়।

শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে, মন্ত্রী বিনা রাজা, ধন বিনা গৃহ, যৌবন বিনা সৌভাগ্য এবং জ্ঞান বিনা বৈরাগ্য বৃথা হয়। দুর্জনদের শান্তি, পাষণ্ডদের বুদ্ধি, বেশ্যাদের প্রীতি, খলদের মিত্রতা, পরাধীনের অবস্থান, নির্ধনের রোষ, সেবকের কোপ, স্বামীর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণী স্ত্রীদের পতিভক্তি, চোরদের যুক্তি, মূর্খদের মতামত—এই সমস্তই নিষ্ফল জানবে।

মহৎ ব্যক্তির সেবা, বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বাক্য শ্রবণ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের পালন এবং ন্যায়পথে চলা রাজাদের কর্তব্য। হে রাজন, রাজলক্ষণের উপযুক্ত গুণ বিদ্যমান আছে আপনার মধ্যে। সমস্ত রাজগণের মধ্যে আপনি উত্তম। মন্ত্রীরও এই সব গুণ থাকা উচিত। যিনি কুল-ক্রিয়ানুসারে কামন্দক ও চাণক্য এবং পঞ্চতন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রকলায় অভিজ্ঞ তিনিই মন্ত্রী। রাজার কার্যে উদ্যম, পাপ হতে ভয়, প্রজাদের মধ্যে মন্ত্রগোপন, পরিচারকদের কার্যে নিয়োগ, রাজার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ, সময়োচিত পরিজ্ঞান, অনিষ্টকর কার্য হতে রাজাকে নিবারণ করা— এই সমস্ত গুণ থাকলে মন্ত্রীপদবাচ্য হয়। যেমন বহুশাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন নন্দরাজমন্ত্রী বহুশ্রুত ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।

ভোজরাজ বললেন, তা কি রকম ?

মন্ত্রী বললেন, হে রাজন, বলছি শুনুন। বিশালা নগরীতে নন্দ নামে মহা শৌর্যবীর্য সমন্বিত এক রাজা ছিলেন। তিনি আপন বাহুবলে সমস্ত শত্রুরাজাদের নিজের পাদপদ্মের অধীন করে একচ্ছত্র রাজত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে এক পুত্র, যজ্ঞবিধ দণ্ডনীতি, শাস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বহুবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বহুশ্রুত নামে এক মন্ত্রী এবং ভানুমতী নামে এক ভার্যা ছিল। সেই ভানুমতী রাজার খুবই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রাজা সর্বদা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে সুরত সুখ উপভোগ করতেন। এমন কি যখন সিংহাসনে বসতেন, তখনও ভানুমতীকে তাঁর অর্ধাঙ্গে বসাতেন। ক্ষণকালও তাঁর বিরহ সহ্য করতে

পারতেন না।

একদিন মন্ত্রী মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই রাজা নির্লজ্জভাবে সভার মাঝে স্ত্রীকে অর্ধাসনে বসিয়ে থাকেন, সমস্ত লোক রাণীকে দেখে থাকে। এ কার্য খুবই অনুচিত। অথচ রাজার সে জ্ঞান নেই। কারণ কামী ব্যক্তির উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে না।

উক্ত আছে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের বহু পদ্মলোচনা অপ্সরা থাকলেও তিনি তপস্বিনী অহল্যাতে উপগত হয়েছিলেন। যখন হৃদয়রূপ তৃণ-কুটির মদনানলে দগ্ধ হতে থাকে, তখন পণ্ডিত হয়েও কোন ব্যক্তি উচিত অনুচিত বিবেচনা করতে পারে না।

মানুষ যতক্ষণ রমণীদের কটাক্ষবাণে ভিন্নহৃদয় না হয় ততক্ষণই ধৈর্য ও মর্যাদা বহন করতে পারে। যতক্ষণ মানিনী রমণীদের ক্ষীরসমুদ্র-পারের বেলামণ্ডলের মত বিলাসবিশিষ্ট লীলায়ত আয়ত লোচনের কটাক্ষদ্বারা হৃদয় বিদ্ধ না হয় ততক্ষণই পুরুষদের প্রতিষ্ঠা, মনশ্চাঞ্চল্যের দমন ততক্ষণই, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশক শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সূত্র ততক্ষণই স্ফুরিত হতে থাকে তাদের হৃদয়ে। কি আশ্চর্য! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করে তোলে।

উক্ত আছে, দেব মকরকেতন কলাবিদ ব্যক্তিকে ক্ষণমাত্রেই বিকল করেন। শুচি ব্যক্তিকে লোকের উপহাসাস্পদ করেন, পাণ্ডিত্যের লাঞ্ছনা করেন, বীরপুরুষকে উন্মত্ত করে থাকেন।

আরও উক্ত আছে, মদনমূঢ় ব্যক্তি বণিতানলে প্রবেশ করে বেদাভ্যাস, সত্য, তপস্যা, সচ্চরিত্র, নিষ্কাম, পরম তত্ত্ব—এই সমস্তই ঐ অনলের ইন্ধন যুগিয়ে থাকে।

যে কামুক, সে পূর্বাপর বৃত্তান্ত, বলক্ষয়, নিজ বংশের কলঙ্ক এবং নিকটমৃত্যু—এই সমস্ত কিছুই দেখতে পায় না।

এই চিন্তা করে একদিন মন্ত্রী অবসরমত রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমার কিছু নিবেদন আছে।

রাজা বললেন, কি তা বল।

মন্ত্রী বললেন, রাণী ভানুমতী যে সভামধ্যে বসে থাকেন—এটা

অতিশয় অনুচিত বিষয়। রাজমহিষী অসূর্যম্পশ্যা, এটা শাস্ত্রকারদের বাক্য। এখানে বিবিধ চরিত্রের লোক এসে তাঁকে দেখে। এটা কখনই ভাল দেখায় না।

রাজা বললেন, সকলই জানি, কিন্তু কি করি, ভানুমতীর প্রতি আমার অসীম প্রীতি, তাকে পরিত্যাগ করে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করতে পারি না।

মন্ত্রী বললেন, তবে এইরূপ করুন।

রাজা বললেন, কি তা নিরূপণ করুন।

মন্ত্রী বললেন, কোন চিত্রকর দ্বারা পটের উপর ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করিয়ে সামনে ভিত্তিতে তা আটকে রেখে তাঁর রূপ দর্শন করবেন।

মন্ত্রীর কথা রাজার মনে লাগল। তিনি তখন চিত্রকরকে ডেকে বললেন, হে চিত্রকর, তুমি ভানুমতীর রূপ চিত্রে অঙ্কিত করো।

চিত্রকর বলল, দেব, আমি প্রথমে তাকে প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করি, পরে যেখানে যেমন অবয়ব আছে, সেইভাবেই অঙ্কিত করব।

তা শুনে রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করে চিত্রকরকে দেখালেন। চিত্রকর ভানুমতীকে দেখে তিনি পদ্মিনী স্ত্রী ভেবে পদ্মিনীলক্ষণযুক্ত একটি প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করতে লাগলেন।

শাস্ত্রে পদ্মিনীর লক্ষণ উক্ত আছে—যে রমণীর দেহ কমলকোরকের মত মৃদু, যার গাত্রগন্ধ প্রফুল্ল কমলতুল্য, যার প্রতি অঙ্গে দিব্য সৌরভ এবং সুরসরসে সুগন্ধ, যার নেত্রযুগল চকিতহরিণসদৃশ সর্বদা চঞ্চল এবং প্রান্তদেশ কৃষ্ণবর্ণ, স্তনযুগল বিম্বফলতুল্য শোভাময় এবং অনুপম।

যার নাসিকা তিনপুষ্পের মত, সেই নারীই পদ্মিনী নামে খ্যাত। যে নারী সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্বিজ, দেবতা ও গুরুপূজা করে থাকে, যে নারী চম্পকের মত গৌরবর্ণা, কুবলয়দলের মত লাবণ্যময়ী, মনোহর পত্রবিশিষ্ট প্রফুল্লকমলের মত যার অঙ্গবিশেষ সেই নারীই পদ্মিনী।

যে নারী ক্ষীণাঙ্গী, রাজহংসীর মত লীলাবিলাসময়ী ও মৃদুমন্দ-গমনা, হংসের মত অস্ফুটভাষিণী, যার মধ্যদেশে মনোহর ত্রিবলী, এইরূপ বেশভূষাসজ্জিতা, মৃদু লঘুশুচি আহারপ্রিয়া, ধবলকুসুমতুল্য

কোমল বসনপ্রিয়া সেই নারীকেই পদ্মিনী বলে।

এইভাবে চিত্রকর পদ্মিনীলক্ষণযুক্ত ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করে রাজার হাতে অর্পণ করল। রাজাও চিত্রাঙ্কিত ভানুমতীকে দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন এবং চিত্রকরকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করলেন।

এরপর রাজপুরোহিত শারদানন্দ চিত্র অঙ্কিত ভানুমতীকে দেখে চিত্রকরকে বললেন, হে চিত্রকর, ভানুমতীর সমস্ত লক্ষণই চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তুমি একটি জিনিস আঁকতে ভুল করেছ।

চিত্রকর বলল, কি ভুলেছি প্রভু ?

শারদানন্দ বললেন, রাণীর বামজঘনস্থলে তিলকের মত এক মৎসচিহ্ন আছে। তা তুমি আঁকনি।

রাজাও শারদানন্দের কথা শুনে সে কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য সুরতকার্যের সময় যখন ভানুমতীর বামজঘন দেখলেন তখন তিলকসদৃশ মৎসচিহ্ন দেখতে গেলেন। তা দেখে রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, শারদানন্দ রাণীর গুপ্তস্থানস্থিত মৎসচিহ্ন কি করে দেখতে পেলেন ? তাতে বোধহয়, রাণীর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয় দেহসংসর্গ ঘটেছে। তা না হলে কিরূপে তা জানতে পারলেন ? স্ত্রীদের চরিত্র বিষয়ে পাপসন্দেহ করা কর্তব্য।

শাস্ত্রে বলে, নারীরা একজনের সঙ্গে কথা বলে আর বিলাসসহকারে অন্য ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করে, আবার হৃদয়ে অন্য ব্যক্তিকে চিন্তা করে। অতএব স্ত্রীদের একজনের উপর অনুরাগ স্থির থাকে না।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিদ্বারা, সমুদ্র যেমন নদীসমূহদ্বারা এবং অন্তক বা যম যেমন সমস্ত জীবদ্বারা তৃপ্তিলাভ করতে পারে না তেমনি কামিনীগণও পুরুষদ্বারা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না।

শাস্ত্রে নারদকে লক্ষ্য করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, হে নারদ, উপযুক্ত সময়, নির্জন স্থান ও প্রার্থনাকারী পুরুষের অভাবেই নারীদের পাতিব্রত্যধর্ম রক্ষিত হতে পারে।

যে মূঢ় ব্যক্তি মোহবশে মনে করে এই নারী আমার প্রতি অনুরক্ত আছে, সেই ব্যক্তি নৃত্যক্রীড়ায় ময়ূরের মত তার বশীভূত হয়ে পড়ে।

আসলে নারীজাতি কারো স্থিরানুরাগিণী হবার নয়।

যে কৃতী ব্যক্তি নারীদের কথা অনুসারে কার্য করে সে লোকসমাজে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। নারীগণ রক্তবর্ণ অলক্তকের মত অনুরক্ত পুরুষদের হৃতসর্বস্ব করে পাদমূলে নিবেদিত করে থাকে।

রাজা এইসব কথা জিজ্ঞাসা করে মন্ত্রীকে ডেকে পূর্ববৃত্তান্ত সব বললেন। মন্ত্রীও রাজার চিত্তের অনুকূলভাবে বললেন, কার মনে কি আছে কে জানে? এই বৃত্তান্ত সত্যও হতে পারে।

রাজা বললেন, মন্ত্রীবর, যদি তুমি আমার বাধ্য হও তাহলে শারদানন্দের প্রাণ বিনাশ করো।

মন্ত্রী তখন তথাস্তু বা তাই হোক বলে শারদানন্দকে সকলের সামনে গ্রেপ্তার করে আটক করে রাখলেন। শারদানন্দ তখন বলতে লাগলেন, হায়, রাজা যে কারও প্রিয় নয় এই লোকোক্তি সর্বদাই সত্য।

কোন ব্যক্তি অর্থ পেয়ে গর্বিত না হয়? কোন বিষয়ী ব্যক্তি আপদে পতিত না হয়? পৃথিবীতে স্ত্রীজাতিদ্বারা কার মন খণ্ডিত না হয়? কোন ব্যক্তি রাজার চিরপ্রিয় হয়? কালের গোচরীভূত হয়নি এমন কে আছে? কোন যাচঞাকারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়? কোন ব্যক্তি দুর্জন ব্যক্তির কূটজালে নিপতিত হয়ে মঙ্গলসহকারে উদ্ধার পেতে পারে?

কাকের পবিত্রতা, দ্যূতকারের সত্যবাদিতা, ক্লীবের বীরত্ব, মদ্যপায়ীর তত্ত্বজ্ঞান, সর্পের ক্ষমা, স্ত্রীলোকের কামনির্বাণ এবং রাজার মিত্রতা কে কবে দেখেছে বা শুনেছে?

রাজা যার প্রতি কুপিত হন সে নিষ্পাপ হলেও পাপী। রাজার ক্রোধহেতু মানুষগণ শুচি হলেও অশুচি, পটু হলেও অপটু, বীর হলেও ভীরু, দীর্ঘায়ু হলেও স্বল্পায়ু এবং কুলীন হলেও কুলহীন হয়।

এরপর মন্ত্রী শারদানন্দকে বধ্যস্থানের দিকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে শারদানন্দ এই শ্লোকটি পাঠ করতে লাগলেন। মানুষের পূর্বকৃত পুণ্যসমূহ বন ও রণমধ্যে, জল ও অগ্নিমধ্যে, মহাসমুদ্রে অথবা পর্বত-মস্তকেও মানুষকে রক্ষা করে। সুপ্ত, প্রমত্ত বা বিষম দশায় পড়লেও উদ্ধার করে।

একথা শুনে মন্ত্রী মনে মনে বিচার করলেন, এই বিষয় সত্যই হোক বা মিথ্যাই হোক, ব্রাহ্মণ বধ করা একান্তই অবিধেয়, এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এই ভেবে তিনি শারদানন্দকে অন্যের অজ্ঞাতসারে গুপ্তভবনমধ্যে লুকিয়ে রেখে রাজাকে গিয়ে সংবাদ দিলেন, আপনার আদেশ প্রতিপালন করলাম।

রাজা বললেন, উত্তম।

এরপর একদিন রাজকুমার মৃগয়া করার জন্য বনমধ্যে গমন করলেন। যাত্রাকালে নানা কুলক্ষণ দেখা যেতে লাগল। যেমন অকালবৃষ্টি, মৃতাশৌচ, বজ্রপাত, উল্কাপতন, পশ্চাৎ সুহৃদের নিষেধবাক্য—এই সব অমঙ্গলসূচক অনিষ্ট দর্শন হতে লাগল।

এমন সময় মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিসাগর রাজকুমারকে বললেন, কুমার জয়পাল, আজ মৃগয়ায় যাবেন না, নানা কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

জয়পাল বললেন, আমি কুলক্ষণ বিশ্বাস করি না।

বুদ্ধিসাগর বললেন, কুমার, অনিষ্টকর দুর্লক্ষণ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানদের একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করবেন না, বিষধরের সঙ্গে খেলা করবেন না, যোগীদের নিন্দা করবেন না এবং ব্রহ্মদ্বেষ করবেন না।

এইভাবে মন্ত্রীপুত্র নিষেধ করলেও কুমার তাঁর কথায় অনাদর প্রদর্শন করে মৃগয়ায় গমন করলেন। যাত্রাকালে মন্ত্রীপুত্র আবার বললেন, হে জয়পাল, আপনার বিনাশকাল উপস্থিত, তা না হলে এমন বুদ্ধির উদয় হত না।

আসলে কুমার জয়পালের একটি কাঞ্চনমৃগ ধরার বাসনা হয়েছিল। কারণ এই কাঞ্চনমৃগ আগে কেউ ধরেনি, দেখেনি বা তার কথা শোনেওনি। বিনাশকালে এই বিপরীত বুদ্ধি জেগেছিল তাঁর মধ্যে।

উপার্জিত কৃতকর্মসমূহের ভোগ ছাড়া বিনাশ সম্ভব নয়। বেশ্যাদের ভদ্রতা নেই, সম্পদের স্থায়িত্ব নেই, মূর্খদের বিবেচনাশক্তি নেই। তেমনি কৃতকর্মের ভোগ ব্যতীত বিনাশ নেই।

বনে গিয়ে রাজকুমার জয়পাল অনেক জন্তু বধ করার পর একটি

কৃষ্ণসার মৃগ দেখতে পেলেন। সেই মৃগকে বধ করার জন্য তিনি গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরে দেখলেন তিনি একা, সব সৈন্য নগরে ফিরে গেছে। এদিকে কৃষ্ণসার মৃগটিও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, তাকে আর দেখতে পেলেন না।

তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে একা ফিরতে ফিরতে পথে একটি সরোবরের ধারে একটি বন দেখতে পেলেন। সেখানে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে একটি গাছের শাখায় বেঁধে সরোবরে জলপান করতে গেলেন। জলপান করে ফিবে এসে গাছের তলায় বসতেই একটি ভয়ঙ্কর বাঘ এসে উপস্থিত হলো সেখানে। বাঘ দেখে ঘোড়াটি দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে নগরে পালিয়ে গেল। রাজকুমার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাছের উপর উঠে পড়লেন।

সেই গাছে তার আগেই একটি ভালুক উঠেছিল। ভালুক দেখে রাজকুমার আরও বেশী ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন ভালুক বলতে লাগল, হে রাজকুমার, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না, আমায় বিশ্বাস করো। বাঘ হতেও তোমার কোন ভয় নেই।

রাজকুমার বললেন, ঋক্ষরাজ, আজ আমি তোমার শরণাগত, বিশেষত ভয়ে ভীত। অতএব শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য তোমার মহৎ পুণ্য হবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, একদিকে উত্তম সহস্র দক্ষিণাবিশিষ্ট সর্ববিধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে ভয়ভীত প্রাণীদের প্রাণরক্ষা—এই উভয়ের ফলই সমান।

তখন ভালুক রাজপুত্রকে আশ্বাস দান করল। সেই বাঘটিও গাছের তলায় বসে রইল। ক্রমে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করলেন। রাত্রি গভীর হলে রাজকুমার যখন নিদ্রা যেতে আরম্ভ করলেন তখন ভালুক বলল, ঘুমের ঘোরে গাছের তলায় পড়ে যাবে, এস, আমার কোলে ঘুমোও।

এরপর রাজকুমার ভালুকের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন বাঘ নিচে থেকে ভালুককে বলল, ওহে ভালুক, এই রাজপুত্র নগরবাসী, এ আবার মৃগয়া করতে এসে আমাদের বিনাশ করবে। এ ব্যক্তি আমাদের

শত্রু। কেন তবে একে কোলে নিয়েছ? যেহেতু এ ব্যক্তি মানুষ, একে বিশ্বাস করা উচিত নয়। পশুপক্ষীদের মধ্যে যে সত্য আছে মানুষদের মধ্যে সে সত্য নেই। আবার বাঘ, বানর ও সর্পদের কথাও সত্য হয় না।

তুমি এর উপকার করলে এ ব্যক্তি তোমার অপকার করবে। অতএব একে নিচেতে ফেলে দাও। আমি একে ভক্ষণ করে সুখে বনে চলে যাই। তুমিও নিজের বাসায় চলে যাও।

ভালুক বলল, এ ব্যক্তি যেমনই হোক, আমার শরণাগত। আমি একে ফেলে দেব না। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করলে মহৎ পাপ হয়। কথিত আছে, বিশ্বাসঘাতক ও শরণাগত ঘাতক উভয়েই প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে থাকে।

তারপর রাজকুমার জেগে উঠলে ভালুক বলল, রাজকুমার, আমি এবার কিছুকাল ঘুমোব। তুমি সাবধানে থাকবে।

রাজপুত্র বলল, আমি তাই করব।

এরপর ভালুক রাজকুমারের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন বাঘ বলল, হে রাজকুমার, তুমি ওকে বিশ্বাস করো না, কারণ ভালুক নখায়ুধ অর্থাৎ নখরূপ অস্ত্র আছে তার। শাস্ত্রে বলে, নদী, নখী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রপাণি অর্থাৎ হাতে যার অস্ত্র আছে, নারী ও রাজকুল—এই সকলের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়।

এই ভালুকের চিত্তও চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। তার অভয়দানও ভয়ঙ্কর জানবে। কথিত আছে, যারা ক্ষণে তুষ্ট এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিদের প্রসন্নতাও ভয়ঙ্কর। ভালুক আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে নিজে ভক্ষণ করতে চায়। অতএব তুমি একে ফেলে দাও, আমি একে ভক্ষণ করে চলে যাই।

রাজকুমার বাঘের কথায় বিশ্বাস করে যেমন ভালুককে গাছ থেকে ফেলে দিল, অমনি সে পড়ে যাবার আগে একটি শাখা ধরে ফেলল। তা দেখে ভয় পেয়ে গেল রাজকুমার।

ভালুক কুমারকে বলল, রে পাপিষ্ঠ, ভয় করছিস কেন? পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মফল তোকে ভোগ করতেই হবে। অতএব তুই 'সসেমিরা'

এই কথাটি বলতে থাক আর তুই পিশাচ হয়ে যা।

তখন রাত্রি প্রভাত হলো। অভিশাপ দিয়ে ভালুক চলে গেল। বাঘও সেখান থেকে চলে গেল।

এরপর রাজকুমার পিশাচ হয়ে 'সসেমিরা' কথাটি বলতে বলতে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে রাজপুত্রের ঘোড়াটি শূন্যপিঠে নগরে ফিরে গেলে নগর-বাসীরা রাজপুত্রবিহীন ঘোড়াটির ফিরে আসার কথা রাজাকে নিবেদন করল।

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রীবর, রাজকুমার যখন মৃগয়ার জন্য বনগমন করে তখন নানা কুলক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে সে গেছে। এখন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দেখ, তার বাহন অশ্ব শূন্য অবস্থায় বন হতে ফিরে এসেছে। তার অমঙ্গল ঘটেছে। অতএব চল, আমরা তার অন্বেষণের জন্য বনে গমন করি।

মন্ত্রী বললেন, দেব, তা করা একান্ত কর্তব্য।

রাজা তখন মন্ত্রী ও পরিজনবর্গকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার যে পথ দিয়ে বনগমন করেছিলেন, সেই পথ দিয়ে বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, রাজপুত্র পিশাচ হয়ে 'সসেমিরা' কথাটি বলতে বলতে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজা কুমারকে সেই অবস্থায় দেখে শোক-সাগরে নিমগ্ন হলেন এবং তাঁকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। তারপর রাজা মণি, মন্ত্র ও ওষধাদিবিজ্ঞ ব্যক্তিদের ডেকে রাজপুত্রের অনেক চিকিৎসা করালেন। তবু রাজপুত্র সুস্থ হলেন না।

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, যদি এই সময় শারদানন্দ থাকতেন তাহলে ক্ষণকালের মধ্যেই একে আরোগ্য করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁকে বিনাশ করেছি। এখন মনে হচ্ছে, পুরুষ যে কার্য করে তা বিচার করে করাই কর্তব্য। তা না হলে পরে বিপদ এসে উপস্থিত হয়।

উক্ত আছে, বিশেষ বিবেচনা না করে কোন কর্ম করবে না, কারণ অবিবেচক ব্যক্তি পরম আপদের আকরস্বরূপ। যে ব্যক্তি বিবেচনা করে

কার্য করে, গুণপক্ষপাতিনী সম্পদ স্বয়ং এসে তাকে বরণ করে। পরীক্ষা না করে কর্ম করা উচিত নয়, পরীক্ষা করেই কার্য করা উচিত। পরীক্ষা না করে কার্য করলে ব্রাহ্মণী ও লগুড়ের মত অনুতাপ করতে হয়। শারদানন্দকে দণ্ডদানের সময় কেউ আমাকে নিবৃত্ত করেনি।

মন্ত্রী বললেন, সেই সময় যা হয়েছিল তাতে এমন ঘটনা ঘটবারই কথা। ভবিতব্যতা যেমন হয় বুদ্ধিও তেমনি উৎপন্ন হয়ে থাকে। উক্ত আছে, ভবিতব্যতা যেমন হয়, সেই সময়, আশা, বুদ্ধি, চিন্তা এবং সহায়ও তেমনি হয়ে থাকে। আর ভবিতব্যতা যদি না থাকে তবে তা যত্ন না করলেও সংঘটিত হয় না। কিন্তু যত্ন না করলেও যা ভবিতব্য তা আপনি ঘটে থাকে। যা হবার নয় তা করতলগত হলেও বিনষ্ট হয়।

রাজা বললেন, আমার কর্মানুসারেই তা ঘটেছে। সে যা হোক, এখন কুমারের বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য।

মন্ত্রী বললেন, উপায় কি করা হবে বলুন।

রাজা বললেন, যে কোন ব্যক্তি রাজপুত্রকে চিকিৎসা করে সুস্থ করবে তাকে অর্ধেক রাজ্য দান করব—রাজ্যমধ্যে এইভাবে ঘোষণা করা হোক।

মন্ত্রীও এই ঘোষণার ব্যবস্থায় নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। তারপর শারদানন্দকে সব কথা বললেন। সেই সব শুনে শারদানন্দ বললেন, আপনি রাজার সামনে গিয়ে প্রস্তাব করুন, আমার এক কন্যা আছে, তার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ করাতে হবে। সে কোন উপায় বিধান করতে পারে।

মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে একথা জানালেন।

রাজা তা শুনে সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রীভবনে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর রাজকুমারকে সেখানে আনা হলো। রাজকুমার 'সসেমিরা' বলতে বলতে সেখানে এসে বসলেন। তখন পাশের একটি ঘরে পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ এই সকল শ্লোক বলতে লাগলেন।

যারা সভ্যতা অবলম্বন করে বিশ্বস্তভাবে থাকে, তাদের বঞ্চনা করাতে কি কৃতিত্ব আছে? যে কোলে উঠে ঘুমিয়ে আছে তাকে বধ করায় পুরুষকার কি?

এই শ্লোক শুনে রাজপুত্র সসেমিরা—এই চার অক্ষরের মধ্যে প্রথম অক্ষর ছেড়ে 'সেমিরা' অক্ষর তিনটি বারবার বলে যেতে লাগলেন। শারদানন্দ তখন দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করলেন।

সমুদ্রসেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধরামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু মিত্রহত্যাকারী ব্যক্তি কোথাও মুক্তিলাভ করতে পারে না।

এই শ্লোক শুনে রাজকুমার 'সসে' এই অক্ষরটি ছেড়ে শুধু 'মিরা' এই অক্ষরদুটি বারবার বলতে লাগলেন। শারদানন্দ তখন তৃতীয় শ্লোক পাঠ করলেন।

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন আর বিশ্বাসঘাতক এই তিন ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে থাকে।

এই শ্লোক শুনে রাজপুত্র 'সসেমি' এই তিন অক্ষর বর্জন করে শুধু 'রা' এই একটি অক্ষর বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। এরপর শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন।

রাজন, আপনি যদি নিজপুত্রের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে দ্বিজ-গণকে দান ও দেবতাদের আরাধনা করুন।

শারদানন্দ এই চতুর্থ শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সচেতন হয়ে উঠলেন রাজপুত্র। তখন তিনি পিতার কাছে নিজেই ভালুকের সব বৃত্তান্ত বর্ণনা কবলেন।

তা শুনে রাজা পর্দার আড়ালে স্থিত শারদানন্দকে তাঁর কন্যা মনে করে বললেন, হে কুমারী, গ্রামে বাস করো, কখনো বনে গমন করনি, তুমি কি করে ভালুক ও বাঘেব ভাষা জানতে পারলে?

তখন পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ বললেন, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। হে রাজন, সেই প্রভাবেই আমি ভানুমতীর তিলকের বিষয় জানতে পেরেছিলাম।

তা শুনে রাজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিতেই শারদা-নন্দকে দেখতে পেলেন। তখন রাজা ও সকলে প্রণাম করলেন শারদা-নন্দকে। মন্ত্রী এবার পূর্ববৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন।

রাজা তখন বহুবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীকে বললেন, হে মন্ত্রীবর, তোমার সংসর্গে আমার কীর্তিলাভ ও দুর্গতিবিনাশ হলো। সুতরাং সৎসঙ্গ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য, তাতে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়ে থাকে।

সজ্জনসঙ্গ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয়প্রকার বিপদ নিবারণ করে। যেমন গঙ্গাজল পান করলে তৃষ্ণানাশ ও দুর্গতিনাশ এই উভয় কার্যই সিদ্ধ হয়। আমার পুত্র তোমার বুদ্ধিকৌশলে মহৎ বিপদজাল হতে মুক্ত হয়েছে। এখন মহাবংশোদ্ভব সৎব্যক্তিদের সংগ্রহ করা রাজার একান্ত কর্তব্য।

উক্ত আছে, গারুড়িক অর্থাৎ সর্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরা যেমন সর্প সংগ্রহ করে, তেমনি রাজাও কুলীন মন্ত্রীদের সংগ্রহ করবেন। তাতে তিনি প্রশংসার পাত্রই হন।

এইভাবে নানা প্রশংসাবাক্যের দ্বারা রাজা মন্ত্রীকে প্রীত ও বস্ত্রাদি-দ্বারা সম্মানিত করে পরম সুখে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই আখ্যান বর্ণনা করার পর আবার বললেন, যে রাজা মন্ত্রীবাক্য শ্রবণ করেন তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হন।

প্রথম উপাখ্যান

তারপর ভোজরাজ নিজমন্ত্রীর প্রশংসা ও সম্মান করে সেই সিংহাসনটিকে রাজপুরীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট এক মণ্ডপ নির্মাণ করে শুভক্ষণে সেই মণ্ডপমধ্যে মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

এরপর ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে ও বন্দীগণের স্তবে অভিনন্দিত হয়ে রাজা চতুর্বর্ণ প্রজাদের দান ও মান দ্বারা সম্মানিত করলেন। দীন, দরিদ্র, পঙ্গু, মূক, বধির প্রভৃতি ব্যক্তিদের দান দ্বারা তৃপ্ত করলেন। তারপর ছত্র-চামরাদিদ্বারা সুশোভিত হয়ে রাজা যেমন সিংহাসনে বসার জন্য পুত্তলিকার মাথায় পা রাখতে যাবেন অমনি পুত্তলিকা মানুষের মত কণ্ঠে বলল, হে রাজন, যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের মত শৌর্য, ঔদার্য ও

ধৈর্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা বললেন, হে পুত্তলিকা, তুমি যে সব গুণের কথা বললে আমারও ঐ সমস্ত গুণ আছে। তুমি কি মনে করো ঐ সমস্ত গুণের অভাব আছে আমার? আমিও যাচঞাকারীদের কালোচিত দান করেছি।

পুত্তলিকা বলল, আপনি যে নিজমুখে আপনার গুণকীর্তন করছেন এটাই আপনার গুণের অভাব। যে আত্মগুণকীর্তন করে সে দুর্জন। সজ্জন ব্যক্তিরা এমন কথা বলেন না। শাস্ত্রে বলে, এই সংসারে দুর্জন ব্যক্তিরাই আপন গুণ ও পরের দোষের কথা বলতে পারে, কিন্তু সজ্জনরা নিজের গুণ ও পরের দোষ বলতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রে আরও বলে, আয়ু, ধন, গৃহছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান—এই নয়টি বিষয় সযত্নে গোপন করা কর্তব্য। অতএব আপনার গুণ আপনিই কীর্তন করা উচিত নয়।

পুত্তলিকার এই কথা শুনে ভোজরাজ সবিস্ময়ে বললেন, পুত্তলিকা, তুমি সত্যই বলেছ, যে নিজগুণ কীর্তন করে সে মূর্খ। আমি যে আপন গুণ কীর্তন করেছি তা খুবই অনুচিত। যাঁর এই সিংহাসন তাঁর ঔদার্য কীর্তন করো।

পুত্তলিকা বলল, হে রাজন, এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের। তিনি যদি সন্তুষ্ট হতেন তা হলে যাচকদের কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। যদি আপনার তেমন দানশক্তি ও মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা মৌন হয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

এরপর ভোজরাজ যেমন আবার পুত্তলিকার মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে উঠতে গেলেন অমনি দ্বিতীয় পুত্তলিকা মানুষের মত কণ্ঠে বলতে লাগল, রাজন, যদি বিক্রমাদিত্যের মত আপনার শৌর্য, ঔদার্য ও ধৈর্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ বললেন, হে পুত্তলিকা, তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।

পুত্তলিকা বলল, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালনকালে একদিন দূতগণকে ডেকে বললেন, দূতগণ, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণকালে যেখানে কৌতুক বা তীর্থবিশেষ দেখতে পাবে, তা এসে আমার কাছে নিবেদন করবে। আমি সেখানে যাব।

কিছুকাল গত হলে একদিন কোন এক দূত দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করে এসে রাজাকে বলল, রাজন, চিত্রকূট পর্বতের সন্নিকটে তপোবন মধ্যে অতি মনোহর একটি দেবালয় আছে। সেখানে পর্বতের উচ্চস্থান হতে নির্মল জলধারা পতিত হয়। সেই জলে স্নান করলে মহাপাপ বিনাশ পায়। যে মহাপাপ করে তার অঙ্গ হতে অতিশয় কালো জল বার হয়। যে সেই জলধারায় স্নান করে সে পুণ্যবান পুরুষ।

সেখানে এক ব্রাহ্মণ একটি বড় কুণ্ডে হোম করছেন। তিনি যে কতকাল হোম করছেন তা কেউ জানে না। কুণ্ডের বাইরে স্থাপিত ভস্মরাশি পর্বতাকার হয়ে উঠেছে। সেই ব্রাহ্মণ কারও সঙ্গে কথা বলেন না। আমি এমন বিচিত্র একটি স্থান দেখেছি।

তা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন সেই দূতের সঙ্গে চিত্রকূট পর্বতের কাছে সেই স্থানে গিয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, আহা, এই স্থান অতি পবিত্র। এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বা বাস করেন। এই স্থানে বাস করে আমার মন নির্মল হলো।

এই বলে রাজা সেই জলধারায় স্নান করে ও দেবীকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণের হোমের স্থানে গেলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন, হে বিপ্রবর, আপনি কতদিন থেকে হোম করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে অবস্থান করছিল, তখন আমি এই হোম আরম্ভ করি। সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিত আছে। সুতরাং হোমের একশত বছর অতীত হয়েছে। তথাপি দেবী প্রসন্ন হলেন না।

তা শুনে রাজা স্বয়ং দেবীর স্তব করে হোমে আহুতি দিলেন। তবু

দেবী প্রসন্না হলেন না। তখন রাজা নিজের মাথা আহুতি হিসাবে দান করব এই সংকল্প করে যেমন গলায় খড়্গ দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন, অমনি দেবী তা ধারণ করে বললেন, রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে হবন করছেন, তথাপি এঁর উপর প্রসন্ন হচ্ছেন না কেন এবং আমার প্রতিই বা প্রসন্ন হলেন কেন ?

দেবী বললেন, রাজন, এই ব্রাহ্মণ হোম করছেন বটে, কিন্তু এঁর চিত্তে একাগ্রতা নেই। এইজন্যই প্রসন্ন হইনি।

উক্ত আছে, অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে জপ, মেরুলংঘনে যে জপ আর ব্যগ্র চিত্তে যে জপ—এই তিনরকম জপ নিষ্ফল হয়। আর মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ঔষধ, গুরু—এইসবের প্রতি যার যেমন ভাবনা তার সেইরূপ সিদ্ধি ঘটে থাকে।

দেখ কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকাতেই দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, দেবতা থাকেন ভাবে। অতএব ভাবই সিদ্ধির কারণ জানবে।

রাজা বললেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করুন।

দেবী বললেন, হে রাজন, তুমি পরোপকারী মহাদ্রুমের মত নিজ দেহে কষ্ট সহ্য করে পরের শ্রম বিনাশ করছ। মহাদ্রুমসকল নিজেরা তাপ সহ্য করে অপরকে ছায়া দান করে এবং সত্যসত্যই পরের জন্য ফলবান হয়।

পরোপকারের জন্য নদীসকল বয়ে থাকে, পরোপকারের জন্য গাভী-সকল দুগ্ধ দান করে, পরোপকারের জন্যই সাধুগণের এই দেহ জানবে।

এইভাবে রাজার প্রশংসা করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করলেন। রাজাও নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

পুত্তলিকা বলল, রাজন, যদি আপনার এমন ধৈর্য থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা মৌন হয়ে রইলেন।

তৃতীয় উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে উপবেশনের জন্য উদ্যত হলে তৃতীয় পুত্তলিকা বলতে লাগল, হে রাজন, যাঁর বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্য গুণ থাকে সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত।

ভোজরাজ বললেন, হে পুত্তলিকা, তুমি তাঁর ঔদার্যগুণ বর্ণনা করো।

পুত্তলিকা বলল, বিক্রমাদিত্যের মত রাজা ভূমণ্ডলে আর নেই, তাঁর মনে এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আপন—এই বিকল্প ভেদবোধ ছিল না। তিনি অখিল বিশ্বই আপনার মত দেখতেন।

উক্ত আছে, এই ব্যক্তি আত্মীয়, এই ব্যক্তি পর এই সব বিকল্পজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান ক্ষুদ্রচেতাদেরই হয়ে থাকে, কিন্তু যাঁরা উদারচিত্ত, অখিল বিশ্বকেই তাঁরা আত্মীয় বলে মনে করে থাকেন।

সাহস, উদ্যম ও ধৈর্যে তার তুল্য ব্যক্তি ছিল না। এইজন্যই ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতেন। কারণ যাঁর উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, দেবগণও তাঁকে ভয় করে থাকে।

রাজন, যে ব্যক্তি যাচকের মনোরথ পূর্ণ করে থাকেন, তাঁর অভিলষিত কার্য দেবতারা সম্পাদন করে থাকেন।

সংকল্পের দৃঢ়তা থাকলে বিষ্ণু সত্যসত্যই তার অভিলাষ পূরণ করেন। যার কার্যের দৃঢ়তা গুণ আছে, সেই প্রকৃত মানুষ।

যে ব্যক্তি উৎসাহসম্পন্ন, অদীর্ঘসূত্রী, কার্যের বিধানক অথবা ব্যসনে অনাসক্ত, কৃতী ও দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন, লক্ষ্মী স্বয়ং তার নিকট বাস করবার বাসনা করে থাকেন।

এইসব গুণের আকর, সর্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন মনে মনে চিন্তা করলেন, হায়, এই সংসার অসার, কখন কার কি হবে জানা যায় না। যখন উপার্জিত ধন দান ভোগ ব্যতীত সফল হয় না, তখন সৎপাত্রে দানই ধনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তা না হলে সেই অর্থ ব্যর্থ হয়।

উক্ত আছে যে, দান, ভোগ ও নাশ—অর্থের এই তিনরকম গতি

আছে। যে ব্যক্তি দান বা ভোগ করে না, ঐশ্বর্য থাকলেও সে ঐশ্বর্য তার হয় না।

লক্ষ্মী অতি বেগশালী পবনকম্পিত দীপশিখার মত চঞ্চলা। পুষ্করিণীর অভ্যন্তরস্থিত জলরাশির জলনির্গমই যেমন জলরক্ষার একমাত্র উপায় তেমনি উপার্জিত অর্থের দানের দ্বারাই সে অর্থ রক্ষা হতে পারে।

রাজা এই সব বিচার করে এক সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তারপর শিল্পীদের দ্বারা এক মনোরম মণ্ডপ নির্মাণ করালেন।

তখন সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী যোগাড় করা হলো। দেব, মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন।

সেই সময় সমুদ্রকে আহ্বান করার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে সমুদ্রতীরে পাঠানো হলো। সেই ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারে সমুদ্রের পুজা করে বললেন, হে সমুদ্র, রাজা বিক্রমাদিত্য যজ্ঞ করছেন। তিনি আমাকে আপনার আহ্বানের জন্য পাঠিয়েছেন।

এই বলে জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে ক্ষণকাল অবস্থান করলেন সেখানে। কিন্তু কেউ তাঁর কথার উত্তর দিল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ যখন উজ্জয়িনীতে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সমুদ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে দেদীপ্যমান শরীরে তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন, হে বিপ্রবর, রাজা বিক্রমাদিত্য আমাকে আহ্বান করার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি যে সম্বর্ধনা করেছেন তা আমার লাভ করাই হয়েছে। যথাসময়ে দানধ্যানাদি করাই সুহৃদের লক্ষণ। উক্ত আছে, দান করা, প্রতিগ্রহ করা, গুপ্তকথা বলা, কুশল জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা এবং ভোজন করানো—এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ।

বন্ধু দূরে থাকলে তার সঙ্গে মিত্রতা নষ্ট হবে এবং সমীপস্থিত হলে বা কাছে থাকলে প্রীতি বর্ধিত হবে, এমন নয়। এ বিষয়ে স্নেহপ্রীতিই প্রমাণ। যে ব্যক্তি কারো মানসে বিদ্যমান থাকে সে দূরে থেকেও নিকটস্থ আর যে ব্যক্তি কারো মনের দূরস্থিত সে কাছে থেকেও দূরে অবস্থিত থাকে। পৃথিবীর জলাশয় থেকে চন্দ্র ছ'লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত,

তবু জলমধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না অবস্থান করে। সূর্য পর্বত হতে লক্ষ-যোজন দূরে থাকলেও সূর্যকিরণ আগে পর্বতের উপরেই পড়ে। তাদের অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পায়। সুতরাং যে যার মিত্র সে দূরে থাকলেও প্রীতির হানি হয় না।

অতএব রাজার আহ্বানে তাঁর কাছে যাওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু আমার এখানে প্রয়োজন আছে বলে যেতে পারছি না আমি। তবে সৎকার্য করার জন্য আমি চারটি বর দান করব রাজাকে। প্রথম বরের বস্তুটি এই যে, তার দ্বারা যখন যে বস্তু স্মরণ করা যায় তাই লাভ করা যায়। দ্বিতীয় বস্তুদ্বারা অমৃততুল্য খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তৃতীয় বস্তুদ্বারা অশ্ব রথ ও পদাতিকযুক্ত চতুরঙ্গসেনা উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থটির দ্বারা দিব্য মহামূল্যবান অলঙ্কারাদি উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মণ এই রত্ন গ্রহণ করে উজ্জয়িনীতে ফিরে গিয়ে দেখলেন রাজার যজ্ঞকার্য সমাপ্ত হয়েছে। রাজা অবভৃমস্থান করে প্রার্থীগণের সব মনোরথ পূরণ করেছেন। ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চারটি রত্ন রাজার হাতে অর্পণ করে তাদের গুণ বর্ণনা করলেন।

তখন রাজা বললেন, হে বিপ্রবর, আপনি যজ্ঞদক্ষিণার কাল অতিক্রম করে এসেছেন। আমি ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদ্বারা সন্তুষ্ট করেছি। আপনি এই চারটি রত্নের মধ্যে আপনার অভিপ্রায়মত একটি রত্ন গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি আগে বাড়িতে গিয়ে গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ এদের জিজ্ঞাসা করে যা তাদের সকলের অভিমত হবে আমি তাই গ্রহণ করব।

রাজা বললেন, আপনি তাই করুন।

ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ি গিয়ে আত্মীয়দের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। তা শুনে তার পুত্র বলল, যে রত্ন চতুরঙ্গসেনা উৎপন্ন করে তাই গ্রহণ করব। কারণ তা দিয়ে সুখে রাজত্ব করতে পারা যাবে।

ব্রাহ্মণ তখন বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো রাজ্য প্রার্থনা করে না। কারণ রামের বনগমন, বলির পাতালবাস, পাণ্ডুপুত্রদের বনবাস, যদু-বংশীয়দের নিধন, নলরাজার রাজ্যভ্রংশ, কার্তবীর্যার্জুনের বধ এবং

লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজ্যের জন্য বিড়ম্বনা ও বধ—এইসব বিবেচনা করে রাজ্যকামনা করবে না।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন, যা হতে ধনলাভ হয় সেই রত্নটিই গ্রহণ করো। কারণ ধন দ্বারা সমস্তই লাভ হয়। জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা ধনদ্বারা লাভ করতে পারা যায় না। এই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে থাকেন।

ব্রাহ্মণপত্নী বলল, যে রত্নদ্বারা ষড়বিধ রসযুক্ত খাদ্য উৎপাদন করা যায়, তাই গ্রহণ করো। কারণ অন্নদ্বারাই প্রাণীগণ প্রাণধারণ করে থাকে।

উক্ত আছে, বিধাতা অন্নকে মানবগণের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য অন্ন ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করা উচিত নয়।

এরপর পুত্রবধূ বলল, যে রত্ন মহামূল্য আভরণাদি উৎপাদন করে সেই রত্নই গ্রহণ করা উচিত। কারণ মনোহর ভূষণই মানুষকে বিভূষিত করে থাকে। শুদ্ধ পরিষ্কৃত বস্ত্রও একরকম ভূষণ যার দ্বারা সৌভাগ্য, আয়ু ও লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়। রত্ন ও ভূষণ ধারণে দেবগণও সন্তুষ্ট হন।

এইভাবে চারজন চারটি রত্নের গুণাগুণ নিয়ে বিবাদবিতর্কে প্রবৃত্ত হলো। ব্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে গিয়ে সব বিবৃত করলেন। তা শুনে রাজা চারটি রত্নই দান করলেন ব্রাহ্মণকে।

এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, ঔদার্য মানুষের স্বাভাবিক গুণ, তা কৃত্রিম শোভা নয়। উদার সাজলেই উদার হওয়া যায় না। যেমন চম্পকপুষ্পে গন্ধ, মুক্তাফলে কান্তি, ইক্ষুদণ্ডে মাধুর্য তেমনি ঔদার্যগুণ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। যদি আপনার মধ্যে এমন ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

একথা শুনে মৌন অবলম্বন করে রইলেন ভোজরাজ।

চতুর্থ উপাখ্যান

এরপর ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে চতুর্থ পুত্তলিকা বলল, রাজন শুনুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক

ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় পারদর্শী ও সমস্ত গুণে ভূষিত হয়েও অপুত্রক ছিলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী বলল, হে প্রাণেশ্বর, পুত্র ব্যতীত গৃহস্থের গতি নেই। সমস্ত স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন, অপুত্রকের গতি নেই, তার স্বর্গলাভ হয় না। অতএব পুত্রমুখ দর্শন করার পর তাপস হবে। যেমন তমস্বিনী রাত্রির আলো চন্দ্র, প্রভাতকালের আলো সূর্য, ত্রিলোকের আলো ধর্ম, তেমনি কুলের আলো হচ্ছে সৎপুত্র। মাতঙ্গ মদ দ্বারা, জল পদ্মদ্বারা, মন্দির নিত্যোৎসব দ্বারা, বাণী ব্যাকরণ সংস্কার দ্বারা, নদীসকল হংসমিথুন দ্বারা, সভাস্থল পণ্ডিতসমূহের দ্বারা, কুল ও পৃথিবী সৎপুত্রদ্বারা এবং লোকত্রয় সূর্যদ্বারা শোভা পেয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ বললেন, প্রিয়ে, তুমি সত্য বলেছ, পরম অধ্যবসার দ্বারা দুর্লভ বস্তুও লাভ করতে পারা যায়, গুরুসেবা দ্বারা বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু যশ ও সন্তানলাভ পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত লাভ করতে পারা যায় না। উক্ত আছে, যদি নিরন্তর সুখলাভের বাসনা থাকে হৃদয়ে তাহলে ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে ভবানীবল্লভকে ভজনা করবে।

স্ত্রী বলল, আপনি সর্বজ্ঞ, সুতরাং পরমেশ্বরের প্রসন্নতার জন্য কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি তোমার কথা মেনে নিলাম। কারণ বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিরও যুক্তিযুক্ত কথা বালকের নিকট হতেও গ্রহণ করা উচিত আর যুক্তিহীন অনিষ্টকর কথা বৃদ্ধের নিকট হতেও গ্রহণ করা উচিত নয়।

এই বলে ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের প্রীতি ও প্রসন্নতালাভের জন্য রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। তারপর একদিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখলেন, জটাজুটধারী বৃষবাহন পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়ে বলছেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করো, সেই ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার পুত্রলাভ হবে।

তখন ব্রাহ্মণ পরদিন প্রভাতকালে বৃদ্ধদের কাছে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

বৃদ্ধগণ বললেন, হে দ্বিজবর, এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ। স্বপ্নাধ্যায়ে উক্ত আছে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা স্বপ্নে

যা বলেন সত্য। অতএব এই ব্রতের অনুষ্ঠান করলে তোমার পুত্রলাভ হবে।

তাঁদের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবারে কল্পোক্তবিধানে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তাতে দেবাদিদেব পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুত্রবর দান করলেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের জাতকর্মাদি সম্পন্ন করে দ্বাদশদিনে তার 'দেবদত্ত' এই নামকরণ করলেন। তারপর ক্রমে অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি সংস্কারকার্য সম্পাদন করলেন।

যথাকালে পুত্র শাস্ত্রাদি শিক্ষা করে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করল। তখন তার গো-ক্রিয়া সম্পন্ন করে তার বিবাহ দিয়ে ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রার অভিলাষ করে পুত্রকে এইমত উপদেশ দিলেন।

হে পুত্র, তুমি অতিশয় কষ্টকর অবস্থায় পড়লেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করবে না। অন্যের সঙ্গে বিবাদ করবে না। সকল জীবের প্রতি দয়া করবে, পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদাই ভক্তিবান হবে, পরস্ত্রী অবলোকন করবে না, প্রবলের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হবে না, ধর্মজ্ঞ লোকের অনুবৃত্তি করবে, প্রস্তাব অনুসারে কথা বলবে, আয় বুঝে ব্যয় করবে, সাধু সজ্জনদের সেবা করবে, দুর্জনের সঙ্গে মিশবে না, স্ত্রীদের কাছে গুহ্য কথা বলবে না।

ব্রাহ্মণ পুত্রকে এই ধরনের অনেক উপদেশ দান করে নিজে বারাণসী চলে গেলেন। দেবদত্তও পিতার উপদেশ পালন করে দিনযাপন করতে লাগল।

একদিন দেবদত্ত হোমের কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে কাঠ কাটছিল, এমন সময় রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার জন্য সেই বনে আসেন। তিনি সেই সময় একটি শূকরের অনুসরণ করতে করতে গভীর বনে প্রবেশ করে পথ হারিয়ে ফেলেন। এমন সময় দেবদত্তকে সেখানে দেখতে পেয়ে তাকে নগরের পথ জিজ্ঞাসা করেন। দেবদত্ত তখন নিজে আগে আগে গিয়ে রাজাকে পথ দেখিয়ে নগরে নিয়ে যান। রাজা তখন দেবদত্তকে নানা সম্মান দান করে একটি বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করেন। এইভাবে

অনেক কাল কেটে যায়।

একদিন রাজা বললেন, আমি কিভাবে দেবদত্তের নিকট কৃতজ্ঞতা হতে মুক্ত হব? এই সময়ে কোন ব্যক্তি রাজাকে লক্ষ্য করে বললেন, রাজা কি মহানুভব, ইনি কৃত উপকার কখনো বিস্মৃত হন না। উক্ত আছে, নারকেলবৃক্ষ শৈশব অবস্থায় যে অল্পপরিমাণ জল দান করেছে তা স্মরণ করেই মাথায় বহু ফলের ভার বহন করে অমৃতকল্প গুচ্ছপরিমাণ জল আজীবন দান করে যায়। তাই দেখা যায়, সাধু ব্যক্তিগণ কৃত উপকার কখনই বিস্মৃত হন না।

দেবদত্ত রাজার এই কথা মনে মনে বিচার করে ভাবলেন, রাজার এই কথা সত্য কি মিথ্যা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই বলে কেউ জানতে না পারে এমনভাবে রাজার পুত্রকে বাড়িতে এনে গোপনে রেখে তার অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে সেগুলির মধ্যে একটি বিক্রি করার জন্য নগরে কোন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিল।

তখন 'রাজকুমারকে চোরে হত্যা করেছে ভেবে' রাজভবনে সকলেই বলাবলি করতে লাগল। রাজা তখন পুত্রের সন্ধানে চারদিকে রাজ-কর্মচারিদের পাঠালেন। নগরমধ্যে রাজকুমারের খোঁজ করতে করতে নগরমধ্যে একটি দোকানে রাজকুমারের কিছু অলঙ্কার দেখতে পেল। তারা তা দেখে যে ভৃত্যটি দোকানে অলঙ্কার বিক্রি করছিল তাকে ধরে নিয়ে এল রাজার কাছে।

রাজার সামনে রাজকর্মচারিগণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করল, রে পাপিষ্ঠ, এই অলঙ্কার তুই কোথায় পেলি?

ভৃত্যটি বলল, আমি দেবদত্তের ভৃত্য। তিনি বলে দিয়েছেন এই অলঙ্কার বাজারে বিক্রি করে টাকা নিয়ে এস।

এরপর রাজা দেবদত্তকে ডাকিয়ে আনিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদত্ত, এইসব অলঙ্কার তোমার হাতে কে দিয়েছে?

দেবদত্ত বলল, কেউ দেয়নি, আমিই ধনলোভে আপনার পুত্রকে হনন করে তার অলঙ্কারগুলি নিয়ে তার মধ্যে একটি বিক্রি করার জন্য এই ভৃত্যকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম, এখন আপনার যা অভিরুচি হয় তা

করুন। কর্মবশে আমার এই বুদ্ধি ঘটেছে।

এই বলে দেবদত্ত অধোমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দেবদত্তের একথা শুনে রাজা মৌন হয়ে রইলেন। তখন কোন কোন সভাসদ দেবদত্ত সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য, লোকটা সমস্ত ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেও এমন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হলো?

কেউ বলল, আপন কর্মফলের জন্যই এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছে। শাস্ত্রে আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও প্রাক্তন কর্মদ্বারা প্রেরিত হয়ে কুৎসিত কর্ম করে থাকে। মানুষদের বুদ্ধি প্রায়ই নিজ নিজ কৃতকর্মের অনুসারিণী হয়ে থাকে।

সভাসদরা এবার বলল, রাজন, এই দেবদত্ত কুমারঘাতী ও স্বর্ণচোর। অতএব খদিরকাষ্ঠনির্মিত শূলেতে চড়িয়ে একে বধ করা উচিত।

এরপর মন্ত্রীগণ বলল, এর দেহটাকে শতখণ্ড করে তার মাংস শকুনিদের উপহার দেওয়া উচিত।

সকলের সব কথা শুনে রাজা বললেন, হে সভ্যগণ, এই ব্রাহ্মণ আমার আশ্রিত এবং অতীতে একসময় আমাকে নগরের পথ দেখিয়ে অত্যন্ত উপকার করেছে। আশ্রিত ব্যক্তিদের দোষগুণ বিচার করা কর্তব্য নয়।

উক্ত আছে, চন্দ্র ক্ষয়শীল, স্বভাবতঃ বক্রদেহ ও জড়াত্মা অর্থাৎ জলময় শরীর এবং মিত্র সূর্যের বিপদকালে বা অস্তগমনকালে সূর্যের শত্রু রাত্রিকে আলো দান করে, তথাপি পরমেশ্বর মহাদেব সেই চন্দ্রকেই মস্তকে ধারণ করে থাকেন, মহৎ ব্যক্তিগণ আশ্রিতদের গুণদোষ বিচার করেন না। তাছাড়া যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করে তার সাধুতায় আর মাহাত্ম্য কি আছে? কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করে, সে ব্যক্তিই যথার্থ সাধু।

এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, হে দেবদত্ত, আপনি মনের মধ্যে কিছুমাত্র ভয় করবেন না। আমার পুত্র পূর্বকৃত কর্মবশতঃ অকালে মরেছে, আপনি কি করবেন? পূর্বকৃত কর্মের ফল লঙ্ঘন করতে কেউ পারে না। দেখুন, যার মাতা লক্ষ্মী এবং পিতা বিষ্ণু, যিনি স্বয়ং

বিষমায়ুধ, সেই মদনও হরকোপানলে দগ্ধ হলেন।

রাজা আরও বললেন, আমি যখন মহারণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম আপনি তখন আমাকে পথ দেখিয়ে নগরে এনে আমার অশেষ উপকাব সাধন করেছিলেন। আমি সহস্র প্রত্যুপকার করেও আপনার উপকারের ঋণ পরিশোধ করতে পারব না।

রাজা এইভাবে আশ্বাস দান করে দেবদত্তকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

তখন দেবদত্ত বাড়ি থেকে রাজকুমারকে এনে রাজার হাতে তুলে দিলেন। তাতে রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একি?

দেবদত্ত বললেন, আপনি আগে বলেছিলেন, দেবদত্তকৃত উপকার হতে আমি কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারব না। এ বিষয়ে আপনার স্বভাব পরীক্ষার জন্য এই কাজ করেছি। এখন আপনার কথায় বিশ্বাস জন্মেছে।

রাজা বললেন, যে কৃত উপকার বিস্মৃত হয় সে নিশ্চয় পুরুষাধম।

দেবদত্ত বললেন, হে রাজন, আপনি বিনা কারণেই অখিল জগতের উপকারসাধন করে থাকেন। অতএব আপনি ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র সুজন!

উক্ত আছে যাঁরা সুজন এবং পরের হিতকামনায় জীবন ধারণ করেন তাঁরাই প্রকৃত ধনী এবং প্রকৃত সুখী।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার করার প্রবৃত্তি ও শক্তি, ধৈর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হয়ে রইলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান

এরপর ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অপর পুত্তলিকা বলল, হে রাজন, শুনুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন কোন রত্ন-বিক্রেতা বণিক এসে একটি অমূল্য রত্ন রাজার হাতে অর্পণ করল। রাজা তখন সেই উজ্জ্বল রত্নটি নিরীক্ষণ করে পরীক্ষকদের ডাকিয়ে

বললেন, তোমরা এই রত্ন কেমন, উত্তম না অধম, এর মূল্যই বা কত তা যাচাই করে বল।

তারা রত্ন পরীক্ষা করে বলল, মহারাজ, এই রত্ন অমূল্য। যদি আমরা এর মূল্য না জেনে মূল্য নির্ধারণ করি, তবে অত্যন্ত অপরাধী হব।

তাদের কথা শুনে রাজা বণিককে সেই রত্নের দাম অনুসারে অনেক দ্রব্য দান করে বললেন, বণিকবর, এরূপ রত্ন তোমার আর আছে কি?

বণিক বলল, দেব, এর তুল্য রত্ন আমার আরও আছে, কিন্তু সঙ্গে আনিনি। যদি প্রয়োজন হয় তবে মূল্য নির্ধারণ করে সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করুন।

এর পর পরীক্ষকেরা সেই এক একটি রত্নের মূল্য ছয় কোটি করে নির্ধারিত করে দিল। রাজা সেই নির্ধারিত মূল্য বণিককে দিয়ে তার বাড়ি থেকে সেই রত্নগুলি আনার জন্য এক বিশ্বাসী মণিকারকে পাঠিয়ে দিলেন তার সঙ্গে। মণিকারকে বললেন, দেখ মণিকার, যদি তুমি আট দিনের মধ্যে রত্নগুলি নিয়ে ফিরে আসতে পার তাহলে তোমাকে সমুচিত পুরস্কার দেব।

মণিকার বলল, এই আট দিনের মধ্যে আমি আপনার চরণ দর্শন করব। তা না হলে আমি দণ্ডনীয় হব।

এই বলে মণিকার সেই বণিকের সঙ্গে তার নগরে গমন করল। তার বাড়ি গিয়ে বণিক দশটি রত্ন মণিকারকে দিল।

সেই সকল রত্ন নিয়ে মণিকার যখন আসছিল তখন পথে প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। পথে এক নদী ছিল। সেই বৃষ্টিতে নদীর দুই তীর প্লাবিত হলো এবং নদী বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। তখন সে নদী পার হতে না পেরে নাবিককে ডেকে বলল, ওহে কর্ণধার, আমাকে নদী পার করে দাও।

নাবিক বলল, নদীর জল দুই তীর অতিক্রম করেছে, কি করে পার করব? প্রবল নদী উত্তীর্ণ হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্তব্য নয়। উক্ত আছে, মহানদী উত্তরণ, মহাপুরুষদের মূর্তি ও মহাজনদের সঙ্গে

বিরোধ—এই সকল দূর হতে বর্জন করবে। আর নারীদের চরিত্রে, পূর্ণ নদীর জলে, রাজার আদরে, বণিকের স্নেহে কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মণিকার বলল, হে কর্ণধার, তুমি যা বললে, তা সত্য বটে, তবু আমার মহৎ কাজ আছে। সামান্য কাজ হতে বিশেষ বা মহৎ কাজ বেশী যত্নের বিষয়। উক্ত আছে, প্রায়ই দেখা যায় লোক বিশেষ কার্যের তাগিদে সামান্য কার্য উপেক্ষা করে। নদী পার হওয়ার নিষেধ সামান্য কার্য এবং রাজকার্য বিশেষ বা মহৎ কার্য। এই মহৎকার্যই বলবান হবে।

কর্ণধার বলল, কি এমন মহৎ রাজকার্য বলুন।

মণিকার বলল, আজ যদি দশটি রত্ন নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত না হই, তাহলে আজ্ঞাভঙ্গহেতু শাস্তি পেতে হবে।

নাবিক বলল, সেই দশটি রত্নের মধ্যে যদি আমাকে পাঁচটি দিতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে নদী পার করে দেব।

মণিকার তখন বাধ্য হয়ে পাঁচটি রত্ন নাবিককে দিল। নাবিক তখন মণিকারকে নদীপার করে দিলে সে রাজবাড়িতে ফিরে এসে পাঁচটি রত্ন রাজার হাতে দিল।

রাজা বললেন, মণিকার পাঁচটি রত্ন কেন? বাকি পাঁচটি কোথায় গেল?

মনিকার বলল, আমার নিবেদন শুনুন মহারাজ। বণিকের বাড়ি গেলে বণিক আমাকে দশটি রত্নই দেয়। কিন্তু সেথায় পথে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় নদী পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নাবিক পাঁচটি রত্ন নিয়ে আমাকে নদী পার করে দেয়। আট দিনের মধ্যে যদি ফিরে আসতে না পারতাম তাহলে প্রভুর মনে দুঃখ হত। এইজন্যই বাধ্য হয়ে পাঁচটি রত্ন দিয়েছি নাবিককে। কথিত আছে, রাজাদের আদেশ লঙ্ঘন, ব্রাহ্মণদের মানখণ্ডন, নারীদের পৃথক শয্যা—এই সকল বিনা শাস্ত্র বধেরই সমতুল। এই বিচার করেই রত্ন পাঁচটি দিয়েছি তাকে।

রাজা এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বাকি পাঁচটি রত্নও মণিকারকে দান করলেন।

এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যদি আপনার মধ্যে বিক্রমাদিত্যের মত এই ঔদার্যগুণ থাকে তবে আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য একটি পুত্তলিকা বলল, শুনুন রাজন, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একবার চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব হয়। এই সময় রাজা অন্তঃপুরযুবতীদের সঙ্গে বিহার করার জন্য ক্রীড়াকাননে যান। নানারকমের তরুশোভিত সেই বিহার-কানন ইন্দ্রনীলমণিখচিত ভিত্তি দ্বারা রমণীয়। চন্দ্রকান্তশিলা নির্মিত তার প্রাঙ্গণ। নানাবিধ ধূপবাসিত সেই অঙ্গনমধ্যে বিহারের জন্য আনা চন্দ্রালঙ্কারে সজ্জিত পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী—এই চার শ্রেণীর রমণীর সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন রাজা। সেই বিহারকাননের সন্নিকটে এক চণ্ডিকার মন্দির ছিল। সে মন্দিরে একজন ব্রহ্মচারী বাস করতেন।

সেই ব্রহ্মচারী রাজাকে বনের মধ্যে বিহার করতে দেখে আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এতদিন ধরে তপস্যা করে বৃথা জীবনটাকে অতিবাহিত করেছি। বিষয়সুখ স্বপ্নেও অনুভব করিনি।

কথিত আছে, বৈষয়িক সুখমাত্রই শুধু দুঃখদানের জন্য বিধাতার দ্বারা সৃষ্ট, এ ধারণা মূর্খের। তন্ডুল বা আতপচালপ্রার্থী কোন মানুষ শুভ্র তণ্ডুল ছেড়ে তুষমিশ্রিত তণ্ডুল গ্রহণ করে থাকে ক্লেশের ভয়ে? অতএব মহৎ কষ্ট করেও সংসারে স্ত্রীসঙ্গসুখ উপভোগ করা কর্তব্য।

এই অসার অনিত্য সংসারমধ্যে লোললোচনা রমণীরাই সারবস্তু। তাদের জন্যই ধন উপার্জন। তাদের পরিত্যাগ করলে ধন নিয়ে আর কি হবে? এই কথা ভেবেই স্বয়ং শঙ্কর পার্বতীকে নিজের অর্ধাঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করেছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ঘটনাক্রমে এই স্থানে এসেছেন। তাঁর কাছে এক দণ্ড ব্রহ্মত্র ভূমি প্রার্থনা করে একটি রমণীকে বিবাহ করে সংসারসুখ উপভোগ করব।

ব্রহ্মচারী এই কথা ভেবে রাজার কাছে গিয়ে নগেন্দ্রনন্দিনীর রতির উৎসবস্বরূপ পঞ্চাননের পঞ্চবাণ তাঁর আদ্যরস পানের বাসনা করলে পরিহিত সুশোভন কর্ণভূষণের গন্ধ লোকে ভ্রমণশীল ভ্রমরের মত শোভাধারী পার্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুন—এই আশীর্বাদ রাজাকে করলেন।

তারপর রাজা তাঁকে সাদরে বসিয়ে বললেন, হে বিপ্রবর, আপনি কোথা হতে এসেছেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি এইখানেই জগদম্বিকার সেবা করে থাকি। আমি এ'র সেবায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছি। আমি এতদিন ব্রহ্মচারী হয়ে আছি, বিবাহ করিনি। আজ রাত্রিশেষে দেবী জগদম্বা প্রত্যক্ষ হয়ে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি এতদিন আমার সেবায় পরিশ্রান্ত হয়েছ, আমি তোমার সেবায় প্রসন্ন হয়েছি। অতএব তুমি এখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে পুত্র উৎপাদন করো। পরে মোক্ষসাধনায় মনোনিবেশ করবে। তা না হলে তোমার গতি নেই।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্তিম মোক্ষমার্গে মনোনিবেশ করে তার মোক্ষলাভ ত হয়ই না, বরং সে আরও অধঃপতিত হয়।

প্রথমে ব্রহ্মচারী থাকার পর গৃহস্থ হলে, পরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবে। এখন রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট যদি এ বিষয় নিবেদন করো তাহলে তিনি তোমার মনোবাসনা পূরণ করবেন।

দেবী আমাকে স্বপ্নে এই কথা বলেছেন, তাই আমি আপনার সান্নিধানে এসেছি।

ব্রাহ্মণ কপট বাক্যে একথা রাজাকে জানালে রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। সে যাই হোক, তথাপি সে যাচক হয়ে আমার কাছে এসেছে তখন তার মনোরথ পূরণ করা আমার কর্তব্য।

উক্ত আছে, রাজা দীন ব্যক্তিকে দান করলে, শূন্যালিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা করলে এবং নিরত আশ্রিতদের প্রতিপালন করলে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে থাকেন।

রাজা এই কথা বিচার করে সেইখানেই একটি নগর নির্মাণ করালেন। তারপর সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করে একশত বিলাসিনী সুন্দরী রমণী, পাঁচশত চতুরঙ্গসেনা, চার হাজার যোদ্ধা তাঁকে দান করলেন। সেই নগরের নামকরণ হলো চন্ডিকাপুর।

এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ পূর্ণকাম হয়ে রাজাকে ভূয়সী আশীর্বাদ করলে রাজা নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

এই কাহিনী শেষ করে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এই ধরনের ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

সপ্তম উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে অন্য এক পুত্তলিকা তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণকথা বলতে লাগল। সে বলল, মহারাজ, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সব লোকই সুখে বাস করত। সংসারে দুর্জনরূপ কোন কণ্টক ছিল না। সকল লোকই ছিল সদাচারী। ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্র চর্চা, স্বধর্মাচরণ ও যজনযাজন প্রভৃতি ষটকর্মাদিতে নিয়ত বিরত থাকতেন। সকল বর্ণের লোকেরাই কার্যসিদ্ধিতে ও যশে অভিরুচি, পরোপকারে প্রবৃত্তি, অসত্যে বিদ্বেষ, লোভে দ্বেষ, পরনিন্দায় অনাদর, জীবের উপর দয়া ও অনুরাগ, পরমেশ্বরে ভক্তি, দেহের প্রতি নির্মমতা, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার, পারলৌকিক বিষয়ে মন, বাক্যের সত্যতা, নিজ উক্তি বা কথার প্রতিপালনে দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্য— এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল। এইভাবে সমস্ত লোক সততার সঙ্গে পবিত্র অন্তঃকরণে রাজার প্রসাদে সুখে অবস্থান করছিল। কারো কোন বিষয়ে কোন অভাব ছিল না।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক বাস করত। তার ধনসম্পত্তির কোন সীমা ছিল না। তার ঘরে সব বস্তুই পাওয়া যেত। এই বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে তার সকল বস্তুতেই অনিত্য বুদ্ধির উদয় হলো। সে ভাবল, এই সংসার এবং যাবতীয় ভোগ্যবস্তুসমূহও

অনিত্য। প্রণয়িণীদের সংস্পর্শ মেঘনির্মিত নগরের মতই অলীক, ধন ও যৌবন মেঘমালার মতই ক্ষণস্থায়ী, স্বজন পুত্র ও শরীরাদি বিদ্যুতের মত চঞ্চল, সংসারের সব কাজই ক্ষণিক। সহায় বা অসহায় যাই হোক, আত্মীয়পরিজনগণ সংসারবন্ধনের মূল। পুত্র ও শত্রুর ভেদজ্ঞান বিকল-মতির বিকৃতবুদ্ধির ধারণামাত্র। সুতরাং সংসারীগণের পক্ষে ধর্মই পরম আশ্রয়। তাই সকল কর্ম পরিত্যাগ করে নির্মল ধর্মের ভজনা করতে হবে।

উক্ত আছে, ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্ম সেই প্রাণীকে রক্ষা করে। ধর্মকে নাশ করলে ধর্মও তাকে নাশ করে। যোগীগণ যা ধ্যান করেন, ধর্ম মানুষকে সেই সম্পদ দান করে। সুতরাং ধর্মের মত সুহৃদ কেউ নেই, ধার্মিক অপেক্ষা সুখী কেউ নেই, ধার্মিকের অপেক্ষা পণ্ডিত কেউ নেই।

আরও উক্ত আছে, ধর্ম স্বর্গপুরীর সারসুখদানে সমর্থ, ধর্ম মানুষকে অবিনশ্বর প্রীতিদানের উপযোগী, ধর্ম নিরন্তর স্বর্গসুখ-স্বাদের মূল। ধর্ম মুক্তিরূপিণী কামিনীর সম্ভোগযোগ্য তনু সম্পাদন করতেও সমর্থ।

অতএব ধর্মসংগ্রহের জন্য উপার্জিত ধন সৎপাত্রে দান করা বুদ্ধিমানদের একান্ত কর্তব্য। সৎপাত্রে দান করলে ধন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে, পাত্রবিশেষে দান করলে সেই ধন দাতার গুণান্তর সৃষ্টি করে অর্থাৎ দাতার গুণকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। মেঘের জল সমুদ্রের শুক্তিতে পড়লে তা মুক্তায় পরিণত হয়। বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ ভাল ক্ষেত্রে পতিত হলে তা বহু বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

এই সব বিচার করে সেই বণিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের কাছ থেকে হেমাদ্রি নামক স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দানখণ্ডের গোদান, কন্যাদান, ভূমিদান ও জলদানাদির বিধি ও মাহাত্ম্য শুনে সেই সব দান সৎপাত্রে করতে লাগল। এইভাবে পবিত্রচিত্ত হয়ে আবার বিচার করল, আমি যেসব দানব্রতাদির অনুষ্ঠান করলাম, তা তখনই সফল হবে যখন আমি দ্বারকাধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করব।

এই ভেবে দ্বারকার অভিমুখে সে যাত্রা করল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে বণিক নাবিককে ডেকে তাকে অনেক জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করে তার জাহাজে ভিক্ষুক, যোগী, অনাথ ও দীনদরিদ্রকে চাপিয়ে তাদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে করতে যেতে লাগল। সেই সময় সহসা সমুদ্রমধ্যে একটি ছোট পাহাড় দেখতে পেল। সেই পাহাড়ে একটি দেবমন্দির ছিল।

সেখানে জাহাজ থেকে নেমে সেই মন্দিরে গিয়ে বণিক দেবী ভুবনেশ্বরীকে ষোড়শোপচারে পূজা দান করল। সহসা মন্দিরের বাঁ দিকে চোখ পড়তেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল বণিক। দেখল ছিন্নমস্তক এক স্ত্রী ও এক পুরুষ পড়ে আছে আর তাদের সামনে ভিত্তিভাগে লেখা আছে, কোন মহাধৈর্যবান ও পরোপকারী ব্যক্তি যখন তাব গলার রক্ত দিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীর অর্চনা করবে তখন এই স্ত্রীপুরুষ দুটি জীবনলাভ করবে।

এই দৃশ্য দেখে ও লেখা পাঠ করে ধনদ বণিক আবার জলযানে চড়ে দ্বাবকা নগবীতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগল।

একবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হয়। কিন্তু অশ্বমেধকারীকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, অথচ শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারীকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

এইভাবে স্তব করে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে নিজ নগরে ফিরে এল ধনদ বণিক। তারপর বন্ধুবর্গকে প্রসাদ দান করার পর মূল্যবান একটি বস্তু নিয়ে সে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কারণ রিক্তহাতে রাজা ও গুরুদর্শন করতে নেই। ফলদানের দ্বারাই ফল পাওয়া যায়।

কথিত আছে, প্রিয়তমা ভার্যা, মিত্র ও শিশুকে রিক্ত হাতে দর্শন করবে না।

বণিক তাই কৃষ্ণের প্রসাদ আর সেই মূল্যবান বস্তুটি উপঢৌকন দিয়ে বসে রইল। তখন রাজা তাকে দ্বারকাযাত্রার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বণিককে রাজা বললেন, অপূর্ব কোন দৃশ্য যদি পথে কোথাও দেখে থাক তা বর্ণনা করো।

বণিকও সমুদ্রমধ্যস্থিত এক পর্বতে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সেই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বর্ণনা করল।

রাজা এ কথায় দারুণ বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ ধনদ বণিকের সঙ্গে দ্বারকার নিকটবর্তী সেই পার্বত্য মন্দিরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেব-বিগ্রহের বাঁ পাশে সেই দুটি কবন্ধ অর্থাৎ গলাকাটা দুটি মৃতদেহ দেখতে পেলেন।

রাজা তখন মনে মনে দেবীকে স্মরণ ও সংকল্প করে কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হতেই কবন্ধ দুটির মাথা জোড়া লেগে গেল এবং তারা জীবন্ত হয়ে উঠল। দেবীও তখন রাজার হাত থেকে খড়্গটি নিয়ে বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। বর গ্রহণ করো।

রাজা বললেন, দেবী, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে এই স্ত্রী-পুরুষকে রাজ্যদান করুন। তখন দেবী তাদের রাজ্যদান করলেন। রাজাও ধনদ বণিকের সঙ্গে নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যদি আপনার মধ্যে এইরকম পরোপকার করার শক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অষ্টম উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে আর একটি পুত্তলিকা বলল, রাজা বিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও নানারকম চিত্ত-বিনোদনকারী আশ্চর্য রসে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি নানা কৌতুকজনক বিষয় বিভিন্ন লোকমুখে অবগত হতেন।

কথিত আছে, পশুগণ গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রদ্বারা, রাজাগণ লোক-মুখদ্বারা এবং অপরাপর ব্যক্তিরা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে থাকে। যিনি রাজা, সকল লোকের অবস্থিতি জ্ঞান, সকলের বিত্ত অবগতি করা, প্রজাদের সম্যক পালন করা, দুষ্টদের দণ্ডবিধান করা, ন্যায়মতে ধনো-পার্জন করা ও যাচকদের প্রতি মমতা প্রদর্শন—এইগুলি তাঁর কর্তব্য এবং এইগুলিই পঞ্চ মহাযজ্ঞের সমতুল। দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা,

ন্যায় অনুসারে রাজকোষ বৃদ্ধি, প্রার্থীদের প্রতি অপক্ষপাত ও রাজ্যরক্ষা রাজাদের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করা কর্তব্য। এই কাজগুলিই হলো রাজাদের দৈবকার্য ও জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি। রাজার রাজ্যে যেন কোনমতে অশ্রুপাত না হয়।

এই সব নিয়ম অনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য শাসন করছিলেন, এমন সময় একদিন চরগণ পৃথিবী পরিক্রমা করে আসার পর রাজার কাছে তারা উপস্থিত হলে রাজা তাদের দেখা দর্শনীয় বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তারা তখন বলল, হে দেব, কাশ্মীরদেশে মহাধনাঢ্য এক বণিক আছে। সেই বণিক পঞ্চক্রোশব্যাপী এক দীর্ঘ পুষ্করিণী খনন করে তার মধ্যে জলশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নস্থান নির্মাণ করিয়েছে, কিন্তু সেই পুষ্করিণীতে জল ওঠেনি। তখন সেই বণিক জল ওঠার জন্য নারায়ণের উদ্দেশ্যে পুজা ও যাগযজ্ঞ করান। কিন্তু তবুও জল উঠল না। তখন সেই বণিক খুবই দুঃখিত হয়ে প্রতিদিন সেই পুষ্করিণীর পাড়ে এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, হায়, কোন উপায়েই জল উঠল না। সমস্ত পরিশ্রমই আমার বৃথা হলো।

একদিন বণিক যখন এইভাবে বসেছিল পুকুরধারে তখন এক আকাশবাণী হলো সহসা, হে বণিকপুত্র, তুমি কি জন্য নিঃশ্বাস ফেলছ? দ্বাত্রিংশৎ বা বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্ঠশোণিতদ্বারা যখন এই তড়াগ বা পুষ্করিণী অভিষিক্ত হবে তখন এতে জল উঠবে। তা না হলে কিছুতেই জল উঠবে না।

তা শুনে বণিক সেই তড়াগে এক মহৎ অন্নসত্র করল। সেই অন্নসত্রে বিভিন্ন দেশের লোকেরা আসতে লাগল। তখন অন্নসত্রের উদ্যোক্তারা সমাগত লোকদের সামনে ঘোষণা করতে লাগল, যে ব্যক্তি আপন কণ্ঠ-শোণিতদ্বারা এই তড়াগ অভিষিক্ত করতে পারবে তাকে শত ভার স্বর্ণ দান করা হবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি সে কাজ করার জন্য এগিয়ে এল না। এই বিচিত্র ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

তাদের কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের অন্তর্গত সেই তড়াগে চলে গেলেন। সেখানে জলাশয়স্থিত বিষ্ণুর অতি মনোহর শয়নমন্দির ও জলাশয়ের বিশালতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর তিনি আপন মনে চিন্তা করলেন, যদি আমি আপন কণ্ঠশোণিতে অভিষিক্ত করি এই তড়াগ তাহলে জলপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাতে সকল লোকের উপকার হবে। মমতা করা মহাপুরুষের কর্তব্য নয়, পরোপকারের জন্য শরীর দান করা কর্তব্য। উক্ত আছে, কেউ একশত বছর জীবন ধারণ করুক বা শয্যায় শয়ন করে থাকুক শরীর অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। শরীরের বিপদ সর্বদাই সুলভ। সুতরাং শরীরের উপর যে মমতা সকল লোকের নিন্দনীয়, সে মমতা লোকাতীত পুরুষগণ পরিত্যাগ করেন। দেহীগণের দেহপিঞ্জর সর্বদাই রোগে আক্রান্ত, শোকের গৃহ, সর্বদাই পতনোন্মুখ। এই দেহের সামর্থ্য সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণই অর্জন করেছেন, যাঁরা নিজস্বার্থে বিমুখ হয়ে পরের জন্য শরীরপাত করেছেন।

এইরূপ বিচার করে রাজা বিক্রমাদিত্য জলশায়ী নারায়ণের পূজা ও তাঁকে প্রণাম করে বললেন, হে জলদেবতা, আপনি দ্বাত্রিংশ লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠরুধির কামনা করেছেন, তবে আমার কণ্ঠরক্তদ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে জলপূর্ণ করুন এই তড়াগ।

এই বলে রাজা যেমন কণ্ঠে খড়্গাঘাত করবেন অমনি সেই দেবী তাঁর খড়্গ ধরে বললেন, হে বীর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, বর গ্রহণ করো।

রাজা বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই তড়াগ জলপূর্ণ করুন।

দেবী আবার বললেন, হে রাজন, তুমি এই স্থান হতে যখন সত্বর নির্গত হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবে তখন এই তড়াগ জলপূর্ণ দেখবে।

তা শুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে যেমন তড়াগের পাড়ে উঠলেন, অমনি জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সমগ্র তড়াগ। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে

প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনার মধ্যে এইরূপ পরোপকারপ্রবৃত্তি ও সত্ত্বসারাদি গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন।

নবম উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য এক পুত্তলিকা বলল, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভট্টি মন্ত্রী, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেনাপতি এবং ত্রিবিক্রম পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিত ত্রিবিক্রমের কমলাকর নামে এক পুত্র ছিল।

কমলাকর প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে ঘৃতান্ন ভোজন এবং বস্ত্র, ভূষণ ও তাম্বূলাদি ভোগ দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট দেহে বিষয়সুখ উপভোগ করতে থাকেন।

একদিন পিতা পুত্রকে বললেন, রে পুত্র, তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে কেন এমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবনযাপন করছ?

এই আত্মা শতজন্ম ধরে নানা যোনিপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ অনেক পুণ্যের ফলে হয়ে থাকে। সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করেও তুমি দুরাচার হয়েছ। সর্বদাই বাইরে থাক, কেবল ভোজনকালেই গৃহে আস। সুতরাং তুমি বড়ই অনুচিত কার্য করছ। তুমি জান না যে এখন তোমার বিদ্যাভ্যাসের কাল। এখন বিদ্যাভ্যাস না করলে ভবিষ্যতে বড়ই কষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করে না এবং যৌবনকালে কামাতুর হয়ে নষ্টচরিত্র হয় তারা শীতকালে বস্ত্রহীনের মত বৃদ্ধকালে অত্যন্ত কষ্ট পায়। যাদের বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দান নেই, সুশীতলতা নেই, গুণ নেই, ধর্ম নেই তারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ মানুষরূপী পশু হয়ে বিচরণ করে থাকে। এই সংসারে পুরুষদের বিদ্যার সমান ভূষণ নেই। বিদ্যা নরগণের সমুজ্জ্বল রূপ ও গুপ্তধন, বিদ্যা যশস্করী

ও সুখকরী, বিদ্যা গুরুগণের গুরু, বিদেশের বন্ধু, বিদ্যা পরম দেবতা, বিদ্যা রাজাদের পূজনীয়। বিদ্যার তুল্য ধন নেই, বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। বিদ্যাহীন ব্যক্তির উচ্চকুলে জন্মলাভ করে কি ফল? বিদ্বান ব্যক্তি অকুলীন অর্থাৎ নীচু কুলে জন্মগ্রহণ করলেও দেবতারা সম্মান করে থাকেন তাঁকে।

অতএব হে পুত্র, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করতেই হবে। বিদ্যা অভ্যাস করলেই সেই বিদ্যা একদিন বন্ধুর কার্য করবে।

উক্ত আছে, বিদ্যা মাতার মত রক্ষা করে, পিতার মত হিতকর্মে নিযুক্ত করে, ভার্যার মত দুঃখ দূর করে অনুরঞ্জন করে, দশদিকে কীর্তি বিকীরণ করে এবং ধনাগম করে। সুতরাং কল্পলতার মত বিদ্যা সব কার্যই সাধন করে থাকে।

পিতার এই সব কথা শুনে পুত্র কমলাকর অতিশয় অনুতপ্ত হয়ে ভাবল, যদি আমি সর্বজ্ঞ হতে পারি তবেই এই পিতার মুখ দর্শন করব আবার। না হলে নয়।

এই ভেবে সে কাশ্মীরদেশে গমন করল। সেখানে চন্দ্রমৌলী নামক এক ভট্টাচার্যের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলল, হে প্রভু, আমি মূর্খ, আপনার নাম শুনে আমি বিদ্যাভ্যাসের জন্য এখানে এসেছি। যাতে আমার এখানে বিদ্যালাভ হয় আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

এই বলে গুরুকে আবার প্রণাম করল কমলাকর। তখন গুরু অঙ্গীকার করলে সে দিনরাত গুরুর সেবা করে যাতে বিদ্যালাভ হয় তা করে যেতে লাগল।

উক্ত আছে, গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা অথবা প্রচুর ধনদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা হতে পারে অথবা বিদ্যাদ্বারাও বিদ্যালাভ হয়ে থাকে। এ ছাড়া চতুর্থ কোন উপায় নেই। এইভাবে গুরুর সেবা করতে করতে অনেককাল কেটে গেল কমলাকরের।

একদিন উপাধ্যায় তাঁর প্রতি কৃপা করে সিদ্ধসারস্বত মন্ত্রের উপদেশ

দিলেন। সেই উপদেশ দ্বারা কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে এল।

পথে যেতে যেতে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলো কমলাকর। সেই নগরীর রাজা নরেন্দ্রসেনের নরমোহিনী নামে এক রূপসী রমণী ছিল। সে ছিল রূপে অদ্বিতীয়া। যে কেউ তাকে দর্শন করলেই সঙ্গে সঙ্গে কামজ্বরে পীড়িত হয় সে এবং তাকে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। যে কেউ তাকে সম্ভোগ করার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবাস করলেই বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে তার রক্তপান করত এবং তার মৃত্যু হত। কমলাকর এই আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনে তার নগরে ফিরে গেল।

তাকে ফিরে আসতে দেখে পিতামাতার অতিশয় আনন্দ হলো। দ্বিতীয় দিনে পিতার সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করল কমলাকর। রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে কমলাকর, তুমি যে দেশে গিয়েছিলে সে দেশে আশ্চর্যজনক কিছু দেখেছ কি?

কমলাকর বলল, সেদেশে এমন কিছু দেখিনি। তবে ফেরার পথে কাঞ্চীনগরে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনলাম। সে নগরে নরমোহিনী নামে এক পরমাসুন্দরী রমণী আছে। কিন্তু তার রূপে মুগ্ধ হয়ে কোন লোক যদি তার ঘরে রাত্রিবাস করে তাহলে এক রাক্ষস এসে তার রক্তপান করে। এইভাবে তার জীবনহানি হয়।

রাজা তা শুনে বললেন, তাহলে চল, সেখানে যাই।

এই বলে রাজা তখনি কমলাকরের সঙ্গে কাঞ্চীনগরে গিয়ে নরমোহিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য তার ঘরে রইলেন।

নরমোহিনী পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল, তেল, গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করে বলল, হে রাজন, আজ আমি ধন্য হলাম। আপনার চরণপদ্মস্পর্শে পবিত্র ও গৌরবময় হয়ে উঠল আমার গৃহ। আপনি আমার গৃহে ভোজন করুন।

রাজা বললেন, আমি এখনি ভোজন করে তোমার গৃহে এসেছি।

নরমোহিনী তাঁকে তাম্বূল দান করল। এইভাবে রাত্রি এক প্রহর কেটে গেলে নরমোহিনী ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষস এসে উপস্থিত হলো। রাজা তার পদশব্দ শুনে নরমোহিনীর পিছনে লুকিয়ে রইলেন। ফলে রাক্ষস নরমোহিনীর ঘরে কোন লোক দেখতে পেল না। রাক্ষস যখন ঘর হতে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল রাজা তখন তার পিছন থেকে তাকে ধরে বধ করলেন। রাক্ষসের গর্জনে ও কোলাহলে ঘুম থেকে জেগে উঠল নরমোহিনী। সে রাক্ষসকে নিহত দেখে আনন্দের সঙ্গে বলল, হে রাজন, আমি আপনার প্রসাদে নির্ভয় ও মুক্ত হলাম। আজ এই রাক্ষসের উপদ্রব হতে চিরমুক্ত হলাম। আপনার কৃত এই উপকার হতে কি করে উত্তীর্ণ হব? অতএব অনুমতি করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাই। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, যদি তুমি আমার কথা মানতে চাও তাহলে এই কমলাকরকে ভজনা করো।

নরমোহিনী রাজার কথামত কমলাকরকেই ভজনা করল। বিক্রমাদিত্যও তাঁর উজ্জয়িনী নগরে ফিরে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যদি আপনার এমন ধৈর্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে রইলেন।

দশম উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে অন্য পুত্তলিকা বলল, রাজন, আগে শুনুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে কোন এক যোগী উজ্জয়িনী নগরে আগমন করেন। তিনি বেদ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীতশাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর তুল্য অন্য কেউ ছিল না।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে আহ্বান করার জন্য পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত সেই সর্বজ্ঞ যোগীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, রাজা আপনাকে আহ্বান করছেন,

আপনি সেখানে গমন করুন।

যোগীবর সেই রাজপুরোহিতের সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, রাজন, আপনি যদি মন্ত্র সাধন করেন, তবে তার ফলে জরামরণবর্জিত হতে পারবেন।

রাজা বললেন, বেশ, আপনি সেই মন্ত্রের উপদেশ করুন, আমি সাধন করব।

যোগী রাজাকে মন্ত্র দিয়ে বললেন, এই মন্ত্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এক বর্ষকাল জপ করতে হয়, পরে দুর্বাঙ্কুর দ্বারা অগ্নিতে জপসংখ্যার এক দশমাংশ হোম করতে হবে। তারপর পূর্ণাহুতিদানকালে হোমকুণ্ড হতে এক পুরুষ ফল হাতে উত্থিত হয়ে আপনাকে সেই ফল দান করবেন। সেই ফল ভক্ষণ করে জরামরণবর্জিত ও বজ্রতুল্য দৃঢ়কায় হবেন।

রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে যোগীবর স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজাও নগরের বাইরে গিয়ে এক বছরকাল ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে মন্ত্রজপ ও দুর্বাঙ্কুর দিয়ে জপের দশমাংশ হোম করে যখন পূর্ণাহুতি দিতে যাবেন অমনি হোমকুণ্ড হতে কোন পুরুষ নির্গত হয়ে রাজার হাতে একটি ফল দান করলেন। রাজাও সেই ফল নিয়ে নগর অভিমুখে যখন আসছিলেন, সেই সময় রাজপথে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণকায় এক ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, রাজা লোকের মাতা ও পিতার তুল্য। উক্ত আছে, রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু, অচক্ষুর চক্ষু, রাজা মাতা ও পিতা এবং রাজা সকলের দুঃখ নিবারণকারী গুরু। যেহেতু আপনি বিশ্বের দুঃখ দূর করে থাকেন, আপনি আমারও দুঃখ নাশ করুন। এই ব্যাধি দ্বারা আমার দেহ নাশ হচ্ছে এবং আমার কর্মশক্তি লোপ পেয়েছে। যেহেতু প্রথমে শরীররক্ষা করে পরে ধর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, অতএব আমার শরীর যাতে রোগশূন্য ও উপভোগযোগ্য হয়, আপনি তার উপায় বিধান করুন।

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা তাঁকে সেই মন্ত্রসাধনায় প্রাপ্ত ফল দান করেন। ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হয়ে নিজস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজাও

রাজপুরীতে ফিরে গেলেন।

পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, হে রাজন, যদি এমন ঔদার্য, ধৈর্য ও মহত্ত্ব আপনার থাকে তবেই এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

তা শুনে মৌনী হয়ে রইলেন ভোজরাজ।

একাদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে গেলে পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন আগে। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যে কোন খল, তস্কর বা পাপী ব্যক্তি ছিল না। যে রাজার সর্বদাই রাজ্যভারের চিন্তা ও বলবান শত্রুবিজয়ের ভাবনা আছে, সে রাজা দিনে রাতে কখনো নিদ্রা যেতে পারে না। উক্ত আছে, যে ব্যক্তি অর্থের জন্য লালায়িত, তার পিতাও নেই, বন্ধুও নেই। কামাতুরের ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। চিন্তাতুরের সুখ ও নিদ্রা নেই, এবং ক্ষুধার্তের বল ও তেজ কিছুই থাকে না।

এই বিক্রমাদিত্য তেমন রাজা ছিলেন না। ইনি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের নিজ পাদপদ্মে আশ্রিত করে তাদের উপর আজ্ঞা দান করে রাজ্যশাসন করতেন। উক্ত আছে রাজ্যের ফল আজ্ঞাপালন, ব্রহ্মচর্যের ফল তপস্যা, বিদ্যার ফল জ্ঞান এবং ধনের ফল দান ও ভোগ।

রাজা বিক্রমাদিত্য কোন সময়ে মন্ত্রীগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে স্বয়ং যোগী বেশে দেশান্তরে গমন করেন। তিনি বিদেশে পছন্দমত স্থানে কিছুদিন করে অবস্থান করতেন, আবার যেখানে আশ্চর্য কিছু দর্শন করতেন সেখানেও কিছুকাল কাটাতেন।

এইভাবে তিনি যখন দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন তখন একদিন চলতে চলতে এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এদিকে সূর্য অস্ত গেছে। সন্ধ্যাকাল আগত। অগত্যা রাজা রাত্রিযাপনের জন্য এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিলেন। সেই বৃক্ষের উপর চিরঞ্জীবী নামে এক বৃদ্ধ পক্ষীরাজ বাস করত। তার পুত্র ও পৌত্রগণ প্রতিদিন দূরদেশে গিয়ে নিজ নিজ উদর পূরণ করে সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেকে এক একটি ফল এনে

সেই বৃদ্ধ পক্ষীরাজকে দিত। মনু বলেছেন, বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্যা ও শিশুপুত্র—এই সকলকে শত শত নিন্দিত কার্য করেও প্রতিপালন করা কর্তব্য।

তারপর রাত্রিকালে পাখিরা বাসায় শান্তিতে বসলে বৃদ্ধ চিরঞ্জীবী তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। রাজা গাছের তলায় বসে তাদের কথা শুনতে লাগলেন।

চিরঞ্জীবী অন্য পাখিদের বলল, বৎসগণ, তোমরা ত নানাদেশ পর্যটন করে থাক, কোথাও কোন আশ্চর্য কিছু দেখেছ কি? তাদের মধ্যে একটি পাখি বলল, আমি আশ্চর্য কিছু দেখিনি। তবে আজ আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

চিরঞ্জীবী বলল, কি সে দুঃখ?

পাখিটি বলল, কি হবে সেকথা বলে?

বৃদ্ধ বলল, বৎস, যে দুঃখী সে যদি তার দুঃখের কথা তার সুহৃদদের কাছে বলে তাহলে সে দুঃখের লাঘব হয় কিছুটা।

তখন পাখিটি তার দুঃখের কারণের কথা বলতে লাগল। উত্তরদেশে শৈবালঘোষ পর্বতের কাছে পলাশ নামে একটি নগর আছে। সেই পর্বতের উপর এক রাক্ষস থাকত। তার নাম ছিল বকাসুর। সে প্রতিদিন নগরে এসে সামনে যাকে পেত তাকেই ধরে ভক্ষণ করত। তাতে রোজ অনেক লোক মারা যেত। তখন নগরবাসীরা একদিন বকাসুরকে বলল, তুমি যখন তখন যথেচ্ছভাবে যে কোন মানুষ বধ করে খেও না। তোমার ভক্ষণের জন্য আমরা প্রতিদিন একটি করে মানুষ পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।

বকাসুর একথা মেনে নিল। এইভাবে বহুকাল গত হলো। আজ আমার পূর্বজন্মের মিত্র এক ব্রাহ্মণের পালা পড়েছে। তাঁর একটিমাত্র পুত্র। যদি সেই ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রকে পাঠান তাহলে সন্তানবিচ্ছেদ ও বংশনাশ হয়, যদি নিজেকে রাক্ষসকে খাদ্য হিসাবে দান করেন তাহলে স্ত্রী বিধবা হয় এবং বৈধব্যযন্ত্রণা অতি বিষম, আবার যদি স্ত্রীকে দান করেন তাহলে গার্হস্থ্য জীবন ভেঙ্গে যায়। এইজন্য তার দুঃখে আমি

অতিশয় দুঃখিত।

এই কথা শুনে অন্যান্য পাখিরা বলল, যে বন্ধুর সুখে সুখী এবং বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত হয়, সেই যথার্থ বন্ধু। দেখ চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র-বক্ষ স্ফীত হয় আবার চন্দ্র অস্তমিত হলে সমুদ্র ক্ষীণ হয়। দুধ জলের সঙ্গে মিশে গুণ হারায়, কিন্তু আগুনের তাপে জল বিনষ্ট হলে দুধ বায়ুর জন্য উথলে উঠে আগুনে পড়তে চায়। আবার তাতে জল দিলে উত্তাল দুধ স্থির হয়। এমনি তাদের বন্ধুত্ব।

পাখিদের এই সব কথা শুনে রাজা তখনি সেই নগরে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়ে নিকটবর্তী এক সরোবরে স্নান করে মধ্যশিলার উপর বসে রইলেন। এমন সময় রাক্ষস এসে দেখল এক নির্ভীক পুরুষ হাসিমুখে মধ্যশিলার উপর বসে আছে। তখন সে বিস্মিত হয়ে বলল, হে মহাসত্ত্ব পুরুষ, আপনি সকলেরই দুঃখনাশক গুরু। আপনি বিশ্বের দুঃখনাশ করেছেন। যেহেতু শরীর সমস্ত ধর্মকর্মের সাধন, এই পাপকর্মে আমার শরীর বিনষ্ট হলে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠানও বিনষ্ট হবে। এই শিলার উপর প্রতিদিন যে ব্যক্তি বসে থাকে সে আমি আসার আগেই মরে যায়। কিন্তু আপনি মহা-ধৈর্যবান ও সহাস্যবদন। যার মরণকাল উপস্থিত হয় তার ইন্দ্রিয়সকল গ্লানিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু আপনি অধিকতর কান্তিমান হয়ে হাসছেন। বলুন, আপনি কে?

রাজা বললেন, সে বিচারে আপনার প্রয়োজন কি? আমি পরের জন্য এই দেহ দান করছি। তুমি তোমার কার্য করো।

রাক্ষস মনে মনে ভাবল, এই ব্যক্তি সাধু, ইনি নিজের সুখভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে পরের দুঃখে দুঃখী হয়ে এখানে এসেছেন। কথিত আছে, সাধুগণ নিজের সুখ দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত সাত্ত্বিক গুণের অভিলাষী হন এবং পরদুঃখে কাতর হয়ে থাকেন।

এরপর রাক্ষস রাজাকে বলল, হে মহাপুরুষ, পরের জন্য আপনি এই শরীর দান করছেন, অতএব আপনার এই শরীর গৌরবময়। পশু-গণও ত নিজেদের উদর পূরণ করে বেঁচে থাকে। কিন্তু যিনি পরের

জন্য শরীর দান করেন তার শরীরই গৌরবের বস্তু। আপনার মত পরোপকারী ব্যক্তির পক্ষে এ এমন বিচিত্র নয়। কারণ সজ্জন ব্যক্তিগণ পরের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে তৎপর হন। চন্দনবৃক্ষসকল নিজের দেহের শীতলতার জন্য জন্মলাভ করে না। হে মহাসত্ত্ব পুরুষ, এই পরোপকার ব্রতে আপনি সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েছেন।

উক্ত আছে, যিনি পরের উপকার সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্বপ্রকার সম্পদ ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আপনার মত যাঁরা স্বার্থসুখে নিস্পৃহ হয়ে পরোপকারে নিরত হন, তাঁরা জগতের হিতের জন্যই জন্মগ্রহণ করেন পৃথিবীতে।

এই সকল কথা বলার পর রাক্ষস রাজাকে বলল, হে মহাসত্ত্ব, আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি অভিলষিত বর গ্রহণ করুন।

রাজা বলল, হে রাক্ষস, যদি তুমি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক, তাহলে আজ হতে মনুষ্য ভক্ষণ বন্ধ করো। আর আমি যে উপদেশ দিচ্ছি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। তোমার নিজের প্রাণ যেমন তোমার কাছে প্রিয় তেমনি প্রাণীদের প্রাণ তাদের কাছে প্রিয় জানবে। এইজন্য মৃত্যুভয় হতে প্রাণীদের পরিত্রাণ করা জ্ঞানীদের কর্তব্য। আরও দেখ, এই ঘোর সংসারসাগরে পড়ে মর্ত্য জীবগণ জন্ম মৃত্যু, জরা ক্লেশে বড় কষ্ট পায় এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। 'আমি মরব' এই ভাবনায় মানুষের মনে যে দুঃখ হয় তা অনুমান দ্বারা কেউ বলতে পারে না। নিজের প্রাণের মত পরের প্রাণকে প্রিয় ভেবে তা রক্ষা করবে।

রাজা উপদেশ দিলে রাক্ষস সেদিন হতে জীবননাশ একেবারে পরিত্যাগ করল। রাজাও নিজ নগরে গমন করলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এই পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়াগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হয়ে রইলেন।

দ্বাদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ এরপর আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভদ্রসেন নামে এক বণিক ছিল। তার ধনসম্পদের সীমা ছিল না, কিন্তু সে মোটেই ব্যয়-শীল ছিল না।

ভদ্রসেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র পুরন্দর পিতার ধনসম্পদ পেয়ে সর্বস্ব দান করতে আরম্ভ করল। তখন ধনদ নামে পুরন্দরের এক প্রিয় মিত্র বলল, হে পুরন্দর, তুমি বণিকপুত্র হয়েও ক্ষত্রিয় কুমারের মত ধন ব্যয় করছ। এটা বণিককুলজাত ব্যক্তির লক্ষণ নয়। বণিকের যে কোন উপায়ে ধন সংগ্রহ করা ও সেই ধন ব্যয় না করা উচিত। উপার্জিত অর্থ একদিন মানুষের কোন না কোন বিপদে বিশেষ কার্যে লাগতে পারে। তাই বিপদ আপদের জন্য ধন সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। উক্ত আছে, আপদের জন্য ধন রক্ষা করবে, ধনদ্বারা দারাগণকে রক্ষা করবে এবং দারা ও ধনদ্বারা আত্মাকে সতত রক্ষা করবে।

এই কথা শুনে পুরন্দর বলল, হে ধনদ, তুমি যে বলছ উপার্জিত ধন একদিন কোন বিপদে বিশেষ কার্যে লাগতে পারে—একথা বিচারশূন্য অর্থাৎ যুক্তিহীন, কারণ আপদকালে ধনও বিনষ্ট হয়। অতএব সংসারে গত বিষয়ের জন্য শোক আর ভবিষ্যৎ অর্থের জন্য চিন্তা করা বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য নয়। সুতরাং বর্তমানের চিন্তা করাই কর্তব্য।

নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, বুদ্ধিমানগণ অতীত ও ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কেবল উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা করে থাকেন। কারণ ভবিতব্য বিনা আয়াসেই সংঘটিত হয় এবং যা যাবার তা যাবেই। উক্ত আছে, যা ভবিতব্য তা নারিকেলফলমধ্যস্থিত জলের মত আপনা হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং যা যাবার তা গজভুক্তকপিত্থের মত চলে যাবে। জানবে, যা ভবিতব্য নয় তা করতলগত হলেও বিনষ্ট হয়।

পুরন্দরের এই কথা শুনে ধনদ কোন উত্তর করল না। ক্রমে পুরন্দর সমস্ত পিতৃধনই ব্যয় করে ফেলল। এইভাবে পুরন্দর নির্ধন হয়ে পড়লে তার বন্ধু ও মিত্রগণ তার প্রতি আর কোন সম্মান দেখাত না।

এমনকি একসঙ্গে বসত না। তখন পুরন্দর মনে মনে ভাবল, যতদিন আমার হাতে ধন ছিল ততদিন এই মিত্রগণ আমার অনুগত ছিল। এখন এরা আমার সঙ্গে বাক্যালাপও করে না। একথা খুবই সত্য যে যার অর্থ আছে, তারই সুহৃদ আছে। ধনবান ব্যক্তিরই সুহৃদ হওয়া সম্ভব। অর্থবান ব্যক্তিই এ সংসারে পুরুষপদবাচ্য, যার অর্থ আছে, সেই পণ্ডিত। পুরুষ ধনহীন হলে তার বন্ধুবান্ধবগণ নামমাত্র পরিজন হিসাবে থাকলেও আগের মত তার সঙ্গে ব্যবহার করে না বা তার অনুবর্তন করে না। এমনকি, নির্ধন পুরুষের তার স্ত্রীর সঙ্গেও কলহ হয়ে থাকে।

যার ধন আছে সেই কুলীন, সেই পণ্ডিত, সেই বেদজ্ঞ, সেই গুণজ্ঞ, সেই বক্তা, সেই সুন্দর পুরুষ। সমস্ত গুণই কাঞ্চনকে আশ্রয় করে থাকে। যে পবন বনদহনকারী বহ্নির সখা হয়, সেই পবনই আবার ক্ষীণতেজা প্রদীপকে নির্বাপিত করে। ক্ষীণ ব্যক্তিকে কেউ গৌরব দান করে না। তাই মনে হয়, দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়।

কোন এক দরিদ্র ব্যক্তি কোন ধনী মুমূর্ষুকে লক্ষ্য করে বলছে, সখা, গাত্রোত্থান করো। আমার এই দারিদ্র্যভার ক্ষণমাত্র বহন করো, আমি চিরকাল একে বহন করে পরিশ্রান্ত হয়েছি। এখন তোমার মরণের সুখ আমাকে ভোগ করতে দাও।

ধনহীনের এই কথা শুনে মুমূর্ষু ব্যক্তি মনে ভাবল, দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক ভাল।

এই ভেবে সে মৌন হয়ে রইল। কোন ব্যক্তি স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করে বলেছেন, হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার, কারণ তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধপুরুষ হয়েছি। বিশ্বের কোন লোক আমাকে দেখতে পায় না।

আরও উক্ত আছে, দরিদ্র পুরুষ মৃত, যে স্ত্রী পুরুষের সন্তান হয়নি তারা জীবন্মৃত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন অপাত্রে দান মৃত বা নিষ্ফল এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞও অর্থহীন।

এই সব ভেবে দেশান্তরে গমন করল পুরন্দর। ঘুরতে ঘুরতে হিমাচলের নিকট এক নগরে এসে উপস্থিত হলো। সেই নগরের কিছু

দূরে এক বেনুবন বা বাঁশবন ছিল। গ্রামের মধ্যে গিয়ে রাত্রিকালে কোন গৃহস্থের বাড়ির পরিষ্কার স্থানে শয়ন করল। ক্রমে সে ঘুমিয়ে পড়ল। অর্ধরাত্রিকালে সেই বেনুবন থেকে এক নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পুরন্দরের। কে যেন বলছে, হে মহাজনসকল, আমাকে বাঁচান, পরিত্রাণ করুন, রাক্ষস আমাকে মারছে।

পরদিন সকালে পুরন্দর গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, রাত্রিকালে কোন নারীকণ্ঠের ধ্বনি শুনলাম। কে সে?

গ্রামবাসীরা বলল, প্রতিদিনই রাত্রিকালে বেনুবনে ঐ রকম ধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু ভয়ে কেউ সেখানে যেতে পারে না।

এরপর পুরন্দর নিজ নগরে ফিরে এসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দেশান্তবে কোন অপূর্ব বিষয় দেখেছ কি?

পুরন্দর তখন সেই বেনুবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করল রাজার কাছে।

রাজা তা শুনে পুরন্দরের সঙ্গে তখনি সেই নগরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে রাজা রাত্রিকালে সেই নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনে বনমধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখলেন এক রাক্ষস এক স্ত্রীলোককে প্রহার করছে আর সেই নারী কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করছে।

রাজা তখন রাক্ষসকে বললেন, ওরে পাপিষ্ঠ, কেন তুই অনাথা স্ত্রীলোককে প্রহার করছিস?

রাক্ষস বলল, তোমার এ বিষয়ে প্রয়োজন কি? তুমি যে পথে এসেছ সেই পথে চলে যাও। বৃথা আমার হস্তে নিধন হবে কেন?

এরপর রাজা ও রাক্ষসের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাজা রাক্ষসকে নিহত করলেন। তখন সেই নারী রাজার চরণতলে পতিত হয়ে বলল, হে প্রভু, আপনার প্রসাদে আমার শাপাবসান হলো, আপনি আমাকে মহাদুঃখসাগর হতে উদ্ধার করলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

রমণী বলল, এই নগরে মহাধনশালী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁর ভার্যা। আমি ব্যভিচারিণী হওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি আমার

কোন প্রীতি ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর অতিশয় অনুরাগ ছিল। রূপগর্বে আমি এমনই গর্বিতা ছিলাম যে তিনি আমাকে সম্ভোগার্থে আহ্বান করলেও তাঁর কাছে যেতাম না আমি। এতে আমার স্বামী যাবজ্জীবন কামানলে সন্তপ্ত হয়ে মৃত্যুকালে আমাকে শাপ দিলেন। রে দুঃশীলা, যেমন তুই আমাকে যাবজ্জীবন সন্তাপ দিয়েছিস তেমনি বেনুবনবাসী কোন রাক্ষস তোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিদিন রাত্রিকালে সুরতাভিলাষে তোকে প্রহার করবে।

আমি তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম, নাথ আমাকে শাপমুক্ত করে দিন। তিনি বললেন, যখন পরোপকারী মহাধৈর্যসম্পন্ন কোন পুরুষ এসে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করবেন, তখন তুই তাঁর চরণতলে পতিত হলে শাপমুক্ত হবি। আমার এই ধন তাঁকে দিস।

এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। এখন আমি আপনার শরণাগত অধীনা। এই ধনকুম্ভ গ্রহণ করুন।

একথা শুনে রাজা সেই ধনকুম্ভ ও সেই রমণীকে পুরন্দরের হাতে সমর্পণ করে নিজে তাদের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ধৈর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য এক পুত্তলিকা, বলল, রাজন, আগে শ্রবণ করুন, একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীবর্গের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে যোগীবেশে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামে একদিন এবং নগরে একদিন অবস্হান করতে লাগলেন।

এইভাবে পরিভ্রমণ করতে করতে একদিন কোন এক নগরে উপস্হিত হলেন। সেই নগরের নিকটবর্তী নদীতীরে একটি দেবালয় ছিল। সেই দেবালয়ে ধার্মিক ব্যক্তিগণ পুরাণপাঠকের নিকট হতে পুরাণকথা

শুনতেন। রাজাও নদীতে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে বসলেন। সেই সময় পুরাণকথক পুরাণপাঠ আরম্ভ করলেন। তিনি বলছিলেন, শরীর অনিত্য, বৈভব বা ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী নয়, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত রয়েছে। অতএব ধর্ম সংগ্রহ করা কর্তব্য। অসংখ্য গ্রন্থে উক্ত সেই ধর্মের সার কথা শ্রবণ করুন। পরোপকার পুণ্যের কারণ এবং পরপীড়ন পাপের হেতু। যে ব্যক্তি দুঃখী লোক দেখলে দুঃখী এবং সুখী লোক দেখলে সুখী হয় সে ব্যক্তি সনাতন ধর্মের তত্ত্ব অবগত হয়েছেন। যে ব্যক্তি ভয়েভীত ব্যক্তিদের অভয় দান করেন তার সেই ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নেই। একটি ভীত ব্যক্তিকে অভয় দিয়ে জীবনদান করলে যে ফল হয়, সহস্র ব্রাহ্মণকে গোদান করলেও সে ফললাভ হয় না। যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে সমস্ত ব্যক্তিকে অভয় দান করে কল্পান্তকালেও তার পুণ্যের ক্ষয় হয় না। সুবর্ণ, ভূমি, ধেনু প্রভৃতির দাতা পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু সকলের প্রতি দয়াবান পুরুষ সংসারে দুর্লভ। মহা মহা যজ্ঞের ফল অভয়দানজনিত ফলের কোন অংশের এক অংশও হবে না।

যে ব্যক্তি চতুঃপাশবেষ্টিত এই পৃথিবী দান করে তার থেকে অভয়প্রদ ব্যক্তির ফল অনেক বেশী। যে মানুষ প্রতিক্ষণে বিনাশশীল এই অনিত্য শরীর দ্বারা শাশ্বত ধর্ম উপার্জন না করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির জন্য সাধুগণ দুঃখ করে থাকেন। যদি প্রাণীগণের হিতে এই দেহ নিয়োজিত করা না হয় তাহলে বৃথা নরদেহ ধারণ করে কি উপভোগ করবে?

যখন এইভাবে পুরাণকীর্তন হচ্ছিল তখন কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সঙ্গে নৌকাযোগে নদী পার হবার সময় নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি কাতর কণ্ঠে ডেকে বলতে লাগলেন, হে মহাজনগণ, শীঘ্র আসুন, আমি ব্রাহ্মণ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। কোন মহাবলবান ধার্মিক লোক আমাদের জীবন-দান করুন।

নদীস্রোতে ভাসমান সেই ব্রাহ্মণের আর্তনাদ শুনেও সেই মহাজনগণ কৌতূহলী হয়ে শুধু তা দেখতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্ধার করবেন

বলে কোন অভয় দিলেন না।

তখন বিক্রমাদিত্য মাভৈঃ বলে তাঁদের অভয়দান করে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁর পত্নীকে ধরে টেনে তুলে আনলেন নদীর তটভূমিতে। ব্রাহ্মণ সুস্থ হয়ে রাজাকে বললেন, হে সত্ত্বাবান পুরুষ, আমার দেহ অতীতে আমার পিতার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আপনার নিকট দ্বিতীয় জন্মলাভ করলাম। অতএব আপনি প্রাণদানহেতু আমার মহা উপকারী। যদি আমি এই মহা উপকারের কিছু প্রত্যুপকার না করি তবে আমার জীবনই ব্যর্থ। আমি গোদাবরী নদীর জলে দ্বাদশ বছর মন্ত্র জপ করে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি তা আপনাকে প্রদান করলাম। আর কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতদ্বারাও যা কিছু পুণ্য অর্জন করেছি তা সবও আপনি গ্রহণ করুন।

এই বলে সেই সমস্ত পুণ্য রাজাকে সমর্পণ করে আশীর্বাদ দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ পত্নীর সঙ্গে স্বস্থানে গমন করলেন।

ঠিক সেই সময়ে এক অতি ভয়ংকর ব্রহ্মরাক্ষস রাজার নিকট এসে উপস্থিত হলো। রাজাও তাকে দেখে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, তুমি কে?

রাক্ষস বলল, আমি এই নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। নিয়ত নিন্দনীয় দান গ্রহণ ও অযাজ্যযাজন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতাম। সর্বদা গুরু, বৃদ্ধ ও মহৎ ব্যক্তিদের নিন্দা করাই আমার কাজ ছিল। সেই পাপবশে আমি এক অশ্বত্থবৃক্ষে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে দশ সহস্র বছর অতি কষ্টে অবস্থান করছি। আজ আপনার প্রসাদে সেই পাপ হতে উদ্ধার-লাভ করতে চাই।

তার এই কথা শুনে রাজা তাকে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত সমস্ত পুণ্যই প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্যদ্বারা স্বকৃত সব পাপ হতে মুক্ত হয়ে রাজার স্তুতি করতে করতে স্বর্গে গমন করল। রাজাও নিজনগরে ফিরে গেলেন।

এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনার এমন পরোপকার, ধৈর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা অধোমুখী হয়ে রইলেন।

চতুর্দশ উপাখ্যান

এরপর ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসার চেষ্টা করলে আর এক পুত্তলিকা বলল, একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মনে করলেন, পৃথিবীতে যত সব আশ্চর্য বিষয়, সাধুপুরুষ, তীর্থস্থান ও দেবতা আছে, তা দর্শন করবেন।

এই ভেবে যোগীবেশে পরিভ্রমণ করতে করতে এক নগরে উপস্থিত হলেন। সেই নগরের নিকট এক তপোবনের মধ্যে জগদম্বিকার এক বিশাল মন্দির ছিল এবং তার পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল। রাজা সেই নদীতে স্নান ও দেবতাকে প্রণাম করে সেই মন্দিরে বসতে গিয়ে দেখলেন এক অবধূত সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে কুশল প্রশ্ন করলেন। রাজা সুখী বললে সন্ন্যাসী তাঁর পাশে বসলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, আপনি কোথা হতে এসেছেন ?

রাজা বললেন, আমি পথিক, তীর্থযাত্রায় বার হয়েছি।

যোগী বললেন, আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য, একদিন আমি উজ্জয়িনীতে আপনাকে দেখেছি, এজন্য চিনতে পারলাম। এখন এখানে কি জন্য এসেছেন ?

রাজা বললেন, হে যোগীবর, আমার মনে বাসনা হয়েছে পৃথিবী পর্যটন করে আশ্চর্য বস্তুসকল দর্শন করব, সেই সঙ্গে সাধুসজ্জনদেরও দর্শন হবে।

যোগী বললেন, রাজন, আপনি বিচক্ষণ হয়েও এভাবে রাজ্য ছেড়ে স্বাধিকারমত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ রাজ্যমধ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তবে আপনি কি করবেন ?

রাজা বললেন, আমি সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রীহস্তে ন্যস্ত করে এসেছি।

যোগী বললেন, রাজন, তা হোক, আপনি নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য করেছেন। উক্ত আছে, যাঁরা কর্মচারির উপর রাজ্যভার অর্পণ করে শৈলবিহারে নিরত হন, সেই মূঢ়বুদ্ধি রাজাগণ বিড়ালদের কাছে দুগ্ধকুম্ভ রেখে নিদ্রিত থাকেন। রাজ্যের অধিকার বংশপরম্পরাগত হলেও উপেক্ষা করা উচিত নয়, নতুন করে সুদৃঢ় করা কর্তব্য। কৃষিকার্য,

বিদ্যা, বণিক, ভার্যা, নিজধন ও রাজ্যসম্পদ কৃষ্ণসর্পের মুখের মত বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত।

তা শুনে রাজা বললেন, আপনি যা বললেন, তা সব নিরর্থক, কারণ দৈবই সব থেকে প্রবল। রাজ্যরক্ষা করতে যে সব দ্রব্যসামগ্রী দরকার, তার দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে রাজ্যরক্ষা করলেও পৌরুষমণ্ডিত কত রাজা প্রতিকূল দৈববশে পরাভব প্রাপ্ত হন। উক্ত আছে, বৃহস্পতি যাঁর গুরু, বজ্র যাঁর অস্ত্র, সুরগণ যাঁর সৈনিক, স্বর্গভূমি যাঁর দুর্গ, যাঁর উপর হরির অনুগ্রহ, ঐরাবত যাঁর বাহন, এইরূপ অসাধারণ বলসমন্বিত হয়েও দেবরাজ ইন্দ্র বলবান শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধে কতবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যান। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দৈবই জীবের আশ্রয়, পুরুষকারকে ধিক, তা সবই বৃথা হয়ে থাকে। আরও দেখুন, সুন্দর বা সুদৃঢ় আকৃতি, কুলশীল, বিদ্যা অথবা যত্নকৃত সেবা বা চেষ্টা কিছুই সফল হয় না, কেবল পুরুষের পূর্বকালের তপস্যাসঞ্চিত ভাগ্যই বৃক্ষের মত যথাকালে ফলদান করে থাকে। দেখা যায়, যুদ্ধের সময় যে হিরণ্যকশিপুর বক্ষেতে ইন্দ্রহস্তীর দন্তকুমুদ ও পিনাকপানির পরভর আঘাত ব্যর্থ ও প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল সেই বক্ষস্থল নৃসিংহদেবের নখরদ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং দৈব সহায় হলে তৃণখণ্ডও বজ্রতুল্য হয়ে ওঠে, এটি সত্যকথা। যা ভবিতব্য তা অবশ্যই হবে।

যোগী বললেন, তা কি করে সম্ভব?

রাজা বললেন, নদীপর্বতবন্ধন নামে এক নগর আছে। সেখানে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিমান ও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। একসময় তাঁর জ্ঞাতিগণ তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নগর হতে বার করে দিল।

তখন সেই রাজা স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশ দেশান্তর ঘুরে অবশেষে একটি নগরপ্রান্তের এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সময় সূর্য অস্তমিত হওয়ায় রাজা স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একটি গাছের তলায় বসলেন। সেই গাছের উপর পাঁচটি পাখি বাস করত। তারা নিজেদের মধ্যে

কথাবার্তা বলছিল।

প্রথমে একটি পাখি বলল, এই রাজ্যে রাজা নেই। যিনি রাজা ছিলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং এখন কে রাজা হবে?

দ্বিতীয় পাখিটি বলল, এই বৃক্ষমূলে যে রাজা বসে আছেন তিনিই রাজা হবেন।

তৃতীয় পাখিটি বলল, তাই হোক।

পাখিদের এই সব কথাগুলি বৃক্ষমূলে বসে রাজা সব শুনলেন। পরে সকালবেলায় সূর্য উঠলে সকলেই নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, রাজাও নিত্যকর্ম সম্পন্ন করে সূর্যপ্রণাম করে রাজপথে বার হলেন। সেই সময় সেই রাজ্যের রাজা স্থির করার জন্য একটি মাল্যধারিণী হস্তিনী সেই পথ দিয়ে আসছিল। সেই করিণী রাজশেখরকে আসতে দেখে তাঁর কণ্ঠদেশে মালা পরিয়ে দিল। তারপর তাকে পিঠের উপর চড়িয়ে রাজভবনে নিয়ে গেল। তখন মন্ত্রীগণ অভিষেক করে রাজশেখরকেই রাজা করলেন।

এরপর একসময়ে সমস্ত বিপক্ষ রাজাগণ পরস্পর সন্ধি করে রাজশেখরকে পরাভূত করার জন্য নগর আক্রমণ করল। সেই সময় রাজশেখর তাঁর মহিষীর সঙ্গে পাশাখেলায় রত ছিলেন।

মহিষী বললেন, নাথ, আপনি কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন? বিপক্ষ রাজারা নগর বেষ্টন করেছেন। কাল প্রভাত হলেই তারা নগর অধিকার করে আমাদের ধরবে।

রাজা বললেন, যত্ন ও চেষ্টা করে কি হবে? দৈব যখন অনুকূল হয়, তখন সব কার্য আপনিই ঘটে থাকে। দৈব যখন প্রতিকূল হয় সমস্ত চেষ্টাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তা কি তুমি প্রত্যক্ষ করনি? দৈবই সকল উন্নতি ও অবনতির কারণ।

দেখ, আমি যখন বৃক্ষমূলে ছিলাম, তখন যিনি আমাকে রাজা করেছিলেন, তিনিই আমার বিষয় চিন্তা করেছিলেন। আমার ভাবনা তিনিই ভাববেন।

রাজা রাজশেখরের এই কথা শুনে যিনি তাকে রাজা করেছিলেন সেই দেবতা ভাবলেন, আমি একে যে রাজ্যভার দিয়েছি সে রাজ্য যদি আমি রক্ষা না করি তাহলে অতিশয় অন্যায় হবে।

এই বিচার করে সেই দেবতা ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে শত্রুদের তাড়না করতে লাগলেন। তারা সকলেই পরাজিত হলো। তখন রাজশেখর নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

বিক্রমাদিত্য এই কথা বললে সেই যোগীরাজ তা শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং রাজাকে কাশ্মীরলিঙ্গ নামে একটি শিবলিঙ্গ দান করলেন। তারপর বললেন, এই লিঙ্গ চিন্তামণির মত। আপনি যা চিন্তা করবেন, এ লিঙ্গ তাই প্রদান করবে। একে উত্তমরূপে পূজা করবেন।

রাজাও তথাস্তু বলে যোগীকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। তিনি যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, আমি নিয়মিত শিবলিঙ্গ পূজা করে জলগ্রহণ করে থাকি। কিন্তু পথে লিঙ্গটি হারিয়ে গেছে। এজন্য আমি তিনদিন উপবাস আছি। অতএব আপনি এই শিবলিঙ্গটি আমাকে প্রদান করুন।

রাজা তখন সেই ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটি দান করে নিজ নগরে গমন করলেন।

এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বললেন, রাজন, আপনার মধ্যে যদি এইরকম ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠতে গেলে আর একটি পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাঁর পুরোহিত বসুমিত্র অত্যন্ত রূপবান, সমস্ত কলাবিদ্যায় নিপুণ, রাজার অত্যন্ত প্রিয়, সমস্ত লোকের উপকারী ও মহাধনসম্পদশালী ছিলেন।

একদিন বসুমিত্র মনে মনে বিচার করে দেখলেন, গঙ্গাস্নান ব্যতীত সঞ্চিত পাপসমূহের ক্ষয়ের অন্য কোন উপায় নেই। তীর্থস্থান ছাড়া

পবিত্রকর আর কিছুই নেই। জীবগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ বা দানদ্বারা যে সদগতি প্রাপ্ত না হয় গঙ্গায় স্নান করলে সেই সদগতি প্রাপ্ত হয়। যেমন ঘোর অন্ধকার বিনাশ করে দিবাকর দীপ্তি পেতে থাকেন তেমনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ গঙ্গাজলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পাপসকল বিনাশ করে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। তুলারাশি যেমন অগ্নিসংযোগে সদ্য ভস্মীভূত হয় তেমনি গঙ্গার পবিত্র প্রবাহে সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি সূর্যকিরণে তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, সে যথাবিধি গব্যপানের ফল পেয়ে পাপ হতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণদ্বারা দেহশোধন করেছে, আর যে কেবল গঙ্গাজল পান করেছে—এই উভয় ব্যক্তিই সমান ফলভোগী। যারা দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করে থাকে তাদের গঙ্গাতুল্য গতি দেখি না।

বহু মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে দীনচিত্তে নরকগামী হতে থাকলে গঙ্গাজল তাদের উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে অবগাহন করে সে ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারে। গঙ্গার দর্শন, ধ্যান ও গঙ্গানাম কীর্তনদ্বারা শত শত সহস্র সহস্র পুরুষ উদ্ধার পেয়ে থাকে। শক্তি থাকতে যারা পাতকনাশিনী গঙ্গাদর্শন না করে তারা জন্মান্ধ, মৃগ ও পশুতুল্য।

এইরূপ বিচার করে বসুমিত্র বারাণসী গমন করে গঙ্গাস্নানের পর বিশ্বেশ্বর দর্শন করে প্রয়াগে গিয়ে আবার স্নান করল। তারপর নিজ নগরে ফিরে গেল। পথে একটি নগর দেখতে পেল।

সে নগরে শাপভ্রষ্টা এক সুরবণিতা রাজত্ব করত। তার স্বামী ছিল না। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের এক বিরাট মন্দির ও তার মধ্যে এক বিবাহমণ্ডপ নির্মিত ছিল।

বসুমিত্র দেখল সেই মন্দিরের দ্বারদেশে একটি বড় লৌহপাত্রে তেল ফুটছে। সেই মন্দিরের রক্ষকগণ বিভিন্ন দেশ হতে আগত তীর্থযাত্রীদের বলছে, যদি কোন সত্ত্বশালী ব্যক্তি এই তৈলমধ্যে পতিত হতে পারেন তাহলে এই মন্মথসঞ্জীবনী নাম্নী অপ্সরা তার কণ্ঠে মালা দেবে।

বসুমিত্র এই কথা শুনে নিজ নগরে ফিরে এল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার পর সে পরদিন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। রাজাকে দর্শন করে গঙ্গাজল ও প্রসাদ নিয়ে বসল।

তারপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, বসুমিত্র, তুমি তীর্থযাত্রা করেছ কি?

বসুমিত্র বলল, প্রভু, আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা করে আমি নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছি।

রাজা বললেন, দেশান্তরে গিয়ে কি অপূর্ব জিনিস দেখলে?

বসুমিত্র সেই অপ্সরা ও তপ্ত তেলের কথা বলল।

রাজা তখন বসুমিত্রের সঙ্গে সেই নগরে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে সেই বিরাট লৌহপাত্রের মধ্যে তপ্ত তেলের উপর ঝাঁপ দিলেন।

তা দেখে সেখানকার লোকেরা হাহাকার করতে লাগল। তখন রাজার শরীর মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করল। তা দেখে মন্মথসঞ্জীবনী নামে সেই অপ্সরা অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ঢেলে দিয়ে তা অভিষেক করল। তার ফলে রাজা দিব্যদেহধারী এক পুরুষ হয়ে উঠলেন। অপ্সরা তখন রাজার গলায় মালা দিতে উদ্যত হলো।

রাজা বললেন, হে মন্মথসঞ্জীবনী, যদি তুমি আমার অধীনা হও, তবে আমার কথা শোন।

অপ্সরা বলল, প্রভু, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, যদি আমার কথা শোন তবে আমার পুরোহিত বসুমিত্রকে বরণ করো।

অপ্সরা তখন রাজপুরোহিত বসুমিত্রের গলায় মালা দিয়ে তাকে বিবাহ করল। এরপর রাজা নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

এই কথা বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ধৈর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ষোড়শ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উঠতে গেলে আর এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন আগে। রাজা বিক্রমাদিত্য একবার দিগ্বিজয়ে বহির্গত

হয়ে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দিকসকল পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের বশীভূত করলেন। তাঁদের প্রদত্ত বহু মূল্যবান উপঢৌকন গ্রহণ করে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে অধিষ্ঠিত করে নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

তারপর নগরমধ্যে প্রবেশ করার সময় দৈবজ্ঞ বললেন, মহারাজ, চারদিন নগরে প্রবেশ করার শুভ সময় নেই।

দৈবজ্ঞের কথা শুনে রাজা নগরের বাইরে উদ্যানের মধ্যে এক পট-মণ্ডপ নির্মাণ করে তাতে চারদিন থাকার মত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এমন সময় ঋতুরাজ বসন্ত এসে উপস্থিত হলো।

সুমন্ত্রীনামা নামে রাজার মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন, রাজন, ঋতুরাজ বসন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন। অতএব আজ বসন্তের পূজা করা কর্তব্য। তাঁর পূজা করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন আপনার উপর। সমস্ত লোক সুখী হবে এবং সকল অমঙ্গল দূরীভূত হবে।

মন্ত্রীর কথা অনুমোদন করে রাজা 'তাই হোক' বলে বসন্ত পূজার আদেশ দিলেন।

মন্ত্রী তখন উদ্যানমধ্যে এক মনোহর সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে বেদশাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ, সঙ্গীত ও বাদ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ গায়কগণ ও কলাকুশলী নর্তকীদের আহ্বান করলেন। দীন, দরিদ্র, অন্ধ, পঙ্গু, বধির প্রভৃতি ব্যক্তিরা অনাহূতভাবে উপস্থিত হলো।

সেই সভামণ্ডপে নবরত্নখচিত এক সিংহাসন স্থাপিত হলো। তার উপর লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হলো। পূজার জন্য কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরিকা, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও নানারকমের পুষ্প আনা হলো। এইভাবে যথাবিধানে রাজা স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ-মূর্তির স্নান ও পূজা করে ব্রাহ্মণ ও কলাকুশলীদের বস্ত্রদান করলেন।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে এক প্রশস্তিবাক্য শোনাল, মহাদেবের পাণিগ্রহণকালে অম্বিকার লজ্জিত মুখমণ্ডল আপনার কল্যাণদায়ী হোক।

এই আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বললেন, আমি নন্দীবর্ধন নগরের

অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ। আমার আটটি পুত্র হয়। পরে দেবী অম্বিকার উপাসনা করে একটি কন্যা জন্মে। তখন আমি সস্ত্রীক দেবীর কাছে সংকল্প করেছিলাম, হে অম্বিকে, যদি আমার কন্যা হয় তাহলে আপনার নামে নামকরণ করব এবং সেই কন্যাকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করব। এখন সেই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত। আমি তখন আরও সংকল্প করেছিলাম কন্যার অঙ্গে তার সমপরিমাণ সোনা ওজন করে দেব। এখন মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। আমি এখন কন্যাকে আমার সংকল্পমত তার দেহপরিমিত স্বর্ণ দান করতে চাই। এই পৃথিবীতে রাজা বিক্রমাদিত্য ছাড়া এমন কোন রাজা নেই যিনি এই পরিমাণ স্বর্ণ দান করতে পারেন। তাই আপনার নিকট এসেছি।

রাজা বললেন, আপনি উত্তম কার্য করেছেন। আপনার প্রয়োজনমত স্বর্ণ আপনি গ্রহণ করুন।

এই বলে রাজা ভাণ্ডারীকে ডেকে বলে দিলেন, এই ব্রাহ্মণকে এঁর কন্যার দেহভারপরিমিত সোনা দিয়ে দিও। এছাড়া অষ্টবর্গের অর্ধ অষ্টকোটি সোনা দেবে। ভাণ্ডারী তাই করল। ব্রাহ্মণও অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে কন্যার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল। রাজাও শুভ মুহূর্ত দেখে নিজ পুরীতে প্রবেশ করলেন।

এই কথা বলার পর পুত্তলিকা বলল, হে রাজন, যদি আপনার এমন ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা তুষ্ণীভূত হয়ে রইলেন।

সপ্তদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে পুত্তলিকা বলল, হে রাজন, ঔদার্যগুণে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য কেউ ছিল না। এই গুণদ্বারাই সারা ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কীর্তি। যাচকগণ সর্বদাই সেই রাজার স্তুতিপাঠ করত। স্তুতিবাক্য একমাত্র দাতার প্রীতির জন্যই যাচকগণের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে থাকে। বীরের নামে কেউ স্বস্তিবাক্য বলে না।

উক্ত আছে, ধনার্থীদের স্বস্তিবাচন দাতাদের প্রীতি উৎপাদনের জন্যই হয়ে থাকে আর শূর বা বীরগণের প্রীতির জন্য রণদুন্দুভির শব্দ হয়ে থাকে।

শৌর্য, ধৈর্য, জ্ঞানানুষ্ঠান প্রভৃতি গুণসমূহ সকলেরই হতে পারে, কিন্তু সবগুণ সকলের হয় না। পশুসকলও যুদ্ধ করে, শুকপাখিগণ দেবতার নামকীর্তন করে, কিন্তু দান করে কয়জন? যে দান করে, সেই বীর এবং পন্ডিত। যাঁরা বীর এবং দয়ালু তাঁরা দানবীরের ষোল অংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়।

অন্য গুণরাশির তুলনায় একমাত্র দানগুণেই গৌরবজনক, তাই দানগুণে পশু, পাষাণ, বৃক্ষাদিগণও পূজিত হয়ে থাকে। আমার মনে হয় দান-গুণ শত শত গুণেরও বেশী। তাতে যদি আবার দাতা বিদ্যাদ্বারা ভূষিত হয় তাহলে আর বলার কি আছে? আবার যদি তাতে বীরত্ব থাকে তবে তাঁকে নমস্কার। এই তিনটি গুণ এবং অহঙ্কারহীনতা সকল গুণকে অতিক্রম করে। এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান ছিল বিক্রমাদিত্যের মধ্যে।

একদিন অপর এক রাজ্যের রাজার সামনে এক স্তুতিপাঠক বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী পাঠ করল। তা শুনে সেই রাজা মনে মনে স্পর্ধা করে স্তুতিপাঠককে বলল, কি জন্য এই সব স্তুতিপাঠক কেবল রাজা বিক্রমাদিত্যেরই গুণ বর্ণনা করে, আর কি কোন রাজা নেই?

স্তুতিপাঠক বলল, হে রাজন, দান, উপকার, সাহস, শৌর্য, বীর্য ও ধৈর্যে তাঁর তুল্য রাজা ত্রিভুবনে নেই। পরোপকার বিষয়ে তাঁর নিজ দেহেও তিনি মমতা করেন না।

এই কথা শুনে সেই রাজা 'আমিও পরোপকার করব' মনে মনে ভেবে কোন এক যোগীকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যোগীবর, পরোপকার উপায় কি আমাকে বলুন। আমি তার সাধনা করব।

যোগী বললেন, রাজন, এমন কোন উপায় নেই। তবে কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে চতুঃষষ্ঠী যোগিনীচক্রের পূজা করতে হবে। তারপর পুরশ্চর করে জপের দশাংশ হোম করতে হবে। এইভাবে হোম সম্পন্ন হলে পূর্ণাহুতি দানকালে নিজ শরীর আহুতি দিতে হবে।

রাজা তাই করলেন। এতে যোগিনীচক্র প্রসন্ন হয়ে রাজাকে নূতন শরীর দান করে বললেন, রাজন, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, হে মাতৃগণ, যদি আপনারা প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমার গৃহে যে সাতটি বৃহৎ কলস আছে তা প্রতিদিন সুবর্ণপূর্ণ করুন।

যোগিনীগণ বললেন, তিন মাস যদি এইভাবে নিজ শরীর অগ্নিতে আহুতি দিতে পার তাহলে আমরা তা করতে পারি।

রাজাও 'তাই হোক' বলে প্রতিদিন নিজ দেহ অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ পেয়ে সেই যজ্ঞস্থলে এসে পূর্ণাহুতিদানকালে নিজে হোমানলে ঝাঁপ দিলেন। তখন যোগিনীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, আজ অন্য দেহের মাংস বলে মনে হচ্ছে। এ মাংসের আস্বাদ বেশী ভাল। এর দেহ মহাসারসম্পন্ন সন্দেহ নেই।

এই কারণে বিক্রমাদিত্যকে পুনর্জীবিত করে বললেন, হে মহাসত্ত্ব, তুমি কে? তোমার এই দেহত্যাগের উদ্দেশ্য কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি পরোপকারের জন্য নিজদেহ অনলে আহুতি দিয়েছি।

যোগিনীগণ বললেন, আমরা প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে এই রাজা প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করতে গিয়ে যে মহৎ কষ্ট পাচ্ছেন তা নিবারণ করুন। এঁর সপ্ত মহাকলস সুবর্ণপূর্ণ করুন।

'আমরা তাই করব' বলে যোগিনীগণ অঙ্গীকার করলেন। ফলে সেই রাজার মৃত্যু নিবারিত হলো। তাঁর কলসগুলি সুবর্ণে পরিপূর্ণ হলো। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে প্রত্যাগমন করলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, যদি আপনার মধ্যে এমন পরোপকার, দয়া ও ধৈর্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করতে যাবেন এমন সময় অন্য এক পুত্তলিকা বলল, হে রাজন, আগে শ্রবণ করুন। মণিপুরে গোবিন্দশর্মা নামে সকল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ যখন নিজ পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন, তখন আমিও সেই নীতি উপদেশ শুনেছিলাম, তা আপনায় নিকট বলছি।

রাজা বললেন, বল।

পুত্তলিকা বলল, দুর্জনের সঙ্গে সঙ্গ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্তব্য নয়। কারণ তা অনর্থসমূহের মূল। উক্ত আছে, দুর্জনদের সম্মিলন অনর্থপরম্পরার হেতু, তাতে সজ্জনের নিন্দা হয়ে থাকে। দেখ, লঙ্কেশ্বর রাবণ রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করল, আর দক্ষিণ সমুদ্র বন্ধনপ্রাপ্ত হলেন। বিশেষতঃ এই জগতে দুর্জনের সঙ্গে সঙ্গ নিজপ্রভাবে নরকের পথ পরিস্কার করে থাকে, বিনয় ও সদ্‌গুণ দূরীভূত করে।

সজ্জনের সঙ্গে সহবাস করা কর্তব্য। সৎসঙ্গের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ আর ইহলোকে কিছুই নেই। কারণ তাতে মহৎ আনন্দলাভাদি গুণসকল উদ্ভূত হয়ে থাকে। উক্ত আছে, সৎসঙ্গ আনন্দ উৎপাদন করে, মৃদুমন্দ বায়ু, চাঁদ ও চন্দন অপেক্ষা শীতল ও মনোহরভাব আনে, অসৎপ্রবৃত্তি দূর করে এবং সম্পদের উৎপত্তি করে। কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়। পরের মনে কষ্ট দিতে নেই। বিনা অপরাধে ভৃত্যদের দণ্ডদান করা অনুচিত। নিতান্ত চরিত্রদোষ না দেখলে স্ত্রীকে ত্যাগ করা অবিধেয়। তাহলে নরকগামী হতে হয়। উক্ত আছে, যে ব্যক্তি আজ্ঞা-প্রতিপালিনী, সুরূপা, সুদক্ষা ও সুশীলা স্ত্রীকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করে সে অনন্তকাল নরকভোগ করে।

লক্ষ্মী স্থির মনে করো না, তিনি জলস্রোতের মত চিরচঞ্চলা। উক্ত আছে, যতদিন বাঁচবে, ভোগ করে যাবে, ধন দান করবে, মান্য ব্যক্তিদের সম্মান করবে। সজ্জনদের সঙ্গে সহবাস করবে। লক্ষ্মী চিরদিন থাকবে না। অতিশয় বেগবান পবনদ্বারা চালিত দীপশিখার মত লক্ষ্মী সর্বদাই চঞ্চলা।

স্ত্রীলোকের কাছে গুপ্তকথা বলবে না। ভবিষ্যতের চিন্তা করবে না। শত্রুদেরও হিতবাক্য বলবে। দান ও অধ্যয়ন ছাড়া দিন অতিবাহিত করবে না। পিতামাতার সেবা করা কর্তব্য। চোরের সঙ্গে আলাপ করবে না। কর্কশভাষায় উত্তরদান অনুচিত। অল্পের জন্য কোন কাজ করা অকর্তব্য।

কথিত আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পরক্ষার জন্য বহুতর ক্ষতি স্বীকার করেন না, বরং অল্প দ্বারা বহু রক্ষা যাতে হয় সেইরূপ করাই পণ্ডিতের উচিত।

দীন ব্যক্তিকে দান করা কর্তব্য। ধর্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কর্মদ্বারা পরোপকার করা কর্তব্য।

এইসব সাধারণ নীতি সকল পুরুষের পক্ষে উপদিষ্ট আছে। রাজা বিক্রমাদিত্য সকল নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

একদিন বিদেশাগত এক ব্যক্তি বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হয়।

রাজা তাকে বললেন, সৌম্য, তোমার নিবাস কোথায়?

লোকটি বলল, রাজন, আমি বিদেশী, আমার কোথাও বসতি স্থির নেই। সর্বদাই পর্যটন করে থাকি।

রাজা বললেন, পৃথিবী পরিভ্রমণ করে কি কি অপূর্ব জিনিস দেখেছ?

সে বলল, রাজন, এক মহৎ আশ্চর্য জিনিস দেখেছি।

রাজা বললেন, কি সে আশ্চর্য জিনিস?

বিদেশী বলল, উদয়াচল পর্বতে সূর্যদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। সেখানে গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গাতীরে পাপবিনাশন নামে এক শিবালয় আছে। সেখানে গঙ্গাপ্রবাহ হতে প্রতিদিন একটি সোনার স্তম্ভ উত্থিত হয়। তার উপর নবরত্নখচিত এক সিংহাসন আছে। সেই সুবর্ণস্তম্ভ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর হতে বাড়তে থাকে। মধ্যাহ্নকালে তা সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সূর্য অস্তমিত হলে তা আপনা হতেই গঙ্গার জলে ডুবে যায়। প্রতিদিনই এইরকম হয়। আমি এই মহাশ্চর্য

জিনিস দেখেছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য তা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই লোকটির সঙ্গে উদয়াচল সন্নিহিত সেই গঙ্গাতটে গিয়ে রাত্রিকালে নিদ্রিত রইলেন। রাত্রি প্রভাত হলে গঙ্গার জল হতে রত্নসিংহাসনবিশিষ্ট সেই সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়ে ক্রমে আকাশের দিকে উঠতে লাগল।

রাজা তখন সেই সিংহাসনের উপর উঠে বসলেন। স্তম্ভটি প্রতিদিন-কার মত রাজাকে নিয়ে মধ্যাহ্নকালে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। সিংহাসনটি ক্রমে সূর্যের নিকট উপস্থিত হলে সূর্যের অগ্নিতুল্য কিরণের তাপে রাজার দেহ মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হলো। তথাপি রাজা সেই অবস্থায় সূর্যমণ্ডলে গিয়ে সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। হে দেব, জগতের প্রসবকর্তা, জগতের একমাত্র চক্ষু, তুমিই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু। ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কররূপী তোমাকে নমস্কার।

সূর্যদেব তখন অমৃতদ্বারা সেই স্তম্ভের অভিষেক করলেন। রাজা দিব্যদেহ ধারণ করলেন।

সূর্যদেব বললেন, হে রাজন, তুমি মহাসত্ত্ববান পুরুষ। আমার এই মণ্ডল সকলেরই অগম্য। তুমি যে এখানে আগমন করেছ এজন্য আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর। বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? কারণ মুনিগণেরও অগম্য এই স্থানে আমি আসতে পেরেছি। আপনার প্রসাদে সকলপ্রকার সম্পদই আমার গৃহে বিদ্যমান আছে।

রাজার কথায় সূর্যদেব আরও সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তখন নবরত্ন-খচিত তাঁর কুণ্ডল দুটি রাজাকে দান করে বললেন, এই কুণ্ডল দুটি প্রতিদিন একভার করে স্বর্ণ প্রদান করে থাকে।

রাজা তখন সেই কুণ্ডল দুটি গ্রহণ করে সেই স্তম্ভযোগে অবতরণ করে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হলেন।

পথে কোন এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বেদান্তশাস্ত্রে যাকে অখিল ভুবনব্যাপী অদ্বিতীয় পুরুষ বলে থাকে,

যাতে 'ঈশ্বর' শব্দ অন্যগামী না হয়ে যথার্থরূপে অন্বিত হয়, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করে যাঁকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করেন, সুদৃঢ় ও সুস্থির ভক্তিযোগ দ্বারা সুলভ সেই মহাদেব আপনার পরম মঙ্গলবিধান করুন।

এই আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বললেন, হে যজমান, একে আমার বহু পোষ্য, তাতে আবার আমি অতি দরিদ্র। সর্বত্র ভিক্ষার জন্য ঘুরেও সকলের উদর পূরণ হয় না।

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা তাঁকে সেই কুণ্ডল দুটি দান করে বললেন, এই কুণ্ডলদ্বয় প্রতিদিন আপনাকে একভার করে স্বর্ণ দান করবে।

তা শুনে ব্রাহ্মণ অতীব সন্তুষ্ট হয়ে রাজার স্তুতি করতে করতে চলে গেল সেখান থেকে। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ঔদার্য ও ধৈর্যগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হয়ে রইলেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, আগে শুনুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে সমস্ত লোকই আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ ষটকর্মনিরত, স্ত্রীসকল পতিব্রতা, মানুষরা শতবর্ষজীবী, বৃক্ষসমূহ সর্বদা ফলে পরিপূর্ণ, মেঘসকল প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষী এবং পৃথিবী শস্যময়ী ছিল। পাপ হতে ভয়, অতিথিগণের পূজা, জীবগণে দয়া, গুরুজনে সেবা, দান—প্রদানের মধ্যে এইসব সদ্‌বৃত্তিসমূহ লক্ষিত হত।

একদিন বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে বসেছিলেন। অন্যান্য সামন্তরাজাগণও তাঁর কাছে বসেছিলেন। রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ স্তুতিপাঠককে দিয়ে আপন আপন বংশাবলী পাঠ করাচ্ছিল। উদ্ধতস্বভাব রাজারা আপন আপন বাহুবলের প্রশংসা নিজমুখে করছিল।

ছাব্বিশ প্রকার দণ্ড ও শস্ত্র সাধনায় অভিজ্ঞ কোন কোন রাজা পরস্পরকে উপহাস করছিল।

এমন সময় মৃগয়াজীবী এক ব্যাধ এসে রাজা বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করে নিবেদন করল, হে দেব, অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্বততুল্য এক বিরাট বরাহ এসেছে। আপনি তাকে দর্শন করুন।

এই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য অন্যান্য সামন্তরাজাদের সঙ্গে নিয়ে তখনি বনমধ্যে গিয়ে নদীর ধারে এক কুঞ্জবনের মধ্যে সেই বরাহ দেখতে পেলেন।

বীরগণের কোলাহল শুনে সেই বরাহ বেরিয়ে এল কুঞ্জবন হতে। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্তরাজাগণের সামনে ছাব্বিশ রকম অস্ত্র-প্রয়োগের কৌশল দেখিয়ে ছাব্বিশটি অস্ত্র বরাহের উপর প্রয়োগ করলেন। তবু সেই বরাহ অস্ত্রাঘাত গ্রাহ্য না করে পর্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করল। রাজাও তার পিছু পিছু গমন করলেন।

রাজা সেই গুহার মধ্যে কাঞ্চনময় এক দ্বার দেখে তার মধ্যে প্রবেশ করে কিছুদূর অন্ধকারে গমন করলেন। তারপর এক উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। তার কিছু দূরে স্বর্ণপ্রাচীরবেষ্টিত শ্বেতবর্ণ আকাশ-চুম্বী প্রাসাদসমন্বিত এক নগর দেখা গেল। ধনীগণ অধ্যুষিত সেই নগর দেবালয় ও উপাসনাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ও সমস্ত রকমের বস্তুপূর্ণ বিপণি-দ্বারা বিরাজিত ছিল। সেখানে বিলাসী পুরুষগণ বিলাসিনীদের নিয়ে উপভোগে মত্ত ছিল। অতি মনোহর সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করে অতি মনোরম মণ্ডপবিশিষ্ট এক রাজভবন দেখতে পেলেন রাজা। সেখানে বিরোচনপুত্র বলি তখন রাজত্ব করছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই রাজভবনে প্রবেশ করামাত্র বলিরাজ স্বয়ং তাড়াতাড়ি এসে বিক্রমাদিত্যকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর বললেন, হে প্রভু, আপনি কোথা হতে আগমন করেছেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি আপনাকে দর্শন করার জন্য এসেছি।

বলি বললেন, আজ আমার বংশ পবিত্র ও পূর্ণকাম হলো। বহু পুণ্যবলে আজ আমার গৃহে আপনার আগমন হয়েছে। আজ বহুকালের

পর আপনার পাদস্পর্শানুগ্রহে আমার গৃহ ধন্য ও পবিত্র হলো।

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজন, আপনার অন্তঃকরণ পবিত্র। আপনার জন্ম সার্থক, যেহেতু বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ আপনার মন্দিরে নিয়ত বিরাজ করছেন।

বলি বললেন, প্রভু, আপনার আগমনের কারণ কি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, হে দানবেন্দ্র, আমি আপনাকে দর্শন করার জন্যই এসেছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

বলি বললেন, আপনি যদি আমার প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করেই এসে থাকেন তবে কৃপা করে কোন বর প্রার্থনা করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার কোন বিষয়ে অভাব নেই। আপনার প্রসাদে আমিও সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ।

বলি বললেন, অভাবের কথা বলছি না, কিন্তু মিত্রতার উদ্দেশ্যে কিছু প্রদান করছি। বুদ্ধিমান জ্ঞানী পণ্ডিতগণ বলেছেন, দান করে, প্রতিগ্রহণ করে, ভোজন করে, ভোজন করায়, গুপ্তকথা বলে, গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা করে—এই ছয় রকমই প্রীতির লক্ষণ।

উপকার ব্যতীত কখনো কারো মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হয় না। দেবগণের নিকট উপযাচক হলেই তারা অভীষ্ট প্রদান করে থাকেন। নিয়ত দান করলে বিবেকবর্জিত পশুগণের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খলে দান করলেও তা বিফল হয় না। সন্তানহীনা নারীও দুগ্ধ দান করে থাকেন।

এই বলে বলিরাজ বিক্রমাদিত্যকে রস ও রসায়ন এই দুই পরম বস্তু দান করলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই দান নিয়ে পাতালপুরস্থিত নগর হতে বেরিয়ে এসে সুড়ঙ্গপথ ধরে বনমধ্যে এসে পড়লেন। পরে তার অশ্বে আরোহণ করে রাজধানীর পথে যাত্রা করলেন। পথে মহাদৈন্যদশাগ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার পুত্রের সঙ্গে এসে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

যার উদরের ত্রিবলী যশোদাকর্তৃক কঠিনতর রজ্জুর দ্বারা বন্ধনের রেখায় সন্দেহ জন্মায়, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন।

এই আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ বললেন, হে যজমান, আমি অতি দরিদ্র, পীড়িত ও বহু পোষ্যবিশিষ্ট এক ব্রাহ্মণ। আজ আমাদের সপরিবারে ভোজন যাতে সম্পন্ন হয় সেইমত কিছু দান করুন। আমরা অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এখন আমার হাতে কিছুই নেই। কিন্তু রস ও রসায়ন নামে দুটি বস্তু আছে। রসযোগে সমস্ত ধাতু সোনা হয়ে যায়, আর রসায়ন সেবন করলে জরামরণ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই দুটি বস্তুর মধ্যে আপনি একটি গ্রহণ করুন।

তখন ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্রের মধ্যে মতভেদ হলো। ব্রাহ্মণ বললেন, রসায়ন সেবন করলে জরামরণের ভয় হতে রক্ষা পাব। সুতরাং তাই দিন।

পুত্র বলল, রসায়ন নিয়ে কি হবে? জরামৃত্যুবর্জিত হয়ে চিরদিন দারিদ্র্যই ভোগ করতে হবে। যে রসসংযোগে সকল ধাতু সোনা হয়ে যায় তাই গ্রহণ করা কর্তব্য।

এইভাবে পিতাপুত্র দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে রাজা রস ও রসায়ন দুটিই তাদের দান করলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে ঘরে চলে গেল। রাজাও তাঁর রাজভবনে ফিরে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এই ধৈর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

বিংশতি উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য এক পুত্তলিকা বলল, মহারাজ, আগে শুনুন, বিক্রমাদিত্য ছয় মাস রাজত্ব করতেন আর ছয় মাস দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন।

একবার দেশান্তরে গিয়ে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে পদ্মালয় নামে এক নগরে উপস্থিত হন। সেই নগরের বাইরে স্বচ্ছসলিলা এক পুষ্করিণী দেখে তার জলপান করে সেখানে বসলেন। সেই সময় সেখানে আরো কয়েকজন এসে জলপান করে বসল। তারপর তারা পরস্পর কথাবার্তা বলতে শুরু করল।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, আমরা অনেক দেশ দেখলাম, অনেক তীর্থস্থান ঘুরলাম, অনেক দুর্গমস্থানে গেলাম এবং অনেক অগম্য পর্বতসকলে আরোহণ করলাম, কিন্তু কোনখানে একজন মহাপুরুষদর্শন ঘটল না।

অন্য এক ব্যক্তি বলল, কি করে মহাপুরুষদর্শন ঘটবে? যেখানে মহাপুরুষ আছে সেখানে গমন করা অসাধ্য। সেখানে যাওয়ার পথ অতিশয় দুর্গম বলে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা এবং তাতে দেহনাশও ঘটতে পারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রথমে দেহরক্ষা করা কর্তব্য। যে উদ্যম দ্বারা আত্মনাশ হয় তার ফল কে ভোগ করবে? উক্ত আছে, পত্নী গেলে আবার পত্নী পাওয়া যায়, ক্ষেত্র গেলে ক্ষেত্র হয়, অশুভ কর্মও পরে শুভ হতে পারে, কিন্তু শরীর জন্মকালে একবারই পাওয়া যায়, সে শরীর গেলে পুনর্বার আর তা পাওয়া যায় না।

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের অকার্য পরিহার করা কর্তব্য। উক্ত আছে, যে সব ব্যসনে পরিণামসকল মন্দ এবং ব্যয়ও অধিক, যে সকল কার্য অসাধ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কখনই তাতে প্রবৃত্ত হবেন না।

আরও একটা কথা আছে, পর্বত বিষম ও অতিভীষণ, তাতে বহু হিংস্র জীবজন্তু বাস করে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণসংশয়ের কারণ উপস্থিত হলেও পর্বতে কখনো আরোহণ করবেন না।

রাজা বিক্রমাদিত্য এইসব কথা শুনে বললেন, সে কি বিদেশী, এমন কথা বলছেন কেন? পুরুষ যতক্ষণ সাহস ও পৌরুষ প্রকাশ করে, ততক্ষণ কোন কার্যই দুঃসাধ্য হয় না তার পক্ষে। উক্ত আছে, সংশয়ারূঢ় সাহসী পুরুষই দুষ্প্রাপ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করতে পারে, অলস ব্যক্তিরা তা লাভ করতে পারে না।

কথিত আছে, আকাশের খাদেও কদাচিৎ পাতাল হতে জল উঠতে পারে, কারণ দৈব অচিন্ত্য ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ জগতে সাহসী ব্যক্তিই কার্যসিদ্ধিলাভ করতে পারে। বিনা কষ্টে কখনো সুখ পাওয়া যায় না। দেখ, স্বয়ং নারায়ণ মন্থনের পরিশ্রম স্বীকার করেই লক্ষ্মী-দেবীকে লাভ করেছিলেন।

নরসিংহাকৃতি বিষ্ণু কোন কার্য না করেছিলেন? কিন্তু তিনিই আবার চার নামে সমুদ্রে নিদ্রা যান।

যতদিন মানুষ পৌরুষ প্রকাশ না করে, ততদিন তার সৌভাগ্যলাভ দুষ্কর। দেখ, সূর্যদেব তুলারাশিতে আরোহণ করে নিজ আবরক জলসকল হরণ করে থাকেন।

রাজার কথা শুনে সেই বিদেশী ব্যক্তি বলল, হে মহাসত্ত্ব, বলুন সে কি কার্য?

রাজা বললেন, এখান হতে দ্বাদশ যোজন দূরে এক মহারণ্যের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পর্বত আছে। সেই পর্বতে ত্রিকালনাথ নামে এক যোগীবব বিরাজ করছেন। যদি তাঁর দর্শনলাভ করতে পারা যায় তাহলে তিনি সব বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেন। আমি সেখানে যাচ্ছি।

বিদেশীরা বলল, আমরাও যাব।

রাজা বললেন, স্বচ্ছন্দে আসতে পার।

রাজার সঙ্গে তারা একযোগে পথ চলতে লাগল। কিন্তু মহারণ্যের পথ অতিশয় দুর্গম দেখে তারা বলল, মহাসত্ত্ব, পর্বত আর কতদূর?

রাজা বললেন, এখান হতে আট যোজন দূরে।

তারা তখন বলল, যদিও পথ বিষম এবং অনেক দূর, তবু আমরা যাব।

কিন্তু ছয় যোজন পথ যাবার পর তারা সহসা দেখল মহাকালের মত মুখবিশিষ্ট বিষাগ্নি উদ্গীরণকারী এক মহাসর্প তাদের পথরোধ করে অবস্থান করছে। সেই সর্প দেখে তারা সকলে পালিয়ে গেল। রাজা একাকী এগিয়ে গেলেন।

তখন সেই সর্প এসে রাজার দেহটিকে জড়িয়ে দংশন করল। সর্প রাজার দেহটিকে জড়িয়ে রইল, ছেড়ে গেল না। রাজা তখন সর্পবিষে জর্জরিত দেহটিকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে সেই দুর্গম পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন। অবশেষে পর্বতের উপর যোগীবর ত্রিকালনাথকে দর্শন করে প্রণাম করলেন। যোগীদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সর্প রাজার দেহ ছেড়ে চলে গেল। রাজাও নির্বিষ হলেন।

যোগী বললেন, হে মহাসত্ত্ব, এই স্থান মানুষের অগম্য এবং বিপদসংকুল। তুমি কেন এসেছ এখানে ?

রাজা বললেন, যোগীবর, আমি আপনাকে শুধু দর্শন করার জন্য এসেছি।

যোগী বললেন, আহা, তোমার কত কষ্টই না হয়েছে।

রাজা বললেন, এখন আর কোন কষ্ট নেই। আপনাকে দর্শন করামাত্র সব পাপ বিনষ্ট হয়েছে। কষ্ট করে আজ আমি ধন্য হলাম। যেহেতু মহতের দর্শনলাভ অতি দুর্লভ এবং যেহেতু শরীর যতদিন দৃঢ় থাকে এবং ইন্দ্রিয়সকল বিকল না হয় ততদিন মানুষের আত্মহিতকর কার্য সাধন করাই কর্তব্য। উক্ত আছে, যতদিন এ দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন জরা দূরে থাকে, যতদিন ইন্দ্রিয়শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ আয়ুক্ষয় না হয়, ততদিন আত্মমঙ্গলের জন্য যত্ন করা বিদ্বান ব্যক্তিদের একান্ত কর্তব্য। গৃহ জ্বলে উঠলে কূপখননের উদ্যোগ বৃথা।

এই কথা শুনে যোগীবর প্রসন্ন হয়ে রাজাকে একটি ঘুঁটি, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কন্থা বা কাঁথা দান করে বললেন, এই ঘুঁটিদ্বারা মাটিতে যতগুলি রেখা টানা যায়, তুমি একদিনে তত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারবে। এই যোগদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধরে স্পর্শ করালে মৃত সৈন্য জীবিত হয়ে উঠে পড়বে আর বাম হস্তে ধরে স্পর্শ করালে সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আর এই কন্থাও ইচ্ছানুরূপ বস্তু প্রদান করে।

এই তিনটি বস্তু গ্রহণ করে রাজা যোগীবরকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে পর্বত হতে নেমে রাজপথে এসে উপনীত হলেন। সেখানে এসে তিনি দেখলেন, কোন এক রাজকুমার সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে কাঠ সংগ্রহ করছেন।

রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সৌম্য, কেন আপনি এমন করছেন ?

কুমার বলল, আমি কোন রাজপুত্র, জ্ঞাতিগণ আমার রাজ্য অপহরণ করেছে। ফলে আমি দরিদ্র হয়ে জীবনধারণে অক্ষম হয়ে পড়েছি। তাই আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করছি।

রাজা এই কথা শুনে দয়াপরবশ হয়ে সেই ঘুঁটি, যোগদণ্ড ও কন্হা সেই রাজকুমারকে দান করে তাদের গুণবর্ণনা করলেন। তখন রাজকুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে প্রণাম করে নিজ দেশে চলে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনার এমন ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

একবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ যখন সিংহাসনে পুনরায় বসতে যাবেন তখন অন্য এক পুত্তলিকা বলল, যার বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ আছে সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত।

ভোজরাজ বললেন, পুত্তলিকা, বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।

পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন, বিক্রমাদিত্যেব রাজত্বকালে বুদ্ধি-সিন্ধুনামক তাঁর এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র অনর্গল ঘৃতান্ন ভোজন করত এবং সব সময় খেলা করত, কোন বিদ্যাভ্যাস করত না।

একদিন তার পিতা বললেন, অনর্গল, তুমি আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেও অতিশয় দুরাচারী হয়ে কালযাপন করছ। বিদ্যাভ্যাস করো না, ফলে মূর্খ ও হৃদয়হীন হয়ে আছ। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্য, মূর্খের হৃদয় শূন্য, বান্ধবহীন দেশ শূন্য এবং দারিদ্র্য সর্ব-শূন্য। তোমা হতে আমার কোন কার্য সাধিত হবে না। যে পুত্র বিদ্বান ও ধার্মিক নয়, সেই পুত্রের জন্ম হলে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যে গাভী গর্ভিনী নয় এবং দুগ্ধও দান করে না সেই গাভী নিয়ে কি করবে?

কথিত আছে, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনের মধ্যে মৃত ও অজাত এই দুটি পুত্রই ভাল, কারণ তারা অল্প দুঃখ দিয়েই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মূর্খপুত্র যাবজ্জীবন দগ্ধ করতে থাকে। যে পুত্রের দ্বারা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে ধ্বজের মত কুল উন্নত না হয়, মাতার যৌবনবিনাশী সেই পুত্র দ্বারা কি ফল লাভ হবে?

পিতার এই কথা শুনে অনুতপ্ত হলো অনর্গল এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করে দেশান্তরে গমন করল। সেখানে এক নগরে এক উপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকে সমস্ত নীতিশাস্ত্র পাঠ করল। তারপর একদিন নিজ নগরের পথে রওনা হলো।

পথে এক বনের মধ্যে একটি দেবালয় দেখতে পেল। সেই দেবালয়ের কাছে স্বচ্ছনির্মল জলে পূর্ণ একটি সরোবর ছিল। তাতে পদ্মসকল শোভা পাচ্ছিল এবং চক্রবাকমিথুন খেলা করছিল। সেই সরোবরের একদিকে অতিশয় উত্তপ্ত জল ছিল।

এই সব দেখে অনর্গল সেই সরোবরের ধারে বসল। ক্রমে সূর্য অস্তমিত হলো। পরে রাত্রিকালে সরোবরের সেই তপ্ত জল থেকে আটটি দিব্যাঙ্গনা উঠে এসে মন্দিরে গিয়ে দেবতার অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করে নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করল। তখন দেবতা প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রসাদ দিলেন।

অনর্গল এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে লাগল। প্রভাতকালে দিব্যাঙ্গনারা প্রস্থান করার সময় অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে একজন বলল, ভদ্র, তুমি আমাদের নগরে চল।

এই বলে সরোবরের সেই তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে যেতে অনর্গলের ইচ্ছা হলেও ভয়ে সে সেই তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারল না। সে তার নগরে ফিরে গেল। তাকে ফিরে পেয়ে তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন খুবই আনন্দিত হলো।

পরদিন অনর্গল রাজদর্শনের জন্য রাজসভায় গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে বসল। রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, অনর্গল, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

অনর্গল বলল, মহারাজ, বিদ্যাভ্যাস করার জন্য দেশান্তরে গিয়েছিলাম।

রাজা বললেন, সেখানে কি কি অপূর্ব জিনিস দেখলে বল।

অনর্গল তখন সেই সরোবরের তপ্ত জল ও দিব্যাঙ্গনাদের বৃত্তান্ত সব বলল।

রাজা তা শুনে অনর্গলের সঙ্গে সেই স্থানে গমন করলেন। সেখানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রি গভীর হলে দিব্যাঙ্গনারা সরোবরের সেই তপ্ত জল থেকে বার হয়ে এসে দেবালয়ে এসে ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করে নৃত্যগীতাদিদ্বারা দেবতার প্রীতি সাধন করল।

পরদিন প্রভাতকালে দিব্যাঙ্গনাদের একজন রাজাকে দেখতে পেয়ে বলল, সৌম্য, আমাদের সঙ্গে নগরে চলুন।

তা শুনে রাজাও তাদের সঙ্গে তপ্ত জলের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের অনুসরণ করে তাদের নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। তখন সেই দিব্যাঙ্গনারা মিলিত হয়ে তাঁর আরতি প্রভৃতি সম্বর্ধনা করে বলল, হে মহাসত্ত্ব, আপনার মত শৌর্যাদিসম্পন্ন আর কেউ নেই। এখন আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বর হোন। আমরা নারীগণ সকলেই আপনার সেবা করব।

রাজা বললেন, আমারও রাজ্য আছে, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই। আমি শুধু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এখানে এসেছি।

তারা তখন বলল, হে মহাপুরুষ, আমরা সন্তুষ্ট হলাম। আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, তোমরা কে?

তারা বলল, আমরা অষ্টসিদ্ধা।

রাজা বললেন, তাহলে আমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করো।

তখন দিব্যাঙ্গনারা রাজাকে আটটি রত্ন অষ্টসিদ্ধি হিসাবে দান করল। সেই আটটি রত্ন ছিল অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টশক্তিসম্পন্ন।

তারপর রাজা যখন সেই রত্নগুলি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে আসছিলেন তখন পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে বললেন, যিনি হরির নাভিকমলে নিয়তই বিরাজ করেন, বেদের প্রথম বক্তা সেই চতুরানন ব্রহ্মা আপনাকে সততই রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ এই আশীর্বাদ করলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দ্বিজবর, কোথা হতে আপনার আগমন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমার নিবাস চম্পকপুরীতে। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার পোষ্য অনেক। অভাবের জন্য আমার স্ত্রী আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন, তাই আমি দেশান্তরে বার হয়েছি। নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, নির্ধন পুরুষকে ভার্যা প্রভৃতি প্রিয়জনেরাও পরিত্যাগ করে।

কথিত আছে, যার ধন নেই, সেই গৃহস্বামী যদি সুরূপ হয় এবং উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত থাকে এবং বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা প্রশংসিতও হয় তথাপি স্ত্রীপুত্রাদি তাকে পরিত্যাগ করে। আপদ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভার্যা সদ্বংশজাত হলেও তার ভজনা করে না, মিত্রবর্গও তার নিকট যায় না। আর গুরুই হোন বা সুরূপই হোন, সুশীল বা অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞানীই হোন, ধন না থাকলে মানুষেরা লোকমধ্যে আদর বা সম্মান পান না। অবিকল ইন্দ্রিয়সকল, অপ্রতিহতবুদ্ধি ও উত্তমবাক্য-বিশিষ্ট হলেও অর্থ বা ধনবিরহিত ব্যক্তির কোন গুণ লোকে স্বীকার করে না।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা তাঁকে সেই আটটি রত্নই দান করলেন। ব্রাহ্মণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা করে নিজগৃহে গমন করলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ধৈর্য, শৌর্য ও ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা মৌনী হয়ে রইলেন।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য পুত্তলিকা বলল, রাজন, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসার যোগ্য।

ভোজরাজ বললেন, হে পুত্তলিকা, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ বর্ণনা করো।

পুত্তলিকা বলল, শুনুন, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করতে করতে

একবার পৃথিবী পর্যটনে বার হন। ঘুরতে ঘুরতে নানা তীর্থস্থান, দেবালয়, নগর ও পর্বত দর্শন করেন। অবশেষে মহারত্নময় প্রাচীর-বেষ্টিত, আকাশচুম্বী প্রাসাদ সুশোভিত, অনেক শিবালয় ও হরি-মন্দিরাদিসমন্বিত একটি নগরে উপস্থিত হলেন।

সেই নগরের বাইরে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। সেখানে গিয়ে নিকটবর্তী একটি সরোবরে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম করে বললেন, হে নাথ, আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য জানি না, কারণ আপনি বাক্যের অগোচর। আমি ত তুচ্ছ, আপনার মহিমা পরাৎপর ব্রহ্মাও বিদিত নন। আমি অন্য কোন দেবতার ভজনা করি না, অন্য কোন দেবতাকে আশ্রয় করি না, আর কারো ধ্যান করি না, শুধু আপনারই শ্রীচরণারবিন্দেরই ভজনা করে থাকি ভক্তিসহকারে। অতএব হে শ্রীনিবাস, হে পুরুষোত্তম, আমাকে আপনার দাস হবার অধিকার দিন।

রাজা বিষ্ণুর এই স্তব করার পর রঙ্গমণ্ডপে কোন এক ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি কোথা হতে আসছেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি এক তীর্থযাত্রী, পৃথিবী পর্যটন করছি। তুমি কোথা হতে আসছ ?

রাজা বললেন, আমিও তোমার মতই এক তীর্থযাত্রী।

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, না, তা নয়, তোমাকে অতি তেজস্বী বলে মনে হচ্ছে। তোমার মধ্যে রাজলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তুমি একজন রাজরাজেশ্বর, সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য। কি জন্য তুমি পৃথিবী পর্যটন করছ ? অথবা এটা তোমার অদৃষ্ট। ললাটের লিখন খণ্ডন হবার নয়। উক্ত আছে, হরিই হোন, আর হরই হোন, ব্রহ্মাই হোন আর দেবতাগণই হোন, ললাটে লিখিত ভাগ্যরেখা কেউ মুছে দিতে পারেন না।

রাজাও একথা স্বীকার করলেন। কারণ কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। প্রভাবান্বিত ব্যক্তিও যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হলেও গ্রহণ করবে আর যুক্তিহীন বাক্য বৃদ্ধের নিকট হলেও গ্রহণ করবে না।

রাজা বললেন, হে দ্বিজবর, কি জন্য আপনাকে অতিশয় ক্লান্ত দেখা

যাচ্ছে ?

ব্রাহ্মণ বললেন, শ্রমের কারণ আর কি বলব ?

রাজা বললেন, বলুন আপনার কষ্টের কারণ।

ব্রাহ্মণ বললেন, তবে শুনুন। নিকটে নীল নামে একটি পর্বত আছে। তাতে কামাক্ষী নামে এক দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ দেবালয় হতে পাতালে যাবার একটি গর্ত আছে। কিন্তু তা সর্বদাই রুদ্ধ থাকে। কেবল কামাক্ষী মন্ত্র জপ করলেই সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। তার মধ্যে এক রসের কুণ্ড আছে। সেই রসদ্বারা সুবর্ণ প্রভৃতি অষ্ট ধাতু নির্মিত হয়। ঐ দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য দ্বাদশ বছর পর্যন্ত আমি কামাক্ষীমন্ত্র জপ করছি। কিন্তু সে দ্বার উদ্‌ঘাটন হচ্ছে না।

ব্রাহ্মণের কথা শুনেই রাজা নিজ গলায় খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবী বললেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলাম, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, দেবী, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই ব্রাহ্মণকে তাঁর অভিলষিত রস দান করুন।

দেবী 'তথাস্তু' বলে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে রসদান করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার প্রশংসা করে নিজ নগরে গমন করলেন। রাজাও নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

পুত্তলিকা এই বলে ভোজরাজকে বললেন, রাজন, আপনার যদি এই রকম ধৈর্য ও ঔদার্য গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌন অবলম্বন করে রইলেন।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনর্বার সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে পুত্তলিকা বলল, রাজন, যার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্যগুণ আছে সেই ব্যক্তিই এ সিংহাসনে বসার উপযুক্ত।

ভোজরাজ বললেন, পুত্তলিকা, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ বর্ণনা করো।

পুত্তলিকা বলল, রাজন, একসময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্যটন করে নিজ নগরে এসে প্রচুর দান ও ভোজনে বহু লোককে তৃপ্ত করেন।

সেই রাত্রিতে নিদ্রাকালে রাজা এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন তিনি মহিষের পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে কোথায় যাচ্ছেন। এ স্বপ্নের কোন অর্থ বুঝতে পারলেন না তিনি।

পরদিন সকালে রাজসভায় ব্রাহ্মণদের ডেকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে এর অর্থ জানতে চাইলেন রাজা।

তা শুনে সর্বজ্ঞভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন, স্বপ্ন সাধারণতঃ দুই রকমের। কোন স্বপ্নের ফল শুভ আর এক শ্রেণীর ফল অশুভ হয়। যেমন হাতির পিঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গদা, শঙ্খ ও সুবর্ণ দর্শন প্রভৃতির স্বপ্ন শুভ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু মহিষ বা গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ, কন্টকবৃক্ষে আরোহণ, ভস্ম, শূকর ও বানরাদি দর্শন প্রভৃতি স্বপ্নের ফল অশুভ হয়।

রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন, তাহলে এর প্রতিবিধান কি?

সর্বজ্ঞভট্ট বললেন, আপনি প্রথমে স্নান করে যজ্ঞদর্শন করে ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার ও বস্ত্রদান করুন। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে দেবতার আরাধনা করুন। সেই সঙ্গে অন্ধ, অনাথ, আর্ত, বধির, পঙ্গু প্রভৃতি অসহায় দীন দুঃখীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করে তাদের পরিতৃপ্ত করুন। এই সব দানের ফলে স্বপ্নজনিত অশুভ ও অনিষ্টকর প্রভাব খণ্ডিত হয়ে যাবে।

সর্বজ্ঞভট্টের কথামত রাজা তিন দিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করার জন্য কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন।

কাহিনী শেষ করে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনার এমন ঔদার্যগুণ ও দানশীলতা থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ উত্তর দিতে না পেরে মৌনী হয়ে রইলেন।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অন্য এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, আগে শুনুন।

এই বলে সে রাজা বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী বলতে শুরু করল। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে সম্পদশালী নামে এক ধনী বণিক বাস করত। তার চার পুত্র ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে একদিন সেই বণিক তার পুত্রদের ডেকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা বিষয়সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ করতে পার। তাই আমি আগে থেকে আমার সব সম্পত্তি বড় ছোট অনুসারে আমার সব পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর আমার নির্দেশ অনুসারে তোমরা তা গ্রহণ করবে।

এর কিছুদিন পর বণিকের মৃত্যু হলো। তার ছেলেরা কিছুকাল একসঙ্গে থাকার পর সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে।

তখন একদিন চার ভাই এক জায়গায় বসে স্থির করল, তাদের পিতার নির্দেশমত সব বিষয়সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে শান্তিতে বাস করবে।

এরপর তারা পিতার নির্দেশমত তাঁর শোবার ঘরে খাটের নিচে মাটি খুঁড়ে একটি বড় ভাঁড় পেল। সেই ভাঁড়ের মধ্যে চারটি কৌটো পেল। একটি কৌটোর মধ্যে মাটি, একটির মধ্যে অঙ্গার বা পোড়া কাঠ, একটিতে হাড় আর একটিতে খড় পাওয়া গেল।

এই সব দেখে চার ভাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এর অর্থ কি তা কিছু বুঝতে পারল না তারা।

তারা তখন বলাবলি করতে লাগল কে এমন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন যিনি এর প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

এরপর চারভাই যুক্তি করে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে সব বৃত্তান্ত

বলল। রাজসভায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ এর অর্থ বুঝতে পারলেন না।

চার ভাই তখন অন্য এক রাজার রাজসভায় গিয়ে সব কথা বলল। সেই রাজ্যে এক কুমোরের ঘরে শালিবাহন বাস করত। সে খুব বুদ্ধিমান ছিল।

শালিবাহনের কানে কথাটা যেতেই সে নিজে থেকে রাজসভায় এসে বলল, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই ভাইরা একই পিতার সন্তান। এদের পিতা জীবিতকালেই তাঁর সব বিষয়সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

শালিবাহন আরও বলল, জ্যেষ্ঠপুত্রকে তিনি মাটি দিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো যাবতীয় ভূসম্পত্তি বা জমি জায়গা জ্যেষ্ঠপুত্র পাবে। দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি খড় দিয়ে গেছেন। এর অর্থ হলো বাড়িতে যত ধান মজুত আছে সেই সব মজুত ধান সব সে পাবে। তৃতীয় পুত্রকে তিনি দিয়ে গেছেন হাড়। এর অর্থ হলো যত সব গৃহপালিত পশু সে পাবে। চতুর্থ পুত্রকে তিনি দিয়ে গেছেন অঙ্গার। তার অর্থ হলো বাড়িতে মজুত সোনা সব সে পাবে।

শালিবাহন এইভাবে বিষয়ভাগের তাৎপর্যটা চারভাইকে বুঝিয়ে দিলে চার ভাই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিষয়ভাগের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি শালিবাহনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি শালিবাহনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে তাঁর রাজসভায় আসার জন্য আহ্বান জানালেন।

কিন্তু রাজার এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল শালিবাহন। সে বলল, রাজার কাছে যাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। রাজার যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনি আসতে পারেন আমার কাছে।

শালিবাহনের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন রাজা। তিনি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে শালিবাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হলেন।

রাজা এবার নগরদ্বারে শিবির স্থাপন করে এক দূত পাঠালেন

শালিবাহনের কাছে। দূত গিয়ে শালিবাহনকে বলল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য নগরদ্বারে অপেক্ষা করছেন। আপনি গিয়ে দেখা করুন তাঁর সঙ্গে।

তবু কিন্তু নত হলো না শালিবাহন। সে দূতকে বলল, তুমি রাজাকে বলবে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দেখব বিক্রমাদিত্য কত বড় বীর।

দূতমুখে শালিবাহনের এই স্পর্ধার কথা শুনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন রাজা। উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। সৈন্যদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হলো। অশ্বক্ষুরের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হলো চারদিক। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হলো।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহু সৈন্য হতাহত হলো। রাজা বিক্রমাদিত্যের সৈন্যরা মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে বদ্ধপরিকর হয়ে এগিয়ে গিয়ে অট্টহাসির দ্বারা ত্রাস উৎপাদন করতে লাগল। কেউ বা শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা আহত, ভিদ্যমানদেহ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হয়ে স্বর্গরমণীদের প্রিয় হতে লাগল। শত্রুসৈন্যদের রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল। রণক্ষেত্রে পতিত হস্তীদের কলেবরগুলি রক্তনদীর মধ্যে প্রেতের মত এবং তাদের অস্থি-গুলি শঙ্খের মত মনে হতে লাগল। এই যুদ্ধ যেমন ভয়ঙ্কর হলো শম্ভুর যুদ্ধও তেমন হয়নি।

অবশেষে রাজা বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের সব সৈন্যকে পরাজিত ও নিপাতিত করলেন। তখন শালিবাহন তার পিতা শেষনাগকে স্মরণ করল।

শেষনাগ তখন পুত্রকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য নাগকে পাঠাল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। বিষধর নাগরা এসে বিক্রমাদিত্যের সব সৈন্যদের জড়িয়ে ধরে দংশন করতে লাগল। তাদের বিষের জ্বালায় রাজসৈন্যরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। রাজা তখন একাকী তাঁর নগরে ফিরে গেলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন সর্পবিষে মৃত তাঁর সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য জলের মধ্যে দেহের অর্ধাংশ ডুবিয়ে নয় বছর ধরে বাসুকিমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। অবশেষে বাসুকি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বললেন,

রাজন, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে সর্পবিষে মূর্ছিত ও মৃতপ্রায় আমার সৈন্যদের বাঁচাবার জন্য অমৃতঘট প্রদান করুন।

বাসুকি তখন অমৃতঘট দান করলেন রাজাকে। সেই অমৃতঘট নিয়ে রাজা যখন পথ দিয়ে আসছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, হিমালয়ের মত শুভ্র যে দংষ্ট্রাদণ্ডের উপর পৃথিবী অবস্থান করে শোভাবর্ধন করেছিল, হরির লীলাবতার বরাহমূর্তির সেই দণ্ডাকৃতি দংষ্ট্রা আপনাকে পবিত্র করুক।

এই বলে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন ব্রাহ্মণ।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি কোথা হতে এসেছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি প্রতিষ্ঠাননগর হতে এসেছি।

রাজা বললেন, কি আপনার অভিপ্রায়?

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি যাচকদের চিন্তামণি, কারণ আপনি যাচকদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আমার একটি প্রার্থিত বস্তু আছে। যদি আপনি তা দান করেন তবে বলি।

রাজা বললেন, আপনি যাই বলবেন, আমি তাই দান করব।

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি ঐ অমৃতঘটটি আমাকে দান করুন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমাকে শালিবাহন পাঠিয়েছেন।

তা শুনে রাজা আপন মনে বিচার করে দেখলেন, আমার শত্রুর দ্বারা প্রেরিত হলেও এই ব্রাহ্মণকে আগেই তাঁর প্রার্থিত বস্তু দেব বলেছি, এখন যদি তা না দিই, তাহলে আমার অকীর্তি ও অধর্ম হবে। অতএব এঁকে অমৃতঘট দান করাই আমার কর্তব্য।

রাজাকে চিন্তান্বিত ও দ্বিধাগ্রস্ত দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন, আপনি সজ্জন, কি বিচার করছেন? সজ্জনদের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। উক্ত আছে, যদিও সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হন, যদিও মেরুপর্বত বিচলিত হয়, অগ্নিও শীতল হয়, যদিও পর্বতের শিলার উপর পদ্মফুল

বিকশিত হয় তথাপি সজ্জনদের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না।

রাজা বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। আমি তাই দেব। আপনি এই অমৃতঘট গ্রহণ করুন।

এই বলে সেই ব্রাহ্মণকে অমৃতঘট দান করলেন রাজা। ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন।

এই বলে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ঔদার্যগুণ থাকে ত এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে যাবেন এমন সময় অন্য এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, যার বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ আছে সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসতে পারেন।

তখন ভোজরাজের অনুরোধে বিক্রমাদিত্যের আর এক কাহিনী বলতে লাগল পুত্তলিকা। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক জ্যোতির্বিদ এসে রাজাকে বললেন, সূর্যদেব আপনাকে শৌর্য, চন্দ্র ইন্দ্রপদবী, মঙ্গল উত্তম মঙ্গল, বুধ সদ্‌বুদ্ধি, বৃহস্পতি গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, শনি শুভ, রাহু বাহুবল এবং কেতু কুলের উন্নতি প্রদান করুন। সমস্ত গ্রহগণ অনুকূল হয়ে নিত্য আপনার প্রীতিপ্রদ হোক।

এই আশীর্বাদ করে তিনি পঞ্চাঙ্গ বর্ণনা করলেন।

রাজা তখন সেই জ্যোতির্বিদকে বললেন, হে দৈবজ্ঞ, এই বছরের রাজাদি কে তা বর্ণনা করুন।

তিনি বললেন, এ বছরে রবি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি। শনৈশ্চর রোহিণী শকট করে গমন করবেন। অতএব এ বছর ঘোর অনাবৃষ্টি হবে। বরাহমিহির সংহিতায় উক্ত আছে, সূর্যপুত্র শনি যখন রোহিণী শকট ভগ্ন করেন, তখন মেঘ দ্বাদশ বছর ধরে বর্ষণ করে না। তাহলে পৃথিবীতে রক্তবৃষ্টি হয়। সাগরেও জল থাকে না, আর তার ফলে সমস্ত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

দৈবজ্ঞের এই কথা শুনে রাজা বললেন, এই অনাবৃষ্টির প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি ?

দৈবজ্ঞ বললেন, যদি গ্রহহোম করেন তাহলে বৃষ্টি হবে।

তখন বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে এই সব চূড়ান্ত বর্ণনা করে তাঁদের দ্বারা গ্রহহোম আরম্ভ করলেন। সমস্ত হোমসামগ্রী আনা হলো। রাজা বিবিধ দ্রব্য, অন্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করলেন। তিনি দশবিধ দ্রব্য দান করলেন। তারপর দীন, দরিদ্র, আর্ত, পঙ্গু ও অনাথদেরও দানের দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন।

তথাপি বৃষ্টি হলো না। বৃষ্টির অভাবে খাদ্য না পেয়ে রাজ্যের সমস্ত লোক ক্ষুধায় কাতর হয়ে অতিশয় কষ্ট পেতে লাগল। রাজাও তাদের দুঃখে দুঃখিত হলেন।

একদিন রাজা যজ্ঞশালায় বসে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করছেন এমন সময় আকাশবাণী হলো, যদি কোন বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত পুরুষের শিরশ্ছেদ করে বলি প্রদান করো তাহলে তোমার পুরস্থিত মন্দিরে বিরাজিত দেবী জলবর্ষণ করে তোমার আশা পূরণ করবেন।

এই দৈববাণী শুনে রাজা দেবালয়ে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে যেমন গলায় খড়্গাঘাত করতে যাবেন অমনি দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, রাজন, তোমার ধৈর্যগুণ দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, দেবী, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করুন।

দেবী বললেন, তাই হবে।

এই বলে পুত্তলিকা বলল, রাজন, যদি আপনার এমন ধৈর্য ও পরোপকারবাসনা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, যাঁর বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ আছে তিনিই

এ সিংহাসনে বসার অধিকারী।

ভোজরাজ বললেন, পুত্তলিকা, বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণের কথা বল।

পুত্তলিকা বলল, ঔদার্য, দয়া, বিবেক ও ধৈর্যগুণে বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা আর নেই। শুধু তাই নয়, তিনি মুখে যা বলতেন, তাই কাজেও করতেন। তাঁর মন ও বাক্য ও ক্রিয়া একই রূপ ছিল। তিনি যা মনে করতেন তাই বলতেন আর সেইরকম কাজও করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সজ্জন, সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিদের চিত্ত, বাক্য ও ক্রিয়াতে একই ভাব লক্ষিত হয়।

একদিন স্বর্গধামে দেবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সেই সভায় অষ্টাশী হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্টলোকপাল, ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণ, দ্বাদশ আদিত্য, দেবর্ষি নারদ ও তুম্বুরু, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা বা অপ্সরারা এবং গন্ধর্বগণও উপস্থিত ছিলেন।

সেই সময় মহর্ষি নারদ বললেন, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য কীর্তিমান, পরোপকারী ও মহান্তকরণসম্পন্ন রাজা আর নেই।

সেকথা শুনে সভাস্থিত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

কামধেনুও বললেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উক্ত আছে দান, তপস্যা, শৌর্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিনয় ও নীতি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা কর্তব্য নয়, কারণ এই বসুন্ধরায় বহুতর রত্ন বিরাজ করে।

তখন দেবরাজ কামধেনু সুরভিকে বললেন, তুমি মর্ত্যলোকে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া ও পরোপকার গুণাদি পরীক্ষা করে এসে আমাকে জানাবে।

এরপর সুরভি এক দুর্বল গাভীরূপ ধারণ করে মর্ত্যলোকে গমন করলেন। যখন বিক্রমাদিত্য একটি পথ দিয়ে আসছিলেন তখন সুরভি সেই পথে দুস্তর পঙ্কমধ্যে পড়ে রইলেন। রাজাকে দেখে তিনি কাতর শব্দ করতে লাগলেন। রাজাও পঙ্কে নিমগ্ন গাভীটির কাছে এসে দেখলেন, একটি দুর্বলা গাভী দুস্তর পঙ্কমধ্যে ডুবে আছে, উঠতে পারছে না, আর একটি তার কাছে বসে আছে।

রাজা গাভীটিকে পঙ্ক হতে উদ্ধার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে পারলেন না। ক্রমে সূর্য অস্তমিত হলো। রাত্রি সমাগত হলো। রাজাও সেখান থেকে চলে না গিয়ে অসহায় গাভীটিকে পাহারা দিয়ে সারারাত্রি বসে রইলেন সেইখানে।

তারপর রাত্রি প্রভাত হলে এবং সূর্য উঠলে গাভী রাজার দয়া ও ধৈর্যগুণ দেখে নিজে থেকেই পঙ্ক থেকে উঠে এসে রাজাকে বলল, আমি স্বর্গধেনু সুরভি। তোমার দয়াদি গুণসমূহ পরীক্ষা করার জন্য স্বর্গ থেকে এসেছি। এখন আমার বিশ্বাস হলো তোমার তুল্য দানশীল রাজা পৃথিবীতে আর নেই। আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, আপনার প্রসাদে আমার কোন বিষয়ে অভাব নেই। আমি কি বর চাইব ?

সুরভি বললেন, আমার বাক্য নিষ্ফল হয় না। আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।

তারপর রাজা যখন কামধেনু সুরভির সঙ্গে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন ঃ মহাদেবের উদ্ধত নৃত্যকালে আনন্দিত নন্দীর বাদিত মুরজের শব্দ শুনে মেঘভ্রমে কার্তিকের ময়ূর এসে উপস্থিত হলে তাকে দেখে মহাদেবের কটিবন্ধন হতে সর্প ভীত হয়ে গণেশের করিমুখের শুঁড়ের গর্তে শরীর সংকুচিত করে প্রবেশ করল এবং মদক্ষরণহেতু গণেশের হস্তীগণ্ডে ভ্রমরকুল উড়ে এসে গুঞ্জন-রবে-চারদিক মুখরিত করছিল। সেই অবস্থায় ভ্রমরদংশনে ও নাসিকা-মধ্যে সর্প প্রবেশের অস্বস্তিতে গণেশের চিৎকারসহকৃত বদনঢাকনা আপনাদের রক্ষা করুক।

এইভাবে আশীর্বাদ করার পর ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, বিধাতা আমাকে দরিদ্র করেছেন, সেইজন্য জগতের সকল লোককেই আমি দেখতে পাই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না। হে দারিদ্র্য, তোমাকে প্রণাম, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধপুরুষ হয়েছি। যে ব্যক্তি সর্বদা দারিদ্র্য দ্বারা অপ্রকাশ তার গৃহে সর্বদাই সূতকাশৌচ বর্তমান। কথিত আছে, কোন দরিদ্র তার স্ত্রীকে দারিদ্র্যকষ্ট বোঝাবার জন্য বলেছিল তার

ঘরে দারিদ্র্যনামক পুত্রের জন্ম হয়েছে এবং তাই সূতকাশৌচ যাবজ্জীবন স্থায়ী, সে অশৌচের শেষ নেই।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, কি যাচঞা করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন, আপনি আশ্রিতজনের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, যাতে আমার যাবজ্জীবনের দারিদ্র্য বিনষ্ট হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা বললেন, এই কামধেনু আপনাকে বাঞ্ছিত বস্তু দান করবেন। আপনি এঁকে গ্রহণ করুন।

এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে কামধেনু দান করলে ব্রাহ্মণ স্বর্গসুখ পেলাম বলে তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন। আর রাজাও নিজ নগরে গমন করলেন।

পুত্তলিকা এই কাহিনী শেষ করে ভোজরাজকে বলল, আপনার যদি এমন ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হয়ে রইলেন।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ যখন আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন তখন আর এক পুত্তলিকা বলল, বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ যাঁর আছে তিনি এ সিংহাসনে বসার যোগ্য। তখন ভোজরাজের অনুরোধে পুত্তলিকা এই কাহিনী বর্ণনা করতে লাগল।

একবার বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্যটন করতে করতে এক নগরে উপস্থিত হন। সেখানে এক অতিশয় ধার্মিক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি বেদ ও স্মৃতিবিহিত কর্মের দ্বারা রাজ্যের সমস্ত বর্ণের প্রজাদের প্রতিপালন করছিলেন। সেখানকার সমস্ত লোক সদাচারে নিরত, অতিথিবৎসল ও দয়ালু ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে তিন বা পাঁচদিন থাকবেন স্থির করে এক মনোহর দেবালয়ে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে রঙ্গমণ্ডপে বসলেন। এমন সময় রাজপুত্রের মত দেখতে মনোহর বেশে পট্টবস্ত্র পরিধান করে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত ও কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, মৃগমদমিশ্রিত চন্দন দ্বারা পরিলিপ্ত হয়ে কোন এক পুরুষ কয়েকজন লোকের সঙ্গে সেখানে এসে

নানারকম আলাপ আলোচনা ও কৌতুক করে তাদের সঙ্গে চলে গেল। তাকে দেখে রাজা মনে মনে তার পরিচয় বিচার করতে লাগলেন।

পরদিনও সেই ব্যক্তি একাকী বস্ত্রহীন অবস্থায় কৌপীনমাত্র পরিধান করে সেখানে এসে দেবালয়ের রঙ্গমণ্ডপে বসে পড়ল।

তাকে দেখে রাজা বললেন, সৌম্য, আগের দিন তুমি উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছিলে, আজ কেন এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এলে ?

লোকটি বলল, প্রভু, আগের দিন আমি সেইরূপই ছিলাম, আজ দৈবযোগে এই দশাপ্রাপ্ত হয়েছি। উক্ত আছে, যে ভ্রমরগণ প্রফুল্ল পদ্ম-পরাগে সুরভিতদেহ হয়ে করিগণের কপোলজ মদবারিপানে বর্ধিত হয়েছিল, এখন তারা দৈববশে নিম্ব ও আকন্দপুষ্পে বসে কোনরকমে কালযাপন করছে। যে মধুকর রসাল আম্র ও তালপুষ্পের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে কেলি করত, এখন সে দুর্ভাগ্যক্রমে আকন্দবনে ভ্রমণ করছে। যে কলহংসগণ আগে মন্দাকিনীর বিমল সলিলের আন্দোলনরঙ্গে মত্ত হয়ে স্বর্ণপদ্মের পিঙ্গলবর্ণ রেণুমধ্যে বর্ধিত হয়েছে, এখন তারা দৈববশে শৈবালদামপূর্ণ কঠিন জলমধ্যে প্রবেশ করছে।

আরও দেখুন, যে কলহংস আগে বায়ুদ্বারা আন্দোলিত পদ্মফুলের স্খলিত পরাগ দিয়ে পৃষ্ঠদেশে অঙ্গরাগ করত অলিগণের কলগুঞ্জন শুনে হৃষ্টচিত্ত হয়েছিল, নিজকান্তার চঞ্চুপুটপ্রান্তস্থিত মৃণালগ্রাস নিতেও অবসর পায়নি, সে আজ বিধিবিপাকে খাদ্যের জন্য কাষ্ঠের নিকট তৃণ প্রার্থনা করছে। কর্মফলে বাধ্য হয়ে জীবগণ কি কষ্টই না পেয়ে থাকে।

উক্ত আছে, কর্মফলের দ্বারা বাধ্য হয়ে ব্রহ্মান্ডমধ্যে ব্রহ্মা কুম্ভকারের মত নিয়মিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, যার বশে বিষ্ণু দশাবতাররূপ সঙ্কটকার্যে পড়ে আছেন, যার বশে রুদ্র পাণিপুটে নরকপাল ধারণ করে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন আর যার চালনায় সূর্যদেব গগনপথে নিত্য ভ্রমণ করছেন, সেই কর্মকে নমস্কার।

রাজা বললেন, তুমি কে ?

লোকটি বলল, আমি এক দ্যূতকার।

রাজা বললেন, দ্যূতক্রীড়া জান ত ?

লোকটি বলল, দ্যূতক্রীড়ায় আমি বিচক্ষণ। তাছাড়া শারীরক্রীড়া এবং চাতুর্যও জানি। কিন্তু সবই নিরর্থক, দৈবই বলবান। হস্তী, ভুজঙ্গ ও বিহঙ্গগণের বন্ধন, চন্দ্র সূর্যের রাহুগ্রাস এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দারিদ্র্য দর্শন করে আমি স্থির করেছি অদৃষ্টই প্রবল। আকৃতি, কুল, শীল, বিদ্যা ও যত্নকৃত চেষ্টা বা সেবা কিছুই সফল হয় না। কেবল পূর্বসঞ্চিত তপস্যা যথাকালে বৃক্ষের মত ফলবতী হয়ে থাকে।

রাজা বললেন, ভদ্র, তুমি অতিশয় বিজ্ঞ পুরুষ, তবে অতি পাপকর্ম দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছ কেন ?

লোকটি বলল, প্রাজ্ঞ হয়েও জীব কর্মদ্বারা প্রেরিত হয়ে কোন্ কার্য করে না থাকে ? ঠিক মানুষও স্বকৃত কর্মদ্বারা প্রেরিত হয়ে শত অকার্য কুকার্য করে থাকে। মানুষের বুদ্ধি কর্মের অনুসরণ করে চলে।

রাজা বললেন, ভদ্র, দ্যূতক্রীড়া হতে চোর ও বেশ্যা নারীতে আসক্তি জন্মে। মহাপাতকের সঙ্গ এতে যেমন হয়, অন্য কিছুতে তেমন হয় না। কোন্ নির্মল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানতে এই বিষম নরকপথে যেতে দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করবেন ? অকীর্তি ও দারিদ্র্যের দুঃখ তার কাছে কিছুই নয়। ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু এর কাছে তুচ্ছ। মৃত ব্যক্তির নরকের দুঃখই বা কি বিষম ! দ্যূতক্রীড়ার মোহে পড়ে মানুষ যে দুঃখে পড়ে, এ সব দুঃখ তার মনে স্থানই পায় না। তাই সংসারে দুষ্ট নষ্ট চরিত্রের সংসর্গে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পড়লে ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা করে। এইজন্যই মহাপাপস্বরূপ সপ্ত ব্যসন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। উক্ত আছে, দ্যূতক্রীড়া, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য ও পরনারীসেবা— এই সাতটিকে সপ্ত ব্যসন বলে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সপ্তবিধ পাপ পরিত্যাগ করবেন।

কথিত আছে, যে ব্যক্তি একটিমাত্র ব্যসনে আসক্ত তার ত কথাই নেই। সাত রকমের ব্যসনের এক একটি হতে কত মহাপুরুষের কত অনিষ্ট হয়েছে। দ্যূত হতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মাংস হতে বকরাক্ষস, মদ্য হতে যাদবগণ, বেশ্যা বা কাম হতে চৌর্য, মৃগয়া হতে রাজা পরীক্ষিৎ এবং

ও বিষণ্ণ দেখা যাচ্ছে। আমি আমার শরীর দান করে একে মুক্ত করব। কারণ এই শরীর শত বছরের পর অবশ্যই বিনাশ পাবে। অতএব নিজ দেহ ত্যাগ করে ধর্ম ও কীর্তি অর্জন করা শরীরধারীদের একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে, লক্ষ্মী চঞ্চলা, প্রাণ, যৌবন ও দেহ অস্থির, সংসারও অনিত্য, কেবল কীর্তি ও ধর্ম নিশ্চল হয়ে থাকে। অর্থসমূহ পদধূলির মত অকিঞ্চিৎকর, যৌবন গিরিনদীর প্রবাহের মত বেগশীল, মনুষ্যত্ব জলবিম্বের মত অতীব চঞ্চল, জীবন ফেনার মত বিলীয়মান। অতএব যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধিতে স্বর্গদ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটনকারী ধর্ম উপার্জন না করে, সে পরে জরাগ্রস্ত হয়ে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়।

এই বিচার করে রাজা সেই লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাজনগণ, এই ব্যক্তিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? দেখ, এর মুখ ম্লান হয়ে গেছে।

তারা বলল, দেবতার নিকট একে বলিদান করব।

রাজা বললেন, কেন?

তারা বলল, এই বলিতে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মনোরথ পূরণ করবেন।

রাজা বললেন, হে মহাজনবর্গ, এ ব্যক্তি ভীত, এর শরীর বড় ক্ষীণ, একে বলি দিয়ে দেবীর কি তৃপ্তি হবে? অতএব একে ছেড়ে দাও। এর বিনিময়ে আমিই বলির জন্য নিজদেহ দান করব। আমার দেহ হৃষ্টপুষ্ট, আমার মাংস দ্বারা দেবী তৃপ্ত হবেন।

এই বলে বলির জন্য আনীত লোকটিকে মুক্ত করিয়ে রাজা স্বয়ং দেববিগ্রহের সামনে গিয়ে গলদেশে খড়্গাঘাত করতে গেলেই দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মহাপুরুষ, তোমার ধৈর্য ও পরোপকারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বর গ্রহণ করো।

রাজা বললেন, দেবী, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আজ হতে নরবলিগ্রহণ পরিত্যাগ করুন।

দেবী তথাস্তু বলে তা স্বীকার করলেন।

তখন মহাজনগণ রাজাকে বলল, হে রাজন, আপনি নিজে সুখের

আশা ত্যাগ করে পরের জন্য কষ্ট করছেন। আপনার কাছে ওটাই হলো নিত্য সনাতন কর্তব্য। তরুগণ মস্তকে সুতীব্র তাপ সহ্য করেও আশ্রিত ব্যক্তিকে ছায়াদান করে তাকে তাপ থেকে রক্ষা করে। মহৎ লোকের এটাই হলো স্বভাব।

তারপর রাজা নিজ নগরে চলে গেলেন।

পুত্তলিকা এবার ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন ঔদার্য ও পরোপকার গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর এক পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের আর এক ঔদার্যগুণবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগল।

একদিন বিক্রমাদিত্য সভায় বসে আছেন, রাজকুমারগণ তাঁকে ঘিরে আছেন, এমন সময় কোন এক স্তুতিপাঠক এসে বললেন, হে রাজন, যতদিন পর্যন্ত পবিত্রসলিলা সুরনদী জাহ্নবী তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হবেন, যে পর্যন্ত আকাশপথে লোকপাল সূর্যদেব ভুবনমধ্যে আলোক বিতরণ করবেন, যতদিন মেরুশৃঙ্গে হীরক, ইন্দ্রনীলমণি ও স্ফটিকশিলা-সমূহ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আপনি পুত্র পৌত্র ও স্বজন-সমূহে পরিবৃত হয়ে রাজ্য উপভোগ করুন।

এইভাবে আশীর্বাদ করে স্তুতিপাঠক বলল, হে রাজন, মেঘোদয় হলে তৃষ্ণার্ত ময়ূরগণ তৃষিত হয়ে যেমন জল প্রার্থনা করে, দারিদ্র্যপীড়িত আমিও আপনার দর্শন পেয়ে তেমনি যাচ্ঞা করছি। আমি দূরদেশবাসী, আপনার কীর্তিকলাপ শ্রবণ করে বহুদূর হতে এসেছি। আপনার কীর্তি সপ্তসমুদ্রপরিবেষ্টিত মেদিনীমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে শোভা পাচ্ছে। আপনার কীর্তি কর্পূর, কুন্দ, মন্দাকিনীকল্লোল, রাজহংস এবং কলঙ্কবিরহিত চন্দ্রমণ্ডল হতেও শুভ্র। আপনার এই শুভ্রতম কীর্তির দ্বারাই পৃথিবী ধবলিত হয়েছে। আপনি যাচকগণের কল্পতরু--একথা জেনেই দারিদ্র্য-রূপ ব্যাধি হতে মুক্ত হবার জন্য আপনার নিকট এসেছি। আপনাকে দর্শন করে আজ আমার ধনেশ্বর নামে এক রাজার কথা মনে পড়ল।

উত্তরাঞ্চলে জম্বীর নামক নগরে ঐ ধনেশ্বর রাজা বাস করতেন। তিনি প্রার্থীদের দুঃখদারিদ্র্য নিবারণের জন্য প্রচুর ধনদান করতেন। একবার মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে ধনেশ্বর বসন্তপুজো করলে তাতে বহু বিদেশী যাচকের সমাগম হয়। রাজা তখন দানের জন্য অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণের ব্যবস্থা করলেন। উদারতার আদর্শ সেই রাজার মত দাতা একমাত্র আপনাকেই দেখা যাচ্ছে এদেশে।

তা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, এই স্তুতিপাঠককে ভাণ্ডারগৃহে নিয়ে গিয়ে যত মহামূল্য রত্ন আছে দেখাবে। তারপর ইনি যত রত্ন নেবেন তা সব দেবে।

একথা শুনে ভাণ্ডারী সেই স্তুতিপাঠককে ভাণ্ডারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বহু রত্ন দেখাল। স্তুতিপাঠক ইচ্ছামত বহু মূল্যবান রত্ন নিয়ে রাজার কাছে ফিরে এসে বলল, রাজন, আপনি ঈশ্বর, আপনার প্রসাদে আজ আমি ধনপতি হলাম। এখন দেখছি, অখিল ভুবনমধ্যে চরিত্রগুণে আপনি সকলকে অতিক্রম করেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও আপনার সাদৃশ্যলাভের উপযুক্ত নন। কারণ ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়নেই নিবিষ্টচিত্ত, বিষ্ণু গদা ধারণ করে শত্রুসংহারেই ব্যস্ত, শূলধারী মহেশ্বরও বিষভক্ষণ করে কালযাপন করছেন। সুতরাং কোন্ দেবতা আপনার উপমাস্থল হতে পারেন ?

এই বলে স্তুতিপাঠক 'ব্রহ্মার মত আয়ুষ্মান হও' বলে রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

এই কাহিনী শেষ করে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি এমন উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হয়ে রইলেন।

ত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ যখন আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন তখন একটি পুত্তলিকা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী বলল।

একদিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন এমন সময় কোন এক

ঐন্দ্রজালিক এসে 'ব্রহ্মার আয়ুষ্লাভ করুন' বলে রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, দেব, আপনি সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী। অনেক ঐন্দ্রজালিক আপনার কাছে এসে বুদ্ধির কৌশল দেখিয়ে থাকে, অতএব আজ আমার একটি বুদ্ধিকৌশল প্রসন্নচিত্তে অবলোকন করুন।

রাজা বললেন, এখন ত অবসর নেই, আমাদের স্নান ভোজনের সময় হয়েছে, কাল সকালে দেখব।

পরদিন সকালে রাজা রাজসভায় এসে বসতেই মহাশমশ্রুধারী বিরাটকায় এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ স্কন্ধদেশে এক উজ্জ্বল খড়্গ স্থাপন করে এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে এসে রাজাকে প্রণাম করল।

তখন রাজসভায় উপস্থিত রাজপুরুষগণ সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করল, হে নায়ক, তুমি কোথা হতে এসেছ?

সে বলল, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সেবক ছিলাম। একসময় দেবরাজ আমাকে শাপ দিয়েছিলেন বলে আমি এখন মর্ত্যলোকে বাস করছি। ইনি আমার স্ত্রী। আজই দেব ও দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে, সেই কারণে সেখানে আমাকে যেতে হবে। এই রাজা বিক্রমাদিত্য পরনারীর সহোদরের মত, এই বিবেচনা করে এঁর কাছে আমার স্ত্রীকে গচ্ছিত রেখে দেবদানবের যুদ্ধে যোগদানের জন্য স্বর্গে যাব স্থির করেছি।

তা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার কাছে তার স্ত্রীকে রেখে রাজাকে জানিয়ে তার সেই খড়্গের উপর ভর করে আকাশে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ আসতে লাগল।

রাজসভার সকলেই উপর দিকে মুখ তুলে কৌতূহলসহকারে দেখতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে রক্তমাখা একখানি খড়্গ আর একখানি হাত এসে পড়ল।

তা দেখে উপস্থিত সকলে বলল, আহা, এই স্ত্রীলোকটির বীর স্বামীকে প্রতিপক্ষ হত্যা করেছে। তারই একটি হাত আর খড়্গটি পড়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ছিন্নমুণ্ড ও কবন্ধ বা মুণ্ডহীন দেহ পতিত হলো।

এই সব দেখে সেই স্ত্রীলোকটি রাজাকে বলল, দেব, নিশ্চয়ই আমার স্বামী রণস্থলে শত্রুদের দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই তার মুণ্ড, হাত, কবন্ধ ও খড়্গ পড়ে গেছে। যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য দিব্যাঙ্গনারা আমার সেই প্রিয় স্বামীকে বরণ করার জন্য হরণ করেছেন। আমার এই শরীর তাঁর জন্যই রেখেছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী যখন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তখন এ শরীর আর কার জন্য রাখব? পতি যে পথে যান, পতিব্রতা রমণীগণও সেই পথে গিয়ে থাকেন, একথা মূর্খরাও জানে। দেখুন, চন্দ্র অস্ত গেলে জ্যোৎস্নাও অস্ত যায়। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুৎও বিলীন হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে যে নারী অগ্নিতে আরোহণ করে, স্বর্গলোকে সে অরুন্ধতীর মত পূজিতা হয়। পতির মৃত্যু হলে পত্নী যে পর্যন্ত নিজেকে অগ্নিতে দগ্ধ না করে, স্বর্গলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নরক হতে কোনরূপেই মুক্তিলাভ করতে পারে না। যে নারী মৃত স্বামীর অনুগমন করে সে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিনকুল উদ্ধার করে থাকে। মানুষের গায়ে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে। যে স্ত্রী মৃত স্বামীর অনুগমন করে, সে সেই সংখ্যক বছর স্বর্গলোকে বাস করে থাকে। সাপুড়েরা যেমন বলপূর্বক সাপকে গর্ত হতে বার করে, অনুসৃতা সাধ্বী স্ত্রীও তেমনি পতিকে নরক হতে উদ্ধার করে স্বর্গে গমন করে আনন্দে বিহার করে। পতি দুর্বৃত্তই হোক আর সচ্চরিত্রই হোক, কিম্বা পাপকার্যেই নিরত থাকুক, ধর্মপরায়ণা সে স্ত্রী পতিকে উদ্ধার করে নেয়। পতিহীনা নারীর জীবন নিষ্ফল। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র সকলেই নারীকে পরিমিত দান করেন, কিন্তু একমাত্র পতিই তাকে অপরিমিত দান করেন। তবে কেন স্ত্রী তার পতির পূজা না করবে? নারী বহুতর পুত্র ও শত শত বন্ধুজনে পরিবৃতা হলেও পতিহীনা হলে সে শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হয়। বিধবা নারী গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ধূপ, বিবিধ ভূষণ, শয্যা ও বসন সমূহ নিয়ে কি করবে? যেমন তন্ত্রী বিনা বীণা বাজে না, চক্রের অভাবে রথ চলে না, তেমনি পতিহীনা নারী বন্ধুজনে পরিবৃতা হলেও-স্বস্তি পায় না।

স্বামী দরিদ্রই হোক, বাসনাসক্তই হোক, বৃদ্ধই হোক বা ব্যাধিগ্রস্তই হোক, বিকলাঙ্গ হোক বা পতিতই হোক, অথবা কৃপণই হোক, স্বামীই স্ত্রীদের পরমগতি। নারীদের পতির সমান বন্ধু নেই, পতির সমান গতি নেই। বৈধব্য তুল্য দুঃখজনক আর কিছুই নেই। যে নারী স্বামীর সামনে মৃত্যুবরণ করতে পারে তার তুল্য ধন্যা ও পুণ্যশীলা আর কে আছে?

এই বলে সেই নারী অগ্নিপ্রবেশের জন্য রাজার চরণে পতিত হলো। সেই স্ত্রীলোকের কথা শুনে করুণা জাগল রাজার মনে। তিনি তখন চন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা চিতা নির্মাণ করিয়ে তাকে চিতায় আরোহণের অনুমতি দান করলেন। সেই নারী এবার রাজার অনুমতি পেয়ে স্বামীর দেহের সঙ্গে চিতাগ্নিতে প্রবেশ করল।

ক্রমে সূর্যদেব অস্তমিত হলেন।

পরদিন সকালে রাজা সামন্তবর্গের সঙ্গে রাজসভায় উপবেশন করলে সেই দীর্ঘকায় বীরপুরুষ কাঁধে খড়্গ নিয়ে উজ্জ্বল দেহে এসে রাজার কণ্ঠদেশে কল্পতরুর কমলমালা পরিয়ে দিল। মধুলুব্ধ অনেক মধুকর বসেছিল সে মালার উপরে। এরপর নানা যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগল। তাকে অক্ষত দেহ ও জীবিত অবস্থায় দেখে সভার সকলে বিস্মিত হলো।

সেই বীরপুরুষ বলল, রাজন, আমি এই স্থান হতে স্বর্গগমন করলে দৈত্যগণের সঙ্গে দেবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাতে অনেক দৈত্য ধ্বংস হয় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবরাজ আমাকে বললেন, হে নায়ক, আজ হতে তোমায় আর মর্ত্যলোকে যেতে হবে না। তোমার শাপের অবসান হয়েছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি।

এই বলে রত্নখচিত মুক্তাবলয় নিজ বাহু হতে খুলে আমাকে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, এখানে আসার সময় আমি আমার ভার্যাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে রেখে এসেছি। আমি তাকে শীঘ্রই নিয়ে আসছি এখানে। ইন্দ্রের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। হে রাজন,

আপনি পরনারীর সহোদরতুল্য, আপনি আমার ভার্যাকে ফিরিয়ে দিন। তাকে নিয়ে আবার আমি স্বর্গে ফিরে যাব।

এই কথা শুনে রাজা সভার সকলের সঙ্গে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রইলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

সেই পুরুষ রাজাকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল, কি মহারাজ, চুপ করে আছেন কেন?

সভার পরিষদগণ বলল, তোমার ভার্যা চিতানলে প্রবেশ করেছে।

পুরুষ বলল, কি জন্য?

তখন কেউ তার উত্তর দিতে পারলেন না। সেই পুরুষ বলল, হে রাজশিরোমণি, হে পরনারীসহোদর, হে লোককল্পদ্রুম মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আপনি ব্রহ্মার আয়ু লাভ করুন। আমি একজন মহান ঐন্দ্রজালিক। আপনার সামনে এই ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করলাম।

রাজা তা শুনে বিস্মিত ও তার প্রতি প্রসন্ন হলেন।

এই সময় রাজার কোষাধ্যক্ষ এসে নিবেদন করল, মহারাজ, পাণ্ড্যদেশের রাজা প্রভুর নিকট কর পাঠিয়েছেন।

রাজা বললেন, কি কি পাঠিয়েছেন?

কোষাধ্যক্ষ বলল, আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা, তিরানব্বই কোটি মুক্তার হার, পঞ্চাশটি হস্তী, তিনশত অশ্ব ও তিনচারিশত বারাঙ্গনা পাঠিয়েছেন।

রাজা বললেন, সেই সমস্তই এই ঐন্দ্রজালিককে দান করো।

এই কাহিনী শেষ করে পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলল, রাজন, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ থাকে ত এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ নীরবে মুখ নত করে রইলেন।

একত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে গেলে পুত্তলিকা বলল, বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্যগুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এ সিংহাসনে বসার

উপযুক্ত।

তখন রাজার অনুরোধে বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ বর্ণনা করতে লাগল পুত্তলিকা।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন শ্মশানে হোম করব। আপনি পরোপকারী ও মহাবলবান পুরুষ। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। সেই শ্মশানের কিছুদূরে একটি শমীবৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে এক বেতাল বাস করে। আপনি মৌনী হয়ে তাকে আনবেন।

রাজা 'তাই করব' বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

তারপর সন্ন্যাসী কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন হোমের ঘৃতাগ্নি সংগ্রহ করে শ্মশানে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে রাজা সেই শমীবৃক্ষস্থিত বেতালকে স্কন্ধে বহন করে পথে যখন আসছিলেন তখন বেতাল বলল, রাজন, শ্রম দূর করার জন্য কোন গল্প বলুন। রাজা মৌনভঙ্গ হবার ভয়ে চুপ করে রইলেন।

বেতাল বলল, আপনি মৌনভঙ্গভয়ে চুপ করে রইলেন। কথা বললেন না, তবে আমিই প্রথমে কথা বলব। আমার কথা শেষ হলে আপনি যদি কথা বলেন তাহলে আপনার মস্তক সহস্র প্রকারে বিদীর্ণ হবে।

এই বলে গল্প বলতে আরম্ভ করল বেতাল।

হিমাচলের দক্ষিণ পাশে বিন্ধ্যবতী নামে এক নগরী আছে। সেখানে সুবিচারক নামে এক রাজা বাস করেন। তাঁর পুত্র ময়সেন একদিন মৃগয়ার জন্য বনে যায়। সে বনে এক হরিণ দেখতে পেয়ে তাকে বিদ্ধ করার জন্য তার অনুসরণ করতে করতে আরও গভীরে চলে যায়। নগরের পথ দিয়ে একাকী আসতে আসতে পথে নদী দেখতে পেল। সেই নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করছিলেন।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল, আমি যতক্ষণ জলপান করব, আপনি আমার এই অশ্বটিকে ধারণ করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি কি তোমার ভৃত্য যে অশ্ব ধারণ করব?

এতে রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বরজ্জু দিয়ে ব্রাহ্মণকে আঘাত করল। ব্রাহ্মণ তখন কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন।

রাজা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে পুত্রকে নির্বাসনদণ্ড দান করলেন। সেই সময় মন্ত্রী রাজাকে বললেন, মহারাজ, কুমারকে রাজ্যলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করুন, কিন্তু স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করা উচিত নয়।

রাজা বললেন, যেহেতু এই ব্রাহ্মণের দেহে ও কশাঘাত করেছে, সেই হেতু এই দণ্ডই উপযুক্ত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো ব্রাহ্মণের প্রতি কোন দ্বেষ করেন না।

উক্ত আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষভক্ষণ, সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া, যোগীদের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করেন। মন্ত্রীবর, তুমি কি পুরাণ, ইতিহাসের কথা শোননি? পূর্বে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত, নৃগরাজের কৃকলাস শরীর, ইন্দ্রের দারিদ্র্য, নহুষের অজগরযোনিপ্রাপ্তি হয়েছিল। কোন ব্যক্তি সম্পদলাভ ও উচ্চপদ পেয়েও মাননীয়গণের অবমাননা করবেন না। নহুষ ইন্দ্রত্ব পেয়েও অগস্ত্যের অবমাননা করার জন্য স্বর্গরাজ্য হারান। অতএব ব্রাহ্মণজাতি সকল সময়ই সম্মানীয়।

আরও দেখ, যাঁরা অগ্নিকে সর্বভক্ষ্য, মহাসমুদ্রকে অপেয় ও চন্দ্রকে ক্ষয়রোগাক্রান্ত করেছেন তাঁদের কুপিত করলে কোন ব্যক্তির সর্বনাশ না হয়? দেবতাগণ, পিতৃগণ যাদের হস্তে হব্য দ্রব্য ভোজন করেন তাঁদের অপেক্ষা উত্তম আর কে থাকতে পারে? সমস্ত দেবতা ও মানুষ যাঁদের পূজা করেন, যাঁরা ঘোর তপস্যানিয়মে পীড়িত, সেই সব বিপ্রকে সর্বদা সম্মান করা উচিত। দ্বারকায় স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছেন, ব্রাহ্মণ শত গালা-গালি দিলেও শত শত কটুবাক্য বললেও যে ব্যক্তি আমার মত ব্রাহ্মণের অর্চনা করে না, সেই পাপিষ্ঠ ব্রহ্মদাবাগ্নিতে পুড়ে মরে। আমাদের রক্ষাকর্তা পুরুষগণ দ্বারা সে দণ্ডনীয় ও বধ্য। যে ব্যক্তি পরমা ভক্তি দ্বারা আমার আরাধনা করতে ইচ্ছা করে সে ব্যক্তি সর্বদা ব্রাহ্মণের সম্মান করবে এবং তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।

হে মন্ত্রী, আমার পুত্র যে হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে তাড়না করেছে সে

হাত ছেদন করা কর্তব্য।

এই বলে রাজা যখন পুত্রের হস্ত ছেদন করতে উদ্যত হলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ সেখানে এসে বললেন, রাজন, কুমার তখন অজ্ঞানবশে এই কাজ করেছেন, আজ হতে আর কখনো এমন অনুচিত কাজ করবেন না। আমার অনুরোধ, আপনি রাজপুত্রকে ক্ষমা করুন। আমি প্রসন্ন হয়েছি।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা পুত্রকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণও নিজগৃহে গমন করলেন।

এই কাহিনী শেষ করে বেতাল রাজাকে বলল, বলুন দেখি রাজন, এই দুজনের মধ্যে বেশী গুণবান কে?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজাই বেশী গুণবান।

তা শুনে রাজার মৌনভঙ্গ হওয়ায় বেতাল আবার শমীবৃক্ষে গিয়ে আরোহণ করল। রাজাও আবার সেখানে গিয়ে বেতালকে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। বেতাল আবার গল্প বলতে আরম্ভ করল। এইভাবে বেতাল পঞ্চবিংশতিটি গল্প বলেছিল।

রাজার সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বেতাল প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বলল, রাজন, এই সন্ন্যাসী আপনাকে নিহত করার চেষ্টা করছে।

রাজা বললেন, কিভাবে?

বেতাল বলল, আপনি যখন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন তখনি আপনার মৃত্যু হবে। অতএব এক উপায় বার করতে হবে। আপনি শ্মশানে গেলে সন্ন্যাসী বলবে, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, এখন অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু আপনি প্রণাম করার জন্য মাথা নত করলেই সন্ন্যাসী খড়্গ দ্বারা আপনাকে নিহত করবে। তারপর আপনার মাংসদ্বারা হোম করবে। এই সব করলে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে সে।

রাজা বললেন, তাহলে উপায়?

বেতাল বলল, সন্ন্যাসী যখন আপনাকে প্রণাম করতে বলবে আপনি তখন বলবেন, আমি সার্বভৌম রাজা, সকলেই আমাকে প্রণাম করে

থাকে। আমি কখনো কাউকে এভাবে প্রণাম করিনি। তাই আমি প্রণাম কি করে করতে হয় তা জানি না। সুতরাং আপনি আগে প্রণাম করে আমায় দেখিয়ে দিন। তারপর আমি প্রণাম করব।

এরপর সন্ন্যাসী যখন প্রণাম করে আপনাকে দেখাতে যাবে তখন আপনি খড়্গদ্বারা তার শিরশ্ছেদ করবেন। আমি তাতে কোন বাধা দেব না। তখন আপনারই অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে।

বেতালের কথামত রাজা বিক্রমাদিত্য এ কাজ করলে তাঁর অষ্টসিদ্ধি লাভ হলো।

বেতাল এবার রাজাকে বলল, আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই বর দাও যে, যখনই আমি তোমাকে স্মরণ করব তখনই আমার কাছে আসবে।

বেতাল বলল, তাই হবে। এই বলে চলে গেল সে। রাজাও ফিরে গেলেন তাঁর নগরে।

এই সব বলে পুত্তলিকা আবার সিংহাসনে বসতে গেলে ভোজরাজকে বলল, রাজন, যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের মত ঔদার্যগুণ থাকে তবেই এ সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ মৌনী হলেন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে বসতে যাবেন এমন সময় অন্য এক পুত্তলিকা বলল, রাজন, সেই বিক্রমাদিত্যই এ সিংহাসনে বসার যোগ্য, অন্য কেউ নন। বিক্রমের মত রাজা ভূমণ্ডলে আর কেউ নেই। তিনি কাষ্ঠনির্মিত একখানি খড়্গ নিয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে সব রাজাদের পরাজিত করে একচ্ছত্র রাজত্ব করেছিলেন।

তিনি অন্যের বিপদ দূর করে নিজের মাথায় সমস্ত বিপদ নিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বশীভূত করে রাজ্যের সমস্ত দুর্জনদের নির্বাসিত করে যাচকদের দারিদ্র্যমোচন ও দুর্ভিক্ষদুঃখ দূর

করে পৃথিবী পালন করেছিলেন। অতএব বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য-গুণ যদি আপনার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

তা শুনে মৌন হয়ে রইলেন ভোজরাজ।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সমস্বরে ভোজরাজকে বলল, রাজন, বিক্রমাদিত্য অসাধারণ ধৈর্য ও ঔদার্যগুণে ভূষিত ছিলেন, তাই বলে আপনিও সামান্য নন। আপনারা দুজনেই নরনারায়ণের অবতার। আপনার তুল্য পরম পবিত্র চরিত্র, সকল কলাবিদ্যায় নিপুণ ও ঔদার্যগুণবিশিষ্ট রাজা বর্তমানে ভূমণ্ডলে আর নেই। আপনার প্রসাদে আমাদের এই বত্রিশ পুত্তলিকার পাপক্ষয় হলো এবং শাপ হতে মুক্তিলাভ করতে পারলাম।

ভোজরাজ বললেন, কিরকম শাপ?

পুত্তলিকা বলল, রাজন, শুনুন, আমরা বত্রিশটি সুরাঙ্গনা পূর্বে পার্বতীর সখী ছিলাম। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমাদের নাম হলো, মিশ্রকেশী, প্রভাবতী, সুপ্রভা, ইন্দ্রসেনা, সুদতী, অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকর্ণিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা, হরিমধ্যা, মদনসুন্দরী, বিলাসরসিকা, শৃঙ্গারকর্ণিকা, মন্মথসঞ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী, চিত্ররেখা, সুরতগহ্বরা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশীকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, কামরসিকা ও উন্মাদিনী।

একসময় পরমেশ্বর শঙ্কর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রেম ও বিলাস-সহকারে আমাদের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। তা দেখে দেবী পার্বতী কুপিতা হয়ে আমাদের অভিশাপ দিলেন, তোমরা নির্জীব পুত্তলিকা হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে সংলগ্ন থাকবে।

আমরা তখন দেবীকে প্রণাম করে শাপের অবসান প্রার্থনা করলাম।

তখন দেবী বললেন, সেই সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্য অধিষ্ঠান করার পর তা যখন ভোজরাজের হস্তগত হবে তখন ভোজরাজের সঙ্গে তোমাদের কথোপকথন হবে। যখন ভোজরাজ তোমাদের মুখ থেকে বিক্রমাদিত্যের গুণ ও চরিত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ করবেন তখনই তোমাদের শাপের অবসান হবে।

এই বলে সেই সিংহাসনসংলগ্ন বত্রিশ পুত্তলিকা ভোজরাজের নিকট অনুমতি নিয়ে দিব্য দেহ ধারণ করে স্বর্গে গমন করল।

তারপর ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে নির্মিত পদ্মের অষ্টদলে উমা-মহেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা করতে লাগলেন। ধর্মনিরত শিষ্ট লোকদের প্রতি-পালন করে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন তিনি। তার পূজা ও স্তবাদি দ্বারা গৌরী দেবী অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার উপর।

মালবিকাগ্নিমিত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা

যিনি ঐশ্বর্যে স্থিত থাকলেও প্রণত ব্যক্তিদের বহু ফল দান করেন, যিনি চর্মকে বসন হিসাবে পরিধান করেন, যাঁর দেহ কান্তাসংযুক্ত হলেও বিষয়বিমুখ ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি অষ্টমূর্তিতে নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেও অহঙ্কারশূন্য, সেই ঈশ্বর তোমাদের মনের তামসিক বৃত্তি-গুলিকে দূর করুন যাতে তোমরা সত্যের পথ দেখতে পাও।

নান্দীশেষে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। (নেপথ্যে ঘরের দিকে তাকিয়ে) মারিষ, এদিকে এস।

মারিষের প্রবেশ

পারিপার্শ্বিক। ভাস, এই যে এসেছি।

সূত্রধার। বিদ্বৎপরিষদ আমাকে বলেছেন আজকের বসন্তোৎসবে কালিদাসের রচনা 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের অনুষ্ঠান করতে হবে। সুতরাং সঙ্গীত শুরু হোক।

পারিপার্শ্বিক। না না, ভাস, কবিপুত্র সৌমিল্ল— এতসব খ্যাতনামা কবিদের রচনাকে বাদ দিয়ে সেদিনের কবি কালিদাসের রচনায় পরিষদের এত আগ্রহ হলো কেন?

সূত্রধার। এ যে বিচারবুদ্ধিহীনের মত কথা বলছ। দেখ, পুরনো হয়েছে বলেই সে সব কাব্য উৎকৃষ্ট তা নয়, আবার নতুন বলেই সে কবির রচনা নিকৃষ্ট হয় না। সজ্জনেরা পরীক্ষা করেই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেন। যাদের বুদ্ধি নেই তারাই পরের কথা শুনে চলেন।

পারিপার্শ্বিক। আপনার মতই চূড়ান্ত প্রমাণ।

সূত্রধার। তাহলে তাড়াতাড়ি চল। পরিষদের যে আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করেছি, তা পালন করতে চাইছি। যেমন রাণীমা ধারিণীর সেবায় পটু এই পরিজনটি করে চলেছে। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা সমাপ্ত

চেটীর প্রবেশ

চেটী। রাণীমা ধারিণী আদেশ করেছেন, আচার্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, ছলিতনৃত্যের যে পাঠ সদ্য আরম্ভ হয়েছে তাতে মালবিকা কেমন করছে।

অলঙ্কার হাতে দ্বিতীয় চেটীর প্রবেশ

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখে) সই কৌমুদিকা, বলি এত কি গভীর ব্যাপারে মত্ত হয়ে আছিস যে পাশ কাটিয়ে গেলেও আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না ?

দ্বিতীয়া। ওঃ, বকুলাবলিকা যে। সই এই দেখ, রাণীমার স্বর্ণকারের কাছ থেকে সাপের শীলমোহর করা এই আংটির কথা একমনে ভাবতে ভাবতে তোর গাল খেলাম।

বকুলাবলিকা। ঠিক জায়গাতেই তোর চোখ পড়েছে। আংটিটা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, যেন ফুলের কেশর। মনে হচ্ছে যেন তোর হাতের পাতায় একটা ফুল ফুটে আছে।

কৌমুদিকা। সই, কোথায় যাচ্ছিস ?

বকুলাবলিকা। রাণীমার কথামত মালবিকা কেমন পাঠ নিচ্ছে তা আচার্য গণদাসের কাছে জানতে যাচ্ছি।

কৌমুদিকা। সই, এত সব আয়োজন করে তাকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও শুনছি নাকি রাজামশাই তাকে দেখে ফেলেছেন।

বকুলাবলিকা। ছবিতে রাণীমার পাশে আঁকা তাকে দেখেছেন।

কৌমুদিকা। কি করে ?

বকুলাবলিকা। রাণীমা ছবিঘরে গিয়ে সদ্য আঁকা ছবিগুলো দেখছিলেন। এমন সময় রাজামশাই এসে হাজির হন।

কৌমুদিকা। তারপর ?

বকুলাবলিকা। তারপর যথাযোগ্য সমাদর জানানোর পর রাণীমার সঙ্গে এক আসনে বসে ছবিতে রাণীমার পাশে আঁকা মালবিকাকে দেখে রাজামশাই বললেন—

কৌমুদিকা। কি বললেন ?

বকুলাবলিকা। বললেন, মেয়েটি ত চমৎকার দেখতে, রাণীমার পাশেই আঁকা দেখছি। এর নাম কি ?

কৌমুদিকা। সুন্দর রূপেরই আদর হয়। তারপর ?

বকুলাবলিকা। কিন্তু তাঁর কথায় কান দিচ্ছেন না দেখে মনে মনে সন্দেহ নিয়ে রাজা রাণীমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। রাণীমা তবু কথা বলছেন না দেখে কুমারী বসুলক্ষ্মী বলে দিলেন, দাদাভাই, এ হলো মালবিকা।

কৌমুদিকা। (মৃদু হেসে) ছেলেমানুষের মত কাজ। তারপর কি হলো ?

বকুলাবলিকা। এখন মালবিকাকে রাজামশাই-এর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

কৌমুদিকা। সই, যা নিজের কাজ কর। আমিও আংটিটা রাণীমার কাছে নিয়ে যাই। (প্রস্থান)

বকুলাবলিকা। (চারদিক ঘুরে দেখে) এই যে নাট্যাচার্য গণদাস নাচগানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই ওঁর সামনে গিয়ে দেখা দিই।

গণদাসের প্রবেশ

গণদাস। সকলের কাছেই কুলবিদ্যা বড় আদরের বস্তু—একথা ঠিক। আমাদের নাট্যবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তা আমাদের

কাছে গৌরবের বস্তু। যেহেতু মুনিঋষিরা বলেন, এ হলো দেবতাদের চোখে দেখার মত এক শান্তি যজ্ঞ। মহাদেব নিজ শরীরের মধ্যে পার্বতীর দেহ ধারণ করে দুটি বিভাগ স্পষ্ট করে দেন। এতে বিভিন্ন গুণ থেকে যে লৌকিক ক্রিয়াকলাপ জন্ম নেয় তাকে নানা রসে পুষ্ট দেখা যায়। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তবু নৃত্যাভিনয় নানাভাবে সকলকেই অনন্য আনন্দ দান করে।

বকুলাবলিকা। (কাছে গিয়ে) আর্য, প্রণাম হই।

গণদাস। ভদ্রে, বেঁচে থাক।

বকুলাবলিকা। আর্য, রাণীমা জিজ্ঞাসা করেছেন, পাঠ নিতে গিয়ে মালবিকা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে না ত?

গণদাস। ভদ্রে, রাণীকে জানাবে, মালবিকা শুধু মেধাবিনী নয়, এ বিদ্যায় অতি নিপুণও বটে। অভিনয়ের বিষয়ে আমি তাকে যে যে ভঙ্গী শেখাই, সেগুলিকে সে আরো সুন্দর করে প্রকাশ করে সে যেন আমাকেই ফিরিয়ে শেখায়।

বকুলাবলিকা। (স্বগত) মালবিকা ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে গেছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) গুরু যাকে প্রশংসা করছেন, আপনার সেই শিষ্যা ধন্য।

গণদাস। বৎস, এমন মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, রাণী তাকে কোথা থেকে এনেছেন?

বকুলাবলিকা। রাণীমার এক ছোটজাতের ভাই আছে, তার নাম বীরসেন। রাজামশাই তাকে নর্মদা নদীর তীরে সীমানার দুর্গ দেখা-শোনার ভার দিয়েছেন। এই বীরসেন শিল্পকলায় পটু দেখে এই মেয়েটিকে তার দিদির কাছে উপহার পাঠিয়েছে।

গণদাস। (স্বগত) চেহারার জৌলুস দেখেই তার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মেছে, আমার ধারণা ও কখনই সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। (প্রকাশ্যে) তার জন্য আমারও নিশ্চয়ই খুব নাম হবে। কারণ গুরুর শেখানো শিল্পকলা যোগ্যপাত্রে পড়লে তা আরো বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন মেঘ থেকে সমুদ্রের শুক্তিতে জল পড়ে তা মুক্তো হয়ে ওঠে।

বকুলাবলিকা। আচ্ছা, আপনার শিষ্যা কোথায় ?

গণদাস। এইমাত্র তাকে পঞ্চাঙ্গ নৃত্য শিখিয়ে আমি তাকে বিশ্রাম নিতে বলায় সে দীঘির দিকের জানালায় বসে মুক্ত হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

বকুলাবলিকা। তবে অনুমতি দিন গুরুজী, গুরুদেবের সন্তোষের কথা জানিয়ে তার উৎসাহ বাড়িয়ে দিই।

গণদাস। সইকে দেখে এস। আমিও সময় পেয়েছি, ঘরে যাই। (দুজনের প্রস্থান)

রাজার প্রবেশ ও উপবেশন। পরিজন দূরে দাঁড়িয়ে। রাজার পাশে উপবিষ্ট মন্ত্রীর হাতে একখানি চিঠি।

রাজা। (মন্ত্রীর চিঠি পড়া শেষ হলে তার দিকে তাকিয়ে) বাহতক, বিদর্ভের রাজা কি করতে চায় ?

মন্ত্রী। মহারাজ, উনি নিজেদের ধ্বংস চান।

রাজা। এখন কি খবর পাঠিয়েছে শুনি ?

মন্ত্রী। এখন সে আমাদের চিঠির উত্তরে লিখেছে, মহামান্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, আপনার খুড়তুতো ভাই মাধবসেন বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসার সময় আপনারই সীমান্তরক্ষীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে বন্দী আছে। আমার সম্মানরক্ষার্থে আপনি তাকে স্ত্রী ও ভগিনীসহ মুক্তি দিন।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন সকল রাজাই তাদের অধীনস্থ ভূস্বামী বা সামন্ত রাজাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, মহামান্য আপনি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকুন—এটাই বাঞ্ছিত। ওঁর ভগিনী আবার বন্দী করার সময় গোলমালের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাকে খুঁজে বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদি মহামান্য আপনি চান আমি সত্যিই মাধবসেনকে মুক্তি দিই তাহলে চুক্তি শুনুন, যদি মহামান্য আপনি আমার শ্যালক মৌর্যসচিবকে মুক্তিদান করেন তাহলে আমিও এই মুহূর্তে মাধবসেনকে মুক্তি দেব।

রাজা। (সরোষে) কী—মূর্খটা আমার সঙ্গে কাজের বদলে কাজ

করতে চাইছে? বাহতক, বিদর্ভের রাজা স্বভাবতই আমার শত্রু এবং সব সময় আমার অনিষ্ট করে। সুতরাং ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য বীরসেনের নেতৃত্বে সৈন্য-বাহিনী সাজাতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজের যেমন আদেশ।

রাজা। অথবা তোমার মত কি?

মন্ত্রী। দণ্ডনীতির শাস্ত্র মেনেই আপনি একথা বলেছেন। কারণ যে শত্রু অল্পদিন রাজপদ লাভ করেছে, সে প্রজাদের মধ্যে বেশী মূল বিস্তার করতে পারেনি। অতএব তাকে সদ্য রোপিত গাছের মতই সহজে উৎপাটিত করে ফেলা যায়।

রাজা। অমাত্যবর ঠিক কথাই বলেছেন।

মন্ত্রী। ঠিক আছে। (প্রস্থান)

পরিক্রমারত বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। রাজামশাই হুকুম দিয়েছেন, গৌতম, এমন একটা উপায় বার করো যাতে ছবিতে দেখা মালবিকাকে সত্যি চোখে দেখতে পাই। আমিও সেই মত কাজ করেছি। যাই, ওঁকে জানাই।

রাজা। এই যে অন্য কাজের মন্ত্রীও আমার কাছে এসে গেছে।

বিদূষক। (কাছে গিয়ে) আপনার বৃদ্ধি হোক।

রাজা। (মাথা নেড়ে) এখানে বস। (বিদূষক বসল) তোমার জ্ঞানদৃষ্টি লক্ষ্যবস্তুলাভের উপায় সন্ধানে ব্যস্ত ছিল?

বিদূষক। উপায়ের সাফল্য জানতে চাও।

রাজা। তার মানে?

বিদূষক। (কানে কানে) এইরকম।

রাজা। বাঃ, বেশ বন্ধু, বেশ ভাল কাজ করেছ। কার্যসিদ্ধি কঠিন জেনেও এই আরম্ভে বেশ আশা হচ্ছে। কারণ সহায় সাথী থাকলেই বাধা সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্তুকে হাতের মুঠোয় আনা যাবে। চোখ থাকলেও প্রদীপ ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

(নেপথ্যে)

খুব হয়েছে। আর গর্ব করতে হবে না। মহারাজের সামনে আমাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট বিচার হয়ে যাক।

রাজা। (কান পেতে শুনে) বন্ধু, তোমার কূটবুদ্ধির গাছে ফুল ফুটেছে।

বিদূষক। ফল খুব শীগগির দেখতে পাবে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন, প্রভুর আদেশমত কাজ হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন হরদত্ত ও গণদাস। দুজনেই অভিনয়বিদ্যার আচার্য, পরস্পরকে হারাতে চাইছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—ঠিক যেন দুটি ছবি ভাব শরীর ধারণ করে দেখা দিয়েছে।

রাজা। তাদের নিয়ে এস।

কঞ্চুকী। মহারাজের যেমন আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার দুজনকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে আসুন আপনারা।

হরদত্ত। (রাজাকে তাকিয়ে দেখে) আহা কি দুর্লভ রাজমহিমা! কারণ ইনি একেবারে অপরিচিত নন, কাছে যাওয়া যাবে না এমনও মনে হচ্ছে না, তবু এঁর পাশে যেতে দ্বিধা হচ্ছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, বিশাল সমুদ্রের মত আমার চোখে এঁকে প্রতিমুহূর্তেই নতুন মনে হচ্ছে।

গণদাস। মানুষের শরীরে এ কি বিপুল জ্যোতি! রক্ষী আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে, সিংহাসনের কাছে পরিজনের সঙ্গেই যাচ্ছি, তবু কোন কথা না বলে শুধু তেজোরাশি দিয়ে আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত করে অর্থাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তিনি যেন আমাকে প্রকারান্তরে নিষেধ করছেন।

কঞ্চুকী। এই যে মহারাজ, আপনারা এগিয়ে যান।

দুজনে। (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। আপনাদের স্বাগত জানাই। (পরিজনদের দিকে তাকিয়ে) আপনাদের আসন।

(হরদত্ত ও গণদাস পরিজনদের আসনে বসল)

রাজা। কি ব্যাপার? শিষ্যদের পাঠ দেবার সময়ে একই সঙ্গে দুজন আচার্য উপস্থিত!

গণদাস। মহারাজ, শুনুন তাহলে। আমি খুব বড় পণ্ডিতের কাছে অভিনয়বিদ্যা শিখেছি। এ বিষয়ে আমি শিক্ষকতাও করেছি। মহারাজ নিজে এবং রাণীমাও আমাকে নিয়োগ করেছেন।

রাজা। খুব ভালভাবেই জানি। তারপর কি?

গণদাস। কিন্তু আমাকে হরদত্ত লোকদের সামনে অপমান করে বলেছে, ও আমার পায়ের ধূলার যোগ্য নয়।

হরদত্ত। মহারাজ, ও-ই আগে আমাকে অপমান করেছে। বলেছে ওর সঙ্গে আমার মধ্যে তফাৎ হলো সমুদ্র আর ডোবার তফাৎ। তাই আমার নিবেদন, আপনিই ওকে ও আমাকে বিদ্যায় ও প্রয়োগে আমাদের গুণাগুণ বিচার করে দিন। মহারাজ, নিজেই আমাদের বিশেষজ্ঞ ও বিচারক হবেন।

বিদূষক। ঠিক প্রস্তাব।

গণদাস। হ্যাঁ, খুব ভাল কথা। মহারাজ মন দিয়ে শুনবেন।

রাজা। একটু থামুন। মহারাণী একে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। সুতরাং পণ্ডিত কৌশিকীর সঙ্গে তিনি থাকবেন। তাঁর সামনেই বিচার হবে।

বিদূষক। আপনি ঠিক বলেছেন।

দুজন আচার্য। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

রাজা। মৌদ্‌গল্য, এই প্রস্তাব জানিয়ে পণ্ডিত কৌশিকীর সঙ্গে রাণীকে ডেকে আন।

কঞ্চুকী। মহারাজ যা আদেশ করেন। (প্রস্থান ও পরিব্রাজিকাসহ রাণীকে নিয়ে প্রবেশ) এই দিকে, এই দিকে দেবী।

দেবী। (পরিব্রাজিকার দিকে তাকিয়ে) হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনার কি মনে হয়?

পরিব্রাজিকা। তোমার পক্ষের লোক হেরে যাবে এমন ভয় করো না। প্রতিপক্ষের কাছে গণদাস কোন অংশে কম নয়।

দেবী। তা হলেও রাজার অনুগ্রহ তাকে প্রাধান্য দেবে।

পরিব্রাজিকা। তুমিও ত রাণী, সে কথাটাও ভুলো না। দেখ সূর্যের দাক্ষিণ্যে আগুন খুব বেশী জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু রাত্রির দাক্ষিণ্যে চাঁদও তার মহিমা পায়।

বিদূষক। দেখ দেখ, পণ্ডিত কৌশিকীকে সামনে নিয়ে দেবী ধারিণী এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কৌশিকীর সঙ্গে থেকে মাঙ্গলিক অলঙ্কারে ভূষিত দেবীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে সশরীরে ত্রয়ী-বিদ্যা আবির্ভূত হয়েছে।

পরিব্রাজিকা। (কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। ভগবতী, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

পরিব্রাজিকা। আপনি একশো বছর ধরে ধারিণী ও ধরণীকে পালন করুন। ধারিণী এবং ধরণী দুজনেই রত্নপ্রসবা। ধারিণীর পুত্র মহাবলশালী এবং ধরণীও শস্যশ্যামলা। দুজনেই ক্ষমাগুণে সমান অর্থাৎ সর্বংসহা।

ধারিণী। আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা। দেবীকে স্বাগত। (পরিব্রাজিকার দিকে ফিরে) দেবী, আসন গ্রহণ করুন।

(সকলে যথাস্থানে বসল)

রাজা। ভগবতী, এখানে হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে তাদের জ্ঞান-বিদ্যার বিবাদ হয়েছে। তাই এখন আপনাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরিব্রাজিকা। (মৃদু হেসে) ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে কিনা গাঁয়ে এসে রত্ন পরীক্ষা করা ?

রাজা। না না, একথা বলবেন না। আপনি পণ্ডিতকৌশিকী। আমি এবং রাণী আমাদের দুজনেরই ওঁদের প্রতি পক্ষপাত আছে।

আচার্যদ্বয়। মহারাজ ঠিক বলেছেন। আপনিই আমাদের দোষগুণ ঠিক বিচার করতে পারবেন।

রাজা। তাহলে তর্ক শুরু হোক।

পরিব্রাজিকা। মহারাজ, নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োগ অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়ই হলো আসল। কথায় বা তর্কে কি প্রয়োজন? রাণী কি বলেন?

দেবী। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বলি এদের এই ঝগড়া-বিবাদই আমার ভাল লাগছে না।

গণদাস। দেবী, সমান বিদ্যার একজনের কাছে আমি হেরে যাব এটা ভাববেন না।

বিদূষক। দেবী, ভেড়ার লড়াই দেখা যাক না। শুধু শুধু মাইনে দেওয়া কেন?

দেবী। ঝগড়াটে কোথাকার।

বিদূষক। না না, দুটো পাগলা হাতি ঝগড়া করতে থাকলে একটা না হারা পর্যন্ত শান্তি কোথায়?

রাজা। মনে হয় দুজনেরই সুন্দর দেহভঙ্গিমাকৃত নৃত্যাভিনয় দেবী দেখেছেন।

পরিব্রাজিকা। হ্যাঁ।

রাজা। তাহলে এরপর এরা আর কি প্রমাণ দেবে?

পরিব্রাজিকা। তাই বলছি কারো বিদ্যা নিজের জ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কারো বা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে। যিনি দুটিই সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তিনিই শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবেন।

বিদূষক। আচার্যেরা দেবীর কথা শুনলেন। তার সারমর্ম হলো এই যে শিক্ষার প্রয়োগ দেখে বিচার হবে।

হরদত্ত। আমরা একমত এ বিষয়ে।

গণদাস। এটাই ঠিক হবে।

দেবী। যদি আবার বোকাবুদ্ধির শিষ্যা শিক্ষাকে খর্ব করে দেয় তাহলে ত শিক্ষকের দোষ হবে।

রাজা। তা ত হবেই। অপদার্থ ব্যক্তিকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করাটাই ত শিক্ষকের কমবুদ্ধির পরিচয় দান করে।

দেবী। (স্বগত) এখন কি হবে? (গণদাসের দিকে তাকিয়ে

জনান্তিকে) আর্যপুত্রের উত্তেজনার খোরাক এই ইচ্ছাপূরণের কাজ না করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) এই অনর্থক চেষ্টা থামান।

বিদূষক। রাণীমা ঠিকই বলেছেন। গানের ছলে সরস্বতীকে দেওয়া মিষ্টিগুলো ত তুমিই খাও। হারবে ত নিশ্চয়, তবে ঝগড়ায় কাজ কি ?

গণদাস। সত্যি রাণীর কথার এই মানেই হয়। এখনকার উপযোগী এই কথাটা শোন তাহলে। যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছি বলে তর্ক করতে চায় না, অপরের নিন্দাও সহ্য করে যায়, যার বিদ্যা শুধুমাত্র জীবিকার জন্য তোলা থাকে, তাকে পণ্ডিতরা জ্ঞানপণ্যের বণিক বলেন।

দেবী। আপনার শিষ্যার বেশীদিন হয়নি। পাঠ দেওয়া শেষ হবার আগেই তাকে প্রকাশ করে দেওয়া উচিত হবে না।

গণদাস। সেইজন্যই আমার আগ্রহ।

দেবী। তাহলে দুজনেই ভগবতীর কাছে পাঠ দেখান।

পরিব্রাজিকা। দেবী, এটা উচিত নয়। যিনি সব জানেন, তাঁরও একার সিদ্ধান্তে দোষ থাকবে।

দেবী। (স্বগত) মূর্খ, জেগে থাকলেও তুমি কি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছ ? (রাগে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাজা তা পরিব্রাজিকাকে দেখালেন।)

পরিব্রাজিকা। ওগো চন্দ্রমুখী, অকারণে কেন রাজামশাইএর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ? স্বামীগৃহে প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণে স্বামীর উপর রাগ করে।

বিদূষক। আহা কারণ আছে বৈকি। নিজ পক্ষের লোককে রক্ষা করতে হবে ত। (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) ভাগ্যক্রমে রাণীমার রাগের জন্য রক্ষা পেলেন। বিদ্যাশিক্ষা খুব থাকলেও সকলে অন্যকে পাঠ দিতে পটু হয় না।

গণদাস। দেবী, এইভাবেই লোকে আমাকে বিচার করছে। সুতরাং এখন আমি নিজেকে নিজের প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে চাইছি। আপনি যদি আমাকে অনুমতি না দেন তবে বুঝব আপনি আমাকে

ত্যাগ করেছেন। (আসন ছেড়ে উঠলেন)

দেবী। (স্বগত) কি করি? (প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপরে আচার্যের জোর খাটে।

গণদাস। এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলাম। (রাজার দিকে ফিরে) দেবী ত অনুমতি দিলেন। তাহলে মহারাজ আদেশ করুন, অভিনয়ের কোন্ বিষয়ে প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাব?

রাজা। ভগবতী যা আদেশ দেবেন।

পরিব্রাজিকা। রাণীর মনে কি আছে তাই ভাবছি।

দেবী। খুলে বলুন। আমার পরিজনের উপর আমার জোর আছে।

রাজা। আমার উপরেও তোমার জোর আছে, সেটাও বল।

দেবী। ভগবতী, এখন বলুন।

পরিব্রাজিকা। মহারাজ, চতুষ্পদের চলিত নৃত্যাভিনয় খুব কঠিন বলা হয়। সেই একই বিষয়ে দুজনের শিক্ষা দেখব। এর থেকেই দুজনের শিক্ষণকার্যের তফাৎ বোঝা যাবে।

আচার্যদ্বয়। ভগবতী যা আদেশ দেবেন।

বিদূষক। তাহলে দুজনেই প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতের আয়োজন করে মহারাজের কাছে দূত পাঠান। অথবা মৃদঙ্গের আওয়াজ শুনে আমরা উঠব।

হরদত্ত। (উঠে পড়ল)

(গণদাস রাণীকে দেখতে লাগল)

দেবী। (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) জয়ী হোন। আমি সত্যি সত্যি আপনার জয়ের পথে বাধা নই। (প্রস্থান)

পরিব্রাজিকা। আচার্য, এইদিকে আসুন।

আচার্যদ্বয়। (ঘুরে এসে) এই যে আমরা।

পরিব্রাজিকা। বিচারকের অধিকার বলে বলছি, সমস্ত অঙ্গের ভঙ্গী প্রকাশের জন্য সামান্য প্রসাধন করে শিষ্যা দুজনকে আনবেন।

আচার্যদ্বয়। সে আমাদের বলতে হবে না। (প্রস্থান)

দেবী। (রাজার দিকে তাকিয়ে) যদি রাজকার্য পরিচালনার

ব্যাপারেও আর্যপুত্র এমন নিখুঁত হন তাহলে চমৎকার হয়।

রাজা। এটা অন্যভাবে নিও না। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার চেষ্টায় এটা ঘটছে না। সমান সমান বিদ্যার লোক একে অন্যের নামযশে ঈর্ষা করে থাকে।

(নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ। সকলে কান পেতে শুনতে লাগল)

পরিব্রাজিকা। ওঃ, সঙ্গীত শুরু হলো। কারণ এই মধ্যমতালে বাঁধা ময়ূরদের প্রিয় মৃদঙ্গধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মন মাতিয়ে তুলছে। ময়ূরেরা এই আওয়াজকে মেঘের গর্জন মনে করে ঘাড় উঁচু করে পাল্টা সুর তোলে।

রাজা। দেবী, চল সভাগৃহে যাই।

দেবী। (স্বগত) আর্যপুত্রের কী অধীরতা। (সকলে উঠে পড়লেন।

বিদূষক। (আড়ালে রাজাকে) ওহে ধীরে চল। রাণী ধারিণী যেন সন্দেহ না করেন।

রাজা। ধৈর্য ধরেছি। তবু মুরজধ্বনি শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠছি। এ শব্দ যেন সাফল্যের পক্ষে অবতীর্ণ হওয়া আমারই মনস্কামনার পদধ্বনি। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

সঙ্গীতশেষে বয়স্যসহ রাজা, রাণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গের প্রবেশ

রাজা। ভগবতী, উপস্থিত দুই আচার্যের মধ্যে কার শিক্ষা আমরা প্রথম দেখব ?

পরিব্রাজিকা। বিদ্যাভ্যাসে দুজনেই সমান হলেও গণদাসেরই প্রথম অধিকার।

রাজা। মৌদ্গল্য, আচার্য দুজনকে একথা জানিয়ে তুমি নিজের কাজ করো।

কঞ্চুকী। মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

গণদাসের প্রবেশ

গণদাস। মহারাজ, শর্মিষ্ঠার কাব্যকৃতির চারটি অংশ এবং তা মধ্যলয়ে বাঁধা। তারই চতুর্থ অংশের নৃত্যপ্রয়োগে আপনি মনোনিবেশ করুন।

রাজা। আচার্যকে সম্মান দেখিয়ে আমি মনোনিবেশ করছি। (গণদাসের প্রস্থান)

রাজা। (জনান্তিকে) বন্ধু, নেপথ্যে থাকা তাকে দেখার আগ্রহে আমার চোখ অস্থির হয়ে পর্দাটাকেই সরিয়ে দিতে চাইছে।

বিদূষক। (আড়ালে) ওহে, তোমার নয়নমধু মৌমাছিসহ উপস্থিত। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করে এখন দেখে যাও।

মালবিকার প্রবেশ। আচার্য তার প্রতিটি অঙ্গের মুদ্রা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

বিদূষক। (জনান্তিকে) তুমি দেখ, ছবির থেকে এর সৌন্দর্য কিছু কম নয়।

রাজা। ছবিতে দেখে এর রূপসৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, যে এর ছবি এঁকেছে সে এর সৌন্দর্য ঠিকমত আঁকতে পারেনি।

গণদাস। বাছা, ভয় করো না, স্বাভাবিক হও।

রাজা। আহা, এর প্রতিটি অঙ্গে কি অনিন্দ্য রূপ। দেখছি, চোখদুটি টানা-টানা, মুখখানি যেন শরৎকালের চাঁদ, কাঁধ থেকে যেন দুটি বাহু নেমে এসেছে, উন্নত স্তনযুগলের জন্য বক্ষোদেশে স্থানাভাব, দুপাশ মাজাঘষা যেন পালিশ করা ; ক্ষীণ কটিদেশ যেন হাতের মুঠোয় ধরা যায়। প্রশস্ত জঘন, নিতম্বযুক্ত, দুটি পায়ে বাঁকা আঙ্গুলগুলো যেন নৃত্যগুরুর পছন্দমত করেই এর সমস্ত গঠিত।

মালবিকা। (উপগান করে চতুষ্পদার বিষয় গাইতে লাগল) হে আমার মন, প্রিয়জন বড়ই দুর্লভ, তাই সে বিষয়ে কোন আশা রেখো না। আহা, আমার বাঁ চোখের প্রান্তে এ কিসের কাঁপন? বহুদিন পর এঁর দেখা পেয়েছি, কেমন করে এগিয়ে যাব? হে প্রিয় আমার, আমি

পরাধীন, তবু জেনো, আমি তোমাকেই চাই। (নানা রস অনুসারে নৃত্যে অভিনয় করতে লাগল)

বিদূষক। (জনান্তিকে) ওহে, চতুষ্পদার বিষয়কে মাধ্যম করে এ ত তোমার কাছে আত্মনিবেদন করছে।

রাজা। বন্ধু, আমার মনের অবস্থাও একই রকম। ও সত্যি সত্যি 'ওগো এই মানুষটা তোমায় ভালবেসেছে' এই কলিটি গাইবার সময় নিজের দিকে ইঙ্গিত করে অভিনয় করতে গিয়ে আমার সঙ্গেই যেন বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গীতে কথা বলছে, ধারিণী কাছে থাকার জন্য ভালবাসা প্রকাশ করার অন্য পথ ছিল না যে।

(গান শেষ করে মালবিকা প্রস্থানে উদ্যত হলো)

বিদূষক। দেবী দাঁড়ান, একটি বিশেষ কাজ আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন। সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

গণদাস। বাছা দাঁড়াও, তোমার শিক্ষার সুফল শুনে যাবে। (মালবিকা ফিরে দাঁড়াল)

রাজা। (স্বগত) তার সব ভঙ্গীতেই লাবণ্য শোভিত হয়ে ওঠে। যেমন ওর শরীরের ঊর্ধ্ব অংশ সোজা রেখে দাঁড়ানোর ভঙ্গী যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনিবন্ধে বলয় স্থির হয়ে ছিল, বাঁ হাতটি ছিল নিতম্বে রাখা আর ডান হাতটি ছিল শ্যামালতার মত এলানো, তার চোখের দৃষ্টি ছিল মেঝের দিকে নামানো যেখানে তারই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ঘর্ষণে ফুলের রাশি পিষ্ট হয়েছে।

দেবী। আচ্ছা, গৌতমের কথাও কি আর্যপুত্রের মনে ধরেছে?

গণদাস। দেবী, এমন ভাববেন না। প্রভুর কাছে থেকে থেকে গৌতমেরও দৃষ্টি সূক্ষ্ম হতে পারে। বিদ্বান মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে বোকা লোকও আর বোকা থাকে না। পাঁক পরিষ্কারের ফলে যেমন নোংরা জলও পরিষ্কার হয়।

বিদূষক। বিচারককে জিজ্ঞাসা করো তাহলে। তারপর আমি যে কাজের ভুল ধরেছি তা বলব।

গণদাস। ভগবতী, কেমন দেখলেন বলুন। ভাল না খারাপ?

পরিব্রাজিকা। যা দেখলাম সবটাই চমৎকার। কারণ দেহের অভিনয়ে ও প্রকাশভঙ্গীতে গানের অর্থ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ লয় অনুসারে হয়েছে। রস যেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। হাতের প্রতিটি মুদ্রা ছিল সুকুমার। আর পরপর একটি ভাব অন্য ভাবকে সরিয়ে স্থান করে নিচ্ছিল, কিন্তু মূল ভাবটি ছিল এক ও অক্ষুণ্ণ।

গণদাস। রাজা কেমন ভাবছেন?

রাজা। গণদাস, আমার নিজের পক্ষের লোকের জন্য গর্ব কমে গেছে।

গণদাস। আজ আমি সত্যই নৃত্যাচার্য। বিজ্ঞজনে শিক্ষকের সেই শিক্ষা ও উপদেশকে শুদ্ধ বলেন যা আগুনে পোড়া খাঁটি সোনার মতই বিদ্বৎসমাজে পড়ে কালো হয় না।

দেবী। কি ভাগ্য যে আপনি বিচারকের প্রশংসা পাচ্ছেন।

গণদাস। দেবীর অনুগ্রহই আমার সমৃদ্ধির কারণ। (বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) গৌতম, আপনি কি ভুলের কথা বলছিলেন এবার বলুন।

বিদূষক। প্রথম-শিক্ষা দেখানোর সময়ে আগেই ব্রাহ্মণের পূজো করা উচিত। সেটা আপনারা করেননি। (সকলের অট্টহাসি, মালবিকাও মৃদু হাসল)

রাজা। (স্বগত) আমার চোখ লক্ষ্যবস্তুর সার গ্রহণ করেছে। কারণ সে আয়তাক্ষীর হাসিমুখ দেখেছে, সামান্য দাঁত দেখা যাওয়ায় তা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল, যার কেশর-গুলো এখনো ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

গণদাস। হে মহাব্রাহ্মণ, নেপথ্যগৃহের এটা প্রথম সঙ্গীত নয়। তা না হলে কেনই বা আপনার মত পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করব না?

বিদূষক। আমি সত্যিই বোকা চাতকপাখির মত শুকনো মেঘের আকাশে জল পান করতে চেয়েছি।

পরিব্রাজিকা। তাই হয়েছে।

বিদূষক। তাহলে সত্যি, পণ্ডিতের সন্তোষেই মূর্খেরা বিশ্বাস

করে। ইনি যেহেতু ভাল বলেছেন, সুতরাং আমি এঁকে এই পুরস্কার দিচ্ছি। (এই বলে রাজার হাতের বালা ধরে টানল)

দেবী। দাঁড়াও, অন্যজনের গুণের কথা না জেনেই কেন তুমি অলঙ্কার দিচ্ছ ওঁকে ?

বিদূষক। যেহেতু এ অলঙ্কার অন্যের।

দেবী। (আচার্যের দিকে তাকিয়ে) আর্য গণদাস, আপনার শিষ্যার পরীক্ষা ত শেষ হয়েছে।

গণদাস। বৎসে, এখন আমরা যাই। (মালবিকার সঙ্গে প্রস্থান)

বিদূষক। (জনান্তিকে) তোমার সেবায় আমার এই পর্যন্ত বুদ্ধির দৌড়।

রাজা। (জনান্তিকে) তার এই চলে যাওয়া আমার দুটি চোখের অন্তস্বরূপ, হৃদয়ের মহোৎসবের অবসানস্বরূপ, আমার আনন্দের দ্বার যেন রুদ্ধ হলো।

বিদূষক। (জনান্তিকে) তুমি দেখছি দরিদ্র রোগীর মত চাইছ বদ্যিমশাই ওষুধও সঙ্গে করে আসবেন।

হরদত্তের প্রবেশ

হরদত্ত। প্রভু, এখন আমার প্রয়োগবিদ্যা দেখার জন্য অনুগ্রহ করুন।

রাজা। (স্বগত) দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হরদত্ত, আমরা ত উৎসুক হয়েছি।

হরদত্ত। অনুগৃহীত হলাম।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক। প্রভুর জয় হোক। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। দীঘির পদ্মপাতার ছায়াতে হাঁসেরা চোখ বুজে বসে আছে। পারাবতেরা অতিশয় উত্তাপে ঢালু ছাদ ছেড়ে সৌধমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু পান করার জন্য ময়ূর ধারাযন্ত্রে গিয়ে বসেছে। সকল রাজগুণে দীপ্ত আপনারই মত সূর্য সমস্ত কিরণসমূহে প্রদীপ্ত।

বিদূষক। আহা, ব্রাহ্মণের খাবার সময় হয়েছে। আপনারও।

খাবার সময় পার হয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দোষ ধরেন। হরদত্ত, এখন আপনি কি বলেন?

হরদত্ত। এখানে আমার বলার কিছু নেই।

রাজা। (হরদত্তকে) তাহলে আপনার বিদ্যা আমরা আগামীকাল দেখব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

হরদত্ত। প্রভুর যা আদেশ।

দেবী। আর্যপুত্র স্নানকার্য সম্পন্ন করুন।

বিদূষক। দেবী, তাড়াতাড়ি পানভোজনের ব্যবস্থা করুন।

পরিব্রাজিকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার স্বস্তি হোক। (দেবী ও পরিজনসহ প্রস্থান)

বিদূষক। (রাজাকে) ওহে শুধু রূপে নয়, মালবিকা শিল্পগুণেও অদ্বিতীয়া।

রাজা। তার অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে বিধাতা কামদেবের একটি বিষযুক্ত বাণ সৃষ্টি করেছেন। আর কি বলব? আমার কথা তোমার ভাবা উচিত।

বিদূষক। তোমারও উচিত আমার কথা ভাবা। দোকানের চুল্লীর মত আমার পেট জ্বলছে।

রাজা। এইভাবেই তুমি বন্ধুর কাজে তাড়া দেবে।

বিদূষক। তোমার কথা বুঝেছি। কিন্তু মেঘমালায় আবৃত জ্যোৎস্নার মত মালবিকার দেখা পাওয়া যে পরের অধীন। তুমিও ত কশাইখানার পাখির মত মাংসলোভী অথচ ভীরু। সুতরাং আমার ইচ্ছা তুমি ধৈর্য না হারিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করো।

রাজা। কিন্তু বন্ধু, ধৈর্য কিভাবে ধরি? অন্তঃপুরের অন্য সব রমণীর বিষয়ে আমার হৃদয় নিস্পৃহ। সেই সুনয়নাই এখন আমার সমস্ত প্রেমের লক্ষ্য। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

পরিব্রাজিকার পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। দেবী আদেশ করেছেন, উপহার দেবার জন্য বীজপূরক বা একরকম লেবু গাছের ফল নিয়ে এস। তাই প্রমোদবনের রক্ষিণী মধুকরিকাকে খুঁজে দেখি। (এদিক ওদিক ঘুরে) এই যে তপনীয় অশোকতরুর দিকে চেয়ে আছে মধুকরিকা। যা হোক, ওর কাছে যাই।

উদ্যানপালিকা মধুকরিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। (এগিয়ে এসে) মধুকরিকা, তোর বাগানের খবর ভাল ত?

মধুকরিকা। সখী সমাভৃতিকা, তোকে স্বাগত জানাই।

সমাভৃতিকা। সখী, দেবী আদেশ করেছেন, আমাদের মত মানুষের শুধু হাতে দেবীকে অর্থাৎ রাণীমাকে দর্শন করা উচিত নয়। সুতরাং বীজপূরক দিয়ে তাঁর সেবা করতে চাই।

মধুকরিকা। বীজপূরক ত সামনেই রয়েছে। এবার বল, পরস্পর রেষারেষি করা দুই নাট্যাচার্যের প্রয়োগ দেখে দেবী কাকে প্রশংসা করলেন?

সমাভৃতিকা। দুজনেই পণ্ডিত এবং প্রয়োগে নিপুণ। তবে শিষ্যার গুণ পরীক্ষায় গণদাস বেশী গুণী বিবেচিত হয়েছেন।

মধুকরিকা। মালবিকাকে নিয়ে কি সব কানাঘুষো চলছে?

সমাভৃতিকা। তার উপর রাজার দৃষ্টি পড়েছে। শুধু রাণীমা ধারিণীর কথা ভেবে তিনি নিজের প্রভুত্ব দেখাচ্ছেন না। এই কদিনে মালবিকাও একবার গলায় পরে খুলে রাখা মালতীলতার মত ম্লান হয়ে পড়েছে। তারপর আর কিছু জানি না। এবার যেতে দে।

মধুকরিকা। এই শাখাতে ঝুলতে থাকা বীজপূরকটি নে।

সমাভৃতিকা। (নেবার ভাণ করে) সখী, তুইও সাধুজনকে সেবা করার জন্য আরও মূল্যবান ফললাভ করবি।

মধুকরিকা। সখী, একসঙ্গেই যাই। আমি এই তপনীয় অশোক-

তরুর দোহদ অর্থাৎ সুন্দরীর পদাঘাতে ফুল ফোটাবার বাসনার কথা রাণীমাকে জানাব। এর ফুল ফুটতে দেরী হচ্ছে।

সমাভৃতিকা। ঠিক বলেছিস। এটা ত তোর করণীয়। (দুজনের প্রস্থান)

কামাতুর অবস্থায় রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

রাজা। দয়িতার আলিঙ্গনসুখের অভাবে শরীর ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে, ক্ষণেকের জন্য তার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না বলে দুচোখ জলে ভরে যেতে পারে। কিন্তু হে আমার হৃদয়, তুমি ত সেই মৃগনয়নার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হওনি। তাকে মনে মনে পাওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি পরিত্যাগ করছ ?

বিদূষক। তুমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে বিলাপ করো না। আমি দেবী মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার দেখা পেয়েছি। তোমার নির্দেশও তাকে জানিয়েছি।

রাজা। তাতে কি বলেছে সে ?

বিদূষক। সে বলেছে, রাজাকে বলবেন, তাঁর এই নিয়োগ পেয়ে আমি অনুগৃহীত। কিন্তু বেচারী মালবিকাকে রাণীমা অতি কড়া পাহারায় রেখেছেন। আগলে রাখা সাপের মণির মত তাকে পাওয়া সহজ হবে না। তবু আমি তা করব।

রাজা। হে দেব মন্মথ, প্রতিকূল বিষয়ে আকৃষ্ট করে কেন এই মানুষটিকে এমন পীড়া দিচ্ছ যে সে কালবিলম্ব সহ্য করতে পারছে না। (সবিস্ময়ে) কোথায় এই চিত্ত উন্মোথিত করা বেদনা আর কোথায় তোমার বিশ্বাসযোগ্য কুসুমায়ুধ ? মৃদু বস্তু যে অধিক তীক্ষ্ণ, তার প্রমাণ, হে মন্মথ, তোমার মধ্যেই পাওয়া যায়।

বিদূষক। বলছি ত, তাকে পেতে গেলে যা করার দরকার তা করেছি। এখন একটু শান্ত হও।

রাজা। এমন কর্মবিমুখ এই মন নিয়ে দিনের শেষে কোথায় কাটাই ?

বিদূষক। শোন, বসন্তের প্রথম প্রকাশ রক্তাশোক ফুলের উপহার

পাঠিয়ে নতুন বসন্তোৎসবের ছলে ইরাবতী নিপুণিকার মুখে তোমাকে প্রার্থনা জানিয়েছেন, আর্যপুত্রের সঙ্গে দোলারোহণ করতে চাই। তুমিও তাকে কথা দিয়েছ। সুতরাং প্রমোদবনেই যাই চল।

রাজা। তা হয় না।

বিদূষক। কেন হয় না ?

রাজা। বন্ধু, মেয়েরা স্বভাবতই চতুর। আমাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে দেখেও তোমার সখী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন আমি মনে মনে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট। তাই দেখছি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাই উচিত হবে, আর প্রত্যাখ্যান করার অনেক কারণ আছে। মনস্বিনী বুদ্ধিমতী নারীদের সঙ্গে এমন প্রেমশূন্য ভদ্রতা করা উচিত নয়।

বিদূষক। অন্তঃপুরে তোমার যে সৌজন্য প্রতিষ্ঠিত আছে তা হঠাৎ মুছে ফেলা ঠিক হবে না।

রাজা। তবে প্রমোদবনের পথ দেখাও।

বিদূষক। এদিকে, এদিকে এস। (উভয়ের পরিক্রমা) বাতাসে কম্পিত এই পল্লবরূপ অঙ্গুলি দিয়ে বসন্ত যেন তোমাকে ডাকছে, এই বনে প্রবেশ করো।

রাজা। (স্পর্শসুখের অভিনয় করে) বসন্ত সত্যিই উদার। বন্ধু দেখ, প্রমত্ত কোকিলের শ্রুতিমধুর কুজনে সে যেন আমার মদনব্যথা কতটা সহনীয় তা সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করছে। আম্রমুকুলের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণা বাতাস আমাকে কোমলভাবে স্পর্শ করছে, বসন্ত যেন নিজেই তার কোমল করতল বুলিয়ে দিচ্ছে।

বিদূষক। শান্ত হবার জন্য প্রবেশ করো। (উভয়ের প্রবেশ) বন্ধু, মন দিয়ে দেখ, তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যই যেন বসন্তলক্ষ্মী যুবতীদের সাজসজ্জাকেও হার মানিয়ে এই বসন্তকালের ফুলের সাজ পরেছে।

রাজা। সত্যি অবাক হয়ে দেখছি। রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে ছাড়িয়ে গেছে, কুরুবকের শ্যামল এবং শ্বেত আভা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণীশোভিত তিলকফুল-

গুলি সুন্দরীদের মুখের তিলক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে। এইভাবে বসন্তের শোভা সুন্দরী রমণীদের প্রসাধনকলাকে হেলাভরে হারিয়ে দিয়েছে। (উভয়ে উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন)

উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা। প্রভুর মনের কথা না জেনেই তাঁকে চাইছি বলে আমার নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছে। সদয় সখীদের কাছে এ কথা বলার সুযোগ যে কবে হবে তা জানি না। জানি না, কামদেব কতদিন আমাকে প্রতিকারহীন এই কষ্ট দিয়ে যাবেন। (কয়েক পা এগিয়ে) কোথায় চলেছি? (চিন্তা করে) ও, দেবী আমাকে আদেশ করেছেন, গৌতমের চপলতার ফলে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আমার দুটি পায়ে বড় ব্যথা, তুমি গিয়ে তপনীয় অশোকতরুর ইচ্ছাপূরণ করো। যদি পাঁচরাত্রির মধ্যে ফুল ফোটে তাহলে আমি অভিলাষ পূর্ণ করার পুরস্কার দেব। যাই হোক, নির্দিষ্ট স্থানে এগিয়ে যাই। যতক্ষণ পিছনে পিছনে চরণের অলঙ্কার নিয়ে বকুলাবলিকা না আসছে ততক্ষণ আমি নির্জনে একটু বিলাপ করি। (পরিক্রমা করতে লাগল)

বিদূষক। (দেখে) হুঁ, হুঁ, এ যে একেবারে মাতালের মুখ বদলানোর মাছের ডিম মুখের কাছে উপস্থিত।

রাজা। এই, কি হয়েছে?

বিদূষক। এখানে সামান্য সাজে উৎকণ্ঠিতা একাকিনী মালবিকা কাছেই রয়েছেন।

রাজা। কি? মালবিকা?

বিদূষক। হ্যাঁ।

রাজা। আমার জীবন ধারণ করা সম্ভব। সারসের কণ্ঠস্বর শুনে গাছে ঢাকা নদীর কথা জানতে পারা তৃষ্ণার্ত পথিকের মত তোমার মুখে নিকটস্থ প্রিয়ার কথা জেনে আমার ক্লিষ্ট হৃদয় আশ্বস্ত হলো। কই কোথায় সে?

বিদূষক। ইনি তরুরাজির মধ্য থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছেন মনে হচ্ছে।

রাজা। (দেখে আনন্দের সঙ্গে) বন্ধু, একে দেখছি, নিতম্ব দুটি বিশাল, ক্ষীণ কটিদেশ, সমুন্নত স্তনযুগল, চোখ দুটি টানা টানা—আমার প্রাণই বুঝি আসছে। বন্ধু, এর আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কারণ এর কপোলদেশ শরকাণ্ডের মত পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য অলঙ্কার পরিধান করে আছে, মনে হচ্ছে যেন বসন্তকালে পরিণত পত্রসহ সামান্য কুসুমে শোভিত কুন্দলতা।

বিদূষক। ইনিও তোমারই মত প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।

রাজা। তোমার বন্ধুত্ব এই রকম দেখছে।

মালবিকা। এই সেই অশোকতরু যে দোহদের বাসনায় কুসুমসজ্জা গ্রহণ না করে আমার উৎকণ্ঠিত অবস্থাকেই অনুকরণ করছে। যাই হোক, এর ছায়াশীতল শিলাতলে বসে একটু আশ্বস্ত হই।

বিদূষক। শুনেছ ত? তিনি নিজেই বলছেন তিনি উৎকণ্ঠিতা।

রাজা। এইটুকুতেই তোমার অনুমান সঠিক মনে করি না। যেহেতু কুরুবক ফুলের রেণু বয়ে আনা এবং নবকিশলয়ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয় সমীরণ অকারণ উৎকণ্ঠাও ত জন্মাতে পারে।

(মালবিকা বসে আছে)

রাজা। বন্ধু, এদিকে এস, আমরা লতার আড়ালে যাই।

বিদূষক। মনে হচ্ছে দূরে ইরাবতী আসছেন।

রাজা। কমলিনীকে দেখার পর গজরাজ আর কুমীরের দিকে যায় না। (এই বলে মালবিকার দিকে তাকিয়ে রইলেন)

মালবিকা। হৃদয় আমার! অবলম্বনশূন্য সীমাহীন আশা থেকে ক্ষান্ত হও। কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?

(বিদূষক রাজার দিকে তাকাল)

রাজা। প্রিয়ে, প্রেমের গতি কেমন বক্র দেখ, তোমার উৎকণ্ঠার কারণ তুমি বলনি, অনুমানেরও অর্থজ্ঞানরূপে একটিমাত্র ফল হয় তা নয়, তবু হে রম্ভোরু, আমি নিজেকেই এই সমস্ত বিলাপের লক্ষ্য মনে করছি।

বিদূষক। এখনি তোমার সংশয় দূর হবে। গোপনে যাকে তোমার প্রেমের খবর পাঠিয়েছিলাম সেই বকুলাবলিকা আসছে।

রাজা। আমার অনুরোধের কথা কি ওর মনে থাকবে?

বিদূষক। বাঁদী বেটী তোমার দরকারী খবর ভুলে যাবে নাকি? আমি পর্যন্ত কখনো ভুলি না।

চরণের অলঙ্কারহাতে বকুলাবলিকার প্রবেশ

বকুলাবলিকা। সখীর খবর ভাল ত?

মালবিকা। সখী বকুলাবলিকা, স্বাগত। বস।

বকুলাবলিকা। (বসে) সখী, দেবী তোমাকে যোগ্যতার বিচারে নিযুক্ত করেছেন। অতএব একটি পা দাও। আলতা পরিয়ে নূপুর বেঁধে দিই।

মালবিকা। (স্বগত) হৃদয়, এই গৌরবে বেশী খুশি হয়ো না। কেমন করে এখন নিজেকে মুক্ত করি? অথবা এটাই আমার মরণসাজ হবে?

বকুলাবলিকা। কি ভাবছ? এই তপনীয় অশোকতরুর ফুল ফোটা নিয়ে দেবী সত্যিই উৎসুক হয়েছেন।

রাজা। কি? অশোকের ইচ্ছাপূরণের জন্য এই আয়োজন?

বিদূষক। তুমি কি জান না, দেবী একে অন্তঃপুরের সাজে সাজাবেন না?

মালবিকা। সখী, ক্ষমা করো। (পা তুলে দিল)

বকুলাবলিকা। এ ত দেখছি আমারই শরীর। (চরণ সংস্কারের অভিনয় করল)

রাজা। বন্ধু দেখ, প্রিয়ার চরণপ্রান্তে আঁকা রক্তিম রেখা যেন মহাদেবের কোপে দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ।

বিদূষক। সত্যি পায়ের উপযুক্ত দায়িত্বই দেবী দিয়েছেন।

রাজা। তুমি ঠিকই বলেছ, এই বালিকা নখের দ্যুতি ছড়িয়ে কচি কিশলয়ের মত রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে—ইচ্ছাপূরণের জন্য কুসুমহীনা অশোকতরুকে অথবা চরণে প্রণত সদ্য অপরাধী দয়িতকে।

বিদূষক। তুমি অপরাধ করেছ, উনি তোমাকে আঘাত করবেন।

রাজা। সিদ্ধিদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের বচন গ্রহণ করলাম।

প্রমত্ত অবস্থায় ইরাবতী ও চেটীর প্রবেশ

ইরাবতী। হ্যাঁরে নিপুণিকা, শুনেছি প্রচুর মদ্যপানে নাকি স্ত্রীলোকের বিশেষ শোভা হয়। এই কথা কি সত্যি?

নিপুণিকা। প্রথমে এ এক শ্লোকোক্তি ছিল, আজ সত্য হলো।

ইরাবতী। বাড়াবাড়ি করিস না। কিকরে জানলি যে রাজা এখন প্রথমে দোলাঘরে গেছেন?

নিপুণিকা। আপনার প্রতি অখণ্ড স্নেহবশতঃ।

ইরাবতী। মন-রাখা কথা বলবি না, সোজাসুজি বল।

নিপুণিকা। বসন্ত উপহারে লোভী আর্য গৌতম বলেছেন। দেবী তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরাবতী। (অবস্থা অনুযায়ী চলে) ওরে, আমি মদ্যপানে অবশ, আমাকে হৃদয় তাড়া দিচ্ছে আর্যপুত্রকে দেখার জন্য। কিন্তু পা দুটি পথে চলছে না।

নিপুণিকা। যাক, দোলাঘরে পেঁছে গিয়েছি।

ইরাবতী। নিপুণিকা, আর্যপুত্রকে ত দেখছি না।

নিপুণিকা। আপনি দেখুন, পরিহাস করে রাজামশাই কোথাও লুকিয়ে আছেন। আমরাও প্রিয়ঙ্গুলতার হাওয়ায় অশোকতরুর এই শিলাতলে প্রবেশ করি।

ইরাবতী। (তাই করবেন)

নিপুণিকা। (পরিক্রমা করে দেখে) দেখুন রাণীমা, আমরা যে আমের মুকুল খুঁজছি তাতে পিঁপড়ে ধরেছে।

ইরাবতী। সে আবার কি?

নিপুণিকা। এখানে বকুলাবলিকা অশোকতরুর ছায়াতে বসে মালবিকার চরণ অলংকৃত করেছে।

ইরাবতী। (ভয়ের অভিনয় করে) এটা ত মালবিকার জায়গা নয়। এখানে মালবিকার আসার কথা নয়। একথা কেন ভাবছিস?

নিপুণিকা। মনে হচ্ছে দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে

দেবী অশোকের দোহদপূরণের জন্য মালবিকাকে নিযুক্ত করেছেন। নয়ত দেবী নিজের পায়ের নূপুরজোড়া পরিজনকে পরার অনুমতি দেবেন কেন ?

ইরাবতী। এই গৌরব সত্যিই অনেক।

নিপুণিকা। কি হলো, রাজাকে খুঁজছেন না ?

ইরাবতী। দেখ, আমার পা চলছে না। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। যা আশঙ্কা করছি তা শেষ পর্যন্ত দেখব। (মালবিকাকে দেখে স্বগত) ঠিক জায়গাতেই আমার মন দুর্বল হয়েছে।

বকুলাবলিকা। (পা দেখিয়ে) কি ? আলতাটানা তোমার পছন্দ হয়েছে ত ?

মালবিকা। সখী, নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি! কার কাছে তুমি প্রসাধনকলা শিখেছিলে ?

বকুলাবলিকা। এ বিষয়ে রাজার শিষ্যা আমি।

বিদূষক। যাও, একে গুরুদক্ষিণার জন্য তাগিদ দাও।

মালবিকা। ভাগ্যে তোমার গর্ব হয়নি।

বকুলাবলিকা। বিদ্যা প্রয়োগের উপযুক্ত পা পেয়ে আজ গর্ব করব। (স্বগত) আজ আমার দৌত্য শেষ। (রং দেখে প্রকাশ্যে) সখী, তোমার এক পায়ে রং দেওয়া শেষ হয়েছে। শুধু রং দিয়ে শুকোতে হবে। অথবা এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে। তাতে শুকিয়ে যেতে পারে।

রাজা। বন্ধু, দেখ দেখ, এমন পায়ে কাঁচা আলতা ফুঁ দিয়ে বাতাস করে শুকিয়ে দেবার মত আমার প্রথম সুযোগ এসেছে।

বিদূষক। আর তোমার দুঃখ কি ? যথাকালে এ সুখ তুমি অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করবে।

বকুলাবলিকা। সখী, তোমার পা-টি রাঙা পদ্মের মত দেখাচ্ছে। সর্বথা রাজার অঙ্কশায়িনী হও।

(ইরাবতী নিপুণিকার মুখের দিকে তাকাল)

রাজা। এ আমার আশীর্বাদ।

মালবিকা। সখী, যা বলার নয়, তাই বলছ।

বকুলাবলিকা। যা বলার তাই বলছি।

মালবিকা। তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস।

বকুলাবলিকা। শুধু আমি নই।

মালবিকা। অন্য কে আবার ?

বকুলাবলিকা। গুণগ্রাহী রাজাও।

মালবিকা। মিথ্যা বললে। আমার মধ্যে রাজার ভালবাসা মোটেই নেই।

বকুলাবলিকা। সত্যি তোমার মধ্যে নেই, কিন্তু রাজার কৃশ এবং পাণ্ডুর অঙ্গে অঙ্গে তা রয়েছে।

নিপুণিকা। হতভাগীর উত্তরটা যেন আগে থেকে তৈরী ছিল।

বকুলাবলিকা। ভালবাসার পরীক্ষা ভালবাসাতেই হয়, সজ্জনদের এই উক্তিকে সত্য প্রমাণ করো।

মালবিকা। তুমি নিজের খুশীমত কথাগুলো বলে যাচ্ছ ?

বকুলাবলিকা। না না, এই কথাগুলো রাজার, শুধু আমার মুখে বলা হলো।

মালবিকা। সখী, রাণীর কথা ভেবে আমার মন মানে না।

বকুলাবলিকা। বোকা মেয়ে, ভ্রমর আছে বলে বসন্তের সর্বস্ব আমের মুকুল কি কানে পরা হবে না ?

মালবিকা। তুমি কিন্তু বিপদের সময় সহায় থেকো।

বকুলাবলিকা। আমি সত্যি বকুলাবলিকা অর্থাৎ বকুলফুলের মালা, পিষ্ট করলে যার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

রাজা। সাধু, বকুলাবলিকা সাধু। ওর মনের কথা জেনে কথা বলে এবং সংশয়ের ক্ষেত্রে ঠিকমত উত্তর দিয়ে একে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছে। প্রেমিকের জীবন দূতীর উপর নির্ভরশীল একথা ঠিক।

ইরাবতী। হ্যাঁরে নিপুণিকা দেখ, বকুলাবলিকাই মালবিকাকে এই পথে এনেছে।

নিপুণিকা। এ উপদেশ উদাসীনকেও উৎসুক করে তোলে।

ইরাবতী। আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলাম। আমি সব বুঝে নিয়ে পরে চিন্তা করব।

বকুলাবলিকা। অন্য চরণটিকেও সাজানো হয়ে গেছে। এবার দুটিতে নূপুর পরিয়ে দিই। (নূপুরজোড়া পরিয়ে দিয়ে) এবার ওঠ, দেবীর দেওয়া অশোকতরুর ফুল ফোটানোর কাজ করো। (দুজনে উঠল)

ইরাবতী। দেবীর নিয়োগের কথা শুনলাম। তাই হোক এখন।

বকুলাবলিকা। এই যে রাগরঞ্জিত রক্তবর্ণ অশোকতরু, অনুরক্ত রাজা উপভোগযোগ্য তোমার সামনেই রয়েছেন।

মালবিকা। সেকি? রাজা?

বকুলাবলিকা। (স্মিত হাসি হেসে) না রাজা নয়, এই অশোক-শাখায় পল্লবগুচ্ছ ঝুলছে একে কানে পরে নাও।

বিদূষক। কি? তুমি শুনেছ ত?

রাজা। প্রেমিকের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমার কাছে উদাসীন ও উৎকণ্ঠিতের মিলনেও সম্ভোগের সিদ্ধি নেই, সমান অনুরাগসম্পন্ন দুজনের পরস্পর মিলনের অভাবে শরীরনাশও বরং ভাল।

(মালবিকা পল্লবের কর্ণভূষণ পরে লীলাভরে অশোকতরুতে পাদপ্রহার করল)

রাজা। বন্ধু, এই অশোকতরু থেকে কর্ণভূষণ নিয়ে ওকেই পদাঘাত করছে মালবিকা। ওদের পরস্পর বিনিময় দেখে নিজেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে।

মালবিকা। আশা করি আমাদের গৌরব সার্থক হবে।

বকুলাবলিকা। সখী, তোমার দোষ নেই। যদি এরকম চরণের স্পর্শ পেয়েও ফুল ফুটতে দেরী হয় তাহলে বুঝতে হবে এই অশোক-তরুই নির্গুণ।

রাজা। হে অশোকতরু, এই সুন্দরী নূপুরশিঞ্জামুখরিত তাজা পদ্মের মত কোমল চরণের স্পর্শে তোমাকে গৌরব দান করেছে। যদি তুমি সদ্য সদ্য মুখরিত না হও তবে ললিত প্রেমিকদের মত বৃথাই

তোমার দোহদ। বন্ধু, কথা বলার সুযোগ থাকায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে।

বিদূষক। এস, ওকে নিয়ে মজা করব।

নিপুণিকা। রাণী, রাজা এখানে প্রবেশ করেছেন।

ইরাবতী। আমি প্রথমেই একথা ভেবেছিলাম।

বিদূষক। (এগিয়ে) দেবী, এঁর প্রিয়বন্ধু এই অশোকতরুকে বাঁ পায়ে আঘাত করা কি ঠিক হয়েছে?

উভয়ে। (সসম্ভ্রমে) এ কি রাজা!

বিদূষক। বকুলাবলিকা, তুমি সব জেনেশুনেও কেন এঁকে এই অবিনীত আচরণ থেকে নিবৃত্ত করলে না?

(মালবিকা ভয়ের অভিনয় করল)

নিপুণিকা। রাণী দেখুন, আর্য গৌতম কি আরম্ভ করেছে?

ইরাবতী। হতভাগা বামুনটা আর কি করবে?

বকুলাবলিকা। আর্য, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে। এ পরাধীন বলে এর অন্যথা করার সাধ্য নেই। মহারাজ প্রসন্ন হোন। (এই বলে মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকে প্রণাম করল)

রাজা। যদি তাই হয় তবে তোমার দোষ নেই। ভদ্রে ওঠ। (হাত ধরে তুললেন)

বিদূষক। ঠিক কথা, এ বিষয়ে রাণীর কথা মানা উচিত।

রাজা। (হেসে) কচি কিশলয়কোমল চরণে কঠিন পাদপস্কন্ধে আঘাত করে তোমার বামচরণে কষ্ট হয়নি ত সুন্দরী?

(মালবিকা লজ্জার অভিনয় করল)

ইরাবতী। (স্পর্ধার সঙ্গে) আহারে, ননীর মত কোমল আর্যপুত্রের হৃদয়।

মালবিকা। বকুলাবলিকা চলো, দেবীকে আমরা জানাই তাঁর আদেশ পালন করেছি।

বকুলাবলিকা। তাহলে রাজাকে বিদায় নিতে বল।

রাজা। ভদ্রে যাবে! কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা শোন।

বকুলাবলিকা। মন দিয়ে শোন। বলুন মহারাজ।

রাজা। এই মানুষটিতেও দীর্ঘদিন যাবৎ ধৈর্যের ফুল ধরছে না। অন্য কিছুতেই এর রুচি নেই। তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দোহদ পূরণ করো।

ইরাবতী। হ্যাঁ পূরণ করো, পূরণ করো। অশোকতরু শুধু ফুল ফোটায়, এ কিন্তু ফুল ফল দুইই ধরে।

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত হলো)

রাজা। (আড়ালে) বন্ধু, এখন কি করা যায় ?

বিদূষক। কি আর, পায়ের জোর।

মালবিকা ও বকুলাবলিকা। রাণী প্রসন্ন হোন। আমরা রাজার প্রণয় পাবার কে ? (উভয়ের প্রস্থান)

ইরাবতী। পুরুষেরা কি অবিশ্বস্ত ! আমি ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধ হরিণীর মতই তোমার কথাকে সত্যি ভেবে শঙ্কাশূন্যমনে এত সব জানতেই পারিনি।

বিদূষক। (জনান্তিকে) যা হোক কিছু একটা বলে দাও। হাতে নাতে ধরা পড়লেও চোর বলে থাকে, সিঁধকাটা সবেমাত্র শিখছি।

রাজা। সুন্দরী, মালবিকার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। তোমাদের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে একটু সময় কাটাচ্ছিলাম।

ইরাবতী। তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত ? আমি জানতাম না, আর্যপুত্র সময় কাটাবার জন্য এমন একটি ভোগ্যবস্তু হাতে পেয়েছেন। তা না হলে হতভাগিনী আমি এমন কখনই করতাম না।

বিদূষক। দেবী, আপনি তাঁর সৌজন্যের দোষ ধরবেন না। কার্য-গতিকে দেখা গেলে রাণীর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলাও যদি অপরাধ হয় তাহলে এবিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে।

ইরাবতী। এর নাম কথাবার্তা ? আমার তাতে কি আসে যায় ? (সরোষে প্রস্থান)

রাজা। (অনুসরণ করে) ওগো প্রসন্ন হও।

ইরাবতী। (রশনাজড়িত চরণে চলতে লাগলেন)

রাজা। সুন্দরী, প্রেমিকের প্রতি এই উদাসীনতা ঠিক নয়।

ইরাবতী। শঠ, তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী।

রাজা। প্রিয়ে, আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমাকে শঠ বলে নিন্দা করো সে ভাল। কিন্তু ওগো চণ্ডী, তোমার পায়ে পড়ে মেখলা নিয়ে ক্ষমা চাইলেও ক্রোধটুকু বিসর্জন দিও না।

ইরাবতী। এই হতভাগীও তোমারই মত। (মেখলা তুলে রাজাকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন)

রাজা। এই অশ্রুবর্ষিণী রণচণ্ডী ইরাবতী নিতম্ব থেকে খসে পড়া সোনার মেখলাদাম নিয়ে আমাকে সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন মেঘরাজি বিদ্যুৎঝলকে বিন্ধ্যপর্বতকে ঝলসে দিচ্ছে।

ইরাবতী। কী? আমাকে কেন বারবার অপরাধী করছ?

রাজা। হে কুঞ্চিতাকেশা সুন্দরী, আমি অপরাধ করেছি। কিন্তু আমার থেকে দণ্ড তুলে নিচ্ছ কেন? তুমি আমার কামনা বাড়িয়ে তুলছ, আবার এই সাজের প্রতি ক্রুদ্ধও হচ্ছ। (ইরাবতীর পায়ে পড়লেন)

ইরাবতী। এটা তোমার মালবিকার চরণ নয় যারা তোমার স্পর্শের কামনা পূরণ করবে। (নিপুণিকাসহ প্রস্থান)

বিদূষক। ওঠ, প্রসাদ লাভ করেছ।

রাজা। (উঠে ইরাবতীকে না দেখে) একি, প্রিয়া চলে গেছে?

বিদূষক। ভালই হয়েছে যে তিনি অবিনীতভাবে রাগ করে চলে গেছেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি পালাই যাতে তিনি মঙ্গলরাশির মত আবার ঘুরে বক্রীর দিকে না আসতে পারেন।

রাজা। আচ্ছা, প্রেমের কি বৈপরীত্য! প্রেয়সী মালবিকাতে আকৃষ্ট হৃদয়ে আমি ইরাবতীর প্রণিপাতকে উপেক্ষা করাকেও সেবা বলে মনে করছি। এইভাবেই কুপিত অথচ প্রণয়বতী ইরাবতীকে উপেক্ষা করতে পারব। (বন্ধুর সঙ্গে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

উৎকণ্ঠিত রাজা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) তার কথা শুনে প্রথমে আমার আশায় মুল সৃষ্টি হয়েছিল। চোখে দেখার পর তাতে আরক্ত কিশলয় দেখা দিল। পরে হস্তস্পর্শ করাতে রোমাঞ্চে ফুল ফুটেছিল। তাহলে কামনার তরু নিশ্চয় আমাকে একদিন ফলের রস গ্রহণ করাবে। (প্রকাশ্যে) সখা গৌতম।

প্রতিহারী। রাজার জয় হোক, গৌতম এখানে নেই।

রাজা। (স্বগত) তাই ত, তাকে মালবিকার খবর নিতে পাঠিয়েছি।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

রাজা। জয়সেনা, জেনে এস দেবী ধারিণী এখন কোথায় এবং পায়ের ব্যথা নিয়ে কিভাবে তিনি চিত্তবিনোদন করছেন?

প্রতিহারী। মহারাজের যেমন আদেশ! (প্রস্থান)

রাজা। বন্ধু, তোমার সখীর খবর কি?

বিদূষক। বিড়ালের হাতে পড়া পরভৃতিকা বা কোকিলের মত।

রাজা। (বিষণ্ণভাবে) কি রকম?

বিদূষক। পিঙ্গলাক্ষী ধারিণী দেবী সে বেচারীকে মাটির নিচে মৃত্যুমুখের মত সারভাণ্ডগৃহে আটকে রেখেছেন।

রাজা। আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরেই কি এরকম করেছে?

বিদূষক। হ্যাঁ।

রাজা। কে এমন শত্রু আছে যে দেবীকে রাগিয়ে দিয়েছে?

বিদূষক। শোন, পরিব্রাজিকা আমাকে বলেছেন, গতকাল দেবী ইরাবতী দেবীকে পায়ের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন।

রাজা। তারপর?

বিদূষক। তখন তাকে রাণী জিজ্ঞাসা করেন, প্রিয়জনকে দেখেছ

ত ? তিনি বলেন, তোমার শিষ্টাচার ঠিক হলো না। তুমি তো জান না যে প্রিয়জন এখন পরিজনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

রাজা। স্পষ্ট করে ভেঙ্গে না বললেও একথা মালবিকারই ইঙ্গিত দেয়।

বিদূষক। তখন তাঁর অনুরোধে তোমার আচরণের কথা সবই তিনি রাণীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাজা। আহা, রাণীর রাগ কি দীর্ঘস্থায়ী ? তারপর কি হলো বল।

বিদূষক। তারপর আর কি ? মালবিকা আর বকুলাবলিকা পায়ে শিকল নিয়ে দুই নাগকন্যার মত সূর্যকিরণশূন্য কারাকক্ষে পাতালবাস করছে।

রাজা। সত্যি বড় কষ্টের। মধুকণ্ঠী কোকিলবন্ধু এবং ভ্রমরী প্রফুল্ল সহকারবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ বৃষ্টিপাতের ফলে তারা কোটরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি ?

বিদূষক। কি করে হবে ? কারণ সারভাণ্ডগৃহের রক্ষিণী মাধবিকাকে রাণী নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মুদ্রাঙ্কিত আংটি না দেখে হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে যেন মুক্তি না দেয়।

রাজা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বন্ধু, এখন কি করা যায় ?

বিদূষক। উপায় একটা আছে।

রাজা। কি রকম ?

বিদূষক। (তাকিয়ে দেখে) আড়াল থেকে কেউ শুনে ফেলবে। তোমার কানে কানে বলি। (কানের কাছে মুখ নিয়ে) এই রকম।

রাজা। (আনন্দের সঙ্গে) ভালই ভেবেছ। সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করো।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, রাণীমা খোলা হাওয়ায় বসে আছেন। রক্ত-চন্দন নিয়ে পরিজনেরা তাঁর পাটি ধরে রেখেছে। ভগবতীর সঙ্গে

কথাবার্তা বলে বিশ্রাম করছেন তিনি।

রাজা। তাহলে তার কাছে আমাদের যাওয়ার এই হলো উপযুক্ত সময়।

বিদূষক। তুমি তবে যাও। আমিও দেবীকে দেখার জন্য হাতে কিছু একটা নিই।

রাজা। জয়সেনাকে জানিয়ে যেও কিন্তু।

বিদূষক। তাই হবে। (কানে কানে) এইরকম হবে। (জয়সেনাকে ডেকে প্রস্থান)

রাজা। জয়সেনা, রাণীর সেই প্রবাতশয়নের পথ বলে দাও।

প্রতিহারী। এই দিকে প্রভু।

(শায়িতা দেবী, পরিব্রাজিকা ও বিভিন্ন পরিচারিকা)

দেবী। ভগবতী, গল্পটি চমৎকার। তারপর ?

পরিব্রাজিকা। (তাকিয়ে দেখে) দেবী, এরপর আবার বলব। বিদিশায় রাজা স্বয়ং উপস্থিত।

দেবী। আর্যপুত্র ! (ওঠার চেষ্টা করলেন)

রাজা। থাক, থাক, ভদ্রতা করতে গিয়ে কষ্ট করতে হবে না। হে কলতোষীণী, নূপুরশূন্য, অনভ্যস্ত এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরণটি সোনার পাদপীঠে রেখে তাকে ও আমাকে কষ্ট দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

ধারিণী। আর্যপুত্রের জয় হোক।

পরিব্রাজিকা। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। (পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন) দেবী, তোমার যন্ত্রণা এখন সহ্যের মধ্যে এসেছে ত ?

ধারিণী। আমি এখন ভাল আছি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। বাঁচাও, বাঁচাও তুমি। আমাকে সাপে কামড়েছে।

রাজা। কী দুঃখের ব্যাপার ! কোথায় ঘুরছিলে তুমি ?

বিদূষক। দেবীকে দর্শন করতে প্রমোদবনে ফুল তুলতে গিয়েছিলাম।

দেবী। হায় হায়, আমিই ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয়ের কারণ হলাম।

বিদূষক। সেখানে অশোকগুচ্ছে ফুল তোলার জন্য হাত বাড়ালে কোটর থেকে যেন স্বয়ং মৃত্যু বেরিয়ে এসে আমাকে দংশন করল। এই যে দুটি দাঁতের চিহ্ন। (দেখাল)

পরিব্রাজিকা। দষ্ট অংশের ছেদনই এ বিষয়ে প্রথম করণীয়। এর তাই করা হোক। দষ্ট অংশের ছেদন অথবা দাহ অথবা রক্তমোচন—সাপদংশনমাত্রই প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই এই উপায়গুলি প্রয়োগ করতে হবে।

রাজা। এ ত রাজবৈদ্যের কাজ। জয়সেনা, ধ্রুবসিদ্ধিকে তাড়াতাড়ি ডাক।

প্রতিহারী। মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

বিদূষক। হায়, কালমৃত্যু আমাকে গ্রাস করল।

রাজা। ব্যস্ত হয়ো না। বিষহীন দংশনও ত অনেক সময় হয়।

বিদূষক। কেন কাতর হব না? আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। (বিষক্রিয়ার অভিনয় করল)

দেবী। এই বিকার অমঙ্গলসূচক দেখাচ্ছে। তোমরা সবাই ব্রাহ্মণকে ধর। (পরিজনেরা ব্যস্ত হয়ে বিদূষককে ধরল)

বিদূষক। ওহে ছোটবেলা থেকে আমি তোমার প্রিয় বন্ধু। সেই কথা মনে রেখে একটিমাত্র পুত্রের জননী আমার দেখাশোনা করো।

রাজা। ভয় পেও না। স্থির হও। বৈদ্য শীগগির তোমার চিকিৎসা করবেন।

জয়সেনার প্রবেশ

জয়সেনা। প্রভু, ধ্রুবসিদ্ধিকে আপনার আজ্ঞা জানালে তিনি বললেন, গৌতমকে নিয়ে এস।

রাজা। তাহলে তাকে লোকজনদের দিয়ে ধরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

জয়সেনা। তাই হবে।

বিদূষক। (দেবীর দিকে তাকিয়ে) দেবী, আমি হয়ত বাঁচব না, এঁকে অর্থাৎ রাজাকে সেবা করতে গিয়ে যদি আপনার কাছে অপরাধ করে

থাকি ত ক্ষমা করবেন।

দেবী। দীর্ঘায়ু হও।

জয়সেনার প্রবেশ

জয়সেনা। প্রভুর জয় হোক। ধ্রুবসিদ্ধি জানাচ্ছেন জলকুম্ভে বিষমোক্ষণ করার জন্য সর্পমুদ্রিত কোন বস্তু চাই। তা খুঁজে দেখা হোক।

দেবী। এই যে সর্পমুদ্রিত অঙ্গুরীয়ক। পরে আপন হাতে দিলেন তাকে। (আংটি দিলেন)

রাজা। জয়সেনা, কর্মসিদ্ধি হলে সংবাদটি নিয়ে এস।

জয়সেনা। প্রভুর যা আদেশ। (প্রস্থান)

পরিব্রাজিকা। আমার মন বলছে গৌতমের বিষ লাগেনি।

রাজা। তাই হোক।

জয়সেনার পুনঃপ্রবেশ

জয়সেনা। মহারাজের জয় হোক। বিষমোক্ষন করে গৌতম মুহূর্তের মধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

দেবী। ভাগ্য ভাল, আমি নিন্দা থেকে মুক্তি পেলাম।

প্রতিহারী। অমাত্য বাহতক সংবাদ পাঠিয়েছেন রাজকার্য বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। সুতরাং একবার দর্শনের অনুগ্রহ ইচ্ছা করি।

দেবী। আর্যপুত্র কার্যসিদ্ধির জন্য যান।

রাজা। এ স্থানে রোদ এসে পড়েছে। এখন এই ব্যথার জন্য শীতলতার প্রয়োজন। তাই শয্যাটি অন্যত্র নিয়ে যাও।

দেবী। মেয়েরা, আর্যপুত্রের কথা শোন। (পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গসহ প্রস্থান।)

রাজা। জয়সেনা, গোপন পথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চল।

প্রতিহারী। এই দিকে প্রভু।

রাজা। জয়সেনা, সত্যিই গৌতম তার কাজ শেষ করেছে ?

প্রতিহারী। হ্যাঁ।

রাজা। ইষ্টপ্রাপ্তির জয় একান্ত সঙ্গত পরিকল্পনার কথা জানা

সত্ত্বেও সিদ্ধির বিষয়ে সন্দিগ্ধ আমার দুর্বল চিত্ত আশঙ্কা করছে।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তোমার সব মদনকষ্ট সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা। জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজ করো।

প্রতিহারী। প্রভুর যেমন আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। বন্ধু, মাধবিকা বড় কুটিল। সেও কিছুই বলেনি ?

বিদূষক। রাণীর মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখার পরে কি করে কিছু বলবে ?

রাজা। মুদ্রা নিয়ে বলছি না। বন্দী দুজনকে কেন মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না ? রাণীর পরিচারিকাদের বাদ দিয়ে তোমাকে কেন বলা হলো ? —এই সব প্রশ্ন সে করতে পারত।

বিদূষক। সেকথা জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু আমি বোকা হলেও তখন আমার মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি এসে গিয়েছিল।

রাজা। বলো।

বিদূষক। আমি বললাম, জ্যোতিষীরা রাজাকে জানিয়েছেন, একটি নক্ষত্রের কুদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপরে, সকল বন্দীদের মুক্তি দিন।

রাজা। (সানন্দে) তারপর ?

বিদূষক। তাই শুনে সে ভাবছে রাণী ইরাবতীর মন রাখতে চেয়ে রাজা আমাকে এইরকম আদেশ করেছেন, সুতরাং আমাকে পাঠানোই সঙ্গত হয়েছে।

রাজা। (বিদূষককে আলিঙ্গন করে) সখা, তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস। সুহৃদজনের বুদ্ধিবলেই শুধু লক্ষ্যবিষয় লাভ হয়, তা নয় কার্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম কঠিন উপায় স্নেহবশেও পাওয়া যায়।

বিদূষক। তাড়াতাড়ি করো। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে সমুদ্রগৃহে বসিয়ে রেখে তোমার কাছে এসেছি।

রাজা। আমি তাকে মর্যাদা দেব। তুমি এগিয়ে যাও।

বিদূষক। এস। (পরিক্রমা করে) এই যে সমুদ্রগৃহ।

রাজা। (সশঙ্কিত হয়ে) বন্ধু, এই যে তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা ব্যস্তভাবে কুসুমচয়নে রত হয়ে এদিকেই আসছে। আমরা তাহলে এখানে দেওয়ালের আড়ালে যাই।

বিদূষক। চোরদের ও কামুকদের চন্দ্রিকা পরিহার করা উচিত। (দুজনে আড়ালে গেলেন)

রাজা। গৌতম, তোমার সখী কিভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন? এস, গবাক্ষপথে তাকে দেখি।

বিদূষক। তাই হবে। (উভয়ে দেখতে লাগলেন)

মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা। সখী, প্রভুকে প্রণাম করো।

রাজা। মনে হয় আমার প্রতিকৃতি দেখাচ্ছে।

মালবিকা। (সানন্দে) তোমাকে প্রণাম। (দ্বারপানে চেয়ে বিস্ময়ভাবে) সখী আমাকে প্রতারণা করছ।

রাজা। বন্ধু, এর আনন্দ এবং বিষাদ দেখে আমি প্রীত। সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে পদ্মফুলের যে অবস্থা হয় একমুহূর্তে সুন্দরীর মুখে সেই অবস্থা দেখা গেল।

বকুলাবলিকা। আচ্ছা, এই যে চিত্রাঙ্কিত প্রভু।

উভয়ে। (প্রণাম করে) প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা। সখী, সেদিন সামনাসামনি প্রভুর রূপ দেখে তেমন তৃপ্তি পাইনি যেমনটি আজ হলো। আজ আমি মন দিয়ে চিত্রে প্রভুকে দেখলাম।

বিদূষক। শুনলে ত? ইনি বলছেন, ছবিতে যেমন দেখতে আসলে তোমাকে তেমন দেখায় না। রত্নপূর্ণ পেটিকার মত তুমি বৃথাই যৌবনের গর্ব করো।

রাজা। বন্ধু, কৌতূহল থাকলেও স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হয়। দেখ, আয়তলোচনারা প্রথম মিলনে প্রিয়তমের রূপ পরিপূর্ণভাবে দেখতে ইচ্ছা করলেও তারা পূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে পারে না।

মালবিকা। সখী, (সামান্য মুখ ফিরিয়ে) ইনি কে যাকে প্রভু

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন ?

বকুলাবলিকা। পাশে আছেন ইরাবতী।

মালবিকা। সখী, প্রভুর সৌজন্য নেই মনে হচ্ছে, কারণ ইনি অন্য সব রাণীকে ছেড়ে একজনের মুখপানে এভাবে তাকিয়ে আছেন।

বকুলাবলিকা। (স্বগত) চিত্রিত প্রভুকে সত্যি ভেবে ঈর্ষা করছে। ঠিক আছে এর সঙ্গে একটু খেলা করা যাক। (প্রকাশ্যে) সখী, ইনি বড় প্রভুর প্রিয়।

মালবিকা। তাহলে আমি কেন এত কষ্ট করছি ? (ঈর্ষাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল)

রাজা। সখা দেখ, ভ্রূভঙ্গে তিলক ভিন্ন, অধরোষ্ঠ স্ফুরিত। অসূয়া নিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে এ অপরাধী প্রেমিকের প্রতি ললিত অভিনয়ের শিক্ষাই দেখিয়েছে যেন।

বিদূষক। অনুনয় বিনয় করার জন্য প্রস্তুত হও।

মালবিকা। আর্য গৌতমও এখানে এঁকেই সেবা করছেন। (পুনরায় অন্যস্থানে যেতে উদ্যত)

বকুলাবলিকা। (মালবিকাকে বাধা দিয়ে) এখন তুমি নিশ্চয়ই রাগ করনি।

মালবিকা। যদি মনে করো আমি অনেকক্ষণ কুপিত হয়েছি তবে এই ক্রোধ সংবরণ করছি।

রাজা। (সামনে এসে) অয়ি কৃষ্ণনয়নে, চিত্রে অঙ্কিত আমার ব্যবহারে তুমি কেন কুপিত হচ্ছ ? সত্যি বলছি, আমি তোমার এখন অনন্যসাধারণ দাস।

বকুলাবলিকা। প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা। আমি কি চিত্রে অঙ্কিত প্রভুর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেছি ? (লজ্জিত কৃতাঞ্জলি হলো)

(রাজার কামদুর্বলতা প্রকাশ)

বিদূষক। তুমি হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেলে কেন ?

রাজা। তোমার সখীর অবিশ্বাস্যতার জন্য।

বিদূষক। এঁর প্রতিও তোমার অবিশ্বাস।

রাজা। শোন, তোমার সখী স্বপ্নের মাঝে দৃষ্টিপথে এসেও মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়। দুই বাহুর মধ্যে ধরা দিয়েও দ্রুত অন্যত্র চলে যায়। বন্ধু, মদনযন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে এইরকম মিলনের মায়া দেখলে এর প্রতি আমার মন কিভাবে বিশ্বাস রাখবে?

বকুলাবলিকা। সখী, প্রভুকে নানাভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। এবার নিজে বিশ্বাস অর্জন করো।

মালবিকা। আমার ভাগ্য মন্দ বলে প্রভুর সঙ্গে আমার স্বপ্নে মিলনও অসম্ভব ছিল।

বকুলাবলিকা। প্রভু, একবার উত্তর দিন।

রাজা। উত্তর দেবার কি আছে? পঞ্চবাণের অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি নিজেকেই ত তোমার সখীর কাছে অর্পণ করেছি। আমাকে সেবা করতে হবে না, আমিই তাকে গোপনে সেবা করতে চাই।

বকুলাবলিকা। আমরা অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক। (পরিক্রমা করে) বকুলাবলিকা, এই বালাশোকের পল্লবগুলোকে একটি হরিণ খেতে চেষ্টা করছে। এস, আমরা তাকে নিবৃত্ত করি।

বকুলাবলিকা। ঠিক আছে। (প্রস্থান)

রাজা। বন্ধু, এইভাবে এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের রক্ষা করা উচিত।

বিদূষক। গৌতমকেও কি সেকথা বলতে হবে?

বকুলাবলিকা। আর্য গৌতম, আমি আড়ালে থাকি, আপনি দ্বার রক্ষা করুন।

বিদূষক। ঠিক কথা। (বকুলাবলিকার প্রস্থান)

বিদূষক। তাহলে এই স্ফটিক শিলা দ্বারা বাঁধানো চত্বরে বসি। আহা, এই বিশেষ শিলার স্পর্শ কি সুখকর! (নিদ্রিত)

(মালবিকার সভয়ে অবস্থান)

রাজা। সুন্দরী, মিলনের আশঙ্কা ত্যাগ করো। দীর্ঘকাল তোমার

প্রণয়ে উন্মুখ সহকারতরুসদৃশ আমার প্রতি অতিমুক্তলতার মত শোভিত হও।

মালবিকা। দেবীর ভয়ে নিজের পছন্দমত কাজ করতে পারছি না। আমি পরাধীনা।

রাজা। ওগো ভয় নাই।

মালবিকা। (ব্যঙ্গাত্মক সুরে) প্রভু যে ভয় নাই তা ত আমি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দেখেছি।

রাজা। বিম্বোষ্ঠী, নানারকমের কুলব্রত হলো দাক্ষিণ্য। আয়তনয়না, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই আবদ্ধ। সুতরাং বহুদিন ধরে তোমাতে অনুরক্ত এই মানুষটিকে অনুগ্রহ করো।

(আলিঙ্গন ও মালবিকার পরিহারের চেষ্টা)

রাজা। (স্বগত) যুবতী অঙ্গনাদের কামকলার ক্রিয়া সত্যিই বড় রমণীয়। কম্পিত দেহে সে আমার মেখলা উন্মোচনে ব্যস্ত হাতের আঙ্গুলগুলিকে রুদ্ধ করছে। জোর করে আলিঙ্গন করলে নিজের দুটি হাত দিয়ে স্তনদ্বয়কে আবৃত করছে। মুখটি তুলে তার অধরসুধা পান করতে গেলে সুন্দর পক্ষ্মবিশিষ্ট চোখ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই ভাবে আমাকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও আমার অভিলাষপূরণের সুখই দান করছে।

ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ

ইরাবতী। হ্যাঁরে নিপুণিকা, চন্দ্রিকা সত্যি তোকে বলেছে যে সমুদ্রগৃহের অলিন্দে আর্য গৌতমকে একাকী শুয়ে থাকতে দেখা গেছে?

নিপুণিকা। না বললে আপনাকে বলব কেন?

ইরাবতী। তাহলে আর্যপুত্রের প্রিয়বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করতে সেইখানেই যাব।

নিপুণিকা। দেবী যেন আরো কি বলতে চান?

ইরাবতী। চিত্রাঙ্কিত আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতেও যাব।

নিপুণিকা। তাহলে এখন প্রভুকেই কেন প্রসন্ন করছেন না?

ইরাবতী। বোকা মেয়ে, যেমন চিত্রে অর্পিত তেমনি আর্যপুত্রের

হৃদয় অন্যে অর্পিত। নষ্ট সৌজন্যের রক্ষার জন্যই এই ব্যবহার।

নিপুণিকা। এই দিকে, এই দিকে আসুন ঠাকরুণ। (উভয়ের পরিক্রমা)

চেটীর প্রবেশ

চেটী। ঠাকরুণের জয় হোক। রাণীমা বললেন, এখন আমার ঈর্ষা নয়। তোমার মান রাখতে সখীর সঙ্গে মালবিকাকে শৃংখলে আবদ্ধ করেছি। তোমার অনুমতি পেলে আর্যপুত্রের মনোমত কিছু করি। তোমার যা ইচ্ছা জানাও।

ইরাবতী। নাগরিকা, রাণীকে জানাও, তাঁকে নির্দেশ দেবার আমি কে? পরিজনকে শৃঙখলিত করে আমাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর কাকে প্রসন্ন করে আমার শ্রীবৃদ্ধি হবে?

চেটী। তাই জানাব। (প্রস্থান)

নিপুণিকা। (এগিয়ে গিয়ে) ঠাকরুণ, এই যে সমুদ্রগৃহের দরজায় আর্য গৌতম ষাঁড়ের মত বসে বসেই ঘুমুচ্ছেন।

ইরাবতী। কি সর্বনাশ! আশা করি বিষের বিকার আর নেই।

নিপুণিকা। মুখের ভাব ত প্রসন্নই দেখছি। ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেছেন। অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নেই।

বিদূষক। (ঘুমের ঘোরে কথা বলল) দেবী, মালবিকা—

নিপুণিকা। শুনলেন ত ঠাকরুণ। এই হতভাগ্য ঠকটা যে কার ছেলে! সব সময় স্বস্তিবাচন পড়ে এখান থেকে মিষ্টি খেয়ে পেট পুরে এখন ঘুমের ঘোরে মালবিকাকে ডাকা হচ্ছে।

বিদূষক। ইরাবতীকে হারিয়ে দাও।

নিপুণিকা। এ কি কাণ্ড! সাপের ভয়ে ভীত এই বামুনটাকে আমি সাপের মত কুটিল বাঁকাচোরা এই লাঠি দিয়ে থামের আড়ালে থেকে আঘাত করি।

ইরাবতী। এই কৃতঘ্নের এই শাস্তিই প্রাপ্য।

(নিপুণিকা বিদূষককে লাঠি দিয়ে আঘাত করল)

বিদূষক। (হঠাৎ জেগে উঠে) ছি ছি, ওহে বন্ধু, আমার উপর সাপ এসে পড়েছে।

রাজা। (হঠাৎ এগিয়ে এসে) ভয় পেও না, ভয় পেও না।

মালবিকা। (রাজার অনুসরণ করে) প্রভু, হঠাৎ বেরিয়ে যাবেন না, সাপের কথা বলছেন ইনি।

ইরাবতী। হায় হায়! প্রভু এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিদূষক। (জোর হেসে) ওঃ, এটা একটা লাঠি, আমি ভেবেছিলাম আমি যে কেতকীকণ্টককে সর্পের মত দংশন করেছিলাম, তার ফল ফলেছে।

বকুলাবলিকার প্রবেশ

বকুলাবলিকা। না না প্রভু, যাবেন না। এখানে কুটিলগতি সাপের মত কি দেখা যাচ্ছে।

ইরাবতী। (রাজার সামনে এসে) মিলনের মনোরথ নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়েছে ত?

(সকলে ইরাবতীকে দেখে সন্ত্রস্ত)

রাজা। প্রিয়ে, তোমার এই সৌজন্য অপূর্ব।

ইরাবতী। বকুলাবলিকা, ভাল যে তোর দূতীর প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে।

বকুলাবলিকা। ঠাকরুণ, প্রসন্ন হোন। ব্যাঙের ডাক শুনে ইন্দ্র তাঁর প্রেয়সী পৃথিবীকে জলদানে বিরত বা বিস্মৃত হন না।

বিদূষক। তা নয়, আপনাকে দেখামাত্র ইনি সেদিনের প্রণিপাতের পরেও অবমাননার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দেবী ত আজও প্রসন্ন হচ্ছেন না।

ইরাবতী। রাগ করেই বা এখন কি করব?

রাজা। অস্থানে রাগ প্রকাশ করা তোমার উপযুক্ত কাজ নয়। কারণ কবে বিনা কারণে তোমার মুখ ক্ষণিকের জন্য কুপিত হয়েছে? পূর্ণিমা ছাড়া রাতের চন্দ্রমণ্ডল কি রাহুগ্রস্ত হয়?

ইরাবতী। আর্যপুত্র ঠিকই বলেছেন, অস্থানে। আমার সৌভাগ্য যখন অন্যের হস্তগত হয়েছে তখন রাগ করলে হাস্যাস্পদ হব।

রাজা। তুমি কিন্তু কথাটা অন্যভাবে নিচ্ছ। আমি কিন্তু রাগের মত

কিছু দেখছি না। কারণ অপরাধ করলেও উৎসবের দিন পরিজনদের বন্দী করে রাখা উচিত নয়। ফলে মুক্তি পেয়ে এরা দুজনে আমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

ইরাবতী। নিপুণিকা, যা দেবীকে বল—আজ আপনার পক্ষিপাতিত্ব দেখা গেছে।

নিপুণিকা। তাই হবে। (প্রস্থান)

বিদূষক। (স্বগত) উঃ, কি অনর্থই না এসে পড়ল। বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত এসে চিলের মুখে পড়ল।

নিপুণিকার প্রবেশ

নিপুণিকা। (আড়ালে) ঠাকরুণ, হঠাৎ মালবিকার সঙ্গে দেখা হতে সে বলল ব্যাপারটা এইরকমভাবে হয়েছে। (কানে কানে বলল)

ইরাবতী। বুঝেছি, সত্যি এ ব্যাপারে বামুনটিই সব কিছু করেছে। কামতন্ত্রের মন্ত্রীর কুটিল নীতি।

বিদূষক। দেবী, যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে গায়ত্রীই ভুলে যেতাম।

রাজা। (স্বগত) এখন এই সংকট থেকে কি করে মুক্ত করি নিজেকে ?

জয়সেনার প্রবেশ

জয়সেনা। (উত্তেজিতভাবে) প্রভু, কুমারী বসুলক্ষ্মী বন্দুকের পিছনে ছুটতে ছুটতে একটি পিঙ্গল বানর দেখে ভয় পেয়ে রাণীমার কোলে শুয়েও বায়ুতাড়িত কিশলয়ের মত কাঁপছেন, কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন না।

রাজা। ছেলেমানুষের দুর্বলতা।

ইরাবতী। (ব্যস্তভাবে) আর্যপুত্র, সত্বর তাকে আশ্বস্ত করুন। তার সন্ত্রাসজনিত বিকার যেন বৃদ্ধি না পায়।

রাজা। আমি তাকে আশ্বস্ত করতে যাচ্ছি।

বিদূষক। (স্বগত) ওরে পিঙ্গল বানর, সাধু, সাধু। তোর দ্বারাই এই সংকট থেকে রক্ষা পেলাম আমরা। (মালবিকা ও বকুলাবলিকা

ছাড়া সকলের প্রস্থান)

মালবিকা। সখী, দেবীর কথা ভেবে আমার বুক কাঁপছে। জানি না, এর পরেও কি দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য, আশ্চর্য! পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হবার আগেই অশোকতরু দোহদের মুকুলে আচ্ছন্ন হয়েছে। যাই হোক, রাণীমাকে জানাইগে।

বকুলাবলিকা। (শুনে আনন্দে) সখী, আশ্বস্ত হও। রাণীমা সত্যপ্রতিজ্ঞ।

মালবিকা। তাহলে প্রমোদবনের রক্ষিণীর আড়ালে থাকি।

বকুলাবলিকা। তাই হোক। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

উদ্যানপালিকার প্রবেশ

উদ্যানপালিকা। তপনীয় অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করে দিয়েছি। আমি আগের কর্তব্যকর্ম শেষ করেছি, দেবীকে সেকথা জানাই। মালবিকা সত্যিই অদৃষ্টের অনুকম্পার যোগ্য। তার প্রতি ক্রুদ্ধ দেবী অশোককুসুমের বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন। দেবী এখন কোথায় থাকতে পারেন? (চারদিক দেখে) এই ত রাণীমার পরিজনদের মধ্যে কুঁজো সারসক গালার শীলমোহর করা পেটিকা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। একেই জিজ্ঞাসা করি।

কুব্জ সারসকের প্রবেশ

উদ্যানপালিকা। (এগিয়ে এসে) সারসক, কোথায় যাচ্ছ?

সারসক। মধুকরিকা, বিদ্বান ব্রাহ্মণদের নিয়মিত দক্ষিণা দেওয়া হয়। আর্যপুরোহিতের হাতে দিতে চলেছি।

মধুকরিকা। কেন?

সারসক। যেদিন থেকে সেনাপতি রাজপুত্র বসুমিত্রকে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার ভার দিয়েছেন সেইদিন থেকে পুত্রের আয়ুষ্কামনায় যোগ্য ব্রাহ্মণকে অষ্টাদশ সুবর্ণমুদ্রা দান করেন।

মধুকরিকা। এখন রাণীমা কোথায়? কি করছেন?

সারসক। মদনগৃহে আসনে বসে বিদর্ভদেশ থেকে ভাই বীরসেনের পাঠানো চিঠি লেখকদের মুখ থেকে শুনছেন।

মধুকরিকা। বিদর্ভরাজের কি সংবাদ?

সারসক। বীরসেন প্রমুখের হাতে রাজার বিজয়সেনার কাছে বিদর্ভরাজ পরাজিত হয়েছেন। রাজার আত্মীয় মাধবসেনও মুক্ত হয়েছেন। তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দিয়ে ও শিল্পকর্মে নিপুণা বহু পরিচারিকা উপহার দিয়ে রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আগামীকাল তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করবেন।

মধুকরিকা। যাও, নিজের কাজ করো। আমি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। অশোকতরুর সংকারে দেবী ব্যস্ত হয়ে আদেশ করেছেন, আর্যপুত্রকে নিবেদন করো, আমি আর্যপুত্রের সঙ্গে কুসুম-শোভা দেখতে চাই। যাই বিচারসভায় গিয়ে অপেক্ষা করি।

(নেপথ্যে দুজন বৈতালিক)

সৌভাগ্যক্রমে রাজা তাঁর সৈন্যদের দ্বারা শত্রুর মাথায় পদাঘাত করেছেন।

প্রথম বৈতালিক। কোকিলের কলকূজনে আনন্দ করে আপনি অঙ্গযুক্ত অনঙ্গের মত বিদিশার তীরে উদ্যানে উদ্যানে বসন্ত উদ্‌যাপন করছেন। হে তরঙ্গ, আপনি প্রবল বরদানদীর তটস্থ বৃক্ষগুলি আপনার বিজয়হস্তীদের বন্ধনস্তম্ভ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আপনার শত্রুও অবনত হয়েছে।

দ্বিতীয়। হে দেবোপম, ক্রথকৈশিক বা বিদর্ভদেশের ব্যাপারে আপনাদের উভয়ের কীর্তির বিষয়ে কবিরা বীরপ্রীতিবশতঃ পদ রচনা করেছেন—আপনি চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বিদর্ভ রাজের শ্রীসম্পদ হরণ করেছেন, আর যুগদণ্ডের মত চার বাহুতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন।

প্রতিহারী। এই যে জয়শব্দের লক্ষ্য রাজা এদিকেই আসছেন। আমিও তবে সামনে থেকে একটু সরে এসে এই অলিন্দের তোরণে দাঁড়াই। (একপাশে দাঁড়াল)

বয়স্যসহ রাজার প্রবেশ

রাজা। যার সঙ্গে মিলন অতি দুর্লভ সেই প্রিয়ার কথা ভেবে এবং সৈন্যবলে বিদর্ভরাজ পরাজিত হয়েছেন শুনে আমার হৃদয় রৌদ্রতপ্ত দিনে বৃষ্টিধারায় সিক্ত পদ্মের মত দুঃখ ও সুখ দুই-ই অনুভব করছে।

বিদূষক। আমি যেমনটি দেখছি তাতে তুমি সুখীই হবে।

রাজা। কেমন করে ?

বিদূষক। আজ দেবী পণ্ডিত কৌশিকীকে বলেছেন, ভগবতী, আপনি যে প্রসাধনকলার কার্য করেন, আজ তা মালবিকার অঙ্গে বিবাহ-সজ্জায় প্রদর্শন করুন। তিনিও বিশেষভাবে মালবিকাকে অলংকৃত করেছেন। তিনি হয়ত আপনার মনোরথও পূরণ করবেন।

রাজা। বন্ধু, আমার বিষয়ে ধারিণীর ঈর্ষাশূন্য পূর্বের আচরণের ফলে এ হয়ত সম্ভব।

প্রতিহারী। (কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। দেবী নিবেদন করেছেন, তপনীয় অশোকতরুর কুসুমসম্ভার দর্শনে আমার উদ্যোগ সফল করো।

রাজা। দেবী কি সেখানেই আছেন ?

প্রতিহারী। হ্যাঁ। মর্যাদা অনুযায়ী সম্মানে সুখী অন্তঃপুর ছেড়ে দেবী মালবিকাকে সামনে রেখে সব পরিজনদের নিয়ে প্রভুর অপেক্ষা করছেন।

রাজা। (সানন্দে বিদূষককে দেখে) জয়সেনা, এগিয়ে যাও।

প্রতিহারী। এইদিকে, এইদিকে প্রভু।

বিদূষক। (দেখে) বন্ধু, প্রমোদবনে বসন্ত যেন যৌবন সামান্যই অতিক্রম করেছে।

রাজা। তুমি ঠিকই বলেছ। সামনে কুরবক ফুল ছড়ানো, সহকার-তরুতে ফলসম্ভারের জল বিস্তীর্ণ, বসন্তঋতুর প্রায় পরিণত যৌবন

চিত্তকে উৎসুক করেছে।

বিদূষক। ওহে, এই যে পুষ্পস্তবকের ভারে অবনত তপনীয় অশোকতরু। তুমি চেয়ে দেখ।

রাজা। যুক্তিপূর্ণভাবেই এর কুসুমপ্রকাশে বিলম্ব হয়েছিল। এখন কেমন অনন্যসাধারণ শোভা হয়েছে। দেখ, মনে হচ্ছে এর দোহদ পূরণ করাতে অন্য সমস্ত অশোকতরুর পুষ্পরাশি, যারা প্রথমে বসন্তের সূচনা করেছিল, সব এসে একেই আশ্রয় করেছিল।

বিদূষক। ওহে থাম, আমরা কাছে এলেও ধারিণী মালবিকাকে তাঁর পাশে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাজা। (সানন্দে) বন্ধু দেখ, আমাকে দেখে দেবী প্রিয়াকে নিয়ে বিনয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, যেন বসুমতী রাজশ্রীকে নিয়ে উঠে আসছেন, শুধু তাঁর রাজশ্রীর হাতে পদ্মটি নেই।

ধারিণী, পরিব্রাজিকা, মালবিকা এবং পরিজনদের প্রবেশ

মালবিকা। (স্বগত) বিয়ের অলঙ্কারের কারণ আমি জানি। তবু পদ্মপাতার উপরে জলের মত আমার বুক কাঁপছে। আবার আমার বাঁ চোখটিও বারবার স্ফুরিত হচ্ছে।

বিদূষক। ওহে বন্ধু, বিয়ের সাজে মালবিকাদেবীকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাজা। একে দেখছি প্রণতিলম্বিত দুকূলবাসে এবং বহু অলঙ্কারে সজ্জিত দেখে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রমাসের নক্ষত্র শোভিত হিমযুক্ত রাত্রি যখন জ্যোৎস্না সবেমাত্র দেখা দিয়েছে।

দেবী। (এগিয়ে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

বিদূষক। দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

পরিব্রাজিকা। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। ভগবতী, অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা। আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক।

দেবী। (সস্মিত) আমরা এই অশোকতরুটিকে তরুণীজন-পরিবৃত তোমার সংকেতগৃহ হিসাবে স্থির করেছি।

বিদূষক। ওহে তোমাকে সেবা করা হচ্ছে।

রাজা। (সলজ্জভাবে অশোকতরু পরিক্রমা করতে লাগলেন) এই অশোকতরু দেবীর এরকম সৎকারের যোগ্য ছিল তা নয়, তবু সে প্রথমে বসন্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা ও বিলম্ব করার পর এখন তোমারই প্রয়াসের সমাদর করে পুষ্পসজ্জা করেছে।

বিদূষক। ওহে তুমি শান্তভাবে এই যৌবনবতীকে দেখ।

দেবী। কাকে?

বিদূষক। তপনীয় অশোকতরুর কুসুমশোভাকে। (সকলের উপবেশন)

রাজা। (মালবিকাকে স্বগত) কাছে থেকেও বিচ্ছেদ বড় কষ্টের। আমি যেন এক চক্রবাক, প্রিয়া আমার সহচর চক্রবাকী আর আমাদের সম্পর্ককে অনুমতি না দেওয়ায় ধারিণী যেন রজনী।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। প্রভুর জয় হোক। অমাত্য নিবেদন করেছেন, বিদর্ভ-দেশের উপঢৌকনের মধ্যে দুটি শিল্পনিপুণা কন্যা ছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকার জন্য তাদের আনা হয়নি। এখন আনা সম্ভব। সুতরাং প্রভু আদেশ দিতে পারেন।

রাজা। তাদের নিয়ে এস।

কঞ্চুকী। প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান ও তাদের নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) এই দিকে দেবী।

প্রথমা। (জনান্তিকে) সখী মদনিকা, আগে না দেখলেও এই রাজবাড়িতে প্রবেশ করে আমার ভালই লাগছে।

দ্বিতীয়া। জ্যোৎস্নিকা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। প্রবাদ আছে, হৃদয়ের অবস্থাই ভাবী সুখ ও দুঃখের কথা জানিয়ে দেয়।

প্রথমা। তা এখন সত্য হোক।

কঞ্চুকী। এই যে দেবীর সঙ্গে রাজা রয়েছেন। তোমরা এগিয়ে যাও। (তারা এগিয়ে গেল)

(মালবিকা ও পরিব্রাজিকা দুই কন্যাকে দেখে পরস্পর মুখপানে তাকাতে লাগল)

উভয়ে। (প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক। মহারাণীর জয় হোক। (রাজার আদেশ পেয়ে উপবেশন)

রাজা। তোমরা কোন্ কলাবিদ্যা শিক্ষা করেছ ?

উভয়ে। প্রভু, আমরা সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ।

রাজা। দেবী, এদের একজনকে গ্রহণ করো।

দেবী। মালবিকা, এইদিকে দেখ, এদের মধ্যে কাকে তোমায় সঙ্গীতের সহকারিণী হিসাবে পছন্দ ?

উভয়ে। (মালবিকাকে দেখে) একি, রাজকুমারী! (প্রণাম করে) জয় হোক। জয় হোক রাজকুমারীর। (অশ্রুবিসর্জন)

(সকলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল)

রাজা। তোমরা কে ? ইনিই বা কে ?

উভয়ে। প্রভু, ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা। সে কিরকম ?

উভয়ে। শুনুন রাজন, প্রভুর বিজনসেনা বিদর্ভরাজকে বশীভূত করে যাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, ইনি সেই মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী, এঁর নাম মালবিকা।

দেবী। কি! ইনি রাজপুত্রী? আমি চন্দনকে পাদুকা করে দূষিত করেছি।

রাজা। কিন্তু কি করে ইনি এই অবস্থায় এলেন ?

মালবিকা। (দীর্ঘশ্বাস, স্বগত) অদৃষ্টবশে।

দ্বিতীয়া। প্রভু শুনুন, আমাদের রাজকুমার মাধবসেন জ্ঞাতিদের অধীন হয়ে পড়লে তাঁর অমাত্য আর্য সুমতি আমাদের মত পরিজনদের ত্যাগ করে গোপনে এঁকে নিয়ে আসেন।

রাজা। একথা আমি পূর্বেই শুনেছি। তারপর ?

দ্বিতীয়া। এই পর্যন্তই। তারপর আর আমরা জানি না।

পরিব্রাজিকা। পরের কথা হতভাগিনী আমি বলছি।

উভয়ে। রাজকুমারী আর্য কৌশিকীর মত কণ্ঠস্বর।

মালবিকা। তিনিই ত।

উভয়ে। সন্ন্যাসীবেশিনী আর্যা কৌশিকীকে চেনার উপায় নেই। ভগবতী, প্রণাম হই।

পরিব্রাজিকা। তোমাদের মঙ্গল হোক।

রাজা। একি! ভগবতী এদের চেনেন?

পরিব্রাজিকা। হ্যাঁ, চিনি।

বিদূষক। তাহলে ভগবতী এই বৃত্তান্তের অবশিষ্টটুকু বলুন।

পরিব্রাজিকা। শুনুন তাহলে, মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা। বুঝলাম। তারপর?

পরিব্রাজিকা। আমার ভাই সুমতি একে ও আমাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছায় বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পথ চলতে থাকেন।

রাজা। তারপর?

পরিব্রাজিকা। কিছুদূর যাওয়ার পর বণিকেরা এক বনের প্রান্তে বিশ্রাম করতে থাকেন।

রাজা। তারপর?

পরিব্রাজিকা। তারপর হঠাৎ একদল শত্রুসৈন্য আমাদের পথ অবরোধ করে উপস্থিত হয় সেখানে। তারা দেখতে এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে তাদের দিকে তাকানোই যায় না। তাদের দুই বাহুর মধ্যে বিশাল তূণীর, তার মধ্যে ছিল সুতীক্ষ্ম বাণ, তাদের পুঙ্খরূপী ময়ূরপুচ্ছ কান পর্যন্ত যেন কলাপ মেলে ছিল। তাদের হাতে ছিল ধনুক। তারা প্রচণ্ড গর্জন করছিল।

(মালবিকা ভীত হয়ে উঠল)

বিদূষক। দেবী, ভয় পাবেন না, ভগবতী অতীতের কথা বলছেন।

পরিব্রাজিকা। তারপর বণিকযোদ্ধারা অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধে পরাজিত হলো দস্যুদের হাতে।

রাজা। এরপর শোনা সত্যিই দুঃখজনক।

পরিব্রাজিকা। তখন আমার ভাই শত্রুহাতে অত্যাচারের ভয়ে ভীত এই মালবিকাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রভুভক্তির বশে নিজের প্রিয় প্রাণ দিয়ে প্রভুর ঋণ শোধ করল।

প্রথমা। হায়, সুমতি মৃত!

দ্বিতীয়া। সেইজন্যই রাজকুমারীর এই দশা হয়েছে।

(পরিব্রাজিকা অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল)

রাজা। শরীরধারীদের এই হলো অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যিনি প্রভুর ঋণ এইভাবে শোধ করেছেন তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। তারপর?

পরিব্রাজিকা। তারপর আমি মূর্ছা যাই। পরে জ্ঞান ফিরে এলে আর দেখতে পেলাম না।

রাজা। আপনি বড় কষ্ট পেয়েছেন।

পরিব্রাজিকা। তারপর ভাইএর দেহে অগ্নিসংযোগ করে আমার বৈধব্যদুঃখ আবার নতুন করে ভোগ করে আপনার দেশে এসে আমি এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করেছি।

রাজা। সজ্জনদের এই পথই উপযুক্ত। তারপর?

পরিব্রাজিকা। তারপর এও বনচরদের হাত থেকে বীরসেনের কাছে এবং পরে বীরসেনের কাছ থেকে দেবীর কাছে এসেছে। দেবীর গৃহে প্রবেশ করে আমি একে দেখতে পেলাম। এখানেই গল্প শেষ।

মালবিকা। (স্বগত) এখন রাজা কি বলবেন জানি না।

রাজা। আহা, বিপদ মানুষের কি অপমানই না করে। কেননা দেবীপদযোগ্যা এঁকে দাসীভাবে গ্রহণ করে রেশমী বস্ত্রকে স্নানের বস্ত্র-রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

দেবী। ভগবতী, মালবিকা অভিজাত কুলোদ্ভবা একথা প্রকাশ না করে আপনি ভাল করেননি।

পরিব্রাজিকা। কারণ ছিল বলেই এ বিষয়ে গোপনতা অবলম্বন করেছিলাম।

দেবী। কি সেই কারণ ?

রাজা। যদি বলার মত হয় ত বলুন।

পরিব্রাজিকা। শুনুন। এর পিতা জীবিত থাকাকালীন বিদেশাগত সিদ্ধপুরুষ এক সাধু আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, একবছর দাসী-রূপে থাকার পর এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে। সুতরাং তোমার পদসেবা করে ওর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে চলেছে দেখে কালপ্রতীক্ষা করে আমি ভালই করেছি।

রাজা। প্রতীক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

কঞ্চুকী। প্রভু, কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছে। অমাত্য জানিয়েছেন, বিদর্ভ সম্বন্ধে যা করণীয় তা আমরা স্থির করেছি। এখন আমরা মহারাজের কি অভিপ্রায় তা জানতে চাই।

রাজা। মৌদ্‌গল্য, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভাইকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাঁরা দুজনে বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে বিভক্ত হয়ে রাত্রিদিনের শীতল উষ্ণ কিরণের মত শাসন করবেন।

কঞ্চুকী। প্রভু, এই কথাই অমাত্য পরিষদে জানাই।

রাজা। (অঙ্গুলিনির্দেশে অনুমোদন করলেন)

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

প্রথমা। (জনান্তিকে) রাজকুমারী, সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার অর্ধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাবেন।

মালবিকা। প্রাণসংশয় থেকে মুক্ত হয়েছে এটাই যথেষ্ট।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। প্রভুর জয় হোক। প্রভু, অমাত্য নিবেদন করেছেন প্রভুর বুদ্ধি শুভ। মন্ত্রীপরিষদেরও ঐ একই মত। কারণ রথের দুটি ঘোড়া যেমন একই সঙ্গে লাগাম টেনে রথীর ইচ্ছানুসারে চলে তেমনি এই দুই রাজাও পৃথকভাবে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করে পরস্পর নিয়ন্ত্রণে অবস্থান করবে এবং আপনারই অধীন থাকবে।

রাজা। তাহলে মন্ত্রীপরিষদকে বলো, সেনাপতি বীরসেনকে এরকম ব্যবস্থা করতে লেখা হোক।

কঞ্চুকী। প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান ও উপহারসহ পাত্র নিয়ে পুনঃপ্রবেশ) প্রভুর আদেশ পালিত হয়েছে। এই যে সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে উপহারসহ পাত্রটি এসেছে। প্রভু এটি দেখুন।

(রাজা উঠে উপহার নিয়ে তা পরিজনদের দিয়ে খুললেন)

দেবী। (স্বগত) আমরা এই বিষয়েই উন্মুখ হয়ে আছি। গুরুজনদের কুশলসংবাদ শোনার পর আমি বসুমিত্রের সংবাদ শুনব। সেনাপতি আমার পুত্রকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন।

রাজা। (বসে পড়তে লাগলেন) স্বস্তি। যজ্ঞগৃহ হতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশাস্থিত দীর্ঘায়ু পুত্র অগ্নিমিত্রকে আলিঙ্গন করে নিবেদন করছেন যে, তুমি জেনে রাখ, রাজযজ্ঞের দীক্ষা দিয়ে একশত রাজপুত্রে পরিবৃত করে কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষার দায়িত্ব দিই। এক বছরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে এই আদেশ দিয়ে যজ্ঞাশ্বকে মুক্ত করে দিলে সেই অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ দিকের তীরভূমিতে বিচরণ করতে থাকে। তখন অশ্বারোহী যজ্ঞসেনারা তাকে আক্রমণ করে। ফলে উভয়পক্ষের সেনাদলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। (রাণী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন)

রাজা। উঃ, এই রকম ঘটেছে! (চিঠির শেষাংশ পড়লেন) তারপর ধনুর্ধারী বসুমিত্র শত্রুগণকে পরাজিত করে সবলে আমাদের অশ্বটিকে নিয়ে ফিরে এসেছেন।

দেবী। এবার আমার হৃদয় আশ্বস্ত হলো।

রাজা। (শেষাংশ পড়লেন) সগরের পৌত্র অংশুমানের মত আমি এখন অশ্বটিকে ফিরে পেয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করছি। সুতরাং কালক্ষয় না করে রোষশূন্যমনে তুমি বধূদের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞসেবা করার জন্য এখানে এসে উপস্থিত হও।

রাজা। অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা। কী আনন্দ! পুত্রের বিজয়ে রাজদম্পতির শ্রীবৃদ্ধি হোক। (দেবীকে দেখে) তোমার স্বামী তোমাকে শ্লাঘ্য বীরপত্নীদের অগ্রগণ্যা করে রেখেছেন। আজ পুত্রের গুণে তোমার সঙ্গে 'বীরপ্রসবিনী'

শব্দটি যুক্ত হলো।

বিদূষক। দেবী, আমি খুশী হয়েছি যে পুত্র পিতার মতই হয়েছে।

পরিব্রাজিকা। বাচ্চা হাতিও যূথপতিকে অনুকরণ করে।

কঞ্চুকী। প্রভু, এই কুমার এই সব বীরকর্মের দ্বারা আমাদের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করছেন না, কারণ তাঁর সকল কর্মের উৎস আপনি; যেমন দুরন্ত বাড়বানলের উৎস ঔর্ব। ঔর্ব তাঁর যে ক্রোধাগ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নিই বাড়বানল।

রাজা। যজ্ঞসেনের শ্যালকসহ সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক।

কঞ্চুকী। প্রভুর যেমন আদেশ।

দেবী। জয়সেনা, যাও, ইরাবতী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের পুত্রের বিজয়বার্তা জানাও।

প্রতিহারী। দেবীর যা আদেশ। (প্রস্থান ও ঘুরে ফিরে এসে) এই যে আমি।

দেবী। (জনান্তিকে) অশোকতরুর দোহদ পূরণের জন্য মালবিকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেকথা এবং ওর অভিজাত বংশের কথা জানিয়ে ইরাবতীকে আমার কথা বলো, তুমি আমাকে সত্যভ্রষ্ট করো না।

প্রতিহারী। দেবীর যা আদেশ। (প্রস্থান ও পুনরায় প্রবেশ) রাণীমা, পুত্রের বিজয়ের আনন্দে আমি অন্তঃপুরের আভরণের পেটিকা হয়ে পড়েছিলাম।

দেবী। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! তাদের ও আমার পক্ষে এ ত সমান আনন্দ।

প্রতিহারী। (জনান্তিকে) রাণীমা, ইরাবতী জানিয়েছেন ক্ষমতা-পালিনী দেবীর পক্ষে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির অন্যথা করা উচিত নয়।

দেবী। ভগবতী, আপনার অনুমতি পেলে আর্য সুমতির প্রথম সংকল্পিত মালবিকাকে আর্যপুত্রের হস্তে সমর্পণ করতে চাই।

পরিব্রাজিকা। এ বিষয়েও ওর উপর তোমারই প্রভুত্ব।

দেবী। (মালবিকার হাত ধরে) আর্যপুত্র, প্রিয়নিবেদনের উপযুক্ত এই পারিতোষিকটি গ্রহণ করো। (রাজা লজ্জার সঙ্গে নিরুত্তর রইলেন)

দেবী। (সস্মিত) আর্যপুত্র কি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ?

বিদূষক। এটাই লোকব্যবহার, নতুন বরমাত্রই লজ্জা পেয়ে থাকে। (রাজা বিদূষকের পানে তাকালেন)

বিদূষক। অথবা দেবীর বিশেষ স্নেহের পাত্র দেবীশব্দযোগ্যা মালবিকাকে ইনি গ্রহণ করতে চাইছেন।

দেবী। এই রাজকুমারী তার কুলগৌরবেই দেবী নাম পেয়েছে। পুনরুক্তির কি প্রয়োজন?

পরিব্রাজিকা। না না, এরকম নয়। হে কল্যাণী, খনি থেকে ওঠা মণিও যদি সংস্কৃত না হয় তাহলে তা সোনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।

দেবী। (স্মরণ করে) ভগবতী, ক্ষমা করুন। জয়সেনা যাও, একটি পরিষ্কার রেশমী বস্ত্র নিয়ে এস।

প্রতিহারী। দেবীর যা আদেশ। (প্রস্থান ও রেশমী বস্ত্রসহ পুনঃপ্রবেশ) দেবী, এই যে।

দেবী। (মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করে) আর্যপুত্র, এখন একে গ্রহণ করো।

রাজা। তোমার সামনে আমাদের কিছু বলার নেই।

পরিব্রাজিকা। যাঃ, গ্রহণ করেছেন।

বিদূষক। আহা, তোমার প্রতি দেবী কত সদয়।

(দেবী পরিজনদের দেখলেন)

পরিজন। (মালবিকার কাছে এসে) মহারাণীর জয় হোক।

পরিব্রাজিকা। (দেবীকে) তোমার পক্ষে এটা এমন আশ্চর্যের নয়। স্বামীকে ভালবেসে সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ সপত্নীকে দিয়েও পতিসেবা করে থাকে। সমুদ্রগামিনী নদীরা অন্য শত শত নদীকেও সমুদ্রে পৌঁছে দেয়।

নিপুণিকার প্রবেশ

নিপুণিকা। মহারাজের জয় হোক। ইরাবতী জানিয়েছেন, স্বামীর

সৌজন্যে অবহেলা করে অপরাধ করেছি, তাই আমি নিজেই তাঁর অনুকূল আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

দেবী। নিপুণিকা, রাজা নিশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন।

নিপুণিকা। অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা। প্রভু, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন ত আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে প্রীত মাধবসেনকে আমি সম্মান প্রদর্শন করতে চাই।

দেবী। ভগবতী, আমাদের পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না।

রাজা। ভগবতী, আমাদের পত্রে আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান জানাব।

পরিব্রাজিকা। আপনাদের স্নেহে আমি পরাধীন।

দেবী। আর্যপুত্র, বল, তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি?

রাজা। আর কি প্রিয় কাজ থাকতে পারে? তবু এমন হোক, দেবী, আমি মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি যেন সতত আমার প্রতি প্রসন্ন থাক।

(ভরত বাক্য)

আমি আশ্বাস দিচ্ছি, অগ্নিমিত্র রাজা থাকাকালে প্রজাদের অনর্থ দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না। (সকলের প্রস্থান)

ঋতুসংহার

প্রথম সর্গ

গ্রীষ্মকাল

প্রিয়ে, এখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য এখন ভীতিপ্রদ এবং চন্দ্র এখন প্রীতিপ্রদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শুষ্কপ্রায়। অপরাহ্ণ এখন বরণীয় এবং কামদেবের প্রভাব স্তিমিত।

প্রিয়ে, গ্রীষ্মের রাত্রিকাল লোকের বড় উপভোগ্য। চন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত হয় রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার। কৃত্রিম জলের ফোয়ারাযুক্ত ধারাগৃহগুলি চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি নানারকম উত্তাপনাশক মণি আর চন্দনের আর্দ্রতায় শীতল।

গ্রীষ্মের রাত্রিতে রসিক পুরুষেরা সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যবন, দ্রুত শ্বাসপ্রবাহে প্রকম্পিত কামোদ্দীপক প্রিয়ার অধরসুধা, সারা এবং তন্ত্রীর লয়সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে থাকে।

সূক্ষ্মবস্ত্র ও মেখলায় মণ্ডিত যাদের নিতম্ব, হার ও চন্দনে অলঙ্কৃত যাদের স্তন, স্নানে ব্যবহৃত নানারকম সুগন্ধি দ্রব্যে যাদের কেশ সুবাসিত, সেই রমণীরা রসিক পুরুষের গ্রীষ্মতাপের উপশম করে।

চরণ যাদের লাক্ষারসের লালিমায় সুরঞ্জিত এবং নূপুরযুক্ত, যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হংসধ্বনির অনুকরণ করে, যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই সব কামিনীরা পুরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে।

চন্দনের রসে চর্চিত এবং তুষারের মত শুভ্র উৎকৃষ্ট হারে শোভিত স্তন আর সুবর্ণমেখলায় পরিবেষ্টিত নিতম্ব কার চিত্তকে আকুলিত না করে?

উন্নত স্তনসমৃদ্ধ সেই যুবতী রমণীদের শরীরের সন্ধিস্থানগুলি ঘর্মজলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্থূল বসন বর্জন করে এখন সূক্ষ্ম বসনে স্তনযুগল আবৃত করে।

সৌজন্যে অবহেলা করে অপরাধ করেছি, তাই আমি নিজেই তাঁর অনুকূল আচরণ করছি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

দেবী। নিপুণিকা, রাজা নিশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন।

নিপুণিকা। অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা। প্রভু, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন ত আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে প্রীত মাধবসেনকে আমি সম্মান প্রদর্শন করতে চাই।

দেবী। ভগবতী, আমাদের পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না।

রাজা। ভগবতী, আমাদের পত্রে আপনার নামে তাঁর কাছে সম্মান জানাব।

পরিব্রাজিকা। আপনাদের স্নেহে আমি পরাধীন।

দেবী। আর্যপুত্র, বল, তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি?

রাজা। আর কি প্রিয় কাজ থাকতে পারে? তবু এমন হোক, দেবী, আমি মনে মনে প্রার্থনা করব, তুমি যেন সতত আমার প্রতি প্রসন্ন থাক।

(ভরত বাক্য)

আমি আশ্বাস দিচ্ছি, অগ্নিমিত্র রাজা থাকাকালে প্রজাদের অনর্থ দূরীকরণের কিছুই বাকি থাকবে না। (সকলের প্রস্থান)

ঋতুসংহার

প্রথম সর্গ

গ্রীষ্মকাল

প্রিয়ে, এখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য এখন ভীতিপ্রদ এবং চন্দ্র এখন প্রীতিপ্রদ। অনবরত স্নানের ফলে জলাশয় এখন মলিন এবং শুষ্কপ্রায়। অপরাহ্ন এখন বরণীয় এবং কামদেবের প্রভাব স্তিমিত।

প্রিয়ে, গ্রীষ্মের রাত্রিকাল লোকের বড় উপভোগ্য। চন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত হয় রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার। কৃত্রিম জলের ফোয়ারাযুক্ত ধারাগৃহগুলি চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি নানারকম উত্তাপনাশক মণি আর চন্দনের আর্দ্রতায় শীতল।

গ্রীষ্মের রাত্রিতে রসিক পুরুষেরা সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যবন, দ্রুত শ্বাসপ্রবাহে প্রকম্পিত কামোদ্দীপক প্রিয়ার অধরসুধা, সারা এবং তন্ত্রীর লয়সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে থাকে।

সূক্ষ্মবস্ত্র ও মেখলায় মণ্ডিত যাদের নিতম্ব, হার ও চন্দনে অলঙ্কৃত যাদের স্তন, স্নানে ব্যবহৃত নানারকম সুগন্ধি দ্রব্যে যাদের কেশ সুবাসিত, সেই রমণীরা রসিক পুরুষের গ্রীষ্মতাপের উপশম করে।

চরণ যাদের লাক্ষারসের লালিমায় সুরঞ্জিত এবং নূপুরযুক্ত, যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হংসধ্বনির অনুকরণ করে, যাদের নিতম্ব প্রশস্ত সেই সব কামিনীরা পুরুষের চিত্ত কামাতুর করে তোলে।

চন্দনের রসে চর্চিত এবং তুষারের মত শুভ্র উৎকৃষ্ট হারে শোভিত স্তন আর সুবর্ণমেখলায় পরিবেষ্টিত নিতম্ব কার চিত্তকে আকুলিত না করে?

উন্নত স্তনসমৃদ্ধ সেই যুবতী রমণীদের শরীরের সন্ধিস্থানগুলি ঘর্মজলে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তারা স্থূল বসন বর্জন করে এখন সূক্ষ্ম বসনে স্তনযুগল আবৃত করে।

চন্দনজলযুক্ত তালবৃন্তের বাতাসে, হারবেষ্টিত স্তনমণ্ডলের উপহারে এবং নানা তন্ত্রীজাত ধ্বনিময় সঙ্গীতের শব্দে সুপ্ত কামদেব যেন জাগ্রত হন। অর্থাৎ কামদেব যেন রাজা এবং সুগন্ধি পাখার বাতাস ও সুমধুর বীণার সঙ্গীত যেন তাঁর নিদ্রাভঙ্গের উপচার।

রাত্রিকালে সুন্দরী রমণীরা ধবল অট্টালিকায় সুখে নিদ্রা যায়। প্রবল উৎকণ্ঠায় চাঁদ তাদের মুখ বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর যেন লজ্জা পেয়ে পাণ্ডুর হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সৌন্দর্যে পরাভূত চাঁদ ম্লান হয়ে যায়।

প্রিয়াবিচ্ছেদের আগুনে প্রবাসীদের হৃদয় এমনই দগ্ধ হয় যে প্রবল বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জে ব্যাপ্ত ও সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীর পানে দৃষ্টি দান করতেও পারে না। অন্তরে বিরহের জ্বালা আর বাইরে গ্রীষ্মের জ্বালায় অভিভূত হয়ে পড়ে তারা।

প্রচণ্ড সূর্যতাপে দগ্ধ হরিণের তালু প্রবল তৃষ্ণায় শুকিয়ে যায়। দলিত কাজলের মত নীল আকাশ নিরীক্ষণ করে জলের আশায় সে বন থেকে বনান্তরে ছুটে চলে।

চাঁদ যার সুন্দর অলঙ্কার সেই সন্ধ্যার মত বিলাসিনী রমণীরা মনোরম অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বিলাসপূর্ণ মৃদু হাসি ও কুটিল দৃষ্টিপাতে প্রবাসী পুরুষের হৃদয়ে কামভাব উদ্দীপিত করে।

সূর্যকিরণে ভীষণভাবে তপ্ত সাপ গরম ধুলোয় বিশেষভাবে দগ্ধ হয়ে নতমুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বাঁকা পথে যেতে যেতে ময়ূরের তলায় আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ তাপদগ্ধ প্রাণীকুল খাদ্য-খাদক বা ঘাত্য-ঘাতকের সম্বন্ধ ভুলে যায়।

প্রবল তৃষ্ণায় সিংহ পরাক্রম প্রকাশে উদ্যোগী হয় না। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, দূর থেকেই বিস্ফারিত হয় তার মুখ, জিহ্বা চঞ্চল হয় এবং কেশরের অগ্রভাগ কাঁপতে থাকে। কাছের হাতিকেও হত্যা করে না পশুরাজ।

সূর্যের কিরণে তাপিত হাতির শুকনো গলায় জলকণা উদ্‌গত হয়। প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হাতি জলের অন্বেষণে সিংহকেও ভয় পায় না।

যজ্ঞীয় অগ্নির মত সূর্যের তেজে ময়ূরের শরীর ও চৈতন্য এমনই অবসন্ন যে কলাপের তলে অবস্থিত সাপকে কাছে পেয়েও তারা বধ করে না।

ভদ্রমুস্ত মূল আছে এমন সরোবরের শুকনো পাঁক শূকরেরা লম্বা মুখের অগ্রভাগ দিয়ে এমনভাবে খোঁড়ে যে মনে হয় সূর্যের প্রখর রৌদ্রে অতিশয় তাপিত হয়ে তারা ভূগর্ভে প্রবেশ করছে।

সূর্যের অতি প্রখর কিরণে তাপিত মণ্ডুক পঙ্কিল জলে পূর্ণ জলাশয় থেকে লাফিয়ে উঠে পিপাসায় আকুল সাপের ফণার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

দল বেঁধে একে অন্যকে আঘাত করে হাতিরা সরোবরের সমস্ত মৃণাল তুলে ফেলে ঘন ঘন মর্দন কবে কর্দমাক্ত করে তোলে সরোবর। মাছেরা বিপদে পড়ে এবং সারসেরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

সাপের মাথার মণির তেজ সূর্যের কিরণে উদ্‌ভাসিত। চঞ্চল দুটি জিভ দিয়ে সাপ বায়ু পান করে। আগুন ও সূর্যরশ্মিতে তাপিত এবং তৃষ্ণায় আকুল সাপ মণ্ডুকদের হত্যা করে না।

মহিষীদলের ফেনাযুক্ত, চঞ্চল, দীর্ঘ এবং উপর দিকে প্রসারিত মুখ থেকে আরক্ত জিভ বেরিয়ে আসে। পিপাসায় কাতর হয়ে জলের অন্বেষণে পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তারা।

অতিপ্রখর দাবানলে শস্যের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। রুক্ষ বাতাসে শুকনো পাতা উপরে ওড়ে। সূর্যের তাপে চারিদিকে জল শুকিয়ে যায়। উঁচু জায়গা থেকে নিরীক্ষণ করলে অরণ্য ভয়ের উদ্রেক করে।

পাতাঝরা গাছে বসে পাখিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্লান্ত বানরগুলি পর্বতের লতাকুঞ্জে প্রবেশ করে। গবয়ের দল অর্থাৎ গরুর মত একদল প্রাণী জলের আশায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঋজুদেহী শরভের দল অর্থাৎ আট পাওয়ালা সিংহঘাতী এক শ্রেণীর বন্য জন্তুর দল কূপ থেকে জল তোলে।

প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত অগ্নি তীরস্থিত তরু ও লতার আলিঙ্গনে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। . দিকে দিকে আগুনের স্পর্শে প্রস্ফুটিত কুসুম্ভফুলের

মত নির্মল সিঁদুরের কান্তিবিশিষ্ট বনভূমি সত্বর দগ্ধ হয়ে যায়।

বাতাসের সংযোগে বৃদ্ধি পেয়ে দাবানল পাহাড়ের গুহায় জ্বলতে থাকে। শুকনো বাঁশবনের মধ্যে জোরালো শব্দে প্রকাশিত হয় সে অনল, অল্প সময়ে বেড়ে উঠে তৃণভূমিতে প্রবেশ করে। বনপ্রান্তে সঞ্চারিত বহ্নি ব্যাকুল করে তোলে হরিণদের।

শিমুলগাছের বনে আরও বেড়ে ওঠে যেন আগুন। গাছের কোটরে আগুন সোনার মত গৌরবর্ণ হয়ে শোভা পায়। বাতাসের কাঁপনে উঁচু গাছের ডালে শুকনো পাতায় লেগে দাবাগ্নি বনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দাবাগ্নিতে হাতি, গবয় ও সিংহের শরীর দগ্ধ হয়। আগুনের জ্বালায় পরস্পর শত্রুতা ভুলে বন্ধুর মত মিলিতভাবে তারা শুষ্ক বনাঞ্চল ও কন্দর থেকে দ্রুত নির্গত হয়ে বিশাল তটদেশযুক্ত নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রিয়ে, তোমার সঙ্গীত সুললিত। জলাশয় এখন পদ্মবনে পরিপূর্ণ। পাটলকুসুমের গন্ধ এখন রমণীয়। শীতল জলে স্নান এখন বড়ই সুখপ্রদ। চাঁদের কিরণ এখন উপভোগের বিষয়। সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনিতে মুখরিত হর্ম্যতলে সহচরীদের সঙ্গে রাত্রিতে তুমি এই গ্রীষ্ম-সুখেই যাপন করো।

দ্বিতীয় সর্গ

বর্ষাকাল

প্রিয়ে, বর্ষা এল রাজার মত। রাজার মতই বেশ তার উজ্জ্বল। জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘমালা তার মত্ত হাতি, বিদ্যুৎ তার পতাকা, বজ্র-ধ্বনি তার মাদল। প্রার্থীগণের প্রিয় রাজার মত এই বর্ষাকাল কামী-জনের প্রিয়।

সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। গাঢ় নীলপদ্মের পাতার মত সে মেঘের শোভা। কোথাও সে মেঘের বর্ণ দলিত কাজলের মত, কোথাও গর্ভবতী রমণীর স্তনবৃন্তের মত।

জলের ভারে অবনত মেঘের কাছে জল চায় তৃষ্ণার্ত চাতকপাখির দল।

অজস্র জলের ধারা বর্ষণ করে শ্রুতিমধুর শব্দ করতে করতে আকাশে ভেসে চলে সে মেঘ।

মেঘেরা যে ইন্দ্রধনু ধারণ করে বিদ্যুৎ তার ধনুর্গুণ। বজ্রপাতের শব্দ তার মাদল। সুতীক্ষ্ম ধারাপাতের তীর শরাঘাতে প্রবাসী মানুষের চিত্ত বড় ব্যথিত করে তোলে। কামদেবের মত মেঘেরা প্রিয়জনের জন্য উন্মুখ করে তোলে প্রবাসীদের মন।

খণ্ড খণ্ড নীলকান্তমণির মত তৃণাঙ্কুরে, সদ্যোজাত কদলীগাছের পাতায় এবং ইন্দ্রগোপ কীটে সমাচ্ছন্ন পৃথিবী এখন রঙীন রত্নে অলঙ্কৃত সুন্দরী ললনার মত শোভা পাচ্ছে।

মেঘের মধুর গর্জনে এখন সময়েই উল্লসিত হয়ে ওঠে ময়ূর ময়ূরীর দল। প্রসারিত কলাপের শোভায় তাদের এখন সুন্দর দেখায়। চুম্বন এবং আলিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা এবং নৃত্য করে।

নদীগুলি পঙ্কিল জলরাশির দ্বারা দুই তীরের গাছগুলিকে উপড়ে ফেলে বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিদুষ্ট বিভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মত ঘূর্ণি-পাক সৃষ্টি করে দ্রুত সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

হরিণীর মুখের টানে ছিন্ন তৃণপুঞ্জ, কোমল অঙ্কুরে শোভিত ও নবপল্লবসজ্জিত বিচিত্র নীল বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য চিত্ত হরণ করে।

চঞ্চল নীলপদ্মের মত যাদের মুখে নয়নের শোভা সেই চকিত হরিণের সমাবেশে চারদিকে পরিব্যাপ্ত সৈকতময় বনভূমি চিত্তে আকুলতা জাগিয়ে তোলে।

যখন মুহুর্মুহু মেঘের গম্ভীর গর্জনে অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সেই রাত্রিতেও বিদ্যুতের প্রভায় পথ চিনে অভিসারিকা নায়িকা চলে ভাল-বাসার জনের আকর্ষণে।

মেঘের ঘোর গম্ভীর গর্জনে ও বিদ্যুতের চমকে চকিতচিত্ত রমণীরা শয্যায় অপরাধী স্বামীকেও গভীরভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

প্রবাসী পুরুষের প্রিয়তমার নীলপদ্মের মত চোখের বিন্দু বিন্দু জলে বিম্বফলের মত সুন্দর কোমল অধর সিক্ত হয়ে যায়। নিরাশ হয়ে

তারা ফুলের মালা, আভরণ ও সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন পরিহার করে।

কীটপোকা, ধুলো এবং তৃণের মিশ্রণে পাণ্ডুরবর্ণ নববর্ষার জল সাপের মত তীর্যক গতিতে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে ধাবিত হয়। মণ্ডুকের দল সভয়ে তা নিরীক্ষণ করে।

শ্রুতিমধুর গুঞ্জনকারী মূর্খ ভ্রমরের দল উৎকণ্ঠার দ্বারা তাড়িত হয়ে ফুলপাতারূপ পদ্মবন বর্জন করে নতুন পদ্মের আশায় নৃত্যরত ময়ূরের চক্রাকার কলাপের উপর উড়ে পড়ে।

নবীন মেঘের গর্জনে হাতিরা মদমত্ত হয়ে মুহুর্মুহু শব্দ করে। তাদের কপোলদেশে প্রস্ফুটিত পদ্মের আভা। ভ্রমরদল ও মদবারিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সে স্থান।

যাদের শিলাখণ্ডে সাদা পদ্মের মত মেঘের চুম্বন, চারদিকে নির্ঝর পরিব্যাপ্ত এবং নৃত্যরত ময়ূর ময়ূরীতে মুখরিত সেই পর্বতগুলি আগ্রহ সৃষ্টি করে সকলের মনে।

কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কেতকী গাছগুলিকে কাঁপিয়ে তুলে, তাদের ফুলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে এবং জলকণায় পরিপূর্ণ মেঘের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে বাতাস কার চিত্তকে উৎকণ্ঠিত না করে?

কামিনীরা নিতম্ব পর্যন্ত লম্বিত কেশদাম, কর্ণ ও মস্তকের আভরণের সুগন্ধি কুসুম, হারসমন্বিত স্তনদেশ, সুরাপূর্ণ মুখমণ্ডলের শোভায় বিবাগী পুরুষের অনুরাগ জাগিয়ে তোলে।

বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুতে সুশোভিত এবং জলভারে অবনত মেঘদল ও মণিময় কর্ণাভরণে সুসজ্জিত রমণীগণ একই সঙ্গে প্রবাসীদের চিত্ত হরণ করে।

রমণীরা কদম্ব, সদ্যফোটা বকুল ও কেতকী ফুলের মালা গেঁথে মাথায় পরে, আর অর্জুনগাছের কুঁড়ি দিয়ে পছন্দমত অলঙ্কার তৈরী করে।

সন্ধ্যালগ্নে বধূরা অঙ্গে প্রচুর অগুরু চন্দনের প্রলেপ দেয় এবং ফুলের গয়না পরে কেশ সুবাসিত করে। মেঘের গর্জন শুনে তারা তাড়াতাড়ি গুরুজনের কক্ষ ত্যাগ করে শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

নীলপদ্মের পাতার মত নীল এবং জলভারে অবনত অত্যুচ্চ মেঘমালা মৃদু বাতাসে কম্পিত হয়ে ধীরে ধীরে ভেসে চলে। তাদের সঙ্গে থাকে ইন্দ্রধনু। ঐ সব মেঘমালা স্বামীবিরহে উৎকণ্ঠিত পথিকবধূর হৃদয় হরণ করে নেয়।

নববর্ষার জলে বনানীর উত্তাপ দূর হয়। চারদিকে কদম্ববৃক্ষের প্রস্ফুটিত কুসুমসম্ভারে আনন্দিত হয় সে। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় কম্পনে নৃত্য করতে থাকে যেন বনরাজি। কেতকীফুলের কাঁটায় কাঁটায় দেখা যায় তার হাসি।

মেঘমালায় পূর্ণ এই বর্ষাকাল স্বামীদের মত বধূদের মাথায় নব-প্রস্ফুটিত মালতী ফুল ও যূথিকার কুঁড়ি দিয়ে বকুলফুলের মালা রচনা করে দেয়। সদ্যফোটা কদম্বফুল দিয়ে বধূদের কানের অলঙ্কার তৈরী করে দেয়।

রমণীগণ তাদের উন্নত সুবর্তুল পীনপয়োধর যুগলের অগ্রভাগে হার ধারণ করে, প্রশস্ত নিতম্বদেশে সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। নবীন বৃষ্টিকণায় রোমাঞ্চ উদ্গত হয় তাদের ত্রিবলীযুক্ত কটিদেশে।

নবজলকণার স্পর্শে শীতল বাতাস ফুলের ভারে অবনত বৃক্ষশাখায় কাঁপন জাগায় এবং কেতকী ফুলের পরাগের স্পর্শে সুবাসিত হয়ে সে বাতাস প্রবাসীজনের চিত্ত হরণ করে।

জলের ভারে অবনত মেঘগুলি অতিপ্রখর গ্রীষ্মবহ্নির শিখায় উত্তপ্ত আমাদের আশ্রয়স্থল এই বিন্ধ্যপর্বতকে যেন জলবর্ষণের দ্বারা আনন্দিত করে।

বিভিন্ন গুণের সমন্বয়ে রমণীয়, অবলাজনের চিত্তহারী, বৃক্ষ, শাখা ও লতার অবিকল মিত্র, প্রাণীকুলের প্রাণস্বরূপ এই বর্ষাকাল সতত তোমার অভিলষিত কল্যাণ বিধান করুক।

তৃতীয় সর্গ

শরৎকাল

প্রফুল্ল পদ্মের মত যার মুখ, কাশফুলের মত যার পরিধান, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মত রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মত

সুন্দর যার দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর বেশে শরৎকাল আসে।

কাশফুল পৃথিবীকে, চাঁদ রাত্রিকে, হাঁসের পাল নদীর জলকে, কুমুদ ফুল জলাশয়গুলিকে, ফুলের ভারে অবনত ছাতিম গাছ বনপ্রান্তগুলিকে এবং মালতীফুল উদ্যানগুলিকে সাদা করে তোলে।

চঞ্চল পুঁটিমাছের সুন্দর মাথার মত যাদের মেখলা, প্রান্তে বসে থাকা সাদা হাঁসের মাথার মত যাদের হার আর বিশাল তটপ্রান্তের মত যাদের নিতম্ব সেই যৌবনবিলাসিনী রমণীদের মত নদীরা এখন চলে মন্থর গতিতে।

জলবর্ষণের ফলে হালকা এবং রুপো, শঙ্খ ও পদ্মের ডাঁটার মত শত শত খণ্ড বিভক্ত মেঘ চঞ্চল হয়ে উড়ে চলে বাতাসের বেগে। ফলে আকাশকে কোথাও কোথাও রম্য চামরের হাওয়ায় সেবিত রাজার মত দেখায়।

পুঞ্জীভূত দলিত কাজলের মত মনোরম আকাশ, কন্দুকফুলের লালিমায় মণ্ডিত প্রান্তর এবং পাকা ধানে ভরা শস্যক্ষেত্রগুলি জগতে কোন্ যুবকের মনকে উৎকণ্ঠিত না করে?

যার অতিসুন্দর শাখার অগ্রভাগ মৃদু বাতাসে কাঁপতে থাকে, অজস্র উদ্‌গত পুষ্পের জন্য যার পাতার অগ্রভাগ কোমল, মত্ত মধুকর যার ক্ষরিত মধু পান করে সেই কাঞ্চন তরু কার চিত্তকে না উদ্বিগ্ন করে?

নক্ষত্ররাজির উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে শোভিত হয়ে মেঘের আবরণশূন্য চাঁদমুখ নিয়ে, বিমল জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম বসন পরে তরুণী ললনার মত রজনী প্রতিদিন শোভা পায়।

পাতিহাঁসের মুখের আঘাতে যাদের ঢেউগুলি বিক্ষুব্ধ, যাদের তীরভূমি কলহংস ও সারসদের দ্বারা মুখরিত, পদ্মের রেণুতে আরক্ত সেই নদীগুলি চারপাশের মরালের গুঞ্জনে মানুষের আনন্দ বিধান করে।

নয়নসুখকর ও আনন্দজনক চাঁদ তার জ্যোৎস্নাধারায় হৃদয় হরণ করে। শীতল জলকণা বর্ষণে সেই চাঁদ পতিবিচ্ছেদের বিষময় শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রমণীকুলের ক্ষীণ অঙ্গ অতিমাত্রায় সন্তপ্ত করে।

যে বাতাস ফলের ভারে অবনত শালিধানের গাছগুলিকে কাঁপায়, ফুলের ভারে অবনত গাছগুলিকে নাচায়, প্রফুল্ল পদ্মের জলাশয়ে পদ্মগুলিকে নাড়া দেয়, সেই বাতাস তরুণ প্রেমিক মনকে অতিশয় চঞ্চল করে।

মত্ত মরাল মরালীতে পরিব্যাপ্ত, স্নিগ্ধ ও প্রস্ফুটিত শ্বেত ও নীলপদ্মে সুশোভিত সরোবরগুলি প্রভাতের মৃদু বাতাসে ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে হৃদয়কে সহসা উৎকণ্ঠিত করে।

এখন আর মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু নেই, আকাশের পতাকারূপ বিদ্যুৎ আর প্রকাশিত হয় না, ঊর্ধ্বমুখে ময়ূরেরা আর আকাশ নিরীক্ষণ করে না।

ময়ূরেরা নাচানাচি বন্ধ করায় কামদেব তাদের ছেড়ে হাঁসদের মধ্যে আশ্রয় নেন। হাঁসেরা মধুর গান করে। পুষ্পোদ্‌গমের সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কদম্ব, গিরিমল্লিকা, অর্জুন, শাল ও রক্তকদম্ব গাছকে পরিত্যাগ করে সপ্তপর্ণ তরুকে অবলম্বন করেন।

শিউলি ফুলের মনোহর গন্ধে, সুখে উপবিষ্ট পক্ষিকুলের কলধ্বনিতে এবং প্রান্তস্থিত মৃগী ফুলের নয়নরূপ নীলপদ্মের শোভায় উপবনগুলি প্রেমিক পুরুষের চিত্তকে ব্যাকুলিত করে।

যে বাতাস কহ্লার, পদ্ম ও কুমুদ ফুলকে বারবার কাঁপিয়ে তোলে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে আরও শীতল হয়, সকালবেলায় সেই বাতাস পাতার অগ্রভাগে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুর আঘাতে কেঁপে ওঠে এবং অতিশয় উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে।

পরিপুষ্ট শালিধানের প্রাচুর্যে আচ্ছাদিত ক্ষেত্রের এবং সুখে অবস্থিত গোবৃন্দের শোভায় মণ্ডিত এবং সারস ও হাঁসের বিবাদে মুখরিত প্রান্তরগুলি মানুষকে আনন্দ দেয়।

হংসকুল ললনাদের সুললিত গমনের অনুকরণ করে, বিকশিত শ্বেতপদ্ম মুখচন্দ্রের কান্তি অনুকরণ করে, নীলপদ্ম মদিরামধুর দৃষ্টিপাত অনুকরণ করে আর ছোট ছোট ঢেউগুলি তাদের সুন্দর ভ্রূবিলাস অনুকরণ করে।

ফুলভারে অবনত কিশলয়যুক্ত কৃষ্ণকায় বল্লরী রমণীদের অলঙ্কার-মণ্ডিত বাহুর শোভা ধারণ করে এবং তাদের যে মৃদুহাসি দন্তচ্ছটায় নির্মল ও চাঁদের মত সুন্দর তার শোভা ধারণ করে কঙ্কোনিফুলের সুষমায় মণ্ডিত নবমালতী।

রমণীরা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের অগ্রভাগে তাজা মালতী ফুল গ্রহণ করে এবং উৎকৃষ্ট স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণমণ্ডলে নানাবিধ নীলপদ্ম ধারণ করে।

রমণীরা এখন হৃষ্টচিত্তে চন্দনরসে চর্চিত হারে স্তনমণ্ডল, মেখলায় সুবৃহৎ নিতম্ব এবং মধুরভাবে ঝঙ্কৃত সুন্দর নূপুরে চরণকমল অলঙ্কৃত করে।

মেঘমুক্ত আকাশ চন্দ্র ও তারায় খচিত। এই আকাশ প্রফুল্ল কুমুদে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসে সমাকীর্ণ এবং মরকত মণির মত স্বচ্ছ জলে শোভিত সরোবরের রমণীয় শোভা ধারণ করে।

শরতে কুমুদের স্পর্শে শীতল বাতাসের প্রবাহবলে মেঘশূন্য দিক্‌-মণ্ডল মনোরম হয়ে ওঠে। মনে কোন মলিনতা থাকে না, পৃথিবী কর্দমশূন্য হয়। আকাশ চন্দ্রের নির্মল কিরণে ও তারকার বৈচিত্র্যে শোভা পায়।

সুন্দরী যুবতীর মুখের মত পদ্ম এমন প্রভাতকালে সূর্যের কিরণ-মালায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। প্রবাসী নায়কের বধূর হাসির মত কুমুদফুলও চাঁদ অস্তমিত হলে ক্ষীণ হয়ে যায়।

পথিকপুরুষ নীলপদ্মে প্রিয়তমার কালো চোখের শোভা, মত্ত হাঁসের ডাকে প্রিয়তমার সুবর্ণ মেখলার শব্দ এবং কুন্দফুলের মধ্যে প্রিয়তমার অধরশোভা অনুভব করে এখন জ্ঞানশূন্য হয়ে বিলাপ করছে।

কামিনীফুলের মুখমণ্ডলে চন্দ্রের শোভা, মণিময় নূপুরে হংসের মধুর নিনাদ এবং মনোহর ওষ্ঠপ্রান্তে কুন্দফুলের সৌন্দর্য স্থাপিত দেখে শারদলক্ষ্মী অন্য কোথাও চলে যান।

প্রফুল্ল পদ্মের মত যার মুখ, প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত যার চোখ, সদ্যফোটা কাশফুলের মত শুভ্র বসন যার পরিধানে এবং কুমুদের মত

রমণীয় যার কান্তি সেই প্রমত্তা কামিনীর মত এই শরৎকাল সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বিধান করুক তোমাদের মনে।

চতুর্থ সর্গ

হেমন্তকাল

এখন হেমন্তকাল উপস্থিত। নতুন পাতার আবির্ভাবে শস্যগুলি সুন্দর দেখায়, লোধ্রফুল ফোটে, শালিধান পাকে, পদ্মফুল ম্লান হয়ে যায় এবং শিশির ঝরে।

পীনস্তনী বিলাসবতী রমণীদের কুচমণ্ডল সুন্দর কুসুমের লোহিত রাগে আরক্ত হয় এবং তুষার, কুন্দফুল ও চাঁদের মত মুক্তাগুচ্ছে অলংকৃত হয়।

বিলাসিনী কামিনীদের করযুগলে বলয় ও অঙ্গদ অলঙ্কারের সম্পর্ক নেই, নিতম্বে নেই নূতন সূক্ষ্ম পরিধান, উন্নত স্তনমণ্ডলে নেই সূক্ষ্ম বসন।

কামিনীরা রত্নখচিত সুবর্ণ মেখলায় নিতম্ব ভূষিত করে না এবং পদ্মের শোভাযুক্ত চরণকমলে হংসধ্বনির অনুকারী নূপুর গ্রহণ করে না।

রমণীরা রতিক্রীড়ার আনন্দ উপভোগের জন্য অঙ্গে কৃষ্ণচন্দন লেপন করে, মুখপদ্মে পত্রাবলী রচনা করে, কালাগুরু চন্দনে মস্তক সুরভিত করে।

রতিশ্রমে ক্ষীণ তরুণীদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ। দন্তক্ষতে ওষ্ঠাধর পীড়িত দেখে আনন্দের সময় তারা উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে না।

উন্নত স্তনযুক্ত বক্ষোভাগের যে শোভা সেই শোভা ধারণ করেও হিমকাল যেন স্তনপীড়নের ফলে ক্ষিণ্ন হয়ে প্রভাতবেলায় তৃণপ্রান্তে নগ্ন শিশিরপাতের মধ্য দিয়ে রোদন করে।

প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন শালিধানে পরিব্যাপ্ত, দলে দলে হরিণী সমাগমে বিভূষিত এবং মনোহর ক্রৌঞ্চনিনাদে মুখরিত প্রান্তগুলি চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে।

প্রফুল্ল নীলপদ্মে শোভিত, মুখরিত রাজহংসে অলংকৃত ও সুশীতল নির্মল সলিলে পরিপূর্ণ সরোবরগুলি পুরুষের চিত্ত হরণ করে।

প্রিয়ে, হিমপাতের শীতলতায় পরিপক্ক প্রিয়ঙ্গুলতা বাতাসে অনবরত কাঁপে এবং প্রিয়তমের বিরহে বিলাসিনীর মত পাণ্ডুর হয়ে যায়।

পুষ্পরসের পরিমলে যাদের মুখ সুবাসিত, নিঃশ্বাসের বাতাসে যাদের অঙ্গ সুরভিত, সেই প্রণয়ীযুগল কামরসে জর্জরিত হয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিদ্রা যায়।

নবযৌবনা কামিনীদের দন্তক্ষতচিহ্নিত অধর এবং নখলেখচিহ্নিত স্তনগুলি নির্দয় রতিসম্ভোগের লক্ষণ সূচিত করে।

দর্পণহস্তে কোন রমণী প্রভাতের রৌদ্রে মুখপদ্ম প্রসাধিত করে এবং প্রিয়তমের রসাস্বাদনে ও দন্তাগ্রের দংশনে বিদীর্ণ অধরোষ্ঠ আকর্ষণ করে নিরীক্ষণ করে।

কোন রমণী যথেচ্ছ রতিবিহারের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হওয়ায় এবং রাত্রি জাগরণের ফলে নয়নপদ্ম আরক্ত হওয়ায় সূর্যের কোমল কিরণের উত্তাপে নিদ্রা যায়। তার কেশবন্ধন শিথিল হওয়ায় সে কেশ-পাশ বিক্ষিপ্ত ও আলুলায়িত হয়ে পড়ে।

যে সব তরুণীদের কেশাগ্র ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফীত ও উন্নত স্তনের গুরুভারে দেহযষ্টি যাদের অবনত, তারা মাথা থেকে সুবাসশূন্য ফুলের মালা ফেলে দিয়ে কেশরচনা করে।

অপর কোন কামিনী প্রণয়ীর দ্বারা পরিভুক্ত শরীর নিরীক্ষণ করে আনন্দে অধরের সুন্দর শোভা রচনা করে। কৃষ্ণবর্ণ মনোরম কেশগুচ্ছ আলম্বিত হওয়ায় নয়ন কুঞ্চিত করে এবং অঙ্গে নখক্ষতের চিহ্ন থাকায় কোন বস্ত্র বা কাঁচুলি পরিধান করে।

অন্য রূপবতী তরুণীরা যারা দীর্ঘক্ষণ রতিক্রিয়ার পরিশ্রমে ক্লান্ত, যাদের দেহযষ্টি শিথিল এবং যাদের বিশাল জঘন ও স্তনাগ্রভাগ অতিশয় নিপীড়িত তারা অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রলেপ দেয়।

অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল বিবিধ গুণে রমণীয়, রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন প্রচুর পাকা শালিধানে

পরিপূর্ণ। চারদিকে এখন বকের মেলা। এই হেমন্তকাল সর্বদা তোমাদের সুখ প্রদান করুক।

শীতকাল

হে সুন্দরী, এবার শীতঋতুর কথা শ্রবণ করো। এই ঋতু শালিধান ও আমের প্রাচুর্যে মনোহর। এখানে ওখানে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চের নিনাদ এখন মধুর। এই ঋতুতে কাম বড় প্রবল, এ কাল রমণীদের প্রিয়।

জানালাবন্ধ গৃহের অভ্যন্তর, আগুন, সূর্যের কিরণ, স্থূল বসন এবং যুবতী রমণীরা এই সময় পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

চাঁদের কিরণের মত শীতল চন্দন শরতের চাঁদের মত স্বচ্ছ প্রাসাদতল এবং ঘন তুষারপাতে শীতল বাতাস এখন লোকের চিত্তকে আনন্দিত করে না।

অজস্র তুষারপাতের ফলে শীতল রাত্রি আরও শীতল হওয়ায় এবং পাণ্ডুবর্ণের তারাগুলিতে কদর্যরূপে সজ্জিত হওয়ায় লোকের কাছে উপভোগ্য হয় না।

যাদের মুখপদ্ম সুখপ্রদ ও সুরাপানে আমোদিত সেই সব রমণীরা পান, চন্দন ও ফুলের মালা নিয়ে আবেগভরে পর্যাপ্ত অগুরুচন্দনের ধূপে সুবাসিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

মত্তযৌবনা কামিনীরা অপরাধী পতিদের বারংবার ভর্ৎসনা করায় তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তবু রতিক্রিয়ায় তাদের অভিলাষ আছে দেখে কামিনীরা তাদের সব দোষ ভুলে যায়।

নবযৌবনা রমণীরা সারারাত্রি বহুক্ষণ ধরে অত্যন্ত কামাতুর যুবা প্রণয়ীদের সঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে রমণক্রিয়া করায় রাত্রিশেষে বক্ষদেশে ক্লান্তি-বোধে অলসভাবে বিচরণ করে।

মনোরম কাঁচুলিতে স্তনবন্ধন করে, লাল ক্ষৌমবস্ত্রে বক্ষস্থল শোভিত করে এবং কেশগুচ্ছের মধ্যে পুষ্প নিবেশিত করে রমণীরা যেন শীত-কালকেই ভূষিত করে।

বিলাসী প্রেমিকেরা বিলাসিনী রমণীদের কুংকুমের রাগে পীতবর্ণ,

সুখভোগ্য এবং নবযৌবনের তাপে উত্তপ্ত বক্ষস্হল নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে নিজেদের শীতমুক্ত করে নিদ্রা যায়।

রাত্রিতে কামিনীরা উৎফুল্ল চিত্তে নায়কদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রতিসুখের উদ্দীপক মত্ততাজনক উৎকৃষ্ট সুরা পান করে। তাদের সুগন্ধি নিঃশ্বাসে পদ্ম কেঁপে ওঠে অর্থাৎ তারা পদ্মিনী নারী।

যার মদিরার উন্মাদনা স্তিমিত হয়েছে এবং স্তনের অগ্রভাগ দয়িতের আলিঙ্গনে কঠিন হয়েছে এমন কোন কামিনী প্রভাতে নিজ কলেবর প্রিয়তম কর্তৃক উপভুক্ত হয়েছে দেখে সহাস্যে শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে অন্য কক্ষে চলে যায়।

কোন সুন্দরী কামিনী অগুরু চন্দনের ধূপে সুরভিত কেশপাশ আলুলায়িত করতে করতে সকালবেলা শয্যা ত্যাগ করে। তার নিতম্ব গুরু এবং কটিদেশ ক্ষীণ, তার কেশপাশের অগ্রভাগ কুঞ্চিত এবং তা থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে।

যাদের সদ্য জলে ধোয়া মুখমণ্ডল সোনার পদ্মের মত সুন্দর, নয়ন-প্রান্ত আরক্ত এবং আকর্ণবিস্তৃত ও কেশপাশ কাঁধের উপর আলুলায়িত সেই রমণীরা এখন প্রভাতে গৃহমধ্যে লক্ষ্মীর মত বিরাজ করে।

যারা গুরু জঘনের ভারে পীড়িত, যাদের কটিদেশ ঈষৎ অবনত, যারা স্তনভারে কাতর হয়ে মন্দগতিতে চলে এমন সব তরুণীরা সত্বর কামক্রীড়ার উপযোগী পরিধেয় ত্যাগ করে দিনের বেলার উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে।

স্তনের অগ্রভাগ নখক্ষতের চিহ্নে পরিব্যাপ্ত দেখে এবং কচিপাতার মত ওষ্ঠপ্রান্ত দন্তক্ষত স্পর্শ করে তরুণীরা অভীষ্ট রসে আনন্দ উপভোগ করে এবং সূর্যোদয়ে মুখের প্রসাধন করে।

এখন গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু শালিধান ও আমে এই ঋতু রমণীয়। রতিক্রিয়া এখন প্রবল। কামদেব এখন গর্বিত। যাদের প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন সেই রমণীদের কাছে এই ঋতু মনোবেদনার কারণ। এই শীতকাল সর্বক্ষণ তোমাদের কল্যাণময় হয়ে উঠুক।

বসন্তকাল

প্রিয়ে, কামাসক্ত লোকদের অন্তর বিদ্ধ করার জন্য সেনাপতি বসন্ত-কাল সমাগত। বিকশিত আম্রমুকুল তার সুতীক্ষ্ণ শর এবং ভ্রমরশ্রেণী তার সুন্দর ধনুকের গুণ।

প্রিয়ে, বসন্তে সবই সুন্দর। এখন গাছে গাছে ফুল, জলের মাঝে পদ্ম, কামিনীরা কামাতুরা, বাতাস সুগন্ধি, সন্ধ্যাকাল সুখপ্রদ এবং দিন-গুলি রমণীয়।

এই বসন্তকাল দীঘির জলের, মণিময় মেখলার, চাঁদের কিরণের, রমণীদের এবং কুসুমিত সহকারতরুর সৌভাগ্য এনে দেয়।

বিলাসিনী রমণীদের কুসুম্ভফুলের রসে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম বসনে নিতম্ব এবং কুঙ্কুমের রঙে গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্রে স্তন অলঙ্কৃত হয়।

রমণীদের কানে অলঙ্কারের উপযোগী কর্ণিকার ফুল এবং চঞ্চল নীল কুন্তলে অশোক এবং নবমল্লিকা ফুল শোভা পায়।

যাদের অন্তর কামে পীড়িত, সেই নিতম্বিনী রমণীদের স্তনে শ্বেত চন্দনের হার, হাতে বলয় ও অঙ্গদ অলঙ্কার এবং নিতম্বে চন্দ্রহার শোভা পায়।

বিলাসিনী রমণীদের পত্রাবলী আঁকা সোনার পদ্মের মত মুখে রত্ন-রাজির মধ্যে মুক্তোর মত রমণীয় বিন্দু বিন্দু ঘাম ছড়িয়ে পড়ে।

কামিনীদের কামার্ত কলেবরে ঘন ঘন শ্বাস ওঠে, বসনের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। এ সময় প্রিয়তম কাছে থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা।

অনঙ্গের প্রভাবে রমণীদের শরীর কৃশ, পাণ্ডুর ও অলস হয়ে যায়। ঘন ঘন হাই ওঠে ও তাদের শরীরে লাবণ্যের জোয়ার আসে।

কামিনীদের মদিরাজাত অলস নয়নে চঞ্চল হয়ে, কপোলতলে পাণ্ডুর হয়ে, স্তনে কঠিন হয়ে, কটিদেশে ক্ষীণ হয়ে এবং নিতম্বে স্থূল হয়ে কামদেব তাদের শরীরে বহুবিভক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

কামদেবের প্রভাবে তন্দ্রার আলস্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে কামিনীদের অঙ্গ। সুরাপানের মত্ততায় বাক্য হয়ে ওঠে ঈষৎ মদালস এবং দৃষ্টিপাত

ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে ওঠে।

সুরাপানের মত্ততায় অলস বিলাসিনী রমণীরা শুভ্র স্তনে শ্যামালতা, কৃষ্ণচন্দন ও কুঙ্কুমমিশ্রিত মৃগনাভিযুক্ত চন্দন লেপন করে।

যে সব যুবক যুবতীর অঙ্গ কামনার মত্ততায় অলস তারা সত্বর স্থূল বসন বর্জন করে লাক্ষারসে রঞ্জিত ও সুগন্ধি অগুরু চন্দনের ধূপে সুবাসিত সূক্ষ্ম বসন পরিধান করে।

আম্রমুকুলের রসে মাতাল পুরুষকোকিল অনুরাগের পুলকে কোকিলবধূকে চুম্বন করে। পদ্মের মাঝে কূজনরত ভ্রমরও প্রিয়ার কাছে মধুর চাটুবাক্য শোনায়।

তাম্রবর্ণের কচিপাতার গুচ্ছে যারা অবনত, যাদের সুন্দর শাখাগুলি পুষ্পিত সেই আম্র তরুগুলি উৎকণ্ঠিত করে তোলে যুবতীদের অন্তর।

নবযৌবনা যুবতীদের হৃদয় প্রবালের মত তাম্রবর্ণের ফুল ও পাতায় আগাগোড়া শোভিত অশোকতরু নিরীক্ষণ করে শোকাকুল হয়ে ওঠে।

মত্ত ভ্রমরের চুম্বনে ফুল রমণীয়, মৃদু বাতাসের আকুলতায় যার কোমল কচি পাতা অবনত সেই মনোরম আম্রমুকুল দেখে দেখে কামিনীদের মন অকস্মাৎ অস্থির হয়ে যায়।

প্রিয়ে, প্রিয়ার মুখের মত যাদের কান্তি কুরুবক গাছের সেই সদ্যোজাত পাতার গুচ্ছের অতিসুন্দর শোভা দর্শন করে কোন ব্যক্তি কন্দর্পের শরক্ষেপে ব্যথিত না হয়?

বাতাসে কম্পিত, ফুলভারে অবনত এবং জ্বলন্ত আগুনের মত দীপ্তিমান পলাশের বনে সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী বসন্তে রক্তবসনা নববধূর মত শোভা পায়।

শুক পাখির মুখের মত সুন্দর পলাশ ফুলে কি ছিন্ন হয়নি সুন্দরী-নিহিত যুবকদের হৃদয়? কর্ণিকার ফুলে কি দগ্ধ হয়নি? তবে কেন এই কোকিল অনবরত মধুর রবে আবার তাদের হৃদয়কে আঘাত করছে?

আনন্দে মুখর পুরুষকোকিলের অব্যক্তমধুর স্বরে এবং মত্ত ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে বিনয় ও লজ্জায় অবনত বধূরা শ্বশুরগৃহেও ক্ষণে ক্ষণে আকুল হয়ে ওঠে।

বসন্তে শিশিরপাত বন্ধ হওয়ায় বাতাস মনোরম। সে বাতাস সহকারতরুর কুসুমিত শাখাগুলি কম্পিত করে, কোকিলের কুহুধ্বনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং পুরুষের হৃদয় হরণ করে।

বিলাসবতী বধূর হাসির মত সাদা কুন্দফুলে উদ্ভাসিত মনোহর কাননগুলি অনুরাগশূন্য মুনিচিত্তকেও বিচলিত করে, বাসনামলিন যুবকদের চিত্তকে আগেই হরণ করেছে।

বসন্তকালে রমণীদের স্বর্ণমেখলা আলম্বিত, স্তনদেশ হারশোভিত এবং দেহযষ্টি কন্দর্পের প্রভাবে শিথিল। কোকিল ও ভ্রমরের সুমধুর গুঞ্জনের প্রভাবে সেই রমণীরা পুরুষের হৃদয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

যাদের প্রান্তভাগ বিবিধ মনোহর পুষ্পবৃক্ষে শোভিত, যাদের সানুদেশ আনন্দিত কোকিলের কুহুরবে মুখরিত, যাদের শিলাতলগুলি সারি সারি শৈলেয়বৃক্ষে আচ্ছাদিত সেই পর্বতগুলি দেখে সকলে আনন্দ পায়।

পত্নীবিচ্ছেদে যার হৃদয় কাতর সেই পথিক কুসুমিত সহকারতরু দেখে চোখ বুজে কেঁদে ওঠে, শোক করে, হাত দিয়ে নাক বন্ধ করে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে।

উন্মত্ত ভ্রমর ও কোকিলের ঝঙ্কারে এবং কুসুমিত আম্র ও কর্ণিকার তরুতে রমণীয় বসন্তকাল মানিনীদের অন্তরে মদনকে উদ্দীপিত করার জন্য যেন অতিতীক্ষ্ণ শরের আঘাত হানে।

সুন্দর আম্রমঞ্জরী যার উৎকৃষ্ট বাণ, সুন্দর পলাশ ফুল যার ধনুক, ভ্রমরশ্রেণী যার ধনুকের গুণ, চাঁদ যার নিষ্কলঙ্ক শ্বেতচ্ছত্র, মলয় বাতাস যার মত্ত হাতি, কোকিল যার বৈতালিক সেই ভুবনবিজয়ী বসন্তসখা অনঙ্গদেব বারবার তোমাদের মঙ্গল করুন।

শৃঙ্গাররসাষ্টক

যা সমস্ত গুণের অতীত, যেখানে সুখদুঃখের বোধ থাকে না, এমন একটি বস্তুকেই এ সংসারে কোন কোন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক মোক্ষ বলে থাকে। আমার মতে কিন্তু যার মদনহাস্যে মধুর তারুণ্যতরঙ্গিত রতিরম্য মদির নয়ন এমন তরুণীর নীবিবন্ধনের মোক্ষ বা মোচনই প্রকৃত মোক্ষ।

আমি সুবাসিত রম্যগৃহে শুয়ে প্রিয়ার স্তন দুটি বুকে নিয়ে, ওগো প্রিয়ে, ওগো মুগ্ধা, ওগো কুটিলনয়না, ওগো চন্দ্রাননা প্রসন্ন হও—একথা বলতে বলতে নিমেষে রাত কাটিয়ে দেব।

এখন ত সন্ধ্যা, চাঁদ ত এখন ওঠে না, চাঁদের কিরণও প্রখর হয় না। আকাশে কি দাবানল জ্বলে উঠল নাকি? নির্মল আকাশে বজ্রাগ্নিই বা আসবে কোথা থেকে? বুঝেছি, বিরহিণী পথিকবধূর প্রাণবায়ু সেবনের আশায় রাত্রিরূপিণী সাপিনী ছুটে আসছে। এ হচ্ছে তারই ফণা থেকে ঠিকরে পড়া আলো।

রাতে প্রিয়াবিচ্ছেদে বিধুর চক্রবাক আসছে, যাচ্ছে, জলে পড়ছে, পদ্মাঙ্কুরগুলো নাড়া দিয়ে খুঁজে দেখছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে, পাগলের মত ঘুরছে এবং মৃদুমন্দ গুঞ্জন করছে।

ভ্রমরদল পদ্মে এসে বসায় ছায়া হয়েছে। তাই সন্ধ্যা না হলেও সন্ধ্যা ভেবে প্রিয়াবিচ্ছেদে ভীরু চক্রবাক দিনকে রাত বলে মনে করছে। তাই খাবার জন্য যে বাঁকাপদ্মের নলটি ভেঙ্গেছিল, চাঁদ মনে করে সে আর তা মুখে তুলছে না। তৃষ্ণার্ত হয়েও পাতার উপরকার জলবিন্দুকে তারা মনে করে তা আর পান করছে না।

সুগন্ধে ভরা সোনার বরণ কেতকীকে জগতে সকলেই জানে। পদ্ম-ভ্রমে সেই কেতকীর মাঝে এসে পড়ল ভ্রমর। পরাগে চোখ তার অন্ধ হলো, কাঁটায় তার পাখা ছিঁড়ে গেল। হে সখা, এ অবস্থায় সে থাকতে পারছে না, যেতেও পারছে না।

শিবকে দেখে পার্বতী কাঁপতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় ক্ষীণ দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। ফেরবার জন্য পা তুলে তিনি তা তুলেই রইলেন। পথে শিলায় প্রতিহত হলে নদী যেমন অস্থির হয়ে ওঠে, তিনিও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন—এগোতেও পারলেন না, স্থির হয়ে থাকতেও পারলেন না।

রতিশ্রমে যাদের অঙ্গ পীড়িত, প্রিয়বাহুপাশে বাঁধা পড়ে এখনও যারা নিদ্রিতা তারা শীঘ্রই বাড়ি ফিরে যাক, সূর্য উঠছে। কাকেরা একথা বলার জন্যই যেন কা কা করছে অর্থাৎ কে কে নিদ্রিতা আছে এখনো।

শৃঙ্গারতিলক

প্রথম তিলক

কন্দর্পের বাণরূপ বহ্নিতে যারা পরিদগ্ধ তাদের জন্যই বিধাতা রমণীদেহরূপ রম্য সরোবর নির্মাণ করেছেন। রমণীর বাহু দুটিই তার মৃণাল, মুখই তার পদ্ম, লাবণ্যলীলাই তার জল, নিতম্ব তার শিলা-সোপান আর চঞ্চল নয়ন তার শফরী। কেশকলাপ তার শৈবাল, আর প্রিয়ার স্তন দুটিই তার চক্রবাকমিথুন।

মধুযামিনী এল। কিন্তু যদি প্রিয়া না আসে, তবে মদনানলে প্রাণ যাক। যদি আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করি তাহলে প্রার্থনা করি যেন কোকিলের মুখ বন্ধ করার জন্য ব্যাধ হই, চাঁদকে গ্রাস করার জন্য রাহু হই, কামদেবের পক্ষে যেন শিবনেত্রের অনল হই আর প্রাণনাশের পক্ষে যেন স্বয়ং কামদেব হই।

হে সখী, তোমার কপোলতলে কস্তূরীরচিত প্রথরচনা ঠিক তেমনই আছে, ভ্রষ্ট হয়নি। স্তনতটে মুছে যায়নি চন্দন। অধরে তাম্বুলরাগও স্খলিত হয়নি। কি ব্যাপার? তুমি কি কুপিতা হয়েছিলে না তোমার পতি নিতান্ত বালক?

সখী, এসবের কারণ শোন। তোমাকে সব খুলে বলছি। রতিগৃহে গিয়ে আমি কুপিতা হইনি, আমার প্রিয়তমও বালক নয়। নবযৌবনা, সচকিতা ও কন্দর্পবিহারিণী আমাকে দেখামাত্র প্রবাসপ্রত্যাগত তাঁর রেতঃপাত হয়ে গেল। তাই রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া তিনি প্রবাস থেকে ফিরে এসেছেন বলে দীর্ঘ সময় বিদেশের নানা কথা প্রসঙ্গে অর্ধেক রাত কেটে গেল। তারপর আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ কেবল শুরু করেছি অমনি পূর্বদিক রক্তাভ হয়ে উঠল সপত্নীর মত।

দ্বিতীয় তিলক

প্রিয়া, বিধাতা পদ্ম দিয়ে নয়ন, কুন্দফুল দিয়ে দন্ত, নবপল্লব দিয়ে অধর এবং চম্পকদল দিয়ে অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু পাষাণ দিয়ে হৃদয় নির্মাণ করলেন কেন?

যে ব্যক্তি পদ্মদলের উপরে একটি খঞ্জনকে দেখে, সে রাজোচিত চতুরঙ্গ সেনার আধিপত্য লাভ করে। আর আমি তোমার মুখপদ্মের উপর তোমার নয়নরূপ দুটি খঞ্জন দেখলাম। জানি না, এ দৃশ্য আমাকে কোন্ ভাগ্যের অধিকারী করে তুলবে?

হে মুগ্ধা, যারা দৈবাৎ পদ্মে একটি খঞ্জন দেখে তারাই ভাগ্যবানের প্রসিদ্ধি লাভ করে বহু ভূমির অধিকারী হয়। আর তোমার মুখপদ্মে নয়নরূপ দুটি খঞ্জন যারা দেখে তারা মদনবাণ বর্ষণে বিকল হয়। কী অদ্ভুত!

হে প্রিয়া, অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করো, বাইরে থেকো না, চন্দ্রের রাহুগ্রাসের সময় এটা। তোমার মুখের বিপুল লাবণ্য দেখে পূর্ণচন্দ্র ত্যাগ করে রাহু তোমার মুখচন্দ্রকেই গ্রাস করবে।

তৃতীয় তিলক

হে কুম্ভবর, তোমাকে বহুবার শুকনো কাঠে আঘাত করা হয়েছে। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে হয়েছে তোমাকে। তারপর দেহে পঙ্ক লেপন

করে পোড়ানো হয়েছে তোমাকে। এসবই বরণীয় বলব তোমার পক্ষে, কারণ তুমি প্রিয়ার স্তনতটে লালিত হয়ে তার বাহুলতার হিল্লোলে লীলাসুখ ভোগ করছ। দুঃখ বিনা কি সুখলাভ হয়?

নির্লজ্জ, কেন কাছে ঘেঁষে জোর করে আমার মুখচুম্বন করছ? লজ্জা করে না? আমার আঁচল ছাড়ো, ছেড়ে দাও বলছি। ধূর্ত, বাগাড়ম্বরসর্বস্ব শপথের আর প্রয়োজন নেই। কারণ সারারাত জেগে জেগে আমি ক্লান্ত। সেই নবীনা প্রিয়ার কাছেই যাও। ফেলে দেওয়া নির্মাল্যকুসুমে ভ্রমরেরা কি আর লুব্ধ হয়?

চতুর্থ তিলক

হে পথিক, আমার স্বামী বিদেশে বাণিজ্যে গেছেন, তাঁর খবরও পাচ্ছি না। তাঁর মা অর্থাৎ আমার শাশুড়ী তাঁর মেয়ের ছেলে হওয়ায় আজ সকালে জামাইবাড়ি গেছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, আমার বাড়িতে রাতে কি করে থাকবে তুমি? এখন সন্ধ্যা। তুমি অন্য কোথাও যাও।

এ রাত ঘন মেঘে ঢাকা পড়ায় ঘোর অন্ধকার। কর্মক্লান্ত আমার পতি নিদ্রামগ্ন। আমি বালিকা, কন্দর্পের ভয়ে থর থর কাঁপছি। এ গ্রামে বড় চোরের উপদ্রব। হে পথিক, ঘুমিও না, ওঠ।

এ বালিকা দেখছি সাক্ষাৎ ব্যাধ, ভ্রূ যুগল ব্যাধের ধনু, আর কটাক্ষ যেন বাণ। আমার মনটা এই ব্যাধের হাতে হরিণের মত হলো।

পঞ্চম তিলক

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

ভাই কোথায় চললে?

বৈদ্যের বাড়ি।

সেখানে কেন?

রোগের উপশমের জন্য।

সর্বরোগহারিণী প্রিয়তমা কি বাড়িতে নেই? যদি বায়ু হয়ে থাকে

তবে কুচকুম্ভমর্দনেই তা যাবে। যদি পিত্ত কুপিত হয়ে থাকে মুখামৃত-পানেই তা নিরাময় হবে। আর যদি শ্লেষ্মা হয়ে থাকে রতিক্রিয়ার পরিশ্রমেই তা দূর হবে।

হে বালিকা, হে হরিণায়ত নয়না, আমার দিকে তাকাও। বিষই বিষের ওষুধ—এটাই পূর্বের জনশ্রুতি।

মদনাগ্নির শিখা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট। বাইরের চন্দনের প্রলেপে কি আর তার জ্বালা কমবে? যাতে কাঁচা হাঁড়ি পোড়ানো হয় সেই উনোনের উপর পাঁকের প্রলেপে উত্তাপ বেড়েই যায়, কমে না।

যে সব মত্ত বারাঙ্গণাদের নয়নসৌন্দর্য দেখে নয়নসৌভাগ্যে ভাগ্যবান কৃষ্ণসার মৃগেরা দেশত্যাগ করেছে তাদেরই স্তনযুগলের বিশালতার কাছে পরাজিত হয়ে গজেরা এখনো মদমত্ত হয়। মূর্খ বারবার পরাজিত হলেও অভিমান প্রকাশ করে না।

ষষ্ঠ তিলক

ফুল ফোটার কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। হে বালিকা, কেন তোমার মুখপদ্মে দুটি পদ্ম দেখছি?

সুন্দরী, তোমার স্তন দুটি পতিত হলো কেন? এই প্রশ্ন হলে—

মূর্খ, দেখ এই অধস্থল উৎখাত হলে পর্বতও ভূমিসাৎ হয়—এই উত্তর হয়।

কামিনীর স্তনমণ্ডলে এক অপূর্ব অগ্নি দেখা যায়। দূর থেকে যা অঙ্গে তাপ দেয়, কিন্তু হৃদয়ে লগ্ন হলেই তা শীতল হয়ে যায়।

হে কমলনয়না, এই স্তনযুগলকে পতিত দেখে বৃথা পরিতাপ করছ। দেখ, অত্যুন্নত জনতাপকারী সহস্ররশ্মি সূর্যও পতিত হয়। পরকে যারা তাপিত করে তাদের এমনিই হয়ে থাকে। এতে বিস্মিত হবার কি আছে?

হে কমলনয়না, আমার উপর সত্যি যদি তোমার ক্রোধ হয়ে থাকে আর যদি অভিপ্রেত হয় তাহলে আর অন্য কি করবার আছে? তাহলে আমার দেওয়া আগেকার সেই আলিঙ্গন আর চুম্বনগুলো ফিরিয়ে দাও।

হে কামদেবের আম্রমঞ্জরী, হে কমলায়ত চারুলোচনা, আমার মন হরণ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ? দেশটা কি অরাজক?

সপ্তম তিলক

হে জীবনবন্ধু, তুমি এখন প্রবাসেই কিছুদিন কাটাও। এদেশ এখন বাসের অযোগ্য। চাঁদের কিরণও এখানে তাপ দেয়।

হে কল্যাণী, চন্দনরসে অঙ্গ সিক্ত করে তিন দিন কোনরকমে কাটাও। ফিরে এসে দুই বাহুতে তোমাকে আলিঙ্গন করে চাঁদের কিরণের চেয়েও বেশী শীতলতা দান করব।

পুষ্পবাণবিলাস

শ্রীমতী গোপবধূদের স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনে উন্নত স্তনের মর্দনতা-বশতঃ চন্দনরেণু বিগলিত হলেও যিনি প্রকৃতিসিদ্ধ সৌরভ বহন করেন, রাত্রিজাগরণের ফলে রক্তিম আভায় রঞ্জিত যাঁর নয়ন দুটি প্রভাতে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে, সেই বেণুধ্বনিরসিক কোন জারশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের রক্ষা করুক।

সহস্র যুবতীর সঙ্গে ক্রীড়াশীল নন্দ নন্দনের যে বিচিত্র চরিত্র ভুবনে বিদিত সেইসব অবলম্বন করে মনোজ্ঞ শৃঙ্গারকাব্য রচনায় ইচ্ছুক আমার প্রতি বীণাপাণি প্রসন্ন হোন।

কান্ত দৃষ্টিপথে এলে ভ্রূবিলাসিনীর নয়ন দুটি বিকশিত হলো, পরে তাকে নির্জনে পেয়ে তার অঙ্গ পুলকিত হলো। কান্ত স্তনগ্রহণে উৎসুক হলে সারাদেহে কম্পোদয় হলো। তিনি কণ্ঠে আলিঙ্গন করলে তার দৃঢ়বন্ধ নীবীবন্ধও শিথিল হয়।

অরবিন্দসুন্দরমুখী এই কুরঙ্গনয়না কাছের মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে মুখে একটু হাসি নিয়ে হাত দিয়ে চোখের প্রান্ত আড়াল করে

দূর থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে অনেকক্ষণ ধরে। এখন আবার তার তুঙ্গ স্তনাঙ্গন থেকে উত্তরীয়ের সুন্দর আঁচলটি খসে পড়েছে।

সুন্দরী, দেখ মাধবীলতার মধ্যে এই কুঞ্জগৃহটি ঝরেপড়া ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এটি একেবারে নিশ্ছিদ্র। বিলাসিনীরা যদি রতি-কালে অস্ফুটধ্বনি করেও ফেলে, তাহলে কোকিলের কুহুস্বরে তা ঢাকা পড়ে যাবে।

বিম্বফল মনে করে তোমার ঠোঁট পাখিতে ঠুকরিয়েছে। তুমি আকুল হয়ে ছোটাছুটি করায় তোমার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে, ঘামে তোমার মুখের তিলক মুছে গেছে। কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তোমার দেহ। কানফাটানো কাঁকনধ্বনি তুলে হাত দুটি নাড়তে নাড়তে বনের টিয়াটি ধরার জন্য কেন ঘুরছ? এদিকে তোমার ননদ এসে ত ফুল তুলে নিয়ে গেলেন।

এক করপল্লবে বিস্রস্ত কেশপাশ ধরে অন্যটিতে শাড়ির আঁচল স্তন-মণ্ডলে তুলে এ কামিনী কান্তগৃহ হতে সাক্ষাৎ রতিপতির জয়লক্ষ্মীর মত বেরিয়ে আসছে। তার দেহে কান্তদেহের চন্দনের ছাপ লেগেছে, কান্তমুখের তাম্বূলরাগে অধর তার রক্তবর্ণ।

অয়ি চন্দ্রমুখী, প্রিয় দূর দেশে যাবে বলে আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কারণ বিশ্বভুবনকে যে চাঁদ আনন্দিত করে সেই চাঁদ এখন আমার শত্রুর মত। তা ছাড়া কোকিলের এই কলগুঞ্জন আমার বিলাপের উদ্রেক করছে। হায়! পরম উপভোগ্য মন্দগতি সমীরণও আমার প্রাণ হরণ করছে।

তাপ নিবারণের জন্য সে নবকিশলয়ে শয্যা রচনা করছে। কিন্তু তপ্ত করপদ্মের স্পর্শে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। মদনানলে অঙ্গ তার অঙ্গারের মত হয়ে উঠেছে। কোমলাঙ্গীর এই দারুণ পরিতাপ কে বর্ণনা করবে?

সখা, আজ চাঁদ পদ্মে শয়ন করছে। নীলোৎপলদুটি থেকে স্বচ্ছ মুক্তামালা নির্গত হচ্ছে। স্বর্ণলতাকে শুভ্রতা বেষ্টন করছে। অর্থাৎ নায়িকার চোখে জল ঝরছে এবং তার স্বর্ণকান্তি ম্লান হয়েছে। আর

কোমল কোরক দুটির স্পর্শে অভিনব পুষ্পমালা ম্লান হয়ে পড়েছে। এই সব দুর্লক্ষণ আমার অন্য নায়িকার কাছে যাবার স্পৃহাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

দূতী, তোর নয়নপদ্মদুটি দেখছি নিতান্ত ক্লান্ত, তোর কপালে ঘর্মজলের বিন্দুগুলো মুক্তোর মত শোভা পাচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিস তুই। হায় সুন্দরী, চাঁদের আলোর তাপে যাতায়াত করে তুই আমার জন্য কি কষ্টই না করলি ?

সখী দেখ, চক্রবাকীর মত রমণীয়া, বনহরিণীর মত চকিতনয়না, কোমলাঙ্গী কামিনী এই দুরন্ত বসন্তে বিরহ সহ্য করতে না পেরে মরবার সংকল্প নিয়ে রাশিকৃত অঙ্গারের মত নবপল্লব শয্যায় পড়ে আছে।

হায়, আজ কলকণ্ঠ কোকিলের নিষ্ঠুরতা, পূর্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতা, দক্ষিণ সমীরের দাক্ষিণ্যহানি সেই অবলার মৃত্যু ঘটাতে যেন জোট বেঁধেছে। শুধু তৃণাদি কেঁপে উঠলে নায়ক ফিরে এল ভাবায় মৃত্যুতে বিঘ্ন ঘটছে।

অয়ি কোমলাঙ্গী, নয়ন অশ্রুসিক্ত করো না, শলাকা দিয়ে লাগানো কাজল ধুয়ে যাচ্ছে, তীব্র নিঃশ্বাস রোধ করো, নবমালিকা শুকিয়ে যাচ্ছে। হায়, শয্যায় লুটিয়ে পড়ো না, অঙ্গরূপ নষ্ট হয়ে যাবে। প্রিয়ের সময় এখনো চলে যায়নি। অন্য কিছু মনে করো না।

সর্বজনের চিত্তবিক্ষেপকারী কোন এক শশীমুখী সখীদের মাঝে বসে চঞ্চল চোখ ও ভ্রূর ইশারায় সখীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ চোখে কাজল দিয়ে পীনোন্নত স্তনদুটিতে স্থিত মণিমালিকাটি আঁচল দিয়ে ঢাকল।

সখা, দেখ, জ্যোৎস্না এই সুন্দরীর মুখের আঘ্রাণ নিচ্ছে, পক্কবিম্বের প্রভা এর অধর চুম্বন করছে। রম্য কমলমুকুলের লাবণ্য এর স্তন স্পর্শ করতে চাইছে। কোকিলদের কান্তি এর হাতদুটি ধরে খেলা করছে। প্রবালদ্যুতি এর পদসেবা করছে।

দূতী, আমি তোকে যা বলেছি সব করেছিস। তোর মত পরহিত-পরায়ণা এ সংসারে নেই। হায় কোমলাঙ্গী, আমার জন্য গিয়ে তুই শ্রান্ত

হয়ে পড়েছিস। শ্রম ছাড়া কি সংকৃত সিদ্ধ হয়?

প্রিয়া আগের মত আর কেশপাশে মালা পরছে না, মৃগনাভিচিত্রে সজ্জিত করছে তার অঙ্গ, আমার সামনে আর বিলাসগমনে চলাফেরা করছে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে অপ্রিয় উত্তর দিচ্ছে।

বালিকা, গোপন আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, স্তনস্পর্শাদি যত সব ললিত-ক্রিয়া তুমি খলদের ভয়ে বিস্মৃত হয়েছ। তোমার সঙ্গে এখন কথা বলাও কত কঠিন। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই, তোমার দেখা পাওয়াই দুর্লভ হয়ে উঠল, এতেই আমার দুঃখ।

সখা, স্মিতাননে যে কলঙ্কী চাঁদের লজ্জা জন্মায়, বচনে যে গৃহ-শুকের কণ্ঠকেও নিন্দা করে, নিঃশ্বাসে পদ্মবাসিত বায়ুকেও অতিক্রম করে, তোমার কি সেই সখী বিরহব্যথায় ব্যথিত বলে আজ সেই চাঁদ, শুক আর বায়ু তোমায় এই শোচনীয় দশায় এনে ফেলেছে?

সখা, যদি সেই তন্বী গান করে বীণাধ্বনি শ্রুতিকটু মনে হয়। যদি স্মিতহাস্য প্রকাশ পায় তাহলে চাঁদকে মলিন বলে মনে হয়। তার চোখের সামনে যদি নবোৎপল থাকে তবে তা ম্লান হয়ে যায়। তার রূপের কাছে এই বিদ্যুল্লতাও বিবর্ণ মনে হয়।

হে নাথ, তুমি যে বলেছিলে আমার অনুরাগ তোমার চেয়ে অনেক বেশী। একথা সত্য, কারণ আমাকে দেখার জন্য এই ভোরবেলাতেই বাড়িতে এসেছ, কিন্তু তোমার বুকে এই কুস্কুমপত্র রচিত রাগ, চোখে জাগরণজনিত রাগ এবং কপালে লাক্ষারসজনিত রাগ ভালভাবেই ধারণ করে আছ।

হে প্রাণনাথ, এই বসন্তে তুমি দেশান্তরে যেতে চাইছ। তবু আমি আসন্ন বিরহে ভয় পাচ্ছি না। কারণ ঐ দেখ কুমুদফুলের কেশরসৌরভে সুবাসিত মনোরম সমীরণের সঙ্গে রাত্রিতে চাঁদের স্বচ্ছ রশ্মিচ্ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অয়ি মানিনী, সখীদোষজনিত এই অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ ত্যাগ করে আমাকে মুখ দেখাও। আমার চোখের জড়তা দূর হোক। প্রিয়া, তোমার মধুর কথা কানে আমার অমৃত বর্ষণের সুখ দান করুক।

আমার সব তাপ জুড়িয়ে দিক। ধীরে ধীরে তোমার অনুগ্রহশীতল দৃষ্টি দান করো।

মান করায় এই অভিমানিনী বালিকার মন ম্লান। সে অবনত প্রিয়তমের দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সে চলে গেলে বালিকা অত্যন্ত পরিতাপ করছে। সখীরা তাকে জোর করে ধরে আনলে বালিকা মৌন হয়ে থাকছে আবার প্রিয়তম চলে যেতেই সে কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়ছে।

তার কথা একবার শুনলে কর্ণপীড়াদায়ক মনে হবে কুহুরবে। তার মুখকান্তি যতদিন লোকে দেখেনি ততদিনই চাঁদের সুষমায় আকৃষ্ট হয়েছে তারা। তার নয়নদুটির সামনে মৃগীদের চোখ বন্ধ করে থাকাই ভাল। যতদিন তাকে দেখিনি ততদিন স্বর্ণলতাকেই সুন্দর বলে মনে হত।

শ্রুতবোধ

কোন শ্লোক কোন ছন্দে নিবন্ধ, তার লক্ষণ শ্রবণমাত্র যার সাহায্যে বোঝা যায় শ্রুতবোধ নামক সংক্ষিপ্ত ছন্দোগ্রন্থের কথা এবার বলব, শ্রবণ করো।

অনুস্বার ও বিসর্গসংযুক্ত স্বরবর্ণ, সংযোগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর—আ, ঈ, উ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ—এদের গুরুবর্ণ বলে। শ্লোকপাদের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর কখনো কখনো দীর্ঘ হয়, কখনো হয় না।

যা এক প্রযত্নে বা একমাত্রায় উচ্চারিত হয় তা হ্রস্ববর্ণ। যা দুই বর্ণে উচ্চারিত হয় তা দীর্ঘস্বর। প্লুতস্বরের তিন মাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা হয়ে থাকে।

শ্লোক পড়ার সময় জিহ্বা যে স্থানে বিশ্রাম চায় কবিগণ তাকে যতি বলে থাকেন। তাকে বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি আখ্যা দ্বারাও অভিহিত

করা হয়।

যে শ্লোকের প্রথম পাদে ও তৃতীয় পাদে মাত্রা দ্বাদশসংখ্যক, দ্বিতীয় পাদে অষ্টাদশ ও চতুর্থে পঞ্চদশ তা আর্যাবৃত্ত ছন্দে গ্রথিত।

হে হংসগামিনী, অমৃতভাষিণী, যে উত্তমার্ধ আর্যাবৃত্তের পূর্বার্ধের মত নমিত হয়, ছন্দোবিদগণ তাকে আর্যাগীতি বলে নির্দেশ করেন।

সুন্দরী, যে ছন্দে প্রথমার্ধ আর্যার উত্তমার্ধের মত প্রযুক্ত হয়, মহাকবিগণ সে বৃত্তকে উপগীতি বলে থাকেন।

কোন ছন্দে যদি প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু থাকে তবে তা অক্ষরপঙ্‌ক্তি নাম ছন্দ বলা হয়।

হে নীলপয়োধরা, যে ছন্দে প্রথম চারিটি বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণদ্বয় গুরু তা ষড়ক্ষর শশীবদনা নাম ছন্দের লক্ষণ।

হে মৃগনয়না, কোন শ্লোকে পাদের চতুর্থ বর্ণ যদি লঘু দৃষ্ট হয়, বিদ্বানগণ তাকে মদলেখা ছন্দ বলে অভিহিত করেন।

সকল অষ্টাক্ষর অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রথিত শ্লোকে সকল পাদের ষষ্ঠ গুরু ও পঞ্চম লঘু হবে। ঐরকম দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু, প্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক।

মতান্তরে সাধারণ অষ্টাক্ষর অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ এই,—দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের পঞ্চম ও সপ্তম বর্ণ লঘু হবেই এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া প্রথম ও তৃতীয় পাদের পঞ্চম, সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়ে থাকে।

আদ্য, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বর্ণ গুরু হলে পণ্ডিতগণ তাকে মানবকাক্রীড় ছন্দ বলে।

যখন শ্লোকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ণ গুরুরূপে প্রযুক্ত হয় বিদ্বানগণ তাকে নগনামক ছন্দ বলেন।

হে বীণাধারিণী, যে ছন্দে চার চার অক্ষরের পর যতি বা বিশ্রাম নির্দিষ্ট, শ্লোকের সকল বর্ণই গুরু, পণ্ডিতগণের মতে তা বিদ্যুন্মালা ছন্দ বলেন।

অয়ি কৃশাঙ্গী, প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও অন্ত্য বা দশম গুরু

হলে এবং পাঁচ পাঁচ অক্ষরের পর যতি থাকলে তাকে চম্পকমালা ছন্দ বলা হয়ে থাকে।

প্রেমময়ী, যে শ্লোকে উক্ত চম্পকমালা ছন্দ কেবল অন্ত্যবর্ণহীন হয়, তাছাড়া আর সব অবিকলভাবে বিরাজ করে ছন্দশাস্ত্রনিপুণ কবিগণ তাকে মণিমধ্য ছন্দ বলেন।

কমলমুখী, মন্দাক্রান্তাছন্দের শেষ সাতটি অক্ষর ত্যাগ করে পাঠ করলে যেমন অক্ষরবিন্যাস শ্রুত হয় তা হলো হংসীছন্দের লক্ষণ।

সুন্দরী, যে ছন্দে ষষ্ঠ, অষ্টম, অন্ত্য বা একাদশ বর্ণ মাত্র লঘু, চারি বর্ণের পর সপ্তম বর্ণে যাতে যতি আছে, ছন্দোজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাকে শালিনী নামে অভিহিত করেন।

অয়ি পৃথুজঘনা, মদনোদ্দীপিনী, যে ছন্দের আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট লঘু হয় তাকে দোধক ছন্দ বলা হয়।

জঙ্ঘানুবৃত্তশালিনী, মরালগামিনী প্রিয়ে, প্রতি পদক্ষেপে তুমি হংসকান্তি মলিন করেছ, তোমাকে ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের পরিচয় দান করছি। হংসগতির মত যার তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ লঘু উচ্চারিত হয় তাই মহাকবিগণের প্রিয় ইন্দ্রবজ্রাবৃত্ত ছন্দ।

যদি উপরোক্ত ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের প্রতি পাদের প্রথম বর্ণ লঘু হয় তবে তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে।

হে চন্দ্রমুখী, শ্লোকের চারিপাদে যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্র-বজ্রার অক্ষরমালা বিন্যস্ত হলে বিদ্বানগণ তাকে উপজাতি ছন্দ বলেন জানবে।

কিন্তু মনীষিণী, শ্লোকের প্রথম পাদে ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্ট তিন পাদে উপেন্দ্রবজ্রা গ্রথিত হলে তাকে পণ্ডিতগণ আখ্যানকী ছন্দ বলে থাকেন।

চন্দ্রমুখী, রথের উদ্ধত গতির মত যে ছন্দে প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও একাদশ বর্ণ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, কবিগণ তাকে রথোদ্ধতা ছন্দ বলে নির্দেশ করেন।

হে মৃগনয়না, বিনতস্বভাবা, রথোদ্ধতাবৃত্তের যেমন নবম বর্ণ গুরু ও দশম বর্ণ লঘু হয় তার বিপরীতভাবে যদি বর্ণবিন্যাস হয় অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণ রথোদ্ধতার মত বিন্যস্ত হয়ে কেবল নবম বর্ণ লঘু ও দশম বর্ণ গুরু হয় তবে প্রাচীন কবিগণ তাকে স্বাগত ছন্দ বলেন।

অয়ি নিবিড়কুচভারনতাঙ্গী, অমন্দরতিরসিকে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হলে তা তোটক ছন্দ নামে অভিহিত হবে।

বিলাসিনী, তোটক ছন্দের পঞ্চম অক্ষর যদি গুরু হয়, আর ষষ্ঠ অক্ষর গুরু না হয়ে লঘু হয়, তবে তা প্রমিতাক্ষরা ছন্দ নামে আখ্যাত হয়।

হে শরদিন্দুনিন্দিমুখকমলা, কবীন্দ্রায়ণ ভুজঙ্গপ্রয়াতের লক্ষণ নির্ণয় করে বলেছেন, তাতে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ হ্রস্ব হবে, অবশিষ্ট গুরু হবে। সর্পের গতির মত মাঝে মাঝে হ্রস্ব বর্ণোচ্চারণে দ্রুতগতি লক্ষিত হয় বলে তা ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ নামে খ্যাত।

সুন্দরী, দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই যে, শ্লোকের চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু। প্রথমে লঘু বর্ণের দ্রুত উচ্চারণও মধ্যে মধ্যে গুরু বর্ণের বিন্যাসের জন্য উচ্চারণে বিলম্ব হয়—এই কারণে এ ছন্দের নাম হয়েছে দ্রুতবিলম্বিত।

হে কমলানয়না, উক্ত দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রথমে যে তিনটি লঘু বর্ণ বিন্যাসের নিয়ম আছে, তা না হয়ে যদি দুটি লঘু বর্ণ বিন্যস্ত হয় অর্থাৎ যদি দ্বাদশাক্ষর ছন্দ একাদশ অক্ষরে সম্পন্ন হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ অবিকল দ্রুতবিলম্বিতের মত থাকে তবে তাকে হরিণীপ্লুতা ছন্দ বলা হয়ে থাকে।

অয়ি মত্তভ্রূশালিনী, উপেন্দ্রবজ্রাবৃত্তের মত সকল চরণ হয়ে যদি শেষ বর্ণের আগে একটি অধিক লঘুবর্ণ বিন্যস্ত হয় তবে তা বংশস্থবিল ছন্দরূপে পরিণত হয়।

কিন্তু হে অশোকতরুকরতলে, যৌবনোদ্দামবিলাসিনী প্রিয়ে, উক্ত বংশস্থবিলবৃত্তের প্রথম বর্ণ গুরু হলে কবিদের মতে—তা হবে ইন্দ্রবংশ ছন্দ।

অমৃতভাষিণী, প্রভাবতী ছন্দের নিয়ম এই যে, এই ছন্দে ত্রয়োদশটি অক্ষর থাকবে। তার মধ্যে প্রথম দুটি বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও অন্ত্যবর্ণ বা ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু হবে এবং অন্যান্য লঘু হয়ে চতুর্থ ও ত্রয়োদশ বর্ণে যতি হবে।

হে কুন্দদন্তি মধুরভাষিণী, ত্রয়োদশ বর্ণাত্মক ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, অষ্টম, দশম ও শেষ দুই বর্ণ গুরু হলে তার নাম হবে প্রহর্ষিণী। তাতে তৃতীয় বর্ণে যতি, অন্ত্যেও যতি আবশ্যক।

অয়ি প্রিয়ে, যদি চতুর্দশাক্ষর ছন্দের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বর্ণ গুরু হয় এবং অষ্টমে ও অন্ত্যে যদি যতি দেখা যায় তবে তাকে বসন্ততিলক ছন্দ বলা হয়।

হে প্রিয়তমে, যে পঞ্চদশাক্ষর ছন্দের প্রথমেই ছয়টি লঘু বর্ণ বসে পরে দশম ও ত্রয়োদশ বর্ণ লঘু এবং অষ্টমে ও সপ্তমে অর্থাৎ অন্তে যতি থাকে তবে তাকে কবিজনপ্রিয় মালিনী ছন্দ বলে।

সুমুখী, সপ্তদশাক্ষর ছন্দের প্রথম পাঁচটি লঘু বর্ণ, পরে একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ বর্ণ লঘু হয় এবং উপান্ত্যবর্ণ বা শেষবর্ণের পূর্ববর্ণ লঘু থাকে তবে হে কনকোজ্জ্বলাঙ্গী, সে ছন্দ হরিণী ছন্দ নামে অভিহিত হয়। তার ষষ্ঠে, দশমে ও সপ্তদশে যতি থাকে।

কিন্তু হে কমলসদৃশস্বভাব কোমলাঙ্গী, উক্ত সপ্তদশাক্ষর ছন্দের প্রথম বর্ণ লঘু হয়ে পরপর পাঁচটি গুরুবর্ণ বসলে এবং আবার পাঁচটি লঘু বসে দুটি গুরু বসে অবশেষে শেষে পূর্ববর্তী তিনটি বর্ণ লঘু হয়ে অন্তে গুরুবর্ণ বিন্যস্ত হলে তাকে শিখরিণী ছন্দ বলা হয়। তার ষষ্ঠে ও অন্তে যতি থাকে।

অয়ি প্রিয়ে, ভ্রমরকৃষ্ণকুন্তলে, গভীরনাভিহ্রদাবর্তে, যে সপ্তদশ অক্ষরের ছন্দের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও শেষ বা সপ্তদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যার অষ্টমে যতি পদান্তে যতি রক্ষিত হয় তাকেই পৃথ্বি ছন্দ বলা হয়।

কুমুদপরিমলবাহিনী অয়ি মুগ্ধে, মন্দাক্রান্তাছন্দের প্রথমে চারটি বর্ণ গুরু বসে পাঁচটি লঘু বসে এবং পরে দশম ও ত্রয়োদশ গুরু হয়ে

একটি লঘুবর্ণ বসে পরে অন্তিম দুটি বর্ণ অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ এই দুই বর্ণ গুরু হয়। চতুর্থ বর্ণে যতি থেকে তার ষষ্ঠে অর্থাৎ দশমে এবং তা হতে সপ্তমে অর্থাৎ পাদান্তে যতি বসে।

প্রিয়তমে, যদি প্রথম তিনটি বর্ণ এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম গুরু হয়, পরে একাদশ হতে তিনটি অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বর্ণ এবং সপ্তদশ ও অন্তিম ঊনবিংশ বর্ণ গুরু হয়, অবশিষ্ট লঘুবর্ণে বিন্যস্ত থাকে আর দ্বাদশে ও অন্তিমে যতি রক্ষিত হয় তাহলে সেই ঊনবিংশাক্ষর ছন্দকে কাব্যরসবিদগণ শার্দুলবিক্রীড়িত নামে অভিহিত করেন।

অয়ি মৃগমদবিলাসিনী, রম্ভোরু, যে ছন্দে প্রথম চারটি বর্ণ গুরু, পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম গুরু হয়ে চতুর্দশ, পঞ্চদশ বর্ণ গুরু, আবারস প্তদশ, অষ্টাদশ এবং অন্তিম দুই বর্ণ অর্থাৎ বিংশ ও একবিংশ বর্ণ গুরু এবং অন্যান্য লঘু, যার প্রথম থেকে প্রত্যেক সপ্তম বর্ণান্তে তিনবার যতি থাকে, মাননীয় সুকবিগণ তার নাম দিয়েছে স্রগ্ধরা ছন্দ।

রঘুবংশ

প্রথম সর্গ

শব্দ ও অর্থের মত নিত্যযুক্ত জগতের জনকজননী পার্বতী ও পরমেশ্বরকে শব্দ ও অর্থের জ্ঞানলাভের জন্য বন্দনা করি।

কোথায় সূর্যজাত বংশ আর কোথায় স্বল্পপরিসর বুদ্ধি। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভেলায় করে দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চাইছি।

কোন খর্বাকৃতি ব্যক্তি যদি দীর্ঘাকৃতি পুরুষের লভ্য ফল আহরণের জন্য হাত বাড়ায় তাহলে সে যেমন উপহাসাস্পদ হয় তেমনি আমি অপটু ও অযোগ্য হয়েও কবিখ্যাতি লাভের ইচ্ছা করে উপহাসাস্পদ হই।

অথবা মণিবিন্ধ করার যন্ত্রদ্বারা উৎকীর্ণ হলে কোন পাথরের ছিদ্র-পথে সুতো যেমন সহজে প্রবেশ করতে পারে, বাল্মীকি প্রমুখ পূর্ব-

সূরীরা এই সূর্য বংশের দ্বার বাঙময় কাব্যদ্বারা উন্মোচন করার ফলে সেই সূর্য বংশে আমার প্রবেশও তেমনি সম্ভব হবে।

যে রঘুবংশজাত পুরুষেরা আজন্ম নিত্যশুদ্ধ, ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যাঁরা কর্মত্যাগ করতেন না, যাঁরা সসাগরা ধরণীর অধিপতি ছিলেন, যাঁদের রথের পথ স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁরা বিধিমত যাগযজ্ঞ করতেন, যাঁরা অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যথোচিত দণ্ড দান করতেন, যথাকালে যাঁরা প্রবোধিত হতেন, দানের জন্যই যাঁরা অর্থ সংগ্রহ করতেন, সত্যের জন্যই পাছে সত্যের অপমান হয় এই ভয়ে যাঁরা মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্যই যাঁরা বিজয় কামনা করতেন, সন্তানের জন্যই যাঁরা দার পরিগ্রহ করতেন, শৈশবে বিদ্যালাভ, যৌবনে বিষয়-ভোগ ও বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি বা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে যাঁরা যোগবলে দেহত্যাগ করতেন, আমার বাগৈশ্বর্য অল্প হলেও তাঁদের গুণরাজির কথা শুনে চাপল্যপ্রণোদিত হয়ে আমি সেই রঘুবংশজাত পুরুষদের বংশগৌরব বর্ণনা করতে চলেছি।

যে সব সজ্জনেরা ভালমন্দ বিচারের অধিকারী তাঁরা আমার কথা শুনবেন। সোনার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আগুনেই পরীক্ষিত হয়।

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন সমস্ত মন্ত্রের আদিভূত ও মাননীয়, তেমনি রাজকুলের আদিভূত এবং মনীষীদের মাননীয় সূর্যতনয় মনু নামে এক রাজা ছিলেন।

ক্ষীরোদসমুদ্রে যেমন চন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনি মনুর পবিত্র বংশে দিলীপ নামে এক রাজচন্দ্রের জন্ম হয়।

তাঁর বক্ষস্থল ছিল বিপুল, স্কন্ধদেশ ছিল বৃষস্কন্ধের মত। তাঁকে দেখলে মনে হত বুঝি সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্মযোগ্য কাজ করার উপযুক্ত এক দেহ ধারণ করেছে।

সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করে, সমস্ত তেজকে ম্লান করে, সকলকে উচ্চতায় পরাভূত করে তিনি যেন মেরুপর্বতের মতই পৃথিবী আক্রমণ করেছিলেন।

আকৃতির অনুরূপ তাঁর প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অনুরূপ তাঁর বিদ্যা, বিদ্যার

অনুরূপ তাঁর কর্ম আর কর্মের অনুরূপ তাঁর সিদ্ধি ছিল।

হিংস্রজলজন্তুর জন্য ও রত্নরাজির জন্য সমুদ্র যেমন একাধারে দুষ্প্রবেশ্য ও আশ্রয়যোগ্য তেমনি তিনি তেজপ্রতাপাদিতে প্রচণ্ড অথচ দয়াদাক্ষিণ্যাদিতে রমণীয় এবং নৃপগুণে আশ্রিতদের কাছে একাধারে অগম্য ও শরণ্য ছিলেন।

সুদক্ষ সারথিচালিত রথচক্র যেমন পূর্ববর্তী রথচক্রের চিহ্ন থেকে বিচ্যুত হয় না তাঁর প্রজারাও তেমনি তাঁর শাসনে মনুর কাল থেকে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে রেখামাত্রও বিচলিত হত না।

প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন। সহস্রগুণ ফিরিয়ে দেবার জন্যই সূর্য পৃথিবী থেকে বাষ্পযোগে জল গ্রহণ করেন।

তাঁর সৈন্যবাহিনী ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদের মতই ছিল। শাস্ত্রে অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং ধনুকে আরোপিত জ্যা এই দুটি জিনিসেই সিদ্ধ হত তাঁর প্রয়োজন।

তিনি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন। তাঁর আকার ইঙ্গিতও ছিল সাধারণের অগোচর। জন্মান্তরের সংস্কারের মতই ফল দেখেই তাঁর কাজ বোঝা যেত।

মোটেই ভীত না হয়ে তিনি আত্মরক্ষা করতেন, আর্ত বা রুগ্ন না হয়েই তিনি ধর্মাচরণ করতেন, লুব্ধ না হয়ে তিনি অর্থগ্রহণ করতেন এবং আসক্ত না হয়ে সুখভোগ করতেন।

জ্ঞান সত্ত্বেও মৌন, শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা, ত্যাগ সত্ত্বেও দর্পহীনতা—তাঁর মধ্যে এই পরস্পরবিরোধী গুণগুলির সহাবস্থান দেখে মনে হত এগুলি যেন সহোদর ভাই।

তিনি ছিলেন বিষয়ে নিস্পৃহ, বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্মপ্রেমিক—এই সব গুণের জন্য জরা না এলেও যৌবনেই তিনি বৃদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন।

প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন বলে তিনিই ছিলেন তাদের পিতা। তাদের প্রকৃত পিতারা ছিলেন জন্মদাতামাত্র।

সমাজশৃঙ্খলার জন্য তিনি দণ্ড দিতেন এবং সন্তানের জন্যই দার পরিগ্রহ করেছিলেন। তাই সেই মনীষীর অর্থ ও সম্ভোগ ছিল ধর্মানুগ।

তিনি যজ্ঞের জন্য পৃথিবীকে দোহন করতেন আর ইন্দ্র শস্যের জন্য স্বর্গকে দোহন করতেন। এইভাবে সম্পদ বিনিময় করে উভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য দুই ভুবনের পুষ্টি বিধান করতেন।

রাজ্যরক্ষায় নিপুণ দিলীপের যশের অনুকরণ রাজারা করতে পারতেন না। কারণ চৌর্য তখন পরধন থেকে নিবৃত্ত হয়ে কেবল কথাতেই পর্যবসিত হয়েছিল।

সজ্জন হলে শত্রুও রোগীর কাছে ওষুধের মত তাঁর প্রিয় হত। আবার প্রিয়জন দোষযুক্ত হলে সাপে কাটা আঙ্গুলের মত ত্যাগ করতেন তিনি।

বিধাতা তাঁকে নিশ্চয় পঞ্চ মহাভূতের উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তাঁর সব গুণেই একমাত্র পরার্থেই ছিল উৎসর্গীকৃত।

অন্য কারো শাসননিরপেক্ষ এই পৃথিবীকে তিনি একটিমাত্র রাজপুরীর মতই শাসন করতেন। সমুদ্রে যেন সেই পৃথিবীরূপ রাজপুরীর পরিখা এবং সমুদ্রের বেলাভূমি যেন তার প্রাচীর।

যজ্ঞের দক্ষিণার মত তাঁর মগধরাজবংশোদ্ভূতা পত্নীর নাম ছিল সুদক্ষিণা। দাক্ষিণ্য থেকেই তাঁর নামটি ছিল উদ্ভূত।

অন্তঃপুরের পরিসর বড় হলেও অর্থাৎ তাঁর অনেক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সেই মনস্বিনী সুদক্ষিণা ও রাজলক্ষ্মী এই দুজনকে রাজা নিজেকে কলত্রবান মনে করতেন রাজা।

আত্মানুরূপা সেই পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মজন্মে উৎসুক ছিলেন রাজা দিলীপ। কিন্তু মনোরথপূরণে বিলম্ব দেখে কোনরকমে কালযাপন করছিলেন তিনি।

সন্তানকামনায় তিনি রাজ্যশাসনের গুরুভার নিজের হাত থেকে মন্ত্রীমণ্ডলের উপর অর্পণ করলেন।

তারপর সেই রাজদম্পতি পুত্রকামনায় সংযতচিত্তে বিধাতার উপাসনা করে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন।

মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিরূপ একটি রথে আরোহণ করে তাঁরা দুজন বর্ষাকালীন মধুর ও গম্ভীর ধ্বনিময় মেঘে সমাসীন বিদ্যুৎ ও ঐরাবতের মত শোভা পেতে লাগলেন।

শালতরুর পত্রভঙ্গে সুবাসিত, পুষ্পপরাগে আকীর্ণ এবং বনরাজিকে আন্দোলিত করে প্রবাহিত সুখস্পর্শ বায়ু তাদের সেবা করতে লাগল।

তাঁদের রথচক্রধ্বনিকে মেঘধ্বনিভ্রমে উন্মুখ হয়ে ময়ূরেরা দ্বিধাবিভক্ত ষড়জ স্বরের মত মনোরম কেকাধ্বনি করতে লাগল। তাঁরা সেই কেকা-ধ্বনি শুনতে শুনতে চললেন।

অভিলাষসিদ্ধির দ্যোতক বায়ু অনুকূল ছিল বলে ঘোড়ার ক্ষুর থেকে ওঠা ধূলিরাশি তাঁদের কুন্তলচূর্ণগুলি স্পর্শ করছিল। পদ্ম-দীঘিগুলির তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুর আঘ্রাণ নিতে নিতে তাঁরা চললেন। সেই বায়ু ছিল তাঁদের নিঃশ্বাসের অনুরূপ।

নিজেদের দান করা যূপচিহ্নিত গ্রামগুলিতে যাজ্ঞিকদের অর্ঘ্য ও অব্যর্থ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে চললেন তাঁরা।

সদ্যপ্রস্তুত ঘি নিয়ে গোপবৃদ্ধেরা উপস্থিত হতে লাগল। পথের ধারে গজিয়ে ওঠা বুনো গাছপালার নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাঁরা।

শীতের অবসানে চিত্রানক্ষত্র ও চন্দ্রের মিলনে যে অপূর্ব শোভা হয় শুদ্ধবেশে প্রস্থানরত সেই রাজদম্পতিরও সেই রকম শোভা হয়েছিল।

সৌম্যকান্তি রাজা যেন স্বয়ং বুধ। পত্নীকে বিচিত্র বস্তু দেখাতে দেখাতে কতটা পথ এলেন তা বুঝতেই পারলেন না।

দীর্ঘ পথযাত্রায় রথের বাহন অর্থাৎ অশ্বদুটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুর্লভ যশের অধিকারী রাজা অবশেষে সন্ধ্যায় মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে সেই সংযমী মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হলেন।

সমিৎকুশ ও ফল আহরণ করে বনান্তর থেকে ফিরে তপস্বীরা আশ্রম পূর্ণ করে তুললেন। আশ্রমের হোমাগ্নি যেন অদৃশ্যভাবে তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করল।

ঋষিপত্নীদের কুটিরের দুয়ার আগলে দাঁড়ানো মৃগেরা আশ্রমকে পূর্ণ করে তুলল। এই মৃগরা যেন ঋষিপত্নীদের সন্তানতুল্য। তাঁদের

নীবার ধানের অংশ নিতে এরা অভ্যস্ত।

আলবালে জলপান করতে অভ্যস্ত পাখিদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য মুনিকন্যারা আলবালে জল দিয়েই গাছগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। রোদ চলে যাওয়ায় নীবার ধানের গোছাগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে রাখা পর্ণশালার আঙিনায় বসে হরিণেরা রোমন্থন করছিল।

ধোঁয়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল আগুন জ্বালানো হয়েছে। হোমের গন্ধবাহী বায়ুচালিত সেই ধোঁয়া আশ্রমাভিমুখী অতিথিদের পবিত্র করছিল যেন।

'বাহনদের বিশ্রাম করাও' সারথিকে এই আদেশ দিয়ে রাজা দিলীপ তাঁর পত্নীকে রথ থেকে নামালেন এবং নিজে নামলেন।

রাজার নীতিই আশ্রমের রক্ষাবিধায়ক চোখ এবং তাই তিনি পূজ্যাস্পদ। তাঁকে ও তাঁর পত্নীকে পরম জিতেন্দ্রিয় মুনিরা অভ্যর্থনা জানালেন। তখন রাজা হোমাদি সন্ধ্যাবিধির পর বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখলেন। তাঁর পিছনে তাঁর পত্নী অরুন্ধতী বসেছিলেন। মনে হলো তিনি যেন স্বাহাসমন্বিত অগ্নিকেই প্রত্যক্ষ করলেন।

রাজা ও মগধরাজতনয়া রাজমহিষী তাঁদের প্রণাম করলেন। গুরু ও গুরুপত্নীও তাঁদের সস্নেহে অভিনন্দন জানালেন।

আতিথেয়তায় তাদের রথযাত্রাজনিত ক্লান্তি দূর হলে ঋষিরাজ্যরূপ আশ্রমের ঋষিকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তারপর শত্রুপুরবিজয়ী শব্দার্থতত্ত্ববিদ বাগ্মীপ্রবর দিলীপ সেই অথর্ববেদবিদ্ ঋষির সম্মুখে বলতে লাগলেন।

স্বয়ং আপনি যে আমার দৈবী ও মানুষী আপদরাশি নিবারণ করেন, সেই আমার সাতটি অঙ্গেই যে মঙ্গল এ ত খুবই স্বাভাবিক। আমার বাণরাজি যা দেখে তাই ভেদ করতে পারে। কিন্তু মন্ত্রকৃৎ আপনার মন্ত্ররাজিতে দূর থেকেই শত্রুরা প্রতিহত হয়। তাই আমার বাণ আপনার মন্ত্রের কাছে অকেজো বা অর্থহীন।

হে হোতা, আপনি বিধিসম্মত অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেন তাই শস্যবিঘ্ননাশী বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। আমার প্রজারা যে শতবর্ষ

জীবিত থাকে এবং শস্যবিঘ্ন রহিত হয়ে নির্ভয়ে থাকে, আপনার ব্রহ্মতেজই তার কারণ।

আপনি ব্রহ্মার পুত্র। আপনার মত গুরু এইভাবে যার মঙ্গলচিন্তা করেন সেই আমার সম্পদ কেন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন থাকবে না?

কিন্তু আপনার এই বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তানের মুখ না দেখায় দ্বীপবতী রত্নপ্রসূ পৃথিবীও তৃপ্তি দিতে পারছে না আমাকে।

আমার পর বংশে পিণ্ড দেবার কেউ রইল না দেখে নিশ্চয়ই স্বর্গত পিতৃপুরুষেরা এখন থেকেই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিন্ডাদির কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহে তৎপর হয়ে আমার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকৃত্যে পর্যাপ্ত আহার করছেন না।

আমার পর দুর্লভ হবে ভেবে আমার দেওয়া জলটুকু তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পান করেন আর সেই দীর্ঘশ্বাসে সে-জল নিশ্চয়ই ঈষদুষ্ণ হয়ে ওঠে।

তাই আজ আমার যজ্ঞসম্পাদন অন্তরে বিশুদ্ধ হয়েও সন্তান না থাকার জন্য নিমীলিত অর্থাৎ বাহ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমি যেন দৃশ্য অদৃশ্য জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত পৌরাণিক লোকালোক পর্বতের মত যার দিগ্‌মণ্ডল আলো অন্ধকারে মণ্ডিত।

তপস্যা ও দানে অর্জিত পুণ্য কেবল পরলোকে সুখের কারণ হয়। কিন্তু শুদ্ধবংশে জাত সন্তান ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সুখের কারণ।

হে বিধাতা, আমি যেন আপনার নিজের হাতে জল থেকে বর্ধিত অথচ নিষ্ফল আশ্রমতরুর মত। আমাকে সন্তানহীন দেখে আপনার দুঃখ হচ্ছে না কেন?

ভগবন! অস্নাত গজরাজের বন্ধনস্তম্ভ তার কাছে যেমন মর্মপীড়াদায়ক হয় আমার কাছে পিতৃঋণও তেমনি সুদুঃসহ হয়ে উঠেছে।

হে তাত, সেই ঋণ থেকে যাতে মুক্ত হতে পারি তাই করুন। দুর্লভ হলেও ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সিদ্ধি আপনারই আয়ত্ত।

রাজা এইভাবে সব জানালে ঋষি ক্ষণকালের জন্য ধ্যানস্তিমিতনেত্রে

যে হ্রদের মাছেরা সব ঘুমন্ত সেই হ্রদের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি ধ্যানযোগে রাজার সন্তানহীনতার কারণ প্রত্যক্ষ করলেন এবং তারপর তাঁকে সেবিষয়ে অবহিত করলেন।

তিনি বললেন, অতীতে কোন একদিন ইন্দ্রকে উপাসনা করে তুমি যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলে তখন পথে কল্পতরুর ছায়ায় কামধেনু বসেছিল। ঋতুস্নাতা এই মহিষীকে তুমি ধর্মলোপের ভয়ে স্মরণ করে তুমি প্রদক্ষিণক্রিয়ার যোগ্য এই কামধেনুর প্রতি যোগ্য আচরণ করনি। একে প্রদক্ষিণ করার কথা বিস্মৃত হয়েছিলে।

আমাকে অবজ্ঞা করলে, আমার সন্তানের সেবা না করলে তোমারও সন্তান হবে না—এই শাপ দিয়েছিল। কিন্তু হে রাজন, মন্দাকিনীর প্রবাহে উদ্দাম দিগ্‌গজদের চীৎকারে সেই শাপের কথা তুমি শোননি, তোমার সারথিও শোনেনি।

তাকে অবজ্ঞা করার ফলে নিজের মনোরথ অর্গলযুক্ত হয়ে আছে জেনো। কারণ পূজনীয়ের পূজার ব্যতিক্রম মঙ্গল রোধ করে।

সেই সুরভি এখন বরুণের দীর্ঘকালীন যজ্ঞের ঘৃত যোগাবার জন্য পাতালে গিয়ে বসে আছে। সাপ পাতালের দ্বার আগলে আছে বলে সে ঢুকতে পারছে না। এখন সুরভির কন্যাকে তাঁর প্রতিনিধি ভেবে পবিত্র হয়ে সপত্নীক তার সেবা করো। সন্তুষ্ট হলে সে তোমার অভীষ্ট পূরণ করবে।

একথা বলতে বলতেই মুনির হোমের সাধনরূপিণী নন্দিনী নামে অনিন্দ্যনীয় সেই ধেনু বন থেকে ফিরল। সন্ধ্যা যেমন নবোদিত চন্দ্রকে ধারণ করে পল্লবস্নিগ্ধা ও পাটলবর্ণবিশিষ্টা হয় সেই ধেনুও তেমনি ললাটে ঈষৎ বক্র রোমাবলী ধারণ করে শোভা পাচ্ছিল।

তার পীনস্তন কুণ্ডের মত। বৎসদর্শনে ক্ষরিত ঈষদুষ্ণ দুধের ধারায় সে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সেই দুধের ধারা ছিল অবভৃত স্নানের চেয়েও পবিত্র। তার ক্ষুরের আঘাতে ওঠা ধুলো কাছ থেকেই রাজার দেহ স্পর্শ করে তাঁকে তীর্থস্থানের পবিত্রতায় মণ্ডিত করছিল।

লক্ষণজ্ঞ ঋষি পুণ্যদর্শনা নন্দিনীকে দেখে বুঝলেন রাজার প্রার্থনার

সাফল্য সূচিত হয়েছে, সেই মর্মে তিনি তাঁর যজমান রাজাকে বললেন।

হে রাজন, তোমার সিদ্ধি নিকটবর্তী বলে মনে করতে পার। কারণ এই কল্যাণী নাম করতে করতেই উপস্থিত হয়েছে। এখন বন্যবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থাৎ বনের ফলমূল আহার করে অভ্যাসবলে বিদ্যা-লাভের মত নিরন্তর এর অনুসরণ করে একে সন্তুষ্ট করো।

এ চললে তুমি চলবে, এ দাঁড়ালে তুমি দাঁড়াবে, বসলে তুমিও বসবে, এ জলপান করলে তুমিও জলপান করবে।

বধূও নন্দিনীর পূজা সেরে ভক্তিমতী হয়ে পূতচিত্তে প্রভাতে তপোবনপ্রান্ত পর্যন্ত এই গাভীর অনুগমন করবে এবং সন্ধ্যায় তাকে প্রত্যুদ্‌গমন করবে।

যতদিন না এ গাভী প্রসন্ন হবে ততদিন এর সেবা করবে। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি তোমার পিতার মত পুত্রগণদের অগ্রগণ্য হও।

দেশকালজ্ঞ শিষ্য রাজা প্রীত হয়ে পত্নীসহ আনত হয়ে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন।

গুরুর প্রসন্নতা দেখে রাজার মুখে কান্তি ফিরে এল। প্রদোষকালে প্রজ্ঞাবান সত্যপ্রিয়ভাষী সেই ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ ঋষি রাজাকে নৈশ বিশ্রাম গ্রহণের আদেশ দিলেন।

ব্রতাদি নিয়মে অভিজ্ঞ মুনি তপোসিদ্ধ হলেও এবং তপস্যাবলে রাজোচিত শয্যানির্মাণে সমর্থ হলেও নিয়মনিষ্ঠার খাতিরে অর্থাৎ এখন থেকেই এরা ব্রহ্মচর্য পালনে অভ্যস্ত হোক এই অভিপ্রায়ে রাজার জন্য অরণ্যোচিত পর্ণশয্যারই ব্যবস্থা করলেন।

রাজা কুলপতিপ্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশ করে ব্রতচারিণী পত্নীসহ কুশশয্যায় শয়ন করলেন এবং রাত্রিশেষে মুনিশিষ্যদের বেদপাঠধ্বনিতে রাত শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে জাগ্রত হলেন।

দ্বিতীয় স্বর্গ

পরদিন প্রভাতে যশই যার সম্পদ সেই প্রজাধিপতি রাজা দিলীপ পত্নীকে দিয়ে গাভীটিকে ফুলচন্দনে অর্থাৎ গন্ধে ও মাল্যে সাজালেন। তার বাছুরটিকে দুধ খাওয়ানোর পর বেঁধে রাখলেন এবং ঋষির

গাভীটিকে বনে যাবার জন্য ছেড়ে দিতেন।

স্মৃতি যেমন বেদের অনুগমন করে পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা রাজার ধর্মপত্নীও তেমনি নন্দিনীর ক্ষুরন্যাসে পবিত্র যার ধূলি সেই পথ অনুসরণ করলেন।

যশঃসুরভি দয়ালু রাজা দয়িতাকে আশ্রমপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে দিয়ে সুরভিকন্যাকে রক্ষা করতে লাগলেন। মনে হলো পৃথিবীই যেন ঐ ধেনুরূপ ধারণ করেছেন আর তার চারটি সমুদ্র যেন ধেনুর চারটি স্তন।

ব্রতপালনের জন্য সেই গাভীর অনুগমনকারী রাজা অবশিষ্ট অনুচরদেরও আর বেশী দূর যেতে নিষেধ করলেন। তাঁর দেহরক্ষার জন্য অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন, কারণ মনুর সন্তান স্বশক্তিতেই সুরক্ষিত।

কখনো সুস্বাদু তৃণের গ্রাস মুখে তুলে ধরে, কখনো তার পা চুলকিয়ে দিয়ে, কখনো বা মশা তাড়িয়ে এবং তাকে যেখানে খুশি অবাধে যেতে দিয়ে সম্রাট তার সেবায় তৎপর হলেন।

সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়ান, সে চললে তিনিও চলেন, সে বসলে তিনিও স্থির হয়ে বসেন, সে খেলে তবেই তিনি জল খান। এইভাবে রাজা ছায়ার মত তার অনুগমন করতে লাগলেন।

ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ত্যাগ করলেও তিনি যে রাজলক্ষ্মী ধারণ করে আছেন তা বোঝা যাচ্ছিল তাঁর তেজের প্রবলতায়। এই অবস্থায় তাঁকে দেখাচ্ছিল অন্তর্মদ এক গজরাজের মত, যার বাইরে মদরেখার কোন লক্ষণই নেই।

লতাগুচ্ছ দিয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে বনে বিচরণ করতে লাগলেন তিনি। দেখে মনে হলো তিনি যেন মুনির হোমধেনুকে রক্ষা করার ছলে বনের প্রতিটি দুষ্ট প্রাণীকে শিক্ষা দিতে এসেছেন।

বরুণকল্প রাজা তাঁর অনুচরদের পরিহার করলেও পাশের গাছগুলি যেন পাখির কলরবে রাজার জয়গান গাইতে লাগল।

রাজা কাছে এলে বায়ুতাড়িত তরুলতাগুলি অগ্নিকল্প কল্পনীয় সেই রাজার উপর ফুল ছিটিয়ে দিতে লাগল। মনে হলো যেন পুর-

বালারা লাজাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করছে।

হাতে ধনুক থাকলেও তাঁর নির্ভয় হৃদয় যেন তাঁর দয়ার্দ্র মনোভাবটিকেই প্রকাশ করছিল। তাঁর শরীর দেখে হরিণেরা যেন তাদের টানা টানা চোখ সার্থক ভাবল।

তিনি কুঞ্জে কুঞ্জে বনদেবতাদের উচ্চকণ্ঠে গাওয়া নিজের যশোগান শুনলেন। বাতাস বাঁশের ছিদ্র পূর্ণ করায় যে ধ্বনি হচ্ছিল সে ধ্বনি বনদেবতাদের সেই গানের সঙ্গে বাঁশির কাজ সম্পন্ন করতে লাগল।

ছাতা না থাকায় রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন রাজা। কিন্তু পার্বত্য ঝর্ণার হিমকণায় সিক্ত ও গাছের মৃদু কাঁপনলাগা ফুলের গন্ধ বওয়া বাতাস ব্রতপালনকারী সেই রাজাকে সেবা করতে লাগল।

সেই রক্ষক বনে প্রবেশ করায় বৃষ্টি ছাড়াই দাবানল নিভে গেল। ফল ও ফুলেরও বিশেষ প্রাচুর্য হলো। সবল প্রাণীরা দুর্বল প্রাণীদের কোন পীড়া দিল না।

পল্লবের মত ঈষৎ তাম্রবর্ণ সূর্যকিরণ এবং ধেনু উভয়েই তাদের সঞ্চরণে দিগন্ত পবিত্র করে দিনান্তে আপন আপন আবাসে যেতে উদ্যত হলো।

মধ্যলোক অর্থাৎ মর্ত্যলোকের পালক দিলীপ দেবকার্য, পিতৃকার্য ও অতিথিকার্য সম্পাদনের জন্য নন্দিনীর অনুগমন করায় নন্দিনী সর্বজনসম্মত বিধির সঙ্গে যুক্ত সাক্ষাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোভা পাচ্ছিল।

তিনি বনভূমি দেখতে দেখতে চললেন। বনভূমির পল্লব থেকে বরাহের দল বেরিয়ে আসছিল, ময়ূরেরা আবাসতরুর দিকে উন্মুখ হয়েছিল, তৃণভূমিতে ময়ূরেরা বসেছিল। এই বনভূমি সন্ধ্যাসমাগমে ক্রমশঃ শ্যামবর্ণ ধারণ করেছিল।

স্তনভার বহনের জন্য সেই একবৎসা গাভী এবং দেহের গুরুত্বের জন্য রাজা উভয়েই মনোজ্ঞ গতিভঙ্গিতে তপোবনে ফেরার পথটিকে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীর অনুগামী সেই রাজাকে ফিরতে দেখে তাঁর ধর্মপত্নী বনপ্রান্ত থেকে উপবাসী দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে যেন পান

করলেন। সে দুটি চোখের পাতা আলস্যে যেন পলক ফেলতেও পারছিল না।

পথে রাজা ধেনুটিকে সামনে রেখে চলেছেন, আর রাজার ধর্মপত্নী তাকে প্রত্যুদ্গমন করতে এগিয়ে এসেছেন। এ অবস্থায় দুজনের মাঝখানে সেই ধেনু দিন রাত্রির মাঝখানে স্থিত সন্ধ্যার মত শোভা পাচ্ছিল।

সেই পয়স্বিনী গাভীকে খইএর পাত্র হাতে নিয়ে সুদক্ষিণা প্রদক্ষিণ করলেন এবং প্রণাম করে তার দুটি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানটিকে অর্চনা করলেন। সেই স্থানটি যেন অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ।

বৎসটির জন্য নন্দিনী খুব উৎসুক হলেও সে স্থির হয়ে সে-অর্চনা গ্রহণ করল বলে তাঁরা দুজনে আনন্দিত হলেন। ভক্তিভাজনদের প্রতি তাঁর মত মহৎজনের অনুগ্রহের লক্ষণ সদ্যফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনা করে এবং সান্ধ্যকৃত্য শেষ করে দোহনান্তে যিনি ভুজবলে সমস্ত শত্রুকে উন্মূলিত করেছেন সেই রাজা দিলীপ সেই উপবিষ্টা ধেনুর সেবায় মগ্ন হলেন।

রক্ষক রাজার গৃহিণী তার সামনে নৈবেদ্য ও প্রদীপ রাখলেন এবং সে শয়ন করলে তিনিও শয়ন করলেন, সে জেগে উঠলে তিনিও জেগে উঠলেন।

সন্তানকামনায় এইভাবে মহিষীর সঙ্গে ব্রতপালন করতে করতে দীন-দুঃখীদের দুঃখ মোচনে উৎসুক মহনীয় কীর্তি সেই রাজার একুশ দিন কেটে গেল।

পরের দিন নিজের অনুচরের প্রকৃত মনোভাব জানতে চেয়ে মুনির হোমধেনু গৌরী গুরু হিমালয়ের গুহায় প্রবেশ করল। গঙ্গাপ্রপাতের সম্মুখে সে গুহায় নবতৃণ জন্মেছে।

কোন হিংস্রপ্রাণী মনে হলেও তাঁকে আক্রমণ করতে পারে না—এই ভেবে রাজা পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য চোখ মেলে দিলেন। এমন সময় রাজা হঠাৎ দেখলেন এক সিংহ এসে তাকে আকর্ষণ করছে। সে যে কিভাবে আক্রমণ করল তা তিনি লক্ষ্যই করতে পারেননি।

ধেনু আর্তনাদ করে উঠল। গুহায় তা প্রতিধ্বনিত হয়ে দ্বিগুণিত হলে সেই আর্তনাদ রাজার পর্বতলগ্ন দৃষ্টিকে যেন লাগাম ধরে টেনে ফিরিয়ে আনল সেইদিকে।

ধনুর্বাণ হাতে তিনি এগিয়ে এসে পাটলবর্ণের গাভীতে উপবিষ্ট এক সিংহকে দেখলেন। মনে হলো যেন পাহাড়ের ধাতুময় উপত্যকায় পুষ্পিত লোধ্রতরু দেখছেন। তখন শত্রুঘাতী আশ্রিতবৎসল মৃগেন্দ্রগতি রাজা পরাভব অনুভব করে নিধনযোগ্য সেই সিংহের নিধনের জন্য তূণীর থেকে বাণ তুলতে উদ্যত হলেন।

প্রহারে উদ্যত তাঁর ডান হাতের আঙ্গুল বাণপুঙ্খে লাগায় নখের প্রভায় কঙ্খপাখির পালকগুলি রঞ্জিত হলো। কিন্তু হাতটা নিশ্চল হয়ে রইল ছবির মত। অর্থাৎ হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল বলে বাণ তুলতেই পারলেন না।

এইভাবে বাহু অভিভূত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়লে ক্রোধ বেড়ে গেল। অথচ অপরাধীকে চোখের সামনে দেখেও স্পর্শ করতে পারছেন না তিনি। এই অবস্থায় মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগে রুদ্ধবীর্য সাপের মত রাজা নিজের তেজে নিজেই দগ্ধ হতে লাগলেন অন্তরে।

সিংহের মত প্রচণ্ড যার বল, যিনি মনুবংশের পতাকাস্বরূপ, সজ্জনদের যিনি অত্যন্তপ্রিয় সেই রাজা নিজের অবস্থায় নিজেই বিস্মিত হলেন। তাঁকে আরও বিস্মিত করে মানুষের মত কণ্ঠে সেই ধেনু-আক্রমণকারী সিংহ বলল ঃ

হে রাজন, আপনার শ্রম নিষ্প্রয়োজন। আপনি আমার উপর বাণ নিক্ষেপ করলেও তা বৃথা হবে। বায়ুবেগ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে কোন বলই খাটে না।

কৈলাস পর্বতের মত শুভ্র বৃষ আরোহণে যাঁর অভিলাষ, তাঁর চরণ স্পর্শের অনুগ্রহে আমার পিঠ পবিত্র। আমাকে অষ্টমূর্তি শিবের দাস বলে জানবেন। আমার নাম কুম্ভোদর, আমি নিকুম্ভের মিত্র।

ঐ যে সামনে দেবদারু দেখছেন, পিতা তাকে ছেলের মত দেখেন। কার্তিকেয় গৌরীর হেমকলসের মত স্তনের দুধের স্বাদ পেয়েছে গাছটি।

একদিন এক বন্য হাতিদের ভয় দেখাবার জন্য শিব আমাকে এই পাহাড়ের গুহায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি বিধান দিয়েছেন যে প্রাণী আপনা থেকেই আমার কাছে এসে পড়বে সেই হবে আমার জীবনধারণের উপায়।

পরমেশ্বরপ্রেরিত হয়েই নির্দিষ্ট সময়ে আমার কাছে বরাদ্দ রক্তের পায়স এসে পড়েছে। আমি ক্ষুধার্ত, আমার ক্ষুধাতৃপ্তির পক্ষে এই যথেষ্ট, রাহুর পক্ষে চাঁদের সুধা যেমন তেমনি।

এ অবস্থায় আপনি লজ্জা ত্যাগ করে চলে যান। গুরুর প্রতি শিষ্যোচিত ভক্তি ত দেখালেন। যে রক্ষণীয় বস্তু অস্ত্রদ্বারা রক্ষা করা যায় না তা অস্ত্রধারীর যশ নষ্ট করে না।

রাজা পশুরাজের এই প্রগলভ বাণী শুনে শিবের প্রভাবে অস্ত্র নিরুদ্ধ হয়েছে বুঝে নিজের উপর অবজ্ঞাকে শিথিল করলেন।

বাণনিক্ষেপে এই প্রথম প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় রাজা ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে শিবের দৃষ্টিতে বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত ইন্দ্রের মত তাকে প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ

হে মৃগেন্দ্র, আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমি যে কথা বলতে চাই সে কথা বলা নিতান্তই হাস্যকর। তবু প্রাণীদের মনের কথা সবই তুমি জান বলেই আমি বলব।

স্থাবর ও জঙ্গমের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু সেই শঙ্কর আমার পূজ্য। আবার অহিতাগ্নি গুরুর এই ধেনুও চোখের সামনে বিনষ্ট হতে দেখেও চুপ করে থাকতে পারি না। সুতরাং তুমি আমার দেহ নিয়েই প্রসন্ন হয়ে তোমার দেহবৃত্তি পালন করো। মহর্ষির এই ধেনুটিকে ছেড়ে দাও। তার তরুণ বৎসটি দিনের শেষে তাকে পাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

তখন শিবের অনুচর সেই সিংহ একটু হেসে তার দাঁতের আভায় গিরিগুহার অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে আবার রাজাকে বলল ঃ

হে রাজন, জগতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব, নবীন বয়স এবং এই রমণীয় দেহ আপনার। অল্পের জন্য বহুকে ত্যাগ করতে চাইছেন বলে আপনাকে আমার অবিবেকী বলে মনে হচ্ছে।

আপনার এই প্রস্তাব যদি জীবে দয়াই হয় তবে বলব আপনার বিনাশে এই একটি গাভীরই শুধু কল্যাণ হবে। কিন্তু আপনি বেঁচে থেকে আপনার পিতার মত প্রজাদের সব রকম বিঘ্ন থেকে রক্ষা করতে পারবেন। আর যদি একটি ধেনুর মৃত্যুজনিত মুনির ক্রোধের ভয়ে ভীত হন তাহলে সে ভয়ও অমূলক। কারণ ঘটের মত যাদের স্তন এমন কোটি কোটি গাভী দান করে আপনি গুরুর ক্রোধ দূর করতে পারবেন।

তাই কল্যাণ পরম্পরার ভোক্তা বলদীপ্ত নিজের এই দেহ রক্ষা করুন। আপনার এই সমৃদ্ধ রাজপদ ইন্দ্রপদেরই তুল্য। শুধু এই পদ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই যা তফাৎ।

এই বলে সিংহ বিরত হলে গিরিগুহায় তার প্রতিধ্বনি তুলে পর্বতও যেন রাজাকে স্নেহভরে এই কথাই বলল।

সিংহ তাকে আক্রমণ করে থাকায় নন্দিনী কাতর চোখে রাজার দিকে তাকিয়েছিল। তাতে রাজা তার প্রতি আরও বেশী সদয় হয়ে দেবানুচর সিংহকে বললেন ঃ

'ক্ষত থেকে ত্রাণ করে' এই অর্থে ক্ষত্র শব্দটির জগৎজোড়া খ্যাতি আছে। যে ক্ষত্রিয় এর বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্য নিয়ে তার কি হবে? নিন্দাম্লান প্রাণ নিয়েই বা সে কি করবে? তাছাড়া অন্য পয়স্বিনী গাভী দানেই বা মহর্ষিকে কি করে প্রসন্ন করা যাবে? কারণ এ স্বর্গের কামধেনুর থেকে কিছু কম নয়। তুমি যে একে আক্রমণ করতে পেরেছ তা রুদ্রতেজবলেই সম্ভব হয়েছে।

পূজনীয় এই গাভীটিকে তোমার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আমার নিজের দেহ বিনিময় করা উচিত। তাতে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও প্রাণরক্ষা হবে আর মুনির যজ্ঞকর্মও অব্যাহত থাকবে।

তুমি নিজেও পরাধীন বলে একথা ভালই বুঝবে। কারণ দেবদারু গাছটির জন্য তোমার কি মহতী যত্ন। নিজে অক্ষত থেকে রক্ষনীয় বস্তুকে খুইয়ে প্রভুর কাছে দাঁড়ানো যায় না মাথা তুলে। আর যদি তুমি আমাকে হিংসার বলে মনে করো, তাহলে বরং আমার যশোরূপ

দেহের উপর সদয় হও। আমাদের মানুষের একান্ত নশ্বর ভৌতিক দেহে আমার এমন কোন আস্থা বা মমতা নেই।

আলাপ করলেই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে আলাপকারীদের মধ্যে। বনান্তে মিলিত আমাদের দুজনের মধ্যে আপনা থেকেই এক মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই বলি হে শিবানুচর, তুমি মিত্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

সিংহ বলল, 'তাই হোক।' সিংহ একথা বললে আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হলো রাজা দিলীপের বাহু। তিনি তখন অস্ত্র ত্যাগ করে একটা মাংসপিণ্ডের মত নিজেকে সমর্পণ করলেন সেই দেবানুচর সিংহকে।

সিংহ কখন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষায় বসে রইলেন রাজা। এমন সময় বিদ্যাধরের হাত মুক্ত হতেই পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ল তার মাথার উপর।

'ওঠ বৎস' এই অমৃতকল্প বাণী শুনে রাজা মাথা তুলে দেখলেন, সিংহ নয়, প্রস্রবিনী গাভী নন্দিনী নিজের জননীর মত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে।

ধেনু তখন বিস্মিত রাজাকে বললেন, হে সজ্জন, আমি মায়া উদ্‌-ভাবন করে পরীক্ষা করলাম তোমায়। ঋষির প্রভাবে যমও তোমাকে ছুঁতে পারবে না, হিংস্র জন্তু ত কোন ছার।

গুরুতে তোমার ভক্তি এবং আমাতে তোমার করুণা দেখে আমি প্রীত হয়েছি তোমার প্রতি। হে পুত্র, তুমি বর প্রার্থনা করো। তুমি আমাকে কেবল পয়স্বিনী গাভী বলে মনে করো না। প্রসন্ন হলে আমি যে কোন অভীষ্টই পূরণ করতে পারি। যিনি প্রার্থীদের মনোরথ পূরণ করতে পারেন এবং যিনি বাহুবলে বীর আখ্যা অর্জন করেছেন, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুদক্ষিণার গর্ভে বংশরক্ষক এবং অবশেষে খ্যাতিমান এক পুত্র প্রার্থনা করলেন।

সন্তানকামী রাজাকে 'তাই হোক' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই পয়স্বিনী তাঁকে আদেশ দিলেন, হে পুত্র, তুমি আমার দুধ পত্রপুটে দোহন করে পান করো।

তোমার বৎস পান করার পর এবং হোমানুষ্ঠানের প্রয়োজন মিটে যাবার পর যে দুধটুকু অবশিষ্ট থাকে, ঋষির অনুমতি নিয়ে আমি তাই পান করতে চাই, ঠিক যেমন যে পৃথিবী রক্ষা করি তার শস্যাদির ষষ্ঠভাগ আমি গ্রহণ করি।

রাজা একথা জানালে তাঁর উপর আরও বেশী প্রীত হলো নন্দিনী। তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের গুহা থেকে মোটেই শ্রমকাতর হয়ে ফিরে এল বশিষ্ঠের আশ্রমে।

চাঁদের মত আনন্দোজ্জ্বল মুখে রাজশ্রেষ্ঠ দিলীপ ধেনুর অনুগ্রহের কথা প্রথমে গুরুকে নিবেদন করলেন এবং হোমানুষ্ঠানে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট দুধটুকু অতি তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করলেন। তাঁর যশ যেন মূর্ত হয়ে উঠল একাজে।

পরদিন প্রভাতে যথাবিহিত গোচরণব্রতের পারণ শেষে যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর সংযমী ঋষি বশিষ্ঠ সেই রাজদম্পতিকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা প্রথমে হোমাগ্নি ও গুরুকে এবং পরে অরুন্ধতী ও সবৎসা ধেনুকে প্রদক্ষিণ করার পর প্রস্থান করলেন। এই সব সৎ ও শুভকর্মের ফলে তাঁর প্রভাব বেড়ে গেল।

সহিষ্ণু রাজা ধর্মপত্নীসহ শ্রুতিমধুরধ্বনিযুক্ত ও অনাঘাতরম্য রথে চড়ে পথে রওনা হলেন। মনে হলো ও রথ যেন তাঁদেরই পূর্ণ মনোরথ।

অদর্শনে যিনি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছেন এবং সন্তানকামনায় ব্রত-পালন করে যিনি শরীর কৃশ করেছেন সেই রাজাকে প্রজারা নবোদিত চন্দ্রের মতই চোখ দিয়ে পান করতে লাগল। তবু যেন তাদের তৃপ্তি হলো না।

ইন্দ্রকান্তি দিলীপ পতাকাশোভিত নগরে প্রবেশ করে এবং পুর-বাসীদের অভিনন্দন লাভ করে বাসুকির মত সবল বাহুতে আবার রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তারপর আকাশ যেমন অত্রিমুনির তেজ অর্থাৎ চাঁদকে ধারণ করে, সুরধুনী যেমন অগ্নিনিহিত রৌদ্রতেজ ধারণ করে, তেমনি রাজমহিষী সুদক্ষিণাও রাজকুলের গৌরবের জন্য মহৎ

লোকপালগণের নিহিত তেজ ধারণ করলেন।

তৃতীয় সর্গ

তারপর যথাকালে সুদক্ষিণা ইক্ষ্বাকুকুলের অবিচ্ছিন্নতার কারণরূপ, স্বামীর আকাঙ্ক্ষিত এবং সখীদের চোখে জ্যোৎস্নার আবির্ভাবের মত গর্ভ ধারণ করলেন।

শরীর কৃশ হওয়ায় তিনি আগের মত সব অলঙ্কার পরতে পারলেন না। লোধ্রকুসুমের মত পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। যে রাত্রিতে চাঁদ ম্লান হয়ে যায় এবং নক্ষত্রেরা নেই বললেই চলে সেই প্রভাত-কল্পা রাত্রির মত তাঁকে দেখাচ্ছিল সেই অবস্থায়। গ্রীষ্মের অবসানে বৃষ্টিভেজা বনদীঘির ঘ্রাণ নিয়ে গজরাজ যেমন তৃপ্ত হয় না তেমনি গোপনে মাটির গন্ধমাখা তাঁর মুখের ঘ্রাণ নিয়ে রাজার আশ মিটত না।

দেবরাজ যেমন স্বর্গভোগ করেন, তেমনি তাঁর চক্রবর্তী সন্তানও ভূমি ভোগ করবেন এই জন্যই যেন অন্য সব ভোগ ত্যাগ করে ভূমি-ভোগেই অর্থাৎ মাটি খাওয়াতেই রাণীর বেশী আগ্রহ।

মগধতনয়া সুদক্ষিণা কোন কোন জিনিসে তাঁর অভিলাষ লজ্জায় তা রাজাকে বলেন না। উত্তরকোশলপতি দিলীপ সর্বদা সাগ্রহে এ বিষয়ে প্রিয়ার সখীদের জিজ্ঞাসা করেন।

গর্ভাবস্থায় অভিলাষজনিত দুঃখবোধের সময়টিতে এসে তিনি যা চাইতেন তা পেতেন। ধনুর্বাণধারী এই রাজার কাছে স্বর্গেও কিছু অপ্রাপ্য ছিল না।

ক্রমে প্রথম গর্ভসঞ্চারের অবসাদ কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁর দেহ আবার পুষ্ট হলে তিনি শোভা পেতে লাগলেন। পুরনো পাতা ঝরে গেলে রমণীয় পল্লবে মণ্ডিত হয়ে লতা যেমন শোভা পায় তেমনি।

কিছুদিন গেলে তার ঈষৎকালীন বৃন্তমণ্ডিত সুপুষ্ট স্তন দুটি ভ্রমরের মত মনে হত এবং দুটি সুন্দর পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিত।

রাজা অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার মত, অগ্নিগর্ভা শমীর মত এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত মনে করতেন।

ধৈর্যবান সেই রাজা প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ, মনের ঔদার্য, বাহুবলে অর্জিত আদিগন্ত সম্পদ এবং পুত্রলাভজনিত সন্তোষের অনুরূপ পুংসবনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

রাজা অন্তঃপুরে এলে লোকপালদের অংশপূর্ণ গর্ভের গুরুত্বের জন্য কষ্ট করে আসন থেকে উঠতেন সুদক্ষিণা। অভ্যর্থনা করার জন্য অঞ্জলি রচনা করলেও তাঁর হাত অবসন্ন হত। চোখ চঞ্চল হয়ে উঠত। এই অবস্থাতেও সুদক্ষিণা আহ্লাদ সঞ্চার করতেন রাজার মনে।

শিশুচিকিৎসাবিশিষ্ট কুশলী বৈদ্যদের দিয়ে গর্ভপুষ্টি সম্পাদনের পর সময় পূর্ণ হলো। অর্থাৎ দশম মাসে প্রীত হয়ে রাজা আসন্নপ্রসবা প্রিয়াকে গ্রীষ্মাবসানে মেঘভারাবনত বর্ষানোন্মুখ আকাশের মত দেখলেন।

তারপর শচীর মত গৌরবময়ী সুদক্ষিণা যথাসময়ে ত্রিসাধানসম্পন্ন রাজশক্তির অর্থাৎ প্রভাব, মন্ত্রণা ও অভিযান এই তিন সাধনের দ্বারা আরও প্রভুত্ব, মন্ত্রণা ও উৎসাহ এই তিন শক্তির অর্থোৎপাদনের মত একটি পুত্র প্রসব করলেন। তখন পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থানগত ও অনস্তমিত ছিল এবং সেই অবস্থায় পুত্র যে সৌভাগ্যশালী হবে তা সূচিত করছিল।

সেই সময় দিক্‌মণ্ডল প্রসন্ন হলো। বায়ু মনোরমভাবে প্রবাহিত হতে লাগল। শিখাগুলি দক্ষিণমুখী করে হোমাগ্নি আহুতি গ্রহণ করল — এইভাবে সব কিছুই শুভ সূচনা করল। এরকম মানুষের জন্ম জগতের মঙ্গলের জন্যই হয়।

সূতিকাগৃহের শয্যার চারদিকে বিকীর্ণ শুভকর্মা সেই শিশুর জ্যোতিতে সহসা নিশীথদীপগুলি দীপ্তিহীন হয়ে চিত্রার্পিতের মত হয়ে গেল অর্থাৎ ছবির মতই নিষ্প্রাণ হলো।

অন্তঃপুরচারী যে ভৃত্য অমৃতাক্ষরে কুমারের জন্মসংবাদ দিল তাকে রাজার মাত্র তিনটি জিনিসই অদেয় ছিল—চন্দ্রোজ্জ্বল ছত্র আর দুটি চামর।

চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন কূল ছাপিয়ে যায় তেমনি

নিবাতনিষ্পন্দ পদ্মের মত চোখ দিয়ে রমণীরা পুত্রমুখসুধা সতৃষ্ণভাবে পান করায় রাজার আনন্দ তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে গেল।

তপস্বী পুরোহিত বশিষ্ঠ তপোবন থেকে এসে দিলীপতনয়ের সমস্ত জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করলে সে পুত্র খনি থেকে তোলা সংস্কৃত বা মার্জিত মণির মত উজ্জ্বলতর হয়ে শোভা পেতে লাগল।

শ্রুতিমধুর মঙ্গলতূর্য বারবনিতাদের নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুধু রাজা দিলীপের পুরেই বাদিত হলো না, স্বর্গলোকেও দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হলো।

সুশাসক দিলীপের রাজ্যে এমন কোন বন্দী ছিল না, পুত্রজন্মের আনন্দের আবেগে যাকে তিনি মুক্ত করে দেবেন না। তবে পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ থেকে নিজেকেই মুক্ত করবেন।

এই বালক কালক্রমে যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম হবে তেমনি যুদ্ধে ও শত্রু দমনে পারদর্শী হবে। এইজন্য অর্থতত্ত্বজ্ঞ দিলীপ ধাতুর গমনার্থটি নিয়ে পুত্রের নামকরণ করলেন 'রঘু'।

সূর্যরশ্মির অনুপ্রবেশে বালচন্দ্র যেমন বেড়ে উঠতে থাকে দিনে দিনে তেমনি রঘু সর্ববিভবশালী পিতার প্রযত্নে শুভলক্ষণযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল।

পার্বতী ও শিব কুমার কার্তিকেয়কে পেয়ে এবং শচী ও ইন্দ্র জয়ন্তকে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, রাজা দিলীপ এবং সুদক্ষিণাও তেমনি পুত্র রঘুকে পেয়ে তাঁদের মতই আনন্দ লাভ করেছিলেন।

চক্রবাক ও চক্রবাকীর মত সেই দম্পতির ভাববন্ধ ও পরস্পরাশ্রয় প্রেম একটি পুত্রে বিভক্ত হলেও তা পরস্পরের উপরে বর্ধিতই হলো।

সেই শিশু ধাত্রীর প্রথম শেখানো কথাগুলি বলতে শিখল, তার আঙ্গুল ধরে হাঁটতে লাগল। প্রণাম করো বললে নত হতে লাগল। এই সব করে সে পিতার আনন্দ বর্ধন করত।

অঙ্গস্পর্শজনিত সুখদানে রাজার ত্বকে যেন অমৃত বর্ষণ করত শিশুটি। তাকে কোলে পেয়ে নিমীলিত নয়নে রাজা দীর্ঘসময় ধরে

শিশুর স্পর্শসুখ অনুভব করতেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন নিজ মূর্তিরই রূপান্তর সত্ত্বগুণময় চিকুর দ্বারা লোকস্থিতি অব্যাহত থাকবে এমন অনুভব করেছিলেন, স্থিতি-রক্ষক দিলীপও তেমনি এই বহুগুণশালী পুত্রদ্বারা তাঁর বংশ স্থিতিলাভ করবে এরূপ মনে করেছিলেন।

যথাকালে চূড়াকরণ সুসম্পন্ন হলো। তখন রঘু চঞ্চল শিখায় শোভিত সমবয়স্ক মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অক্ষরজ্ঞান ঠিকমত আয়ত্ত করলেন। মকরাদি যেমন নদীমুখ দিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি তিনিও বিশাল শব্দশাস্ত্ররূপ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

বিধিমত উপনয়ন হবার পর বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ গুরুভক্ত রঘুকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এ বিষয়ে সার্থক হলো তাঁদের প্রচেষ্টা। শিক্ষা সৎপাত্রে প্রযুক্ত হলেই ফলবতী হয়।

দিকপতি সূর্য যেমন বায়ুবেগ পরাভবকারী অশ্বদের বেগবলে চারটি সমুদ্রের মত চারটি দিক ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হন, রঘুও তেমনি তাঁর প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় চারটি সমুদ্রের মত চারটি বিদ্যাকে ক্রমশঃ অতিক্রম করলেন অর্থাৎ আয়ত্ত করলেন।

রঘু পবিত্র মৃগচর্ম পরিধান করে পিতার কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করলেন। তাঁর গুরু পিতা দিলীপ শুধু জগতে অদ্বিতীয় রাজাই নয়, অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন।

গোবৎস যেমন ক্রমে বৃষপদে পরিণত হয়, গজশাবক যেমন ক্রমে গজরাজে পরিণত হয়, সেইরকম রঘুও ক্রমে শৈশব ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে প্রশান্তসুন্দর রাজোচিত দেহ ধারণ করলেন।

তারপর কেশদানবিধি অনুষ্ঠিত হলে পিতা দিলীপ পুত্রের বিবাহ-সংস্কার সম্পাদন করলেন। দক্ষকন্যা রোহিণী আদি তারারা চন্দ্রকে পতিরূপে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি রাজকন্যারাও রঘুকে পেয়ে আনন্দিত হলেন।

যৌবনপ্রাপ্ত রঘুর বাহু যুগদন্ডের মত দীর্ঘ হলো। বক্ষ হলো কপাটের মত বিস্তৃত। গ্রীবা হলো সুপরিণত। বলবান রঘু দৈহিক

গুরুত্বে পিতাকেও হার মানালেন। তবু বিনয়-নম্রতায় তাঁকে ক্ষুদ্র বলে মনে হলো।

তারপর রাজা দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের যে গুরুভার ধারণ করেছিলেন, তা লঘু করবার জন্য স্বভাবনম্র ও সংস্কারবিনীত রঘুকে 'যুবরাজ' আখ্যা দান করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

সৌন্দর্যশ্রী যেমন পূর্বপ্রস্ফুটিত পদ্মকে ত্যাগ করে সন্নিহিত নববিকশিত পদ্মকে আশ্রয় করে, গুণাভিলাষিণী রাজলক্ষ্মীও মূল আশ্রয় রাজা দিলীপকে ত্যাগ করে যুবরাজ নামধারী নূতন আশ্রয় রঘুকে অংশতঃ অবলম্বন করলেন।

বায়ুর সহায়তায় অগ্নির মত, শরৎসান্নিধ্যে সূর্যের মত, মদবারির উদ্দেশে গজরাজের মত রাজাও রঘুর সহায়তায় প্রবলতর হলেন।

ইন্দ্রতুল্য দিলীপ রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত ধনুর্ধর রঘুকে যজ্ঞাশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করে মাত্র একটি কম শতটি যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করেছিলেন। তারপর যজ্ঞকারী দিলীপ পুনরায় যজ্ঞের জন্য উৎসর্গ করলে স্বচ্ছন্দগতি অশ্বটিকে ইন্দ্র ধনুর্ধারীদের সামনেই অপহরণ করলেন।

সেই কুমারসেনারা আকস্মিক বিপদে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হলো। তাঁর প্রভাবের কথা আগেই শোনা গিয়েছে।

সজ্জনবন্দিত দিলীপনন্দন রঘু তখন নন্দিনীর অঙ্গনিঃসৃত জলে অর্থাৎ মূত্রে চোখদুটি ধুয়ে নেবার ফলে অতীন্দ্রিয় বিষয়েও দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন।

রাজপুত্র রঘু এবার পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলেন, পর্বতপক্ষছেদনকারী দেবরাজ ইন্দ্র রথের রশ্মিতে বেঁধে তাঁদের যজ্ঞাশ্ব হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। তার চাঞ্চল্য নিবারণ করার জন্য সারথি বারবার তাকে কশাঘাত করছে।

তাঁর একশোটি নিষ্পলক চোখ দেখে, তাঁর ঘোড়াগুলির রং সবুজ দেখে তাঁকে ইন্দ্র বলে চিনতে পেরে রঘু গগনস্পর্শী গম্ভীর স্বরে তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য যেন বলতে লাগলেন।

যজ্ঞাংশ যাঁরা ভোগ করেন মনীষীরা তাদের মধ্যে আপনাকেই প্রথম বলে মনে করেন। সেই আপনি অজস্র ব্রতানুষ্ঠানে পূত আমার পিতার যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন কেন? আপনি ত্রিভুবনপতি, সবই আপনি দিব্যচক্ষুবলে দেখতে পান। সর্বদা যজ্ঞঘাতকদের দমন করাই ত আপনার কাজ। সেই আপনিই যদি ধর্মচারীদের ক্রিয়াকর্মে নিজেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করেন তাহলে ধর্মকর্ম ত একেবারেই লোপ পাবে।

তাই বলি হে রঘবন, অশ্বমেধযজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ঐ অশ্বটিকে ফিরিয়ে দিন। বেদসম্মত পথের প্রদর্শক মহান পুরুষেরা কখনো অসৎপথ অবলম্বন করেন না।

রঘুর এই প্রগলভ কথা শুনে সুরপতি ইন্দ্র রথ ফিরিয়ে উত্তর দিতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, হে ক্ষত্রিয়কুমার, যা বললে তা ঠিক। কিন্তু যশই যাঁদের সম্পদ, শত্রুর কবল থেকে সেই যশ রক্ষা করা কর্তব্য। তোমার পিতা ভুবনবিদিত আমার সেই অশেষ যশ যজ্ঞসম্পাদনের দ্বারা লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছেন।

পুরুষোত্তম বলতে যেমন বিষ্ণুকেই বোঝায়, মহেশ্বর বলতে যেমন শিবকেই বোঝায় তেমনি শতক্রতু বলতে মুনিরা শুধু আমাকেই বোঝান। এই শব্দ কারো উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই কপিল মুনির অনুকরণে তোমার পিতার এই অশ্ব আমি হরণ করেছি। তুমি এ ব্যাপারে আর চেষ্টা করো না। সগরসন্তানদের পথে আর পা বাড়িও না।

তখন অশ্বরক্ষক নির্ভীক রঘু হেসে ইন্দ্রকে বললেন, এই যদি আপনার সংকল্প হয় তাহলে অস্ত্র গ্রহণ করুন। রঘুকে জয় না করে আপনি কখনই কৃতকার্য হতে পারবেন না।

ইন্দ্রকে এই কথা বলার পর শরাসনে বাণ যোজনা করতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অত্যন্ত রমণীয় আনীড় অর্থাৎ বাঁ পাটিকে ডানদিকে এনে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবস্থান করে তিনি পিনাকপানিকেও যেন পরাজিত করলেন।

রঘুর স্তম্ভাকৃতি এক বাণ ইন্দ্রের বক্ষস্থল বিদ্ধ করল। তখন ইন্দ্র

ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণযোজনা করলেন। তাঁর সেই ধনুকই নব-মেঘমালায় ক্ষণিক চিহ্ন অর্থাৎ রামধনু হয়ে ফুটে ওঠে।

ভীষণ অসুরের রক্তপানে সেই বাণ দিলীপপুত্র রঘুর বক্ষস্থল বিদ্ধ করল। সেই বাণ যেন অনাস্বাদিতপূর্ণ মানুষের রক্ত পান করল।

ঐরাবতকে তাড়না করতে গিয়ে ইন্দ্রের যে হাতের আঙুলগুলো কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং যে হাত শচীদেহের পত্রালঙ্কারে চিহ্নিত, কার্তিকেয়ের মত বলশালী কুমার রঘু সেই হাতে স্বনামচিহ্নিত বাণ বিদ্ধ করলেন। অন্য একটি ময়ূরপুচ্ছযুক্ত বাণ দিয়ে ইন্দ্রের বজ্রাকৃতি পতাকা ছেদন করলেন। এতে ইন্দ্র তাঁর উপর আরও ক্রুদ্ধ হলেন। রঘু যেন সবলে সুরলক্ষ্মীর কেশছেদন করছেন।

পক্ষযুক্ত সাপের মত ভীষণ আকৃতির ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ বাণ বর্ষণ করে করে তাঁরা দুজনেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। উভয়েই জয়ের অভিলাষী। একদিকে সিদ্ধরা, অন্যদিকে সৈন্যরা ভীতত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘ যেমন স্বদেহচ্যুত বজ্রাগ্নিকে বহুবর্ষণেও নির্বাপিত করতে পারে না, ইন্দ্রও তেমনি স্বদেহের অংশসম্ভূত দুঃসহ তেজের আধার বস্তুকেও নিরন্তর অস্ত্রবর্ষণেও নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

তারপর রঘু ইন্দ্রের হরিচন্দনলিপ্ত মণিবন্ধটিকে সমুদ্রমন্থনের ধ্বনির মত ধীরগম্ভীর শব্দকারী ধনুর্গুণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণনিক্ষেপে ছিন্ন করলেন। তাতে ইন্দ্রের ক্রোধ বর্ধিত হলো। তিনি ধনুক ত্যাগ করে প্রবল শত্রুর প্রাণনাশের জন্য পর্বতের বক্ষভেদে উপযুক্ত দেদীপ্যমান অস্ত্র অর্থাৎ বজ্র গ্রহণ করলেন।

সেই বজ্রাঘাতে রঘু বক্ষস্থলে আহত হয়ে সৈনিকদের অশ্রুসহ ভূমিতে পতিত হলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই রঘু সব ব্যথা ভুলে সৈনিকদের আনন্দধ্বনির মধ্যে উত্থিত হলেন।

এর পরও রঘু অস্ত্রপ্রয়োগে নিষ্ঠুর শত্রুতার ভাব দীর্ঘক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখলে তাঁর অসামান্য বীরত্ব দেখে সন্তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। গুণ সর্বত্রই নিজের স্থান করে নেয়! ইন্দ্র বললেন, সারবত্তায় অপ্রতিহত আমার

এই অস্ত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারেনি। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি জানবে। এই অশ্বটি ছাড়া আর কি চাও বল।

রাজকুমার তখন তূণীর থেকে অর্ধেক তোলা বাণটি আর না তুলে ইন্দ্রের কথার উত্তর দিলেন। এই অবস্থায় সুবর্ণপুঙ্খের প্রভায় তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি রঞ্জিত হলো।

তিনি বললেন, হে প্রভু, যদি এই অশ্বটি একান্তই অপরিত্যাজ্য বলে মনে করেন তাহলে বিধিমতে ক্রিয়া শেষ হলে অজস্রযজ্ঞপূতে আমার পিতা যাতে যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল পান তার ব্যবস্থা করবেন।

যজ্ঞমণ্ডপে উপবিষ্ট রাজা দিলীপ এখন অন্যের অগম্য। কারণ তিনি এখন ত্রিলোচনের অন্যতম মূর্তিস্বরূপ। তাই যাতে তিনি এই বৃত্তান্ত আপনারই কোন বার্তাবহের মুখ থেকে শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

'তাই হোক' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইন্দ্র সারথি মাতলিসহ রথযোগে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন। রঘুও রাজার যজ্ঞশালায় ফিরে গেলেন। তবু বিজয়লাভ হলেও অশ্বটি ফেরাতে পারলেন না, খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি।

ইন্দ্রের বার্তাবাহকের মুখে আগেই সব বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজা আনন্দে আড়ষ্ট হাতে বজ্রাঘাতচিহ্নিত রঘুর শরীর স্পর্শ করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

এইভাবে যাঁর রাজ্যশাসন অভিনন্দনীয় সেই দিলীপ আয়ু শেষ হলে স্বর্গারোহণের বাসনায় নিরানব্বইটি যজ্ঞকে যেন পরপর সিঁড়ির মত গেঁথে রাখলেন।

তারপর তিনি বিষয়বিমুখ হয়ে যুবক পুত্রকে রাজচিহ্নিত শ্বেতছত্র দান করে মহিষীকে নিয়ে তপোবনতরুর ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বার্ধক্যে এই হলো ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের কুলব্রত।

চতুর্থ সর্গ

রঘু পিতৃদত্ত রাজ্যলাভ করে সন্ধ্যায় সূর্যচিহ্নিত তেজে সমৃদ্ধ অগ্নির মত আরও বেশী দীপ্যমান হলেন।

দিলীপের পর তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জেনে রাজাদের হৃদয়ে আগে যে আগুন প্রধূমিত ছিল তা এখন প্রজ্জ্বলিত হলো।

ইন্দ্রের পতাকার মত তাঁর এই নব অভ্যুদয় দেখে প্রজারা সন্তানদের সঙ্গে আনন্দিত হলো।

রঘু গদগদ মনে পৈতৃক সিংহাসন ও সমস্ত শত্রুরাজ্য একই সঙ্গে অধিকার করলেন।

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত রঘুকে স্বয়ং লক্ষ্মী যেন অদৃশ্য থেকে রঘুর কান্তিপদ্মরূপ ছত্র ধারণ করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। সে ছত্র চোখে না দেখা গেলেও তাঁর কান্তিপুঞ্জ থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল।

বাগ্‌দেবী যথাকালে স্তুতিপাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়ে স্তবনীয় রঘুকে স্তুতিগানে সেবা করতে লাগলেন।

মনু প্রমুখ মাননীয় নৃপতিবৃন্দের উপভুক্তা হয়েও বসুন্ধরা তাঁর প্রতি যেন অনন্যপূর্ণা বধূর মত অনুরাগিণী হলেন।

তিনি যথোচিত দণ্ডদানে নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণাবায়ুর মত সকলের মন হরণ করলেন।

আম ফললে মুকুলের অভাবটা যেমন লোকে মনে রাখে না তেমনি রঘুর মধ্যে গুণের আধিক্য থাকায় প্রজারা তাঁর পিতার অভাব তেমন বোধ করল না।

নীতিবিদেরা সেই নবনৃপতি রঘুর কাছে সৎ ও অসৎ দুই পক্ষকেই উপস্থিত করতেন। তিনি সব সময় সৎ পক্ষটিকেই গ্রহণ করতেন, অসৎ পক্ষকে নয়।

ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতের গুণরাশি উৎকর্ষ লাভ করল তাঁর মধ্যে। তিনি নতুন রাজা হলে সবই যেন নতুন হলো।

আনন্দ দেয় বলেই যেমন তাঁর নাম চন্দ্র, প্রকৃষ্ট তাপ দেয় বলেই তার নাম তপন, সেইরকম প্রজারঞ্জন করেন বলেই তাঁর রাজা নাম সার্থক হয়েছিল।

কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর দুটো চোখ ছিল ঠিক, কিন্তু তাঁর আসল চোখ ছিল সূক্ষ্মকর্তব্যনির্দেশক শাস্ত্র।

রাজ্যে শান্তিস্থাপনের পর তিনি একটু সুস্থির হলে তাঁর কাছে দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর মত এল পদ্মলক্ষণা শরৎ।

নিঃশেষবর্ষণে লঘু মেঘ পথ মুক্ত করে দেওয়ায় রঘুর এবং সূর্যের দুঃসহ প্রতাপ একই সঙ্গে দশদিক ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র বর্ষাকালীন ধনু ত্যাগ করলেন। রঘু ধারণ করলেন বিজয় ধনু। তাঁরা দুজনেই প্রজাদের মঙ্গলসাধনের জন্য পর্যায়ক্রমে ধনুকধারণ করলেন।

শ্বেতপদ্মের ছত্রে এবং বিকশিত কাশফুলের চামরে বিরাজিত হয়ে শরৎ ঋতু তাঁর অনুকরণ করল বটে, কিন্তু তাঁর লাবণ্য লাভ করতে পারল না। তখন প্রসন্নমুখ রঘু আর শুভ্রকান্তি চাঁদ দুটিতেই চক্ষুষ্মানদের প্রীতি ছিল সমতুল্য।

হংসমালায় তারাদলে এবং কুসুমশোভিত জলাশয়গুলিতে যেন তাঁর যশোরাশির শুভ্র মহিমা বিচ্ছুরিত হলো।

ইক্ষুচ্ছায়ায় বসে শস্যপালিকারা রঘুর যশোগান করত। সে গানের উৎস ছিল তাঁর গুণরাশি। শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর জীবনকথাই ছিল তার বিষয়বস্তু।

অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়ে জল প্রসন্ন হলো, কিন্তু মহাতেজা রঘুর কাছে পরাজিত হবার আশঙ্কায় শত্রুদের মন হলো বিষাদগ্রস্ত।

বিশাল ককুদযুক্ত মদোদ্ধত বৃষদল নদীকূল বিদীর্ণ করে রঘুর বিলাসভঙ্গিসহ তাঁর বিক্রমের অনুসরণ করতে লাগল। মদগন্ধি সপ্তপর্ণ ফুলের গন্ধে অভিভূত তার হাতিগুলো অসূয়াপরবশ হয়েই যেন সপ্তধারায় মদবারি বর্ষণ করতে লাগল।

নদীগুলিকে সুনাব্য করে এবং কাদা শুকিয়ে পথগুলোকে সুপথ করে শরৎ তাঁর মধ্যে স্বতস্ফূর্ত উৎসাহশক্তি জাগার আগেই যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করল তাঁকে।

অশ্ব-আরতির অনুষ্ঠানে বিধিমত প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণমুখী শিখার ছলে যেন তার বাড়িয়েই তাকে জয় দান করলেন।

রাজধানী ও প্রান্তরাজ্য সুরক্ষিত করে এবং পৃষ্ঠদেশ শত্রুমুক্ত করে

তিনি অনুকূল দৈববলের সহায়তায় ছয় রকম সৈন্য নিয়ে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন।

মন্দার পর্বতের আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু বর্ষণে ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন বিষ্ণুর শরীরে চারদিক থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বয়োবৃদ্ধ পুরনারীরা তেমনি চারদিক থেকে তাঁর উপর লাজ বর্ষণ করতে লাগল।

ইন্দ্রতুল্য রঘু বায়ুকম্পিত পতাকাশ্রেণীতে শত্রুকুলকে তর্জন করতে করতে রথোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে আকাশকে ভূতলের মত আর মেঘোপম গজরাজিতে ভূতলকে আকাশের মত করতে করতে প্রথমে পূর্বদিকে অভিযান করলেন।

প্রথমে প্রতাপ, পরে কোলাহল, তারপর ধূলিরাশি তার পিছনে রথাদি —এইভাবে চারটি অঙ্গে বিভক্ত হয়ে যেন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে যেতে লাগল।

রঘু আপন শক্তিপ্রভাবে মরুতলগুলিকে সদন করলেন, নাব্য নদীগুলিকে পারাপারের যোগ্য করে তুললেন এবং বনগুলিকে পরিষ্কার করলেন। হরজটামুক্ত গঙ্গাকে আকর্ষণ করে ভগীরথ যেমন শোভা পেয়েছিলেন, পূর্বগামিনী সৈন্যবাহিনীকে আকর্ষণ অর্থাৎ পরিচালনা করে রঘুও তেমনি শোভা পেতে লাগলেন।

হাতিরা যেমন গাছগুলিকে ফলবিহীন, উন্মূলিত ও ছিন্নভিন্ন করে পথ পরিষ্কার করে নেয়, রঘুও তেমনি বহুধাবিভক্ত রাজাদের নিয়ে তাঁর পথটিকে যানহীন, উৎখাত ও মুক্ত করিয়ে নিলেন।

এইভাবে পূর্বদিকে অবস্থিত সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করে বিজয়ী রঘু তালবনরাজিতে শ্যামবর্ণ মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হলেন।

সুব্রহ্মদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশের মধ্যবর্তী রাজ্যের রাজারা বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করে অবিনীতদের উচ্ছেদকারী নদীস্রোতের মত বেগবান রঘুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

অধিনায়ক রঘু রণতরীসহ সংগ্রামে উদ্যত বঙ্গদেশের রাজাদের সবলে

উৎখাত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন। উৎখাত শত্রুরা তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলে তাঁরা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আগে উপড়ে নিয়ে পরে তোলা ফলভারে বনজধানের চারার মত তাঁরা রঘুকে করদানে অর্থাৎ উপঢৌকনে সংবর্ধিত করলেন।

এরপর তিনি সৈন্যদের দিয়ে গজসেতু তৈরী করিয়ে কপিশাবদী অর্থাৎ বর্তমান উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদী পার হলেন এবং উৎকলবাসী রাজাদের নির্দেশিত পথে কলিঙ্গ দেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মাহুত যেমন হাতির মাথায় অংকুশ প্রোথিত করে, রঘুও তেমনি মহেন্দ্রপর্বতের মাথায় তাঁর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করলেন।

পর্বত যেমন তার পক্ষছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে শিলাবর্ষণ করে আক্রমণ করেছিলেন, গজারোহী সৈন্যবলে বলীয়ান কলিঙ্গরাজও তেমনি স্বপক্ষ-বিনাশে উদ্যত রঘুকে অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করেছিলেন।

ককুৎস্থবংশের সন্তান রঘু সেখানে শত্রুদের অস্ত্রবর্ষণ সহ্য করে যেন বিধিমত মঙ্গলস্নান করে জয়শ্রী লাভ করলেন। সেখানে যোদ্ধারা পানের যোগ্য জায়গা সাজিয়ে পানপাতার তৈরী পানপাত্রে নারিকেলজাত মদ এবং তারই সঙ্গে শত্রুপক্ষের যশও পান করল।

ধর্মবিজয়ী রাজা রঘু মহেন্দ্ররাজকে প্রথমে বন্দী ও পরে মুক্ত করে তাঁর রাজশ্রী হরণ করলেন, রাজ্য নয়।

ফলন্ত সুপারিগাছের সারিতে শোভিত সমুদ্রতীর দিয়ে জয়ে নিস্পৃহ রঘু যেদিকে অগস্ত্যনক্ষত্র উদিত হয় সেই দক্ষিণ দিকে এবার অগ্রসর হলেন।

সৈন্যদের জলকেলিতে এবং গজমদে সুবাসিত কাবেরীনদীকে তিনি যেন জলাধিপতি সমুদ্রের কাছে সন্দেহের পাত্র করে তুলেছিলেন। জয়েচ্ছু রঘুর সৈন্যরা পথ অতিক্রম করে হারীতপক্ষীপরিবৃত মলয়পর্বতের উপত্যকাগুলিতে আশ্রয় নিল অর্থাৎ শিবির স্থাপন করল।

অশ্বক্ষুরে বিচলিত এলাচলতার ফুলরেণু উড়ে এসে তাদেরই মত গন্ধযুক্ত হাতিদের কটিদেশে সংলগ্ন হলো। চন্দনগাছে সাপের বেষ্টনীতে যে সব খাঁজ তৈরী হয়েছিল তাতে হাতিদের গলার শিকল আটকে গেল।

পরে তারা পায়ের শিকল খুলতে পারলেও সেই গলার শিকল খুলতে পারল না।

দক্ষিণ দিকে সূর্যের তেজ কমে যায়। কিন্তু সেই দক্ষিণদিকেই পাণ্ড্যদেশীয় অর্থাৎ বর্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত তিলাভেলি ও মাদুরা অঞ্চলের রাজারা রঘুর প্রতাপ সহ্য করতে পারল না।

সেই সব রাজারা রঘুর কাছে নত হয়ে তাম্রপর্ণী নদী ও মহাসমুদ্রের সঙ্গমস্থল থেকে সংগৃহীত কীর্তিরাজির মত মুক্তারাজি তাঁকে দান করল।

সানুদেশে চন্দনসমন্বিত মলয় ও দর্দুর পর্বত দক্ষিণ দিগ্‌বধূর চন্দন চর্চিত স্তনদ্বয়ের মত প্রতীয়মান হলো। এই পর্বতদুটিতে অসহ্যবিক্রম রঘু যথেচ্ছ বিহার করলেন। তারপর সমুদ্র দূরে সরে যাওয়ায় মেদিনীর স্খলিতবসন নিতম্বের মত দৃশ্যমান সহ্যপর্বত অতিক্রম করলেন।

এরপর রঘুর সৈন্যদল অপরপ্রান্ত অর্থাৎ পশ্চিমদেশ জয়ে উদ্যত হলো। তারা সহ্যপর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী তটভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হলো পরশুরামের অস্ত্রচালনায় অপসারিত সমুদ্র যেন সহ্যপর্বতে সংলগ্ন হয়ে আছে।

তাঁর ভয়ে কেরলের স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ত্যাগ করল। সৈন্যদের পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি উঠে তাদের কুন্তলরাজিতে প্রসাধনচূর্ণের প্রতিনিধিত্ব করল। কেরলের মুবনা নদীর উপর প্রবাহিত বায়ুতে বিকীর্ণ কেয়াফুলের রেণু তাঁর সেনাদের বর্মে লেগে গিয়ে সযত্নে পাওয়া বস্ত্রসুগন্ধির কাজ করল।

ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর গায়ে বাঁধা বর্মগুলোর ধ্বনি হাওয়ায় ওঠা তালবনের ধ্বনিকে ছাপিয়ে গেল। হাতির দল খেজুর গাছের কাণ্ডে জড়ো হয়েছিল। ভ্রমরের দল নাগকেশরের ফুল ত্যাগ করে তাদের মদস্রাবে সুবাসিত গণ্ডদেশে এসে পড়েছিল।

শোনা যায় পরশুরামের অনুরোধে সমুদ্র তাঁকে স্থান দিয়েছিল। এখন সেই সমুদ্র অনুরুদ্ধ না হয়েও পশ্চিমাঞ্চলের রাজাদের রূপ ধরে রঘুকে কর দিল।

সেখানে তিনি মত্ত হাতিদের দন্তাঘাতে উৎকীর্ণ এবং পরাক্রমচিহ্নের প্রকাশক ত্রিকূট পর্বতকেই উন্নত জয়স্তম্ভে পরিণত করলেন।

তারপর সংযমী পুরুষ যেমন ইন্দ্রিয়রূপ রিপুদের জয় করার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিচরণ করেন তিনিও তেমনি পারস্যদেশের রাজাদের জয় করার জন্য স্থলপথে প্রস্থান করলেন।

অকালমেঘের উদয় যেমন পদ্মের উপর পড়া প্রভাতসূর্যের প্রভা নষ্ট করে দেয়, তিনিও তেমনি যবনীদের মুখপদ্মের মদ্যপানজনিত রক্তিম আভা দূর করলেন।

পশ্চিমদেশীয় অশ্বারোহী সেনাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হলো তাঁর। এমন ধুলো উড়ছিল যে প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাদের উপস্থিতি শুধু ধনুকের শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল।

ভল্লের আঘাতে তাদের যে সব মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল তাই দিয়ে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করলেন। মনে হলো যেন মৌমাছিভরা মধুর চাকে তিনি পৃথিবী আচ্ছন্ন করেছেন।

যারা বেঁচে ছিল তারা শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে রঘুর শরণ নিল। কারণ রঘুর মত মহানুভবের ক্রোধের উপশম শুধু প্রণিপাতেই সম্ভব।

দ্রাক্ষাবেষ্টিত ভূমিতে মূল্যবান মৃগচর্মে বসে তাঁর সৈন্যরা মদ্যপান করে ক্লান্তি দূর করল।

তারপর সূর্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করে পৃথিবীর রস শোষণ করার জন্য উত্তরায়ণে যান, রঘুও তেমনি শরজাল নিক্ষেপ করে পশ্চিমদেশীয় রাজাদের উৎখাত করে উত্তরদিকে গেলেন।

তাঁর অশ্বগুলি সিন্ধুনদীর তীরে গড়াগড়ি দিয়ে পথশ্রম দূর করল এবং কুঙ্কুম লাগা কেশরে মণ্ডিত ঘাড়গুলো কাঁপাতে লাগল। সেখানে স্বামীদের প্রতি রঘুর শক্তিসূচক আচরণ হূণ রমণীদের কপোলরক্তিমার কারণ হলো।

কম্বোজদেশের রাজারা যুদ্ধে রঘুর প্রভাব সহ্য করতে পারল না। তা না পেরে হাতিবাঁধা আখরোট গাছের সঙ্গে নুয়ে পড়েছিল।

তাদের প্রচুর ভাল ভাল ঘোড়া এবং পর্যাপ্ত রত্নরাশি উপহার হিসাবে

অনবরত রঘুর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু তাতে কোন গর্ববোধ তাঁকে আশ্রয় করেনি।

তারপর তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে উৎক্ষিপ্ত ধাতুরেণুতে শৃঙ্গ-গুলোকে যেন আরও বর্ধিত করে হিমালয় পর্বতে আরোহণ করলেন।

সৈন্যদের কলরব থাকলেও গুহাশায়ী সমবল সিংহেরা ঘাড় ফিরিয়ে তাদের নিভীকতাই প্রকাশ করল। পথে ভুর্জতরুতে মর্মরধ্বনি তুলে কীচকবাঁশে শব্দ জাগিয়ে গঙ্গার জলকণা বয়ে বায়ু তাঁর সেবা করতে লাগল।

সৈন্যরা নমেরুগাছের ছায়ায় কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধে সুবাসিত প্রস্তরফলকে বসে বিশ্রাম করল। দেবদারু গাছে বাঁধা হাতিদের গলার শিকলে আলো এসে পড়েছিল। তাই ওষধিরা রাত্রিকালে রঘুর তৈলহীন প্রদীপের কাজ করল।

তিনি সেনানিবেশ তুলে নিলেন। হাতিদের গলায় বাঁধা দড়ির দাগ লাগা দেবদারু গাছগুলো তাঁর হাতিদের দেহের উচ্চতা জানিয়ে দিল।

সেখানে পার্বত্য জাতির সঙ্গে রঘুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তাতে নারাচ, ভিন্দিপাল ও প্রস্তরের পরস্পর ঘর্ষণে আগুন ঠিকরাতে লাগল।

তিনি শরনিক্ষেপে উৎসবসংকেত নামে পার্বত্য জাতিদের নিরুৎসব করে কিন্নরদের দিয়ে নিজের বাহুযুগলের বিজয়গান গাইয়ে নিলেন।

তারা উপহার হাতে নিয়ে এলে রাজা হিমালয়ের সম্পদ ও হিমালয় রাজার পরাক্রম জানতে পারলেন। তিনি সেখানে অমলিন যশোরাশি স্থাপন করে রাবণ-উত্তোলিত কৈলাস পর্বতের লজ্জা উৎপাদন করেই যেন অবতরণ করলেন।

তিনি লৌহিত্যনদ অর্থাৎ বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদ পার হলে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা রঘুর হাতিদের বন্ধনস্তম্ভরূপে গৃহীত কৃষ্ণাগুরুগাছগুলোর মত তাদের সঙ্গে একইভাবে কম্পিত হতে লাগল।

রঘুর রথমার্গের ধুলো ধারাবর্ষণহীন দুর্দিনের মত সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা সেই ধুলো সহ্য করতে পারলেন

না, রঘুর সেনাদের প্রতাপ সহ্য করা ত দূরের কথা।

কামরূপের রাজা পরাক্রমে ইন্দ্রকে জয় করলেও রঘুকে ভজনা করলেন মদবর্ষী হাতিদের দান করে। সেইসব হাতিদের দিয়ে তিনি অন্য রাজাদের গতিরোধ করতেন।

কামরূপের রাজা রঘুর স্বর্ণপীঠে রাখা পদযুগলের ছায়ারূপ দেবতাকে রত্নরূপ পুষ্পউপহারে অর্চনা করলেন। বিজয়ী রঘু এইভাবে চারদিক জয় করে তাঁর রথোত্থিত ধূলোয় রাজাদের ছত্রহীন মুকুট স্থাপন করে রাজধানীতে ফিরলেন।

সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় এমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন তিনি। সজ্জনেরা মেঘেদের মতই যা গ্রহণ করেন তা দান করার জন্য।

অমাত্যদের সঙ্গে ককুৎস্থ বংশের রঘু পরাজিত রাজাদের বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করে তাঁদের পরাজয়ের দুঃখ দূর করলেন। তাঁদের পত্নীরা দীর্ঘকাল তাঁদের বিরহে উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলে সেই রাজাদের তিনি নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন।

প্রস্থানকালে সেই সব রাজারা রঘুর ধ্বজ, বজ্র ও ছত্ররেখায় চিহ্নিত-চরণে প্রণত হলেন। তাঁর অনুগ্রহ না হলে সে চরণ লাভ করা যায় না। প্রণাম করার সময় তাঁদের মুকুটখানা থেকে ঝরে পড়া পরাগরেণু দিয়ে তাঁরা রঘুর পায়ের আঙ্গুলগুলোকে শুভ্রবর্ণ করে তুললেন।

পঞ্চম সর্গ

মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত ধনরাশি নিঃশেষে দান করেছেন। এমন সময় বেদাধ্যয়ন শেষে বরতন্তুশিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রার্থনায় তাঁর কাছে এলেন।

অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারী যশোভাস্বর অতিথিবৎসল রঘু স্বর্ণপাত্র না থাকায় মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করলেন।

সম্মানই যাঁদের সম্পদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নিয়মনিষ্ঠ ও কার্যজ্ঞ রাজা তপস্বীকে সামনে বসিয়ে যথানিয়মে অর্চনা করে যুক্তকরে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হে কুশাগ্রধী, মন্ত্রকৃৎ ঋষিদের অগ্রণী আপনার গুরু। সূর্যের কাছ থেকে জগৎ যেমন চেতনা লাভ করে আপনিও তেমনি তাঁর কাছ থেকে অশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন। আপনার সেই গুরুর কুশল ত?

তিনি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে যে তপস্যা করে চলেছেন, যে তপস্যা ইন্দ্রেরও আশঙ্কাজনক, কোন বাধাবিঘ্নে সেই ত্রিবিধ তপস্যার কোন ক্ষতি হয়নি ত?

আলবালবন্ধন ও অন্যান্য নানারকম যত্নে আপনারা অপত্যনির্বিশেষে যে সব তপোবন তরুগুলিকে বর্ধিত করেছেন প্রবল বায়ু বা অন্যান্য উৎপাতে আপনাদের সেই শ্রান্তিনাশক তরুগুলির কোন ক্ষতি হয়নি ত?

যজ্ঞের কাজের সংগৃহীত কুশতৃণাদিতে মুখ দিলেও স্নেহবশে আপনারা যাদের বাধা দেন না, আপনাদের কোলেই যাদের নাভিসংলগ্ন নাড়ী শুকিয়ে ঝরে পড়ে, সেই মৃগশিশুরা নিরাপদে আছে ত?

যেসব তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নান ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, যাদের বালুকাময় তটদেশ সংগৃহীত শস্যের ষষ্ঠাংশ-ভাগে চিহ্নিত, আপনাদের সেই তীর্থজলের মঙ্গল ত?

যথাকালে সমাগত অতিথিদের জন্য যে বনজ নীবারধানের ভাগ রক্ষা করেন, শরীররক্ষার জন্য যে ধান আপনাদের প্রধান অবলম্বন, গ্রাম থেকে তুষপ্রিয় পশুরা এসে তা নষ্ট করবে না ত?

আপনার গুরু মহর্ষি কি যথোচিত শিক্ষাদানের পর প্রসন্নচিত্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন? কারণ আপনার বয়স বিবেচনায় সমস্ত হিতসাধনে সমর্থ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের এই ত উপযুক্ত সময়।

পূজনীয় আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু শুধু এই আগমনেই আমার মন তৃপ্ত হয়নি। আপনার কোন না কোন আদেশ পালনে উৎসুক হয়ে উঠেছে আমার মন।

আপনি কি গুরুর আদেশে অথবা নিজেই আমাকে কৃতার্থ করতে তপোবন থেকে এখানে এসেছেন?

রঘুর এইরকম উদারবাক্য শুনে ও অর্ঘ্যপাত্রটি দেখে তাঁর নির্ধনতা

অনুমান করে এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা খুব ক্ষীণ বুঝে করতন্তুশিষ্য কৌৎস বললেন,—

হে রাজন, সর্বত্রই আমাদের কুশল জানবেন। হে নাথ, আপনি যাঁদের রক্ষাকর্তা, সেই প্রজাদের অমঙ্গল হবে কিকরে? সূর্য যখন কিরণ দেয় তখন অন্ধকার কেমন করে লোকের দৃষ্টি আড়াল করবে?

হে মহাভাগ, পূজনীয়দের প্রতি আপনার ভক্তি কুলোচিত হলেও আপনি তাতে পূর্বপুরুষদেরও অতিক্রম করেছেন। কিন্তু আমি অসময়ে আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি এটাই আমার দুঃখের কারণ।

হে নরেন্দ্র, সৎপাত্রে সর্বস্ব দান করে আপনি কেবল শরীর ধারণ করে আছেন। অরণ্যচারীরা শস্য চয়ন করে নিয়ে গেলে নীবারের শুধু স্তবই অবশিষ্ট থাকে। আপনাকে দেখতে এখন সেই নীবারের মত।

আপনি একচ্ছত্র সম্রাট হয়েও যে এই যজ্ঞজনিত নিঃস্বতা প্রকাশ করছেন তা ঠিকই হয়েছে। কারণ কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা পর্যায়ক্রমে চাঁদের সুধা পান করার ফলে চাঁদের যে কলাক্ষয় হয় তা বৃদ্ধির চেয়েও গৌরবজনক।

আমি বরং অন্য কারো কাছ থেকে গুরুদক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। আপনার মঙ্গল হোক। চাতকও শরতের জলহীন মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে না।

এই বলে মহর্ষির শিষ্য কৌৎস ফিরে যেতে উদ্যত হলে তাঁকে প্রতি-নিবৃত্ত করে রাজা রঘু জিজ্ঞাসা করলেন, হে ধীমান, গুরুকে কি দক্ষিণা দিতে হবে? তার পরিমাণই বা কত?

তখন বিচক্ষণ সেই ব্রহ্মচারী যথাবিধি যজ্ঞসম্পাদক গর্বলেশহীন বর্ণাশ্রমের রক্ষক রাজাকে প্রকৃত বিষয় বলতে লাগলেন,—

বিদ্যা সমাপ্ত হলে কি গুরুদক্ষিণা দেব তা গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরুভক্তিকেই বড় বলে মনে করলেন। পরে আমি বারবার অনুরোধ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার অর্থাভাবের কথা চিন্তা না করেই বললেন, অর্জিত বিদ্যার সংখ্যা অনুসারে তুমি

আমাকে চোদ্দ কোটি সুবর্ণমুদ্রা দাও।

এই অবস্থায় পড়লেও আপনার অভ্যর্থনাপাত্র থেকেই আপনি যে এখন নামেমাত্র রাজা তা বুঝে গুরুদক্ষিণার এই আধিক্যহেতু আপনাকে আর এ বিষয়ে অনুরোধ করতে উৎসাহ বোধ করতে পারছি না।

বেদজ্ঞ শিরোমণি সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে এইভাবে সব কথা জানালে সেই শশাঙ্ককান্তি জিতেন্দ্রিয় সম্রাট তাঁকে আবার বললেন,—

হে বরেণ্য, আপনি আমার পূজনীয় ও প্রশস্ত অগ্নিগৃহে চতুর্থ অগ্নির মত দু-তিনদিন অপেক্ষা করুন। এই সময়ের মধ্যে আমি আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করব।

ব্রাহ্মণ প্রীত হয়ে অমোঘ প্রতিজ্ঞায় 'তাই হোক' বলে সম্মত হলেন। রঘুও এর আগে দিগ্বিজয়ের ফলে পৃথিবীকে ধনশূন্য বিবেচনা করে কুবেরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন।

বশিষ্ঠের মন্ত্রপূত জলপ্রক্ষেপের প্রভাবে বায়ুতাড়িত মেঘের মত তাঁর রথের গতি সমুদ্রে, আকাশে ও পর্বতে অপ্রতিহত হয়ে উঠল।

কৈলাসনাথ কুবেরকে সামন্ত রাজামাত্র মনে করে বাহুবলে তাকে জয় করতে চেয়ে প্রশস্তচিত্ত রঘু সন্ধ্যায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত রথে শয়ন করলেন। এইভাবে তিনি প্রভাতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রভাতে তিনি যুদ্ধযাত্রায় রওনা হবেন এমন সময় কোষাগারে নিযুক্ত কর্মীরা সবিস্ময়ে এসে জানাল রাজাকে, আকাশ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছে কোষাগারে।

রাজা বুঝতে পারলেন এ স্বর্ণ কুবেরেরই দান। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে যাবেন সেই কুবেরের কাছ থেকে পাওয়া উজ্জ্বল স্বর্ণরাশি তিনি সব নিঃশেষে কৌৎসকে দান করলেন। সেই বিপুল স্বর্ণরাশি বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণ সুমেরুসানুর সঙ্গেই তুলনীয়।

প্রার্থী কৌৎস গুরুকে যা দিতে হবে তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশী নিতে চাইলেন না। এদিকে রাজাও প্রার্থীর প্রার্থিত অর্থের বেশী দিতে চান। এ অবস্থায় দুজনের মহত্ত্বকে জনগণ অভিনন্দন জানাল।

তারপর রাজা শত শত উট ও ঘোড়া দিয়ে সেই অর্থ পাঠাবার ব্যবস্থা

করলেন। প্রসন্নচিত্ত মহর্ষি কৌৎস প্রস্থানকালে দেহের পূর্বাংশ অবনত করে সম্মুখে দাঁড়ানো রাজাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন,—

যে রাজা যথাযথভাবে চতুর্বিধ রাজবৃত্তি পালন করেন ধরিত্রী যদি তাঁর অভীষ্ট প্রসব করেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনার প্রভাব সত্যিই অচিন্ত্যনীয়, কারণ আপনি স্বর্গ থেকেও আপনার অভীষ্ট দোহন করে এনেছেন। সমস্ত মঙ্গলই আপনার করতলগত, তাই যে কোন আশীর্বাদ আপনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তির মত। তবু আপনার পিতা যেমন আপনার মত বরেণ্য পুত্র লাভ করেছেন তেমনি আপনিও নিজের গুণের অনুরূপ পুত্রলাভ করুন—এই আমার কামনা।

ব্রাহ্মণ এইভাবে রাজাকে আশীর্বাদ করে গুরুর কাছে চলে গেলেন। রাজাও সূর্য থেকে যেমন আলোক জন্মলাভ করে তেমনি সেই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদের ফলে অল্পকালের মধ্যে একটি পুত্র লাভ করলেন।

একদিন রাজার মহিষী ব্রাহ্মমুহূর্তে কার্তিকের মত একটি পুত্র প্রসব করলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে জাত বলে ব্রহ্মার নাম অনুসারে পিতা সেই পুত্রের নাম রাখলেন 'অজ'।

সেই তেজোময় রূপ, সেই বীর্য, সেই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য। এক প্রদীপ থেকে জ্বালানো অন্য এক প্রদীপের মত নিজের জন্মকারণ পিতার থেকে তাঁর কোন পার্থক্যই ছিল না।

গুরুদের কাছ থেকে বিধিমত বিদ্যা অর্জন করে যৌবনসমাগমে বিশেষ কান্তিমণ্ডিত হলেন অজ। মনে হলো রাজলক্ষ্মী অজের প্রতি অনুরাগিণী হলেও স্থিরবুদ্ধি কন্যা বিবাহবিষয়ে যেমন পিতারই অনুমতির জন্য অপেক্ষা করেন সেইরকম তিনি রঘুর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিদর্ভরাজের রাজা ভোজ তাঁর ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় কুমার অজকে আনবার জন্য উৎসুক হয়ে বিশ্বস্ত একজন দূতকে রঘুর কাছে পাঠালেন।

রাজা রঘু ভোজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রশংসনীয় এবং পুত্রও বিবাহযোগ্য একথা বিচার করে অজকে সসৈন্যে বিদর্ভরাজের সমৃদ্ধ

রাজধানীতে পাঠালেন।

সেই রাজপুত্রের যাত্রাপথে নির্মিত অস্থায়ী আবাসগুলি প্রমোদ-কাননের মত হয়ে উঠেছিল। এই সব আবাসগুলির পটমণ্ডপে শয্যাদি সাজানো হয়েছিল। সেখানে গ্রামবাসীরা উপহার বয়ে নিয়ে আসছিল কুমারের জন্য।

পথ পাড়ি দিয়ে অজ ক্রমে নর্মদাতীরে এসে পড়লেন। সেই নদী-তীরে করঞ্জক গাছগুলো আর্দ্র বাতাসে দুলছিল। পথক্লান্ত সৈনিকদের তিনি সেইখানেই শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলেন। তাদের পতাকা-গুলো ধূলিধূসর হয়ে উঠেছিল।

তারপর এক বন্য হাতি উঠে এল নদী থেকে। তার গণ্ডদেশ থেকে মদবারি ধুয়ে গিয়েছিল নিঃশেষে। উপরে উড়ন্ত ভ্রমর দেখে সে যে জলে প্রবেশ করেছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।

পাথরের আঘাতে তার দাঁতদুটো একটু ভেঙ্গে গিয়েছিল। জলে ধুয়ে যাওয়ায় গৈরিক ধাতুর চিহ্ন না থাকলেও তাতে নীলরঙের ঊর্ধ্বরেখা থাকায় সে যেন বন্ধনস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে।

পর্বতপ্রমাণ সেই গজরাজের তাড়নায় জলপ্রবাহ তীরভূমি প্লাবিত করল। পরে সে বুক দিয়ে শৈবালদাম বয়ে নিয়ে তীরে উঠে এল।

অজের শিবিরে বাঁধা পালিত হাতিদের দেখে সেই যূথপতির গণ্ড-দেশে যে মদবর্ষণের শোভা জলকাদায় ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত ছিল তা আবার উদ্দীপিত হলো। ছাতিম গাছের উগ্রগন্ধি দুধের মত তার মদবারির অসহ্য গন্ধ পেয়ে তাঁর সেনাবিভাগের হাতিরা মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। মাহুতেরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের নিবারণ করতে পারল না।

সেই বন্য হাতি মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যশিবির তোলপাড় করে তুলল। ঘোড়াগুলো লাগাম ছিঁড়ে পালাতে থাকায় রথগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রইল। অবলাদের রক্ষার জন্য যোদ্ধারা ছোটাছুটি করতে লাগল।

বন্য হাতি রাজাদের মারতে নেই, একথা কুমার অজ জানতেন বলে ছুটে আসা হাতিকে কোনমতে ফিরিয়ে দেবার জন্য ধনুকে একটি বাণ

সামান্য একটু আকর্ষণ করে তা দিয়ে তার কপালে আঘাত করলেন।

বাণ গিয়ে তার দেহ বিদ্ধ করতেই সে গজদেহ পরিত্যাগ করে উজ্জ্বল প্রভামণ্ডলের মধ্যবর্তী হয়ে আকাশচারী মনোহর গন্ধর্ব দেহ ধারণ করল। সৈন্যরা অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর সেই গন্ধর্ব নিজের প্রভাববলে সংগৃহীত কল্পতরুর পুষ্পরাশি অজের উপর বর্ষণ করে দন্তরাজির কিরণে তাঁর বুকের মুক্তাহারের কান্তিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন :

আমি প্রিয়দর্শন নামে গন্ধর্বরাজের পুত্র প্রিয়ংবদ। অহঙ্কারের ফলে মতঙ্গমুনির শাপে এই মাতঙ্গরূপে পরিণত হয়েছি। পরে আমি অনুনয় বিনয় করাতে তিনি কোমল হলেন। অগ্নি এবং উত্তাপে জল উষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি।

সেই মহামুনি আমাকে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশজাত অজ যেদিন লৌহমুখ বাণে তোমার কুম্ভ বিদ্ধ করবেন সেদিন তুমি তোমার নিজ দেহমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাবে আবার।

আমি দীর্ঘকাল আপনার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিলাম। আজ মহাপ্রাণ আপনি শাপমুক্ত করলেন আমাকে। আপনার যদি কোন প্রত্যুপকার না করি তাহলে আজ আমার নিজের দেহ ফিরে পাওয়া ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হে সখা, সম্মোহন নামে এই গান্ধর্ব অস্ত্র গ্রহণ করুন। এর প্রয়োগ এবং প্রতিসংহারের মন্ত্র পৃথক পৃথক। এই অস্ত্রে শত্রু নিধন হবে না। অথচ জয় হবে করতলগত।

আমাকে আঘাত করেছেন বলে আপনি লজ্জা করবেন না। কারণ আঘাত করার সময়ও আপনি মুহূর্তের জন্য সদয় হয়েছিলেন। তাই আমি যখন প্রার্থনা করছি তখন আমার প্রতি যেন প্রত্যাখ্যানের কঠোরতা বা রুক্ষতা প্রয়োগ করবেন না।

এইভাবে পথে দৈবযোগে তাঁদের দুজনের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হলো যার কারণ অচিন্ত্যনীয়। এবার তাঁদের একজন চৈত্ররথ প্রদেশে কুবেরের মনোহর উদ্যানে আর একজন সুশাসনরম্য বিদর্ভরাজ্যে প্রস্থান

করলেন।

কুমার অজ নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছেন জেনে তাঁর আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উদ্বেলিততরঙ্গ সমুদ্র যেমন চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে তেমনি করে বিদর্ভরাজ কুমারকে অভ্যর্থনা করলেন।

বিদর্ভরাজ আগে আগে গিয়ে অজকে নগরে প্রবেশ করিয়ে প্রসন্নচিত্তে এমনভাবে আদরযত্ন করতে লাগলেন যে সমবেত পুরবাসীরা ভাবতে লাগল বিদর্ভরাজই আগন্তুক এবং অজই গৃহপতি।

বিনম্র অনুচরেরা রঘুসদৃশ অজকে নবনির্মিত পটমণ্ডপ দেখিয়ে দিলে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। তার দ্বারদেশে নির্মিত বেদীতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল মূর্তিমান মদনদেব বাল্যের পর সুরম্য যৌবনদশা প্রাপ্ত হয়েছেন।

সেখানে যে কমনীয় কন্যারত্ন স্বয়ম্বর সভায় রাজসমাজকে সম্মিলিত করেছিল তাকে পাবার ইচ্ছায় রাত্রে অজের নিদ্রা অনেকক্ষণ পরে তাঁর নয়নবর্তিনী হলো। পতির অভিপ্রায় জানতে পেরে প্রণয়িণী যেমন হয় ঠিক তেমনি।

যাঁর কুন্তল স্থূল অংশদেশকে পীড়ন করেছিল, শয্যার আস্তরণ বিসর্জনে যাঁর অঙ্গরাগ ম্লান হয়ে পড়েছিল, প্রখ্যাতধী সেই অজকে তাঁরই সমবয়সী প্রগলভ চারণপুত্রেরা প্রভাতে জাগ্রত করলেন।

হে সুধীশ্রেষ্ঠ, ভোর হয়েছে, শয্যা ত্যাগ করো। বিধাতা পৃথিবীর ভার দুভাগে ভাগ করেছেন। তার একদিক তোমার পিতা বিনিদ্রভাবে ধারণ করে আছেন, আর তার অন্যদিক ধারণ করে আছ তুমি।

রাত্রিকালে তুমি নিদ্রাদেবীর বশীভূত হওয়ায় উপেক্ষ্যমানা সৌন্দর্য-দেবী খণ্ডিতা নায়িকার মত যার দিকে তাকিয়ে ঔৎসুক্য দূর করেছিলেন সেই চাঁদও দিগন্তে অস্ত যেতে যেতে তোমার মুখলাবণ্য পরিত্যাগ করছে।

তাই অবিলম্বে এক মনোজ্ঞ উন্মীলনে একই সঙ্গে দুটি জিনিস পারস্পরিক সাদৃশ্যলাভ করুক। সেই দুটি জিনিসের একটি হলো তোমার চোখ, আর অপরটি পদ্ম। উন্মীলনের সময় তোমার নয়নের

কোমল তারা দুটি স্পন্দিত হবে আর পদ্মের মধ্যে অবরুদ্ধ ভ্রমরও অস্থির হয়ে উঠবে বেরিয়ে আসার জন্য।

প্রভাতবায়ু তোমার স্বাভাবিক মুখমারুতের সুবাস অন্য বস্তুর মধ্যে লাভ করতে চেয়ে শিথিল তরুকুসুমকে বৃন্ত থেকে হরণ করছে, এবং তার সঙ্গে সূর্যের স্পর্শে উন্মোচিত পদ্মকেও সঙ্গে নিচ্ছে।

মুক্তাফলের মত শুভ্র শিশির তাম্রাভ তরুপল্লবে পতিত সৌন্দর্যের দিক থেকে আরও উৎকর্ষ লাভ করায় তোমার আরক্ত অধরোষ্ঠে শুভ্র দন্তচ্ছটামণ্ডিত কৌতুকহাস্যের মতই শোভা পাচ্ছে।

প্রতাপনিধি সূর্য ওঠার আগেই অরুণ দ্রুত অন্ধকার নাশ করে। হে বীর, বীরদের অগ্রগণ্য তুমি। সেই তুমি থাকতেও কি তোমার পিতা শত্রুদমন করবেন?

তোমার গজরাজেরা এপাশ ওপাশ করে ঘুম থেকে উঠছে বলে তাতে শৃঙ্খল আকর্ষণের ধ্বনি উঠছে। তাদের দন্তরাজিতে তরুণ অরুণরাগ সঞ্চারিত হওয়ায় মনে হচ্ছে তারা ধাতুময় সানুদেশে বপ্রক্রীড়া করে ফিরছে।

হে কমলাক্ষ, দীর্ঘ পটমণ্ডপে বাঁধা পারস্যের বলায়ুদেশীয় ঘোড়াগুলি নিদ্রা ত্যাগ করে তাদের সামনে রাখা লেহনযোগ্য সৈন্ধবশিখার খণ্ডগুলো মুখের বাষ্পে ম্লান করে দিচ্ছে।

ম্লান পুষ্পোপহার শিথিলগ্রন্থি হয়ে পড়েছে। স্তিমিত হয়ে আসছে প্রদীপগুলি। তাছাড়া খাঁচায় বন্ধ মধুরবাক এই শুকপাখিটি তোমাকে জাগাতে গিয়ে আমরা যেসব কথা বলছি তার অনুকরণ করছে।

রাজহংসদের কলধ্বনিতে জেগে উঠে সুপ্রতীক নামে দিগ্‌গজ যেমন গঙ্গার সৈকতভূমি পরিত্যাগ করে তেমনি বৈতালিক পুত্রদের বিরচিত-বচনে বিনিদ্র হয়ে কুমার শয্যাত্যাগ করলেন।

তারপর ললিতনেত্র অজ বিধিমত প্রাতকৃত্য সমাপন করলেন। পরে প্রসাধনদক্ষেরা তাঁকে উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত করলে তিনি স্বয়ম্বর সভায় সমাসীন রাজসমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ষষ্ঠ সর্গ

কুমার অজ সেখানে দেখলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজারা সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিমানচারী দেবতাদের শোভা নিয়ে অলঙ্কৃত সিংহাসনে রাজোচিতভাবে সারিবন্ধ হয়ে বসে আছেন।

পত্নী রতির প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বুঝি তার স্বামী মদনকে আবার তার দেহটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাকুৎস্থ অজকে দেখে তাই মনে করে উপস্থিত রাজাদের মন ইন্দুমতীকে লাভ করার আশা ত্যাগ করল।

বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে কুমার অজ সাজানো সোপানপথে মঞ্চে আরোহণ করলেন, যেমন ছোট ছোট শিলাখণ্ডে পা রেখে সিংহশিশু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে।

ময়ূরের উপর আরূঢ় রূপবান কার্তিকের মত তিনি উজ্জ্বলতম রঙের আস্তরণ দেওয়া রত্নময় আসনে বসলেন। মেঘরাশির গায়ে গায়ে যেমন বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে তেমনি সৌন্দর্যের আসল রূপটি যেন সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে হাজার ভাগে ভাগ হয়ে অদ্ভুত তেজে-সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

সেই উজ্জ্বল বেশভূষাযুক্ত ও মহার্ঘ আসনে সমাসীন রাজাদের মধ্যে নিজের তেজে দীপ্তিমান রঘুপুত্র অজকে কল্পবৃক্ষদের মধ্যে পারিজাতের মত মনে হলো। অন্য সব রাজাদের ছেড়ে পুরবাসীদের চোখ তাঁর উপরে গিয়ে পড়ল, পুষ্পবৃক্ষ ছেড়ে ভ্রমরেরা যেন মদস্রাবী বন্য হাতির উপরে উড়ে বসল।

তারপর বন্দীরা বংশমর্যাদা অনুসারে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের সব রাজাদের স্তুতিগান গাইল। অগুরু ধূপের ধোঁয়া বাতাসে উড়ে পতাকাগুলোকে ছাড়িয়ে গেল। গভীর গম্ভীর মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি দিকদিগন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তা শুনে নগরের উপকণ্ঠে উপবনের ময়ূরেরা মেঘের গর্জন ভেবে নেচে উঠল। তখন মানুষে বয়ে আনা চতুর্দোলায় চড়ে বধূবেশে স্বয়ংবরা কন্যা ইন্দুমতি পরিজনসহ দুসারি মঞ্চের মধ্যবর্তী পথে প্রবেশ করলেন।

বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি শত শত চোখের একমাত্র লক্ষ্য ঐ কন্যার

প্রতি উপস্থিত রাজাদের মন দুর্বার বেগে আকৃষ্ট হলো। আসনে শুধু তাঁদের দেহগুলো পড়ে থাকল। গাছেরা যেমন পল্লবশোভা বিস্তার করে তেমনি করে আপন আপন মনোগত অভিলাষ নিয়ে রাজকুল প্রেম-নিবেদনের অগ্রদূতের মত সেই কন্যার প্রতি বিভিন্ন প্রণয় চেষ্টা প্রকাশ করলেন।

কোন রাজা হাতের লীলাকমলের মৃণালটিকে দুহাতে চেপে ধরে ঘোরাতে লাগলেন। তাতে চঞ্চল পাপড়িগুলোর আঘাতে ফুলে বসে থাকা ভ্রমরেরা উড়ে গেল। রেণুগুলো উড়ে একটা মণ্ডল তৈরী করল।

কোন বিলাসী কাঁধ থেকে খসে পড়া রত্নখচিত কেয়ূরে আটকে যাওয়া মালাটি টেনে ঠিক জায়গায় বসাতে গিয়ে সুন্দর মুখটি একটু বাঁকিয়ে নিলেন।

আবার কোন জন চোখের দৃষ্টি একটু নামিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ বাঁকিয়ে নখের আঁকাবাঁকা আলো ছড়িয়ে সোনার পাদপীঠে কি যেন লিখলেন।

একজন বাঁ হাতটি আসনে ভর দিয়ে এবং তার ফলে বাঁ কাঁধটি একটু উঁচু করে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন। তাঁর গলার হার ঘুরে গিয়ে মেরুদণ্ড স্পর্শ করল।

এক যুবক রাজা প্রিয়তমার নিতম্বদেশে আঘাতে পটু নখ দিয়ে প্রেয়সীর মন ভোলানো দন্তপত্র কেতকীফুলের প্রায় সাদা পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগলেন।

কারও বা লালপদ্মের মত রাঙা হাতের তালুতে অনেক রেখা বা ধ্বজাচিহ্ন ছিল। তিনি জড়োয়া আংটির জৌলুষ ছড়িয়ে লীলাভরে পাশার দান দিলেন।

কেউ ঠিক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও একটু যেন নড়ে উঠেছে এমনভাবে মুকুট হাতে ছোঁয়ালেন। মুকুটে বসানো বজ্রমাণিক্যের ছটায় আঙ্গুল-গুলো ভরে গেল।

তখন দ্বারপালিকা সুনন্দা যেসব রাজার বংশপরিচয় ও কীর্তির কথা জানত, তা স্বয়ংবরা কন্যাকে বলতে লাগল। প্রথমেই তাঁকে মগধ-

দেশের রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে পুরুষের মত বাকপটু ভঙ্গিমায় বলল—

ইনি মগধদেশের রাজা, শরণাগতদের একমাত্র আশ্রয়। এঁর স্বভাব গম্ভীর। ইনি প্রজাদের মনোরঞ্জন করেন বলে এঁর রাজা নাম সার্থক হয়েছে। অন্য রাজা যতই থাকুক, এঁকে লক্ষ্য করেই সকলে পৃথিবীকে সুশাসিত বলে। গ্রহতারকা অনেক থাকলেও একমাত্র চাঁদই রাত্রিকে আলোকময়ী করে তোলে। ইনি অনবরত যাগযজ্ঞ করেন, সেখানে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র উপস্থিত থাকেন, ফলে শচীদেবীর পাণ্ডুর কপালে এসে পড়া অলকাবলীতে দীর্ঘদিন ধরে মন্দারফুল শোভা পায় না।

যদি চাও ইনি তোমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহলে এঁর নগরীতে প্রবেশ করার সময় রাজপ্রাসাদের জানালায় জানালায় দাঁড়ানো পাটলি-পুত্রের পুরসুন্দরীদের তোমাকে দেখার আনন্দ দান করো।

দ্বারপালিকার কথা বলা শেষ হলে কন্যা সেই রাজার দিকে একবার তাকিয়ে দূর্বাঘাস ও মৌফুলের মালাটি একটু দুলিয়ে কোন কথা না বলে একটি শুষ্ক নমস্কারে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

হাওয়ায় দুলে ওঠা ঢেউ যেমন মানসসরোবরের রাজহংসীকে এক পদ্ম থেকে অন্য পদ্মে নিয়ে যায় তেমনি বেত্রধারিণী দ্বারপালিকা সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য রাজার সামনে নিয়ে গেল।

সুনন্দা এবার স্বয়ম্বরা কন্যা ইন্দুমতীকে বলল, ইনি অঙ্গদেশের রাজা, এঁর যৌবনলাবণ্য সুরসুন্দরীদেরও কামনার বিষয়, সূত্রকারেরা স্বয়ং এঁর গজসমূহকে শিক্ষা দান করেছেন, পৃথিবীতে বাস করেও ইনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

বড় বড় মুক্তাফলের অশ্রুবিন্দুতে শত্রুনারীদের স্তনদেশ ভরিয়ে দিয়ে ইনি যেন ছিনিয়ে নিয়ে হারগুলোতেই বিনা সুতোয় গেঁথে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও এঁর মধ্যে দুটিই স্থান পেয়েছে। ওগো কল্যাণী, রূপে ও মধুর বচনে তুমিই দুজনের তৃতীয় নাম্নী হবার উপযুক্ত।

তখন রাজকুমারী ইন্দুমতী অঙ্গরাজের থেকে চোখ নামিয়ে ধাত্রীকে

বললেন, চল। অঙ্গরাজ সুদর্শন ছিলেন না তা নয়, ইন্দুমতী বিচার করতে জানতেন না তাও নয়, তবে মানুষ ভেদে রুচির পার্থক্য হয়।

তারপর দ্বারপালিকা শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ অথচ সদ্য ওঠা চাঁদের মত সুন্দর রাজা, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষোদেশ, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গোলাকার—ত্বষ্টার ধারাচক্রে শাণিত সূর্যের মতই ইনি দীপ্তিমান।

এই রাজা যখন তিনশক্তি অর্থাৎ প্রভুত্বশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন অগ্রসরমান ক্ষুরের ধুলোর ঝড়ে সামন্ত রাজাদের মুকুটের মণির ছটার অংকুরসহ ঢাকা পড়ে যায়।

চন্দ্রশেখর মহাদেবের দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম মহাকালে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কাছেই এঁর বাস। তাই কৃষ্ণপক্ষেও ইনি প্রেয়সীদের সঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করেন। মহাদেবের মাথার চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণপক্ষও সেখানে আলোকিত।

ওগো রম্ভোরু, এই তরুণ রাজার সঙ্গে শিপ্রানদীর ঢেউয়ে ভেসে আসা হাওয়ার আঘাতে কেঁপে কেঁপে ওঠা উদ্যানসমূহে বিহার করতে মন চাইছে কি?

কুমুদিনী যেমন বন্ধু পদ্মফুলকে ফুটিয়ে তোলা এবং শত্রু পঙ্করাশিকে তেজে শুকিয়ে দেওয়া সূর্যকে চায় না, তেমনি চমৎকার লাবণ্যময়ী ইন্দুমতী বন্ধুবৎসল ও শত্রুনাশক অবন্তীরাজার প্রতি অনুরাগ অনুভব করলেন না।

সুনন্দা এবার লালপদ্মের মত তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বগুণসম্পন্না, বিধাতার মাধুরীমাখা সৃষ্টি সেই সুন্দরী ইন্দুমতীকে অনূপ রাজার সামনে এসে বলতে লাগল,

পুরাকালে এক যোগী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল কার্তবীর্য। যুদ্ধের সময় তাঁর এক হাজার বাহু দেখা দিত। আঠারোটি দ্বীপে তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজা নামটি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

কেউ দুষ্কর্মের চিন্তা করামাত্র শিক্ষক হয়ে তিনি ধনুক হাতে সেখানে উপস্থিত হতেন। প্রজাদের মনোগত অপরাধকেও তিনি নিবৃত্ত

করতেন।

তিনি ইন্দ্রবিজয়ী লঙ্কেশ্বরকেও ধনুকের গুণে বেঁধেছিলেন। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকলেও নিজে প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাঁরই বংশে এই রাজা জন্মেছেন। এঁর নাম প্রতীপ। ইনি জ্ঞানবৃদ্ধদের অনুরাগী। আশ্রয়ের দোষে উৎপন্ন লক্ষ্মী চঞ্চলা এই অপবাদ ইনিই দূর করেছেন।

যুদ্ধের সময় স্বয়ং অগ্নিদেবকে সহায় হিসাবে পেয়ে ইনি ক্ষত্রিয়-কুলের কালরাত্রিস্বরূপ পরশুরামের কুঠারের শাণিত ধারকেও পদ্ম-পাপড়ির মত নিতান্ত কোমল মনে করেন।

যদি মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীররূপ নিতম্বের মেখলাস্বরূপ জলস্রোতে উচ্ছলসুন্দর রেবা নদীকে প্রাসাদের জানালা দিয়ে দেখতে ইচ্ছা থাকে তবে এই আজানুলম্বিতবাহুর অঙ্কশায়িনী হও।

যথেষ্ট রূপবান হওয়া সত্ত্বেও সেই রাজাকে মনে ধরল না ইন্দুমতীর। শরৎকালের নির্মেঘ আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে যেমন নলিনীর মনে ধরে না।

এরপর দ্বারপালিকা তখন শূরসেনের রাজা সুষেন সম্পর্কে কুমারীকে বলল, তাঁর কীর্তি লোক-লোকান্তরে প্রচারিত সদাচারে তিনি মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়কুলের প্রদীপস্বরূপ।

এই বাঙ্কিক রাজা নীপবংশে জন্মেছেন। এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণরাশি স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ত্যাগ করেছে। শান্ত সিদ্ধাশ্রমে এসে প্রাণী-কুল যেমন প্রকৃতিগত পরস্পর বিরোধও ভুলে যায়।

তবে নিজের প্রাসাদে চাঁদের আলোর মত নয়নাভিরাম শোভা, কিন্তু শত্রুদের নগরে এঁর তেজ দুঃসহ। সেখানে অট্টালিকার মাথায় ঘাস গজিয়েছে। ইনি যখন জলবিহার করেন তখন অন্তঃপুরসুন্দরীদের বুকের চন্দন জলে ধুয়ে যায়। ফলে মথুরায় বয়ে যাওয়া কালিন্দী-যমুনাকেও গঙ্গাজলের ঢেউয়ে ভরা মনে হয়।

গরুড়ের ভয়ে পালিয়ে কালিয়নাগ যমুনাতীরে যে মণিটি ফেলে গিয়েছিল বুক জুড়ে তার প্রভা ছড়িয়ে অর্থাৎ তাকে গলার হারে বুকে

দুলিয়ে ইনি যেন কৌস্তুভধারী শ্রীকৃষ্ণকেও লজ্জা দেন।

ওগো সুন্দরী, এই তরুণ রাজাকে পতিত্বে বরণ করে চৈত্ররথের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এমন বৃন্দাবনে কোমল পল্লবের উপরে পাতা কুসুম শয়নে তোমার যৌবনশ্রীকে উপভোগ করো। বর্ষাকালে গিরিগোবর্ধনের রমণীয় গুহায় জলে ভেজা শিলাজন্তুর গন্ধে ভরা শিলাতলে বসে ময়ূরের নাচ দেখো।

সে রাজাকে ছাড়িয়ে নদীর ঘূর্ণির মত সুন্দর নাভি নিয়ে অন্যের মধ্যে হতে তিনি চলে গেলেন, সাগরাভিমুখে ছুটে চলা স্রোতোস্বিনী নদী যেমন পথে পড়া পাহাড়কে এড়িয়ে যায়।

কলিঙ্গরাজ হেমঙ্গদেবের হাতে কনককেয়ূর বাঁধা ছিল। তিনি শত্রুপক্ষকে বিনাশ করেছিলেন। তাঁর সামনে এসে সুনন্দা পূর্ণচন্দ্রমুখী রাজকন্যাকে বলল,—

ইনি মহেন্দ্রপর্বতের মত শক্তিসম্পন্ন। মহেন্দ্রপর্বত এবং বিশাল সমুদ্রের ইনি অধিপতি। যুদ্ধের অভিযানকালে মদধারাবর্ষী সেনাপতির রূপ ধরে মহেন্দ্রপর্বই যেন এঁর সামনে যায়।

ধনুর্ধারীদের মধ্যে ইনি হচ্ছেন সর্বাগ্রগণ্য। এর দুটি বাহুতে ধনুকের চাপ। দেখে মনে হচ্ছে যেন শত্রুরাজাদের বন্দিনী রাজলক্ষ্মীর কাজল আঁকা দুই চোখের দুটি জলধারাকে বহন করছেন।

নিজের কক্ষে সুপ্ত থাকলে প্রহরশেষের তূর্যধ্বনিকে ছাপিয়ে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষই এঁকে জাগিয়ে দেয়। তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন থেকেই সমুদ্রের তরঙ্গমালা দেখা যায়।

তালবনের মর্মরধ্বনিতে মুখরিত সমুদ্রের তীরে তীরে তুমি এঁর সঙ্গে বিহার করো। দ্বীপান্তর থেকে লালফুল উড়িয়ে এনে বাতাস তোমার ক্লান্তির ঘর্মচিহ্ন মুছিয়ে দেবে।

সে এভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেও বিদর্ভরাজের রূপসী বোন তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেলেন। মানুষ পুরুষকার বলে অনেক দূরে টেনে আনলেও প্রতিকূল ভাগ্যের বশে লক্ষ্মী যেমন ফিরে যান।

তারপর দ্বারপালিকা সুনন্দা উরগপুরের রাজা দেবদর্শনের সামনে

এসে আগের মতই ভোজকন্যা ইন্দুমতীকে বলল, ওগো চকোরনয়নে, এইদিকে এস।

এর নাম পাণ্ডুদেশের রাজা পান্ড্য। এর কাঁধ থেকে হারটি লম্বা হয়ে ঝুলছে। হরিচন্দন এঁর অঙ্গরাগ হয়েছে—উদয় সূর্যের রোদে রাঙা। নির্ঝরিণীর উচ্ছ্বাসমুক্ত পর্বতের মতই এঁর শোভা।

যে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্বতকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, বিশাল সমুদ্রকে এক নিঃশ্বাসে পান করে আবার তা উগরে দিয়েছিলেন, সেই অগস্ত্যই ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞশেষে অবভৃথ স্নান করে এলে তাঁকে প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করেন, ঠিকমত স্নান হয়েছে ত?

ইনি মহাদেবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করেছেন। পুরাকালে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত জনস্থান নগরীর বিনাশের আশঙ্কায় উদ্ধত লঙ্কাধিপতি রাবণও এর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে তারপরে ইন্দ্রলোক জয় করতে যান।

এই উচ্চবংশের রাজা শাস্ত্রমতে তোমার পাণিগ্রহণ করলে বিপুলা পৃথ্বীর মত তুমিও রত্নাকর সমুদ্র যার মেখলা সেই দক্ষিণ দিগ্‌বধূর সপত্নী হবে।

মলয়স্থলী বা পশ্চিমঘাট পর্বতের সুপারী গাছগুলোকে বেয়ে পানলতা উঠেছে, চন্দন গাছকে জড়িয়ে আছে এলাচলতা, তমাল গাছের পাতার আস্তরণ পাতা আছে মাটিতে। সেই মনোরম স্থানে বারবার বিহার করতে যাওয়ার ইচ্ছা হোক তোমার।

এই রাজা নীলোৎপলের মত শ্যামবর্ণ, তোমার শরীরটি গোরোচনার মত গৌরবর্ণ। মেঘ আব বিদ্যুতের যোগের মত তোমাদের মিলন পরস্পরের শোভা বর্ধন করুক।

সূর্যাস্তের পর পাপড়ি গুটিয়ে নিলে চাঁদের কিরণ যেমন পদ্মের মধ্যে স্থান পায় না তেমনি দ্বারপালিকার এই উপদেশ বিদর্ভ রাজকন্যার মনে স্থান পেল না।

নৈশ রাজপথে আলোক সঞ্চারিণী দীপশিখা সামনে এগিয়ে গেলে পিছনের অট্টালিকাগুলির যে অবস্থা হয় সেই স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যে সব

রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে পার হয়ে গেলেন সেই সব রাজাদেরও মুখ তেমনি অন্ধকার হয়ে গেল।

ঐ রাজকন্যা আমার সামনে এসে আমাকে বরণ করবে কি? এই ভেবে আকুল হলো রঘুর পুত্র অজের মন। তখন তাঁর দক্ষিণবাহুতে বাঁধা কেয়ূরের ঘন ঘন স্পন্দন তাঁর সব সংশয় দূর করে দিল।

ভ্রমরের দল মুকুলিত সহকার বা আম্রবৃক্ষকে পেয়ে যেমন অন্য আর কারো কাছে যেতে চায় না তেমনি অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি অজের কাছে এসে রাজকুমারী আর অন্য কারো কাছে গেলেন না।

চন্দ্রতুল্য ইন্দুমতীর মন অজের মধ্যে ডুবেছে দেখে বচনপটীয়সী সুনন্দা সবিস্তারে তাঁর কথা বলতে লাগল ঃ

ইক্ষাকুবংশে ককুৎস্থ নামে এক মহাগুণী রাজা ছিলেন। সেই নাম নিয়ে উত্তর কোশলের বড় বড় রাজারা গর্ব করে নিজেদের কাকুৎস্থ বলে পরিচয় দিতেন।

যুদ্ধকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃষরূপ ধারণ করলে রাজা ককুৎস্থ তাঁর ঝুঁটি অর্থাৎ ককুদে বসে মহাদেবের ভঙ্গিতে বাণবর্ষণ করেন। ফলে অসুররমণীদের চোখের জলে তাদের মুখের পত্রলেখা ধুয়ে গিয়েছিল।

ঐরাবতের লাফালাফিতে ইন্দ্রের কেয়ূর শিথিল হয়ে পড়লে রাজা ককুৎস্থ তা ঠিক করে দিলেন। ইন্দ্র নিজের শ্রেষ্ঠ মূর্তিতে থাকলেও অর্থাৎ দেবরাজের আসনে সমাসীন থাকলেও ককুৎস্থ সে আসনের অর্ধাংশে বসতেন।

তাঁরই বংশে বংশের প্রদীপস্বরূপ কীর্তিমান রাজা দিলীপের জন্ম হয়। নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও ইন্দ্রের ঈর্ষানিবৃত্তির জন্যই তিনি যজ্ঞ বন্ধ করেছিলেন। তিনি যখন পৃথিবী শাসন করতেন তখন মত্ত-কামিনীরা অভিসারে যাওয়ার কালে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়লেও কেউ তাদের কিছু চুরি করার জন্য হাত বাড়াত না। বাতাসও তাদের আঁচল টানত না।

তাঁরই পুত্র রঘু এখন রাজ্যশাসন করছেন। তিনি বিশ্বজিৎ নামে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন। চারদিক থেকে সংগ্রহ করা ঐশ্বর্যকে দান

করে দিয়ে তিনি মাটির পাত্রটুকু সার করেছেন।

তাঁর যশ পাহাড়ের চূড়াকে স্পর্শ করেছে, সাগর অতিক্রম করেছে, নাগলোকের পাতালে গিয়েছে এবং দ্যুলোক পর্যন্ত উঠে গেছে। সে যশের পরিমাপ করব এমন সাধ্য আমার নেই।

দেবলোকের রাজা ইন্দ্রের যেমন জয়ন্ত, তেমনিই তাঁর পুত্র এই কুমার অজ। ইনি দক্ষপিতার মত পৃথিবীর গুরুভার বহন করছেন, যেমন ছোট বলদ বড় বলদের মত জোয়াল টানে।

বংশমর্যাদায়, রূপে, তারুণ্যে, বিনয় থেকে শুরু করে সমস্ত গুণে ইনি তোমার সমকক্ষ। এঁকে তুমি বরণ করো। মণিকাঞ্চনে যোগ হোক।

সুনন্দার কথা শেষ হলে রাজকুমারী লজ্জা কাটিয়ে আনন্দস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারকে বরণ করলেন। এই দৃষ্টিই হলো তাঁর বরণমালা।

কুঞ্চিতকেশা সুন্দরী তরুণ অজের প্রতি নিজের ভাবটি শালীনতার বশে মুখে বলতে না পারলেও তাঁর শরীর ভেদ করে রোমাঞ্চ হয়ে বেরিয়ে এল যেন।

সখীর অবস্থা দেখে নেত্রধারিণী সুনন্দা পরিহাস করে বলল, আর্যে, চল আমরা অন্য দিকে যাই। তখন ইন্দুমতী রোষকুটিল নয়নে তার াদকে তাকালেন।

করভ বা হাতির মত উরুবিশিষ্টা ইন্দুমতী মঙ্গলচূর্ণমাখানো মূর্ত অনুরাগের মত ফুলের মালাটি ধাত্রীর হাত থেকে নিয়ে রঘুনন্দনের গলায় ঠিকমত পরিয়ে দিলেন।

বরেণ্য কুমার অজ মঙ্গলপুষ্পে গাঁথা মালাটি বক্ষোদেশে দুলতে দেখে মনে ভাবলেন বিদর্ভের রাজকন্যাই তাঁর কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আছেন।

চাঁদের সঙ্গে জ্যোৎস্না মিলিত হয়েছে, জাহ্নবী তার যোগ্য সমুদ্রে পড়েছে, সমান গুণসম্পন্ন এই দুজনের মিলনে আনন্দিত পুরনারীরা সকলেই একই কথা বলতে লাগল যা প্রত্যাখ্যাত রাজাদের কানে বাজল।

একদিকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত বরপক্ষ, অন্যদিকে শূন্যমনা রাজমণ্ডলকে দেখে মনে হলো যেন একদিকে ভোরবেলাতে সরোবরে প্রফুল্ল পদ্ম আর একদিকে ঘুমে ঢলে পড়া নিষ্প্রভ কুমুদবন।

সপ্তম সর্গ

তারপর কার্তিকের সঙ্গে মিলিত দেবসেনার মত যোগ্য বরে পড়া বোনকে নিয়ে বিদর্ভরাজ অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে চললেন।

অন্য রাজারা তখন ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিজেদের রূপ এবং সাজ-সজ্জাকে ধিক্কার দিতে দিতে সকালবেলার চাঁদ তারাদের মত ম্লান মুখে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন।

সেখানে স্বয়ং শচীদেবী উপস্থিত ছিলেন। তাই স্বয়ংবরসভায় কোন ব্যাঘাত হলো না। কাকুৎস্থ অজের প্রতি ঈর্ষায় কাতর হলেও নিজেদের শান্ত ও সংযত রাখলেন প্রত্যাখ্যাত রাজারা।

নববধূকে নিয়ে বর রাজপথে এলেন। লতায়, ফুলে ও মালায় সজ্জিত করা হয়েছিল সে পথ। রামধনুর মত ঝলমল করছিল তোরণগুলো। পতাকাগুলির ছায়াতে রোদ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল।

তাই দেখার আগ্রহে পুরনারীরা অন্য সব কাজ ফেলে বিভিন্ন প্রাসাদে সোনার গবাক্ষপথে হুড়োহুড়ি করতে লাগল।

গবাক্ষপথে হঠাৎ উঠে যেতে যেতে কারো চুলের বাঁধন খুলে মালা খসে পড়ল। খোলা চুল হাতে ধরেই চলল। কেউ আলতা পরার জন্য প্রসাধিকার হাতে পায়ের পাতাটি তুলে দিয়েছিল, সেই পা হঠাৎ টেনে নিয়ে দৌড়ে জানালা পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন এঁকে দিল। আর একজন ডান চোখে কাজল দিয়ে বাঁ চোখে কাজল না নিয়ে কাজলকাঠি নিয়ে বাতায়নের দিকে ছুটে গেল। অন্য একজন জানালার দিকে চেয়ে ছুটে যেতে গিয়ে পরনের ঘাঘরার গিঁট খুলে গেলেও তা বেঁধে না নিয়ে কাপড়টি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। অলঙ্কারের প্রভা ছড়িয়ে পড়ল তার নাভিদেশে। মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়াতে রত্নগুলো একে একে খসে পড়ল এবং তার বুড়ো আঙুলে শুধু সুতোটি ধরা রইল।

তাদের আসবগন্ধে ভরা কৌতূহলী মুখগুলো চঞ্চল ভ্রমরচক্ষু নিয়ে বাতায়নগুলোকে ঢেকে দিল। মনে হলো বাতায়নগুলি যেন অসংখ্য পদ্মফুলে অলঙ্কৃত হয়েছে।

সে পুরকামিনীরা রঘুপুত্রকে দৃষ্টি দিয়ে নিঃশেষে পান করতে করতে অন্য কাজের কথা ভুলে গেল। কারণ তাদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো যেন চোখে জড়ো হয়েছিল।

অনেক না-দেখা রাজা মনে মনে তাকে চাইলেও ইন্দুমতী স্বয়ংবরের কথা ঠিকই ভেবেছে। তা না হলে কেমন করে সে লক্ষ্মীর অনুরূপ নারায়ণের মত নিজের উপযুক্ত বর পেল? যদি প্রজাপতি কমনীয়কান্তি এই যুগলকে মিলিত না করতেন তাহলে তাঁর এদের দুজনকে এত সুন্দর করে গড়ে তোলার সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যেত।

পূর্বজন্মে এরা নিশ্চয় রতি ও মদন ছিল। তাই এই কন্যা হাজার রাজার মধ্য থেকে নিজের সমান তার বরকে বেছে নিয়েছে। কারণ মন জন্মান্তরের সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারে।

পুরাঙ্গনাদের মুখের এই সব শ্রুতিমধুর কথা শুনতে শুনতে রাজকুমার অজ মঙ্গলসজ্জায় উদ্ভাসিত সম্বন্ধীর প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি করেণুকা থেকে কামরূপের রাজার হাত ধরে অবতরণ করলেন। বিদর্ভরাজ দেখিয়ে দিলে চত্বরের মধ্যে যেন নারী-কুলের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন।

মহার্ঘ সিংহাসনে বসে তিনি ভোজরাজার দেওয়া রত্নাঙ্গুরীয় মধুপর্ক এবং রেশমী জোড়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। তার সঙ্গে ছিল অন্তঃ-পুরিকাদের কটাক্ষ।

ক্ষৌমবস্ত্র পরে নিলে বিনীত অন্তঃপুররক্ষীরা তাঁকে বধূর কাছে নিয়ে গেল, নবোদিত চাঁদের কিরণরাশি ফেনিল সমুদ্রকে যেমন বেলা-ভূমিতে পৌঁছে দেয়।

সেখানে ভোজরাজের পূজো নিয়ে অগ্নিতুল্য পুরোহিত অগ্নিদেবকে আজ্য ইত্যাদি আহুতি দিয়ে অগ্নিকে বিবাহের সাক্ষী করে বর ও বধূর মিলন ঘটালেন।

নববধূর হাত ধরায় রাজকুমারকে আরও উজ্জ্বল দেখাল। কাছের অশোকলতার পল্লবকে সহকারতরু যেন নিজের পল্লবে জড়িয়ে নিল।

বরের মণিবন্ধ রোমাঞ্চিত হলো, কন্যার হাতের আঙুল ঘর্মাক্ত হয়ে

উঠল। পরস্পরের পানিস্পর্শের মধ্য দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁদের মনোগত অনুরাগ যেন সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত পরস্পরের প্রতি সতৃষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে লজ্জাসিক্ত এক সংকোচ দেখা দিল।

জ্বলন্ত অগ্নি প্রদক্ষিণের সময়ে পরস্পরসংযুক্ত ঐ দম্পতি মেরু-প্রদক্ষিণরত রাত্রির মত শোভা পেলেন।

বিধাতাপ্রতিম গুরু পুরোহিতের নির্দেশ পেয়ে লজ্জাবতী নিতম্বিনী নববধূ প্রেমমত্ত চকোরপাখির মত চোখ নিয়ে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিলেন। সেই অগ্নি থেকে হোমের শমীপল্লব ও লাজ বা খই-এর গন্ধ-মাখা পবিত্র ধোঁয়া উঠল। সে ধোঁয়া বধূর মুখে ও গালে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য কর্ণোৎপলের স্থান নিল।

আচারধূম গ্রহণ করার সময় বধূর চোখ কাজলমেশা জলে ভরে গেল। বীজাঙ্কুরের কর্ণভূষণ মলিন হলো। গালদুটো রাঙিয়ে উঠল।

সোনার আসনে বরকনেকে বসিয়ে স্নাতকেরা বন্ধুবান্ধবসহ রাজা ভোজ এবং স্বামী পুত্রবতী রমণীরা একে একে তাদের উপরে জলে-ভেজা আতপচাল ছড়াতে লাগলেন।

বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ রাজা ভোজ এইভাবে ভগিনীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করে নিমন্ত্রিত রাজাদের পৃথক পৃথকভাবে সমাদরের জন্য অনুচরদের আদেশ দিলেন।

হিংস্র প্রাণীকে লুকিয়ে রাখা নির্জন সরোবরের মত বাইরে আনন্দের ভাব দেখিয়ে রাজারা সমস্ত ক্ষোভ গোপন রাখলেন। তারপর বিদর্ভ-রাজকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর দেওয়া উপহার যৌতুকছলে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

পরে সেই রাজার দল ঐ কন্যারত্নকে ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অজের যাবার পথে পরস্পরকে সংকেত দিয়ে অবরোধ করে রইল।

ইতিমধ্যে বিদর্ভের রাজা ভোজ কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ সম্পন্ন করে আপন প্রতিষ্ঠার অনুরূপ সম্পদের যৌতুকসহ রঘুপুত্রকে বিদায় দিয়ে নিজেও তাঁর অনুগমন করলেন।

ত্রিভুবনখ্যাত অজের সঙ্গে মাঝপথে তিন দিন বাস করে কুণ্ডিনগরের অধিপতি ভোজ তাঁর কাছ থেকে অমাবস্যাশেষে সূর্যের কাছে চাঁদের মত বিদায় নিলেন।

কোশলাধিপতি রঘুর প্রতি তাদের সর্বস্ব অপহরণ করার কারণে আগে হতেই অর্থাৎ দিগ্বিজয়ের সময় থেকে সকলে রুষ্ট ছিল। সুতরাং তাঁরই পুত্রের এই স্ত্রী রত্নলাভ উপস্থিত রাজারা সহ্য করতে পারল না।

সেই দৃপ্ত রাজন্যবর্গ ভোজকন্যাকে নিয়ে যাবার সময় অজকে পথে অবরুদ্ধ করল, বলিরাজের ধন নিয়ে যাবার সময় প্রহ্লাদ যেমন বিষ্ণুকে করেছিল।

কুমার অজ ইন্দুমতীকে রক্ষা করার জন্য বহু সেনাসহ পিতৃসচিবকে আদেশ দিয়ে ভাগীরথীতে উত্তালতরঙ্গ শোণনদের মত সেই রাজবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সমানে সমানে তুমুল যুদ্ধ বাধল। পদাতিকরা পদাতিকের উপর, রথারোহী রথীর উপর, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর উপর, এবং গজারোহী গজারোহীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘোর তূর্যধ্বনিতে ধনুর্ধারীরা কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তারা নিজেদের বংশ পরিচয় বলতে পারছিল না। তাদের বাণের উপর লেখা থেকেই পরস্পরের বিখ্যাত নাম জানতে পারা যাচ্ছিল।

যুদ্ধে ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো উড়ল। রথের চাকার মণ্ডলে মণ্ডলে তা ঘন হলো। হাতির কানের ঝটপটানিতে তা ছড়িয়ে ছড়িয়ে চাঁদোয়ার মত হয়ে সূর্যকে ঢেকে দিল।

মাছ-আঁকা পতাকাগুলোর মুখ হাওয়ায় ছিঁড়ে সেনাবাহিনীর রাশি রাশি ধুলোয় ভরে গিয়ে তারা বর্ষার কলুষ জল পানরত সত্যি মাছেদের মত দেখাল। সেই ঘন ধুলোয় রথের চাকার ধ্বনিতেই হাতিকে বোঝা গেল শুধুমাত্র স্বীয় প্রভুর নাম উচ্চারণ শুনেই আত্মপক্ষ ও শত্রুপক্ষ নির্ণীত হলো।

সেই দৃষ্টিরোধকারী দিগন্তব্যাপী ধুলোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া, হাতি এবং বীর যোদ্ধাদের অস্ত্রাঘাত থেকে ফিনকি দিয়ে

ওঠা রক্তপ্রবাহকে বালসূর্য বলে মনে হচ্ছিল।

ধুলোর রাশি রক্তে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওয়াতে ভাসছিল। মনে হচ্ছিল ছাই হয়ে যাওয়া আগুনের প্রথম ওড়া ধোঁয়া।

প্রহারজনিত মূর্ছার ঘোর কেটে গেলে রথারোহীরা রথ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেখে সারথিদের তিরস্কার করল। তারপর পতাকা চিনে চিনে যারা আঘাত করেছিল সক্রোধে তাদেরই আক্রমণ করল।

মাঝপথে শত্রুপক্ষের বাণে কেটে দুখানা হয়ে গেলেও পাকা হাতের ধনুর্ধরের সে বাণগুলি নিজের বেগে অর্ধেক ফল নিয়েই লক্ষ্য বিদ্ধ করল। হস্তীযুদ্ধে ক্ষুরের ফলার মত ধারাল চক্রে গজারোহীদের মাথা কেটে উড়ে গেল। কিন্তু বাজপাখির নখের আগায় তাদের চুলগুলো আটকা পড়াতে সেগুলি অনেক দেরীতে মাটিতে পড়ল।

অশ্বারোহী যোদ্ধা এক আঘাতে শত্রুকে ঘায়েল করল। প্রতিপক্ষ যখন ঘোড়ার পিঠে লুটিয়ে পড়ে ফিরে আঘাত করতে অক্ষম তখন তাকে আর আঘাত করল না। মনে মনে চাইল তার জ্ঞান ফিরে আসুক।

প্রাণের মায়া না করে বর্মধারী সৈন্যরা খাপখোলা তরোয়াল ঘোরাতে থাকলে হাতির বড় বড় দাঁতে ঘা পড়ে পড়ে আগুন ছুটল। হাতিরা ভয় পেয়ে তাদেরই শুঁড়ের জলে সে আগুন নিবিয়ে দিতে লাগল।

সে যুদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর পানভূমি মনে হলো। তীরের ফলায় কাটা নরমুণ্ড তার ফল, মাথা থেকে খসে পড়া শিরস্ত্রাণগুলো তার পানপাত্র, রক্তস্রোত তার মদ্যপ্রবাহ।

কোন মৃতদেহের একধার থেকে চিল-শকুন ছিঁড়তে আরম্ভ করল। গলিত মাংসের লোভে এক খেঁকশেয়ালী কাটা হাতখানা টেনে নিয়েও কেয়ূরের কোণায় হাত কেটে যাওয়াতে সেখানা ফেলে পালাল।

শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্ত হয়ে একজন সদ্য সদ্য স্বর্গে পেঁছিল। সুরললনাকে বাম অঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সে নীচের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরাই কবন্ধ মূর্তিকে নাচতে দেখল।

দুজনের সারথি নিহত হলে তারা নিজেরাই একজন রথী একজন সারথি হলো। আবার রথের ঘোড়া দুটো নিহত হলে তারা বহুক্ষণ

গদাযুদ্ধ করল। শেষে গদাও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেলে তারা বাহুযুদ্ধ করতে থাকল।

কোথাও দুজনে পরস্পরকে আঘাত করে একই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করল। দেবত্বলাভ করল, তবু যুদ্ধ শেষ হলো না। একজন অপ্সরাকে নিয়ে আবার দুজনে বিবাদ করতে লাগল।

অনুকূল এবং প্রতিকূল বাতাসে ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসা এবং পিছিয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউএর মত উভয় পক্ষেরই বিপুল সৈন্যব্যূহের একপক্ষের অপর পক্ষের কাছে ক্রমাগত জয় পরাজয় হচ্ছিল।

শত্রুপক্ষের হাতে নিজের সেনাদলের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও মহাশক্তিধর অজ নিজেই শত্রুসৈন্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাওয়াতে ধোঁয়া উড়ে গেলেও ঘাস পেলে আগুন তাতেই জ্বলে ওঠে।

কল্পান্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে মহাবরাহরূপে বিষ্ণু যেমন উদ্বেল মহাসমুদ্রকে রুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সেই দৃপ্ত বীর বনে আরোহণ করে তূনীর নিয়ে বর্ম আর ধনুক হাতে একাই সে রাজন্যবর্গকে প্রতিরোধ করলেন। দেখে মনে হলো তিনি যুদ্ধকালে বুঝি সুন্দর ডান হাতটিকে তূনীরের মুখেই ধরে রেখেছেন আর তাঁর একবার আকর্ণ টেনে ধরা ধনুকের গুনেই বুঝি শত্রু নিধনের বাণগুলি উৎপন্ন হচ্ছে।

তিনি তন্ন বা একরকম বাঁকানো ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে শত্রুর ছিন্ন মস্তকে মাটি ঢেকে দিলেন। প্রচণ্ড রাগে চেপে ধরা তাদের মুখের ঠোঁটগুলো আরও লাল হয়ে বসেছিল। কপালে উপরমুখী ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়েছিল এবং মুণ্ডগুলো তখনো প্রচণ্ড হুঙ্কারে সোচ্চার ছিল।

তখন সব রাজা একযোগে মিলে বেশী গজসেনাসহ গোটা চতুরঙ্গ-সেনা সাজিয়ে বর্মভেদীসহ সব অস্ত্র নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর উপর আঘাত হানল। শত্রুসমূহের অজস্র অস্ত্রবর্ষণে অজের রথের চাকা ঢাকা পড়ে গেল। শুধু তাঁর রথের ধ্বজটুকু দেখা গেল যেন কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকাল যখন সূর্যের আলো সামান্য উঁকি দেয়।

মহারাজ রঘুর পুত্র কন্দর্পকান্তি কুমার অজ সচেতনভাবে প্রিয়ংবদের

কাছে পাওয়া 'প্রস্বাপন' নামে ঘুম পাড়ানি গান্ধর্ব অস্ত্রটি রাজাদের উপর নিক্ষেপ করলেন।

তার ফলে রাজার সেনারা ধনুক ছেড়ে দিল। শিরস্ত্রাণ মাথা থেকে কাঁধের উপর হেলে পড়ল। রথের ধ্বজার খুঁটিতে দেহটি এলিয়ে দিয়ে তারা ঘুমে ঢলে পড়ল।

তারপর কুমার অজ প্রেয়সী ইচ্ছামতীর চুম্বনে ধন্য অধরোষ্ঠে শঙ্খধ্বনি করলেন। তাতে মনে হলো অদ্বিতীয় বীর বুঝি আপন বাহুবলে অর্জিত যশই পান করলেন।

পরিচিত শঙ্খধ্বনি শুনে তাঁর নিজের যোদ্ধারা ফিরে এসে ঘুমন্ত শত্রুদের মাঝে তাঁকে দেখল—যেন একরাশ মুকুলিত পদ্মের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদের প্রতিবিম্ব।

তিনি রাজাদের পতাকায় পতাকায় রক্তমাখা তীরের ফলা দিয়ে লিখলেন, এবারে রঘুকুমার তোমাদের যশ হরণ করেছেন। কিন্তু দয়া করে প্রাণনাশ করলেন না।

তিনি ধনুকের প্রান্তে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। শিরস্ত্রাণ খুলে যাওয়ায় মাথার চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। কপালে রণক্লান্তি-জনিত স্বেতবিন্দু জমে উঠেছিল। তিনি ভীতা সন্ত্রস্তা প্রিয়ার কাছে এসে বললেন,—হে বিদর্ভরাজনন্দিনী, আমি বলছি, একবার শত্রুদের দিকে চেয়ে দেখ, একটি শিশুও ওদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে, অথচ এইরকম বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য নিয়ে ওরা আমার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল।

শত্রুদের ভয়ে মনে যে বিষাদ জমেছিল তা সব দূর হয়ে গেল ইন্দুমতীর। তাঁর প্রসন্ন মুখটি নিঃশ্বাসবাষ্পযুক্ত নির্মল দর্পণের মত শোভা পেল। অত্যন্ত খুশি হয়েও তিনি প্রিয়তমকে লজ্জায় প্রশংসা করতে পারলেন না। নবীন মেঘের বর্ষণে সিক্ত ভূমি যেমন ময়ূরের কেকারবে মেঘবৃন্দকে উল্লাস জানায় তেমনি সখীদের কথায় অভিনন্দন জানালেন তাঁকে।

নির্দোষ অজ রথের চাকার মাথায় বাঁ পাটি তুলে দিয়ে নিষ্কলঙ্ক

ইন্দুমতীকে আপন করে পেলেন। তাঁর রথের চাকার ও ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় রুক্ষধূসর হয়ে উঠেছিল ইন্দুমতীর বসনের প্রান্তভাগ। মনে হচ্ছিল তিনিই বুঝি যুদ্ধের মূর্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী।

এই সংবাদ আগেই দূতমুখে পেয়েছিলেন মহারাজ রঘু। গৌরবময়ী পত্নীসহ ফিরে এলে বিজয়ী পুত্রকে অভিনন্দিত করলেন রঘু। পুত্রের হাতে সংসারের দায়িত্বভার দিয়ে তিনি শান্তিমার্গ অবলম্বন করতে আগ্রহী হলেন। বংশের ভারগ্রহণে যোগ্য সন্তান থাকলে সূর্যবংশীয়রা আর গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করেন না।

অষ্টম সর্গ

বিয়ের মঙ্গলসূত্র তখনো অজের হাতে বাঁধা ছিল। রাজা রঘু দ্বিতীয় ইন্দুমতীর মত বসুন্ধরাকেও অজের করতলগত করে দিলেন।

রাজার ছেলেরা নানা দুষ্কর্ম করেও যা লাভ করতে চায়, অজ তাকে আপনা হতে পেলেন। পিতার আজ্ঞারূপে তাকে গ্রহণ করলেন, ভোগ-লালসায় নয়।

বশিষ্ঠের আদেশে পুণ্যসলিলে সেচনে অজের সঙ্গে ধরণীও যেন অভিষিক্ত হলেন। ধরণী যেন নির্মল বাষ্পোচ্ছ্বাসে জানালেন তিনি ধন্য।

অথর্ব বেদে অধিত গুরুদেব বশিষ্ঠ সংস্কার সাধন করলে শত্রুদের পক্ষে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন অজ। কারণ ক্ষত্রতেজের সঙ্গে ব্রহ্মতেজের এই মিলন যেন বাতাস এবং অগ্নির মিলন।

নতুন রাজারা অজকে পেয়ে তারা ভাবল, রঘুই বুঝি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছেন। কারণ অজ শুধু ধনসম্পদ নয়, পিতার সকল গুণেরও অধিকারী ছিলেন।

অজ পৈতৃক সম্পদ ও প্রতিষ্ঠাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর নবীন যৌবন বিনয় দ্বারা অলংকৃত—এই দুটি কল্যাণময় মিলনে আরও শোভন হলো।

মহারাজ অজ নবোঢ়া বধূর মত সদ্যপ্রাপ্ত পৃথিবীকে এমনভাবে উপভোগ করতে লাগলেন, হঠকারিতা যেন কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করতে

না পারে।

শত শত নদী এসে পড়লেও সমুদ্র যেমন কাউকে ফেরায় না, অজও তেমনি কাউকে উপেক্ষা করতেন না। তাই প্রজাদের প্রত্যেকেই ভাবল, 'রাজা আমাকেই পছন্দ করেন।'

অজ অতিরিক্ত কঠোর বা অতিরিক্ত মৃদুস্বভাব ছিলেন না। বাতাস যেমন গাছগুলোকে ফেলে না, শুধু আনত করে তেমনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে অজও রাজাদের উৎখাত না করে বশীভূত করলেন শুধু।

প্রজাদের মাঝে পুত্রকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখে রঘু আপন আত্মজ্ঞানের প্রেরণায় শুধু নশ্বর বিষয়সমূহে নয়, স্বর্গসুখেও নিস্পৃহ হলেন।

দিলীপের বংশধরেরা সকলে পরিণত বয়সে গুণবান পুত্রের হাতে সম্পদশ্রীকে তুলে দিয়ে সংযমের সঙ্গে বল্কলধারী সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করতেন। তাঁকে বনবাসে উন্মুখ দেখে পুত্র অজ উষ্ণীষে মনোহর মাথাটি নুইয়ে পিতার চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন—আমাকে ছেড়ে যাবেন না।

পুত্রবৎসল রঘু তাঁর সজলনয়নের ঐ প্রার্থনাটি পূরণ করলেন। কিন্তু সাপের খোলসের মত পরিত্যক্ত রাজ্যশ্রীকে আর গ্রহণ করলেন না। তিনি শেষ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে সব ইন্দ্রিয়কে সংযত করে নগরের উপকণ্ঠে কুটির বাঁধলেন। পুত্রবধূর মত পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মীর আর সেবা পেলেন না।

একই রাজবংশে পুরাতন রাজা আত্মিক প্রশান্তিতে মগ্ন এবং নতুন রাজা অভ্যুদয়ে দীপ্তিমান।

অস্তমিতপ্রায় চাঁদ আর উদয়রত সূর্যকে একই সঙ্গে আকাশের সঙ্গেই সে রাজবংশের তুলনা চলে।

সন্ন্যাসীবেশে রঘু এবং রাজবেশে রঘুপুত্রকে রাজ্যের সমস্ত লোক দেখল। তাদের মনে হলো নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় এই দুই ধর্মের অংশ মূর্তিমান হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীতে।

অলব্ধ বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে অজ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে

মন্ত্রণায় বসলেন আর মুক্তিজ্ঞানের জন্য রঘু তত্ত্বদর্শী যোগীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তরুণ রাজা প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিচারাসনে বসলেন আর প্রবীণ রাজা নির্জনে পবিত্র কুশাসন গ্রহণ করে ধ্যানে বসলেন।

প্রভুশক্তি অর্থাৎ কোশ, দণ্ড এবং সেনাবলের দ্বারা একজন পার্শ্ববর্তী শত্রুরাজাদের বশে আনলেন আর অন্যজন যোগাভ্যাসবলে শরীরস্থ পাঁচটি বায়ুকে অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানকে নিয়ন্ত্রণ করলেন।

নতুন রাজা পৃথিবীতে শত্রুদের সব উদ্যোগকে দমন করতে সচেষ্ট হলেন আর অন্যজন জ্ঞানাগ্নিতে সব কর্মফল পুড়িয়ে ফেলতে সক্রিয় হলেন।

পরিণামের কথা জেনেশুনে অজ সন্ধি থেকে ছয়টি গুণ অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই ছয়টি বৈদেশিক নীতিকে প্রয়োগ করলেন আর রঘু টাকা মাটি, মাটি টাকা অর্থাৎ শাণ আর সোনা এক এই নীতি মেনে নিয়ে তিনটি গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে প্রকৃতিস্থ রেখে জয় করলেন।

কর্মনিষ্ঠ নবীন রাজা কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠানে বিরত হলেন না আর প্রবীণ স্থিতধী রাজা পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত যোগাসন ত্যাগ করলেন না।

এইভাবে তাঁরা দুজনে শত্রুর প্রচার দমনে এবং ইন্দ্রিয়ভোগসংযমে সদা সচেতন রইলেন। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সে আগ্রহী হয়ে তাঁরা দুজনে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করলেন।

সর্বভূতে সমদর্শী রঘু অজের মুখ চেয়ে এইভাবে কয়েকটি বছর কাটালেন। তারপর যোগসমাধিতে মোহরূপ অন্ধকারের অতীত অবিনাশী পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলেন।

পিতার দেহত্যাগের কথা শুনে রঘুপুত্র অজ দীর্ঘক্ষণ অশ্রুপাত করলেন। তারপর আহিতাগ্নি অজ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পিতার অগ্নি-সংস্কার না করে মৃতদেহটি মাটিতে প্রোথিত করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সম্পন্ন করলেন।

পিতার প্রতি ভালবাসাবশতই তিনি পিতৃকার্যের বিধান মেনে তাঁর পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেছিলেন। কারণ ঐভাবে যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁরা মৃত্যুর পর পুত্রের পিন্ডদানের আকাঙ্ক্ষা করেন না।

যে পিতা পরমা মুক্তি লাভ করেছেন তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয় বুঝে তিনি তত্ত্ববিদদের উপদেশ অনুসারে সব মনোদুঃখ দূর করলেন। অন্যদিকে ধনুকে শরাসন সর্বদা প্রস্তুত রেখে তিনি জগতে প্রতিপক্ষের শাসন নির্মূল করলেন। অর্থাৎ নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

অনন্য পৌরুষদীপ্ত অজকে পতিরূপে পেয়ে বহুরত্ন প্রসব করল পৃথিবী এবং একটি বীরপুত্রের জন্ম দিলেন কান্তা ইন্দুমতী।

হাজার আলোর মত উজ্জ্বল সেই পুত্রের নামযশ দশদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সে দশানন রাবণের ঘাতক রামচন্দ্রের জনক হবে— তাই পণ্ডিতেরা তাঁর নাম রাখলেন দশরথ।

এইভাবে রাজা অজ বিদ্যাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও পুত্রজন্মের মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ শোধ করলেন। পরিবেশযুক্ত প্রখর সূর্যের মত ছিল তাঁর দীপ্তি।

তাঁর শক্তি বিপন্নদের ভয় দূর করত, তাঁর অগাধ বিদ্যা বিদ্বজ্জনদের সংবর্ধনা করত। শুধু ধনসম্পদ নয়, তাঁর গুণাবলীও ছিল অন্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

একদিন সুকুমার পুত্রের জনক, সুপ্রজাপালক রাজা অজ নন্দনকাননে শচীদেবীর সঙ্গে বিহাররত ইন্দ্রের মত রাণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নগরের উপবনে বিহার করছিলেন।

তখন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গোকর্ণস্থিত মন্দিরে মহাদেবকে বীণা-যোগে গান শোনাবার জন্য নারদমুনি আকাশপথে যাচ্ছিলেন সূর্যের দক্ষিণায়ণের পথ ধরে। তাঁর বীণার মাথায় জড়ানো ছিল দিব্যপুষ্পে গাঁথা একটি মালা। তার সৌরভে মুগ্ধ হয়েই যেন উতাল হাওয়া সেই মালাটিকে উড়িয়ে নিল। ফুলের গন্ধে মুনির বীণাটিতে ভ্রমরের দল

যেন সে বাতাসের অপমানে কাজলমিশ্রিত চোখের জল ফেলছে।

মকরন্দের গন্ধভরে মর্ত্যের তরুলতাদের বসন্তশোভাকেও হার মানিয়ে উড়তে উড়তে সেই মালাটি রাজার প্রেয়সী স্ত্রী ইন্দুমতীর স্তনাগ্রভাগে এসে পড়ল। ভরা বুকের মাঝখানে মুহূর্তের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া প্রিয় সখীর মত হঠাৎ এসে পড়া মালাটিকে দেখে রাজবধূ ইন্দুমতী রাহুগ্রস্ত চাঁদের জ্যোৎস্নার মত মূর্ছায় অবশ হয়ে চোখ বুজলেন।

হতচেতন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময়ে স্বামীকে ধরায় তিনিও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁদের দুজনকে ঘিরে অনুচরেরা তুমুল আর্তনাদ করতে থাকে। তাদের সে আর্তনাদে পদ্মঝিলের পাখিরাও সমব্যথীর মত কেঁদে ওঠে।

জল ও বাতাসে রাজার মূর্ছা কেটে গেলেও রাণী কিন্তু তেমনি হতচেতন হয়ে পড়ে রইলেন। কোন চিকিৎসা ও সেবায় ফল হলো না। কারণ আয়ু অবশিষ্ট থাকলেই তবে চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায়।

তখন প্রিয়াবল্লভ রাজা সুন্দরীর নিষ্প্রাণ দেহটিকে ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত করে জড়িয়ে ধরে পরিচিত ভঙ্গিতে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর সেই হতচেতন বিবর্ণ দেহটিকে কোলে নিলে স্বামী অজকে দেখে মনে হলো যেন মৃগাঙ্ক-অঙ্কিত ভোরের নিষ্প্রভ চাঁদ।

তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন। স্বাভাবিক ধৈর্য পর্যন্ত হারিয়ে গেল। অতিরিক্ত দহনে লোহাও গলে যায়, মানুষের ত কথাই নেই।

তিনি বললেন, হায়, শরীরে ফুলের ছোঁয়াতেও যদি প্রাণ যায়, তবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতের আর কিই বা বাকি থাকে? অথবা যমরাজ কোমল বস্তুকে কোমল অস্ত্র দিয়েই আঘাত করতে উদ্যত হন। এ বিষয়ে তুষারপাতে পদ্মিনীর বিনাশই মনে হয় প্রথম দৃষ্টান্ত।

ফুলের মালা যদি প্রাণনাশিনী হয় তবে আমার বুকে রাখলে তা আমাকে সংহার করছে না কেন? তবে কি ঈশ্বরের ইচ্ছামত বিষও কখনো অমৃত হয়, আবার অমৃতও কখনো বিষ হয়ে ওঠে।

অথবা আমারই এই ভাগ্য বিপর্যয়, তাই বিধি বিনামেঘে এই বজ্রাঘাত

করলেন। সেই বজ্র গাছ উপড়ে ফেলেনি তাকে জড়িয়ে থাকা লতাটিকে মুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে।

যে তুমি অপরাধ করলেও কখনো মুখ ফিরিয়ে নাওনি, আমাকে অনাদর করনি, সেই তুমি আজ বিনা দোষে আমাকে ডেকে একটা কথাও বলবে না?

শুচিস্মিতে, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি শঠ ও কপটপ্রেমিক ভেবেছ। তাই কি আমাকে কিছু না বলে চিরকালের মত পরলোকে চলে গেলে?

আমার এ পোড়া প্রাণ ত প্রেয়সীর সঙ্গই নিয়েছিল, তারই অনুগমন করছিল। তবে আবার ফিরে এল কেন? এখন সে নিজের কর্মফলের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করুক।

তোমার মুখে রতিশ্রমে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম এখনো শুকোয়নি, অথচ তুমি আর নেই। মানুষের জীবনের এই শূন্যতাকে ধিক।

আমি ত মনে মনেও কখনো তোমার অপ্রিয় কিছু করিনি, তবু আমাকে ত্যাগ করছ কেন? সত্যি বলছি আমি শুধু নামে মহীপতি, আমার অকৃত্রিম প্রেম ত শুধু তোমাতেই নিবদ্ধ।

হে করভোরু, তোমার ফুলজড়ানো ঢেউ খেলানো অলকাবলী বাতাসে উড়ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি ফিরে এলে। সত্যি সত্যি জেগে উঠে আমার সব দুঃখ দূর করে দাও প্রিয়ে। রাত্রিতে ওষধিরা জ্বলজ্বল করে হিমালয়ের গুহার অন্ধকারকে দূর করে দেয়।

তোমার কেশপাশ আলুলায়িত, মুখ হতবাক। রাতের ভ্রমরগুঞ্জন-শূন্য নত হয়ে পড়া একক পদ্মফুলের মত এ মুখ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

রজনী আবার চাঁদের কাছে আসবে। প্রেমিকা চক্রবাকী তার প্রেমিক চক্রবাকের কাছে থাকে। তাই তারা বিরহের বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। কিন্তু তুমি চিরকালের মত চলে গিয়ে আমাকে কি দগ্ধ করে মারছ না?

কচি পাতার আস্তরণে শুয়েও ত তোমার ননীর মত শরীরে কষ্ট হত। তাহলে বল, এখন চিতার অগ্নিশয্যা কেমন করে সইবে?

তোমার নির্জন আসঙ্গের প্রথম সহচরী এই মেখলা তোমার চলা

স্তব্ধ হওয়াতে নীরব হয়ে আছে। শোকে ও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকা তোমাকেই অনুসরণ করছে।

কোকিলবধূর কলকাকলিতে ধ্বনিত তোমার কণ্ঠস্বর, মদালসাগতি কলহংসীদের চলায় তোমার গতিভঙ্গি, তোমার প্রাণচঞ্চল দৃষ্টিতে আছে হরিণের চাউনিতে বাতাসে কম্পিত লতায় লতায় তোমার বিলাস সুষমা। স্বর্গসুখের আগ্রহ সত্ত্বেও তুমি ঐ গুণগুলিতে আমার কথা ভেবে রেখে গেছ ঠিক। কিন্তু তোমার বিরহে আমার ব্যথাতুর হৃদয়কে ধরে রাখতে পারছি না কিছুতেই।

তুমি সহকারতরু আর প্রিয়ঙ্গুলতার জোড় বেঁধে দিয়েছ। তাদের বিয়ের পালা না চুকিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে যাচ্ছ—এ ত ঠিক নয়।

তোমার পদাঘাতে দোহদপূরণেই ফুলে ভরে উঠেছে অশোকতরু। তোমার অলকাভরণের সেই ফুল কেমন করে চিতার মালায় গাঁথব?

ননীর পুত্তলি আমার, তোমার মুখরিত রুণুঝুনু নূপুর বাঁধা দুর্লভ পদাঘাত স্মরণ করেই বুঝি তোমার শোকে ঐ অশোকতরু কুসুমাশ্রু বর্ষণ করছে।

হে কিন্নরকণ্ঠী, ঘুমিয়ে পড়লে কেন? আমার সঙ্গে বসে তোমার নিঃশ্বাসের মত সুরভিমাখা বকুলফুলের মেখলাটি অর্ধেক গাঁথা হয়েছে, এখনো শেষ হয়নি।

সখীরা তোমার সুখে দুঃখে সমব্যথী, প্রতিপদের চাঁদের মত তোমার পুত্র, আমি একমাত্র তোমাতে অনুরক্ত। তবুও তোমার এই উদ্যোগ সত্যি বড় নিষ্ঠুর। আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে, প্রেম সম্ভোগ ঘুচেছে, গান থেমেছে, বসন্ত উৎসবশূন্য, অলঙ্কারের প্রয়োজন মিটেছে। আজ আমার শয্যা একেবারে শূন্য।

তুমি আমার ঘরণী, পরামর্শের সচিব, প্রেমের বঁধু ললিতকলায় আদরের শিষ্যা-নিষ্করুণ বিধি তোমাকে কেড়ে নিয়ে আমার সর্বস্ব হরণ করল।

মদিরাক্ষী, তুমি আমার মুখের ছোঁয়া সুরভি-মদিরা পান করেছ, আজ পরলোকে আমার অশ্রুমলিন জলাঞ্জলি কি করে পান করবে?

হাজার ঐশ্বর্য থাক, তোমাকে হারিয়ে অজের সব সুখ এখানেই শেষ হলো। কোন লোভনীয় বিষয় আমাকে আর আকর্ষণ করতে পারে না, আমার সব আনন্দ তোমাকে ঘিরেই ছিল।

কোশলাধিপতি অজ প্রিয়াকে নিয়ে এইরকম করুণ বিলাপ করে করে তরুলতাদেরও দ্রবীভূত শাখাশ্রুত রসের অশ্রুবর্ষণ করালেন। তারপর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর কোল থেকে কোনমতে সুন্দরীকে সরিয়ে নিয়ে শেষ সাজে সাজিয়ে অগুরু চন্দন কাঠের আগুনে তাঁকে বিসর্জন দিলেন।

রাজা অজ বিদ্বান, তাই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে গেছেন এই অপবাদের আশঙ্কায় অগ্নিতে দেহ উৎসর্গ করলেন না, প্রাণের মায়াতে নয়।

দশদিন পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে নগরের উপবনে গুণবতী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তারপর তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন। ইন্দুমতী নেই, যেন শেষ রাতের নিষ্প্রভ চাঁদ। তাঁরই শোকের প্রবাহ দেখতে পেলেন পুরনারীদের মুখের অশ্রুধারায়।

ইতিমধ্যে কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে যজ্ঞের জন্য দীক্ষা নিয়ে ধ্যানযোগে জানতে পারলেন রাজা শোকে বিমূঢ়। এক শিষ্যের মাধ্যমে বলে পাঠালেন, গুরুদেবের যজ্ঞ শেষ হয়নি। তাই আপনার শোক-সন্তাপের কথা জানতে পেরেও নিজে আপনার কাছে এসে বিচলিত আপনাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

হে সদাচার, তাঁর সংক্ষিপ্ত উপদেশবাণী নিয়ে আমি এসেছি। আপনার ধৈর্য ভুবনবিদিত। আপনি সেকথাটি শুনুন এবং হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুন।

অনাদি পুরুষের সকল পাদবিক্ষেপের অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকের ত্রিকালদর্শী সেই মুনি অপ্রতিহত জ্ঞাননেত্রে সব কিছুই দেখতে পান।

বহুকাল আগে তৃণবিন্দু নামে এক ঋষি অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করতে থাকলে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র হরিণী নামে এক

সুরসুন্দরীকে সেই ঋষির কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সুন্দরীর প্রশান্তিনাশক প্রলয়ংকরী লাস্যতরঙ্গে ঋষির তপোভঙ্গ হলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরই সামনে বিলাসচঞ্চল রমণীয়া সুরসুন্দরীকে দেখে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্যের মানুষী হও।

সুন্দরী তখন 'প্রভু, আমি পরাধীন, আমার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করুন' এই বলে অনুনয় করলে ঋষি বলেন তিনি মর্ত্যে গিয়ে যতদিন না দিব্য পুষ্প দেখেন ততদিন মর্ত্যজন্ম তাঁকে ভোগ করতে হবে।

সেই সুরসুন্দরী হরিণীই পরে বিদর্ভের রাজকুমারী হয়ে জন্ম নেন। বহুদিন তোমার মহিষীরূপে ছিলেন। পরে একদিন শাপমুক্তির উপকরণ স্বর্গচ্যুত ফুলমালাটি দেখে তিনি শেষবারের মত চোখ বন্ধ করে মরদেহ ত্যাগ করেন।

সুতরাং তাঁর মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করবেন না। মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই বসুন্ধরাকে আপনি পালন করুন। বসুমতীই রাজাদের প্রকৃত পত্নী। অভ্যুদয়ের সময়ে গর্বশূন্যতা দেখিয়ে আপনি আত্মবিশ্বাস ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। আজ মানসিক সন্তাপের মধ্যেও আপনি আবার আত্মবীর্য প্রকাশ করুন।

তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন করে বা সহমরণে গিয়ে তাঁকে কোথাও পাবেন কি? কারণ আপন আপন কর্মফল অনুসারে লোকান্তরস্থিত মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গতি হয়। সুতরাং শোক কাটিয়ে উঠে পিণ্ডজল দান করে পত্নীকে তর্পণ করুন। কথিত আছে, প্রিয়জনের অবিচ্ছিন্ন অশ্রুপাতে প্রেতের কষ্ট হয়।

জ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষের মৃত্যুই স্বাভাবিক, জীবনটাই মায়া। প্রাণীরা যে একমুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে তাই তার যথেষ্ট। যারা মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন তারাই প্রিয়জনের মৃত্যুকে বুকে বিদ্ধ শেল মনে করে, কিন্তু আত্মস্থ ব্যক্তি তাতে কল্যাণের পথে শল্যোদ্ধারই বলে মনে করেন।

নিজের দেহ ও আত্মার সংযোগ এবং বিভাগের কথা ত শ্রুতিতে বলা হয়েছে। তাহলে বলুন, বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি শোক

করতেন কেন ?

আপনি সংযমীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষের মত শোকের বশবর্তী হওয়া আপনার উচিত নয়। বৃক্ষ ও পর্বতের মধ্যে কি তফাৎ থাকবে যদি দুজনেই ঝড়ে ভেঙ্গে যায়।

এই সব কথা শুনে রাজা 'আচ্ছা' বলে উদারমতি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করে মুনিকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সে উপদেশ তাঁর শোকাতুর হৃদয়ে স্থান পেল না, হয়ত আবার তা গুরুর কাছেই ফিরে গেল।

সত্যপ্রিয় এবং প্রিয়ভাষী অজ নাবালক পুত্রের মুখ চেয়ে প্রিয়ার প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি অর্থাৎ সাদৃশ্য আছে এমন কোন বস্তুকে দেখে দেখে এবং স্বপ্নে ক্ষণিক মিলনের আনন্দ নিয়েই কোনমতে আটটি বছর কাটিয়ে দিলেন।

অশ্বত্থের অঙ্কুর যেমন প্রাসাদপৃষ্ঠে ফাটল ধরায় তেমনি সেই শোকের শেল তিলে তিলে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যু তাঁর অনিবার্য হয়ে উঠল। মৃত্যুতে সত্বর প্রেয়সীর অনুগমন করতে পারার আশায় চিকিৎসকের অসাধ্য এই রোগযন্ত্রণাকে পরম লাভ মনে করলেন।

সুশিক্ষিত কবচধারী পুত্রকে প্রজাপালনের জন্য যথাবিধি নিযুক্ত করে রোগাক্লিষ্ট দুঃখজর্জরিত শরীরটি থেকে মুক্তিকামনায় রাজা আমৃত্যু অনশনের ব্রত নিলেন। পরে জাহ্নবী এবং সরযূর স্রোতোধারার সঙ্গমতীর্থে দেহত্যাগ করে তিনি আপন কর্মফল অনুসারে দেবত্ব লাভ করলেন। আগের থেকে অনেক কমনীয় শরীর নিয়ে তিনি প্রিয়ার সঙ্গে নন্দনকাননের কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করতে লাগলেন।

নবম সর্গ

পিতার মৃত্যুর পর সংযমীগণের ও রাজন্যবর্গের অগ্রগণ্য মহারথ অর্থাৎ শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দশরথ উত্তরকোশল রাজ্য অধিকার করে নিপুণভাবে শাসন করছিলেন।

নগরজনসহ প্রজাপুঞ্জকে কুলক্রমাগত যথানিয়মে পালন করাতে তাঁর

গুণবত্তা কার্তিকেয়ের বীর্যবত্তাকেও ছাড়িয়ে গেল।

মনীষীরা বলতেন বলনিহন্তা ইন্দ্র এবং মনুর রাজবংশে জাত অর্থপতি দশরথ যথাকালে জল ও ধনের বর্ষণদানে কর্মনিষ্ঠ মানুষের শ্রম অপনয়ন করেন।

দিব্যতেজসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় রাজা দশরথের শাসনে দেশে ব্যাধির আক্রমণ ছিল না, শত্রুর কাছে পরাজয়ও ছিল না। ধন-ধানে পুষ্পেভরা পৃথিবী হয়ে উঠেছিল সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ।

দশ দিগন্ত জয় করা রঘুর রাজত্বকালে ও তাঁর পদে অজের শাসন-কালে পৃথিবীর যে শ্রী হয়েছিল, দশরথ তাঁদের থেকে গুণে বা বীর্যে কোন অংশে কম ছিলেন না, তাই এমন রাজাকে পেয়ে পৃথিবীর শ্রী ও শোভা তেমনিই রইল।

সকলের প্রতি সমদৃষ্টি দিয়ে ধনবৃষ্টি দান এবং দুষ্টের শাসন করে রাজা দশরথ কুবের, যম এবং বরুণকে অনুকরণ করেছিলেন এবং তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন অরুণসারথি সূর্যের মত।

মৃগয়ার আকর্ষণ, পাশাখেলা, জ্যোৎস্নারাতে মদিরাপান অর্থাৎ চন্দ্র-কিরণের সুধা পান, নবযৌবনা অঙ্গনা—এই সব কোন কিছুই তাঁর কোন উদ্যোগের যত্নকে ব্যাহত করতে পারত না।

প্রভাবশালী বাসবে বা ইন্দ্রের উপস্থিতিতেও তিনি কখনো কোন দীনহীন বাক্য উচ্চারণ করতেন না, কোন হীনতা প্রকাশ করতেন না। হাস্য পরিহাসকালেও তিনি মিথ্যা বলতেন না, রোগশূন্য রাজা অজ শত্রুদেরও কখনো নিষ্ঠুর কথা বলতেন না।

রঘুবংশীয় নায়কের হাতে পৃথিবীর রাজারা সমৃদ্ধি এবং বিনাশ লাভ করলেন। কারণ তাঁর নির্দেশ যে সব রাজারা অমান্য করতেন না, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন বন্ধু, কিন্তু প্রতিস্পর্ধীদের পক্ষে তিনি ছিলেন ইস্পাতের মত কঠিনহৃদয়।

একক রথযোদ্ধারূপেই তিনি শরসংযোগে সমুদ্রমেখলা ধরণীকে জয় করেছিলেন। তাঁর গজবাহিনী এবং অতি বেগশালী অশ্ববাহিনীযুক্ত সেনাগণ শুধু বিজয় ঘোষণাই করত। রথযুক্ত অর্থাৎ রথস্থিত ব্যক্তিকে

অদৃশ্য করে রাখে এমন বস্তুযুক্ত একটিমাত্র রথে ধনুর্ধারণ করে তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন। সমুদ্রেরা গম্ভীর নির্ঘোষে তাঁর বিজয় ঘোষণার দুন্দুভি হয়েছিল। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল কুবেরতুল্য।

ইন্দ্র শতমুখী বজ্র দিয়ে পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করেছিলেন। প্রফুল্ল শতদলের মত মুখ নিয়ে তিনি সশব্দে ধনুঃ আকর্ষণ করে প্রচণ্ড শরবর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষের শক্তিকে নাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অপ্রতিহত পৌরুষে দীপ্ত।

ইন্দ্রকে যেমন সব দেবতারা প্রণাম করতেন তেমনি মুকুটের মণিরত্নের প্রভায় তাঁর পায়ের নখে রং ছড়িয়ে শত শত রাজারা তাঁকে প্রণাম করতেন।

যে সব রাজারা অমাত্যদের সঙ্গে তাদের পত্নী ও শিশুপুত্রদের অঞ্জলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছিল, অলকে অলঙ্করণশূন্য সেই সব পত্নী ও শিশুপুত্রদের অনুকম্পা করে মহাসমুদ্রের বেলাভূমি থেকে অলকাসদৃশ অযোধ্যা নগরীতে ফিরে এলেন।

একাধারে অগ্নি ও সোমের দীপ্তিমান হয়ে তিনি রাজমণ্ডলের মধ্যে একাধিপত্য লাভ করেও লক্ষ্মী নিমেষচঞ্চলা জেনে সদাজাগরূক রইলেন।

সকল দিক থেকে বাহুবলে নানা রত্ন আহরণ করে এনে মুকুট খুলে বহু যাগযজ্ঞ করেছিলেন। তিনি তমোগুণযুক্ত হয়ে সোনার যূপকাষ্ঠ স্থাপন করে তমসা ও সরযূ নদীর তীরগুলিকে শোভাময় করে তুলেছিলেন।

অজিন, দণ্ড, কুশমেখলা ও মৃগশৃঙ্গ ধারণ করে মৌনব্রত অবলম্বন করে তিনি যখন যজ্ঞের দীক্ষা নিতেন তখন মনে হত স্বয়ং মহাদেবই অতুল প্রভায় দীপ্তি পাচ্ছেন তাঁর শরীরে। যজ্ঞের অবভৃথ স্নান শেষে জিতেন্দ্রিয় দশরথ দেবসভাতেও প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র জলবর্ষণকারী নমুচিসূদন ইন্দ্রের কাছেই তিনি তাঁর উন্নত শির আনত করে প্রণাম করতেন।

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী প্রার্থীদের প্রতি উদার ককুৎস্থকুলের বংশধর দশরথকে এবং স্বয়ম্ভু পরমপুরুষ বিষ্ণুকে ছেড়ে অন্য কোন নৃপতিকে

আশ্রয় করেননি। অসুরযুদ্ধে মহারথ রণাঙ্গনে ইন্দ্রের সহায়তা লাভ করে শরবর্ষণে সুরবধূদের ভয় দূর করেছিলেন এবং তাঁদের মুখে তাঁর নিজের বাহুবলের যশোগান করিয়েছিলেন।

তিনি বারবার ইন্দ্রের সামনে থেকে ধনুর্যোজনা করলেন। মহা পরাক্রমে অদ্বিতীয় রথীরূপে অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধে। সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলা যুদ্ধের ধূলিরাশির ঘূর্ণিকে অসুররক্তে নিবারিত করলেন।

পার্বত্য নদীরা যেমন সমুদ্রে এসে মিলিত হয় তেমনি মগধ, কোশল এবং কেকয় দেশের রাজাদের পতিব্রতা কন্যারা শত্রুর পক্ষে শরযোজনা-কারী রাজা দশরথকে পতিরূপে বরণ করলেন। শত্রুনিধনে নিপুণ রাজা তিন প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শোভা পেলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাবর্গকে শিক্ষাদান করার জন্য তিন শক্তি নিয়ে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়েছেন।

তারপর বসন্ত সমাগমে বনকুসুমসম্ভারে মনে হলো সে বুঝি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্রের সমকক্ষ পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় রাজা দশরথকে সেবা করতে এসেছে।

সূর্য সারথিকে দিয়ে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরায়ণে যেতে চাইলেন। হিমনির্মোক বা হিমের খোলস সরিয়ে প্রভাতবেলাকে উজ্জ্বল করতে করতে তিনি মলয়পর্বত ত্যাগ করলেন। তখন ফুল ফুটল। কচি পাতায় ভরে গেল গাছগুলি। তারপর ভ্রমর ও কোকিলের কলকুজন শুরু হলো। এইভাবে পাদপসমাকীর্ণ বনস্থলীতে যথানিয়মে অবতরণ করে বসন্ত আবির্ভূত হলো।

হিমমুক্ত বসন্তশ্রী কিংশুকের কোরক থরে থরে সাজাল, যেন মদাবেশে মুক্তলজ্জা প্রণয়িণী কামিনীর নখাঘাতের অলঙ্করণ হলো। শীতে কামিনীদের অধরোষ্ঠে প্রেমিকের স্পর্শশীতল দন্তাঘাত বেদনা-দায়ক। তাই তারা নিতম্বের মেখলা খুলে ফেলেছিল। সূর্য হিমের প্রকোপ এই নির্মূল করতে পারলেন না একেবারে, শুধু অনেকটা কমিয়ে দিলেন।

মলয়সমীরে কোরকশোভিতা সহকারলতা পল্লব কাঁপিয়ে যেন নৃত্যাভিনয় অভ্যাস করছে। এইভাবে দুলে দুলে রাগদ্বেষশূন্য নিরাসক্ত মানুষের মনও মাতিয়ে তুলল।

রাজার নীতিযুক্ত ও সজ্জন মানুষের উপকারে উৎসর্গীকৃত সম্পদের দিকে প্রার্থীরা যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনি বসন্তের সরোবরে প্রফুল্ল পদ্মিনীকে ঘিরে ভ্রমর ও জলচর পাখিরা এসে জড়ো হলো।

বসন্তে অশোকতরুর নবকুসুমবিকাশই যে কামোদ্দীপক হলো তা নয়। প্রেয়সীদের কানে পরা পল্লবদলও বিলাসীদেরকে প্রেমে মত্ত করে তুলল।

বসন্ত যেন কুরবক ফুলের রাশি দিয়ে উপবনলক্ষ্মীর পত্রভঙ্গ রচনা করে নিয়েছে। তাই ফুলের মধু পান করার জন্য ভ্রমর এসে গুঞ্জন করতে লাগল। সুন্দরীদের মুখের মদিরাসিঞ্চনে তারই গন্ধে ভরা বকুল ফুল ফুটল। মধুলোভী মকরন্দদের ঝাঁকে ঝাঁকে টেনে এনে আকুল হলো বকুলবীথি।

মুগ্ধা নববধূর অস্ফুট আলাপের মত সুরভিমাখা কুসুমিত বনমালাতে কোকিলবধূর প্রথম অনুচ্চ কূজন শোনা যাচ্ছিল। উপবনের লতায় লতায় ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জনগীতি, কুসুমের কোমল দন্তরুচি, বাতাসে পল্লবের কম্পন। লতারা যেন হাতের ললিতমুদ্রাসহ নর্তকীর মত নৃত্যাভিনয়ে রত হয়ে উঠল।

প্রেমিকের অঙ্গে অখণ্ড অনুরাগে বিভোর হয়ে কামিনীরা ললিত বিলাসের সহযোগী মদিরা পান করল। তা ছিল রতির উদ্দীপক এবং সুগন্ধে বকুলকেও হার মানায়।

প্রফুল্ল পদ্ম আর বিহঙ্গকুলের মত্ত কলরবে পূর্ণ গৃহজীবিকাগুলি শোভা পাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন সুন্দরী রমণী মুখে মধুর হাসি আর শিথিল মেখলার রুনুঝুনু শিঞ্জিনীতে শোভমানা হয়ে উঠেছে।

বসন্তে চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুর মুখশ্রী নিয়ে রাত্রিবধূ প্রিয়সমাগমে বঞ্চিতা নায়িকার মত ক্ষীণ হতে লাগল।

হিমের আবরণ সরে যাওয়ায় নির্মল চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণমালা প্রেমিকদের রতিশ্রম দূর করল। মীনকেতনের পুষ্পধনুকেও তীক্ষ্ণ করে তুলল আরও অর্থাৎ নরনারীর কামতৃষ্ণা উজ্জীবিত হলো।

জ্বলজ্বলে আগুন রঙের হলুদ কর্ণিকার কুসুম বনলক্ষ্মীর কনক আভরণ। প্রেমিকের দেওয়া পরাগমাখা কোমল পাপড়িবিশিষ্ট সে ফুলগুলিকে যুবতীরা তাদের চূর্ণকুন্তলে পরে নিল। কাজলের টিপের মত সুন্দর ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে উড়ে বসায় তিলকতরু সুন্দরীর তিলকভূষণের মতই বনস্থলীর শোভা আরও বেড়ে গেল।

নিজের মুখের অল্পগন্ধে ও স্মিতহাসিতে নায়কের মন ভুলিয়ে দেওয়া নায়িকার মত গাছকে জড়িয়ে দুলতে থাকা নবমল্লিকা তার মদির গন্ধে এবং কাঁচ কিশলয়রূপ অধরে ফুলের হাসিতে মন মাতিয়ে দিচ্ছিল।

বালসূর্যের রক্তিমাকে হার মানালো রাঙা পোশাকে, কানের যবাঙ্কুরের ভূষণে, কোকিলবধূর কলকূজনে সজ্জিত ও মুখরিত কামসেনাদের প্রভাবে বিলাসী ব্যক্তিরা একমাত্র ললনারসে বিভোর হয়ে উঠল।

শ্বেতপরাগে ভরা তিলকমঞ্জরীতে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি ঘন হয়ে বসেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন নারীর অলকে মুক্তাজালের শোভা। উপবনের পুষ্পধনু মঙ্গলের ধ্বজার মত এবং বসন্তলক্ষ্মীর প্রসাধনের মুখচূর্ণের মত ফুলের পরাগরেণু উড়ছিল। ভ্রমরশ্রেণী তাকে অনুসরণ করছিল।

কামিনীরা দোলারোহণে পটু হলেও বসন্তোৎসবে অভিনব দোলায় দুলবার সময় প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করতে তাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল, তাই আসনরজ্জু গ্রহণকালে কামিনীদের বাহুলতা যেন গলে জল হয়ে গেল।

মানিনী, মান রাখ, আর ঝগড়া নয়; নবযৌবন একবার গেলে আর ফিরে আসে না—কোকিলবধূরা যেন কামদেবের এই উপদেশই কূজনে কূজনে নিবেদন করল। তাতে নববধূরাও নতুন করে প্রেমের খেলায় মেতে উঠল।

মধুরিপু, মধুমাস এবং মন্মথের মত বিলাসিনীপ্রিয় রাজা এইভাবে যথাসুখে বসন্তোৎসব উপভোগ করে মৃগয়াবিহারের অভিলাষ করলেন। মৃগয়া চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করার অভ্যাস এনে দেয়, ভীত ও ক্রুদ্ধ পশুর হাবভাব ও গতিবিধি শিখিয়ে দেয়, পরিশ্রমের মাধ্যমে শরীরকে সুঠাম রাখে। সুতরাং অমাত্যদের অনুমোদন নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন।

মৃগয়াবনের উপযুক্ত বেশ ধারণ করে চওড়া কাঁধের উপর শরাসন স্থাপন করে সূর্যতেজা রাজা ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় আকাশ যেন ঢেকে ফেললেন। তাঁর মাথায় বনমালা, গাছের পাতার রঙের বর্ণে শরীর ঢাকা, ঘোড়ার দ্রুত বেগে কানের কুণ্ডল চঞ্চল। তিনি সরু মৃগের দিকে নজর দিলেন।

কোমল লতাসমূহের শরীর নিয়ে ভ্রমরশ্রেণীর চোখ দিয়ে বনদেবতারা পথে তাঁকে দেখলেন। তাঁর চোখ দুটি সুন্দর, তিনি কোশলবাসীকে ন্যায়ধর্মে স্বস্তি দান করেছিলেন।

তিনি বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে কুকুরসেনা ও জাল নিয়ে শিকারীরা আগেই উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে দাবানল নেই, ডাকাতের ভয়ও নেই। সেখানে আছে ঘোড়া বাঁধার মত মাটি, জলেভরা পুকুর আর বনভরা হরিণ, আছে পাখি আর নীল গাই।

তারপর ভাদ্রমাস যেমন সোনার মত বিদ্যুতের গুন দেওয়া ইন্দ্রধনু ধারণ করে, নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথও তেমনি করে ভয় ভাবনা ছেড়ে ধনুকে শরাসন করলেন। ধনুকের টানে সিংহ ক্রোধে গর্জন করে উঠল।

তাঁর সামনে একদল হরিণ দেখা দিল। স্তন্যপায়ী মৃগশিশুরা তাদের মা হরিণীদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। তাদের মুখে তখনো ছিল কুশাঘাসের ডেলা। তাদের আগে আগে আসছিল একটি কৃষ্ণসার মৃগ।

জোড়কদম ঘোড়ায় চড়ে রাজা তূণীরের মুখ থেকে বাণ নিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন। তারা দল ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারা ভয়ার্ত সজল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, যেন নীলপদ্মের রাশি বাতাসে কেঁপে কেঁপে বনে অন্ধকার নিয়ে এল।

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম নিয়ে রাজা একটি হরিণকে লক্ষ্য স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে তার সহচরী এসে নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তাই দেখে ধনুর্ধর আকর্ণ গুণ টেনেও মমতাবশতঃ কৃপাকোমল প্রাণে বাণ প্রতিসংহার করলেন।

শরবর্ষণ করার জন্য তাঁর দৃঢ় মুষ্টি আকর্ণ প্রসারিত হয়েও আপনিই শিথিল হয়ে গেল। তাদের টানা টানা ত্রাসচঞ্চল চাহনিতে তাঁর মনে পড়ছিল প্রাণচঞ্চল প্রেয়সীদের কটাক্ষ-বিলাস।

পুকুরের পাঁক থেকে উঠে মুখ থেকে খসে পড়া ঘাসের গ্রাস পথে ছড়াতে ছড়াতে ছুটে গেছে শুয়োরের পাল। তাদের ভিজে পায়ের টানা দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি সেই পথ ধরলেন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তিনি তাদের বাণবিদ্ধ করলেন। তারাও কেশর ঝাঁকিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে এগোল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল না—মুহূর্তের মধ্যেই পেটের কাছে তীর লেগে তারা গাছের সঙ্গে বিঁধে গেছে।

একটা বুনো মোষ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল তাঁর উপর। তিনি তাঁর চোখের মধ্যে একটা তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটা তার শরীর বিদ্ধ করল। কিন্তু তাতে রক্ত পড়ল না একটুও। মোষটা প্রথমে ধরাশায়ী হলো, পরে তীরটা মাটিতে পড়ল।

রাজা ধারাল খুরপি দিয়ে খড়্গ নামে গণ্ডক মৃগদের শৃঙ্গচ্ছেদ করে তাদের মাথা হালকা করে দিলেন। দুষ্টের দমনই তাঁর ব্রত ছিল। তাই তিনি শত্রুবৃদ্ধি সহ্য করতেন না। এ ছাড়া তাদের জীবনের প্রতি তাঁর কোন হিংসা ছিল না।

নির্ভীক রাজা সুদক্ষ নিপুণ হাতে নিমেষের মধ্যেই তাদের মুখের হাঁগুলোকে তীরে তীরে ভরে দিয়ে সেগুলোকে যেন তূণে পরিণত করলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে বিচিত্র বাঘের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর সামনে, যেন বাতাসে অসন গাছের পল্লবদল ভেঙে পড়ল।

বনকুঞ্জে লীন সিংহদের বধ করতে চেয়ে রাজা প্রচণ্ড টঙ্কার দিলেন তাঁর ধনুকের গুণে। নিশ্চয় তাদের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের পরিচায়ক পশুরাজ

নামেই বুঝি তাঁর অসুয়া জন্মেছিল।

কাকুৎস্থ রাজা দশরথ শরবর্ষণ করে তাদের বধ করলেন। যারা যুদ্ধের পক্ষে বহু উপকারী হস্তিযূথের সঙ্গে চিরশত্রুতায় আবদ্ধ, যাদের নখাগ্রে গজমুক্তা আটকে যায় সেই সব হাতিদের এইভাবে প্রত্যুপকার করে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন।

কোথাও নীল গাইদের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কান পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে ভল্ল নিক্ষেপ করে তাদের সাদা চামর খসিয়ে দিলেন। যেন শত্রু রাজাদের ছত্র কেড়ে নিয়ে শান্ত হলেন।

চন্দ্রক কলাপ মেলে ময়ূরেরা তাঁর রথের সামনে এসে পড়লেও তিনি তাদের লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন না। কারণ হঠাৎ তাঁর মনে নানা ফুলমালায় অলঙ্কৃত তাঁর প্রেয়সীদের কেশকলাপ ভেসে উঠল যা তিনি প্রেমের খেলার সময় খুলে দিতেন।

কঠোর মৃগয়া বিহারের ক্লান্তিতে তাঁর মুখ স্বেদজলকণায় ভরে গেল। তুষারকণাবাহী বনসমীর পাতার রাশির মধ্য দিয়ে বয়ে এসে তা মুছিয়ে দিল। এইভাবে অন্য সব কাজ ভুলে গিয়ে সচিবদের উপরে রাজ্যের সব ভার দিয়ে পৃথিবীপতি রাজা দশরথ অনবরত মৃগয়া অনুশীলন করতে থাকলেন। তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি দেখা দিল। লীলাময়ী কামিনীর মত মৃগয়ার আকর্ষণ পেয়ে বসল তাঁকে। তিনি কোন পরিজন রাখেননি। কোমল পল্লবের শয্যাতে রাজা একাই শয়ন করতেন। বনের জ্বলজ্বলে মহৌষধিরাই রাত্রিতে প্রদীপের কাজ করত।

ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙ্গত হাতিদের কানের ঝটপটানির তীক্ষ্ণ পটহধ্বনিতে। তারপর চারণদের বন্দনাগানের মত পাখির মধুর কলকূজন শুনে তিনি আনন্দ পেতেন।

একদিন বনে একটা রুরুমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে অন্যদের অলক্ষ্যে তিনি পেঁছিলেন তপস্বীজনসেবিত তমসানদীর তীরে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের জন্য তাঁর ঘোড়াটির মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছিল।

সেই তমসানদীর জলে কুম্ভপূরণের এক মধুর ধ্বনি শুনতে পেয়ে

রাজা ভাবলেন হাতির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন তিনি। রাজার এ কাজ করা উচিত নয়। তবু শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করে তিনি তা করলেন। রজোগুণের প্রভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অপথে পদার্পণ করেন।

সহসা 'হা তাত' এই কান্না শুনে তাঁর হৃদয় বিষাদে ভরে গেল। তিনি বেতসবনে সেই কান্নার উৎস খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন কলসীতে জল ভরতে এসে এক মুনিপুত্র তীরবিদ্ধ হয়েছে। রাজার হৃদয়েও অনুশোচনার শেল বিঁধল যেন।

তিনি জন্মেছেন নামী বংশে, ঘোড়া' থেকে নেমে এসে তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। জলের কলসীর গায়ে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে স্খলিত কণ্ঠে জড়ানো উচ্চারণে সে তাঁকে জানাল, যে বৈশ তাপসের পুত্র।

তার আদেশমত রাজা তাঁকে তীরবিদ্ধ হতেই দৃষ্টিশক্তিহীন বাবা-মার কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁদের একটিমাত্র পুত্রের প্রতি ভুল করে যে আচরণ করেছেন তা বললেন। তখন সেই দম্পতি বিলাপ করে তাঁদের শিশুক যে আঘাত করেছে তাকে দিয়ে বুকে বিদ্ধ তীর টেনে তোলালেন —তার জীবন শেষ হলো। তখন বৃদ্ধ পিতা চোখের জলে রাজাকে অভিশাপ দিলেন।

শেষ বয়সে আপনিও আমারই মত পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন। তিনি এই কথা বললে আহত সর্প যেন বিষ উগরে দিলে এই প্রথম অপরাধে অপরাধী কোশলাধিপতি তাঁকে বললেন। আমি আজও পুত্রের কমল-সুন্দর মুখ দেখিনি, আমার প্রতি ঠাকুরের এই অভিশাপ বরের মত। ইন্ধনে জ্বলে ওঠা আগুন কৃষিক্ষেত্রকে পুড়িয়ে দিয়েও তাকে বীজাংকুর ধারণের উর্বরতা দেয়।

এর পর রাজা বললেন, এই বধযোগ্য ও নিষ্ঠুরহৃদয় মানুষটা এখন কি করবে?

মুনি তাঁকে চিতায় জ্বলন্ত কাঠ সাজাতে বললেন—তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মৃত পুত্রকে অনুসরণ করতে চান।

অবিলম্বে রাজা অনুচরদের সহায়তায় মহাপাতকের চিন্তায় উৎসাহহীনভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করলেন। নিজের মৃত্যুবাণরূপ অভিশাপ বুকে নিয়ে বড়বাগ্নিনিহিত সমুদ্রের মত তিনি বন থেকে ফিরে এলেন।

দশম সর্গ

অনন্ত সম্পদ নিয়ে ইন্দ্রের সমান তেজে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে করতে তাঁর প্রায় দশ বছর কেটে গেল। কিন্তু যা পূর্বপুরুষদের ঋণমুক্তির উপায়, যা সব শোকের অন্ধকার দূর করে দেয়, সেই পুত্ররূপ জ্যোতির দেখা পেলেন না।

সেই রাজা সন্তানজন্মের কারণের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে রইলেন। যেন মন্থনের রত্নসম্ভাবনাময় সমুদ্র স্থির হয়ে আছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ ইত্যাদি ঋত্বিকেরা তাঁকে সন্তানাকাঙ্ক্ষী এবং জিতেন্দ্রিয় জেনে তাঁর জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করলেন।

সেই সময় দেবতারা রাবণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে শ্রীহরি বিষ্ণুর কাছে গেলেন, রৌদ্রক্লান্ত পথিকেরা বুঝি ছায়াবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করল। তাঁরা সমুদ্রে উপস্থিত হলে সেই সনাতন পুরুষও যোগনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তাঁর এই তৎপরতা ভাবী কার্যসিদ্ধিরই লক্ষণ।

দেবতারা নারায়ণকে দেখলেন। অনন্তনাগের ফণার উপর বসে আছেন তিনি, তার ফণামণ্ডলের থেকে ছড়িয়ে পড়া মণিপ্রভায় তাঁর দিব্যদেহটি দীপ্তিময়। তিনি তাঁর পা দুটি রেখেছেন পদ্মাসনা কমলার কোলের উপর রাখা দুটি করপল্লবের উপরে। রেশমী আবরণে কমলার মেখলাটি আবৃত। স্বর্গের মন্দাকিনীতে স্নান করে এসে সাতজন ব্রহ্মর্ষি পুণ্য বেদমন্ত্র পাঠ করলেন।

প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষের পরনে আছে বালসূর্যের মত রাঙা বসন, যেন শরৎকালের সকাল, দেখেই আনন্দ হয়। সমুদ্রের সেরা কৌস্তভমণি তাঁর প্রশস্ত বুকে দুলছে, সে মণি যেন লক্ষ্মীর সাধের দর্পণ। তার ছটা যেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎসচিহ্নকে ঢেকে ফেলেছে।

তাঁর বাহুগুলি বিটপের মত। সে বাহু নানা দিব্যভূষণে অলংকৃত। সমুদ্রে আবির্ভূত হয়েছে দ্বিতীয় একটি পারিজাতবৃক্ষ। তাঁর চেতনা-যুক্ত অস্ত্রগুলো উচ্চকণ্ঠে তাঁর জয়গান গাইছে। এই অস্ত্রগুলিই দৈত্যদের পরাজিত করে তাদের স্ত্রীদের কপোলের মদলেখা মুছে দিয়েছিল।

তাঁর কাছেই ছিল বিনীত কৃতাঞ্জলি গরুড়, বাসুকির সঙ্গে ঝগড়া নেই, আর বজ্রের আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে। যোগনিদ্রাশেষে পবিত্র দৃষ্টিতে তিনি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিকে অনুগৃহীত করছেন। তাই সব ঋষিরা তাঁর যোগশয়নের কুশল জানতে এসেছেন।

দেবতারা তখন সেই অসুরবিনাশী আবাঙ্‌মানসগোচর স্তুতির যোগ্য নারায়ণকে প্রণাম করলেন এবং স্তব করতে লাগলেন।

তুমি তিন স্বরূপে অবস্থান করো, তোমাকে প্রণাম। প্রথমে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করো, পরে তাকে পালন করো এবং শেষে তাকে সংহার করো। দিব্য জলবর্ষণ একটিমাত্র রসের আস্বাদন দান করলেও দেশ বা আধারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদন ঘটায়। তেমনি অধিকারীর গুণভেদে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে তোমারও ভিন্ন অবস্থা হয়।

তোমাকে পরিমাপ করা যায় না, তুমিই লোকসমূহকে পরিমাপ করছ। তোমার কোন প্রয়োজন নেই, তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করছ, তোমাকে জয় করা যায় না, তুমিই সকলকে জয় করছ। তুমি অতিসূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াতীত, অথচ তুমি স্থূল ইন্দ্রিয় জগতের কারণস্বরূপ।

ঋষিরা বলেন, তুমি সকলের হৃদয়ে, তবু তুমি দূরে অপ্রত্যক্ষ। তুমি নিষ্কাম, তপস্বী, দয়ালু, অপাপবিদ্ধ, সনাতন অক্ষয়। তুমি দুর্জ্ঞেয়, চিত্ত সর্বজ্ঞ, সব সৃষ্টির উৎস, তুমি স্বয়ম্ভূ, আমার প্রভু, তোমার উপরে কেউ নেই, তুমিই অনন্তরূপে প্রকাশিত।

সকলে বলেন, সপ্তাঙ্গ সামগান তোমারই স্তুতি, সপ্ত সমুদ্রে তুমিই শয়ন করো, সপ্ত জিহ্বা অগ্নি তোমারই মুখস্বরূপ, সপ্তলোকের আশ্রয় তুমিই। চতুর্বর্গফলযুক্ত, জ্ঞান, কালের পরিমাপ চারটি যুগ এবং পৃথিবীর চতুর্বর্ণ—সবই তোমার চতুর্মুখের সৃষ্টিবিলাস।

যোগীরা মুক্তির জন্য অভ্যাসবলে মনকে সংযত করে হৃদয়স্থ জ্যোতির্ময় তোমাকে ধ্যানে উপলব্ধি করেন। তুমি অনাদি জন্মরহিত হয়েও জন্মগ্রহণ করো, নিস্পৃহ হয়েও শত্রু নিধন করো। নিত্য জাগ্রত চেতন হয়েও তুমি যোগনিদ্রায় মগ্ন হও। তোমার মহিমা কে-ই বা বুঝতে পারে ?

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই সব বিষয় ভোগ করার জন্য, তপশ্চরণের জন্য এবং প্রজাপালন করতে তুমিই সচেষ্ট এবং তুমিই সবচেয়ে উদাসীন। জাহ্নবীর জলরাশি নানা পথে প্রবাহিত হলেও যেমন এক সমুদ্রে গিয়েই মেশে, তেমনি বেদশাস্ত্র সিদ্ধির উপায়রূপে ভিন্ন পথ দেখালেও তারা সকলেই তোমার উদ্দেশ্যে সমর্পিত।

যে সব ব্যক্তিরা নিরাসক্ত, যাঁদের চিত্ত তোমাতে সমর্পিত, যাদের কর্ম শুধু তোমাতেই উৎসর্গীকৃত, তাদের পুনর্জন্ম নিরোধের তুমিই একমাত্র উপায়।

প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার পঞ্চভূতের মহিমা অপরিমেয়, ঋষিবাক্য এবং অনুমানবাক্যে জ্ঞানযোগ্য তোমার সম্বন্ধে কী-ই বা বলার আছে। স্মরণমাত্রই তুমি পুরুষকে পবিত্র করে দাও, এতেই তোমার প্রতি উৎসর্গীকৃত অন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির ফলও অনুধাবনযোগ্য।

সমুদ্রের রত্ন যেমন গুণে শেষ করা যায় না, সূর্যের তেজোরাশি যেমন পরিমাপ করা যায় না, তেমনি স্তবমহিমার দ্বারা তোমার আবাঙ্‌মানসগোচর স্বরূপকে ঠিকমত জানা যায় না। তুমি পূর্ণস্বরূপ, তোমার অপ্রাপনীয় কিছুই নেই। শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যই জন্মগ্রহণ করো এবং কর্মানুষ্ঠান করো।

তোমার মহিমা কীর্তন করে বা তোমার গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। শুধু পরিশ্রমে ও অক্ষমতায় ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়।

এইভাবে দেবতারা ইন্দ্রিয়াতীত নারায়ণের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। এ শুধু সেই পরমপুরুষের স্বরূপকীর্তন, তাঁর নিছক প্রশংসাগীতি নয়।

তিনি কুশলপ্রশ্ন করে প্রীতি প্রকাশ করলে দেবতারা রাক্ষসরূপ

মহার্ণবের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা নিবেদন করলেন।

তারপর সাগরের তরঙ্গধ্বনিকে হার মানিয়ে, বেলাভূমির পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনি তুলে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভগবান নারায়ণ বললেন ঃ সরস্বতী যেন সনাতন কবির উচ্চারণস্থান থেকে শুধু সংস্কৃতভাবে উচ্চারিত হয়ে সার্থক হলেন। পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী যেন তাঁরই চরণ-নিঃসৃত ঊর্ধ্বস্রোতা গঙ্গার মত তাঁর দন্তরুচিকৌমুদীতে শোভা পেল।

তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, রাক্ষসের আক্রমণে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম অভিভূত হয়েছে, তমোগুণে যেমন মানুষের সত্ত্ব ও রজোগুণ আচ্ছন্ন হয়। আমি এও জেনেছি, অনিচ্ছাকৃত পাপকর্ম যেমন সাধুগণের হৃদয়কে দগ্ধ করে, তেমনি সেই রাক্ষস তিন ভুবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করছে।

ইন্দ্রের নতুন করে আমার কাছে প্রার্থনা কিছুই নেই, কারণ আমরা একই কাজের সহকর্মী, বাতাস ত নিজেই এগিয়ে এসে অগ্নির সহায়তা করে।

অসিধারার ছেদনযুক্ত তার দশম মস্তকটি সে আমারই লভ্যাংশরূপে রেখেছে। আমারই সুদর্শন চক্রের লক্ষ্য সে। চন্দনগাছের মাথার উপর যেমন সাপ উঠে বসে তেমনি স্রষ্টা ব্রহ্মার বরপ্রভাবেই ঐ শত্রু বাড়াবাড়ি করে আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে। আমি তার বাড়াবাড়ি সহ্য করে এসেছি এতদিন।

বিধাতাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে রাক্ষস বর চেয়েছিল, মর্ত্যের মানুষ ত দূরের কথা, দেবতারাও তাকে বধ করতে পারবে না। আমি তাই দশরথের পুত্র হয়ে তীক্ষ্ণ বাণে তার মস্তক ছেদন করব। পদ্মমালার মত তার মুণ্ডমালাকে রণভূমির পূজার্ঘ্য করব আমি।

বেশী দেরী নেই, যাজ্ঞিকদের উৎসর্গ করা বিধিমত যজ্ঞভাগ আবার তোমরা পাবে, রাক্ষসেরা তা ছুঁতে পারবে না। পুণ্যবান ব্যক্তিরা আকাশে বিমানযোগে ভ্রমণ করার সময় রাক্ষসরাজ রাবণের পুষ্পকরথ দেখে মেঘের আড়ালে লুকোবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন।

শাপবলে রাবণের বলাৎকারের হস্তস্পর্শে স্বর্গের বন্দিনী সুর-

কামিনীদের কেশকলাপ দূষিত হয়নি, তোমরা সেই বেণীর বাঁধন খুলে দেবে।

সেই কৃষ্ণমেঘকান্তি বিষ্ণু রাবণের উৎপীড়নে ক্লান্ত দেবতাদের রৌদ্রশুষ্ক শস্যরাজিকে যেন এই বাক্যামৃতরসবর্ষণে সিক্ত করে অন্তর্ধান করলেন। গাছেরা যেমন ফুলে ফুলে বায়ুকে অনুসরণ করে তেমনি ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা নিজ নিজ অংশ নিয়ে দেবকার্যে উদ্যত বিষ্ণুর অনুগমন করলেন।

এদিকে রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে রাজার ঈপ্সিত কর্মের শেষে ঋত্বিকদের বিস্মিত করে দিয়ে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি দুহাতে স্বর্ণপাত্রে ভরা চরু পায়েস ধরে আছেন। সে পায়েসের মধ্যে আদিপুরুষ ভগবানের অনুপ্রবেশের ফলে সেই দিব্য-পুরুষের পক্ষে সে পাত্র দুর্বহ মনে হচ্ছিল।

সমুদ্রমন্থন হতে লাভ করা অমৃতকে ইন্দ্র যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রাজা দশরথ প্রজাপতি ব্রহ্মার দেওয়া এই চরু গ্রহণ করলেন। ত্রিলোকের উৎপত্তির কারণ বিষ্ণু যে তাঁর পুত্র হতে চেয়েছিলেন, এতেই রাজার দুর্লভ গুণগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রহপতি সূর্য যেমন দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁর আলো ছড়িয়ে দেন তেমনি রাজা চরুরূপে পাওয়া বিষ্ণুর তেজকে তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিলেন। কৌশল্যা তাঁর পাটরাণী, কৈকেয়ী তাঁর প্রিয় রাণী। রাজা চাইলেন তাঁরা সুমিত্রাকেও তার ভাগ দিয়ে খুশি করবেন।

সর্বজ্ঞ স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁরা দুজনেই সুমিত্রাকে সেই চরুর অর্ধেক অংশ দিলেন। কারণ মত্ত হাতির দুগাল বেয়ে যখন মদধারা ঝরতে থাকে তখন ভ্রমরী যেমন দুই ধারাতেই আসক্ত হয় তেমনি সুমিত্রা দুই সপত্নীকেই সমানভাবে ভালবাসতেন।

সূর্যের অমৃত নামে কিরণজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে তাঁরাও তেমনি সন্তান প্রসবের জন্য বিষ্ণুর অংশজাত গর্ভ ধারণ করলেন। আসন্নপ্রসবা হয়ে তাঁরা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করলেন, দেখে মনে হলো যেন ফলোন্মুখী শস্যসম্পদ শোভা পাচ্ছে।

মহিষীরা সকলে একদিন স্বপ্নে দেখলেন, শঙ্খ, অসি, গদা, শার্ঙ্গ ও চক্র প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করে বামনমূর্তিরা তাঁদের রক্ষা করছেন। দেখলেন, গরুড় তার গতিবেগে মেঘগুলোকে টান দিচ্ছে, তার সোনার পাখার কিরণজাল আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে পিঠে করে তাঁদের বহন করছে।

তাঁরা আরও দেখলেন, লক্ষ্মীদেবী বুকের মাঝখানে কৌস্তভমণিটিকে দুলিয়ে তাঁদেরকে পদ্ম পাখার বাতাস দিয়ে সেবা করছেন।

তাঁদের মুখে এইরকম স্বপ্নের কথা শুনে আনন্দিত হলেন রাজা। জগৎপিতার জনক ভেবে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। নির্মল জলে যেমন একই চাঁদের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে তেমনিই একই ঈশ্বর চার ভাগে বিভক্ত হয়ে রাণীদের গর্ভে বাস করতে লাগলেন।

প্রসবের সময় এলে রাজার পাটরাণী সতী কৌশল্যা ঘর-আলো করা এক পুত্রলাভ করলেন, বনৌষধি যেন রাত্রিতে জ্যোতি দেখাল। পুত্রের নয়নাভিরাম রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পিতা তার নাম রাখলেন জগতের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলসূচক শব্দ রাম।

রঘুবংশের প্রদীপ সে পুত্রের অলোকসামান্য তেজে সূতিকাগৃহের প্রদীপের আলোকশিখাও যেন ম্লান হয়ে গেল। শিশু রাম যখন শয্যায় শুয়েছিলেন, তখন কৃশোদরী মাতাকে শরতের ক্ষীণ গঙ্গাধারার মত দেখাচ্ছিল যার তীরের বেলাভূমিতে সাজানো আছে কমল অর্ঘ্য।

কৈকেয়ীর কোলে জন্ম নিল সুশীল পুত্র ভরত। জননীর অলঙ্কার সে, যেন সম্পদশ্রীর বিনয়ভূষণ।

সুমিত্রা প্রসব করলেন দুটি যমজ পুত্র লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন, সুশিক্ষিতা বিদ্যা যেমন একই সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান ও সংযম দান করে।

সমস্ত জগতের দুঃখ দূর হলো, সুখের বন্যায় প্লাবিত হলো চারদিক। মনে হলো পুরুষোত্তমের পিছু পিছু স্বর্গ নেমে এল পৃথিবীতে।

চতুর্মূর্তিতে তাঁর আবির্ভাবে রাবণের ভয়ে সংকুচিত দিগ্‌বধূরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, চারদিকে নির্মল বাতাসের দোলা দেখা দিল।

আগুন জ্বলল, কিন্তু ধোঁয়া লাগল না। সূর্য প্রসন্ন হলো। রাক্ষসের অত্যাচারে পীড়িত এঁরা এখন বিষাদ ভুলে গেলেন।

দশানন রাবণের মাথার মুকুট থেকে মণিগুলো খসে পড়ল একে একে, যেন তাঁর রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল মাটিতে।

পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তূর্যধ্বনির মধ্যে স্বর্গেই প্রথম দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। রাজার প্রাসাদে পারিজাতের পুষ্পবৃষ্টি হলো। এই বৃষ্টিই যেন সমস্ত মাঙ্গলিক কর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।

রাজকুমারদের একে একে সংস্কার সাধন হলো। ধাত্রীর স্তন্যে পুষ্ট হয়ে উঠল তারা। পিতার প্রথমজাত আনন্দ বর্ধন করতে করতে বড় হতে লাগল তারা। ঘি যেমন আগুনের স্বাভাবিক তেজকে উজ্জ্বলতর করে তোলে তেমনি তাদের স্বাভাবিক বিনয়গুণ সুশিক্ষার সংস্কারে সমৃদ্ধ হলো আরও।

ঋতুরঙ্গ যেমন স্বর্গের নন্দনকাননকে সুন্দরতর করে তোলে, তেমনি তাদের পারস্পরিক অনুরাগ অকলঙ্ক রঘুকুলকে উজ্জ্বলতর করে তুলল আরো অনেক। তাদের সৌভ্রাতৃত্ব একই রকম ছিল। তবু রাম লক্ষ্মণে ও ভরত শত্রুঘ্নে বেশী প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। বাতাস আর আগুনের মত, চাঁদ আর সমুদ্রের মত তাদের এই জোড়ায় জোড়ায় একতা কখনো ক্ষুণ্ণ হতো না।

এই কুমারেরা গ্রীষ্মশেষে কালো মেঘে দিনের আলোর মত তেজস্বিতায় এবং স্নেহশীলতায় প্রজাদের মন কেড়ে নিলেন। রাজার চতুর্ধা-বিভক্ত সত্তা এই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে শোভা পেল, মনে হলো এরা যেন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সশরীর অবতার।

চতুর্দিকের অধিপতি রাজাকে চার সমুদ্র যেমন রত্ন দিয়ে সেবা করত, তেমনি পিতৃবৎসল চার পুত্র তাদের গুণাবলীর দ্বারা পিতাকে তৃপ্ত করত। চার পুত্রকে নিয়ে রাজাধিরাজ শোভা পেলেন। মনে হলো স্বর্গের ঐরাবত চারটি দাঁত দিয়ে দৈত্যদের তরোয়ালের ধার নষ্ট করে দিচ্ছে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি উপায় দিয়ে রাজনীতির ফল নির্ণয় করা যায়। স্বয়ং বিষ্ণুর যুগকাষ্ঠের মত দীর্ঘ চারটি বাহু এই চারটি কুমার।

একাদশ সর্গ

একদিন কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে এসে যজ্ঞ-বিঘ্ন দূর করার জন্য বালকোচিত শিখাধারী রামকে প্রার্থনা করলেন, কারণ তেজস্বীদের বয়স কত তা দেখার প্রয়োজন হয় না।

বিচক্ষণ রাজা বহুকষ্টে রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে মুনির হাতে সমর্পণ করলেন। প্রাণপ্রার্থীদের প্রার্থনাও রঘুবংশে প্রত্যাখ্যাত হয় না।

রাজা তাঁদের প্রস্থানের জন্য নগরীর পথ সংস্কার করার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুকে সঙ্গে নিয়ে জল ও পুষ্পবর্ষী মেঘ অবিলম্বে তা সম্পাদন করলেন। পিতার আদেশপালনে উদ্যত ঐ দুই ধনুর্ধারী পিতার চরণে প্রণিপাত করলেন। রাজার অশ্রুবিন্দুই প্রবাসগমনে প্রস্তুত বিনীত ঐ দুই পুত্রের উপর বর্ষিত হলো।

পিতার নয়নজলে ঐ ধনুর্ধর দুজনের শিখা ঈষৎ সিক্ত হলো। তাঁরা সেই ঋষির অনুগমন করলেন। পুরবাসীরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় তাদের নয়নপঙক্তিতে যেন তাঁদের রাজপথের তোরণদ্বার রচিত হলো।

ঋষি কেবল লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকেই নিতে চাওয়ায় রাজা আর সৈন্য-সামন্ত কিছু দিলেন না। কারণ ঋষির আশীর্বাদই তাদের দুজনের রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট।

তাঁরা দুজনে জননীদের চরণস্পর্শ করে তেজস্বী মুনির অনুগমন করলেন। চৈত্র ও বৈশাখ মাস মেষাদিরাশির সংক্রমণকালে সূর্যের অনুগমন করলে যেমন শোভান্বিত হয় তাঁরা দুজনেও সেইরকম শোভা পেলেন।

বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও ভিদ্য নদের নামানুসারে তাদের ক্রিয়া অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদ যেমন শোভা পায়, শৈশবহেতু চঞ্চল হলেও তাদের তরঙ্গের মত আন্দোলিত বাহুদুটি তেমনি শোভা পেল।

যাঁরা একদিন মণিবন্ধ ভূমিতে বিচরণ করতেন তাঁরা দুজন ঋষিপ্রদত্ত 'বলা' ও 'অতিবলা' এই দুটি বিদ্যার প্রভাবে পথে কোন ক্লান্তিবোধ করলেন না, বরং তাদের মনে হলো তাঁরা যেন মায়ের পাশেই রয়েছেন।

যানবাহনে আরোহণের যোগ্য অনুজসহ রামচন্দ্র পুরাবিদ পিতৃবন্ধু ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে সেকালের গল্প শুনতে শুনতে এতই অন্যমনা হয়েছিলেন যে তাঁরা যে পায়ে হেঁটে চলেছেন তা বুঝতেই পারলেন না।

সরোবরেরা রসাল জল দিয়ে, পাখিরা কূজন দিয়ে, বায়ুরা সুরভি ফুলের রেণু দিয়ে এবং মেঘেরা ছায়া দিয়ে তাঁদের দুজনকে সেবা করতে লাগল। প্রিয় দর্শন সেই দুজনকে দেখে তপস্বীরা যেরকম আনন্দ পেলেন, পদ্মশোভামণ্ডিত জল কিংবা ক্লান্তিহরা তরুরাজি দেখেও সেরকম আনন্দ পাননি।

সেই ধনুর্ধর রাম হরকোপানলে দগ্ধ মদনদেবের তপোবনে এসে শুধু সুন্দর মূর্তিতেই তাঁর প্রতিনিধি হলেন, মর্মে নয়।

অগস্ত্যমুনির অভিশাপে রাক্ষসবেশধারিণী যক্ষ সুকেতুর কন্যা তাড়কা পথ আগলে বসে আছে। বিশ্বামিত্রের কাছে তা জানতে পেরে রামচন্দ্র মাটিতে ধনুর প্রান্তভাগ রেখে অনায়াসে তাতে জ্যা রোপণ করলেন। তখন কৃষ্ণবর্ণ রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা তাড়কা তাঁদের দুজনের ধনুকের টংকার শুনে সামনে আবির্ভূত হলো, তার কর্ণলম্বিত নরমুণ্ড আন্দোলিত হচ্ছিল, তাকে বলাকাশোভিত নিবিড়কৃষ্ণ মেঘরাশির মত দেখাচ্ছিল।

তখন ছিন্ন প্রেতবাসপরিহিতা বিকটনাদিনী তাড়কা তীব্রগতিবেগে পদ্মতরু কম্পিত করে শ্মশানোত্থিত বাত্যার মত রামচন্দ্রকে অভিভূত করল। একটি বাহুরূপ যষ্টি তুলে কটিদেশে পুরুষের অস্ত্ররূপ মেখলা ধারণ করে সে ছুটে আসছিল। তাকে দেখে রাম বাণ ও স্ত্রীলোকবধে ঘৃণা একই সঙ্গে ত্যাগ করলেন।

রামের সেই বাণ শিলার মত কঠিন তাড়কার বুকে যে ছিদ্র করল সেই ছিদ্রই রাক্ষসদেহে যমরাজের প্রবেশের দ্বারপথ হয়ে উঠল। রামের শর তাড়কার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করল। এ অবস্থায় মাটিতে পড়বার সময় কেবল যে তার বনভূমি কম্পিত হলো তা নয় ত্রিভুবন জয় করায় রাবণের অচঞ্চলা জয়লক্ষ্মীও বিচলিত হলেন।

রাক্ষসী তাড়কা দুঃসহ রামরূপ মদনবাণে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হয়ে অঙ্গে রক্তরূপ সুবাসিত চন্দন লেপন করে যমালয়ে প্রস্থান করল। তারপর সূর্যকান্তমণি যেমন সূর্য থেকে ইন্ধনদাহক তেজ লাভ করে তাড়কাঘাতী রামও তেমনি তাঁর বিক্রমে প্রীত মহর্ষির কাছ থেকে রাক্ষসবধের মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রলাভ করলেন।

তারপর বামনাশ্রমে এলেন রাম। ঋষির কাছ থেকে এ আশ্রমের কথা আগেই শুনেছিলেন। এখানে প্রথম জন্মের লীলা ঠিক মনে না পড়লেও উন্মনা হয়ে পড়লেন।

সেখান থেকে মুনি তাঁর নিজের তপোবনে এলেন। শিষ্যেরা আগেই অর্ঘ্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আশ্রমতরুরা পল্লবপুটরূপ অঞ্জলি রচনা করে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃগরা উন্মুখ হয়েছিল তাঁদের দেখবার জন্য।

যথাক্রমে উদিত সূর্য ও চন্দ্র যেমন রশ্মিজালে অন্ধকার থেকে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, দশরথের এই পুত্রও তেমনি শরজালে যজ্ঞদীক্ষিত মুনিদের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করলেন।

তখন বন্ধুকফুলের মত স্থূল রক্তবিন্দুতে যজ্ঞ দূষিত হচ্ছে দেখে ঋত্বিকরা যজ্ঞের কাজ পরিত্যাগ করলেন এবং ভয়ে তাঁদের হাত থেকে বিকস্কতে তৈরী স্রুগাদি অর্থাৎ কণ্টকতরুর দ্বারা তৈরী যজ্ঞীয় হাতা স্খলিত হলো।

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তৎক্ষণাৎ তূণীর থেকে বাণ নিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে রাক্ষসসেনাদের দেখতে পেলেন। শকুনদের পাখার হাওয়ায় তাদের পতাকাগুলো কাঁপছিল। রাম যজ্ঞবিদ্বেষী রাক্ষসদের প্রধান দুজন মারীচ ও সুবাহুর উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করলেন। কারণ যে গড়ুর মহাভূজঙ্গবধের শক্তি ধারণ করেন তিনি কখনো ঢোড়া সাপের উপর বিক্রম প্রকাশ করেন না।

অস্ত্রবিদ রাম তখন উগ্রবেগ বায়ব্য অস্ত্র ধনুকে সংযোজিত করে পর্বতের মত ধাবমান তাড়কাপুত্র মারীচকে জীর্ণ পত্রের মত ভূপাতিত করলেন। সুবাহু নামে আর এক রাক্ষস তখন সেখানে মায়া বিস্তার করে বিচরণ করছিল। রাম ক্ষুরপ্র বাণে তাকে খণ্ড খণ্ড করে

আশ্রমের বাইরে পাখিদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

যজ্ঞবিঘ্নবিনাশী রামলক্ষ্মণের সামরিক বিক্রমকে অভিনন্দিত করে ঋত্বিকরা সংযতভাবে মহর্ষির ক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

মুনির যজ্ঞীয় স্নানের পর দুই ভাই তাঁকে প্রণাম করলে তাঁদের শিখাবন্ধ দুলে উঠল। তিনি আশীর্বাদ করে কুশক্ষত হাতে তাঁদের স্পর্শ করলেন।

মিথিলাপতি জনক আবদ্ধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন। তাই তিনি তাঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

তাঁরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় গৌতম মুনির বন্য আশ্রমে অবস্থান করলেন। ঐ আশ্রমে গৌতমপত্নী অহল্যা ক্ষণকালের জন্য ইন্দ্রের পত্নীত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শিলাময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা দীর্ঘকাল শাপগ্রস্ত হয়ে থাকার পর আবার যে নিজের মনোজ্ঞ দেহ ফিরে পেয়েছিলেন সে কেবল রামের চরণধূলির অনুগ্রহে।

রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে রাজা জনক অর্ঘ্য নিয়ে অর্থ ও কামযুক্ত মূর্তিমান ধর্মের মত সেই মুনির প্রত্যুদ্গমন করলেন। বিদেহনগরের অধিবাসীরা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসা সপ্তম নক্ষত্র পুনর্বসুর মত তাঁদের দুজনকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন। তখন তারা চোখের পলক ফেলাকেও বিড়ম্বনা বলে মনে করল।

জনকের যূপচিহ্নিত যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হলে কুশিক-তিলক বিশ্বামিত্র অবসর বুঝে মিথিলাধিপতি জনককে বললেন যে রাম সেই ধনুকটি দেখতে উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা প্রখ্যাতবংশে জাত সেই বালকের লাবণ্যময় দেহ দেখে এবং অনমনীয় ধনুকের কথা ভেবে কেন যে কন্যা এই কঠিন পণ করলেন তা চিন্তা করে ব্যথিত হয়ে বললেন, বিশাল গজরাজের পক্ষেও যে কাজ দুষ্কর সেই কাজে সামান্য গজশাবকের ব্যর্থ চেষ্টা অনুমোদন করতে আমি উৎসাহবোধ করছি না।

হে তাত! এ ধনুক বহু ধনর্ধর রাজাকে লজ্জা দিয়েছে। নিজেদের যে বাহুর ত্বক নিয়ত ধনুর্গুণের আকর্ষণে কঠিন হয়েছে তাঁরা সেই বাহুকে ধিক্কার দিয়ে ফিরে গিয়েছেন।

মুনি তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন, এর শক্তিমত্তার কথা শুনুন। অযথা কথায় কাজ নেই। পর্বতে যেমন বজ্রের শক্তি পরীক্ষিত হয় তেমনি আপনার বজ্রের পথ এই ধনুকটিতেই এঁর শক্তি ও সারবত্তা প্রকাশিত হোক।

জনক এই বিশ্বস্ত মুনির কথা শুনে ইন্দ্রগোপকীটের মত ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দাহিকাশক্তির মত বালক রামেরও পরাক্রম সম্ভব তা বিশ্বাস করলেন।

তারপর ইন্দ্র যেমন তাঁর তেজোময় ধনুর প্রকাশের জন্য মেঘরাশিকে আদেশ করেন, তেমনি জনকও অনুচরদের ধনুকটিকে আনার জন্য আদেশ করলেন। সতীর দেহত্যাগের পর শিব দক্ষের যজ্ঞনাশে উদ্যত হলে যজ্ঞ যখন মৃগরূপ ধারণ করে পালাতে থাকে তখন যে ধনুকে শিব বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, নিদ্রিত বাসুকির মত ভীষণ সেই ধনুক দেখে রাম তা গ্রহণ করলেন।

কামদেব যেমন অনায়াসে পুষ্পধনুতে গুণ আরোপ করেন, রামও তেমনি পর্বতের মত সেই ধনুতে অনায়াসে গুণ আরোপ করলেন। তখন সভার সকলে বিস্ময়স্তিমিত নয়নে তা দেখতে লাগলেন। রামের প্রবল আকর্ষণে বজ্রের মত কঠিন শব্দ তুলে ভগ্ন হয়ে সেই ধনুক যেন ভৃগুনন্দনকে জানিয়ে দিলেন—ক্ষত্রিয় আবার জেগেছে।

হরধনুভঙ্গে রামের পরাক্রম দেখলেন মিথিলাপতি। তিনি তাঁর হরধনুভঙ্গ-পণকে অভিনন্দিত করে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী অযোনি-সম্ভুতা কন্যা সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করলেন।

সত্যপ্রতিজ্ঞ জনক তেজোনিধি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমক্ষে অগ্নিকে অযোনিজা কন্যাকে অবিলম্বে রামচন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করলেন। 'আমার এই কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করে এই নিমিকুলকে ভৃত্য বলে মনে করুন—মহাদ্যুতি জনক এই বার্তা দিয়ে মাননীয় পুরোহিতকে

কোশলরাজ দশরথের কাছে পাঠালেন।

রাজা দশরথ যখন যোগ্য পুত্রবধূর সন্ধান করেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর বাসনার অনুকূল প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে এলেন জনকের পুরোহিত। কল্পতরুর ফলের মত পুণ্যবানদের বাসনা সদ্য সদ্যই পরিপক্ক হয়।

বাসববন্ধু জিতেন্দ্রিয় দশরথ সেই ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিতকে অর্ঘ্যদানে সম্মানিত করে তাঁর কাছে সব কথা শুনে সৈন্যবাহিনীসহ মিথিলার পথে রওনা হলেন। সৈন্যদের পায়ে পায়ে ওঠা ধূলিরাশিতে সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হলো।

রাজা দশরথ তাঁর সৈন্যদের দিয়ে মিথিলানগরী বেষ্টন করিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে সৈন্যেরা উপবনতরু বিদলিত করতে লাগল। যুবতী নারী যেমন গাঢ় প্রিয়সম্ভোগ সহ্য করে মিথিলাপুরীও তেমনি দশরথের সৈন্যদের এই প্রণয়াবরোধ সহ্য করল সানন্দে।

তারপর রাম পৃথিবীকন্যা সীতাকে, লক্ষ্মণ তাঁর কনিষ্ঠা ঊর্মিলাকে এবং তাঁদের তেজস্বী অনুজ দুজন ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজের ক্ষীণ-কটি দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করলেন। তখন চারপুত্র নববধূ গ্রহণ করে রাজা দশরথের সাম, দান ভেদ ও দণ্ড এই চারটি উপায়ের মত শোভা পেলেন।

সেই রাজকন্যারা রাজপুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর চরিতার্থতা লাভ করলেন। বরবধূর এই মিলন যেন প্রস্তুতিপ্রত্যয়যোগের মত হলো।

এইভাবে পুত্রবৎসল দশরথ তার চার পুত্রকে বিবাহ দিয়ে নিজের পুরীতে প্রস্থান করলেন। রাজা জনক তিন দিনের পথ পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলে তিনি তাঁকে বিদায় দিলেন।

নদীবেগ যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে, দূরবর্তী স্থলভাগকেও নিপীড়িত করে তেমনি পথে একদিন প্রতিকূল বায়ু ধ্বজদণ্ডরূপ তরু উন্মীলিত করে রাজার সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করতে লাগল।

তারপর সূর্য ভয়ঙ্কর পরিবেশনতলে আবৃত হলেন। গরুড়নাশিত কালভুজঙ্গ যেমন তার দেহ দিয়ে শিরোভ্রষ্ট মণিকে বেষ্টন করে রাখলে

যেমন ভয়ঙ্কর দেখায় সূর্যকেও তেমনি ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। দিগঙ্গনারা শ্যেনপাখির পক্ষরূপ ধূসর অলকরাশি ধারণ করে এবং সান্ধ্যমেঘরূপ রক্তিম বসনে আবৃত হয়ে রজস্বলা রমণীর মত দর্শনের অযোগ্য হলো।

ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণকারী পরশুরামের আগমনবার্তা ঘোষিত হতেই যেন যেদিকে সূর্যদেব ছিলেন সেইদিকে চেয়ে চেয়ে রব করতে লাগল।

কার্যজ্ঞ রাজা প্রতিকূল পরগাদি দুর্লক্ষণ দেখে শান্তিবিধানের জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠকে বললেন। বশিষ্ঠ 'মঙ্গল হবে' বলে রাজার উদ্বেগ দূর করলেন।

তখন সৈন্যদের সামনে এক তেজোরাশি আবির্ভূত হলো। তারা নয়ন মার্জনা করে দেখল সেই তেজোরাশি এক দর্শনীয় পুরুষাকৃতির রূপ নিল।

কণ্ঠে পিতার অংশস্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং হাতে মায়ের অংশস্বরূপ দুর্জয় ধনুর্ধারণ করে তিনি চন্দ্রযুক্ত স্বর্ণ এবং স্বর্গবেষ্টিত চন্দনতরুর মত প্রতিভাত হলেন। পিতা ক্রোধে নিষ্ঠুর হলেও এবং ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করলেও তিনি তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন। তিনি কম্পমানা জননীর শিরশ্ছেদন করে প্রথমে ঘৃণাকে ও পরে পৃথিবীকে জয় করেছিলেন। তিনি ডান কানে জড়ানো রুদ্রাক্ষমালার ছলে একুশবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের গণনাকে বহন করে যেন শোভা পাচ্ছিলেন।

সন্তানেরা বালক বলে নিজের অসহায় অবস্থা এবং পিতৃবধজনিত ক্রোধে ক্ষত্রিয় রাজবংশ নিধনে উদ্যত পরশুরামকে দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন রাজা। নিজের পুত্র এবং শত্রুতে সমভাবে 'রাম' নামটি তাঁর কাছে কণ্ঠদ্বারের মণি আর সাপের মাথায় মণির মত প্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর হলো একই সঙ্গে।

দশরথ সসম্ভ্রমে 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' করতে থাকলেও সেদিকে না তাকিয়ে পরশুরাম যেখানে রাম ছিলেন সেখানে ক্ষত্রিয় কোপানলের শিখার মত

চোখ রাখলেন। সে চোখের তারাগুলো উগ্রতায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরশুরাম সংগ্রামে ইচ্ছুক হয়ে একটি মুষ্ঠিতে ধনুক আর এক মুষ্ঠিতে আঙ্গুলের ফাঁকে তীর রাখতে রাখতে নির্ভীক রামকে বললেন—

অপকার করে ক্ষত্রিয়কুল আমার শত্রু হয়েছে। আমি বহুবার তাদের নিধন করে শান্ত হয়েছি এখন। তবু তোমার পরাক্রমের কথা শুনে দণ্ডতাড়িত সুপ্তনাগের মত ক্রুদ্ধ হয়েছি। অন্য রাজারা জনকের যে ধনু নোয়াতেই পারেনি, তুমি নাকি সে ধনুক ভঙ্গ করেছ। তাই শুনেই মনে হলো আমার শক্তির চূড়াটিকেই ভেঙ্গেছ।

আগে জগতে 'রাম' নামটি উচ্চারিত হলে আমাকেই বোঝাত। এখন উদীয়মান তোমাতে সে নামটি বিভক্ত হওয়ায় আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণকালেও যার কুঠার অভয় সেই আমি দুজনকে সমদোষী শত্রু বলে মনে করছি। একজন হলো ধেনুবংশ হরণকারী হৈহয়বংশীয় কার্তবীর্য আর একজন আমার কীর্তি হরণে উদ্যত তুমি।

তাই তুমি আমার হাতে পরাজিত না হলে আমায় ক্ষত্রিয়বিনাশী পরাক্রম তৃপ্ত করতে পারবে না আমাকে। আগুন যে শুষ্ক তুষের মত সমুদ্রেও জ্বলে তাতেই তার মহিমা। তুমি যে হরধনু ভঙ্গ করেছিলে বিষ্ণুতেজে তার সার বা আসল শক্তি অপহৃত হয়েছিল। নদীর বেগে মূল আলগা হলে সামান্য বাতাসও তটরুহকে ভূপাতিত করে।

তুমি আমার ধনুকে গুণ পরিয়ে আকর্ষণ করো দেখি, যুদ্ধ থাক। এতেই আমি মনে করব তুল্যবল তুমি আমাকে পরাজিত করেছ। আর যদি অগ্নিবর্ষী আমার এই পরশু দেখে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে বৃথা ধনুগুলির আঘাতে যে আঙ্গুলগুলো কঠিন হয়েছে অভয় প্রার্থনায় তা দিয়ে অঞ্জলি রচনা করো।

ভীমদর্শন পরশুরাম একথা বললে স্মিতহাস্যে কম্পিত হলো রামের অধর। তিনি সেই ধনুক গ্রহণ করে গুণ পরিয়ে তাতে তীর লাগিয়ে সেকথার উত্তর দিলেন। পূর্বজন্মে যে ধনু গ্রহণ করেছিলেন সেই ধনু এজন্মে ধারণ করে রাম অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হলেন। এমনিতেই সুন্দর নবীন মেঘ ইন্দ্রধনুযুক্ত হলে যেমন সুন্দরতর হয়।

শক্তিমান রাম মাটিতে ধনুকের প্রান্তভাগ রেখে তাতে গুণযোজনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামশত্রু পরশুরাম ধূমাবশিষ্ট অগ্নির মত নিষ্প্রভ হলেন।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন। একজনের তেজ দীপ্যমান আর একজনের তেজ নিষ্প্রভ, এ অবস্থায় জনতা দুজনকে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় উদয়োন্মুখ চন্দ্র ও অস্তগামী সূর্যের মত দেখল।

কার্তিকেয়কল্প রাম পরশুরামকে হীনবল ও নিজের সংযোজিত বাণকে অব্যর্থ দেখে করুণাকোমল কণ্ঠে বললেন—

আপনিই প্রথমে যুদ্ধের আস্ফালন করলেও আপনি ব্রাহ্মণ বলে আমি নির্দয়ভাবে আঘাত করতে পারছি না আপনাকে। এখন বলুন এই বাণ নিক্ষেপ করে আমি আপনার ঈশ্বরগতি রুদ্ধ করব, না আপনার যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোকের পথ রুদ্ধ করব ?

ঋষি পরশুরাম প্রত্যুত্তরে বললেন, স্বরূপতঃ তোমাকে পুরাণপুরুষ নারায়ণ বলে জানি না তা নয়। কিন্তু ধরায় অবতীর্ণ তোমার বৈষ্ণব তেজ দেখতে চেয়েছিলাম। তাই তোমার ক্রোধ উৎপাদন করেছি।

আমি পিতৃশত্রুদের ভস্মসাৎ করেছি এবং সসাগরা বসুন্ধরাকে যোগ্য পাত্রে দান করেছি। এখন পরমপুরুষ তোমার কাছে আমার এই পরাভব আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।

হে সুধীশ্রেষ্ঠ, আমি তীর্থযাত্রী। পুণ্যতীর্থযাত্রায় অভীষ্ট অব্যাহত রাখো। আমি ভোগলিপ্সু নই, সুতরাং স্বর্গের পথরোধ আমাকে কোনরূপ পীড়া দেবে না। জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু ব্যক্তি বিষয়াভিলাষের সঙ্গে স্বর্গসুখের স্পৃহাও ত্যাগ করেন।

রাম 'তাই হোক' বলে অঙ্গীকার করে পূর্ব দিকে মুখ করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ পরশুরাম পুণ্যবান হলেও তাঁর দুরতিক্রম্য স্বর্গপথ অবরুদ্ধ করল। তারপর রাম 'ক্ষমা করুন' বলে তপস্বী পরশুরামের চরণস্পর্শ করলেন। শক্তিকে পরাজিত করে শত্রুর কাছে প্রণত হওয়া বীরদের কীর্তিরই কারণ হয়।

পরশুরাম বললেন, তুমি আমার মাতৃসম্বন্ধীয় রজোগুণ দূর করে

পৈতৃক তমোগুণ অবলম্বন করিয়েছ। তার ফলে আমার এই শুভাবহ নিগ্রহও অনুগ্রহে পরিণত হয়েছে। তুমি দেবকার্যসাধনে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ, তোমার মঙ্গল হোক। আমি চললাম। —এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

পরশুরাম চলে গেলে পিতা বিজয়ী রামকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। রামের যেন পুনর্জন্ম হলো। ক্ষণিক পরিতাপের পর তাঁর পরিতোষ লাভ দাবানলে আক্রান্ত তরুতে বৃষ্টিপাতের মত হলো যেন।

তারপর শিবতুল্য রাজা দশরথ পথে সুনির্মিত পটমণ্ডপে কয়েক রাত যাপন করে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন সীতাদর্শনে উৎসুক পুরনারীরা বাতায়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় মনে হলো সেখানে যেন পদ্ম ফুটে আছে অসংখ্য।

দ্বাদশ সর্গ

সমস্ত বিষয়সুখ ভোগ করে জীবনের শেষ দশায় উপনীত হলেন রাজা দশরথ। ভোরের প্রদীপশিখার মত তাঁর জীবনদীপও প্রায় নির্বাপিত হলো।

জরা পলিতকেশের বেশে তাঁর কানের কাছে এসে কানে কানে বলল, রামের হাতে রাজ্যশ্রীকে অর্পণ করো।

প্রিয় রামের অভিষেকবার্তা পুরবাসী সকলকে আনন্দে ভাসিয়ে দিল—উদ্যানের জলস্রোত যেন তরুগুলিকে ভাসিয়ে দিল।

কুটিলমতি কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন রাজার শোকসন্তপ্ত অশ্রুপাতে দূষিত করে দিলেন। সেই রণচণ্ডী দশরথের অনেক আশ্বাসে ও তোষামোদে তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুত দুটি বরের কথা বলল— বর্ষার জলে ভেজা মাটি যেন দুটো সাপ উগরে দিল।

তার একটিতে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠানো হলো আর অন্যটিতে নিজের ছেলের জন্য রাজ্যশ্রী চাইল। আর তার ফল হলো নিজেরই বৈধব্য।

রামচন্দ্র পিতার রাজ্যকে চোখের জলে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর

তাঁরই কাছ থেকে 'বনে যাও' এই আদেশ খুশিমনে গ্রহণ করলেন। লোকে অবাক হয়ে দেখল, পবিত্র রেশমী জোড় পরে তাঁর মুখে যে ভাব হয়েছিল, বল্কলজোড় পরেও সেই একই ভাব রইল একটুও পরিবর্তন হলো না।

রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে পিতাকে সত্যভ্রষ্ট না করে দণ্ডকারণ্যে চলে গেলেন। সজ্জনদের মনে গভীর রেখাপাত করে গেলেন। তাঁর বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় নিজের কর্মফলরূপ সেই অভিশাপের কথা মনে ভেবে ভেবে রাজার মনে হলো দেহত্যাগ করেই তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

রাজপুত্রেরা বাইরে, রাজার মৃত্যু হলো। ছিদ্রান্বেষী শত্রুরা মনে ভাবল এই সুবর্ণ সুযোগ। রাজ্য কেড়ে নিলেই হলো। নিরুপায় অমাত্যেরা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে মামার বাড়ি থেকে ভরতকে আনালেন। তাঁরা সারাক্ষণ শোকাশ্রু গোপন রেখেছিলেন।

পিতার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনে কৈকেয়ীর পুত্র শুধু যে মাতার উপর ক্রুদ্ধ হলেন তা নয়। রাজ্যশ্রীর প্রতিও তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল।

সৈন্যসামন্ত নিয়ে রামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ভরত। বনের আশ্রমবাসীরা তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাম লক্ষ্মণ বনের যে সব গাছগুলিতে বিশ্রাম নিতেন সেই সব গাছগুলি দেখে দেখে এগিয়ে গেলেন।

চিত্রকূট বনে এসে রামকে পিতার মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করলেন ভরত। রাজসম্পদ কেউ স্পর্শ করেনি। রামকে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন তিনি।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভাই রাম রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করলেন না, তাই অগত্যা তাঁকেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু এতে বড় ভাইকে অবিবাহিত রেখে ছোট ভাই-এর পত্নীগ্রহণের অপরাধ হয়। স্বর্গতঃ পিতার আদেশ থেকে রামচন্দ্র যখন কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না তখন ভরত তাঁর পাদুকাজোড়া চেয়ে নিলেন তাঁর কাছে। সেই পাদুকা-দুটিকেই তিনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করবেন।

রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলে পাদুকা দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কিন্তু ভরত আর অযোধ্যা ফিরলেন না। নন্দীগ্রামে থেকে গচ্ছিত ধনের মত করে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ভরতের ছিল অপরিসীম ভক্তি। তাই রাজ্যভোগে ভরতের একটুও আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এইভাবে তিনি যেন মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন।

অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈদেহীকে নিয়ে শান্ত রামচন্দ্র সামান্য বন্য আহারে জীবন-ধারণ করতে লাগলেন। যেন যুবক বয়সের বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত গ্রহণ করেছেন।

একদিন রামচন্দ্র নিজের প্রভাবে এক বিশাল গাছের ছায়াকে স্থির করে রেখে তারই নিচে সীতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। সহসা একটা কাক এসে সীতার স্তনযুগলে নখের আঁচড় কেটে দিল। স্বামীর উপভোগের বস্তুতে সে যেন দোষ দেখতে পেয়েছিল।

প্রিয়ার ডাকে জেগে উঠে রামচন্দ্র সেই কাককে লক্ষ্য করে একটা কাশের তীর নিক্ষেপ করলেন। কাকও ঘুরতে ঘুরতে একটা চোখ ফেলে দিয়ে মুক্তি পেল।

চিত্রকূটবন বেশী দূরে নয়, ভরত আবার তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য আসতে পারেন এই আশঙ্কা করে রামচন্দ্র ব্যাকুল হরিণে ভরা চিত্রকূটবন ছেড়ে চলে গেলেন। অতিথিবৎসল ঋষিদের আশ্রমে বাস করে তিনি দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন, বর্ষাকালের নক্ষত্রগুলোতে অবস্থান করে সূর্য যেমন দক্ষিণায়ণে যায়।

তাঁর সঙ্গে চলেছেন বিদেহ দেশের রাজনন্দিনী সীতা, কৈকেয়ীর নিষেধ-না-মানা গুণগ্রাহিণী অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী যেন শোভা পাচ্ছেন। অত্রিমুনির সাধ্বী স্ত্রী অনসূয়া তাঁর অঙ্গরাগ করে দিয়েছিলেন। তার পবিত্র গন্ধে আকুল ভ্রমরেরা ফুলের মধু ছেড়ে তাঁর কাছেই উড়তে লাগল।

সহসা রাহু যেমন চাঁদের পথ অবরোধ করে তেমনি করে সন্ধ্যাবেলার মেঘের মত বাদামী রঙের বিরাধ নামে এক রাক্ষস এসে রামের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অশুভ বর্ষণের প্রতিবন্ধী যেমন শ্রাবণমাস ও ভাদ্র-

মাসের মধ্যকার বৃষ্টিকে হরণ করে, তেমনি নররক্তলোলুপ সেই রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণের মধ্য থেকে সীতাকে হরণ করল।

রাম লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসকে পিষে মেরে ফেললেন। অপবিত্র গন্ধে বনস্থলী দূষিত হবে ভেবে তাকে তাঁরা মাটিতে পুঁতে ফেললেন।

তারপর ঋষি অগস্ত্যের আদেশে একদিন বিন্ধ্যপর্বত যেমন তার ক্রমবৃদ্ধি সংযত করে প্রকৃতিস্থ হয়েছিল, তেমনি সেই অগস্ত্যের আদেশে পঞ্চবটীবনে বাস করতে লাগলেন রামচন্দ্র। সেখানে কামাতুরা রাবণ-ভগিনী একদিন রামচন্দ্রের কাছে এল, গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ সর্পিনী যেন সুশীতল চন্দনতরুর আশ্রয় নিল।

সীতার সামনেই সে নিজের পরিচয় কথা বলতে লাগল রামের সঙ্গে, নারীদেহে কামাবেগের তীব্রতা স্থানকালের জ্ঞান মানে না।

বৃষস্কন্ধ রামচন্দ্র সেই কামাতুরা রাক্ষসীকে বললেন, আমার স্ত্রী আছে, তুমি আমার ছোট ভাই লক্ষ্মণের কাছে যাও।

আগে জ্যেষ্ঠ ভাই রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার জন্য তিনিও তাকে গ্রহণ করলেন না। তাই সে আবার রামচন্দ্রের কাছেই ফিরে গেল। নদীর জল যেমন দুই তীরকেই আঘাত করে। ঝঞ্ঝাবায়ু বন্ধ থাকায় শান্ত সমুদ্রের বেলাভূমি যেমন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে তেমনি সীতার মুখের হাসি কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে থাকা রাক্ষসী শূর্পনখাকে ক্ষিপ্ত করে দিল।

সে তখন সীতাকে বলল, আমাকে দেখে রাখ, এই মজা দেখার ফল তুই শীঘ্রই ভোগ করবি। তোর এই উপহাস বাঘিনীকে দেখে হরিণীর ঠাট্টার মত মনে রাখছি।

সীতা তখন ভয়ে স্বামীর কোলে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। এদিকে সীতাকে এই কথা বলার পর তার নামের মত ভয়ঙ্কর রূপটি প্রকাশ করল শূর্পনখা। প্রথমে কোকিলার মত মধুর ও তারপর শৃগালীর মত গলার স্বর শুনে লক্ষ্মণ বুঝলেন সে কোন মায়াবিনী।

তিনি তখন তাড়াতাড়ি পর্ণকুটিরে প্রবেশ করে একটি মুক্ত তরবারি এনে তাই দিয়ে রাক্ষসীর নাক কান কেটে তাঁর বিকৃত রূপটিকে আরও

বিকৃত করে দিলেন।

তখন শূর্পনখা বাঁকা বাঁকা নখ, অঙ্কুশের মত খসখসে হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো নেড়ে নেড়ে শূন্যে উঠে তাঁদের শাসাতে লাগল।

শূর্পনখা তখন দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ জনস্থানে ফিরে গিয়ে খর ও অন্যান্য রাক্ষসদের কাছে রামের অত্যাচারে রাক্ষসদের এই অদ্ভুত পরাজয়ের কথা বলল। তখন নাক কান কাটা শূর্পনখাকে সামনে রেখে রাক্ষসেরা রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অভিযানই তাদের অমঙ্গল ডেকে আনল।

গর্বিত রাক্ষসদের অস্ত্রহাতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে রামচন্দ্র ধনুকে বিজয়ের আশা রাখলেন আর সীতাকে লক্ষ্মণের হাতে রাখলেন।

একা রাম হাজার হাজার রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রাক্ষসেরা সংখ্যায় যতজন একা রামকে তারা ততজনই দেখতে লাগল। এইভাবে আপন শক্তিবলে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করলেন রাম।

শুদ্ধাচারী কাকুৎস্থ রাম রাক্ষসদের নেতা দূষণকে নিজের দোষের মতই সহ্য করতে পারলেন না। তাকে শরবর্ষণে ধরাশায়ী করলেন। খর ও ত্রিশিরাকেও বধ করলেন। তার ধনুক থেকে তীরগুলি একে একে নিক্ষিপ্ত হলেও দেখে মনে হচ্ছিল তীরগুলি যেন একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে।

দেহ ভেদ করে বাণ ছুটে গেল, তবু রক্ত পড়ল না, আগের মতই পরিষ্কার। তীক্ষ্ণ বাণগুলো ওদের তিনজনের আয়ু পান করল মাত্র, রক্ত পান করল না। বিশাল রাক্ষসবাহিনী ছিন্নভিন্ন হলো রামের বাণে। মুণ্ডহীন চঞ্চল কবন্ধ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছিল না।

রাক্ষসদের সেনাবাহিনী রামের অজস্র বাণবর্ষণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল, আর জাগল না। শকুনেরা এসে ডানা মেলে ছায়া ফেলল। রাক্ষসেরা রাঘবের অস্ত্রে নিহত হলো। একমাত্র শূর্পনখা ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না। রাবণের কাছে সে-ই তাদের দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেল।

বোনের উপর অত্যাচার, আপনজনের বধ—এইসবের ফলে রাবণের মনে হলো রাম তার দশটা মাথায় পদাঘাত করেছেন।

একটা রাক্ষসকে হরিণের রূপ ধরিয়ে পাঠিয়ে রামলক্ষ্মণকে ঠকিয়ে সে সীতাকে হরণ করল। মাঝপথে পক্ষীরাজ জটায়ু একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।

রাম লক্ষ্মণ দুজনে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে ডানা কাটা এক পাখিকে দেখতে পেলেন। দশরথের প্রীতির ঋণ শোধ করে তার প্রাণ তখন কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছে। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, এ বৃত্তান্ত তিনি মুখে বলে জানালেন। নিজের মহৎ যুদ্ধরূপ কর্মের কথা বুঝিয়ে ও শরীরের আঘাতগুলোকে দেখিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন জটায়ু।

রামলক্ষ্মণ নতুন করে পিতৃবিয়োগের শোক অনুভব করলেন। বাবার মত করে অগ্নিসংস্কার থেকে শুরু করে সমস্ত পারলৌকিক কাজ তাঁরা সম্পন্ন করলেন।

রামের হাতে প্রাণ দিয়ে এক কবন্ধ রাক্ষস শাপমুক্ত হলো। তার কথামত রামচন্দ্র সমদুঃখী বানর সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। তিনি বালীকে বধ করলেন। তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসনে ধাতুর স্থানে আদেশের মত সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রাজা সুগ্রীবের আদেশে অসংখ্য বানর যেন বিপন্ন রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় জেনে সীতার অন্বেষণে চারদিক বিচরণ করতে লাগল।

জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতির দেখা পেয়ে তার মুখে সীতার বৃত্তান্ত জানতে পারল পবননন্দন হনুমান। নিরাসক্ত মানুষ যেমন সংসার পার হয় সেও তেমনি সহজেই সাগর পার হয়ে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে লঙ্কায় এসে সে সীতাকে দেখল। রাক্ষসীরা ঘিরে আছে তাঁকে। কোন মহৌষধি লতাকে যেন বিষাক্ত লতারা জড়িয়ে আছে। প্রভুর অভিজ্ঞান আংটিটি তাঁকে দিল হনুমান। সীতা শান্ত অশ্রুবর্ষণ করে সেটিকে অভ্যর্থনা জানালেন যেন।

প্রিয়তমের সব খবর দিয়ে সে শান্ত করল সীতাকে। তারপর অক্ষরাক্ষসকে বধ করল এবং শত্রুর হাতে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করার পর লঙ্কাপুরী দহন করল। এইভাবে কাজ শেষ করে সে সীতার অভিজ্ঞান-রত্ন এনে রামকে দেখাল। রামের মনে হলো সীতার হৃদয়খানিই মূর্তি ধরে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছে। বুকের মধ্যে সেই রত্নটিকে চেপে ধরতে চোখ বন্ধ হয়ে এল তাঁর। রাম বুঝি প্রিয়াকে আলিঙ্গন করার সুখই অনুভব করলেন, বাকি শুধু স্তনস্পর্শের সুখ।

প্রেয়সীর আদ্যোপান্ত সব ঘটনা শুনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রাম। লঙ্কার চারদিকের বিশাল সমুদ্রও সামান্য পরিখার মত মনে হলো তাঁর।

রাম এবার শত্রুবিনাশ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শুধু ভূতলে নয়, আকাশ পথেও অসংখ্য বানরসৈন্য দুর্গম পথে অনুসরণ করল তাঁকে। সমুদ্রের তীরে অসামান্য বিভীষণ এসে তাঁর শরণ নিলেন। রাক্ষস রাজলক্ষ্মীই তাঁকে যেন সুমতি দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

রাক্ষসরাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁকে দেবেন—রামচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি দিলেন বিভীষণকে। নীতিসমূহকে যথাসময়ে প্রয়োগ করলে তবেই তার সুফল পাওয়া যায়।

লবণাক্ত সমুদ্রের উপর বানরদের সাহায্যে এক সেতু নির্মাণ করলেন রাম। দেখে মনে হলো নারায়ণকে শুতে দিয়ে শেষনাগ যেন পাতাল ছেড়ে উঠে এসেছে। সেই পথে সাগর পার হয়ে তিনি লঙ্কায় অবরোধ সৃষ্টি করলেন। সোনালী রঙের বানরেরা তার চারদিক ঘিরে আছে, যেন স্বর্ণলঙ্কার দ্বিতীয় স্বর্ণপ্রাচীর।

বানরসৈন্য আর রাক্ষসবাহিনীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দিকে দিকে শুধু রামের অথবা রাবনের জয়ধ্বনির ঘোষণা ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের আঘাতে লোহাতে বাঁধা কাঠের বড় বড় গুঁড়ি ভেঙ্গে গেল। পাথরের আঘাতে লোহার গদাসমূহ পিষে গেল। নখের আঁচড়ে তুচ্ছ হয়ে গেল শস্ত্রের আঘাত। বড় বড় পাথরের আঘাতে বড় বড় হাতিরাও

মারা যেতে লাগল।

এদিকে রামের ছিন্নভিন্ন মুণ্ড দেখে সীতা একদিন জ্ঞান হারালেন। এটা রাবণের মায়া, রাম নিহত হননি একথা তাঁকে বুঝিয়ে ত্রিজটা রাক্ষসী শান্ত করল সীতাকে। আমার স্বামী নিশ্চয় বেঁচে আছেন এই ভেবে তিনি শোক ভুললেন ঠিক, কিন্তু তাঁর মৃত্যু জেনেও তিনি যে বেঁচে-ছিলেন একথা ভেবে লজ্জা পেলেন তিনি।

রামলক্ষ্মণের নাগপাশবন্ধন গরুড় এসে খুলে দিল। মেঘনাদের হাতে তাঁদের এই কষ্ট ও লাঞ্ছনা সামান্য দুঃস্বপ্নের মত হয়ে রইল।

তারপর একদিন রাবণ শক্তিশেল হানল লক্ষ্মণের বুকে। লক্ষ্মণ হতচেতন হয়ে পড়লেন। সে শেল রামকে আঘাত না করলেও শোকের তীরে হৃদয় বিদীর্ণ হলো তাঁর।

অবশেষে হনুমানের আনা মহৌষধি বিশল্যকরণী প্রয়োগে সুস্থ হয়ে উঠলেন লক্ষ্মণ। পরে তিনি শরবর্ষণ করে করে বহু রাক্ষস নিহত করলেন। তাদের স্ত্রীরা শোকে বিলাপ করতে লাগল।

শরৎকাল যেমন মেঘের তর্জন গর্জনকে স্তব্ধ করে, বর্ষার ইন্দ্রধনুকে বিলোপ করে, লক্ষ্মণ তেমনি মেঘনাদের তর্জন গর্জন এবং তার শক্তিশালী ধনুক দুটিই থামিয়ে দিলেন।

সুগ্রীবের হাতে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের দশা তার বোনের মতই হলো। পাষাণভেদী অস্ত্রের আঘাতে গা বেয়ে লাল মনঃশিলা গড়িয়ে পড়া পাহাড়ের মত রক্তাক্ত দেহে সে রামের পথের উপর দাঁড়াল।

আহা! তুমি ঘুমোতে ভালবাস, শুধু শুধু তোমার ভাই তোমাকে অসময়ে জাগিয়ে দিয়েছে, এই বলেই যেন রামের শরজাল তাকে চিরকালের মত ঘুম পাড়িয়ে দিল। বানরদের উপর রাক্ষসরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদেরই রক্তস্রোতে যুদ্ধের ধূলিরাশির মত তারা ভেসে যেতে লাগল।

তারপর আজ পৃথিবীতে হয় রাম থাকবে না হয় রাবণ থাকবে এই বলে রাবণ আবার যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এল প্রাসাদ থেকে।

ইন্দ্র দেখলেন রাম পদাতিক হয়ে রয়েছে, আর লঙ্কেশ্বর রথারোহী। তিনি রামকে কপিলবর্ণের অশ্ববাহিত নিজের রথখানি পাঠিয়ে দিলেন।

আকাশগঙ্গার তরঙ্গবাতাসে সেই রথের ধ্বজা কাঁপছিল। দেবসারথির হাতে ভর দিয়ে সেই জয়শীল রথে আরোহণ করলেন রামচন্দ্র। মাতলি তাঁকে দেবরাজের দেওয়া দেহবর্ম পরিয়ে দিলেন। সেই বর্মের উপর রাক্ষসদের আঘাত পদ্মপাপড়ির মতই ব্যর্থ হলো।

বহুদিন পর পরস্পরের দেখা পেয়ে রাম ও রাবণ আপন আপন পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ পেলেন। এতদিনে যেন সার্থক হলো রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণ একা, আগের মত কোন সঙ্গীসাথী ছিল না। তবু তার ছিল অনেক হাত, অনেক মাথা, অনেক পা ও উরু। মনে হলো রাবণের গোটা মাতৃকুল অর্থাৎ রাক্ষসবংশই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

রাবণ দিকপালগণকে জয় করেছে, নিজেব মুণ্ডগুলো দিয়ে সে পরমেশ্বর শিবকে অর্চনা করেছিল। সে কৈলাস পর্বতকে একদিন উপড়ে ফেলেছিল। তাই রাবণের মত একজন শত্রু পেয়ে খুশি হলেন রাম।

ভীষণ রাগে রামের দক্ষিণ বাহুতে তীরবিদ্ধ করলেন। সীতার সঙ্গে মিলনের লক্ষণ জাগিয়ে সে বাহুতে তখন স্পন্দন জেগেছিল। রামের নিক্ষিপ্ত বানও রাবণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে তীব্র বেগে মাটির নীচে চলে গেল। যেন পাতালে নাগকুলকে রাবণবধের সুসংবাদ দেবে সে বাণ।

কথার উত্তর তাঁরা কথায় দিলেন, অস্ত্রের জবাব অস্ত্রাঘাতে দিলেন। তর্কযুদ্ধের বাগ্মীর মত তাঁদের জয়লাভের জেদ বেড়েই চলল। দুজনের বিক্রম সমান। যুদ্ধরত সমশক্তিধর দুই মত্তমাতঙ্গের মধ্যবর্তী বেদীর মত বিজয়লক্ষ্মী দুজনের মাঝখানে সমানভাবে রইলেন। কোন একজনের পক্ষে যেতে পারলেন না।

আঘাত এবং প্রত্যাঘাতে খুশি হয়ে দেবতারা এবং অসুরেরা তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি শরাঘাত পরস্পরকে মস্তক স্পর্শ করতে বাধা দিল।

অবশেষে রাক্ষসরাজ রাবণ কৃতান্ত বা যমের বিনয়লব্ধ কূটশাল্মলী অর্থাৎ কাঁটাগাছের মত কন্টকময় গলার মত লোহার কাঁটাবেঁধানো

শতঘ্নী গদাটিকে শত্রুকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু রথের কাছে আসার আগেই অর্ধচন্দ্রের ফলা দেওয়া বাণে রামচন্দ্র তাকে কলা গাছের মত কেটে কুচিকুচি করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসদের সব আশাও ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রাম প্রিয়াবিচ্ছেদের শোকশল্য উদ্ধারের অমোঘ ওষুধ ব্রহ্মাস্ত্রটি এবার রাবণকে লক্ষ্য করে ধনুকে যোজনা করলেন। সেই অস্ত্র শতধা বিভক্ত হয়ে জ্বলন্ত মুখ নিয়ে আকাশে শোভা পেল। মনে হলো তা যেন বিশাল অনন্তনাগের ভয়ঙ্কর ফলামণ্ডলযুক্ত শরীর।

তিনি সেই মন্ত্রপূতঃ অস্ত্রে অর্ধনিমেষের মধ্যেই রাবণের মুখখানা মাটিতে লুটিয়ে দিলেন। আঘাতের যন্ত্রণাটুকু বোঝাবারও সময় দিলেন না। জলের চঞ্চল তরঙ্গে বাল সূর্যের প্রতিবিম্বের মত রাক্ষসের শরীর থেকে পরপর ছিন্ন মুণ্ডের তরঙ্গ দেখা গেল।

তার ছিন্ন মুণ্ডগুলো মাটিতে পড়ে আছে দেখেও দেবতাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না, ভয় হচ্ছিল, হয়ত বা আবার সেগুলি তার দেহের সঙ্গে জুড়ে যায়। আসন্ন অভিষেকে যা রত্নে শোভিত হবে রাবণারি রামের সেই মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন দেবতারা। ভ্রমর পংক্তি দিগ্‌গজদের মদধারাস্রাবী গণ্ডমণ্ডল ত্যাগ করে এই সুগন্ধি পুষ্পরাশির অনুসরণ করল।

দেবকার্য সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে শরাসন গুটিয়ে নিলেন রামচন্দ্র। ইন্দ্রের সারথি মাতলি তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এক হাজার অশ্বের রথটি নিয়ে উর্ধ্বলোকে চলে গেলেন। রথের মত পতাকায় তখনো রাবণের নামাঙ্কিত শরজাল বিদ্ধ হয়ে ছিল।

রঘুপতি রাম অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে গ্রহণ করলেন। প্রিয় বন্ধু বিভীষণের হাতে রাবণের রাজ্যশ্রী অর্পণ করলেন। বাহুবলে জয় করে নেওয়া রত্নবিমান বা পুষ্পকরথে আরোহণ করে নগরীর দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে রইলেন সূর্যপত্র সুগ্রীব, বিভীষণ এবং লক্ষ্মণ।

ত্রয়োদশ সর্গ

তারপর গুণজ্ঞ 'রাম' নামে মুখরিত হরিশব্দগুণাত্মক আকাশে যাত্রাকালে বিমান হতে সমুদ্র দেখে রামচন্দ্র জায়া সীতাকে বললেন, হে বৈদেহী, শরৎকালের রাত্রিতে ছায়াপথে বিভক্ত দ্বিধাবিভক্ত রমণীয় তারকাখচিত সুনির্মল আকাশের মত আমার সেতুতে দ্বিধাবিভক্ত মলয়পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ফেনিল জলরাশি দেখ।

যজ্ঞাভিলাষী গুরুর যজ্ঞীয় অশ্বটি কপিল মুনি রসাতলে রাখলে তার জন্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সমুদ্রকে বর্ধিত করে আরও।

সূর্যের কিরণমালা এই সমুদ্র থেকেই জল আকর্ষণ করে গর্ভ ধারণ করে, এখানে রত্নরাজি বর্ধিত হয়। এই সমুদ্রই বাড়বানল বহন করে। এই সমুদ্র থেকেই সেই আনন্দদায়ক জ্যোতিসম্পন্ন চন্দ্রের জন্ম হয়।

মহিমায় সর্বব্যাপী বিষ্ণুর মত অক্ষোভ্যাদি নানা অবস্থাপন্ন এবং বিশালতায় দশদিকব্যাপী অবস্থিত এই মহাসমুদ্রের রূপ প্রকারগত ও পরিমাণগতভাবে বোঝা যায় না।

বিষ্ণু সমস্ত লোক সংহার করে নিজের নাভিজাত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আদি বিধাতা পুরুষের দ্বারা স্তুত হয়ে কল্পান্তকালোচিত যোগনিদ্রায় এই সমুদ্রেই শয়ন করেন।

শত্রুভয়ে ভীত হয়ে রাজারা যেমন মধ্যবর্তী ধর্মপরায়ণ কোন রাজাকে আশ্রয় করেন, তেমনি পক্ষচ্ছেদক ইন্দ্রের ভয়ে শত শত পর্বতশরণ্য এই সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে।

যখন আদিপুরুষ বরাহরূপে রসাতল থেকে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেন, তখন এই সমুদ্রের প্রলয়প্লাবনপুষ্ট জলরাশি ক্ষণকালের জন্য বসুন্ধরার অবগুণ্ঠন হয়েছিল।

এই সমুদ্রের প্রিয়াসম্ভোগ অনন্যসাধারণ। তরঙ্গরূপ অধরপ্রদানে দক্ষ এই সমুদ্র মুখার্পণে স্বভাবপ্রগলভা তটিনীদের অধরসুধা পান করায় এবং নিজে পান করে।

ঐ দেখ, তিমিরা হাঁ করে নদীমোহানার প্রাণীসুদ্ধ জল মুখে নিয়ে মুখ বন্ধ করে মাথার ছিদ্র দিয়ে সেই জল বার করে দিচ্ছে।

দেখ, হাতির মত জলজন্তুরা হঠাৎ মাথা তোলায় সমুদ্রের ফেনরাশি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এই ফেনরাশি এদের গণ্ডলগ্ন হয়ে ক্ষণকালের জন্য কর্ণলগ্ন চামরের মত মনে হচ্ছে।

সাপেরা সৈকতবায়ু সেবনের জন্য ছুটে যাচ্ছে। এতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে তাদের দেহের কোন তফাৎই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল তাদের ফণায় স্থিত মণিগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করাতে তাদের সাপ বলে চেনা যাচ্ছে।

শঙ্খগুলি তরঙ্গের বেগে তোমার অধরতুল্য প্রবালে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তাদের মুখে প্রবালের অঙ্কুর বিঁধে যাচ্ছে, তারা অতি কষ্টে বেরিয়ে আসছে।

মেঘেরা জলপানে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। তাতে নিশ্চিত মনে হচ্ছে, মন্দার পর্বত দিয়ে আবার সমুদ্র মন্থন করা হচ্ছে।

তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ লোহার চাকার মত সমুদ্রের বেলাভূমি সূক্ষ্মরেখার মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে লোহার চাকার পরিধি-রেখায় মালিন্য লেগেছে অর্থাৎ মরচে ধরেছে।

হে আয়তনয়না, তটবায়ু কেয়াফুলের বেনুতে তোমার মুখের প্রসাধন সম্পাদন করছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে তোমার বিম্বাধরে সতৃষ্ণ আমি প্রসাধনের সময়টুকুও দিতে পারছি না।

বিমানযোগে আমরা মুহূর্তে সমুদ্রতীরে উপনীত হলাম। দেখ, তীরে ঝিনুকের মুখের জোড় খুলে যাচ্ছে আর তা থেকে মুক্তো ছড়িয়ে পড়ছে। সুপারিগাছের সারি ফলভারে নুয়ে পড়ছে।

হে করভোরু, হে মৃগাক্ষী, একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমরা সমুদ্র থেকে যতই দূরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সকানন ভূমিও যেন ততই সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। এর আগে তা যেন সমুদ্রের অঙ্গেই লীন হয়ে ছিল।

দেখ, এই বিমান আমার অভিলাষ অনুসরণ করে কখনো দেবতাদের পথে, কখনো মেঘমালার পথে, কখনো বা পাখিদের পথে সঞ্চরণ করছে।

সুরনদীর তরঙ্গস্পর্শে শীতল ঐরাবত-মদগন্ধি আকাশবায়ু তোমার মুখ থেকে মধ্যাহ্নজনিত ঘর্মজল দূর করছে।

হে কোপনা, তুমি কৌতূহলবশতঃ পুষ্পকরথের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেঘ স্পর্শ করছ, আর মেঘও যেন বিদ্যুৎ-বলয় তৈরী করে তোমার হাতে দ্বিতীয় অলঙ্কার হিসাবে তা পরিয়ে দিচ্ছে।

ঐ দেখ, চীরপরিহিত তাপসেরা জনস্থানকে নির্বিঘ্ন জেনে চির-পরিত্যক্ত আশ্রমে আবার নতুন করে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছে।

এই সেই বনস্থলী যেখানে তোমাকে অন্বেষণ করতে করতে মাটিতে পড়ে থাকা তোমারই একটি নূপুর দেখতে পেয়েছিলাম। তোমার চরণ-কমল থেকে স্খলিত হবার দুঃখেই যেন তা মৌন অবলম্বন করেছিল।

হে ভীরু, রাক্ষস রাবণ তোমাকে যে পথ দিয়ে হরণ করেছিল, তা মুখে বলে দিতে না পারলেও লতারাজি কৃপা করে অবনত পল্লবযুক্ত শাখা সঞ্চালনে সে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।

মৃগীরাও দর্ভাঙ্কুরে উদাসীন হয়ে চোখের পাতা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তোমার গতিপথ বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল।

ঐ দেখ, মাল্যবান পর্বতের আকাশচুম্বী শৃঙ্গ সম্মুখে আবির্ভূত হচ্ছে। সেখানে মেঘ নবজলধারা এবং আমি তোমার বিচ্ছেদজনিত অশ্রু-ধারা একই সঙ্গে বর্ষণ করেছিলাম।

সেখানে বৃষ্টিধারাতাড়িত পল্লবের গন্ধ, অর্ধপ্রস্ফুটিত কদম্ব এবং ময়ূরদের মধুর কেকাধ্বনি অসহ্যবোধ হয়েছিল তোমার বিরহে।

হে ভীরু, এই সেই স্থান যেখানে পূর্বানুভূত তোমার কম্পন এবং তার পরবর্তী আলিঙ্গন স্মরণ করে গুহায় প্রতিধ্বনিত মেঘগর্জনকে আমি অতি কষ্টে সহ্য করেছিলাম, যেখানে প্রস্ফুটিত নব কদলী ফুল ধারাসিক্ত ভূমির ধূমল বাষ্পের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিণয়কালে যজ্ঞধূমে আরক্ত তোমার নয়নের কান্তি অনুসরণ করে আমাকে পীড়িত করত।

দূরে হতে অবতীর্ণ আমার অবতরণের ক্লেশ লাঘব করতেই যেন উপান্তদেশে বেতসবনে ব্যাপ্ত ঈষৎ দৃশ্যমান চঞ্চল সারসে সমাকীর্ণ পম্পা-সরোবরের জল আমার দৃষ্টিকে পান করছে। তোমার কাছ থেকে দূরে থাকার সময় এখানে মিলিত চক্রবাকমিথুনকে আমি সতৃষ্ণনয়নে দেখতাম। ওরা দুজনে দুজনকে পদ্মকেশর উপহার দিত।

স্তনের মত মনোহর স্তবকের ভারে অবনতা নদীতটের ঐ তন্বী অশোকলতাকে তোমাকেই পেয়েছি মনে করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করতে চাইলে লক্ষ্মণ আমাকে নিষেধ করত।

ঐ গোদাবরীর সারসপঙক্তি বিমানের মধ্যে লম্বিত সুবর্ণকিঙ্কিনীর ধ্বনি শুনে সারসের ডাক মনে ভেবে আকাশে উড়ে যেন তোমাকেই প্রত্যুদগমন করছে।

তোমার কটিদেশ কোমল হলেও ঘটে করে জল দিয়ে তুমি যে বনের আমের চারাগুলো বাড়িয়ে তুলেছিলে, দীর্ঘকাল পরে সেই পঞ্চবটীবন আমাকে আনন্দিত করছে। এ বনের কৃষ্ণসার মৃগগুলি যেন উন্মুখ হয়ে তোমাকেই দেখছে।

মনে পড়ে এখানে মৃগয়া থেকে ফিরে ও গোদাবরীর কুলে তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুতে ক্লান্তি দূর করে নির্জন বেতসগৃহে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছি।

যিনি ভ্রূভঙ্গে স্বর্গের রাজা নহুষককে ইন্দ্রপথ থেকে বিচ্যুত করে-ছিলেন, যাঁর হৃদয়ে আবিল জল নির্মল হয়ে যায় সেই অগস্ত্যমুনির মর্ত্যলোকস্থিত আবাস ঐ দেখা যাচ্ছে। অনিন্দ্যকীর্তি ঐ মুনির বিমানপথস্পর্শী গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই তিন অগ্নির ঘৃতবাসিত ধূমশিখা আঘ্রাণ করে রজোমুক্ত হয়ে আমার অন্তঃকরণ লঘুভার হচ্ছে।

মালিনী, ঐ দেখ, শাতকর্ণমুনির পঞ্চাপসর নামে কেলিসরোবর। চারদিকে উপবনবেষ্টিত ঐ সরোবর মেঘের অন্তরালে ঈশৎ দৃশ্যমান চন্দ্রবিম্বের মত দেখাচ্ছে।

পুরাকালে এই মুনি মৃগদলের সঙ্গে বিচরণ করতেন এবং কুশাঙ্কুর-

মাত্র আহার করে তপস্যা করতেন। তাঁর সেই তপস্যার কঠোরতায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পাঁচটি অপ্সরার যৌবনরূপ মায়াপাশে তাঁকে আবদ্ধ করেন।

সম্প্রতি জলের অন্তর্গত প্রাসাদে অধিষ্ঠিত সেই মুনির সঙ্গীতসং মৃদঙ্গধ্বনি আকাশগামী হয়ে কিছুক্ষণ পুষ্পকরথের চূড়াগৃহকে মুখরিত করছে।

ঐ দেখ, আর একজন তপস্বী ইন্ধনযুক্ত চতুরাগ্নির মধ্যে অবস্থান করে সূর্যের দিকে কপাল রেখে তপস্যা করছেন। এই মুনির নাম সুতীক্ষ্ন হলেও ইনি শান্ত চরিত্র। ইনি তপস্যায় শঙ্কিত করে তুলেছিলেন দেবরাজকে। তাঁরই পাঠানো অপ্সরাদের ছলনাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ও মেখলার অংশ প্রদর্শন প্রভৃতি বিলাসচেষ্টা কোন বিকার সৃষ্টি করতে পারেনি এঁর মনে।

ঊর্ধ্ববাহু এই মুনি অক্ষমালারূপ বলয়যুক্ত এবং মৃগদেহ ও কুশাচ্ছাদনে অভ্যস্ত দক্ষিণবাহুটি আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই দিকেই মেলে ধরেছেন অনুকূলভাবে।

মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন বলে এই ঋষি একটু মাথা নত করে আমায় প্রণাম করলেন এবং বিমানগতিতে ক্ষণকাল যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে মুক্ত করে দৃষ্টিকে আবার সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করলেন।

যিনি দীর্ঘকাল সমিধ নিক্ষেপ করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন এবং শেষে নিজের দেহকেও আহুতি দিয়েছিলেন, ঐ সেই শরভঙ্গ নামে সাগ্নিক ঋষির পবিত্র ও শরণ্য তপোবন। বর্তমানে ঐ ঋষির অতিথি-সৎকারবৃত্তি তাঁর পুত্রতুল্য তরুরাজিতে মূর্ত হয়ে আছে। তারা ছায়া-দানে পথিকদের পথশ্রম নাশ করে এবং প্রচুর ফল দান করে।

হে বন্ধুরগাত্রী, যার গুহারূপ মুখ নির্ঝরধারায় ধ্বনি উদ্গীরণ করছে এবং শৃঙ্গকোটিতে মেঘরূপ বপ্রক্রীড়ার পঙ্ক সংলগ্ন হয়ে আছে, উদ্ধত বৃষভের মত সেই চিত্রকূট পর্বত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পর্বতের উপকণ্ঠে নির্মল ও নিশ্চল প্রবাহমণ্ডিত মন্দাকিনী মধ্যবর্তী

অবকাশের দূরত্বের জন্য সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়ে মুক্তাহারের মত শোভা পাচ্ছে পৃথিবীর কণ্ঠে।

চিত্রকূটের কাছে ঐ সুন্দর তমালতরুর সুগন্ধি পল্লব নিয়ে আমি তোমার যবাঙ্কুরের মত ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে শোভমান কর্ণভূষণ রচনা করেছিলাম।

ঐ দেখ অত্রিমুনির প্রভূতপ্রভাবমণ্ডিত সেই তপোবন। এখানকার জন্তুরা দণ্ডভয়রহিত হয়েও শান্তভাবে বিচরণ করছে এবং তরুরা পুষ্পোদগমরূপ কারণ ছাড়াই ফল প্রসব করছে। সপ্তর্ষিরা নিজের হাতে যাঁর স্বর্ণপদ্ম রচনা করেন, যিনি শিবের শিরোমালাস্বরূপ, সেই মন্দাকিনীকে অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া মুনিদের স্নানের জন্য এইখানেই প্রবাহিত করেন।

বীরাসনে উপবিষ্ট ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। তাঁদের অধ্যুষিত বেদীর তরুরাজিও বায়ুর অভাবে স্থির হয়ে যোগস্থিত মুনিদের মতই শোভা পাচ্ছে। তুমি আগে যার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছিলে শ্যাম নামে খ্যাত ঐ গাছটি ফলবান হওয়ায় পদ্মরাগের সঙ্গে মিলিত মরকতমণির মত শোভা পাচ্ছে।

হে সুন্দরী, দেখ, গঙ্গাপ্রবাহ যমুনাতরঙ্গে মিলিত হয়ে কোথাও উজ্জ্বল ইন্দ্রনীল মণিতে গাঁথা মুক্তামালার মত, কোথাও বা নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালার মত, কোথাও নীলহংসে মেশানো মানস সরোবর-প্রিয় রাজহংসের সারির মত, কোনখানে ছায়ামিশ্রিত অন্ধকারে খণ্ড খণ্ড চাঁদের কিরণের মত, কোথাও বা ফাঁক দিয়ে নীল আকাশে উঁকি দেওয়া শরতের সাদা মেঘের মত, আবার কোথাও বা কালো কালো সাপে জড়ানো শিবের ভস্মাচ্ছাদিত দেহের মত শোভা পাচ্ছে।

যাঁরা সমুদ্রপত্নী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে অবগাহন করে দেহত্যাগ করেন, সেই সব পুণ্যাত্মাদের তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই পুনর্জন্ম হতে মুক্তি হয়।

এই সেই নিষাদরাজ গুহের আশ্রম যেখানে আমি মাথার মণি ত্যাগ করে জটা ধারণ করি এবং তখন সারথি সুমন্ত্র 'হে কৈকেয়ী, তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ হলো' বলে রোদন করেছিলেন।

যাঁর স্বর্ণপদ্মের রেণু যক্ষরমণীদের স্তনে সংলগ্ন হয়ে থাকে, অব্যক্ত যেমন মহত্ত্বের কারণ, তেমনি ঋষিরা মানসসরোবরকে যাঁর উৎস বলে থাকেন, যাঁর তীরে যজ্ঞের যূপাবলী প্রোথিত আছে, যাঁর জল-প্রবাহ অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা অশ্বমেধ-যজ্ঞের পর অবভৃথস্নানের জন্য অবতরণ করে যাঁর জল আরও পবিত্র করে তুলেছেন, অযোধ্যাবাসীরা যাঁর সিকতাময় অঙ্গে অবস্থান করে পরম সুখভোগ করে, যাঁর প্রচুর জলপানে সংবর্ধিত হচ্ছে সকলে এবং আমার মতে যিনি সকলেরই ধাত্রীরূপে পরিগণিত, ঐ দেখ আমার মায়ের মত সেই সরযূ দীর্ঘদিন পর রাজাকে দূর দেশ থেকে ফিরতে দেখে আমাকে যেন বায়ু শীতলকারী তরঙ্গরূপবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছেন।

রক্তিম সন্ধ্যার মত তামাটে রঙের ধূলো মাটি থেকে উঠছে। দেখে মনে হচ্ছে হনুমানের মুখে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে ভরত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের প্রত্যুদ্‌গমন করতে আসছে।

আমি যুদ্ধে খর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করে ফিরে এলে লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছিল, প্রতিজ্ঞা পালন করে আমি ফিরে এলে তেমনি আমার হাতে সচ্চরিত্র ভরত সংরক্ষিত ও অনুচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যর্পণ করবে।

ঐ দেখ, ছিন্নবাসপরিহিত ভরত পিছনে সৈন্যদের রেখে কুলগুরুকে সামনে নিয়ে বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে অর্ঘ্য হাতে আমার কাছে আসছে। যুবক হয়েও সে অঙ্কগত রাজলক্ষ্মীকে আমারই অপেক্ষায় উপভোগ না করে এত বছর ধরে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যেন অতি কঠোর অসিধার ব্রত অর্থাৎ যে ব্রতে শয্যায় অসি স্থাপন করে স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে অবস্থান করে সেই ব্রত পালন করছে।

রাম এই সব কথা বললে বিমানটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নির্দেশে তাঁর ইচ্ছা জানতে পেরে আকাশ থেকে নেমে এল। ভরতের অনুগামী প্রজারা সবিস্ময়ে তা লক্ষ্য করছিল।

রাম সেবানিপুণ সুগ্রীবের হাত ধরে মাটিতে স্ফটিকরচিত সোপান-পথে বিমান থেকে নেমে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিভীষণ সেই সোপান-

পথ দেখিয়ে দিলেন।

ভক্তিনম্র রাম প্রথমেই ইক্ষ্বাকুকুলগুরুকে প্রণাম করলেন। পরে অর্ঘ্য গ্রহণ করে আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে ভাই ভরতকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর প্রতি ভক্তিভাববশতঃ রাজ্যাভিষেকে পরাঙ্মুখ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করলেন।

বৃদ্ধ অমাত্যেরা রামকে প্রণাম জানালেন। শ্মশ্রুবৃদ্ধিতে তাঁদের মুখ বিকৃত হয়েছিল। এ অবস্থায় ঝুরিনামা জটাধারী বটগাছের মত দেখাচ্ছিল তাঁদের। রাম অনুকূল দৃষ্টি দিয়ে কুশলপ্রশ্ন ও মধুর সম্ভাষণে তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ভল্লুক ও বানরদের অধিপতি সুগ্রীব আমার দুঃসময়ের বন্ধু। আর ইনি আমার সংগ্রামে অনুগামী পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণ—রাম এইভাবে সাদরে তাঁদের পরিচয় দিলে ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম করে এঁদের দুজনকে বন্দনা করলেন। তারপর তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করলে তাঁকে উঠিয়ে মেঘনাদের প্রহারজনিত ব্রণকর্কশ বক্ষটিতে নিজের বক্ষ রেখে যেন নিজের ক্রীড়া দিয়েই আলিঙ্গন করলেন।

বানর সেনাপতিরা রামের আদেশে মানুষের দেহধারণ করে হাতির পিঠে উঠল। অজস্র ধারায় মদজলবর্ষী সেই সব গজরাজদের পিঠে উঠে পর্বতচূড়ার সুখ অনুভব করল।

রাক্ষসরাজ বিভীষণও রামের আদেশে রথে উঠলেন। তাঁর রথটি বিশেষ মায়ায় রচিত হলেও রচনাচাতুর্যে তা রামের রথের সাদৃশ্যলাভে সমর্থ হলো না।

তারপর রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পতাকাশোভিত ইচ্ছাগতি রথে আবার আরোহণ করলেন। মনে হলো বুধ ও বৃহস্পতির সঙ্গে বিশেষ যোগে দর্শনীয় চন্দ্রমা চঞ্চল বিদ্যুৎমণ্ডিত সান্ধ্য মেঘমালায় আরোহণ করলেন।

প্রলয়কালে ভগবান হরি যেমন পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, শরৎকাল যেমন গাঢ় মেঘাবরণ থেকে চাঁদের কিরণকে উদ্ধার করে, রাম রাবণরূপ

সংকট থেকে যাঁকে উদ্ধার করেন ভরত সেই ধৈর্যবতী সীতাকে প্রণাম করলেন। যিনি রাবণের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের পাতিব্রাত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, সেই সীতার বন্দনীয় চরণযুগল এবং ভরতের জ্যেষ্ঠের অনুবর্তনবশতঃ জটামণ্ডিত মস্তক একত্র মিলিত হয়ে যেন পরস্পরের পতিব্রতার পোষক হলো।

তারপর আর্য রামচন্দ্র প্রজাদের আগে রেখে পুষ্পকরথের গতি শিথিল করে আধক্রোশ পথ অতিক্রম করে অযোধ্যার উপবনে শত্রুঘ্ন-রচিত পটমণ্ডপে অবস্থান করতে লাগলেন।

চতুর্দশ সর্গ

সেখানে রাম দেখলেন, বড় গাছ ভেঙ্গে পড়লে তাকে জড়িয়ে থাকা লতার মত দুই জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার বড় শোচনীয় দশা হয়েছে।

যাঁরা শত্রুনিধন করে পরাক্রমের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, সেই দুজনে দুই জননীকে প্রণাম করলেন। মায়েরা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন। ভাল দেখতে পেলেন না। ছেলেব গায়ে হাত বুলিয়ে স্পর্শসুখে বুঝতে পারলেন কোনটা কে। হিমালয়ের নির্ঝর যেমন গঙ্গা-সরযূর গ্রীষ্মতপ্ত জলকে ভাসিয়ে দেয় তেমনি তাঁদের শান্ত আনন্দাশ্রু উষ্ণ শোকাশ্রুকে ধুয়ে দিল।

তাঁরা দুই ছেলের গায়ের যুদ্ধজনিত ক্ষতচিহ্নগুলোতে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। মনে হলো সেই ক্ষতগুলো এখনো রক্তে ভিজে আছে। ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গনাদের 'বীরপ্রসবিনী' নামেও তাঁদের আর কোন আগ্রহ নেই।

'আমি সীতা, বড় অলক্ষণে স্বামীকে কত কষ্ট দিয়েছি'—এই কথা বলতে বলতে বধূ সীতা এগিয়ে এসে স্বর্গত শ্বশুরের দুই মহিষীকে সমান ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করলেন।

'বাছা ওঠ, তোমার পবিত্র চরিত্রের জোরেই ত রামচন্দ্র ভাই-এর সঙ্গে থেকে এই বিরাট যুদ্ধ জয় করতে পেরেছে।' তাঁরা আদরিণী বধূকে এইভাবে প্রিয় অথচ সত্য কথা বললেন।

এরপর রঘুকুলের ধ্বজাস্বরূপ রামচন্দ্রের অভিষেক শুরু হলো। প্রথমে জননীর আনন্দাশ্রু বর্ষণে যে অনুষ্ঠান শুরু হলো, বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে আনা সোনার কলসের জলসিঞ্চনে সে অনুষ্ঠান বৃদ্ধ অমাত্যেরা শেষ করলেন।

রাক্ষস এবং বানরবৃন্দ বিভিন্ন নদীতে সমুদ্রে ও সরোবরে গিয়ে জল এনে দিয়েছে। সেই জলরাশি জয়দীপ্ত রামের মাথায় ঝরতে লাগল। মনে হলো বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় মেঘের বর্ষণ যেন শুরু হয়েছে।

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণে তাঁকে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল, আজ রাজবেশের সাজসজ্জাতে সেই শোভা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

রামচন্দ্র এবার তাঁদের রাজবংশের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ছিল কুলক্রমাগত অমাত্যেরা, অনুগত রাক্ষস ও বানরেরা, ছিল রাজ্যের সেনাদল আর তূর্যধ্বনিতে মাতোয়ারা পুরবাসীরা। উচ্চ তোরণে সজ্জিত ছিল রাজধানী। প্রাসাদগবাক্ষ হতে পুরনারীরা লাজবর্ষণ করছিল।

রামচন্দ্র রথের উপর বসে আছেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে চামর দোলাচ্ছেন, ভরত রাজছত্রটি ধরে আছেন। মনে হলো সাম, দান, ভেদ, দণ্ড -এই উপায়চতুষ্টয়ের সমষ্টি রথ বুঝি অযোধ্যায় প্রবেশ করেছে আজ।

প্রাসাদের কৃষ্ণাগুরুর ধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছিল বাতাসে। মনে হলো বনবাস থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীর বিরহকালীন বেণীটি খুলে দিচ্ছেন নিজের হাতে।

শাশুড়ীরা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন বধূ সীতাকে, তিনি কর্ণীরথ অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পালকিজাতীয় এক ছোট রথে করে চলেছেন। প্রাসাদের প্রতিটি গবাক্ষে দেখা গেল অযোধ্যার রমণীরা প্রণাম জানাচ্ছেন তাঁকে। অনসূয়ার দ্বারা প্রসাধিত অক্ষয় অঙ্গরাগে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী সীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর স্বামী যেন অযোধ্যাবাসীকে দেখাচ্ছেন তিনি বিশুদ্ধা, তিনি যেন আগুনের মাঝে

দাঁড়িয়ে আছেন।

বন্ধুবৎসল রামচন্দ্র বন্ধুদের জন্য বিশ্রামগৃহ এবং সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সজল চোখে পিতার গৃহে প্রবেশ করলেন। পিতা নেই। আছে শুধু তাঁর একখানি প্রতিকৃতি আর পূজার চিহ্ন একটি ফুলমালা।

সেখানে তিনি ভরতজননীর লজ্জা দূর করে দিলেন। তিনি বললেন, মা, পিতৃদেব যে সত্যভ্রষ্ট হননি এবং স্বর্গে গমন করেছেন, ভেবে দেখ, সে তোমারই সুকৃতি।

ইচ্ছা করামাত্রই সব কিছু হাতে পাওয়ার বিদ্যা ওঁদের জানা ছিল। তবু রামচন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্যদের নানাভাবে সংগৃহীত বস্তুতে এমনই পরিচর্যা করলেন যে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে।

তাঁকে যাঁরা অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন সেই দিব্য মুনিদেরও তিনি অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের দ্বারা নিহত রাবণের সারা জীবনের কীর্তিকাহিনী শুনলেন। এতে তাঁর বীরত্বের গৌরব সূচিত হলো।

মুনিরা চলে যাবার পর সুখে স্বচ্ছন্দে দেখতে দেখতে পনের দিন কেটে গেল। সীতা নিজের হাতে রাক্ষসরাজ ও বানরাধিপতিদের অনেক সেবাযত্ন করেছেন। এবার তাদের বিদায় জানালেন রামচন্দ্র।

যে বিমান মনে মনে স্মরণ করামাত্র এসে উপস্থিত হয়, রাক্ষস-রাজ রাবণের জীবনের সঙ্গে যে বিমানটিকে জয় করে নেন, স্বর্গের পুষ্পাভরণস্বরূপ সেই পুষ্পকরথটিকে রাম আবার কৈলাসপতি কুবেরকে বহন করার জন্য অনুমতি দিলেন।

এইভাবে পিতার আদেশমত বনবাসদুঃখকে অতিক্রম করে রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল সমান। তিন ভাইয়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারও ছিল একরকম।

দেবসেনাপতি কার্তিক যেমন ছয় মুখে স্তন্য পান করে কৃত্তিকাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেন, তেমনি সব মায়ের প্রতি সমান ভক্তি প্রদর্শন করতেন ভক্তিবৎসল রামচন্দ্র।

তাঁর নির্লোভ ব্যবস্থায় ও সুশাসনে রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল। তিনি সমস্ত বিঘ্নভয় দূর করে দিলেন। রাজ্যে সৎকর্ম

অনুষ্ঠিত হলো। তিনি লোকশিক্ষার সুব্যবস্থা করলেন। সারা রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের তিনি যেন পিতা। তিনিই পুত্ররূপে সকলের সব শোক দূর করলেন।

তিনি যথাসময়ে রাজকার্য পরিচালনা করে বিদেহ রাজনন্দিনীর সঙ্গসুখ উপভোগ করতেন। লক্ষ্মীদেবী নিজেই যেন তাঁকে পাবার আগ্রহে সীতার সুন্দর দেহটিকে আশ্রয় করে মিলিত হতেন তাঁর সঙ্গে।

রাম-সীতা বাসনামত ভোগ্যবস্তু সবই পেয়েছিলেন। চিত্রশালায় এসে ছবি দেখে দণ্ডকারণ্যে পাওয়া সব দুঃখকেও আজ চিন্তা করতে গিয়ে সুখের বলেই মনে হলো।

ধীরে ধীরে সীতার চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হলো আরও। মুখখানি শরযষ্টির মতো ম্লান, মুখে বলতে হলো না। তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে জেনে স্বামী আনন্দিত হলেন। তাঁর দেহটি ক্ষীণ, স্তনাগ্রে অন্য বর্ণ, অঙ্কশায়িনী লজ্জাবতী স্ত্রীর কাছে স্বামী গোপনে তাঁর মনের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন।

সীতা ভাগীরথী নদীর তীরে কুশঘাসে ছাওয়া তপোবনগুলিতে আর একবার যেতে চাইলেন। সেখানে হিংস্র প্রাণীরা নীবার ধানের মুঠো চিবোয় আর বৈখানস কন্যারা হাত ধরাধরি করে বেড়ায়।

রঘুবীর রাম তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর ইচ্ছাপূরণ হবে। তারপর আনন্দকোলাহলপূর্ণ অযোধ্যা নগরীকে দেখার জন্য একজন অনুচরকে নিয়ে আকাশছোঁয়া প্রাসাদশীর্ষে উঠলেন।

রাজপথ, দোকানপাট সরগরম, কত লোকে নৌকোবিহার করছে সরযূ নদীতে, নগরের উপকন্ঠে উপবনে উৎসবে রত আছে কত বিলাসী লোক —দেখেশুনে বড় ভাল লাগল তাঁর।

শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সচ্চরিত্র সর্পরাজের মত দীর্ঘবাহুসমন্বিত মহাশত্রু-জয়ী রাম ভদ্র নামে এক অনুচরকে ডেকে লোকে তাঁর সম্বন্ধে কি বলছে না বলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন।

বারে বারে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, মহারাজ, রাক্ষসভবনে বাস করার পরেও আপনি রাণীকে গ্রহণ করেছেন—এই একটি বিষয় ছাড়া

আপনার অন্য সব রাজকার্যের প্রশংসা করছে পুরবাসীরা।

স্ত্রী সম্পর্কে অপযশমূলক এই ঘোর নিন্দার আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল জানকীবল্লভের হৃদয়। তপ্ত লোহার উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল।

নিজের এই নিন্দাবাদকে অগ্রাহ্য করব, না নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করব?—এই দুই মতের একটিও গ্রহণ করতে না পেরে তিনি মনে মনে চঞ্চল দোলার মত অস্থির হয়ে পড়লেন।

কোনদিনই এই অপবাদ বন্ধ হবে না, একথা বুঝে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দোষস্খালন করতে চাইলেন, সমস্ত নিন্দাবাদ বন্ধ করতেও চাইলেন। কারণ যশস্বী মানুষের কাছে ভোগ্যবস্তুর কথা দূরে থাক, নিজের শরীরের চেয়েও যশই বেশী কাম্য।

রাম ভগ্নহৃদয়ে অনুজদের ডেকে আনলেন, তাঁর এই বিকার দেখে তাঁরাও নিরানন্দ হয়ে উঠলেন। তিনি নিজের নিন্দার কথা তাঁদের জানালেন। তারপর বললেন, সূর্যসম্ভূত সদাচারে পবিত্র রাজর্ষিবংশেও আমার জন্য কিরকম কলঙ্ক দেখা দিল। জলাসিক্ত বাতাসে যেমন স্বচ্ছ দর্পণেও মালিন্য দেখা যায় তেমনি।

হাতি যেমন তার বন্ধনস্তম্ভকে সহ্য করতে পারে না, আমিও পুরবাসীদের মধ্যে ক্রমশঃ জলের ঢেউয়ে তৈলবিন্দুর মত ছড়িয়ে পড়া এই নিন্দা মেনে নিতে পারছি না।

একদিন যেমন পিতার আদেশে সসাগরা পৃথিবীকে ত্যাগ করেছিলাম আজ তেমনি এই অপযশ দূর করার জন্য আমি জানকীকে ত্যাগ করব। তার প্রসবসময় আসন্ন, তবু আমি আর অপেক্ষা করব না।

আমি জানি তার কোন দোষ নেই। কিন্তু আমার চোখে লোকনিন্দার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নিষ্কলঙ্ক চাঁদে পৃথিবীর ছায়াকেও মানুষে তার মালিন্য বা কলঙ্ক বলে আরোপ করে।

এতে কিন্তু রাক্ষসবধের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না। সে ত শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। কেউ পদাঘাত করলে ক্রুদ্ধ সর্প কি তার রক্তপান করার জন্য দংশন করে? তাই, তোমরা যদি চাও যে আমি এই নিন্দার কাঁটা নির্মূল করে প্রাণে বেঁচে থাকি তাহলে করুণাসিক্ত মন নিয়ে

তোমরা আমাকে এই পরিত্যাগ কাজে বাধা দিও না।

তিনি জানকীর প্রতি তাঁর নিতান্ত নিষ্ঠুর এই সিদ্ধান্তের কথা বললে ভাইদের মধ্যে কেউ তাঁকে নিষেধও করতে পারলেন না, অনুমোদনও করতে পারলেন না।

ত্রিলোকবিশ্রুত, সত্যভাষী, আদেশ পালনে প্রস্তুত লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র বললেন, 'সৌম্য!' তারপর তাঁকে আলাদা করে ডেকে আদেশ করলেন, তোমার ভ্রাতৃবধূ আসন্নপ্রসবা, তাঁর তপোবন দেখার বড় সাধ। তুমি সেই অজুহাতে তাঁকে বাল্মীকির আশ্রমে রথে করে গিয়ে সেখানেই ত্যাগ করে আসবে।

লক্ষ্মণ শুনেছিলেন পিতার আদেশে পরশুরাম নিষ্ঠুরভাবে মাতাকে হত্যা করেছিলেন, তিনিও তাই অগ্রজের আদেশ গ্রহণ করলেন। কারণ গুরুজনের আদেশের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে নেই।

তারপর মনোমত ব্যবস্থা শুনে আনন্দিত সীতাকে গর্ভিনী-বহনের উপযুক্ত ঘোড়ায় টানা রথে বসিয়ে সুমন্ত্রকে সারথি করে লক্ষ্মণ প্রস্থান করলেন।

পথে যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর প্রদেশ দেখে সীতার খুব আনন্দ হলো। মনে ভাবলেন, সত্যি, আমি যা ভালবাসি আমার প্রিয় তাই করেন। কিন্তু তখনো তিনি জানতেন না, তাঁর পক্ষে রাম আর কল্পতরু নেই, হয়ে উঠেছেন ইক্ষতরু।

অনেকক্ষণ স্বামীকে দেখেননি, তাঁর ডানচোখ কাঁপছিল। লক্ষ্মণ তাঁর কাছে যে কথা গোপন রেখেছিলেন মাঝপথে সেই ভয়ংকর দুঃখজনক কথা কে যেন তাঁকে বলে দিল। এই দুর্লক্ষণের মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল তাঁর মুখকমল। তিনি মনে মনে কামনা করলেন রাজা এবং তাঁর অনুজদের কল্যাণ হোক।

গুরুজনের আদেশে সৌমিত্রী রাজবধূকে বনপ্রান্তে ফেলে আসতে চলেছেন। সামনে উত্তালতরঙ্গময় গঙ্গানদী হাত তুলে তাঁকে যেন নিষেধ করছেন। সারথি রথের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, তিনি ভ্রাতৃবধূকে তীরে অবতরণ করালেন। সত্যলব্ধ কঠোর প্রতিজ্ঞা উত্তরণের মত

নিষাদের আনা নৌকোয় গঙ্গানদী পার হলেন।

লক্ষ্মণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কোনমতে কথাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে রাজার আদেশ উচ্চারণ করলেন, মেঘ যেন সৃষ্টিধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ করল।

এই ভয়ঙ্কর কথার আঘাতে সীতা জননী ধরিত্রীর উপরে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খসে পড়ল গা হতে। ঝঞ্ঝাতাড়িত লতা যেন চারদিকে ফুল ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করে তোমার শুদ্ধচরিত্রের স্বামী অকারণে কেন তোমাকে ত্যাগ করবেন—মা ধরিত্রী যেন এই সংশয়বশতঃই তাঁর অন্তরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

জ্ঞান হারিয়ে সীতা কোন দুঃখ অনুভব করতে পারেননি, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁর অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল। সুমিত্রাতনয়ের যত্নে পাওয়া এই জ্ঞান তাঁর কাছে মূর্ছার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর হয়েছিল।

তবু আর্যপত্নী সীতা স্বামীকে নিন্দা করলেন না, যদিও বিনা দোষে তিনি তাকে ত্যাগ করেছেন। চিরদুঃখিনী শুধু নিজের দুর্ভাগ্যকেই বারবার দোষ দিতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ তাঁকে শান্ত করলেন। বাল্মীকির আশ্রমে যাবার পথও বলে দিলেন। তারপর তাঁকে প্রণাম করে বললেন, দেবী, আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছি, ক্ষমা করুন।

সীতা তাঁকে উঠিয়ে বললেন, সৌম্য, আমি প্রীত হয়েছি। তুমি চিরজীবী হও। কারণ আমি ত জানি, বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের অধীন, তুমিও তেমনি তোমার অগ্রজের অধীন।

সীতা আরও বললেন, একে একে সব শ্বশ্রূমাতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবে, আমার মধ্যে রয়েছে তাঁদেরই পুত্রের সন্তান, তাঁরা যেন মনে মনে তার মঙ্গলকামনা করেন। আর আমার কথামত সেই রাজাকে বলবে, নিজের চোখে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ জেনেও লোকনিন্দা শুনে তিনি যে আমাকে ত্যাগ করলেন, এ কাজ কি তাঁর বিদ্যা বা কুলগৌরবের

উপযুক্ত ? অথবা তুমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, আমার প্রতি তোমার কোন স্বেচ্ছাচার আশঙ্কা করা উচিত হবে না। এ নিশ্চয় আমারই জন্মান্তরের পাপকর্মের ফলের অসহ্য এক অশনিসঙ্কেত।

একদিন রাজলক্ষ্মীকে অনাদর করে আমাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলে। তাই আজ তার আশ্রয়ে স্থান পেয়ে তারই প্রচণ্ড রোষে আমি রাজভবনে থাকতে পারলাম না। নিশাচর রাক্ষসেরা তাদের স্বামীদের আক্রমণ করলে তোমারই গৌরবে আমি তপস্বিনীর আশ্রয়ে ছিলাম। আজ তুমি রাজা থাকতে আমি কেমন্ করে অন্যের আশ্রয় নেব।

কি আর বলব ? আমার গর্ভে আছে তোমারই সন্তান। তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এই বাধাটুকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের পরে এই নিষ্ফল হতভাগ্য জীবনে আর মায়া করতাম না।

তাই আমি সন্তানপ্রসবের পর ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তপস্যা করব যাতে জন্মান্তরে আমি তোমাকেই স্বামীরূপে পাই, কিন্তু কোন বিচ্ছেদ যেন না ঘটে।

মনু বিধান করেছেন, রাজার ধর্ম বর্ণাশ্রমের পালন। তাই আমাকে এভাবে পরিত্যাগ করলেও তপস্বিনীরূপে আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলে তাঁর সব কথা শুনে ফিরে গেলেন। তাঁকে আর দেখা গেল না। সীতা দুঃখের দুর্বহ ভারে মুক্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন বাণবিদ্ধ করবী বা চিলজাতীয় পক্ষিবিশেষের মত। তাঁর বেদনায় সমব্যথী সমগ্র বনভূমিও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। ময়ূরের নাচ থেমে গেল, গাছের ফুল ঝরে পড়ল, হরিণীরা মুখ থেকে কুশের গ্রাস ফেলে দিল।

ব্যাধের বাণে বিদ্ধ পাখিকে দেখে যাঁর শোক শ্লোক হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই আদিকবি বাল্মীকি বনপথে তখন চলেছিলেন কুশসমিধ আনতে। কান্না শুনে তিনি সীতার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কান্না থামিয়ে চোখের অশ্রু মুছে সীতা তাঁকে বন্দনা করলেন। মুনি তাঁকে গর্ভবতী দেখে সুপুত্রের আশীর্বাদ দিলেন। তারপর

বললেন,—আমি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছি, তোমার স্বামী মিথ্যা অপবাদে অস্থির হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছেন। দুঃখ করো না, জানবে তুমি অন্য এক পিতৃগৃহে এসেছ।

তোমার স্বামী ত্রিলোকের শত্রুকণ্টক উন্মূলিত করেছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার। তবু তোমার প্রতি অকারণে এই গর্হিত আচরণ করাতে আমি সত্যই রামচন্দ্রের উপর রুষ্ট হয়েছি। তোমার বিশ্রুত-কীর্তি শ্বশুর আমার বন্ধু ছিলেন। তোমার পিতা তত্ত্বোপদেশ দান করে সজ্জনদের মুক্তি এনে দেন। তুমি পতিব্রতা রমণীদের অগ্রগণ্যা। তোমাকে অনুগ্রহ না করার ত কারণ নেই।

তপস্বীদের সংসর্গে তপোবনের প্রাণীরা শান্ত। এখানে তুমি নির্ভয়ে বাস করো। নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেলে তোমার সন্তানের সংস্কারাদি এখানেই অনুষ্ঠিত হবে।

তমসার তীর জুড়ে আছে মুনিদের আশ্রম। শোকনাশিনী ঐ নদীতে স্নান করে তার বেলাভূমিতে পূজাপার্বণের কাজ করে শান্ত থাকবে তোমার মন। তাছাড়া মুনিকন্যারা আছে। তারা প্রত্যেক ঋতুতে ফুল তোলে, ফুল কুড়োয়, ক্ষেত থেকে পুজোর বীজধান সংগ্রহ করে। তারা নতুন নতুন বিষয়ে মধুর আলাপ করে তোমাকে আনন্দ দান করবে।

তোমার শক্তি অনুসারে জলের কলস নিয়ে আশ্রমের চারাগাছগুলিকে জল সিঞ্চন করে বড় করে তোল। এতে সন্তানজন্মের আগেই তুমি শিশুকে স্তন্যদানের আনন্দ অনুভব করবে।

তাঁর এই অনুগ্রহে প্রসন্ন হলেন সীতা। বাল্মীকি করুণার্দ্রচিত্তে তাঁকে সন্ধ্যাবেলায় নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। পশুরা সেখানে শান্ত। যজ্ঞবেদীর পাশে হরিণেরা শুয়ে আছে। বাল্মীকি শোকাতুরা সীতাকে তাপসীদের হাতে অর্পণ করলেন। তাঁরা তাকে দেখে আগেই প্রসন্ন হয়েছিলেন। পিতৃগণ চাঁদের সারাংশ পান করে নেওয়ার পর অমাবস্যা যেমন অবশিষ্ট অংশটুকু ওষধিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তেমনি।

তাপসীরা যথাবিধি অতিথি সংস্কার করে সীতাকে রাত্রিবাসের জন্য

একটি কুটির দিলেন। ইঙ্গুদীতেলের একটি প্রদীপ জ্বলছিল তার মধ্যে এবং পবিত্র মৃগচর্মের একটি শয্যা পাতা ছিল।

সেখানে সীতা অভিষেক স্নান করে সংযতভাবে যথানিয়মে অতিথি সৎকার করলেন। তিনি বল্কল ধারণ করেছিলেন এবং সন্তানের রক্ষার জন্য বন্য ফলমূল আহার করে শরীর ধারণ করলেন।

এদিকে রাজা রামচন্দ্র কি একটুও অনুশোচনা করলেন না? ইন্দ্রজিতের নিহন্তা লক্ষ্মণ উৎসুক হয়ে অগ্রজের কাছে আদেশ পালনের বৃত্তান্ত আগাগোড়া সীতার বিলাপ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

সহসা রামচন্দ্রের চোখে জল এল, যেন পৌষমাসের তুষারবর্ষী চাঁদ। কলঙ্কের ভয়ে তিনি জানকীকে ত্যাগ করেছেন, গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি।

তিনি বুদ্ধিমান। বর্ণাশ্রম পালনে সদাসতর্ক। তিনি নিজেই শোক সংযত করে কোনরকম ভোগাসক্তি না রেখে অনুজদের সঙ্গে একযোগে সমৃদ্ধ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

সাধ্বী জেনেও লোকনিন্দার ভয়ে রামচন্দ্র একমাত্র স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন। সপত্নীশূন্য হয়ে রাজলক্ষ্মী যেন তাঁর হৃদয়ে অনন্ত সুখে বিরাজ করতে লাগলেন।

সীতাকে ত্যাগ করে দশাননজয়ী রামচন্দ্র অন্য কোন নারীকে বিবাহ করেননি, তাঁরই প্রতিকৃতি নিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। স্বামীর এই কাহিনী শুনে পরিত্যাগজনিত দুঃসহ দুঃখকে কোনমতে মেনে নিয়েছিলেন সীতা।

পঞ্চদশ সর্গ

সীতাকে পরিত্যাগ করে পৃথিবীপতি রামচন্দ্র সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকেই যেন ভোগ করে যেতে লাগলেন।

পাপাচারী লবণাসুর যমুনাতীরবর্তী আশ্রমগুলিতে মুনিদের যজ্ঞনাশ করছিল বলে তাঁরা এসে শরণ নিলেন রামচন্দ্রের। রাম স্বয়ং আছেন দেখে মুনিরা লবণাসুরকে নিজেরা ধ্বংস করলেন না। কারণ

রক্ষকের অভাবেই মুনিরা অভিশাপরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করে তপস্যার ক্ষয় করে থাকেন।

কাকুৎস্থ রাম তাঁদের কাছে বিঘ্নের প্রতিকার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কারণ বিষ্ণুর রামরূপে অবতার ধর্মসংরক্ষণের জন্যই। তাঁরা রামকে সেই দেববিদ্বেষী রাক্ষসের বধের উপায় বলে দিলেন। লবণ-রাক্ষসের হাতে যতদিন শূল থাকবে ততদিন সে অপরাজেয় থাকবে, তাই শূলহীন অবস্থাতেই তাকে আক্রমণ ও বধ করতে হবে।

মুনিদের মঙ্গল করার জন্য শত্রুনাশ করে নিজের নাম সার্থক করুক এই উদ্দেশ্যেই রাম শত্রুঘ্নকে আদেশ দিলেন।

একটি বিশেষ বিধি যেমন সামান্য বিধিকে বাধিত করতে পারে তেমনি রঘুবংশের যে কেউ শত্রুনিপাতে সমর্থ।

জ্যেষ্ঠ আশীর্বাদ দেবার পর নির্ভীক দশরথপুত্র শত্রুঘ্ন রথে আরোহণ করে পুষ্পিত ও সুবাসিত বনস্থলী দেখতে দেখতে চললেন। অধ্যয়নার্থক ই-ধাতুর সঙ্গে অধি-উপসর্গ যুক্ত হয়ে যেমন অর্থসিদ্ধির সহায়ক হয় তেমনি রামের আদেশে সেনাবাহিনীও শত্রুঘ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যসিদ্ধির সহায়ক হলো।

রথগামী মুনিরা সেই তেজস্বীপ্রবর শত্রুঘ্নকে পথ দেখিয়ে চলতে থাকলেন। বালখিল্য মুনিরা পথ দেখিয়ে চলতে থাকলে সূর্যদেব যেমন শোভা পেয়েছিলেন তেমনি তিনিও শোভা পেলেন।

পথে চলতে চলতে বাল্মীকির তপোবন পড়ল। সেই তপোবনের হরিণেরা রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। শত্রুঘ্ন সেই তপোবনে একরাত্রি বাস করলেন।

তাঁর রথবাহন অশ্বেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঋষি তপোপ্রভাবে নানারকম উৎকৃষ্ট উপকরণ সৃষ্টি করে তাঁকে সেবা করলেন। সেই রাতেই তাঁর ভ্রাতৃবধূ একসঙ্গে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। মনে হলো ধরিত্রী যেন কোশ ও দণ্ড প্রসব করলেন।

অগ্রজের সন্তানলাভের সংবাদ শুনে শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। প্রভাতে তিনি রথ প্রস্তুত করে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন।

এর পর তিনি লবণাসুরের নগর মধুবাঘ্নে পেঁছিলেন। সেই সময় কুম্ভলমীর পুত্র লবণাসুরও বন থেকে কিছু প্রাণীসংহার করে ফিরছিল। মনে হলো, সে যেন বনভূমি থেকে রাজস্ব আদায় করে আনল।

ধোঁয়ার মত ধূসর তার গায়ের রং, দেহময় চর্বির গন্ধ, কেশরাশি অগ্নিশিখার মত পিঙ্গলবর্ণ, চারদিকে রাক্ষসবেষ্টিত হয়ে ধাবমান চিতাগ্নির মত অগ্রসর হচ্ছিল সে।

লক্ষ্মণাত্মজ শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে শূলহীন অবস্থায় দেখে তার গতি রোধ করলেন। সুযোগ বুঝে যারা শত্রুকে আঘাত করে, জয় তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

লবণ বলল, আজ আমি যে আহার সংগ্রহ করেছি তাতে আমার পেট ভরবে না, তাই বিধাতা সৌভাগ্যক্রমে আগে থেকেই যেন তোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই বলে সে তর্জন করে শত্রুঘ্নকে বধ করার জন্য একটি বিশাল গাছকে একগুচ্ছ ঘাসের মতই অনায়াসে উৎপাটিত করল।

নৈঋতবায়ুপ্রেরিত সেই গাছটিকে শত্রুঘ্ন মাঝপথেই তীক্ষ্ম বাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন, তা তাঁর গায়ে লাগল না। শুধু ফুলের পরাগে মণ্ডিত হলেন তিনি। সেই গাছটি বিনষ্ট হলো দেখে লবণ-রাক্ষস যমের মুষ্টির মত একটা বিশাল পাথর উঠিয়ে তাঁর উপরে নিক্ষেপ করল।

শত্রুঘ্নও ঐ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করে সেই পাথরটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বালুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত করলেন। লবণ এবার ডান হাত তুলে শত্রুঘ্নের দিকে ধাবিত হলো। মনে হলো প্রবল বায়ুতে সঞ্চালিত হয়ে তালগাছবিশিষ্ট কোন এক পাহাড় ছুটে আসছে।

এবার বৈষ্ণবাস্ত্র অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রভাবমণ্ডিত বাণে আহত হয়ে বিদীর্ণবক্ষ সেই রাক্ষস ভূলুণ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর কম্প উৎপাদন করল এবং সেই সঙ্গে আশ্রমবাসীদের কম্প দূর করল।

নিহত শত্রুর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে বসল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী

শত্রুঘ্নের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সেই বীর লবণাসুরকে বধ করে নিজেকে ইন্দ্রজিৎ বধে শোভিত হওয়াতে লক্ষ্মণের যথার্থ সহোদর বলে মনে করলেন।

কৃতি তপস্বীরা প্রশংসা করতে থাকলে তার বিক্রমোন্নত মস্তকটি লজ্জানত হয়ে শোভা পেল। তারপরই যার একমাত্র ভূষণ এবং অর্থব্যয়ে যিনি আকৃষ্ট সেই মধুরাকৃতি শত্রুঘ্ন যমুনানদীর তীরে মধুরা নামে একটি নগরী নির্মাণ করলেন।

শত্রুঘ্নের সুশাসনে নগরবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব রইল না। তাই সেই নগরীকে স্বর্গের অতিরিক্ত অধিবাসীরা সেখানে এসে বাস করতে লাগল। তখন তা উপনিবেশের মত শোভা পেল।

সেই নগরের সৌধশীর্ষে আরোহণ করে শত্রুঘ্ন যখন যমুনা নদী দেখতেন তখন তাঁর মনে হত পৃথিবীর স্বর্গবেণী শোভা পাচ্ছে।

এদিকে দশরথ ও জনকের সখা মন্ত্রবিদ বাল্মীকি তাঁর সখাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ সীতার দুই পুত্রের যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পন্ন করলেন। সেই ঋষিকবি বাল্মীকি কুশ ও লব অর্থাৎ কুশ ও গরুর লেজের লোম দিয়ে তাদের দুজনের গর্ভক্লেদ মুছে দিয়েছিলেন বলে যথাক্রমে তাদের একজনের নাম কুশ ও আর একজনের নাম লব রাখা হলো।

শৈশব কিছুটা কাটিয়ে ওঠার পরই বাল্মীকি তাদের দুজনকে বেদ পড়িয়ে পরবর্তী কবিদের প্রধান উপজীব্যস্বরূপ নিজের রচিত রামায়ণ গান অভ্যাস করালেন। সেই দুই পুত্র মায়ের কাছে মধুর স্বরে রাম-চরিত গান করে তাঁর বিরহবেদনাকে লাঘব করত।

এই সময় ত্রেতাগ্নির মত তেজোময় ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিনজনও তাঁদের পতিব্রতা পত্নীতে দুটি করে পুত্র উৎপাদন করলেন। জ্যেষ্ঠপ্রিয় শত্রুঘ্ন বহুবিদ্যাবিদ শত্রুঘাতী সুবাহু নামে নিজের দুই পুত্রকে যথাক্রমে মধুরা ও বিদিশানগরীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আবার বাল্মীকির আশ্রম পথে পড়ল। সেখানে সীতাতনয়দের সঙ্গীত শ্রবণে হরিণেরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুনির তপস্যার

বিঘ্ন হবে বলে শত্রুঘ্ন সে আশ্রমে প্রবেশ না করে তা অতিক্রম করে গেলেন।

লবণাসুর বধ করে শত্রুঘ্ন ফিরছেন বলে অযোধ্যার পুরবাসীরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তাঁকে দেখতে লাগল। পথের সংস্কার করায় অযোধ্যাবাসী শোভামণ্ডিত হচ্ছিল। তিনি সুসজ্জিত অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন।

সীতাপরিত্যাগের পর এই প্রথম পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর রামচন্দ্রকে সভায় সভাসদদের সঙ্গে উপবিষ্ট দেখা গেল। উপেন্দ্র কালনেমি দৈত্যকে বধ করে ফিরলে যেমন তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, অগ্রজ রামও তেমনি লবণাসুরনিহন্তা অনুজ শত্রুঘ্নকে অভিনন্দিত করলেন।

জিজ্ঞাসা করলে শত্রুঘ্ন সকল কুশলসংবাদই রাজাকে দিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্রজন্মের কথা কিছু বললেন না। যথাকালে তিনি নিজেই রামের হাতে তাদের প্রত্যর্পণ করবেন বলে আদিকবি বাল্মীকি এমন কিছু না বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর একদিন দূর জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ কোলে করা এক কিশোর সন্তানকে রাজদ্বারে নামিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, হায় পৃথিবী, দশরথের হাত থেকে তুমি রামের হাতে গিয়ে কী শোচনীয় অবস্থায় এসেছ।

রক্ষক রাম তাঁর শোকের কারণ শুনে লজ্জিত হলেন। কারণ অকাল মৃত্যু এর আগে ইক্ষ্বাকুদের রাজ্যকে কখনো স্পর্শ করেনি। রাম শোকার্ত ব্রাহ্মণকে 'ক্ষণকাল ক্ষমা করো' এই বলে ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করে যমরাজাকে জয় করতে ইচ্ছা করে কুবেরের পুষ্পকরথকে স্মরণ করলেন।

রঘুবংশের রাজা রাম অস্ত্র নিয়ে সেই রথে চড়ে প্রস্থানে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁর সম্মুখে এক রহস্যময়ী দৈববাণী উচ্চারিত হলো।

দৈববাণী বলল, হে রাজন, তোমার প্রজাদের মধ্যে কোথাও কোন অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। তুমি তারই অন্বেষণ করে তার

প্রতিকার করো।

এই দৈববাণী শুনে রাম বর্ণাশ্রমধর্মের সেই অনাচার দূর করবার জন্য রথে চড়ে দিক্‌মণ্ডল ভ্রমণে বহির্গত হলেন। রথ এত দ্রুত ছুটেছিল যে পতাকাটি নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

তারপর রাম এক পুরুষকে দেখলেন। সে একটি তরুশাখাকে অবলম্বন করে মুখ নিচের দিকে দিয়ে তপস্যা করছিল। ধোঁয়ায় তার চোখ তামাটে রঙের হয়ে গিয়েছিল।

রাজা নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করায় সেই ধূমপায়ী পুরুষ বলল, সে ইন্দ্রপদ লাভ করতে চায়। তার নাম শম্বুক, সে জাতিতে শূদ্র। তপস্যায় তার অধিকার না থাকায় সে অনর্থ বহন করে এসেছে, তাই তার শিরচ্ছেদ করা কর্তব্য এই স্থির করে অস্ত্র ধারণ করলেন রাম।

সেই রাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধশ্মশ্রু তার মুখটিকে তুষারপাতে ক্লিষ্টকেশর পদ্মের মত কণ্ঠ হতে অস্ত্রাঘাতে বিচ্যুত করলেন।

স্বয়ং রাজা তাকে দন্ড দিলেন বলে সেই শূদ্র সদ্‌গতি লাভ করল। তার তপস্যা দুশ্চর হলেও অনধিকার দোষে দুষ্ট হওয়ায় সে সদ্‌গতি লাভ করতে পারত না।

তারপর রাম পথে অগস্ত্যের সঙ্গে মিলিত হলেন। মনে হলো যেন শশাঙ্কের সঙ্গে শরৎকালের মিলন হলো।

অত্যাচারী অসুরেরা সমুদ্রে আশ্রয় নিলে দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্রকে এক গণ্ডুষে পান করে পরে উগরে দিয়ে অসুরদের অত্যাচার থেকে দেবতাদের মুক্ত করেছিলেন বলে তার মূল্যস্বরূপ কুম্ভযোনি ইন্দ্র অগস্ত্যকে এক দিব্য অলঙ্কার দান করেছিলেন। আজ অগস্ত্য সেই অলঙ্কার রামকে প্রদান করলেন।

সীতার কণ্ঠধারণে বঞ্চিত বাহুতে সেই অলঙ্কার ধারণ করে অযোধ্যায় ফিরলেন রাম। দেখলেন, তার আগেই ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র যমালয় থেকে ফিরে এসেছে। তখন পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণ যমের গ্রাস থেকে পুত্রদানে সমর্থ রামকে তিনি আগে যে নিন্দা করেছিলেন, নানাভাবে স্তুতি করে তা সংশোধন করতে লাগলেন।

তারপর রাম একদিন অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দিলেন। মেঘ যেমন শস্যরাশিকে জলদানে সন্তুষ্ট করে, নর, বানর ও রাক্ষসদের অধিপতিরা তাঁকে তেমনি উপঢৌকন দানে সংবর্ধিত করলেন।

কি নক্ষত্রলোক, কি ভূলোক—সব স্থান থেকে সমস্ত দিক থেকে নিমন্ত্রিত মহর্ষিরা আসতে লাগলেন। সমাগত মহর্ষিদের নগরের উপান্তভাগে সন্নিবেশিত করা হলো। চতুর্দ্বারে শোভিত অযোধ্যা-নগরীকে দেখে মনে হলো চতুর্মুখ ব্রহ্মা সদ্য লোকসৃষ্টির পর যেন সশরীরে বিরাজ করছেন।

রামের সীতা পরিত্যাগ গৌরবের বিষয়। কারণ তিনি অন্য পত্নী গ্রহণ করেননি। হিরণ্ময়ী সীতা অর্থাৎ তাঁর হিরণ্ময়ী মূর্তিই যজ্ঞশালায় পতির সহধর্মচারিণী পত্নীর স্থান গ্রহণ করেছিল।

যা নিয়ম তার অনেক বেশী জিনিস দিয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করা হলো। একদিন যারা যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিয়ে এসেছে সেই রাক্ষসরাই যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হলো।

এদিকে গুরুর আদেশে সীতাতনয় লব ও কুশের সর্বত্র বাল্মীকির প্রথম উপদেশ রামায়ণ গান করে বেড়াতে লাগল। একে রামের চরিত, তার উপর বাল্মীকির রচনা এবং কিন্নরকণ্ঠ লব ও কুশ সে গানে শ্রোতাদের মন হরণ করে নিতে লাগল।

যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং শুনেছেন, তাঁরা বারবার এসে বলতে থাকলে রাম কৌতূহলী হয়ে ভাইদের নিয়ে লব ও কুশের রূপ ও সঙ্গীত-মাধুর্য দেখতে এবং শুনতে লাগলেন।

তাদের সেই অপূর্ব রামায়ণগান শুনে তন্ময় ও অশ্রুসজল হয়ে উঠল রাজসভা। সে সভা প্রভাতে হিমবর্ষী নিষ্কম্প বনস্থলীর মত শোভা পেল।

লোকেরা কেবল রাজবেশ ছাড়া সব বিষয়েই রামের সঙ্গে তাদের দুজনের সাদৃশ্য দেখে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। লোকেরা কুমারদের দক্ষতা দেখে ততটা অবাক হয়নি, যতটা অবাক হয়েছিল রাজার দেওয়া প্রীতি উপহারে তাদের নিস্পৃহতা দেখে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমাদের এই গান শিখিয়েছেন এবং কেই বা এই গানের রচয়িতা? তারা তখন বাল্মীকির নাম করল। তারপর রাম ভাইদের নিয়ে বাল্মীকির কাছে গেলেন এবং শুধু দেহটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত রাজ্য নিবেদন করলেন।

করুণাময় আদিকবি রামকে বললেন, এ দুটি সীতার গর্ভজাত তোমারই পুত্র। এই বলে তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

রাম বললেন, হে তাত, আপনার পুত্রবধূ আমাদের সম্মুখে অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধা প্রতিপন্ন হলেও প্রজারা রাক্ষসরাজ রাবণের দুশ্চরিত্রতার জন্য সীতাকে শুদ্ধা মনে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারছে না। সীতা স্বচরিত্র বিষয়ে প্রজাদের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহলেই আমি আপনার পুত্রবতী সীতাকে গ্রহণ করব।

রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলে মুনি শিষ্যদের দিয়ে আশ্রম থেকে তাঁর তপস্যাবলে আনীত সিদ্ধির মতই সীতাকে নিয়ে এলেন।

তার পরদিন রাম প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য পুরবাসীদের একত্রিত করে বাল্মীকিকে আহ্বান করলেন।

তখন পুত্রদুটিসহ সীতাকে নিয়ে মুনি রামের কাছে এলেন। মনে হলো যেন তিনি উদাত্তাদি স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রীর সঙ্গে সূর্যের কাছে এলেন।

সীতার পরিধানে ছিল গৈরিক বসন। তাঁর চোখদুটি নিজের পায়ের দিকে নিবদ্ধ। সীতার সেই শান্ত দেহ দেখে তিনি যে শুদ্ধচরিত্রা তা সহজেই অনুমিত হলো।

সীতা রাজসভায় এলে সভাজনেরা তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে চোখ সরিয়ে এনে ফলন্ত শালিধানের মত মুখ নত করে রইল।

আসন গ্রহণ করে মুনি সীতাকে আদেশ দিলেন, বৎস, পতির সম্মুখে স্বচরিত্র বিষয়ে প্রজাদের সংশয় দূর করো।

তখন সীতা বাল্মীকির শিষ্যদের আনা পুণ্যজলে আচমন করে এই সত্য বাণী উচ্চারণ করলেন, বাক্যে, মনে ও কর্মে যদি পতির বিষয়ে

কোন ব্যভিচার না হয়ে থাকে তাহলে হে ধরিত্রী দেবী, তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও।

সাধ্বী সীতা একথা বলতেই সদ্যসংঘটিত ভূমিরন্ধ্র থেকে বৈদ্যুতিক জ্যোতির মত প্রভামণ্ডল নির্গত হলো। সেই প্রভামণ্ডলে নাগফণাবাহিত সিংহাসনে উপবিষ্টা সাক্ষাৎ ধরিত্রীদেবী আবির্ভূতা হলেন। তিনি পতির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সীতাকে কোলে নিয়ে রাম 'না না' বলতে না বলতেই পাতালে প্রবেশ করলেন।

সীতার প্রত্যর্পণ আকাঙ্ক্ষা করে রাম ধনুর্যোজনা করতেই জগদ্-গুরু ব্রহ্মা দৈববলে পৃথিবীর প্রতি রামের ক্রোধকে শান্ত করলেন।

রাম যজ্ঞশেষে যথাবিধি পুরস্কৃত মুনিদের ও সুহৃদদের বিদায় দিয়ে সীতাগত স্নেহ তাঁর সন্তানদের উপর ন্যস্ত করলেন।

প্রজাপালক রাম ভরতমাতুল যুধাজিতের পরামর্শক্রমে ভরতকে রাজ-প্রভুত্ব অর্পণ করে সিন্ধুদেশ প্রদান করলেন। সেখানে ভরত যুদ্ধে গন্ধর্বদের পরাজিত করে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়ে তাদের হাতে শুধু বীণা গ্রহণ করালেন।

ভরত এরপর তাঁর দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে তাঁদেরই নামাঙ্কিত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী রাজধানীতে অভিষিক্ত করে আবার রামের কাছে ফিরে এলেন।

লক্ষ্মণও রামের আদেশে তাঁর দুই পুত্র অঙ্গজ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্য প্রদান করলেন।

এইভাবে রাম ও তাঁর অনুজ রাজারা পুত্রদের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে পতিলোকে প্রস্থান করা জননীদের শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

তারপর যম মুনিবেশ ধারণ করে এসে রামকে বললেন, আমাদের দুজনের কিছু গোপন কথা আছে। কিন্তু যে আমাদের এই নির্জন স্থানে এ অবস্থায় দেখবে তাকেই আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

'তাই হবে' বলে প্রতিশ্রুতি দিলে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে যম বললেন, ব্রহ্মার আদেশে আপনি এখন স্বর্গবাস করুন।

দ্বারে অবস্থানরত লক্ষ্মণ জেনেশুনেও দুর্বাশা রামদর্শনে আসায়

মুনির অভিশাপের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁদের নির্জনালাপের মধ্যে ঘরে প্রবেশ করে বাধা সৃষ্টি করলেন। এরপর যোগবিদ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গিয়ে দেহত্যাগ করে অগ্রজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন।

নিজের চতুর্থ অংশরূপ লক্ষ্মণ আগে স্বর্গগমন করলে ত্রিপাদ ধর্মের মত শিথিল হয়ে মর্ত্যলোকে বাস করতে লাগলেন রাম।

শত্রুরূপ গজের পক্ষে অঙ্কুশরূপ কুশকে স্থিতধী রাম কুশাবতী নগরীতে এবং সদুক্তিবর্ষণে সজ্জনের অশ্রু-উদ্রেককারী লবকে শরবতীতে অধিষ্ঠিত করে অগ্নিকে সম্মুখে রেখে অনুজদ্বয়কে নিয়ে উত্তর দিকে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। প্রভুপ্রেমে সমস্ত অযোধ্যাবাসীও গৃহত্যাগ করে তাঁর অনুগমন করল। চিত্তজ্ঞ বানর ও রাক্ষসেরাও প্রজাদের সঙ্গে কদম্বের মত স্থূল অশ্রুবিন্দুতে সিক্ত রামের পথে অনুগমন করল।

এমন সময় স্বর্গ থেকে দিব্য বিমান এসে উপস্থিত হলো। ভক্তবৎসল রাম অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাবার জন্য সরযূকেই সোপান-স্থানীয় করে দিলেন।

তখন সরযূতে নিমগ্ন হয়ে দেহত্যাগের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল জনগণের মধ্যে। অজস্র গো-ধন নদী পার হবার সময় যেমন হয় সেখানেও তেমনি হয়েছিল বলে তা 'গোপ্রতর' নামে পরিগণিত হলো।

সুগ্রীবাদি দেবাংশরা নিজ নিজ মূর্তিতে বিলীন হলে রাম দেবত্ব-প্রাপ্ত পুরবাসীদের জন্য এক পৃথক স্বর্গ নির্মাণ করে দিলেন।

বিষ্ণু এইভাবে রামরূপে রাবণবধরূপ কাজ শেষ করে লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে এবং পবনতনয় হনুমানকে উভয়ের কীর্তিস্তম্ভের মত দক্ষিণে চিত্রকূট পর্বতে ও উত্তরে হিমালয় পর্বতে অধিষ্ঠিত করে নিজের মূর্তিতে প্রবেশ করলেন।

ষোড়শ সর্গ

সাতজন রঘুকুলবীর কুমারের মধ্যে বয়স ও গুণগরিমার দিক থেকে কুশই শ্রেষ্ঠ। তাই সাতজন কুমারই কুশকে শ্রেষ্ঠ রত্ন অর্পণ করলেন।

কারণ সৌভ্রাতৃত্ববোধ তাঁদের বংশের ধর্ম। সহজাত প্রবৃত্তি।

সেতুবন্ধন, গজসংগ্রহ, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতির মাধ্যমে অতিশয় সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন তাঁরা সকলেই। কিন্তু সমুদ্র যেমন কখনো বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তেমনি তাঁরাও কেউ একে অন্যের রাজ্যসীমা লঙ্ঘন করলেন না।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু থেকে তাঁদের বংশের জন্ম। তাঁরা সর্বদা দানপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন। সামযোনি থেকে উৎপন্ন দানবর্ষী দিগ্‌গজদের বংশের মত রঘুবংশও আটভাগে বিভক্ত হয়ে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

একদিন মধ্যরাত্রিতে কুশ যখন তাঁর শয়নগৃহে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন, শয়নগৃহের জ্বলন্ত প্রদীপ যখন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, প্রাসাদের সকলেই যখন ঘুমিয়েছিল তখন ঘুমন্ত কুশ হঠাৎ জেগে উঠলেন। দেখলেন প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর কেশধারিণী এক নারী দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে। সে নারী কোনদিন দেখেননি এর আগে।

ইন্দ্রের মত তেজস্বী ও বন্ধুবৎসল কুশ সাধুসজ্জনদের সমানভাবে রাজ্যভোগ করতেন। সেই নারী শত্রুজিৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করলেন।

প্রাসাদকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সেখানে দর্পণে প্রতিবিম্বের মত প্রবিষ্ট সেই রমণীকে দেখে সবিস্ময়ে শয্যা থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঈষৎ উন্নত করে অর্থাৎ বালিশ থেকে মাথাটি তুলে দশরথাত্মজ কুশ বললেন, রুদ্ধদ্বার গৃহে আপনি প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আপনার ত তেমন যোগশক্তির পরিচয় পাচ্ছি না। শিশিরসিক্ত মৃণালিনীর মত আপনার আকৃতি বিষণ্ণ। আপনি কে? কার ঘরণী? কেনই বা এসেছেন আমার কাছে? জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দের মন পরস্ত্রীতে সদা বিমুখ—একথা জেনে আপনার যা বলার বলুন।

তখন সেই পরী তাঁকে বললেন, রাজন, আপনার পিতা স্বর্গগমন-কালে যে নগরীর পুরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আমি সেই নগরীর অনাথা অধিদেবতা। একদিন আমি সুশাসনের গৌরবমহিমার বিভূতির জন্য অলকাপুরীকেও উপহাস করতাম। আজ অশেষ শক্তিসম্পন্ন

আপনার মত রাজা থাকা সত্ত্বেও আমি এক সকরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি।

প্রভুহারা আজ আমার শত শত অট্টালিকা জীর্ণ, প্রাচীরগুলি ভগ্ন। এখন আমার অবস্থা সূর্যাস্তকালীন প্রচণ্ড বাতাসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমালাবিশিষ্ট দিনান্তের মতই দুঃখময়। রাত্রিতে যে রাজপথ পথ আলো করা চঞ্চল নূপুরধ্বনি অভিসারিকাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্থান ছিল, আজ সেখানে উল্কামুখী আমিষলোলুপ শৃগালেরা চীৎকার করতে করতে যাতায়াত করে।

যে দীর্ঘিকাগুলির জলে সুখসন্তরণরতা প্রমোদাগণের করাগ্রের আঘাতে ধীরমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হত, আজ সেখানে বন্যমহিষদের শৃঙ্গের আঘাতে সে জল যেন যন্ত্রণায় হাহাকার করছে।

অট্টালিকার বাসকক্ষগুলি ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে মৃদঙ্গধ্বনিও নেই। ক্রীড়াময়ূরেরা এমন প্রাসাদ ছেড়ে বৃক্ষকে আশ্রয় করেছে। তাদের কোন লাস্য নেই, তাদের কলাপ যেন দাবানলদগ্ধ। আজ তারা বনময়ূরেই পরিণত হয়েছে।

আবার যে সমস্ত সোপানপথে রমণীরা অলক্তরঞ্জিত পদচিহ্ন রাখতেন অর্থাৎ আলতাপরা পা ফেলে হেঁটে যেতেন, আজ সেখানে সদ্যোনিহত হরিণের রক্তে পথ রাঙিয়ে হিংস্র বাঘেরা চলাফেরা করে।

পদ্মবনে গজবধূরা তাদের গজপতিদের কাছে ভগ্ন মৃণাল তুলে ধরছে—প্রাসাদগাত্রে এই আলেখ্যচিত্রিত দৃশ্যকে সত্যি ভেবে আজ কুপিত সিংহেরা নখের আঘাতে বিদীর্ণ করছে তাদের কুম্ভ।

স্তম্ভসমূহে অঙ্কিত নারীমূর্তিগুলির বিবর্ণ ধূসর অবস্থা। সাপের খোলস জড়িয়ে আছে তাদের গায়ে। সেগুলি আজ যেন তাদের স্তনোত্তরীয় হয়েছে। সেদিন আর নেই। অযোধ্যার শুভ্রধবল শোভা আজ শ্যামবর্ণ। ইতস্ততঃ তৃণগুল্ম জন্মেছে চারদিকে। রাত্রিতে চাঁদের কিরণ আগের মতই আজও মুক্তার মত অমলধবল আছে, কিন্তু তারা আর তেমন প্রতিফলিত হয় না।

আমার উদ্যানের লতাবিতান থেকে একদিন বিলাসিনীরা কত যত্নে শাখা নুইয়ে ফুল তুলতেন। আজ বন্য ব্যাধদের মত বানরের দল তার

লতাগুচ্ছকে ছিন্নভিন্ন করছে।

রাত্রে আর কোন দীপালোক জ্বলে না, দিনের বেলাতেও কোন কান্তার মুখশ্রী দেখা যায় না। গবাক্ষগুলি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন। তাদের ধূমনির্গমনের পথও রুদ্ধ।

সরযূনদীর তীরে তীরে আর কোন যাগযজ্ঞ হয় না, স্নানকার্যে ব্যবহৃত সুগন্ধিদ্রব্যেরও সুবাস পাওয়া যায় না। তীরের বেতসলতা-মণ্ডপগুলি আজ জনশূন্য। সরযূনদীকে দেখে আজ আমি বড় কষ্ট পাই।

সুতরাং এই বসতিকে পরিত্যাগ করে কুলরাজধানীকে গ্রহণ করুন,. আপনার পিতা যেমন নৈমিত্তিক মানবদেহ ত্যাগ করে বিষ্ণুমূর্তি লাভ করেছেন।

তাঁর কথায় প্রীত হয়ে কুশ 'তাই হবে' বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুরদেবতাও প্রসন্ন মুখে সশরীরে অন্তর্ধান করলেন।

পরদিন সকালবেলায় রাজা কুশ রাত্রির সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জানালেন। সব শুনে তাঁরা অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। কুলরাজধানী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে পতিত্বে বরণ করেছেন তাঁকে।

কুশাবতী নগরীকে ব্রাহ্মণদের দান করে শুভদিন দেখে রাজা পরিজনবর্গকে নিয়ে অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা করলেন। মেঘরাশি যেমন বায়ুকে অনুসরণ করে, তেমনি সৈন্যগণ তাঁর অনুগমন করল।

সৈন্যবাহিনী চলতে থাকলে মনে হলো সমস্ত রাজধানীই যেন চলতে আরম্ভ করেছে। পতাকাশ্রেণী তার উপবনরাজি, বড় বড় হাতিগুলো তার ক্রীড়াশৈল, রথগুলি যেন তার প্রাসাদসমূহ।

রাজছত্র নিয়ে রাজা সৈন্যগণসহ পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। নবোদিত চাঁদ যেমন সমুদ্রের উত্তাল জলরাশিকে বেলাভূমিতে নিয়ে আসে তেমনি তিনি শোভা পেতে লাগলেন। যাত্রাকালে তাঁর সৈন্যসামন্তের বিক্রম বসুন্ধরা যেন আর সহ্য করতে পারলেন না, ধুলোয় ধুলোয় আকাশ ভরে তিনি যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে আরোহণ করলেন অর্থাৎ বিষ্ণু বামনাবতার-কালে দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপে যে স্বর্গলোক ব্যাপ্ত করেছিলেন সেই স্বর্গ

বা আকাশ পর্যন্ত ধুলো উড়ল : তাই বসুন্ধরা যেন আকাশে বিষ্ণুর দ্বিতীয়পদে উঠে গেলেন।

সেনাবাহিনীর কোন অংশ এগিয়ে চলেছে, কোন অংশ শিবির স্থাপনের উদ্যোগ করছে, পথ চলছে কোন অংশ। কিন্তু সেনাবাহিনীকে যেখানেই দেখা গেল মনে হলো গোটা বাহিনীটাই বুঝি বা রয়েছে সেখানে।

রাজার হাতিদের মদবারিসিঞ্চনে পথের ধুলো কাদা হলো, আবার ঘোড়াদের ক্ষুরের আঘাতে সে কাদা ধুলো হয়ে উঠল।

বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে পথ খুঁজতে খুঁজতে সেনাদল বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। নর্মদার কলধ্বনির মত তাদের তুমুল কোলাহলে পর্বতের গুহাগুলি প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠল। পর্বতের পতিত ধাতুস্রোতে রাজার রথের চাকা রক্তিম হলো। অভিযানের কোলাহলের সঙ্গে মিশ্রিত হলো তূর্যধ্বনি। রাজা এইভাবে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করলেন। পুলিন্দরা তাঁর কাছে নানা উপঢৌকন নিয়ে এল।

বিন্ধ্যপর্বত হতে অবতরণকালে তিনি গজশ্রেণীর সেতুবন্ধন করে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা উত্তীর্ণ হলেন। আকাশপথে পারাপার করা চঞ্চল পাখার বাতাসে হংসশ্রেণী অনায়াসে ব্যজন করল তাঁকে।

কুশ তরণীচঞ্চলা ত্রিস্রোতা গঙ্গাকে প্রণাম করলেন। কপিলমুনির রোষানলে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভস্মসাৎ হয়ে গেলে এই গঙ্গারই পবিত্র স্পর্শে শাপমুক্ত হয়ে আবার স্বর্গে গমন করেছিলেন।

কয়েকদিন পথ চলার পর অবশেষে সরযূর তীরে উপস্থিত হলেন কুশ। দেখলেন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী রঘুবংশীয়দের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত শত শত যূপকাষ্ঠ সেখানে শোভমান হয়ে আছে তখনো।

কুলরাজধানীর উপবনের বাতাস ফুলগাছগুলির শাখা কাঁপিয়ে শীতল সরযূনদীর তরঙ্গমালাকে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়ে তাঁকে ও ক্লান্ত সেনাদলকে যেন অভ্যর্থনা করল।

তাঁর শত্রুকুল উচ্ছিন্ন ও নির্মূল, তিনি পুরবাসীদের সখা, বংশের পতাকাস্বরূপ, পরাক্রমশালী রাজা চঞ্চল পতাকাশোভিত সৈন্যদলকে

নগরীর উপকণ্ঠে সন্নিবেশিত করলেন।

রাজার আদেশে শিল্পীরা সবরকম উদাহরণসহযোগে হীনদশা প্রাপ্ত অযোধ্যা নগরীকে নতুন করে তুললেন, মেঘেরা যেমন জলরাশি বর্ষণ করে নিদাঘদগ্ধ পৃথিবীকে সজীব করে তোলে।

তারপর রঘুশ্রেষ্ঠ কুশ উপবাসী বাস্তুযজ্ঞে নিপুণ ব্রাহ্মণদের হাতের পশুবলি উপহারে বিশাল দেবালয়যুক্ত নগরীর অর্চনা সম্পাদন করলেন। রাজা কুশ কান্তার হৃদয়ে কামীর মত অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। পরিজনবর্গেরও সম্মান ও পদমর্যাদা অনুসারে বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি বন্ধনস্তম্ভে যথানিয়মে আবদ্ধ হলো। বিপণিগুলিতে দ্রব্যসম্ভার শোভা পেতে লাগল। আপাদ-মস্তক অলঙ্কৃতা কোন নারীর মত ঝলমল করে উঠল অযোধ্যানগরী।

এইভাবে পূর্ণশোভায় শোভাময়ী রঘুবংশের কুলরাজধানীতে বাস করে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পদে অথবা অলকাপতি কুবেরের ঐশ্বর্যলাভের কোন স্পৃহা ছিল না কুশের।

তারপর গ্রীষ্মকাল এল। সে যেন প্রিয়ার বেশভূষা সম্বন্ধে উপদেশ দান করার জন্যই এসেছে। গ্রীষ্মে কামিনীদের উত্তরীয় রত্নখচিত, পাণ্ডুর স্তনে হারশোভিত। নিঃশ্বাসেও উড়ে যায় তাদের বসন।

দক্ষিণদিক থেকে সূর্য উত্তরায়ণে এগিয়ে এলে উত্তরদিক হিমালয়ের বরফগলা জলে যেন আনন্দশীতল অশ্রুবর্ষণ করল। পরিণত গ্রীষ্মে দিনে প্রচণ্ড তাপ, রাত্রি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল। পরস্পর প্রণয়কলহে যেন জায়াপতি বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুতাপে কষ্ট পাচ্ছে।

দিনে দিনে গৃহদীর্ঘিকার জলরাশি সোপানপর্বের নিচে নেমে গেল। সেখানে শৈবালদল দেখা দিল, পদ্মের মৃণাল ভেসে উঠল। জলের শোভা নারীর নিতম্বের মত হলো।

বনে বনে সন্ধ্যামল্লিকার কোরক ফুটছে। সৌরভে চারদিক ভরপুর। তাদের প্রত্যেকটিতে ভ্রমর এসে বসেছে। তারা যেন তাদের সংখ্যা গুণছে।

কামিনীদের কপোলদেশ আর্দ্র এবং প্রিয়তমের নখক্ষতে লাঞ্ছিত। তাই তাদের কাণ থেকে শিরীষ ফুল খুলে এলেও খসে পড়ল না, কপোলে তার শিখাটি জড়িয়ে থাকল।

ধনশালী মানুষদের ধারাগৃহসমূহ যন্ত্রসঞ্চালিত সুশীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ এবং চন্দনজলে বিধৌত। চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি শিলাবিশেষে শয়ন করে গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করতেন তাঁরা।

বসন্তশেষে কামদেবের শক্তি যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। স্নানসিক্ত ধূপবাসিত কেশকলাপ দেখে এবং সন্ধ্যায় তাতে মল্লিকাকুসুমের শোভা দেখে তাঁর মধ্যে নতুন শক্তি এল।

অর্জুনগাছের মঞ্জরীতে পরাগ লেগে পিঙ্গলবর্ণ হয়ে তা অপূর্ব শোভা পেল। মনে হলো মহাদেবের কোপানলে মদনের শরীর দগ্ধ ও ভস্মীভূত হবার পরেও তার খণ্ডবিখণ্ড ধনুকের জ্যা দেখা যাচ্ছে।

স্বয়ং সুগন্ধি আম্রপল্লব ভঙ্গ করে, সুগন্ধি পুরাতন আসবে ও সুগন্ধি পাটলফুলে গ্রীষ্মকাল নিদাঘতপ্ত কামীজনদের সব কষ্ট দূর করে দিল। গ্রীষ্মকাল প্রচণ্ড হয়ে উঠলে দুটি বস্তু মানুষের প্রীতিকর হলো – নবোদিত রাজা আর চাঁদ যার পাদ বা কিরণসেবায় নিদাঘসন্তাপ দূর হয়।

সরযূর ঢেউএর ছন্দে তীরে রাজহংসেরা উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করে, বৃক্ষলতা পুষ্পভারে আনত হয়। রমণীবল্লভ কুশের ইচ্ছা হলো গ্রীষ্মে সুখাবহ সেই নদীতে জলবিহার করে।

চক্রধারী বিষ্ণুর প্রভাবসম্পন্ন মহারাজ কুশ তটভূমিতে মন্ডপ তৈরী করালেন। জেলেদের দিয়ে সরযূকে কুমীর, হাঙর প্রভৃতি জলজ জন্তু হতে মুক্ত করালেন। তারপর নিজের সম্পদ ও গৌরব অনুযায়ী জলবিহারের ব্যবস্থা করলেন।

সরযূনদীর সোপানপথে বিলাসিনীরা অবতরণ করতে থাকল। তাদের পরস্পরের কেয়ূর ঘর্ষণে ও পদসঞ্চালনে মুখরিত নূপুরের শব্দে হংসশ্রেণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারা পরস্পরের উপর জলসেচনে মত্ত হয়ে উঠল। নৌবিহারী রাজা তাদের স্নান দেখতে দেখতে পার্শ্বচারিণী

চামরধারিণী কিরাতবালাকে বললেন, দেখ, আমার শত শত অন্তঃপুরীরা স্নান করছে, তাদের অঙ্গরাগ জলে ধুয়ে যাচ্ছে, ফলে সরযূর জলপ্রবাহকে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালের বর্ণরঞ্জিত মনে হচ্ছে।

নৌকাতরঙ্গিত জলে পুরসুন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল। জলকেলির পরে তাদের চোখে মদরাগশোভার মধ্য দিয়ে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গুরু শ্রোণীভারে ও পীনপয়োধরে দেহটি বহন করতেও তাদের কষ্ট হচ্ছিল। তবুও এই সুন্দরীরা মাতোয়ারা হয়ে হাতের কেয়ূরগুলি ঝলমল করে কষ্ট করে করে সাঁতার কাটছিল।

জলবিহারিণীদের কানের অবতংস শিরীষ ফুল খসে পড়ে জলে ভাসছিল। তা দেখে মনে হলো ফুল নয়, যেন শৈবালদল। তাতে শৈবালসুব্ধ মৎসকুল প্রতারিত হলো। জলসঞ্চালনে তৎপর কামিনীরা কেলিমত্ত হয়ে পড়ায় তাদের স্তনসংলগ্ন মুক্তাহার ছিঁড়ে গেল। তাতে মুক্তাগুলি জলে ছড়িয়ে পড়লেও মুক্তাফলসদৃশ জলবিন্দুতে তাদের চেনা গেল না। নিকটবর্তী বস্তুগুলি বিলাসিনীদের রূপ ও অবয়বের উপমান হয়েছে। যেমন জলের ঘূর্ণি নাভিসৌন্দর্যের ও তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গের উপমান এবং চক্রবাকমিথুন স্তনযুগলের উপমান।

জলকেলির শ্রুতিমধুর মৃদঙ্গধ্বনি সুরধ্বনির কান ভরে দিচ্ছে। কলাপ মেলে মধুর কেকাধ্বনিতে তীরস্থিত ময়ূরেরা যেন অভিনন্দিত করছে তাকে।

অঙ্গনাদের সিক্ত বসন নিতম্বে সংলগ্ন হয়ে আছে। চাঁদের কিরণে অল্প প্রকাশিত নক্ষত্রমালার মেখলাটি দেখা যাচ্ছে। সুতোর পথটি জলে ভরে যাওয়াতে রসনাদামে কোন শব্দ হচ্ছে না।

একদল আচমকা আঁজলাভরা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, অন্যেরা তেমনি করেই আবার তাদের মুখে জল দিচ্ছে, তাদের অলক আর কুঞ্চিত নেই। মুখের প্রসাধন মিশে গিয়ে রক্তাভ জল ঝরাচ্ছে তারা।

ওদের কেশপাশ খুলে পড়েছে, মুক্তাখচিত কর্ণভূষণ খসে পড়েছে, জলবিহারে ক্লান্ত হয়ে প্রমদাজনের মুখশ্রী সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।

নৌকাযান থেকে জলে নেমে রাজা কুশ গলার হার দুলিয়ে কামিনীদের সঙ্গে জলকেলি করলেন। মনে হলো গজরাজ যেন স্কন্ধলগ্ন পদ্মিনীকে নিয়ে করেণুদের সঙ্গে মিলিত হলো। বিলাসচঞ্চল কুশের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরকামিনীদের অতিশয় শোভা হলো। মুক্তা এমনিতেই সুন্দর, তার উপর উজ্জ্বল চন্দ্রনীলমণির সঙ্গে যুক্ত হলে তা আরও সুন্দর হয়।

আয়তনয়নারা কাঞ্চনশৃঙ্গযুক্ত পিচকারী দিয়ে বর্ণরঞ্জিত জলসেচন করল তাঁর উপর। ধাতুদ্রবস্রাবী হিমালয়ের মতই সে অবস্থায় তিনিও অতি সুন্দর শোভা পেলেন।

এইভাবে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে তিনি যখন নদীশ্রেষ্ঠ সরযুতে বিহার করছিলেন তখন আকাশগঙ্গাতে অপ্সরাগণের সঙ্গে কেলিপরায়ণ ইন্দ্রের শোভাকেই যেন তিনি অনুকরণ করছিলেন।

রামচন্দ্র যে জয়প্রদ অলঙ্কার অগস্ত্যমুনির কাছে পেয়েছিলেন এবং যা তিনি রাজ্যের সঙ্গে কুশের হাতে অর্পণ করেছিলেন, জলবিহারকালে সে অলঙ্কার তাঁর অজানিতে নদীর জলে পড়ে ডুবে গেল কোথায়।

সাধ মিটিয়ে রমণীদের সঙ্গে স্নান ও জলবিহার সেরে তীরের মণ্ডপে আসামাত্র কেশবিন্যাসের আগেই দেখলেন, তাঁর বাহুতে সেই দিব্য বলয়টি নেই। জয়শ্রীর মোহনমন্ত্রস্বরূপ সেটি ছিল পরমগুরু পিতৃদেবের অলঙ্কার। তাই সেটিকে হারাণো কুশের পক্ষে অসহ্য। তাতে তাঁর লোভ ছিল না। কারণ কুসুম ও অলঙ্কার তাঁর চোখে দুইই ছিল সমান।

তৎক্ষণাৎ তিনি নিপুণ ডুবুরি ও জালিকদের ডেকে সেই রত্নবলয় সন্ধানের আদেশ দিলেন। কিন্তু সরযু নদীতে জাল ফেলে খোঁজ করলেও তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হলো। তারা এসে তাঁকে বলল, প্রভু, অনেক চেষ্টা করেও জলের ভিতর থেকে আপনার সেই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারটি খুঁজে পেলাম না। এই নদীর মধ্যে যে কুমুদনাগের বাসভূমি, নিশ্চয়ই সেই কুমুদনাগ লোভে পড়ে সেটিকে হরণ করেছে।

তখন সেই ধনুর্ধর কুশ ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তীরদেশে গিয়ে প্রবল পরাক্রমে ধনুকে গুণ টেনে কুমুদনাগকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গারুড়াস্ত্র

বা গারুড়াস্ত্র গ্রহণ করলেন। সেই বাণ যোজনা করামাত্র প্রবল ঘূর্ণিতে তরঙ্গচঞ্চল হয়ে উঠল নদী। জলের ঢেউগুলি প্রবলবেগে তীরে আছাড় খেয়ে পড়ল, যেন কোন বন্য গজ বন্ধনগর্তে পতিত হয়ে ক্ষুব্ধ গর্জন করছে।

যেন সমুদ্র মন্থন হচ্ছে, জলজন্তুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সহসা সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে ওঠা পারিজাতবৃক্ষের মত একটি কন্যাকে সামনে রেখে নাগরাজ কুমুদ উঠে এলেন।

মহারাজ কুশ যখন দেখলেন সেই অলংকারটি প্রত্যর্পণের জন্য কুমুদ হাতে নিয়ে এসেছেন তখন তিনি গারুড়াস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। বিনীতদের প্রতি সজ্জনেরা ক্রোধ পোষণ করেন না।

নাগরাজ কুমুদ সে অস্ত্রের মহিমা জানতেন। তাই তিনি নিজের গর্বোন্নত মস্তক আনত করে ত্রিলোকপতি রামচন্দ্রের আত্মজ এবং নিজ শক্তিতে শত্রুকুলের অংকুশস্বরূপ কুশকে বন্দনা করে বললেন, যে দেবতা বিশেষ কার্যসাধনের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করেছিলেন সেই ভগবান বিষ্ণুরই আপনি পুত্ররূপ অন্য মূর্তি—আমি তা জানি। সেই আমি সর্বজনপূজ্য আপনার সন্তোষের প্রতিকূল কোন কার্য করতে পারি না।

এই বালিকা হাতে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করছিল। অন্তরিক্ষ হতে পতিত জ্যোতির মত নদী হতে পতিত আপনার এই জয়শীল আভরণটি দেখে কৌতূহলবশে সে তা গ্রহণ করেছিল। সুতরাং আপনার যে বাহু ধনুকের জ্যা আকর্ষণে সিদ্ধ এবং যা বসুমতীর রক্ষাকল্পে অর্গলস্বরূপ সেই আজানুলম্বিত বাহুতে ও আভরণ আবার যুক্ত হোক।

হে রাজন, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতী আপনার চরণযুগল সেবা করে তার অপরাধ স্খালন করতে চায়, আপনি একে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

এই বলে কুমুদ অলংকার প্রত্যর্পণ করলেন রাজাকে। রাজা বললেন, হে কুমুদ, আপনার মত কুটুম্ব আমার গর্বের বিষয়।

তারপর আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কুমুদ তাঁর কুলের অলংকার-

স্বরূপ সেই কন্যাকে যথাবিধি রাজার হাতে সমর্পণ করলেন।

নৃপতি কুশ যখন শিখাযুক্ত অগ্নির সম্মুখে কুমুদ্বতীর মাঙ্গলিক ঊর্ণবলয়ভূষিত হস্ত গ্রহণ করলেন, তখন দিগন্ত পূরিত করে আকাশ হতে দিব্য তূর্যধ্বনি উত্থিত হলো। তার উপর আশ্চর্য সব মেঘেরা সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল।

এইভাবে ত্রিভুবনপতি রামের ও মৈথিলীর পুত্রকে বন্ধুরূপে পেয়ে নাগরাজ কুমুদ পিতৃহন্তা বিনতাতনয় গরুড়ের ভয় থেকে মুক্ত হলেন। কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে বন্ধুরূপে পেয়ে নাগভয়শূন্য পৃথিবীকে শাসন করে পুরবাসীদের অধিকতর প্রিয়পাত্র হলেন।

সপ্তদশ সর্গ

রাত্রির শেষ প্রহর অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি যেমন প্রসন্নতা লাভ করে, কুমুদ্বতীও তেমনি মহারাজ কুশ থেকে 'অতিথি' নামে এক পুত্রলাভ করলেন।

সবিতা যেমন উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পথই পবিত্র করেন, পিতৃমান অতিথিও তেমনি মাতা পিতার উভয় কুলই পবিত্র করলেন।

অর্থশাস্ত্রবিদদের অগ্রগণ্য পিতা কুশ প্রথমে অতিথিকে কুলবিদ্যা-গুলির অর্থ শেখানোর পর রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করালেন।

সদ্বংশজাত, বীর ও জিতেন্দ্রিয় কুশ সদ্বংশজাত, বীর ও জিতেন্দ্রিয় পুত্র অতিথিকে পেয়ে একা হয়েও নিজেকে অনেক মনে করলেন।

কুশ সূর্যবংশের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে গিয়ে যুদ্ধে দুর্জয় নামে এক দৈত্যকে বধ করলেন এবং নিজেও তার হাতে নিহত হলেন। জ্যোৎস্না যেমন কুমুদফুলের আনন্দদায়ক চন্দ্রের অনুগমন করে তেমনি কুমুদ্বতীও কুশের অনুগমন করলেন।

তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ কুশ মৃত্যুর পর ইন্দ্রের সিংহাসনে অর্ধাংশ উপবেশনের অধিকার পেলেন আর একজন অর্থাৎ কুমুদ্বতী শচীর সহচরী হয়ে পারিজাত কুসুমের অংশভাগিনী হলেন।

যুদ্ধে যাবার সময় কুশ যে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সেই অন্তিম

আদেশ স্মরণ করে বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তাঁর পুত্র অতিথিকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করালেন। মন্ত্রীরা অতিথির অভিষেকের জন্য শিল্পীদের দিয়ে উঁচু বেদীসমেত চতুঃস্তম্ভমণ্ডিত নতুন মণ্ডপ নির্মাণ করালেন।

সেই মণ্ডপে ভদ্রপীঠে অতিথিকে উপবেশন করিয়ে মন্ত্রীরা হেম-কুম্ভে সঞ্চিত তীর্থবারি নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। আহতমুখ তূর্যের স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনিতে তাঁর চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ সূচিত হলো।

বৃদ্ধ আত্মীয় কুটুম্বেরা দূর্বা, যবাঙ্কুর, বটছাল ও অসমবিকশিত পল্লবাদি দিয়ে তাঁর আরতি করলেন। পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণেরা বিজয়প্রদ অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই জয়শীল অতিথির অভিষেক করতে আরম্ভ করলেন।

তখন তাঁর মাথায় সবেগে ও সশব্দে পতিত অভিষেকজলের শোভা শিবের মাথায় পতিত গঙ্গার মত মনোরম হলো।

সেই সময় বন্দীরা তাঁর স্তব করতে লাগল। মনে হলো চাতকেরা যেন জলসম্ভূত মেঘকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বর্ষণসিক্ত বিদ্যুতের অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি অভিষেকজলে স্নাত অতিথির কান্তিও বৃদ্ধি পেল।

অভিষেক শেষ হলে অতিথি স্নাতক ব্রাহ্মণদের এত ধনরত্ন দান করলেন যে তা দিয়ে তাঁরা পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়ে বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারতেন। পরিতুষ্ট মনে তাঁরা অতিথিকে যে আশীর্বাদ দিলেন তাঁর সৎকর্মের দ্বারা সাম্রাজ্যরূপ ফললাভ আগেই করেছিলেন বলে সে আশীর্বাদের আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

তিনি বন্দীদের মুক্তি দেবার, বধ্যদের দণ্ডরহিত করবার, ভারবাহী পশুদের ভারমোচনের এবং বৎসদের পানের জন্য গাভীদের দোহন বন্ধ করার আদেশ দিলেন। খাঁচায় বন্দী শুক প্রভৃতি ক্রীড়াবিহঙ্গেরাও তাঁর আদেশে মুক্তি পেয়ে যার যেদিকে খুশি উড়ে গেল।

তারপর তিনি রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হবার জন্য প্রাসাদের মধ্যবর্তী একটি কক্ষে সুসজ্জিত আস্তরণমণ্ডিত গজদন্ত আসনে উপবেশন করলেন। প্রসাধকেরা জলে হাত ধুয়ে ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর

চুলের প্রান্ত শুকিয়ে রাজোচিত নানা বসন ভূষণে তাঁকে সাজিয়ে দিল।

প্রসাধকেরা মুক্তাগুণে দিয়ে তাঁর মাথার চুল একটু উঁচু করে বেঁধে দিল এবং তার মধ্যে মালা বসিয়ে তা রশ্মিজালমণ্ডিত পদ্মরাগমণিতে খচিত করল। তারা মৃগনাভিসুবাসিত চন্দনে অঙ্গরাগ শেষ করে গোরোচনাদি সহযোগে পত্ররচনা করে দিল।

রাজ্যলক্ষ্মীরূপিনী বধূরূপী অতিথি পুষ্পমাল্য, মুক্তার আভরণ এবং কলহংসচিত্রিত পট্টবস্ত্র পরিধান করে অত্যন্ত দর্শনীয় হলেন। কেমন বেশভূষা হলো তা দেখার জন্য তিনি যখন সোনার আয়নার কাছে এলেন তখন তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ায় তিনি উদিত সূর্যে প্রতিবিম্বিত ঘেরা কল্পতরুর মত শোভমান হলেন।

তারপর পার্শ্ববর্তী পুরুষেরা ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ধারণ করে জয়ধ্বনি করতে থাকলে রাজা অতিথি দেবতাসদৃশ রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সভায় চন্দ্রাতপশোভিত পৈতৃক সিংহাসনে বসলেন অতিথি। ঐ সিংহাসনের পাদপীঠ অন্যান্য রাজাদের চূড়ামণিতে বহু-ঘর্ষিত হলো।

শ্রীবৎস নামে প্রকোষ্ঠে চিহ্নিত সেই বিশাল মণ্ডপে যখন অতিথি প্রবেশ করলেন তখন ঐ মণ্ডপ কেশবের কৌস্তভমণিভূষিত শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষের মত শোভা পেল।

অতিথি কুমার-ভাব থেকে যৌবরাজ্যে ও তারপর পূর্ণনৃপতিত্ব লাভ করে রেখাভাব থেকে ক্রমে অর্ধচন্দ্র এবং পরে পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাজ করতে লাগলেন।

তিনি প্রসন্নমুখে থাকতেন এবং সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। অনুজীবীরা তাঁকে মূর্তিমান বিশ্বাস বলে মনে করত। তিনি ছিলেন সম্পদে ইন্দ্রতুল্য, তাঁর রাজপুরীতে ছিল কল্পতরুরূপ ধ্বজ। তাই ঐরাবতের মত বলশালী হাতিতে চড়ে বিচরণ করে তিনি তাঁর রাজ-পুরীকে স্বর্গ করে তুলেছিলেন।

সেই একচ্ছত্র অতিথির মস্তকে ধৃত অমল প্রভায় মণ্ডিত রাজচ্ছত্রে সমস্ত জগতের পূর্বতন রাজার বিচ্ছেদজনিত তাপ দূর হলো।

আগুনের প্রথমে ধোঁয়া, পরে শিখা, সূর্যের প্রথমে উদয়, পরে কিরণমালা। কিন্তু অতিথি তেজঃপদার্থের এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একেবারে প্রথমেই সমস্ত গুণগরিমায় ভূষিত হয়ে উদিত হলেন।

পুরনারীরা প্রীতি-বিকশিত নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। মনে হত রাত্রিরা যেন শরতের নির্মল নক্ষত্রের জ্যোতিতে ধ্রুবকে দেখছে। বড় বড় মন্দিরে যে সব দেবতার পুজো করা হত অযোধ্যার অর্চিত দেবতারা নিজের নিজের প্রতিমায় আবির্ভূত হয়ে অনুগ্রহাস্পদ অতিথিকে অনুগৃহীত করলেন।

অতিথির অভিষেকজলে সিক্ত বেদী ভাল করে না শুকোতেই তাঁর দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হলো।

গুরু বশিষ্ঠের মন্ত্র এবং ধনুর্ধারী অতিথির বাণ এ দুইয়ে মিলিত হয়ে যা করা সম্ভব তা সম্পাদন করেনি এমন কি আছে।

বাদী ও প্রতিবাদীদের যে সমস্ত মামলার বিচার বেশ জটিল, সেই সব মামলা তিনি ধর্মপরায়ণ বিচারকদের সহায়তায় নিজেই বিচার করতেন। তারপর তার সিদ্ধান্তের ফল তিনি অনুজীবীদের জানাতেন। তারা ঈপ্সিতফল শুনতে পেয়ে প্রীতি প্রকাশ করত। এ ফল যে সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হবে তা তাঁর মুখের প্রসন্নতা দেখে আগেই বোঝা যেত।

প্রজারা তাঁর পিতার শাসনকালে শ্রাবণমাসের নদীর মত বৃদ্ধিলাভ করেছিল সত্য, কিন্তু অতিথির রাজত্বকালে তারা ভাদ্রমাসের নদীর মত সমৃদ্ধিলাভ করল।

তিনি যা বলতেন তা মিথ্যা হত না, যা দান করতেন তা আর গ্রহণ করতেন না। কিন্তু শত্রুদের ক্ষেত্রে এ ব্রত ভঙ্গ করতেন অর্থাৎ এর বিপরীত ঘটত। কারণ তাদের সমূলে উৎপাটিত করে আবার যার যার রাজ্যে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেন। অর্থাৎ রাজ্য গ্রহণ করে তা আবার দান করতেন।

নবীন বয়স, রূপ ও ধনসম্পদ—এর যে কোন একটিই মত্ততার কারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই সব কিছু মিলিতভাবে থাকলেও তাঁর মন কখনো মত্ত বা গর্বিত হত না। এইভাবে প্রতিদিন প্রজাদের মনে

অনুরাগ জন্মিয়ে রাজা নূতন হলেও তা দৃঢ়মূল তরুর মত অবিচল হলো।

বাইরের শত্রুরা অনিত্য, কারণ তারা দূরবর্তী। তাই তিনি ভিতরের কামক্রোধাদি ছয় রিপু বা শত্রুকে জয় করলেন। লক্ষ্মী স্বভাবচঞ্চলা হলেও সেই প্রসন্নমুখ রাজাতে নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখার মত স্থির হয়ে রইলেন।

কেবল নীতি কাতরতামাত্র, কেবল শৌর্য শ্বাপদের ধর্ম। তাই তিনি নীতি ও শৌর্য উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সিদ্ধিলাভে যত্নবান হলেন।

গুপ্তচররূপ রশ্মি চারদিকে ব্যাপ্ত থাকায় মেঘমুক্ত সূর্যমণ্ডলের মত অতিথির রাজ্যমণ্ডলে কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

দিন ও রাত্রিকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে যে সময়ে রাজার যা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট অতিথি তা নিঃসংশয়ে নিয়মিত পালন করতেন। প্রতিদিনই তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতেন। তার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা কখনো প্রকাশ হয়ে যেত না, কারণ সে মন্ত্রণার দ্বার গুপ্ত ছিল। অর্থাৎ আভাসে ইঙ্গিতে সে মন্ত্রণা চলত।

রাজা অতিথি নিদ্রিত হলেও শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সর্বত্র পরস্পরের অজ্ঞাত চর নিযুক্ত থাকায় মনে হত তিনি যেন সর্বদা জেগে আছেন।

তিনি স্বয়ং শত্রুদের অবরোধক ছিলেন। তবু তাঁর দুর্গগুলিকে শত্রুদের কাছে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভীত হয়ে একাজ করেননি, কারণ গজজয়ী সিংহ জয়লাভ করেও কখনো গিরিগুহায় শুয়ে থাকে না।

রাজ্যের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি কৃত্যাকৃত্য বিচার করে কাজ করতেন বলে তা সফল হত। শালিধান যেমন কাণ্ডের মধ্যেই থেকে যায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না তেমনি তাঁর কাজও সব অপ্রকাশ্যভাবেই ফল প্রকাশ করত।

তিনি সমৃদ্ধিতে বিচলিত হয়ে উঠলেও কখনো বিপক্ষে যেতেন না। সমুদ্র উদ্বেলিত হলেও নদীমুখেই সীমাবদ্ধ থাকে তার গতি, অন্য পথে যায় না।

প্রজাদের বিরাগ অচিরে দমন করার সামর্থ্য ছিল তাঁর, কিন্তু যার প্রতিকার করতে হবে তাকে তিনি জন্মাতেই দিতেন না।

তিনি শক্তিমান হলেও অপেক্ষাকৃত হীনবলের বিরুদ্ধেই অভিযান করতেন। কারণ বায়ু সহায় থাকলেও দাবানল তৃণকাষ্ঠাদিরই অন্বেষণ করে, জলের অন্বেষণ করে না।

তিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিকে সমানভাবে সেবা করতেন। কখনো অর্থ ও কামসেবায় ধর্মের, ধর্মসেবায় অর্থ ও কামের, কামসেবায় অর্থের বা অর্থসেবায় কামের বাধা জন্মাতেন না।

মিত্রেরা হীন হলে কোন উপকারে আসে না, আবার তাদের শক্তি বেড়ে গেলে বিরুদ্ধে যায়। তাই মিত্ররা মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে সেই ব্যবস্থা করতেন অতিথি।

অভিযানের আগে তিনি নিজের ও শত্রুর বলের আধিক্য ও ন্যূনতা বিচার করে যদি নিজেকে শত্রুর চেয়ে সর্বদিক দিয়ে শক্তিমান বলে মনে করতেন তবেই যুদ্ধযাত্রা করতেন। না হলে বিরত থাকতেন।

ধনাগারে ধনসঞ্চয় থাকলে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া যায়। তাই তিনি ধনসঞ্চয়ে তৎপর হতেন। কিন্তু কোন লোভের বশবর্তী হয়ে নয়, যে মেঘে জল থাকে চাতকেরা তাকেই অভিনন্দন জানায়। ধন থাকলেই অভাবগ্রস্ত মানুষেরা সাহায্যের আশায় ভীড় করে ধনীর কাছে।

তিনি নিজের কর্তব্যকর্মে অবহিত থেকে শত্রুর কাজ পণ্ড করতেন। রন্ধ্র বা ছিদ্র অন্বেষণ করে শত্রুকে আঘাত করতে করতে নিজের রন্ধ্র আবৃত করতেন অর্থাৎ নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি আবৃত করতেন।

সৈন্যসমৃদ্ধ সেই রাজার পিতা যেসব যুদ্ধবিশারদ সুশিক্ষিত সৈন্য পোষণ করতেন, তিনি তাদের নিজের দেহ থেকে পৃথক মনে করতেন না।

শত্রুরা এই রাজার সাপের মাথায় মণির মত তিনটি শক্তি আকর্ষণ করতে পারত না। কিন্তু তিনি অয়স্কান্ত মণি যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি করে শত্রুর সেই শক্তি আকর্ষণ করতেন।

তাঁর রাজ্যে বণিকদল নদীগুলিতে বাড়ির পুকুরের মত, বনগুলোতে উপবনের মত এবং পাহাড়গুলিতে নিজের বাড়ির মত যথেচ্ছ বিচরণ

করতে পারত।

রাক্ষসাদির উপদ্রব থেকে তপস্যাকে রক্ষা করে, তস্করদের হাত থেকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সম্পদ রক্ষা করে তিনি রাজস্বের মত বর্ণধর্ম ও আশ্রম-ধর্মেরও ভাগী হতেন।

বসুন্ধরার খনি থেকে রত্ন, ক্ষেত্র থেকে শস্য এবং অরণ্য থেকে মাতঙ্গ অর্জন করে রাজাকে রক্ষার অনুরূপ বেতন দিতেন।

কার্তিকেয়ের মত পরাক্রান্ত রাজা অতিথি যেখানে প্রয়োজন সেখানে ছয়রকম গুণ ও বলের প্রয়োগ করতেন। এই প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন তিনি। এইভাবে পর্যায়ক্রমে চাররকম রাজনীতি প্রয়োগ করে তিনি মন্ত্রাদি আঠারোটি বিষয় পর্যন্ত অবাধে সেই রাজনীতির ফললাভ করতেন।

কূট যুদ্ধ জানলেও তিনি ধর্মসম্মত যুদ্ধই করতেন। তাই বীরানুরাগিনী জয়লক্ষ্মী অভিসারিকার মত অনুগমন করত তাঁর। তাঁর অখণ্ড প্রতাপে প্রায় সমস্ত শত্রুই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। গন্ধগজের মদগন্ধে অন্যান্য গজেরা যেমন পালায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয় না, তেমনি রাজা অতিথির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত না কোন শত্রু।

বৃদ্ধিলাভ করে চাঁদ আবার ক্ষীণ হয়, সমুদ্রও তেমনি হয়। কিন্তু অতিথির বৃদ্ধি হলেও চাঁদ বা সমুদ্রের মত কখনো তিনি ক্ষীণ হননি।

জলহীন মেঘ যেমন সাগরের কাছে গিয়ে জললাভ করে দাতা হয় অর্থাৎ পৃথিবীকে জলদান করে, তেমনি অতিশয় দরিদ্র বিদ্বান প্রার্থী মহান রাজার কাছে গিয়ে দাতা হতে পারতেন অর্থাৎ অন্যকে দান করার মত ধনলাভ করতেন।

তিনি প্রশংসনীয় কাজ করতেন। কিন্তু কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি লজ্জা পেতেন এবং স্তাবকদের উপর রুষ্ট হতেন। কিন্তু এতে তাঁর যশ বেড়েই যেত।

তিনি উদিত সূর্যের মত দর্শনেই পাপনাশ করে যথার্থই অন্ধকার দূর করতেন। এইভাবে সর্বদাই প্রজাদের অনন্য করে তুলতেন। চাঁদের কিরণ পদ্মে প্রবেশ করে না, সূর্যের কিরণ কুমুদে স্থান পায় না, কিন্তু

সেই গুণবান রাজার গুণরাশি শত্রুপক্ষের মধ্যেও স্থানলাভ করত।

যদিও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনে জয়েচ্ছু অতিথির উদ্যমের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর সম্পদ আহরণ, তথাপি তা শুধু ধর্মপালনের জন্য, বিনাশের জন্য নয়।

এইভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলে সমৃদ্ধি লাভ করে ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রাজা হয়েছিলেন, তেমনি তিনিও মর্ত্যে রাজাদের রাজা হলেন। তিনি রাজধর্ম পালন করতেন বলে লোকে তাঁর ইন্দ্রাদি চতুর্লোকপালনের পঞ্চম, ক্ষিতি আদি পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ এবং মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতরাজির অষ্টম বলত।

দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করেন, তেমনি তিনি পত্রযোগে কোন আদেশ পাঠালে রাজারা দূর থেকেই রাজচ্ছত্র অবনত করে তা শিরোধার্য করতেন।

তিনি মহাযজ্ঞে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের এত ধন দিয়ে অর্চনা করেছিলেন যে সেই রাজা এবং কুবেরের নাম সমানভাবেই কীর্তিত হত সাধারণের মাঝে।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করতেন, যম মহামারী নিবারণ করতেন, বরুণ নৌ-চালনার জন্য সমস্ত জলপথ নিরাপদ রাখতেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মহিমা জানতেন বলে কুবের তাঁর কোষ বৃদ্ধি করতেন। এইভাবে লোক-পালেরা শরণাগতের মত আচরণ করতেন তাঁর সঙ্গে।

অষ্টাদশ সর্গ

শত্রুদমনকারী রাজা অতিথি নিষধদেশাধিপতি রাজা অর্থপতির কন্যার গর্ভে নিষধ পর্বতের মত দৃঢ়কায় এক পুত্র উৎপাদন করলেন। তার নাম রাখা হলো নিষধ।

পরম পরাক্রান্ত পুত্র নিষধ যৌবনে পদার্পণ করলে ভবিষ্যতে তার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে এই ভেবে পিতা যথাকালে বর্ষণে শস্য ফলোন্মুখ হলে জীবলোক যেমন আনন্দ পায় তেমনি আনন্দিত হলেন।

কুমুদ্বতীর পুত্র অতিথি শব্দ প্রভৃতি সকল সুখ সম্ভোগ করে পুত্র নিষধের উপর রাজ্যভার দিয়ে কুমুদের মত নির্মল কর্মযজ্ঞে অর্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন।

কুশের পৌত্র পদ্মলোচন সমুদ্রের মত প্রশান্তচিত্ত, অপ্রতিহত বীর, নগর তোরণদ্বারের মত তাঁর বিশাল বাহু,—তিনি সসাগরা ধরণীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করলেন।

তাঁর পুত্রের নাম নল। তিনি ছিলেন অনলের মত তেজস্বী এবং কমলতুল্য ছিল তাঁর বদন। পিতার দেহান্তে তিনি রাজলক্ষ্মীকে লাভ করলেন। মাতঙ্গ যেমন নলবহুল স্থানকে বিমর্দিত করে, তিনি তেমনি শত্রুবলকে বিমর্দিত করলেন।

নল নভঃ নামে এক পুত্রলাভ করলেন। নভশ্চর সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ তাঁর যশোগান করতেন। নভস্তনের মত ছিল তাঁর গাত্রবর্ণ। জীবলোকের কমনীয় নভোমাস বা শ্রাবণ মাসের মত তিনি প্রজাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

পরমধার্মিক নল প্রভাবশালী পুত্র নভঃকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন। তারপর জরা আসন্ন বুঝে সংসার নিবৃত্তির জন্য বাণপ্রস্থ নিয়ে মৃগকুলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

গজকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকের মত এক অজেয় পুত্রলাভ করলেন রাজা নভঃ। তার নাম পুণ্ডরীক। পিতার মৃত্যুর পর শ্বেতকমল-রাজলক্ষ্মী পুণ্ডরীকাক্ষের মত করেই বরণ করলেন তাঁকে।

সেই অব্যর্থ ধনুর্ধর পুণ্ডরীক প্রজাকুলের মঙ্গলবিধানে সমর্থ, ক্ষমাগুণান্বিত ক্ষেমধন্বা নামে এক পুত্রলাভ করে পরে তাকে পৃথিবীর আধিপত্যে নিযুক্ত করে ক্ষমাপূর্ণ হৃদয়ে তপশ্চরণ করতে বনে চলে গেলেন।

সেই ক্ষেমধন্বাও যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দেবপ্রতিম এক পুত্রলাভ করলেন। তাঁর নাম হলো দেবানীক। তাঁর খ্যাতি দেবলোক পর্যন্ত বিশ্রুত ছিল। সেই পিতৃসেবাপরায়ণ পুত্র দেবানীকের দ্বারা পিতা যেমন প্রকৃত পুত্রবান হয়েছিলেন তেমনি পুত্রবৎসল পিতার দ্বারা পুত্রও

যথার্থ পিতৃমান হয়েছিলেন।

সকল গুণের নিধিস্বরূপ পরম যাজ্ঞিক পিতা ক্ষেমধন্বা দীর্ঘকাল চতুর্বর্গের প্রতিপালন করে নিজের সমকক্ষ পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গে গমন করলেন।

তাঁর সংযমী পুত্র অহীনও বিনয়গুণে স্বপক্ষের মত বিপক্ষেরও প্রিয় ছিলেন। মাধুর্যগুণে অর্থাৎ মধুর সঙ্গীতের প্রভাবে ভীত সন্ত্রস্ত মৃগকেও বশীভূত করা যায়। তিনি বাহুবলেও অহীন ছিলেন। হীনসংসর্গে পরাঙ্মুখ থেকে তিনি যুবা বয়সেও অনর্থ ব্যসনে অনাসক্ত ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন।

তিনি ছিলেন অন্তর্দর্শী ও বুদ্ধিমান। তিনি পিতার পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আদিপুরুষ বিষ্ণুর মত চারটি উপায়ের অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের সহায়তায় চতুর্দিকের অধিপতি হলেন।

শত্রুকুলজয়ী অহীনও পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্র পারিযাত্রকে রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করলেন। তিনি উন্নত মস্তকে পারিযাত্র পর্বতকে জয় করেন।

পারিযাত্রের পুত্র শিল ছিলেন উদারচরিত্র ; শিলাপটের মতই তিনি ছিলেন বিশালবক্ষ। তিনি বাণ নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষকে জয় করে প্রশংসিত হতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন।

বহুপ্রশংসিত পারিযাত্র সংযতস্বভাব যুবক শিলকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করে সুখসমূহ ভোগ করতে লাগলেন। সাধারণতঃ রাজার কাজ কারাজীবনের মতই সুখের পরিপন্হী।

অনুরাগের ভোগবিলাসে তাঁর তখনো তৃপ্তি হয়নি। রতির প্রতি অকারণ বিদ্বেষবশতই যেন বৃদ্ধা ঈর্ষাপরায়ণা জরা বিলাসিনীদের বিশেষ সম্ভোগের পাত্র পারিযাত্রকে গ্রাস করল।

শিলের পুত্রের নাম উন্নাভ, অথচ তাঁর নাভিরন্ধ্র ছিল অত্যন্ত নিম্ন। তিনি সর্ব বিষয়ে ছিলেন পদ্মনাভ বিষ্ণুর সমকক্ষ এবং রাজ-মণ্ডলের মধ্যে তিনি ছিলেন নাভিস্বরূপ অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র।

উন্নাভের পুত্র বজ্রধর ইন্দ্রের মতই ছিলেন শক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধে

বজ্রঘোষকারী। তিনি 'বজ্রনাভ' বজ্রমণির থলিতে ভরা বসুমতীর অধিপতি হলেন।

বজ্রধর আপন পুণ্যফলে স্বর্গগত হলে তাঁর পুত্র শঙ্খন রাজা হলেন। সেই পরন্তপ রাজাকে সসাগরা ধরণী নানা খনির বহুবিধ রত্ন-উপহারে সেবা করতে লাগলেন।

শঙ্খন-এর মৃত্যুর পর সূর্যের মত প্রভাবশালী, অশ্বিদ্বয়ের মত সৌন্দর্যসম্পন্ন পুত্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করলেন। সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে আপন সৈন্য ও অশ্বকে সন্নিবেশিত (উষিত) করেছিলেন বলে পুরাবিদেরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন ব্যুষিতাশ্ব।

ক্ষিতিপতি ব্যুষিতাশ্ব বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে বিশ্বের পরম বন্ধু এবং সমগ্র পৃথিবীকে পালনে সক্ষম নিজের মূর্তিমান আত্মার মত এক পুত্রকে জন্ম দিলেন। তার নাম বিশ্বসহ।

সেই নীতিজ্ঞ রাজার হিরণ্যাক্ষের শত্রু বিষ্ণুর অংশে হিরণ্যনাভ নামে এক পুত্র হয়। ফলে তরুরাজির পক্ষে বায়ুসমন্বিত অগ্নির মত রাজা বিশ্বসহ অসহ্য হয়ে উঠলেন শত্রুদের পক্ষে।

পিতৃঋণমুক্ত কৃতী পিতা বিশ্বসহ পরিণত বয়সে অক্ষয় সুখের অভিলাষে আজানুলম্বিতবাহু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে নিজে বল্কল ধারণ করলেন।

উত্তরকোশল রাজ্যের অধীশ্বর এবং সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ সোমযাজী হিরণ্যনাভের কৌশল্য নামে একটি পুত্র হয়। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চাঁদের মত নয়নের আনন্দ।

ব্রহ্মার সভা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো তাঁর যশ। যথাকালে তিনি 'ব্রহ্মিষ্ঠ' নামে তাঁর নিজের পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ব্রহ্মলোক লাভ করলেন। বংশের অলঙ্কারস্বরূপ, সৎ পুত্রের ব্রহ্মিষ্ঠের শাসনাধীনা ধরিত্রীকে অপ্রতিহতভাবে শাসন করতে লাগলেন। তাঁর সুশাসনে আনন্দাশ্রু ঝরত প্রীত প্রজাপুঞ্জের নয়নে।

গুরুজনের সেবা করে কৃতার্থ, সুদর্শন, গড়ুরধ্বজ বা বিষ্ণুর মত আকৃতিবিশিষ্ট পদ্মপলাশলোচন এক পুত্র লাভ করলেন ব্রহ্মিষ্ঠ। তার

নাম রাখা হয় পুত্র। রূপে গুণে পুত্র সপুত্রকদের অগ্রগণ্য করে তুলেছিল পিতা ব্রহ্মিষ্ঠকে।

এরপর নশ্বর বিষয়সুখে নিস্পৃহ হয়ে ব্রহ্মিষ্ঠ ইন্দ্রের সখা হবার বাসনা নিয়ে বংশধর পুত্রের উপর রাজ্য ও কুলরক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। তারপর তিনি ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নান করে অমরত্ব লাভ করলেন।

পুত্রের পত্নী পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র দেহপ্রভায় পুষ্পপরাগমণিকেও হার মানায়। দ্বিতীয় পুষ্যানক্ষত্রের মত তাঁর অভ্যুদয়ে জীবলোক পরিপূর্ণ পুষ্টি লাভ করল।

উদারমতি যুবরাজ পুত্র সংসার ও পুনর্জন্মের ভয়ে ভীত হয়ে পুত্র পুষ্পের উপর পৃথিবীর ভার দিয়ে ব্রহ্মবিদ জৈমিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি যোগাভ্যাস করে যোগবলে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এরপর পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি পৃথিবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সত্যিই ধ্রুবের মত সত্যসন্ধ এবং সর্বজনপ্রশংসিত। শত্রুরা নতশিরে তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী সন্ধি স্থাপন করেছিল।

রাজা ধ্রুবসন্ধির প্রতিপদের চাঁদের মত অতি সুন্দর এক পুত্র হয়। তার নাম ছিল সুদর্শন। সুদর্শন যখন শিশুমাত্র তখন একদিন মৃগনয়ন রাজা ধ্রুবসন্ধি মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের মুখে প্রাণ দিলেন।

এইভাবে রাজা ধ্রুবসন্ধি অকালে স্বর্গে গেলে তাঁর রাজ্যের প্রজাকুল অনাথ ও ভাগ্যহীন হয়। তাই তাঁরা একমত হয়ে বংশের কুলতন্তু অর্থাৎ শিবরাত্রির সলতের মত সেই শিশুকুমার সুদর্শনকেই বিধিমত অযোধ্যার রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন।

তখন রঘুবংশ সেই শিশুনৃপতি সুদর্শনকে নিয়ে নবেন্দুশোভিত নভস্তল, একটি মাত্র সিংহশাবকশোভিত অরণ্য এবং মুকুল অবস্থায় একটি মাত্র কমলশোভিত জলের মত শোভা পেত। বালকের মাথায় রাজমুকুট দেখে লোকে মনে ভাবল তিনি ভবিষ্যতে পিতার মতই হবেন। অনুকূল বাতাস পেয়ে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলে।

তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। তিনি যখন মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজপথে বার হতেন তখন তাঁর রাজবেশটি এতবড় ছিল যে মাহুত তাঁর সেই পরিচ্ছদের বাড়তি অংশটি ধরে থাকত। তবু পুরবাসীরা তাঁকে প্রভু ভেবেই তাঁর গৌরবের সমান করেই তাঁকে দেখত।

তিনি পিতার সিংহাসনের সবটা জুড়ে বসতে পারতেন না। তবু স্বর্ণজালের মত তাঁর তেজের মহিমায় তিনি যেন শরীর আবৃত করে সেই সিংহাসনকে ব্যাপ্ত করে রাখতেন। চরণযুগল সামান্য ঘুরিয়ে সিংহাসনের নিচে রাখা পাদপীঠে ঈষৎ স্পর্শ রাখতেন। তাঁর অলক্ত-রঞ্জিত চরণদ্বয়ে নরপতিরা গর্বোন্নত মস্তক আনত করে প্রণাম করতেন।

স্বল্পাকার ইন্দ্রনীল মণি ক্ষুদ্র হলেও উজ্জ্বল প্রভাগুণে তাকে মহানীল বললেও অত্যুক্তি বা বেশী বলা হয় না। তেমনি বয়সে শিশু হলেও সুদর্শনের 'মহারাজ' নাম অসার্থক হয়নি।

সিংহাসনের উভয় পার্শ্বের চামরব্যজনে তাঁর কপোললম্বিত দুটি কাকপক্ষ বা জুলফি চঞ্চল হত। কিন্তু তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত আদেশ সুদূর সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত কোথাও অমান্য করা হত না।

স্বর্ণময় উষ্ণীষশোভিত ললাটে তিনি তিলক ধারণ করে সর্বদা স্মিতমুখে শত্রুরমণীদের মুখ তিলকশূন্য করে দিয়েছিলেন।

তাঁর শরীরটি ছিল শিরীষ ফুলের থেকেও কোমল, বসনভূষণে তাই কষ্ট হত। তবু হৃদয়ের বলে বিশাল পৃথিবীর গুরুভার বহন করতেন। অক্ষরভূমিকায় ভাল করে বর্ণ বিন্যাস শেখার আগেই তিনি জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছে দণ্ডনীতির সর্ববিধ ফলাফল শিক্ষা করেছিলেন।

বালক সুদর্শনের অনতিপ্রশস্ত বক্ষস্থলে অধিষ্ঠানের পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে রাজলক্ষ্মী তাঁর যৌবনের অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সলজ্জ-ভাবে রাজছত্রের ছায়ার তলেই আলিঙ্গন করতেন তাঁকে।

কালক্রমে তাঁর শরীরের অবয়বসমূহ শুধু বৃদ্ধি পেল তা নয়, তাঁদের কুলপ্রথাগত সর্বজনপ্রিয় গুণরাশিও সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

পূর্বজন্মে অর্জিত বিদ্যাসমূহ স্মরণ করেই তিনি যেন গুরুর ক্লেশ

উৎপাদন না করে তিন বর্গকে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামকে আয়ত্ত করার উপায়স্বরূপ তিনটি বিদ্যা অর্থাৎ বেদ, কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য এবং রাজ্যশাসনরূপ দণ্ডনীতি আয়ত্ত করলেন এবং পিতার প্রজাকুলকে সহজে গ্রহণ করলেন।

অস্ত্রশিক্ষাকালে শরীরের পূর্বার্ধ প্রসারিত করে মাথার চূড়া উন্নত রেখে, জানু অকুঞ্চিত করে এবং আকর্ণ বিস্তৃত শরাসন আকর্ষণ করে তিনি বিশেষ শোভা পেতেন। তারপর তিনি সুন্দরীদের নয়নের মধু-স্বরূপ সর্বাঙ্গব্যাপী অকৃত্রিম ভূষণরূপ মনোহর যৌবন লাভ করলেন।

কুমারের শুদ্ধ সন্তানের কামনায় অমাত্যেরা দূতের মাধ্যমে প্রতি-কৃতির থেকে অধিক সুন্দরী কন্যাদের বধূরূপে সংগ্রহ করলেন। সেই সব বধূরা কুমারের প্রথম দুই স্ত্রী রাজলক্ষ্মী ও পৃথিবীকে পেলেন।

ঊনবিংশ সর্গ

যথাকালে বার্ধক্য উপস্থিত হলে বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় রঘুরাজ সুদর্শন অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী আত্মজ অগ্নিবর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করলেন।

সেখানে গিয়ে সুদর্শন দীর্ঘিকাকে বিস্মৃত হয়ে তীর্থবারিতে স্নান করলেন। পালঙ্ক ভুলে গিয়ে ভূমিতে কুশশয্যায় শয়ন করলেন। কুটিরে বাস করে প্রাসাদকে ভুলে গেলেন। এইভাবে ফলাকাঙ্ক্ষায় স্পৃহা না রেখে তপশ্চর্যা করে যেতে লাগলেন।

তাঁর পুত্র রাজ্যপালনের ভারে কষ্ট পেলেন না। কারণ তাঁর পিতা বাহুবলে শত্রুজয় করে পৃথিবীকে তাঁর ভোগের জন্য প্রস্তুত করে রেখে-ছিলেন, কন্টক উদ্ধারের জন্য রাখেননি।

কর্মপ্রিয় অগ্নিবর্ণ রাজ্যপালনের অধিকার কয়েক বৎসর নিজে পালন করলেন। তারপর সচিবদের উপর দায়িত্বভার দিয়ে তিনি নবীন যৌবন নিয়ে স্ত্রীসম্ভোগের অধীন হয়ে পড়লেন।

কামপ্রিয় অগ্নিবর্ণ কামিনীদের সহচর হলেন। মৃদঙ্গধ্বনিমুখরিত তাঁর ভবনে ভবনে উৎসব বৃদ্ধি পেল। তারা ক্রমশঃ পূর্বেকার উৎসব-

সমূহকে বাড়িয়ে গেল। রাজা অগ্নিবর্ণ ইন্দ্রিয়ভোগ বিনা এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। ফলে তাঁর অন্তঃপুরেই দিনরাত কেটে গেল। অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না।

কখনো মন্ত্রীদের পীড়াপীড়িতে প্রজাদের আকাঙ্ক্ষিত দর্শন দিলেও তিনি গবাক্ষপথে একটি চরণ প্রলম্বিত করেই তা সাধন করতেন। অতিকোমল নখরাগে উদ্ভাসিত ঐ চরণ অরুণরাগরঞ্জিত পদ্মের মত। প্রজাবৃন্দ অবনতমস্তকে ঐ চরণ প্রণাম করে যেত।

কামতরঙ্গে অবগাহন করে তিনি বিলাসিনীদের যৌবনসমৃদ্ধ ও উত্তুঙ্গ স্তনের আঘাতে চঞ্চল দীর্ঘিকাসমূহের জলে বিহার করতেন। সেই সব দীর্ঘিকাগুলি পদ্মে পরিপূর্ণ ও অভিসারগৃহযুক্ত ছিল। সেখানে পরস্পর জলসিঞ্চনে সুন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে যেত, অঙ্গনারা তাদের মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে আরও বেশী মোহিত করে তুলত তাঁকে।

গজরাজ যেমন তার গজকামিনীদের নিয়ে মধুগন্ধময় পদ্মবনে অবতীর্ণ হয়, তিনিও তেমনি প্রেয়সীদের নিয়ে সুবাসিত পানভূমিতে গমন করতেন। সুন্দরীরা মজ নামক সুন্দর আসব মদ তাঁর কাছে গোপনে পেতে অভিলাষ করত। তাদের মুখের উচ্ছিষ্ট আসব আমোদের সঙ্গে পান করতেন রাজা।

মনোহারিণী মধুরভাষিণী বামলোচনা অথবা মনোহরধ্বনি বীণা—এই দুটির একটি পর্যায়ক্রমে শোভা পেত তাঁর কোলে। সে কোল কখনো শূন্য থাকত না।

তিনি নিজে রসিক, মাল্য এবং বলয় আন্দোলিত করে তিনি মৃদঙ্গ বাজাতেন।

তিনি নর্তকীদের মনোহরণ করে নৃত্যাভিনয়ে ভুল ধরিয়ে সম্মুখবর্তী নাট্যাচার্যদের কাছে তাদের লজ্জিত করে তুলতেন।

নৃত্যশেষে পরিশ্রান্ত নর্তকীদের ঘর্মাক্ত মুখে তিলক বিশীর্ণ হয়ে পড়ত। তিনি সেই সুন্দর মুখে সোহাগবশে ফুৎকার দিতে দিতে তার সুধা পান করতেন। এতে তিনি যেন অমরেশ্বর ইন্দ্র ও অলকাপতি

কুবেরকেও অতিক্রম করেছিলেন।

তিনি নিত্যনূতন কাম্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর ছিলেন। প্রেয়সীরা সম্ভোগকে অর্ধসমাপ্ত রেখে তাঁর মিলনের আনন্দকে অপূর্ণ রাখতেন। তিনি প্রেয়সীকে প্রবঞ্চিত করে অন্যত্র গেলে কখনো অঙ্গুলি কিশলয়ের তর্জন ভোগ করতেন, কখনো কুটিল ভ্রূভঙ্গের কটাক্ষ দেখতেন, কখনো বা মেখলাদামের একাধিক বন্ধন ভোগ করতে হত তাঁকে।

অভিসারের নির্দিষ্ট রাত্রিতে তিনি দূতীর জ্ঞাতসারে কামিনীর পশ্চাতে উপস্থিত হতেন। তারপর প্রিয়ার বিরহকাতর প্রলাপবাক্য মজা করে শুনতেন।

মহিষীরা তাঁকে ঘিরে থাকলে নর্তকীদের যখন পেতেন না, তখন তিনি অধীর হয়ে অঙ্গুলির স্বেদস্রাবে তুলিকা সিক্ত করে তাদের অঙ্গের আলেখ্য রচনা করে চিত্তবিনোদন করতেন।

প্রেমগর্বিত বিপক্ষের প্রতি ঈর্ষায় এবং নিজেরাও মদনাতুরা হয়ে রাণীরা ক্রোধ অভিমান ত্যাগ করে কোন উৎসবের অজুহাতে তাঁকে সেবা করে কৃতার্থ হতেন।

সকাল হতেই তিনি তাঁর শরীরে সম্ভোগচিহ্ন দেখে কুপিতা প্রেয়সীদের কাছে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাদের প্রসন্ন করতেন। কিন্তু আবার শৈথিল্যবশতঃ তাদের দুঃখও দিতেন।

নিদ্রিত অবস্থায় তিনি কোন প্রমদার নাম করতে থাকলে মহিষীরা তাঁকে কিছু না বলে চোখের জলে বুকের বসন ভিজিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে প্রতিকার করতে গিয়ে হাতের বলয় ভেঙ্গে ফেলতেন।

তিনি দূতীর দেখানো পথে এগিয়ে কুসুমশয্যাশোভিত লতাগৃহে এসে মহিষীদের ভয় নিয়েই পরিচারিকাদের সংসর্গ উপভোগ করতেন। অন্যমনস্কভাবে তিনি অন্য কোন ললনার নাম উচ্চারণ করলে সুন্দরীরা তাঁকে বলত, তুমি যে মহিষীর নাম বললে তার সৌভাগ্যের আকাঙ্ক্ষায় আমার মন লোলুপ হয়েছে।

পিঙ্গলবর্ণ প্রসাধনচূর্ণে ছিন্নমালায় পরিপূর্ণ ছিন্নভিন্ন মেখলা-শোভিত এবং অলক্তলাঞ্ছিত শয্যাই সেই বিলাসী রাজার বিভিন্ন

রতিবিলাসের কথা প্রকাশ করে দিত।

তিনি নিজে ললনাদের চরণে অলক্ত পরিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের বসন শিথিল হয়ে পড়লে শুধু মেখলাযুক্ত নিতম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি আর তেমন অভিনিবেশ করতে পারতেন না। চুম্বনকালে তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, মেখলা ছিন্ন করতে গেলে হাত চেপে ধরত। এইভাবে ইচ্ছায় বাধা পেলেও তাঁর সম্ভোগের কামাগ্নি জ্বলন্তই থাকত।

দর্পণে সম্ভোগচিহ্নগুলি দেখতে থাকা কামিনীদের পশ্চাতে পরিহাসসহকারে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি প্রতিবিম্ব দর্শনে তাদের লজ্জাবনতমুখী করে তুলতেন।

সকালে শয্যাত্যাগকালে প্রেয়সীরা কোমল বাহুবন্ধনে তাঁকে কণ্ঠালিঙ্গন করে চরণের অগ্রভাগ দিয়ে তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে রজনীশেষের চুম্বন প্রার্থনা করত।

নবীন যুবক রাজা অগ্নিবর্ণ দর্পণতলে ইন্দ্রকেও হার মানানো নিজের রাজবেশ দেখে তত তৃপ্ত হতেন না, যতটা তিনি কামিনীদের সম্ভোগচিহ্ন দেখে প্রীত হতেন। বন্ধুর কাজের ছলে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে গেলে এবং তাঁকে চঞ্চল দেখে প্রেয়সীরা তাঁর চুলের মুঠি ধরে বলত, শঠ, তোমার পালাবার ছলচাতুরী আমরা বেশ বুঝি।

তাঁর নির্দয় রতিশ্রমে ক্লান্ত কামিনীর 'কণ্ঠসূত্র' নামে আলিঙ্গনের ছলে তাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে বক্ষে শয়ন করলে তাদের বিশাল স্তনমর্দনে রাজার অঙ্গরাগ তৃপ্ত হত।

রাত্রিতে মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি কুট্টনীদের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হলে সুন্দরীরা তাঁকে টেনে নিয়ে বলত, কামুক, অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে বঞ্চনা করবে?' চাঁদের কিরণে সারারাত প্রস্ফুটিত থেকে কুমুদবন যেমন দিনে নিমীলিত থাকে, তেমনি তিনিও রমণী সংসর্গে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিনে নিদ্রিত থাকতেন।

তাঁর দংশনে তাদের অধর পীড়িত, নখক্ষতে উরুদেশ ক্লিষ্ট, তাই গায়িকাদের বাঁশি ও বীণা বাজাতে কষ্ট হলে তারা রোষকুটিল কটাক্ষ করলে তা দেখে আরও মোহিত হতেন তিনি। তিনি নিজে নর্তকীদের

আঙ্গিক, বাচিক ও মানসিক অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তারপর অভিনয়-কালে বন্ধুদের উপস্থিতিতে নাট্যাচার্যগণের মধ্যে তর্ক বাধিয়ে দিতেন।

কার্তিক মাসের রাত্রিতে তিনি চন্দ্রাতপমণ্ডিত প্রাসাদে বিলাসিনীদের সম্ভোগশান্তিহরা মেঘমুক্ত বিমল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করতেন।

সুমধ্যমায়া মর্মরধ্বনিযুক্ত ও অগুরুধূপের ধোঁয়ায় সুবাসিত হেমন্তকালীন বসনের হেমরশনাটি একটু দেখিয়ে মেখলাবন্ধনে ও উন্মোচনে আগ্রহী রাজাকে আরও লুব্ধ করত। প্রাসাদের বাতাসশূন্য অন্তঃপ্রকোষ্ঠসমূহে নিষ্কম্প দীপসমূহযুক্ত শীতের রাত্রিগুলি তাঁর সর্বপ্রকার নর্মলীলার সাক্ষী ছিল।

বসন্তে দক্ষিণ সমীরণে পল্লবযুক্ত চ্যুতকুসুম দেখে বিরহ সইতে না পেরে সব অভিমান ভুলে অঙ্গনারা তাঁকে অনুনয় করত। তিনি তাদের কোলে নিয়ে দোলারহণ করলে পরিজনেরা দোল দিত। তখন দোলার রশ্মি ছেড়ে দিয়ে তাদের ঠেলে দিলে তারাও যেন ভয় পেয়ে তাঁকে কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ করত।

প্রেয়সীরা গ্রীষ্মকালোচিত বেশবাসে অর্থাৎ পয়োধরে চন্দননিষেকে মুক্তাগ্রথিত সুন্দর অলঙ্কারসমূহে এবং শ্রোণিদেশের মণিময় মেখলা দিয়ে তাঁকে সেবা করতেন।

তিনি সহকারপল্লবমিশ্রিত এবং পাটলকুসুমের রাগরঞ্জিত আসব পান করতেন। তাতে বসন্ত শেষে তাঁর নিষ্প্রভ চিত্ত নবীন উৎসাহে উদ্দীপিত হত।

এইভাবে অন্য সব কাজে বিমুখ হয়ে একমাত্র কামপ্রবাহে মত্ত রাজা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সন্ধানে প্রত্যেকটি বিশেষ ঋতু যাপন করতেন।

তিনি প্রমত্ত হলেও তাঁর রাজশক্তির প্রভাবে অন্যান্য রাজারা তাঁকে আক্রমণ করতে পারতেন না। কিন্তু দক্ষের শাপ যেমন চন্দ্রকে যক্ষ্মারূপে আক্রমণ করেছিল, তেমনি অতিরিক্ত কামসম্ভোগের রোগে যক্ষ্মা ক্ষয় করতে লাগল তাঁকে।

চিকিৎসকদের নির্দেশ অমান্য করে তিনি দোষাবহ দেখেও আসক্তির বস্তু স্ত্রী ও মদ ত্যাগ করলেন না। ইন্দ্রিয়সমূহ রমণীয় বিষয়ে একবার

আকৃষ্ট হলে তাদের নিবৃত্ত করা কঠিন।

তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠল, শরীর ক্ষীণ হলো। খুব লঘু অলঙ্কার ধারণ করতেন। যষ্টি অবলম্বন করে চলতেন, কণ্ঠস্বর ভগ্ন হলো। এইভাবে রাজযক্ষ্মায় ক্ষীণ হয়ে অতিকামুকতার ফল পেলেন।

রাজা যখন ক্ষয়রোগাক্রান্ত হলেন তখন সেই বংশের অবস্থা চাঁদের শেষ কলামুক্ত আকাশের মত হলো। গ্রীষ্মের পঙ্কমাত্রাবশিষ্ট জলাশয়ের মত ও ক্ষীণ শিখাযুক্ত দীপাধারের মত হলো সে অবস্থা।

প্রজারা অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়লে মন্ত্রীরা রাজার রোগের কথা গোপন রেখে তাদের বারবার বললেন, রাজা পুত্রলাভের মানসে দিনের বেলায় পুণ্যকর্মে ব্যস্ত থাকেন।

দীপ যেমন বাতাসকে এড়াতে পারে না তেমনি বহুপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কুলপাবন সন্তানকে না দেখে বৈদ্যদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা ব্যর্থ করে রাজা রোগকে অতিক্রম করতে পারলেন না। যক্ষ্মা তাঁর জীবনকে শেষ করল।

মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে প্রজাদের কাছে রাজার রোগশান্তির কথা বলে পুরোহিতদের সাহায্যে মন্ত্রীরা প্রাসাদের উপবনেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে গোপনে রাজাকে দাহ করলেন।

মন্ত্রীরা যখন প্রধান প্রধান পৌরজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানলেন রাজার সহধর্মচারিণী প্রধানা মহিষী শুদ্ধ অন্তঃসত্ত্বা তখন সেই মহিষীই সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজার অকালমৃত্যুর শোকজনিত উষ্ণ নয়নজলে তাঁর যে গর্ভ প্রথমে প্রতপ্ত হয়েছিল, কাঞ্চনকলসনিঃসৃত শীতল অভিষেকসলিলে তা শান্ত হলো।

প্রজারা রাণীর প্রসব সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। মানুষের মঙ্গলের জন্য পৃথিবী যেমন শ্রাবণ মাসে রোপিত শস্যবীজ অন্তরে ধারণ করে, তেমনি রাজমহিষী গর্ভ ধারণ করে স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হয়ে কুলাগত বৃদ্ধ মন্ত্রীদের সহায়তায় যথাবিধি স্বামীর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কালিদাস সমাপ্ত